রাধিকাসুন্দরী

প্রথম খণ্ড

অমল ঘোষ

প্রগ্রেসিভ ষ্টাডি গ্রুপ
১২/৩, সুরা ক্রস লেন
কলকাতা-৭০০ ০১০

প্রথম প্রকাশ :
১লা অক্টোবর, ১৯৬৩

প্রকাশক :
'প্রগ্রেসিভ স্টাডি গ্রুপ'-এর পক্ষে—
প্রণব রায়
১২/এ, সুরা ক্রস লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১০

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ দাস
'মুদ্রাকর প্রেস'
১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

পরিবেশক :
'কথাশিল্প'
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত

রাধিকাসুন্দরী

প্রথম খণ্ড

পর্ব : এক

শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, রাধাও সঙ্গে যাবে। এমন সোমত্ত বয়সের মেয়ে। এত বড় বাড়িতে রাত্রিবেলা একা থাকবে কেন?

এবম্বিধ উদার সিদ্ধান্তের একটি হেতু ছিল।

উদয়াস্ত শ্রমে গোটা দিনটাই কেটেছে প্রলয় তাণ্ডবে। প্রাকৃতিক জলঝড়। অন্যূন প্রায় সাড়ে পাঁচ কাঠা জমির ওপর নবনির্মিত ত্রিতল প্রাসাদ ; বলা বাহুল্য, মেট্রোপলিটান শহরের পূর্ব প্রান্তে নতুন গড়ে ওঠা অভিজাত পল্লীর সঙ্গে সুষম চারিত্র্যে দুর্গপ্রাকারই একপ্রকার। তৎসহ গৃহে গৃহে অত্যাবশ্যক এবং অতি আধুনিক সুখবিলাসসামগ্রীসমূহ যে-রাজকীয় সম্ভ্রমের অহঙ্কার দান করেছে, সমুদয় বিষয়বৈভব রক্ষায় গৃহকর্ত্রী কিরণময়ী দেবী—সংসারধর্মের সাধারণ রীতি অনুযায়ী নিশ্চিতই যিনি সর্বসম্পদের একমাত্র অধিশ্বরী এবং যেহেতু সমগ্র দুর্গরক্ষার দায়িত্ব তাঁর একার ওপরই ন্যস্ত, অদ্যকার দিনে তিনি সর্বাংশে নাজেহাল। তাঁর অসহায়ত্বের কারণ বহুবিধ—প্রথমত, সংসারের সর্বময় কর্তা শ্রীনিশীথরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজস্ব কর্মোপলক্ষে এখন দিল্লীতে। তাঁর প্রত্যাবর্তন-সংবাদ এখনও সুনিশ্চিত হতে পারছে না বলেই, স্বভাবতই, নারীবক্ষের হৃদ্‌স্পন্দন কিঞ্চিৎ চঞ্চল। দ্বিতীয়ত, দুটি কিশোরী কন্যা এবং সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত একমাত্র পুত্র একটানা ঝড়জলের দিনে স্কুলে বা কলেজে যাওয়া থেকে যথারীতি বিরত থেকেছে। এদের ঘরে থাকার আরেক ঝকমারি, সন্তানদের সীমাহীন দৌরাত্ম্যে মাতা প্রাণান্ত দিনভর। তৃতীয়ত, রাধাসহ অন্যান্য দাসদাসী আজ্ঞাবহবৃন্দ প্রতিটি নির্দেশপালনে সন্ত্রস্ত যদিও, রাধাকে নিয়েও তাঁর অশান্তির শেষ নেই। কাজের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিচের মহলে ওদের নিত্যি ঝগড়া। আজও খামোকা এক তুলকালাম কাণ্ড বেধে গিয়েছিল। অপগণ্ড মুখ্যু মেয়েছেলে কতগুলো। অন্য সবাইকে বোঝানো যায় না, রাধা এ-বাড়িতে ঘরের

মেয়ের মতো। কিংবা ঘরের-মেয়ে রাধাও বোঝে না ঠিক ঠিক, অন্যান্য কাজের লোকদের সঙ্গে ওকেও যখন মিলেমিশেই থাকতে হবে, একটু রয়েসয়ে সবকিছু মানিয়ে চলাই নিয়ম। রাধা এ-সংসারে ব্যতিক্রম হতে চায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে কিরণময়ীর সংসারে গৃহসঙ্কটের চিত্রটি নিম্নরূপ।

সেই ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকেই গা-পোড়ানি জ্বালাটা বাড়ছিল। হোমিওপ্যাথ ডোজে কী ছাই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল দু-চারদিন, তার চেয়ে গোটা শহরে মানুষের ঘামের পরিমাণ ছিল অনেক, অনেক বেশি। কেউই মনে রাখেনি সেসব। তারপরও বোশেখ-জৈষ্ঠি পেরিয়ে আস্ত আষাঢ় মাসটাই কেটে গেল শুকনো খট্‌খটে রোদ্দুর আর পচা ঘামের ভ্যাপসা গরমে। রেডিওটিভির সংবাদ—মৌসুমী বাতাস আসছে। কবে আসবে হদিশ নেই। কাগজপত্রের লেখালেখি, টিভি-রেডিওর নিয়মিত হা-হুতাশ। বঙ্গোপসাগরের আনাচে-কানাচে গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেয়াদপকে নাকি প্রতিদিন খুঁজে বেড়াচ্ছে আবহাওয়া অফিস। ঘরেবাইরে যখন আর তিষ্ঠোনো যাচ্ছিল না কিছুতেই, বায়ুদূষণের শহরে নিজের বাকিবকেয়া পাওনাগণ্ডা মেটাতে গতকাল রাতে, রাতদুপুরে, কখন বা ঠিক কোন্ মুহূর্তে তার সূত্রপাত, কিছুই টের পেল না কেউ, ঝমঝমিয়ে ভেঙে পড়ল আকাশ। বুঝি আস্ত বঙ্গোপসাগরটাই মেঘ হয়ে উড়ে এসে উপচে পড়ল শহরটার ওপর। গভীর রাতে আচমকা মেঘের ডাকে একবার জেগে উঠে জানালার বাইরে অঝোর বৃষ্টিপাতের রিমঝিম রিমঝিম বোলে আশ্বস্ত হয়ে কিরণময়ী সেই যে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আবার, ঘুম ভাঙার পর, ভোরবেলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গোটা শরীর মুচড়ে প্রথম হাই-ভাঙার আলসেমি কাটার আগেই থমক দাঁড়ালেন। লণ্ডভণ্ড চারদিক। এত বড় বাড়ি, এত এত ঘর বারান্দা পার্লার ছাদ জলে জলে ভিজে ন্যাতান্যাতা। গুমোট গরমে ঘরের পাখা চালিয়েও যখন আর স্বস্তি ছিল না, প্রতিটি জানালার শার্সি-পর্দা সব সরিয়ে উদোম খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই। পুবমুখী কতগুলি ঘরে বৃষ্টির ছাঁটে ঘরের ভেতরও অনেকটা জায়গা জুড়ে জলের স্রোত। ঘরদোর এমন ভেজা-ভেজা দেখলেই কেমন গা-ঘিনঘিন করে তাঁর। বড্ড নোংরা মনে হয়। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস নেই, স্লিপার পরলে পিছলে যাবার ভয়। অথচ এখনও চারপাশ ঘিরে আকাশ উজাড় করে জল, অবিশ্রাম বৃষ্টি মুষলধারায়। ঘরে ঘরে ছুটে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ডাকলেন ছেলেমেয়েদের। টেনে টেনে তুললেন সবাইকে। সে-আরেক বিপদ। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে বাইরে জলঝড়ের প্রবল তাণ্ডব দেখে ওদের তুমুল হল্লা। অস্বস্তি কিরণময়ীর। ধমকেধামকেও যখন আর সামলানো যাচ্ছে না ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দজ্জালগুলোকে, ওদের চিৎকার আর ঝকমক বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে, নিচে একতলায় দামাল বিক্রমে ঘেউ ঘেউ চেঁচিয়ে যাচ্ছে টাইগার। বাঘের গর্জন জানা নেই। কিন্তু হাইব্রিড ডোবারম্যানের তেজী তর্জন-গর্জন এই বৃষ্টিবাদলার দিনেও তিনতলা বাড়ির স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কাঁপিয়ে তোলপাড়ে অস্থির করে তোলার পর দিশেহারা কিরণময়ী। তাঁকে দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটে যেতে হয়। সিঁড়ি ভেঙে তরতরিয়ে নামতে থাকেন। গৃহকর্তা নিশীথরঞ্জন প্রতিদিন তাঁর অভ্যাসের মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে টাইগারকে পার্কে ছেড়ে দিয়ে নিজে হাঁটেন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তাঁর অনুপস্থিতিতে, আজ, নিশ্চিতই বৃষ্টির উৎপাতে ওকে নিয়ে পার্কে যেতে পারেনি নন্দলাল। সুতরাং

বিচলিতবোধে ভাবতেই হয় তাঁকে—এক্ষুনি ওকে বাইরে কোথাও ঘুরিয়ে আনতে না পারলে শেষে হয়তো কোনো ঘরে বা বারান্দায় বা সিঁড়ির ওপর নোংরা করে দিতে পারে দস্যিটা। যত মূল্যবান বা যত আদরেরই হোক, আসলে জানোয়ার। যে-করেই হোক, ওকে বাইরে নিয়ে যেতেই হবে একবার। একটির জায়গায় দু'টো ছাতা নিক নন্দলাল, রিকশ ভাড়া করুক, ওকে টয়লেট করিয়ে আনতেই হবে পার্ক থেকে। রাজরাজেশ্বরীর দাপটে এবং আগ্নেয় ক্রোধে নামছিলেন কিরণময়ী। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপেই হড়কে যাবার ভয়। কিছুটা ওপর থেকেই হাঁকলেন চড়া গলায়—'নন্দ....'

বেচারি নন্দলাল। দ্বারোয়ান বা বাজার সরকার—নিজের পদাধিকার সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অচেতন সেই ব্যক্তি। সদরের কলাপসিবল গেট আগলে একতলাতেই দিনরাতের ডিউটিতে থাকার কথা তার। গ্যারেজ ঘরের মাথায় একতলা-দোতলার মাঝামাঝি মেজানিন ফ্লোরে পাকাপাকি বসবাসের বন্দোবস্ত। বউছেলেনাতিনাতনি নিয়ে সংসারও আছে নদীয়া জেলার চাকদহের কাছে কোন এক গ্রামে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেরাও নাকি এদিক-ওদিক করে রোজগারপাতি চালাচ্ছে মোটামুটি। লোকটা পড়ে আছে এখানেই। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। কাজেকম্মেও আর চলে না আগের মতো। সর্দিকাশি শ্লেষ্মাপিত্তি আমাশা হাজারগণ্ডা ব্যামো নিয়ে ঘাড়ের ওপর চেপে থাকলেও, অনেক দিনের পুরনো লোক, বিশ্বস্ত আর ঠাণ্ডা গোছের মানুষ। ওভাবে তো ছাড়িয়ে দেওয়াও যায় না চট করে। অথচ চাকরিই যখন, সময়মত কাজও তো চাই কিছু। সুতরাং গৃহকর্ত্রী কিছু চাইতেই পারেন এমন দুর্যোগের দিনে। হকের পাওনা তাঁর।

এবং নন্দলাল, চারপাশের দেশদুনিয়াই যখন ভেসে যাচ্ছে আকাশভাঙা তুমুল জলের তোড়ে, প্রলয়কাণ্ডের কেন্দ্রে হাত-পা গুটিয়ে রেখে, স্বস্তি ছিল না লোকটার। ওই শালা আরেক বিপদ—এ-বাড়ির ভীষণদর্শন বাঘা জানোয়ারটা....ব্যাটা বামুনও নয়, শূদ্দুরও নয়, এমন কি, দু'টো পা দু'টো হাতের মানুষ না হয়েও মনিবের চাকর বা চাকরদের মনিব গোছের আস্ত শয়তানের বাচ্চা, একটা জন্তু, ওপাশে একটানা ডেকেই যাচ্ছে সকাল থেকে। সবাই কুকুর বলেই মানে বটে, তবে নন্দলালের নিজস্ব ধারণা —ও-ব্যাটা কুকুরও নয় ঠিক-ঠিক। কুকুরের মতোই দেখতে নেকড়ে বা হায়নার আদলে একটা জানোয়ার বনেজঙ্গলে ঘুরছিল কোথায়, ধরেবেঁধে নিয়ে এসেছে পয়সার জোরে। নইলে এমন বাজখাঁই হালুমমারা তর্জন-গর্জন হয় কোনো কুত্তার? প্রতিটি লাফে তেড়েফুঁড়ে এসে এমন খেঁকিয়ে উঠবে দস্যিটা, অনেক কালের চেনাজানা হলেও নন্দলাল আজও প্রতিটি মুহূর্তে ওর শেকল ধরতে ভয় পায়। অথচ তারই ওপর নতুন কাজের ভার—সাহেব যতদিন ঘরে না ফিরছেন, প্রতিদিন সকালে ওকে রাস্তায়-পার্কে ঘুরিয়ে আনতে হবে ঘণ্টাখানেক। সুতরাং কাল রাত্তির থেকেই অফুরান জলের দাপটে বড্ড খুশি ছিল সে। সাতসকালেই শয়তানটাকে বাড়ির পেছনে ওর নির্দিষ্ট জায়গায় শেকলে বেঁধে রেখে, এপাশে সিঁড়ির তলায় একটা খাটিয়ায় জবুথবু বসে থেকে পরম সুখে হাতে হাতে খৈনি টিপছিল। বিদ্যেটা সে নতুন শিখেছে বাবুদের নয়া ড্রাইভার বৈজনাথ মিশিরের তালিমে। ওদিকে বাঘা খেপে উঠছে। যত ওর রাগ বাড়ছে হিংস্র হচ্ছে, গলার জোরে চিৎকারে চিৎকারে মস্ত তিনতলা বাড়ির ঘরদোর জানালা-দরজা কাঁপছে

থরথর। মেঘের ডাক বা অঝোর বৃষ্টি সব নস্যাৎ। অকস্মাৎ ওপর থেকে মা-ঠাকরুণের গলার স্বরে নিজের নাম শ্রবণে এবং শ্রবণমাত্রই নন্দলাল ঝলকে উঠল। ঠিক কী যে হয় এ-সময়টায়, মাথা থেকে তলাব দিকে তরতরিয়ে গড়িয়ে নামা একটা রক্তের ঝাঁকুনি এবং পা থেকে মগজের দিকে দিকে চাগিযে ওঠা আরো এক উর্ধ্বচাপ এক লহমায ছিটকে গিয়ে ধাক্কা মাবে বুকের ঠিক মাঝখানে কলজেটার ওপর—আপডাউন বেলগাড়ি মুখোমুখি ঠোক্কর খেলে ঠিক যেমনটি হয়। গোছগাছে নিজেকে আর স্থির বাখতে পারে না এই বুড়ো বয়সে। তখন হাতে হাতে পাকিয়ে তোলা চুন-খৈনির দলা ঠোঁট টেনে দাঁতের তলায গর্তে ফেলাবও সময় থাকে না। খাটিয়ার নিচে এক পাটি চপ্পল খুঁজে পাওয়া গেলেও আরেক পাটির জন্য অনর্থক হুটপাট না কবে এক পায়েই চটি গলিযে, অথবা এক পাটিও খুলে ফেলে দু'টো পা-ই উদোল নিযে তড়িঘড়ি ছুটে যায সিঁড়িব দিকে, যেখানে দাঁড়ালে অবতবণগতি মাযেব চরণযুগল মাথাব উর্ধ্বেই থেকে যায স্কেল-ফিতের মাপজোকে। প্রাতঃপ্রণামে বিনত হবারও কানুন জানা আছে তাব—'কিছু বলছেন গ মা? ডাকছেন আমাকে?'

'ডাকছি? ডাকছি মানে? কে ডাকছে শুনছ না তুমি? নাকি কানের মাথা খেযে বসে আছ বুড়ো বয়সে?' সংসারের প্রতিপালিকা দেবী কিরণময়ী সঙ্গত কাবণেই কিছুটা আলাভোলা। তীব্র এবং তীক্ষ্ণ—'আরে, হাঁ কবে দেখছ কী? কবো একটা কিছু। ওভাবে চেঁচাতে থাকলে যে অসুখ কবে যাবে ওব। আব এক্ষুনি যদি ঘববাবান্দা নোংরা করে দেয? পরিষ্কার করবে কে? তুমি?'

একদিকে প্রবল সারমেয় বিক্রম, অন্যদিকে মনিব বা মানবী দাপট। মধ্যবর্তী অবস্থানে শীতার্ত নন্দলাল অসহায় বধির। মালিক ক্রুদ্ধ হলে দাস্যতায বিনম্র থাকাই সমীচীন। চার-দেয়ালের ভেতব আরো এক দুরন্ত ঝড়েব মুখোমুখি ফ্যালফ্যাল তাকিযে থাকে সে।

'এই দ্যাখো তুমি আবাব ব্রেকডাউন মেবে দাঁড়িযে বইলে কেন? য্যাও ট্যাক্সি ডাকো। নযতো রিকশ....'

'কেন গ মা? এই ঝড়বাদলার দিনে বেরুবেন গ কোথাও?'

'মাথাটাথা খারাপ নাকি তোমার? এমন দিনে বেরোয নাকি কেউ কোথাও? বৈজনাথ এখনও এল না। গাড়ি বেরুবে কিনা ঠিক নেই। কুকুরটাকে কোথাও তো একটু ঘুবিযে আনতে হবে।'

নন্দলাল হতবাক। এ-রকম একটা হুকুম যে আদৌ প্রস্তাবিত হতে পারে, তার কোনো হিসেবেব মধ্যে ছিল না বলেই হয়তো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, হেঁট হযে পিছু ফিবল সদর দবজার দিকে। হুকুমই যখন, কিছু একটা কবতেই হবে তাকে। এই আকাশভাঙা জলঝড়ের দিনে ট্যাকসি বেরুবে না বাস্তায়। নানান জাযগায থৈ থৈ কবছে কোমব অব্দি জল। যদি কোনো বকমে রিকশ পাকড়ানোও যায একটা, মানুষ ছেড়ে কুকুব তুলতে দর হাঁকবে দশগুণ পনেরোগুণ বেশি। সাহেবদের টাকা আছে। তার গা-গতরে আব সে-তাকত নেই। আব বুড়ো হাড়ে যতটা ভাঙা শরীর, তারও চেয়ে নডবড়ে ভাঙা ছাতাটা সে তুলে নেয় দেয়ালের ধার থেকে। কলাপসিবল দরজার

বাইরে মুষলধারা বৃষ্টির দিকে তাকাতে গলার শিবা চিরে কাশি বাড়ে। দলায় দলায় কফ উগরে উঠতে চায়। আকাশভাঙা জলের তোড় যত বাড়ছে, ওপাশে জানোয়ারটার চিল্লানিও চড়ছে পাল্লা দিয়ে। বাধ্য হয়েই কলাপসিবল দরজা টানতেই হয় তাকে। মুশকিল এই, খেঁকুড়ে কুত্তার বজ্জাতি প্রমাণ কবা কঠিন। মালিক মানবেন না।

একদা নামকরণ হয়েছিল—টাইগার। টাইগার যথার্থই কোনো টাইগার না হোক — অবশ্যই ব্যাঘ্রাধিক। এবং নিশ্চিতই কোনো 'ম্যান' নয়, জাতে ডোবারম্যান। এই প্রাসাদদুর্গে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক বলবান এবং হিংস্রতম পুং। এ-হেন দুর্ধর্ষকে শেকলে বেঁধে গৃহশোভায় বশীভূত রাখাব বিশেষ একটি অহঙ্কার আছে। প্রাচীন ভূস্বামী ক্ষেত্রে যেমন লাঠিয়াল, আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতায় সৈন্যবাহিনী, একইভাবে ধনসম্পদবিত্তেব প্রাচুর্যে একটি ডোবারম্যান ব্যক্তিগত বাহুবলেব প্রতীক। বলা বাহুল্য, এ-বাড়ির প্রভুজনদের সকলেই সেই দুলর্ভ বীরধর্মের উপাসক। সুতবাং অদ্যকাব এই ঘনঘোর বর্ষা, মুহুর্মুহু বিজলী-চমক তথা মেঘগর্জন ছাপিয়েও টাইগারের ব্যাকুল হুঙ্কারনিনাদ প্রিয়জনদের ঘরে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না কাউকেই। ওপব থেকে ছুটে এসেছে ছেলেমেয়েবা। মুনমুন, বুলবুলি এখনও ওদের নাইটি পাল্টাবার সুযোগ পায় নি। মাত্র একুশ বছব বযসেই মেদে মেদে অস্থির বাবন এমনিতেই কিঞ্চিৎ আলস্যবিলাসী এবং শ্লথ। বাথরুম ফেলে দাঁতের ব্রাশ গালে চেপে তাকেও হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসতে হয়েছে। দলা দলা শাদা ফেনা মুখগহ্বরে। ধবধবে শাদা গ্যাঁজলা উপচে উঠছে ঠোঁটের ওপরে-নিচে ডানে বাঁয়ে, গালে থুতনিতে, নাকের তলায়। তবু আধো আধো আঁউআঁউ সরোষ চিৎকারে কিছু বলার কথা তার।

সিঁড়ির এধার থেকে টাইগার দৃশ্যমান নয়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, লোহাব শিকল ছিঁড়ে পড়তে পারে এক্ষুনি। প্রবল বেগে ছুটে এসে হামলে পড়তে পারে। যদিও জানা আছে, বংশবদ চতুষ্পদ ঘাড় মটকাবে না কারুর। দু'টো পা সরাসরি বুকেব ওপব তুলে, ঘাড় উঁচিয়ে ড্রাম-পেটানোর গলায় চেঁচাবে। তখন ওই আগুনেব চোখজোড়া ভয়ঙ্কব। বুকের কাপড খাবলে ধরে লম্বা জিভ বাড়িয়ে প্রভুজনের থুতনিও ছুঁয়ে ফেলতে পারে। আদব চাইবে কিংবা দীর্ঘ অবহেলার কৈফিয়ত দাবি কববে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে।

এবং যখন সেদিকেই এগোচ্ছে বাবন, স্নেহময়ী মা আগলে দাঁড়ালেন—'না, তুই যাবি না। যাস নে ওর কাছে। ভীষণ রেগে আছে। একা সামলাতে পারবি তুই?'

পানেব পিকেব মতো মুখভর্তি টুথপেস্টের ফেনাকে সামলে নিযে কী বলতে চাইছিল বাবন, বুলবুলি এসে দাদার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—'হাউ সিলি...'

সফেন থুতু ফেলতেই বাবন ওপাশে ঝমঝম জলধারার দিকে এগোল। ঘববাড়ি নোংরা হবার ভাবনা নেই। যেখানে অঝোর বর্ষার জল, ধুয়ে-মুছে যাবে সব।

এবং কিরণময়ী, তাঁব চারপাশে অবোধ সন্তানাদি, বেয়াদপ দাসদাসী বা সর্বোপরি মানবেতর চতুষ্পদসহ অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক গণ্ডগোলে নিজেও এক অথৈ দুর্বিপাকে। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—'এই আমার হয়েছে যত জ্বালা। সাহেব ঘবে নেই তো মাথায় উঠেছে সবাই। বৈজু....বৈজু কেন ডিউটিতে এল না এখনও?'

সংসারের বড় মেয়ে মুনমুন, ভরাট উনিশের যুবতী, সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল

চুপচাপ। ভ্রূ কুঁচকোল—'হোয়াট ননসেন্স! কী বৃষ্টি হচ্ছে দেখছ না তুমি? এর মধ্যে আসতে পারে কেউ?'

'চোপ্। একদম কথা বলবি না তোরা। দেখছিস, মরছি হাজার যন্ত্রণায়। বৃষ্টি হচ্ছে তো কী হয়েছে? তাই বলে আপিস-কাচারি ডিউটিতে আসবে না লোকে? কাঁড়িকাঁড়ি টাকা তো মাইনে নিয়ে যাচ্ছে মাসে মাসে। তার ওপর আবার আজ এটা, কাল সেটা, হাজাব বায়নাক্কা তো লেগেই আছে বাবুদের....' প্রায় এক নিঃশ্বাসে, গাঢ় উত্তেজনায় কথাগুলি বলার ঝোঁকেই কিরণময়ী হঠাৎ সদর দরজার দিকে তাকিয়েই খেপে গেলেন আবো— 'ওই....ওই হযেছেন আরেকজন বাবু। গেলেন তো গেলেনই। বলি, একটা ট্যাক্সি ডাকতে কতক্ষণ লাগে?'

'ট্যাক্সি?' প্রায় একই সঙ্গে বুলবুলি আর বারন সবিস্ময়ে—'ট্যাক্সি কি হবে মা?'

'তোদের কুকুরটাকে বাথরুম করিয়ে আনবে।'

ঝলকে ঝলকে হেসে উঠল ছেলেমেয়েরা। এবং বাবন—'এখন ট্যাক্সি চেপে হাগতে যাবে টাইগার? ওফ্, জবাব নেই। ওযান্ডারফুল....'

হাগা! ভেবি আগলি ওয়র্ড। ইট ডিস্টার্বস লাইক এনিথিং। বুঝি যথার্থই কোনো ইতর দুর্গন্ধে নাকমুখ কুঁচকোল বুলবুলি, মুনমুন—'অ্যাই, অ্যাই দাদা! কী হচ্ছে তোর? কী বিচ্ছিরি আব নোংরা বে তুই?'

মাতৃদেবী ক্রোধে দিশেহারা—'থামবি তোরা? যাবি এখান থেকে? যা যা ওপরে গিয়ে নিজেদের কাজ কর। খুব মজা দেখছিস সবাই? সেই গোড়া থেকেই বলেছিলাম আমি, অত সাহেবিয়ানা দবকার নেই বাপু। ওসব কুকুরফুকুর ঢোকাসনি ঘবে। তোবা কেউ শুনলি না আমার কথা? ক'টা বছর ধরে নিত্যিদিন যে কী এক উৎপাত সইতে হচ্ছে আমাকে।'

হঠাৎ, একেবারেই অতর্কিতে, হয়তো কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণের সঙ্গেই তুলনা সম্ভব, প্রলয়ঙ্কর এক মেঘগর্জন ফেটে পড়ল আকাশে। বুঝি গোটা বাড়িটাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে মাথাব ওপর— এরকমই একটা আতঙ্কে দু'হাতে কান চেপে সকলেই থরথব কেঁপে উঠে ছিটকে পড়তেই ঠিক ঠিক বোঝা গেল না গৃহকর্ত্রীর শেষ বাক্যের প্রতিক্রিয়া। কেন না, তখনই সম্মুখবর্তী সদর দবজায় কোলাপসিবল গেটেব ওপাবে বাধা। গেটে তালা ছিল না, বন্ধ ছিল। নিজের হাতে টেনে ভেতরে ঢুকতে পারছিল না সে-মেযে। তার এক হাতে ছাতার হাতল, অন্য হাতে চারটে-চাবটে আটটা দুধের বোতলেব লোহাব স্ট্যান্ড, বগলে পাঁউরুটি। প্রতিদিনেব মতো আজও ভোরবেলা, যেমন ডিউটি তার, দূবের মিল্ক-ডিপোতে দুধ আনতে গিয়েছিল। এবং প্রত্যাবর্তনে একেবারেই ভিন্ন চেহারা। ছাতাটা 'লেডিজ' যদিও, স্প্রিংফ্রিংযের ফ্যাশন কিছুই নেই। সাবেকি মোটা কালো কাপড় আব বাঁশের বাঁট। মাথাটাই হয়তো কোনবকমে বাঁচানো গেছে কিছুটা। পাযেব গোড়ালি থেকে হাঁটু অব্দি শায়া-শাড়ি ভিজে ভিজে ভারি হয়ে লেপটে গেছে তলার দিকে। ব্লাউজে-আঁচলেও রেহাই নেই, সর্বাঙ্গে জল।

বাবন গিয়ে কোলাপসিবল দবজাটা টেনে দেবার পর রাধা ঢুকল ভেতবে। এবং

আরো এক বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন কিরণময়ী—'কি রে, দুধ কোথায় তোর? বোতলগুলো যে সব ফাঁকা। যাসনি দুধ আনতে?'

'দুধের গাড়ি আসে নি গ মা। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। কত কত লোক ফিরে যাচ্ছে।'

'অ্যাঁ! এই... এটুকুন রুটি দিয়ে কী হবে? একটা আক্কেল নেই তোর? এক পাউন্ড রুটিতে এ-বাড়িতে কুলোয় কোনোদিন? দেখছিস অ্যাদ্দিন ধবে।'

'জলে জলে চাদ্দিকে সমুদ্দুব গ মা। বাস চলচে নি। গাড়িফাড়ি কিছু নেই। হাটবাজার দোকানপাট সব বন্ধ...' হাঁপাচ্ছে বাধা। কিংবা স্যাঁতসেতে ভেজা ভেজা শাযা-ব্লাউজ-শাড়িতে বিচ্ছিরি অস্বস্তি বা ঘিনঘিনানি সাবা গায়ে। জড়োসড়ো ভঙ্গি—'ভি. আই. পি. বোডের মুখে একটা চায়ের দোকান ছিল। বললুম লোকটাকে। এমনিতে ত' দেবেনি। অনেক বলেকয়ে দেডা দাম দিযে নিযে এলুম, যেটুকুন পেলুম, তাই। সে-ও কী বেহাই আছে নিকি? কত যে বাবুবা ডেকে ডেকে শুধোয় রাস্তায়—কোথায় পেলি বে? কোন্ দোকানে? আমি আর বা কবিনি কাকুক্কে...'

'বেশ করেছিস।' হাত বাড়িয়ে রুটিটা নিলেন কিরণময়ী। খালি বোতলেব স্ট্যান্ড দু'টো বাখতে বললেন সিঁড়ির ধাপে। পববর্তী নির্দেশ—'হ্যাঁ, ভেজা শাড়ি ছাডাব আগে একবার যা দেখি ওদিকে। সেই সক্কাল থেকে কী যে ছাই বর্ষাবাদলাব দিন শুরু হয়েছে, এ তো থামবেও না দেখছি। তার ওপর তোদের ওই ঘরজ্বালানি উৎপাতটা... ঘরবাড়ি ফাটিয়ে সেই যে তখন থেকে চেঁচিযে যাচ্ছে, তো চেঁচিয়েই যাচ্ছে, আমার তো পোকা ফেলে দিলো মাথাব...'

গিন্নিমার চোখের ইশাবাই জানিযে দেয়, কোন্‌দিকে তাব যাবাব নির্দেশ। রাধা উথলে উঠল—'বাঘা গ মা? বাঘার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ বে, তোব সোহাগেব পুষ্যি। দ্যাখ দেখি মা, কী হলো ওর।'

বাইরের জগতের অবিশ্রাম জলধারার কিছুমাত্র বিরাম নেই। কী জানি কেন, এ-ও বুঝি কোনো প্রাকৃতিক বিধান, কুকুরটা থেমে গিয়েছিল।

যে-চিৎকাব শোনে নি রাধা, খামোকা কেন বাঘার নামে বদনাম, না-বুঝেই শাযা-শাড়িব ছপছপ টেনে টেনে সে সেদিকেই ছুটল।

বাড়িব একতলায় সৌধকৌলীন্যেব আডাল ঢেকে পেছনের দিকে অন্ত্যজদেব জন্য একটি এলাকা আছে আলাদা। ঝি-চাকবদের জন্য পায়খানা, খোলামেলা চৌবাচ্চায স্নানের জল, বাসন মাজার ব্যবস্থা। পাশেই একটা কুঠরি। মেয়েরা কাপড় ছাডতে পাবে। একদিকে বড একটা ড্রামে সারাদিনের আবর্জনাব পাহাড়। ভোরবেলা মেথব আসে। আজ আসে নি। সুতরাং স্থানটি গৃহিণীর কাছে আবো একটি দুর্গতির হেতু অবশ্যই। এবং সেখানেই অন্য প্রান্তে, পাশাপাশি দু'টো ঘর। একটিতে ভাঙা চেয়ার-টেবিল লোহালক্কড়, বাবুদের শখ ফুরিয়ে যাওয়া আস্ত বা বাতিল হবেক শৌখিন সামগ্রীর ভাঁডার। ঘরটা শক্ত তালায় বন্ধই থাকে বারোমাস। তারই পাশে, বেতনভুক নয় বলেই হয়তো অন্যদের চেয়ে কিছুটা অধিক আরামের স্বতন্ত্র কক্ষ আছে একটি। রাধা বলে গোয়ালঘর। কেন বলে, স্পষ্ট কোনো হিসেব নেই। একটি নিরক্ষর গেঁয়ো মেয়ের আবোলতাবোলকে খুব একটা

আমল দেবার কারণ নেই এ-বাড়ির বিপুল কর্মযজ্ঞে। বরং কিছুটা লাভ। বছর পাঁচেক আগে সংসারের একমাত্র বংশপ্রদীপ বাবনের আবদারে অথবা তার ষোড়শ জন্মদিনের উপহার হিসেবে যখন বৃহৎ অর্থমূল্যে একটি শিশু ডোবারম্যান এসে যুক্ত হলো এ-প্রাসাদের ঐশ্বর্য তালিকায়, রাধা নিজেও তখন কিঞ্চিদধিক বালিকা। অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন পুষ্যির যাবতীয় যত্নআত্তি বা দেখভালের যাবতীয় দায়িত্বই পড়ল তার ওপর। প্রতিপালনের বিবিধ প্রণালী শেখানো হলো তাকে—আলাদা সাবান, আলাদা পাউডার। স্নানের রীতি, আদবের কানুন, খাদ্যতালিকা, আহারের সময়নির্ঘণ্ট, মাংসের রন্ধন প্রক্রিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই এতাবতকাল নিয়মিতভাবে করে এসেছে সে। অসুখবিসুখ হলে ডাক্তার বা ওষুধপত্রেব খরচাপাতি ওদের। যত্নআত্তি সেবাশুশ্রূষা রাধাব। বাঘার সঙ্গে খেলবে ওরা। কাঁদবে রাধা—যদি বাঘা কষ্ট পায়।

ববং একটি গোপন সংবাদ—চতুষ্পদ এই আদুরে দুলালকে কোনোদিনই খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি কিবণময়ী। একমাত্র ছেলের জন্য উপহার হিসেবে জন্তুটা যেদিন প্রথম এল, দুধ আর বিস্কুট খেত, কোলে তুলে খেলত সবাই, তখন থেকেই কি রকম একটা গা-ঘিনঘিনানিতে ওকে মেনে নিতে পারেন নি পুরোপুরি। ভাগ্যিস রাধা ছিল। ওকেই জুড়ে দিয়েছিলেন কুকুরটাব সঙ্গে। তাবপর যতই দিন কেটে যেতে থাকে, বছর ফুরোয—হায়না-নেকড়ের আদলে ভয়ঙ্কব হতে হতে যখন যথার্থই এক হিংস্র শ্বাপদ —গোটা বাড়ি তোলপাড় করে ওর বীভৎস দাপাদাপি আর আসুরিক গর্জনে স্বামী-পুত্রের যতই পরাক্রম বৃদ্ধি পাক অথবা খেলাচ্ছলে ওদেব ঘরে বিছানায যতই নৃত্য করুক, তিনি তাঁর নিজের গৃহে কখনই প্রবেশ দেন নি উৎপাতটাকে। ঘরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের ছবি আছে —একটা অজুহাত মাত্র। আসলে বদখত জানোয়ারটা এই সংসারের একমাত্র প্রাণী, যেখানে তাঁর প্রভুত্ব নেই। টাইগাব বা বাঘা নয়। তিনি বাংলামতে আজও ওকে কুকুর বলেই মানেন।

সুতবাং আজ এই বিদঘুটে ঝডবাদলের দিনে সংসাবের একমাত্র তেজস্বীকে একবাব দেখে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। বাবন কখন মুখ ধুতে ওপরে চলে গেছে। মুনমুন আর বুলবুলিকে সঙ্গে নিযে রাধার পিছু পিছু পা টিপে এলেন অকুস্থলে, এবং পৌঁছতেই, সে এক ভয়াবহ কাণ্ড।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি বাইরে। এত বেশি জলের তোড় এবং বেকুবের মতো ওকে যেখানে যেভাবে বেঁধে রেখে গেছে নন্দলাল, জলেব ছাঁটে ভিজে গেছে মেঝের চারপাশ। ব্যতিব্যস্ত বেচারি পিছোতে পিছোতে দেয়ালে ঠেসে গিয়েও যখন আর বেহাই নেই, চেঁচাতে চেঁচাতে ক্লান্ত হযে, নেহাত-ই জানোয়ার.... অভিমান জানে না। জংলী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কুঁকড়োতে কুঁকড়োতে একেবাবে দেযাল ঘেঁষে দু'টো পা সামনে ছড়িয়ে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল চুপচাপ। এবং হঠাৎ, মানুষের ঘ্রাণে বা চেনা-মানুষের আকস্মিক প্রবেশে, নিশ্চিতই ব্যাঘ্রহুঙ্কাব, পলকে লাফিয়ে উঠে যেভাবে তেড়ে এল, টানটান লোহার শিকলটা ছিঁড়ে যেতেই পারত। কিন্তু ছিঁড়ল না। অথবা শেকলটা ওকে টেনে ধরে রাখল বলেই বেহাই কিছুটা। এক ঝলক শিউরে উঠে যেভাবে লাফ মেরে পিছিয়ে এসে মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কিরণময়ী, আবো একটা অঘটন ঘটে যেতেই পারত। কিন্তু

ঘটল না। ঠিক সময়ে দুই মেয়ে মাকে জাপটে ধরে ঝলমলিয়ে হাসছে দু'দিক থেকে —'এত দিন ধরে দেখছ, তুমি এখনও ওকে এত ভয় পাও মা? হাউ স্ট্রেঞ্জ....'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েও বুকের কাঁপুনি থামে না কিরণময়ীর। বিষ-পোড়ানি একটা রাগ সর্বাঙ্গে জ্বলে। ক্রোধের অব্যবহিত হেতু যে কোন্‌টা—মেয়েদের হাসি, কুকুরটার বেয়াদপি অথবা ভোর থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, কিছুই নির্দিষ্ট নয় যেহেতু, আপাতত তাঁর আগ্নেয় চোখজোড়া স্থির নিবদ্ধ থাকে কুকুরটারই ওপর—'দূর করব, সর্বনেশে শয়তানটাকে আমি দূর করব ঘর থেকে। বিষ খাইয়েই মেরে ফেলব একদিন। এই আমি বলে দিলাম। কবে যে কী একটা ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে যাবে বাড়ির ভেতর....'

মেয়েরা একইভাবে হাসে—'উড ইউ কিল হিম? ইট ইজ ডোবারম্যান...ডোবারম্যান মা। তুমি ভয় পাবে কী? সবাই তোমাকে ভয় করবে বলেই তো হি বিহেভস লাইক টাইগার....

'চোপ্, একদম চোপ। বলছি, আজেবাজে কথা বলবি না তোরা। যা বলবি, বাংলায় বল্...' ক্রোধে দিশেহারা কিরণময়ী এবার খেপে গেলেন নিজেরই সন্তানদের ওপর —'এতই যদি মেমসাহেবি ঢং তোদের, যা না, যা...নিজের গিয়ে সামলা না তোদের সোহাগের পুষ্যিকে...'

'হাউ ফানি: সে-আমরা কী করব? উই ক্যান নট স্টপ শাওয়ার। সে-তোমার নন্দলালকে বলো। কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে লোকটার? এভাবে বেঁধে রেখে গেছে? বুড়োও কি রাধার মতো গরু-বাছুর ভেবেছে নাকি ওকে? ডোবারম্যান। রিয়েলি এ টাইগার অ্যামং দ্য ডগস। কেন, ছেড়ে রাখলেই পারত। ওপরে চলে যেত। ঘরে গিয়ে কোথাও থাকত চুপচাপ...'

কী সর্বনাশ। সত্যি সত্যি পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল বুলবুলি। কিরণময়ী মেয়েকে খাবলে ধরলেন—'যাচ্ছিস কোথায় তুই? বলছি যে ওর কাছে এখন এগোবি না তোরা কেউ। কোথায় আঁচড়টাচড় লেগে যাবে...'

তাঁর ভরসা ছিল সম্মুখবর্তী বাধা। এবং বাধা, আরো এক অষ্টাদশী যুবতী, কোনো সার্কাসের মেয়ে নয়। গৃহপোষ্য মানবীই যেহেতু, সে-ই চেনে অন্য এক গৃহপালিতকে। তাকেই এগোতে হয়। ভয় নেই ভয়ঙ্করকে। ভ্রূক্ষেপই নেই। হাসতে হাসতেই সে পৌঁছে যায় ভয়ালদর্শন জন্তুটার ক্রোধের নাগালে। এবং মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে-ওঠা দুটো তীক্ষ্ণ নখের থাবা সুকোমল বক্ষযুগল খামচে ধরতেই সেই মেয়ে, হয়তো শাড়িটা ছিঁড়ল একটু, কোনো হুঁশ নেই, হাত বাড়িয়ে ধরল চতুষ্পদের উদ্যত দুটো পা, যখন দীর্ঘদেহী বলবান জানোয়ার ওর পেছনের দিকের দু'টো পায়ে মাটিতে ভর রেখে, সম্মুখবর্তী দু'টো পা, অবিকল মানুষের হাতের প্রসারণ যেমন, উর্ধ্বে তুলে দাঁড়াতেই ওর চার ফুট লম্বা শরীরটা যুবতীর কাঁধ ছুঁয়ে মাথায় মাথায় প্রায় সমতায় চলে আসে। ভয়াল চাউনি, ধারাল দাঁত আর লম্বা জিভের হিংস্রতা যতই ভয়ঙ্কর হোক অথবা মেঘবৃষ্টিঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বনি ছাপিয়ে দামাল চিৎকার যত বড় মহাপ্রলয—বুঝি সেই মেয়েই জানে জংলী ক্রোধকে বশীকরণের যাদু—নিজের বুক থেকে ওর সম্মুখবর্তী দু'টো পা হাতে তুলে নিয়ে, এভাবে সোজা শিবদাঁড়ায় দাঁড় করালে যেখানে চতুষ্পদের পা-ও দু'টো

হাত হয়ে যেতে পারে, সেই হাতে হাত মিলিয়ে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' খেলতে খেলতে, বহুবিধ অর্থহীন অব্যয়োচ্চারণে হাসতে হাসতে স্নেহে-আদরে পিঠ চাপড়ে চতুষ্পদকে দাঁড় করিয়ে দিলো তার স্বাভাবিক চার পায়ে এবং লতপত লতপত ভেজা কাপড়ে হাঁটু ভেঙে বসে সোহাগে সোহাগে জাপটে ধরল ভয়ঙ্করকে, এবং বসে পড়ার পর যখন চার পায়ের জানোয়ারই দু-পায়ের যুবতীরও মাথা ছাপিয়ে উচ্চতায় দীর্ঘতর, অকুতোভয় সেই মেয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে নিতেই তাব দু'টো হাত পৌঁছে যায় ছাই রঙের রোমশ শরীরের প্রলম্বিত শিরদাঁড়ায়।বাঁ হাতটা স্থির থাকে। ডান হাত আদর বুলোয়। প্রবল পশুশক্তি লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলতে পাবে এক্ষুনি, কিংবা এসব আদব-সোহাগে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে কামড়ে দিতে পারে যুবতীরই হাত অথবা যখন ওব সবোষ ঘেউ ঘেউ প্রবোধ মানছে না কিছুতেই, বুঝি প্রয়োজন ছিল —'থাম, থাম তো তুই...'

সজোরে একটা থাপ্পড় মেরে দেবার দুর্জয় সাহস কত অনায়াস হতে পারে! হয়তো বা এই শাসনটুকুই অত্যন্ত জরুরি ছিল। পরাক্রান্ত বাঘা কিছুটা শান্ত হয়ে দাঁড়াবাব পর বাধা নামেব সেই যুবতী মেঝেতে আবো বেশি লেপটে বসে নিজেব গালের সঙ্গে বাঘাব গাল মেলাল। নিজের কানে গালে ওর ঝুলে-থাকা কানের লতি, ওর গলার শেকল, ওব মসৃণ লোমেব শিবশিব। জলে জলে ভেজা গৃহপালিত এবং গৃহপোষ্য দু'জনই এক সখ্যে আশ্লেষে একীভূত হয়ে যাবাব পব, নিশ্চিত জানোয়ার বলেই হয়তো এতটা নেমকহারাম—যুবতীর কাঁধেব ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে একই ভঙ্গিতে বিরতিহীন কর্কশ চিৎকারে শাসাতে থাকে ভাত-শেকলেব মালিকদেরই। ভয়াবহ শ্বাপদদর্শন, যার রক্তচক্ষু বা বেযাদপিব কোনো কিছুতেই খুব একটা ভবসা পাচ্ছিলেন না কিরণময়ী।

কন্যাবা নির্ভয়—'হাউ টেরিফিক ইট লুকস! আওয়াব টাইগার!'

'ডোবারম্যান ইজ এ ওযনম্যান ডগ। হি নোজ হিজ ওম্যান।'

দু-বোনই যখন তাদেব সহাস্য কৌতুকে উচ্ছল, আবো একবাব ঝামটে উঠতে চেয়েছিলেন কিরণময়ী। সামনেই আবাব এক ভূতের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন —'এ কী। এ-কী দশা হয়েছে তোমার? ছাতা নাওনি সঙ্গে?'

'বাইরে কী যে জল হচ্ছে গ মা। একটা ছাতায কী আর আটকানো যায়। এগোনোই যাচ্ছে না বাস্তায়...'

একটা ছাতা অবশ্যই সঙ্গে ছিল। কিন্তু অল্পবিস্তব সর্বাঙ্গেই ভিজেছে নন্দলাল। বিশেষত হাঁটু অব্দি টানা ধুতি এবং নিম্নাঙ্গেব পুবোটাই ভিজে ন্যাতান্যাতা। পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ় মানুষ। খাটো একটা গামছা কাঁধে। উদোল গায়ে ঠান্ডা কাঁপুনিও হয়তো কিছুটা।

কিবণময়ী সন্ত্রস্ত হলেন—'যাও বাপু, তুমি যাও। পা-দুটো কলতলায় ভালো করে ধুয়ে এসো আগে। কী কাদাকাদা নিয়ে এসেছ বলো দেখি। ঘরদোব তো তোমরাই নষ্ট কবে দেবে সব। খবদ্দার, পা না ধুয়ে ওপরে যাবে না তুমি। আর হ্যাঁ, যার জন্যে গিয়েছিলে, তার কী হলো? রিকশ ট্যাকসি...'

'সে-ত কিছু পেলুম নি গ মা। কিছু পাওয়া যাচ্ছে নি রাস্তায়...'

'হ্যাঁ, সে-শুধু তোমারই পাও না। বৃষ্টি হচ্ছে বলে ঘরেই বসে আছে সবাই। কেউ

আর যাওয়া-আসা করছে না কোথাও...' বাঁদিকে এক ঝলক তিক্ততা ঝেড়ে ফেলে কিরণময়ী সোজা হয়ে তাকালেন—'কী রে রাধু, এবার তোব পুষ্যিব কী হবে? রিক্‌শ ট্যাক্সি কিছুই যে আনতে পারল না।'

বাঘাব গলা থেকে শেকল খুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাধা— 'কেনে গ মা, কোথায যাবে বাঘা?'

'ওর তো বাইরে বেড়াতে যাওযা হলো না আজ।'

'সে হয়নি ত কী হবে। এমনধারা আগেও ত যায়নি কতদিন...' বাধা তাব পুষ্যিকে ধবে থাকে। মাথা নুযে বক্রচক্ষুব উর্ধ্বে ঘাড়ে শিবদাঁড়ায চুমু খায়—'আপনাবা ওপবে যান না কেনে গ মা। ভাববেননি। একদিন বাইরে না গেলে কিছু হবেনি ওব। বড ভালো আমাদের বাঘা। কোন ক্ষেতি করবে নি কারুর...'

যথাস্থান থেকেই যদি নিশ্চিত আশ্বাস, বৃথা সাবমেয-বিলাপে সময়েব অপচয নিবর্থক মাত্র। মেয়েরা রইল। রাধাকে নিযে বাঘাব সঙ্গে ওদেব খেলা। কিবণময়ী তাঁব সংসাবেব দিকে ফিবলেন। কেন না বৃষ্টি। চাবপাশ ঝাঁপিযে অঝোব জলধাবায লণ্ডভণ্ড চাবদিক। এত বড বাড়ি ঘব বারান্দা সিঁড়ি ভাসিয়ে যেভাবে তছনছ হযে যাচ্ছে সব, একচ্ছত্র গৃহকর্ত্রী হিসেবে তাঁর ভাবনা বাড়ে, কাজ বাড়ে, ছুটোছুটি বেড়ে যায। তবতবিয়ে সিঁড়ি ভেঙে তাঁকে অতি দ্রুত ওপবে উঠে আসতে হয। মেঘলা দিনেব কালোয কালোয ঘববাড়ির ভেতরও সাতসকালে আবছা অন্ধকাব। কেমন সন্ধে-সন্ধে।

শুধু তো ঘরবাড়ি নয, অবিশ্রান্ত জলে জলে গোটা কলকাতা শহবটাই হঠাৎ ছন্নছাড়া। দুধ আসে নি, জমাদাব আসে নি, বাসন মাজাব ঠিকে-ঝি ববিব মা আসে নি, গাডিব ক্লিনাব মন্মথ আসে নি, ড্রাইভাব বৈজনাথ এখনও এল না, খববেব-কাগজ দিযে যায নি, বাজাবে পাঠানো যাচ্ছে না কাউকে, ছেলেমেযেবা স্কুল-কলেজে বেরুতে পাববে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সর্বত্রই অঘোষিত হবতাল। অথবা নিত্যদিনেব অতি পরিচিত বিশাল শহর কলকাতা অচেনা পৃথিবীব মতোই এক অজ্ঞাত ভূগোল। কোথাও আব যাবার বাস্তা থাকে না এমন দিনে। এতবড শহরেব কোথায সমুদ্দুব, কোথায কতটুকু ডাঙা? যেখানে প্লাবন, কত গভীর বা অগভীর, কত সেন্টিমিটাব জল সেখানে? অথবা স্থলভাগে কোন্ কোন্ বাস্তায গাড়ি চলছে বা চলছে না কিংবা কোন্ মুলুকে ট্রাফিক জ্যামের জঙ্গল—যেহেতু কিছুরই হদিশ জানা নেই, সুবিশাল গোলকধাঁধায সবচেযে বড ঝঞ্ঝাট তো তাঁদেবই, যাঁদেব নিজস্ব গাডি থাকে। গ্যারেজে পড়ে পড়ে খামোখা ঘুমোয গাড়িটা।

তবু ভালো, সংসাবেব সর্বময কর্তা শ্রীনিশীথবঞ্জন চট্টোপাধ্যায মশাই, মস্ত এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মেব একচ্ছত্র সম্রাট, তাঁব কর্মোপলক্ষে এখন দিল্লীতে। গাড়ি না বেরুলেও তেমন বড়সড ক্ষতি নেই কারুব। কালও সন্ধেবেলা একবাব ট্রাঙ্ককল এসেছিল— এখনও চল্লিশ-বিয়াল্লিশ সেলসিযাস চলছে বাজধানীতে। বৃষ্টি নেই। লু বইছে সারা দুপুর। তিষ্ঠানো যাচ্ছে না। ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে চামড়ায। তবে ভাবনাব কিছু নেই। পবিচিত এম. পি.-র বাজকীয কোয়ার্টার ছেড়ে বেশ ভালো একটা হোটেলে উঠে এসেছেন দু'দিন আগে। এযাব-কন্ডিশনড তো বটেই, সব কিছুবই সুন্দর ব্যবস্থা।

সিডিউল প্রোগ্রাম অনুযায়ী ফিরতে ফিরতে আরো দিন তিনেক বাকি। যেদিন ফিরবেন, মর্নিং ফ্লাইটেই আসবেন। সে-রকমই কথা আছে ট্রাভেলিং এজেন্টের সঙ্গে। গাড়ি পাঠাতে হবে এয়ারপোর্টে। সঙ্গে আরো দু'জন ভদ্রলোক থাকবেন। দু'জনই ভিন রাজ্যের। একজন এখানকার, অর্থাৎ দিল্লীর খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এম. পি.....

বড় রাজধানী আর ছোট রাজধানী—হাজার দেড়েক কিলোমিটারের ফারাকে আবহাওয়ার যদি এতই দুস্তর ব্যবধান, সুদূর প্রবাসবাসে স্বামীর চামড়ায় ফোস্কা আর বৃষ্টিবাদলা দুর্যোগের দিনে তাঁর নিজের ঘরে প্লাবন—কিরণময়ী তাঁর নিজের সংসারে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড়ই নাজেহাল। রাষ্ট্রশাসনে যা হয়—নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ সফরের শূন্যতায় উপনেতার খবরদারিই যদি আইন মোতাবেক বিধি, সেখানেও কিরণময়ীর মাতৃশাসন গভীরভাবে সঙ্কটজনক। সন্তানরা নেহাত-ই কচিকাঁচা খোকাখুকু নয় কেউ। একমাত্র ছেলে বাবন বা জ্যেষ্ঠা কন্যা মুনমুন—দু'জনই কলেজে পড়ে। ছোট মেয়ে বুলবুলি এ-বছরই আই. সি. এস. ই. ফাইনাল দেবে। আজ স্কুল-কলেজ যেতে পারছে না কেউ। টিভি চলবে না বিকেলের আগে। ঘরের ভেতর বন্দী থেকে ভি. সি. আর. চালাবে, নয়তো টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেটের পর ক্যাসেটে গানের হুল্লোড় বইয়ে দেবে গোটা দুপুর। তাঁকে পাগল হয়ে যেতে হবে নির্ঘাত। কিংবা সন্তানদের শাসন না মানার অবাধ্যতায় মনে মনে প্রচ্ছন্ন একটা ভালো-লাগাও সঙ্গোপনে ক্রিয়াশীল থেকে যায় কোথাও। এমন বেসামাল দিনে, ছেলেমানুষির বয়সে, একটু আমোদ-ফুর্তি তো থাকবেই ওদের।

অথচ বৃষ্টি। ভোর থেকে একটানা। মাঝে মাঝেই মেঘের গর্জন। থরথর কাঁপছে চারদিক। কাঁপছে তাঁর নিজের হাড়পাঁজর। দোতলা, তিনতলায় এতগুলো ঘর। ছাদে, সিঁড়িতে, বারান্দায় সরাসরি জলে বা তেরচা জলের ঝাপটায় যেভাবে ভিজে যাচ্ছে সব, পা ফেলা যাচ্ছে না কোথাও। ঘরে ঘরে বন্ধ করে দিতে হয়েছে জানালার শার্সিগুলি। ঘোলাটে জলের রঙে ঘরের আলো। বিছানাপাটি আলুথালু পড়ে আছে। তোলা হয় নি এখনও। গত রাতের বাসি শাড়ি শায়া-ব্লাউজ-ম্যাকসি-গেঞ্জি-জাঙিয়া-পায়জামা, ডাঁই হয়ে পড়ে আছে কলতলায়। রবির মা আসে নি। রাধাই বুঝি ধোয়াধুয়ি করেছিল কাল সন্ধেবেলা। ওদিকের বারান্দায় প্লাস্টিকের দড়িতে শাড়িগুলি ঝুলিয়ে দেবার পর ভেজা কাপড় ভিজতেই থাকে। মেঘলা আকাশের রঙকেও আড়াল করে বারান্দার ওপাশটায় আরো ঘন ছায়া। কী যে এক অলক্ষুণে বর্ষা নামল আচমকা, হাঁকডাক ছুটোছুটিতেই দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সকালটা। কোনো দিকেই আর হদিশ পাচ্ছেন না কিরণময়ী। নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। দেয়ালঘড়ির কাঁটায় সাতটা কুড়ি। কী সর্বনাশ! ছেলেমেয়েদের জলখাবারের ব্যবস্থা হলো না এখনও। স্নান সেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে পুজোয় বসার ফুরসতটুকু পর্যন্ত পেলেন না এত বেলা অব্দি। এবং পুজোর কথা মনে হতেই, কি হলো, নিজের ঘর গোছাতে বিছানায় হাত দিয়েছিলেন মাত্র, স্থগিত রাখলেন। বেরিয়ে এলেন বাইরে। রান্নাঘরে যাবার দরকার ছিল। নড়বড়ে বুড়ি গোপালের-মা একা একা কী করছে ওখানে, কে জানে! অথচ দুপুরের রান্নাবান্নার কী হবে, নিদেন সকালের জলখাবার—এখনও কিছুই বলা হয় নি কাউকে। আসলে রাধা ওপরে উঠে না এলে

তিনিও আশান পাচ্ছেন না কোথাও। ঝি-চাকরদেবই কারুর একটা ছাতা জল ঝরাব জন্য খুলে রাখা ছিল দরজাব পাশে মেঝেতে। ঝাঁ কবে তুলে নিয়েই সিঁড়ির দিকে ছুটে গিয়ে তাঁর উর্ধ্বযাত্রা শুরু। বয়স বাড়ছে। শবীব ভাবি হয়ে উঠছে। চড়াইয়েব সিঁড়ি ভাঙতে দু'টো হাঁটু আর কোমবেব হাড়মাসে টনটনানি ধবে। হাঁপিয়ে উঠলেন। কিন্তু বিশ্রাম অসম্ভব। তিনতলাব ঠাকুবঘব মানেই ডান দিকে লম্বা ছাদ। পুবো ছাদটাই ভেসে যাচ্ছে জলে। ছাদ—বড় সাধেব স্বর্গ তাঁব।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে পূব দিকে পাশাপাশি তিনটে বড় ঘব। একটিতে বাবন থাকে। বাকি দু'টোও বাবনেবই। কখনও কখনও মুনমুন বা বুলবুলিবও। তিন সন্তানেব জন্য এক ডজন অধ্যাপক ঘুবেফিবে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধেবেলা। তাঁদেব জন্য আলাদা ঘবদুটোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাখতেই হয়। আত্মীয়কুটুম কিংবা অন্যান্য অতিথি কেউ এলে অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যায়। কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাটাচড বাথরুম। তিনটে ঘবেব ওপাশে আব কোনো ঘব নয়, ত্রিশূল চূড়ায় ছোটখাটো একটি মন্দিবই গড়ে নিয়েছেন। তাঁব ঠাকুবেব আসন।

কিন্তু সেদিকে নয়। সিঁড়ি ভেঙে ওপবে উঠে ছাতাটা মাথায় ঢাকলেন। ঘুবলেন ডানদিকে। ছাদেব পশ্চিম বিস্তাবে যেখানে আব কোনো আচ্ছাদন নেই, আকাশকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শূন্যতা। গাঢ় সবুজে সবুজে বঙিন উদ্যান। বড় শখেব, সাধেব বনভূমি তাঁব। ছোট-বড় অসংখ্য টবে হবেক বঙেব আলাদা-আলাদা নামেব দেশী-বিদেশী হবেক ফুলেব চাবা। বহু বিচিত্র ক্যাকটাস আব অর্কিড সংগ্রহও কিছু। সেগুলো বাগানে থাকে না। দোতলাব বাবান্দায় অথবা লিভিং-স্পেসে নযতো সিঁড়িব ল্যান্ডিং-গ্রাউন্ডে। এবং ছাদে খোলামেলা বাগানেব জন্য বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা, টকটকে লাল গোলাপ, ধবধবে শাদা টগব, দুর্লভ হলুদ জবা। গত ববিবাবই নিজে গিয়ে কতগুলো জিনিযাব চাবা কিনে এনেছেন। সবই ফুল হয়ে ফুটে ওঠাব কথা ছিল। বঙে বঙে ভবে যেতে পাবত ছাদেব চারপাশ। তিনতলাবও ওপবে ট্যাঙ্ক থেকে সবাসরি জল নেবাব ব্যবস্থা, অনেক লম্বা সিনথেটিক পাইপ কিংবা টিনেব ঝাঁঝবি। দু'বেলা নিযমিত জল ছড়িয়েছে বাধা। তিনি নিজেও তদাবকিতে থাকেন প্রতিদিন। সেই শীতেব সময় থেকে দীর্ঘ খবাব সঙ্গে লড়াই। গোটা বোদ্দুবের তেজে সেভাবে আব টগবগিযে বাড়তে পাবছিল না গাছগুলি। কুঁড়ি থেকে শুকিয়ে যাচ্ছিল সম্ভাবনাব ফুল। বেশিব ভাগই ঝবে যাচ্ছিল। বৃষ্টি নেই। এবং যখন বৃষ্টি এল—গেল, বুঝি সব গেল। বাঁক ঘুবে ছাদেব দবজায় থমকে দাঁড়াতেই সর্বাঙ্গে পাথব হয়ে এলেন। সেই শেষ বাত্তিব থেকে অনর্গল জলে জলে বিদ্ধ হতে হতে চেপটে থেবড়ে গাছগুলি ছত্রাখান হয়ে যাবাব দৃশ্যে কান্না পাচ্ছে তাব। ছাতাটা খুলে নিয়ে মাথায় ধবেও দবজা থেকে আব এগোবেন কিনা ভাবলেন একবাব। কেন না, বৃষ্টি। আকাশ-ভাঙা তুমুল বৃষ্টিপাতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। কাছে-দূবে ঝাপসা চাবপাশ। এবই মধ্যে এগোতে হলে শুধু পা বাড়ানো নয়, ঝাঁপিয়ে নামতে হয়। ভাঙা ভেজা পুবনো স্প্রিংযেব ছাতা। বড্ড নড়বড়ে। কাব ছাতা? এত সকালে কে কোথায় গিয়েছিল, কিছুই জানেন না। নিশ্চযই গোপালেব-মা। অথবা সেসব অবান্তব। আকুল আবেগে লাফিয়ে পড়তেই, এত বেশি জলের তোড়, ছাতাটুকুও মিথ্যে হয়ে

যায়। মাথাটা রেহাই পায় তো কোমর অব্দি শায়া-শাড়ি মুহূর্তে ন্যাতপেতে। চমকে উঠলেন। ছুটে গেলেন। একেবারে কোণের দিকে দেড় ফুট বৃত্তের বড টবের ওপর সযত্ন লালনে ধেই ধেই করে ভারি সুন্দর বেড়ে উঠেছিল সূর্যমুখী গাছটা। এখনও ফুল হয়নি। কুঁড়ি ধরেছিল সবে। তলা থেকে গোটা গাছটাই থুবড়ে পড়েছে মাটিতে। জলে জলে ভিজে, দাঁতে দাঁত চেপে সন্তানেব শিয়রে মাতৃপ্রতিমায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আপাতত তাঁর কবাব কিছুই নেই। বাধাকে ডাকতে হবে এক্ষুনি। সেই অপরিহার্য রাধা। ও যদি বাঁচাতে পাবে এখনও। রাধা গ্রামের মেয়ে। বাধা জানে গাছপালা, গাছপালার নিরাময়বিধি!

পিছু ফিবলেন। পাযেব তলায় ছপছপ করছে জল। প্রাসাদনির্মাণে স্থাপত্যের ত্রুটি ছিল না। অথচ পাইপ গডিয়ে যেটুকু জল নামছে নিচেব দিকে, তার চেয়ে অনেক বেশি জমে যাচ্ছে ছাদের চতুষ্কোণে। এপাশে-ওপাশে টবগুলি ছাপিযে মাটিতে মাটিতে মিশে গড়িয়ে নামছে কাদাজল। কাদায় কাদায় নোংরা হয়ে উঠছে গোড়ালির দিকের শাডিশাযা। দ্রুত পা ফেলতেও বাধা। হাঁটু-গোড়ালি লেপটে কামড়ে ধবে আছে লতপত ছপছপ ভেজা কাপড। তবু নিজেকে টেনে টেনে এগোবাব পথে দু-পাশের অন্যান্য টবে গাছ বা চাবাব মরণদশা দেখলেন গোটাকয়েক।

সুতরাং সিঁড়ি ভেঙে অবতরণধারায় হৃদয়ে বিষাদ ছিল। ভেজা শাড়ি-শায়ার জলে জলে ভিজে যাচ্ছে মোজায়েক পিছল সিঁড়ি। পাযে ববারের স্লিপার আরো বিপজ্জনক। প্রতিটি ধাপেই পা হড়কে পড়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে দোতলায় নেমে আসতেই আরো একবার মাথায় রক্তচাপবৃদ্ধি। বাঁ-পাশে বুলবুলিব ঘরে ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় চিৎকার। ভেতর থেকে বন্ধ। দবজায় খিল এঁটে কী যে সব হুল্লোড়মার্কা ক্যাসেট বাজিযে যাচ্ছে ফুল-ভল্যুমে। নির্ঘাৎ বাবন। দু' বোনও জুটেছে দাদার সঙ্গে। মস্ত স্টিরিও। বন্ধ ঘরে দেয়াল ভেঙেও কান ঝালাপালায় পাগল কবে দিতে পারে যে-কাউকে, যদি সে ওদের হল্লায় মেতে উঠতে না চায়। সাহেবি গান। সবাই নাকি নাচে তালে তালে। ওরাও তিনজনে নাচছে কিনা, কে জানে। নইলে এমন হুড়োহুড়ি, খলখল হাসির তাণ্ডব কেন ঘরের ভেতর? ঝমঝমানো বৃষ্টির দাপটে স্পষ্ট করে শোনা যাচ্ছিল না সবটা। কিংবা ওরাই শুনতে পাচ্ছিল না তাঁর আগ্নেয় ক্রোধে কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজায় ধাক্কা মেবে চিৎকার-চেঁচামেচিতে দরজা খোলানোর পর সক্রোধ ক্ষিপ্রতায় ভেতরে ঢুকে আরো খেপে গেলেন। গলাব শেকল খুলে জানোয়ারটাকে ছেড়ে দিয়েছিল রাধা। কখন ওপরে উঠে এসেছে। দশাসই মাপের বাঘা আর হিংস্র নয়। নিরীহ হরিণ শিশু মেতেছে উৎসবে। কিংবা ওকে নিয়েই, ওরই জন্য মত্ত ক্রীড়ায় বিলিতি পপ্। ঘরের বাইরে বৃষ্টি আর ঘরের ভিতর ঝমঝমাঝম গানের হল্লা চাব-দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এক তুমুল হট্টগোল। মেদল দেহেব ভারে হাঁটু-কোমর ভেঙে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচছে বাবন। ম্যাক্সির পূর্ণাঙ্গ আবরণে বুলবুলিও কমতি যায় না কিছু। বাঘার দিকে চোখ রেখে বাঘাবই জন্য তাব নৃত্য, বাঘাকে ঘিরে ঘিরে। বুঝি বাঘাও জানে বাদলা দিনে ছুটির মজা। সেও লাফাচ্ছে গানের ছন্দতালে। ছুটে ছুটে যাচ্ছে ক্যাসেট বাজানোর যন্ত্রটার কাছে। লম্বা জিভে চাটছে, গন্ধ শুঁকছে স্পিকাব বক্সে। চকিতে ফিরে এসে দু' পা তুলে লাফিযে উঠছে বাবনের

বুকে। বাবন ওকে নিয়েই নাচতে চায়। বাঘা পালায় বুলবুলির দিকে। বুলবুলি ঝপাত করে বসে পড়ে। গলা জড়িয়ে চুমু খায়। লাফিয়ে পরিপাটি বিছানায় উঠে যায় বাঘা। বেডকভার ঢাকা বালিশ পাশবালিশ আঁচড়ায়। কোনো বাধা নেই। আচমকা লাফ মেবে ছুটে যায় অদূরে বাবনের দিকে। সেখানে হাউসকোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে মুনমুন শান্ত ভঙ্গিতে। যেহেতু ল্যাপডগ নয়, কোলে তুলে নেওয়া যায় না এত দীর্ঘদেহী বলবানকে। ববং গলাটা নামিয়ে এনে বাঘাব কানে-পিঠে, দু'টো চোখের মধ্যবর্তী ললাট থেকে নাসিকা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে আদর দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

ঘবে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন কিবণময়ী। এবং মায়েব প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না বেখে একইভাবে লাস্য তাণ্ডবে উচ্ছল ছিল বুলবুলি বাবন। অগ্নিময মাতৃমূর্তি সহ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন কিংকর্তব্যমূঢতায় হতবাক, তাঁব বেসামাল ক্রোধের উদ্‌গাবে সন্তানবা নিশানা হলো না কেউ। কেন না, সেখানে বাধা ছিল। যেখানে মাখন-বিদ্ধ হলেও তৈলাক্ত হবে না ইস্পাতেব ছুরি—'তুই? তুই এখানে কী করছিস? সকাল থেকে কী একটা দিন যাচ্ছে। ঘরদোরেব কী হাল। এত এত কাজ পড়ে আছে। একটা আক্কেল নেই তোর? আমি মবছি আমার নিজেব জ্বালায। আব তুই এখানে নেচে বেডাচ্ছিস ওদেব সঙ্গে? কোনো কাজটাজ নেই তোর?'

দু'বছব-তিন বছরেব ছোটয়-বড়োয দাদাবাবু-দিদিমণিদেব মাপে মাপে সমবয়সী বাধা ছিল একপাশে। হাসছিল সে। বাঘার খুশিতে, বাঘার মজায় দারুণ আনন্দ তার। কিন্তু হাসি শুকোল। অমোঘ মাতৃশাসন। এ-বাড়িতে অঢেল কাজ তাব। অনেক দায়িত্ব। মাযের দিকে সভয চোখ তুলে তাকাতেই হয় একুবাব—'বুল্লিদিদির ঘরে বিছানা তুলতে এযেছিলুম....'

'বিছানা কি একটা? ঘরে ঘবে সবই তো পড়ে আছে। আয, আয আমাব সঙ্গে....' উত্তেজনায ক্ষিপ্ত কিরণমযী—'এদেব এসব ইংরেজি গানবাজনা কী বুঝিস তুই? চল্ চল্....'

'বাট ইভন্ আওয়ার টাইগাব অ্যাপ্রিসিয়েটস দ্যাট....'

'হ্যাঁ, এই তো চলেছে তোদেব। স্কুল নেই, কলেজ নেই। তাই বলে কি বইপত্তর নেই নাকি কারুব? পডাশুনোটুনো সব মাথায় উঠেছে। বেশ মজা পেয়ে গেছিস।'

'ওফ্ মা, ড্যাম ইয়োব পড়াশুনো পডাশুনো। টুডে ইজ বেইনি ডে। নো পডা ওনলি শোনা....' সাহেবি নাচেব বাজনা ফুরিয়ে এসেছে বোধ হয়, বুলবুলি এগিযে এসে সাইডবোর্ডে ডাঁই কবা ক্যাসেটেব স্তূপে নতুন হল্লা খুঁজছে—'ডু ইউ নো এখন আমরা কী কবব?'

'কী আবার করবি? যা কবে যাচ্ছিস, তাই। একটু দয়ামায়াও নেই বে তোদের?' অতিরিক্ত ক্রোধের মাত্রায দিশেহারা কিরণমযী—'এমন ঝডজলেব দিনে কোথায কী হচ্ছে, মা-টা একা একা ছুটোছুটি করে মরে যাচ্ছে, ধিঙি মেযে, একটু তো দেখতেও পাবিস ঘুবেফিবে....'

'ওফ মা, ডোন্ট সে ধিঙি। ভেবি আগলি ওযার্ড। সাউন্ডস লাইক ফিরিঙিজ। উই আর নট ফিরিঙি। হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেঙ্গলি গার্লস.' ওপাশ থেকে মুনমুন।

এককালের পাশ-কোর্সের গ্র্যাজুয়েট কিরণময়ী নিজেরই সন্তানদের কাছে মাঝে মাঝে মস্ত বেকুব। কী যে বলতে চায় ওরা? হেঁয়ালি লাগে। ওদের ভাষা আলাদা। কখনও কখনও সে-ভাষাও দুর্বোধ্য। কিন্তু মাতৃত্বের অধিকারটা যে-করেই হোক রাখতেই হয় নিজের দখলে। মেয়েদের ছেড়ে এবার কটমটিয়ে তাকালেন ছেলের দিকে—'হ্যাঁ রে বাবন, তোর তো আর ওদের মতো নয়। কত শক্ত পড়া তোর। দু'বার পাশ করতে পারিসনি। এখন ওদের বোনেদের পাল্লায় পড়ে....'

বৃথাই গঞ্জনা মাতৃহুঙ্কারে। সোফায় বসে বাঘাকে নিয়ে খক্রিংয়ের কায়দায় খেলছিল বাবন। ওর বুকের ওপর পা তুলে হামলে আছে বাঘা। খেলতে চায়। এবং চকিতেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে—'কস্টিং-চার্টার্ডের তুমি কী বোঝ? তখন থেকে কপচে যাচ্ছ পড়া আর পড়া। আটটা বেজে গেল। খিদে পায় না আমাদের? আমরা খাব।'

'আমরা আজ খিচুড়ি খাব,মা....' বড় মেয়ে মুনমুন ঝাঁপিয়ে উঠল আহ্লাদে--'ইন রেইনি ডেজ, খিনচুরি ইজ দ্য বেঙ্গলি রিচুয়াল....'

'ইয়েস। দি আইডিয়া....' ফুরিয়েছে বিলিতি গানবাজনা। ক্যাসেট পাল্টাতে এগিয়েছিল বুলবুলি। উচ্ছল হলো—'খিনচুরি উইথ ওমলেট অ্যান্ড গ্রেট বেগুনভাজা....'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব বকেছিস। এবার চুপ কর....' প্রচ্ছন্ন বিরাগে প্রস্থানে উদ্যত কিরণময়ী।

খপ করে হাত বাড়িয়ে বাবন ধরল তার মাকে—'তোমাদের ওই লঙরখানার ট্যালট্যালে ভিখিরি খিচুড়ি নয় কিন্তু। সেই যে লক্ষ্মীপুজোর সময় হয় মামাবাড়িতে, এভরি ইয়ার হয়....ওই, ওই যে গো, কী ....কী যেন নামটা? বেশ শক্ত শক্ত, সলিড মাল....'

এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল রাধা। হেসে বলল—'ভুনা গ দাদাবাবু? ভুনি খিচুড়ি?'

'এগজাক্টলি। দ্যাট ভুনা খিনচুড়ি। নাইস বেঙ্গলি কুকিং। চালডালের বেশ একটা ভালো ককটেল।'

ঘর ভরে মেতে উঠলেন কিশোরকুমার। নতুন গান—'রূপ তেরা মস্তানা, প্যার মেরা দিওয়ানা, ভুল কাহি হামসে না হো যায়ে....'

কানের ওপর হামলে পড়ে এমন বীভৎস চিৎকার, এমন কি, অভ্যস্ত কিরণময়ীকেও সহসা আঁচল টেনে দু'টো কান চেপে ধরতে হয়—'আঃ, আস্তে করে দে না একটু। বাইরে এমন একটা অনাসৃষ্টির কাণ্ড চলছে। ঘরের ভেতর তোদের এই হুটোপাটি অশান্তি। কাউকে যে তিষ্ঠোতেও দিবি না দেখছি। সবাইকে পাগল করে দিবি?'

কোন আমল পায় না মাতৃবাক্য। কিশোরকুমার বাতাসে ভাসে। মায়ের কাছাকাছি আরো দু-কদম এগিয়ে এসে বুলবুলির সোল্লাস দাবি—'উই ওয়ান্ট ভুনি খিনচুড়ি। ব্যস আর কোনো কথা নয়। ওঃ গ্র্যান্ড, কোথায় লাগে বিরিয়ানি উইথ ফাউল কারি অর চাউমিন অর....'

'সে-হবে, হবে খন। কিন্তু তোরা এখন চুপ করবি একটু....' মাতৃ-অধিকারের আস্তরণে অভিভাবকের দাপটটুকু জিইয়ে রাখতেই হয় প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে। নইলে এই তো সুখ। তাঁকে ঘিরে সন্তানদের খুশির হুল্লোড়। নিজেরাই খিচুড়ি খেতে চাইছে ওরা। নিখাদ

বাঙালি আহার। যা তিনি নিজে রাঁধবেন। বিদেশী রান্নার চেয়ে অনেক সহজ। বিষণ্ণ মুখভাবে হঠাৎ-ই মোচড় খেলেন কিরণময়ী—'এদিকে কী যে একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে, খবর রাখিস তোরা কেউ?'

'সর্বনাশ?' সচকিত সন্তানরা। দু' কদম পিছিয়ে টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিয়েছে বুলবুলি। স্তব্ধ কিশোরকুমার।

স্তব্ধতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাইরের অবিশ্রাম বর্ষণধ্বনি। মাতৃমুখভাবে কিছুটা মেঘলা হয়ে উঠেছে ঘরের চারপাশ। সকলেই চুপ। গলার স্বর ভারি হয়ে ওঠে কিরণময়ীর। বিষাদের ক্লান্তশ্বাস—'যা দেখে আয় ওপরে। অমন সুন্দর ফুটে উঠেছিল সূর্যমুখীটা....'

'সূর্যমুখী মা? দ্যাট সানফ্লাওয়ার?' ওপাশের ডিভান থেকে উঠে এসেছে মুনমুন—'কী হয়েছে? কী হয়েছে ওর?'

বর্ষার জলে জলে সর্বাঙ্গে ভিজে বুঝি এখনও অন্তর্বর্তী প্রাণে অশ্রুপ্লাবনধারা—'একেবারে তলা থেকে ভেঙে ফুলশুদ্ধু গাছটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটিতে....'

'অ্যাঁ!' প্রায় সমস্বরে কোরাসের ভঙ্গিতে আর্তনাদ যুবকযুবতীদের। বিহ্বল চোখের পাতায় শীতল স্তব্ধতা। বুঝি এখনও একটি মাত্র ফুলের মৃত্যুতে অথবা ক্ষীণপ্রাণ একটি বৃক্ষের পতনে এত গভীর শোকের কাতরতা মুহ্যমান করে তুলতে পারে এ-সংসারকে।

রাধা ছুটে এল—'হলদে হলদে সেই ফুলটা গ মা? নতুন ফুটেছিল।'

'হ্যাঁরে, সেই জন্যেই তো এত করে ডাকছি তোকে। দ্যাখ দেখি তুই, যদি কিছু করতে পারিস। লক্ষ্মী মা আমার।'

'সে-আপনি ভাববেন নি গ মা....' রাধা খলখলিয়ে উঠল—'ও-গাছ আমি ফের চাঙা করে দেব। জলটা কমে যাক....'

'পারবি? পারবি তুই?'

'কেনে পারব নি? এমনধারা ঝড়ে আমাদের পাড়াগাঁয়ে আকছার কত লাউকুমড়োর লতা, ঝিঙেকুমড়ার মাচা ভেঙে যাচ্ছে। গোড়াশুদ্ধু আস্ত পেঁপে গাছ উপড়ে পড়ে গ মা। ফের বাঁশের ঠেকনা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। এ-ত একটা পল্‌কা গাছ। মাটিতেও নয়, বাহারের টবে বেড়ে উঠেছিল। ও সোজা হবে নি? একটা বাঁশ লাগবে শুধু, বাঁশের কঞ্চি....'

'বেশ, যা লাগে আনবি তুই। কিনে আনবি বাজার থেকে।'

সূর্যমুখী বাঁচবে তাঁদের। এ-হেন সুখসংবাদে প্রীত ব্যক্তিরা রাধাকে ঘিরে অকস্মাৎ কোলাহলে উদ্বেল। হুল্লোড়বিলাসী রাবন হঠাৎ তার হেঁড়ে গলায়—'তুই যদি পারিস রে রাধু, তোকে প্রাইজ দেব।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাধা। থমকে দাঁড়াল—'পারাইজ? পারাইজ কেনে গ দাদাবাবু। মা নিজের হাতে গাছ করেছেন, সেটার জন্যি চেষ্টা করব। পারাইজ দেবে কেনে? ও-আমি চাই নে....'

'চাই না কি রে? সে-তোকে নিতেই হবে....' বছরে দু-এক বছরের ছোট বুলবুলি খুশিতে খুশিতে—'এ-বছর কেনেল ক্লাবের ডগশো-এ আমাদের রোকামির জন্যে টাইগার ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেল। কেনেল মেইড হয়ে যা পারলি না, হর্টিকালচারিস্ট হয়ে

এবার তোকে জিততেই হবে। আসছে বছর ফ্লাওয়ার শোতে আমাদের যা-হোক একটা কিছু....সানফ্লাওয়ার ক্রিসেনথেমাম ডালিয়া.... যেকোনো একটা যদি প্রাইজ আনতে পারি রে রাধু, সার্টেনলি এ বিগ প্রাইজ ফলস ডিউ টু ইউ। ফাইন এক সেট কসমেটিকস দেব তোকে। না, না, সে-আর কত দাম? একটা পিওর সিল্ক....'

'তাহলে আর পিওর সিল্ক কেন? পুরোপুরি বেনারসীই বল্।' হাসছে মুনমুন।

'ধ্যাৎ ওদের বয়সের মেয়েদের বেনারসী দিবি কী? সে-তো বিয়ের সময় দেয়। ওয়েডিং-কস্ট্যুম ফব বেঙ্গলি দিদিজ অ্যান্ড বৌদিজ....'

ওদের ছেলেমানুষি প্রলাপবিলাপের হৈহল্লা তাণ্ডবে বেশ মজাই পাচ্ছিলেন কিরণময়ী। বাবনের দিকে তাকিয়ে হেসেই ফেললেন—'বিয়ে না হলে মেয়েরা বেনাবসী পবে না—এই বুঝি ধাবণা তোর? আর তাই যদি হয়, মেয়ে হয়ে জন্মেছে, একদিন না একদিন তো বিয়ে হবেই ওব। বেনারসী পেতে পারে না একটা?'

'নো নো নেভাব....' বুলবুলি গম্ভীব হলো—'রাধুর বিয়ে হবে মানে? রাধু আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? সে-হয নাকি কখনও? ইম্‌পসিবল্। না রে রাধু, ফ্লাওয়াব শোতে আমাদের প্রাইজ হোক। বাপিকে বলে তোর জন্যে একটা সাউথ ইন্ডিযান সিল্ক এনে দেব। পিংক নয় তো অবেঞ্জ কালার। তোর গায়ের রঙ তো কালো। কালো মেয়েদেব দারুণ মানায়।'

'লাগবে নি গ, কিছু লাগবে নি....' ঘব ছেড়ে যেতে পা বাড়িয়েও দরজায় দাঁড়িয়ে পডেছিল বাধা। ভালোবাসার ভাষায় এতগুলো কথা! শুনছিল সে। হালকা একটা শিরশির ছিল লজ্জার। কেন না কোথাও কিছু ঠিক নেই, এখনই তার বিয়ের কথা। খেপে গেল। কালো মেযে সে। সবাই জানে। তবে কেন সেই খোঁচা মারবে বুল্লিদিদি? সে ছুটে বেবিযে গেল। এবং যাবার আগে—'আমাদেব ফুল পারাইজ পেলে সে-তো আমরাই পাব গ। আমরা সব্বায় পাব। আমাব আবার পারাইজ কেনে?'

বাধার চকিত প্রস্থানে মৃতপ্রায় সূর্যমুখীর আরোগ্য বিষয়ে পুত্রকন্যাসহ কিবণময়ী মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যখন, বাবন বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘব থেকে। কিরণমযী বাধা দিলেন—'তুই....তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?'

'দেখি, রাধু কী কবছে ওপবে। ও একা যদি না পাবে।'

'খুব পারবে। তোব আব গিয়ে ওস্তাদি করতে হবে না।'

সে-ছেলে নিশ্চিতই মাতৃশাসনে বশীভূত নয়। ববং টাইগার, অবশ্যই বশীভূত চতুষ্পদ, বাদলা দিনেব ভেজা-ভেজা আবহাওয়ায় গরম রক্তে বিবক্তই ছিল কিছুটা, লাফিয়ে এসে সতেজ যৌবনের পিছু নিলো।

পেছন থেকে হাঁক পাড়লেন কিরণময়ী—'ওই বৃষ্টির মধ্যে যাবি না কিন্তু তুই। ভিজবি না বাবন। খববদাব। তোর আবাব বড্ড বেশি সর্দিকাশিব ধাত....'

বুলবুলি নতুন করে আঙুল টিপে দিয়েছে টেপরেকর্ডারে। ঘর ভরে উদ্দাম কিশোরকুমাব—'ইনা মিনা ডিকা ডাই টামা নিকা, মাকা নাকা নাকা চিকা বিগা রিগা...'

ঘর থেকে বেবিয়ে এসে ধ্বনিময় সঙ্গীতমযধ এক ভুবনে, যা তার নিজেরই সংসার, কোথাও বুঝি আব এক ফোঁটা স্বস্তি পাচ্ছেন না কিরণময়ী। ঘরেব ভেতরে ওদের গান,

বাইরে বৃষ্টি বৃষ্টি....লাগাতার বৃষ্টি সেই সকাল থেকে। একটু-আধটু বিশ্রামও চাইছে না আকাশ। নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না কাউকে। কিন্তু বুক ভরে এ-নিঃশ্বাস ধবে রাখতেই হবে তাকে। থামলে চলবে না। খিচুড়ি হবে। সাত জন্মের ভাগ্যি তাঁর। ওরা যে হঠাৎ এভাবে খিচুড়ির বায়না ধরে বসবে, এমন কোন ধাবণা তাঁর নিজের মধ্যে ছিল না বলেই সন্তানদের আবদার রক্ষায গোপালেব-মাকে সেভাবেই কিছু নির্দেশ দিতে কিচেনের দিকে এগোলেন। পা ফেলতে পারছেন না ভালোভাবে। তখনও ঝপঝপ জল ঝরে যাচ্ছে নিম্নবর্তী শাড়ি-শায়ায়। ঝকঝকে লিভিংরুমের ব্যবধানটুকু ডিঙিয়ে যেতে তাঁরই গা থেকে চুইয়ে পড়া নোংবা জলের ছাপ পড়ছে তকতকে মোজায়েক ফ্লোবের মসৃণে। এতগুলি মানুষের চলাফেবায সব ঘব বারান্দাই জলে জলে বিচ্ছিবি হয়ে উঠছে। ধুলোকাদার পায়েব ছাপও পড়তে পারে ঝি-চাকরদের। গা ঘিনঘিন কবছে তাঁর। এভাবে হেঁসেলে ঢুকে ছোঁযাছানিতে একটি খিঁচ ধবে থাকে বুকে। এর মধ্যে স্নানটা সেবে নিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু স্নানের পর ঠাকুবেব ঘবে আসন না দিয়ে কোনো কাজ কবা যাবে না—ইত্যাদি বিবিধ ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কখন পৌঁছে গেলেন নিজেব জায়গায়। তাঁব কিচেন। বাড়ির প্ল্যান তৈরিব সময থেকেই আর্কিটেক্টেব সঙ্গে আলোচনায বিশেষভাবে খবরাখবর নিয়ে তাঁব কিচেন বানিযে নিয়েছিলেন নিজের পছন্দেব মাপে। সাজিয়েছেন প্রাণ ভরে। তাঁর গহন অন্তঃপুব। তাঁব নিজের জগৎ।

কিন্তু প্রবেশ মুহূর্তেই ভ্রূ-কুঁচকে থমকে দাঁডালেন—'এ কি? কী হলো? হাত পা গুটিয়ে বসে আছো যে বড়? কাজ নেই তোমার? রান্নাবান্না হবে না আজ?'

চোখে পড়ল, গোপালের-মা আনাজ কুটবে বলে গতকালেব অবশিষ্ট তরিতরকাবির ঝুড়ি নিয়ে বঁটিতে বসেছিল একবার। বঁটিটা কাত হয়ে পড়ে আছে। বুডি সেখানে নেই। অদূরে ঘরেব কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বাটি ভরে মুডি আব কী নিযে কুটকুট চিবোচ্ছে গালে। এ-বাডিতে মুড়িচিঁড়েগুড় ঝি-চাকরদেব জলখাবাবের জন্যই বাখা হয় কিছু। সুতবাং আপত্তি ছিল না মুড়ির বাটিতে। কিন্তু গিন্নিমাব অতর্কিত প্রবেশে বাটিটা আঁচলের তলায় বৃথা লুকোবার চেষ্টায় দিশেহারা গোপালের-মা এক-গাল মুড়ি চিবোতে চিবোতেই— 'কি করব গ মা? বোজকাব বাজারে রান্নাবান্না হয় আপনাদেব। এত বেলা তক হাটবাজার থেকে ফিবল নি কেউ....'

'কে যাবে? দেখছ না কী একটা দিন চলছে সকাল থেকে। কাকে পাঠাব? নন্দ তো ভিজে এসেছে। বৈজুও এখন অব্দি ডিউটিতে এল না....' আস্তে আস্তে ফ্রিজের দিকে এগোলেন কিবণময়ী। সেখানে ফলটল মিষ্টিটিষ্টি অল্পবিস্তব থাকেই সব সময়। একটু-আধটু এদিক- ওদিক হলে এক পলকে হিসেব পাওয়াও মুশকিল। তবু চোখে একবাব স্টক মেলানোব চেষ্টা। যেটুকু সম্ভব।

ওপাশে মেঝেতেই লেপটে বসে আছে বুড়ি। কোঁচড়ের তলা থেকে বেরোচ্ছে না মুড়িব বাটি। তোবড়ানো গালে আহার না থাক, সাফাই থাকে—'সে-আব আমি বুঝব কি গ মা? মুখ্যু মানুষ। কী কী রান্নাবান্না হবে আপনারা বলেন নি কেউ। আপনাব সাধের মেয়ে সাতসক্কালে একবারটি মুখ দেখিযেই সেই যে কোথায় চলে গেলেন....'

'দেখো গোপালেব-মা, ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে পাবো তো থাকবে এখানে।

়জাববার বলেছি, তোমার না পোষায় তুমি অন্য কোথাও পছন্দের জায়গা খুঁজে নিতে পারো....' ফ্রিজ বন্ধ করলেন কিরণময়ী। সবাসবি রূঢ়তায়—'সাধের মেয়ে? সাধেব মেয়ে? কাব কথা বলছ?'

মুড়ির-বাটি আগলে গোপালের-মা আবো জড়সড়। ওর পাযেব কাছে আধাআধি সন্দেশেব টুকরো দেখলেন কিবণময়ী। ভ্রূ কুঁচকোলেন—'এ-সংসারে বাধ্ যা কবে, তার কোনো হিসেব জানা আছে তোমাদের? এই জলঝড়েব মধ্যে সকালে দুধ আনতে গেছে। দুধেব গাড়ি আসে নি। সে-ও কী করবে? কী বিচ্ছিবি দিন পড়েছে একটা। এরই মধ্যে ব্যাটাছেলেদের মতো ছুটোছুটি করে যা হোক, যেটুকু পেবেছে রুটি নিয়ে এসেছে এক পাউন্ড। জমাদার আসে নি, ববিব-মা এখনও এল না। ঘরদোব সব নোংবা হযে আছে। কাঁড়িকাঁড়ি বাসন, বাসি জামাকাপড় সব পড়ে আছে কলতলায। এসব ধোবে কে? তুমি? এখন পর্যন্ত তুমি তো নিজেব বুদ্ধিমত একটা দুটো ডিমও ভেজে দিতে পাবলে না দাদাবাবু-দিদিমণিদেব। সাহেব বাড়ি নেই, ব্যস, হযে গেল। আমি যে এত ছুটোছুটি কবে মবছি, এক কাপ চা-ও তো কবে দিতে পারতে আমাকে।'

'সে-করব কী কবে গ মা? উনুন জ্বলছে নি।'

'সে কি! গ্যাস ফুবিযে গেছে?'

'চাযেব-জল ত চাপিযেছিলুম ত্যাখন। হল নি। এট্টু বাদেই হুট কবে নিবে গেল।'

'সেটা তুমি আমাকে বলবে তো আগে।' ছপছপ ভেজা-কাপড়ে হেঁসেলেব ভেতব বেশি দূব যেতে কিছুটা খটকা ছিল। কিন্তু এগোলেন কিবণময়ী। সিলিন্ডারেব নব পবখ করলেন। ওভেনের নব মুচড়ে গ্যাস-লাইটাব জ্বাললেন না। মাথা নুযে গন্ধ শুঁকলেন। তাকালেন গৃহকোণে মজুত সিলিন্ডাবেব দিকে—'যাও দেখি, যাও। বাধা ছাদে আছে। ডাকো ওকে। এটা পাল্টে দিয়ে যাক। এ-ছাই এও তো সেই রাধা ছাড়া আব কারুব কম্মো নয়। সে-কি একদিন দুদিন নাকি? আজ কত বছর....ওব সেই এক রত্তি বযস থেকে সিলিন্ডাব ফুবোলে পাল্টাপাল্টি করে যাচ্ছে ও। আমাব তো বাপু ভযই কবে।'

গিন্নিঠাকরুণেব মুখে কথাগুলো বাজছিল। আঁচলের তলায মুড়িব-বাটি নিয়ে গোপালেব-মা নতুন সঙ্কটে। বিতিকিচ্ছিবি এই বৃষ্টিবাদলাব দিনে গুটি গুটি সিঁড়ি ভেঙে ছাদে গিযে কাউকে ডেকে আনতে আপত্তি ছিল না তার। বিশেষত হুকুমটা যদি খোদ মনিব-গিন্নির। আজ প্রায মাস চাবেকেব কিছু বেশি হলো, এ-বাড়িতে কাজে লেগেছে গোপালের-মা। কিন্তু মুখপুড়ি ওই মেয়েটাকে কিছুতেই সইতে পাবছে না বুড়ি। নাতনিব বযসী একটা মেয়েব মুখে দিনে-বাতে সর্বক্ষণ শুধু কথাব চটপটি আর কর্তালি। শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে। দাসীবাঁদিই যদি, তবে সবাই তো একই বকম হবে। ও-ছুঁড়িব জন্যেই শুধু আলাদা নিযম কেন? সুতবাং গিন্নিমায়ের নির্দেশ সত্ত্বেও ব্যথা-বেদনাব মাজা সামলে এত এত সিঁড়ি ভেঙে নবাবেব-বেটিকে ডেকে আনতে তাব স্বাভাবিক দ্বিধা ছিল। দ্বিতীয় আপত্তি —মুড়িব বাটি। খিদেব পেটে ধীরেসুস্থে বসে সক্কালবেলা দু-গাল মুড়িও চিবোতে পাববে না 'কাজের-লোক' বলে? এ-কেমন কথা?

বুড়ির কপাল ভালো। তাকে যেতে হলো না কোথাও। ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে রাধা। হাঁপাতে হাঁপাতে—'ও-কিছু নয় গ মা। সে-আমি সব ঠিক করে দেব।'

'কী? কী ঠিক করবি তুই?'

'সেই যো সুয্যিমুখী। সেই গাছটা।'

কোমর ভেঙে কিছুটা উবু হয়ে আনাজের ঝুড়িটা নেড়েচেড়ে দেখছিলেন কিরণময়ী। আজ আর হয়ত বাজারে পাঠানো যাবে না কাউকে। কী আছে, কতটুকু আছে? অকস্মাৎ মুমূর্ষু সূর্যমুখীর কুশলসংবাদে নিশ্চিতই খুশি হবার কথা। কিন্তু হাসিটুকু থাকে না। একটা ডাঁসা বেগুন তুলে পরখ করতে করতে পিছু না ফিরেই বললেন—'সে-যা পারিস, করবি। এখন দেখ্ দেখি, গ্যাসটা ফুরিয়ে গেছে। ওটা পাল্টে দে। আর শোন্...'

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কিরণময়ী। ফিরে তাকালেন। কিন্তু কোথায় রাধা? দরজার বাইরে বারান্দায় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখা যাচ্ছিল না ওকে। পায়ে পায়ে এগোলেন সেদিকে। চমকে উঠলেন—'একি রে, তুই যে একেবারে স্নান করে এসেছিস। এভাবে ভিজলি কেন? ছাতা নিস নি সঙ্গে?'

'ছাতায় কী হবে গ মা? যা জলের তোড়, মানুষের গায়ের চামড়া বিঁধে যাচ্ছে। গাছগুলো যে মাজা ভেঙে আরো থেঁতলে পড়বে। চারটে টবকে জল থেকে সরিয়ে রেখে এসেছি সিঁড়ির ধারে ছাদের তলায়, শুকনোয়। আমাদের সেই চন্দ্রমল্লিকা গাছটা গ মা....'

'চন্দ্রমল্লিকা? অ্যাঁ, ওটাও ভেঙেছে নাকি?'

' না গ মা, ও-কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে...' সর্বাঙ্গে ভিজে, হয়তো শীতেই, থরথর কাঁপছিল রাধা। একরাশ ভেজা-চুল বুকে টেনে এনে দু-হাতে নিংড়োচ্ছিল পাক দিয়ে দিয়ে—'এ-ত আর ধান নারি হয়ে যাওয়া নয়। এমনটা হয় আমাদের গাঁয়ে। আশ্বিন-কাত্তিক মাসে জোর জলঝড় হলে মাঠ ভরে পাকা ধানের গাছ শীষশুদ্ধ মাটিতে হেলে পড়ে। কপাল পোড়ে চাষি গেরস্তদের। এ-ত আর মাঠের ধান নয়...'

'হ্যাঁ বুঝেছি। সে-যা হয় হবে...' ফিরে তাকালেন কিরণময়ী—'ও গোপালের-মা, করছ কী তুমি? আঃ, আর তো পারি না। একটু নড়োচড়ো বাপু। যাও, ওর ঘর থেকে শাড়ি শায়া ব্লাউজ এনে দাও ওকে....'

এবং আবার রাধাকে—'তুই একেবারে স্নানটাই করে আয় বরং। ওভাবে থাকলে আবার কখন একটা জ্বরজারি বাঁধিয়ে বসবি।'

'চান করব গ মা? ঘরদোর সব আগোছাল পড়ে আছে। ঝাড়পোছ ধোয়ামোছা হল নি।'

'সে-হবে খন। আর শোন....ওরা খিচুড়ি খেতে চেয়েছে। আমিও স্নান সেরে ঠাকুরের-আসন দিয়ে আসি। সে-না হয় আমিই রাঁধব। তার আগে তুই বরং এক কাজ কর। সকালের জলখাবারও তো করতে হবে। তুই একটা কিছু করে ফেল্। কী করবি?'

গোপালের-মা এনে দেবে বলে শায়া-শাড়ির প্রতীক্ষা তখন। সারা গায়ে ভেজা কাপড়ে লেপটে শীতার্ত রাধা, টবলালিত সূর্যমুখী বা চন্দ্রমল্লিকার ক্ষীণপ্রাণ চারাগাছই

হয়তো-বা, নিশ্চল দাঁড়িযে থাকে। দু-হাতের পাতায় আঙুলগুলি জড়াজড়ি হয়ে থুতনি ছুঁয়েছে। গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে বারান্দায়। ভেসে যাচ্ছে মেঝে। এবং বৃষ্টি, অঝোরে বৃষ্টি বাইরে। সর্বাঙ্গের কাঁপুনি নিয়ে তাকাল—'দুটো কবে ডিম ভেজে দেব গ মা? পাঁউরুটি এনেছি।'

'না, ছুটির দিন। চাউচাউ কর। বাবন বড় ভালোবাসে। বিট গাজব ডিম সবই আছে...' চলে যাচ্ছিলেন কিরণময়ী। ঘুরে দাঁড়ালেন—'নুডলস আছে তো রে বেশি কবে? ওদেব তো আবাব একটু-আধটুতে হয় না...'

'সে-ভাববেন নি গ। জলটা ধরুক এট্টু। আমি ফের বাজার যাব বেলায় বেলায...'

'তুই যাবি কেন? সে-যেতে হয নন্দলালই যাবে।' গেরস্তালির অনেক কাজ ছড়িযে আছে চাবদিকে। দু-পা এগিয়ে কিরণময়ী কিছুটা আনমনেই—'গাড়ি বেরুবে না বলে এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে আজ আর বোধহয় বৈজুও আসবে না।'

'বৈজুদা ত এসে গেছেন।'

'এসে গেছে? কই, কোথায?' কিবণময়ী চঞ্চল হলেন—'আমাব কাছে এল না।'

'ভিজে ভিজে একেবাবে হাপুইসুটি। ছাতাফাতা যা ছিল, ভেঙে গেছে...' শীত বর্ষার উর্ধ্বে টানটান যুবতীদেহে রাধাব কিছুমাত্র বৈকল্য নেই—'আপনার কাছেই আসছিলেন গ মা। দাদাবাবু দিদিমণিরা ধবেছেন ঘরের দোবে। কলকাতায আর নিকি কিছু নেই। চাদ্দিকে থৈ-থৈ করছে জল। ট্রাম চলছে নি, বাস চলছে নি...'

'সে-আর বৈজু বলবে কী। এ-তো ঘবে বসে আকাশ দেখলেই বোঝা যায়...' কিবণময়ীব শব্দগুলি নিতান্তই আলগা-আলগা। নিষ্প্রয়োজনের ঢঙেই কিছু বলা। বাধার জন্য কাপড়চোপড নিয়ে দরজায এসে দাঁড়িয়েছে গোপালের-মা। বাগে ফুঁসছে বুড়ি। রাধা সেগুলো হাতে তুলে নিযেছে যদিও, কিরণময়ীর খরদৃষ্টি অঘটনের গন্ধ পেল। তিনি জানেন—তাঁর উপস্থিতিতে কিছু না হোক, সরে গেলেই এক্ষুনি ঠোকাঠুকি লেগে যেতে পারে ওদের। ঘরসংসাবে এ-আবেক রোজকাব অশান্তি তাঁর। দুটো হুলো বেড়ালকেই মাছেব ঘবে একা ফেলে রেখে এগোলেন তিনি। এবার স্নান। সত্যি সত্যি স্নান। ঠাকুবঘরে তাঁর গৃহদেবতা এত বেলা অব্দি এখনও উপবাসী। দীক্ষা নিয়েছেন আশ্রমে। এখনও চন্দন-তুলসী ছোঁয়ানো হয়নি গুরুদেবের পায়ে।

কিন্তু রেহাই নেই। ডাক শুনে এগোতেই দোতলাব সিঁড়ির ধারে ভেজা কাকের শবীরে বৈজনাথ। বাড়ির ড্রাইভার। মানুষ নয়, পুরো মানুষটাই একটা ভাঙা ছাতা হযে উঠেছে মনে হয। কিংবা আস্ত একটা মেঘই যেন মানুষ হয়ে তলা থেকে পায়ে পাযে উঠে এসেছে ওপবে। কোথায় রেখেছে পাযেব জুতো? থকথকে কাদা। খুলে ফেলেছে জামাগেঞ্জি। রোমশ বুকেব ওপর কোণাকুণি বাঁকে মোটা পৈতে এক গোছ। চকচকে কালো টাকে কোনো সমস্যা নেই। তলার দিকে কোমব থেকে পা অব্দি লম্বিত প্যান্ট ভিজে ভিজে, মনে হয়, দুটো চামড়ার খোল। যেখানেই পা রাখছে, জলে-জলে ভবে যাচ্ছে সিঁডি-বারান্দা। গড়িয়ে যাচ্ছে, চারিয়ে যাচ্ছে জলের ঢল।

'করেছ কী তুমি। এভাবে আসতে হয়? তোমার ছাতার কী হলো?'

'হ্যাঁ মাইজি, ছেল ত জরুর। লেকিন...' এভাবেই বাংলা বলে বৈজনাথ। হিন্দি বোঝার বা বলার দিগদারি থেকে মাতাজিকে বেহাই।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও বাপু। তুমি আর এগিয়ো না। ওখানেই থাকো। এমনিতেই ঘরবাড়ির যা হাল হয়ে উঠেছে...' কিরণময়ী নিজেও ব্রিবত—'কী একটা দিন পড়ল বলো দেখি। এ-যা দেখছি এ-বৃষ্টি খুব শিগগির ফুরোবে, মনে হচ্ছে না। তা তুমি যখন এসেই পড়েছ, দাঁড়াও একটু। দরকার আছে...'

গাড়ি চড়ে না বৈজনাথ। গাড়ি চালায়। সাহেব দিল্লী থেকে ফেরেন নি, জেনেও, নিয়মমাফিক ডিউটিতে আসতে হয়েছে তাকে। ট্রামবাস বন্ধ ভোরবেলা থেকেই। কোমরজল রাস্তায় রাস্তায়, যত্রতত্র। পঞ্চাশ-পেরনো বয়সের শীর্ণদেহে জলমগ্ন নগরীর পথে পথে প্রায় আড়াই-তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে তাকে। কেননা —নকরি। প্যান্টের দুটো খোল যতটা সম্ভব হাঁটু অব্দি গুটিয়ে তুলে, পায়ের জুতো জোড়া জোড়া-ইলিশের কায়দায় বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে, ডান হাতটাও খামোকা বেকার থাকে নি—সুবিপুল আকাশের প্রবল আক্রমণ থেকে নিজের মস্তকরক্ষায় সাবেকি ভারি ছাতাটা ধরা ছিল শক্ত মুঠোয় এবং এভাবে দু-দুটো সবল হাতই আটকে থাকার পর, মহানগরী আচমকা যদি খালবিলসমুদ্দুর হয়ে যায়, তার করণীয় থাকে না কিছুই। প্লাবনের জলে প্যান্ট বাঁচাবার দায় নেই। কেননা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বারবার প্যান্ট মুড়ে নেবার জন্য দুটোর বেশি বাড়তি হাত ছিল না তার। কারুরই থাকে না। সুতরাং অর্ধাঙ্গ জলে ডুবিয়ে রেখে নগরসারথি ভেবে নিতেই পারে—রথচক্র ঘুরবে না আজ। সাহেব ঘরে থাকলেও—না। দাদাবাবু দিদিমণিরা স্কুলকলেজে যেতে চাইলেও—না। মাতাজির মার্কেটিংয়ের কোনো তাড়া থাকলেও—না। সুতরাং আজ তার ছুটি। স্টিয়ারিংয়ের মালিক বৈজনাথ জানে না, এমন হঠাৎ-ছুটির নিশ্চলতায় কী করে মানুষ? রাস্তার নালানর্দমার পচা জলে গা-গতর ভিজিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যাবার ভাবনায় বড় শীতার্ত ছিল সে। সেখানে বস্তি-ঘরের খাঁচায় হাঁসমুরগির মতো গায়ে-গা লেপটে দাপাদাপি করে মরছে তার বালবাচ্চাবউ। টালির ছাদ ভেঙে জল পড়ে। ঘরের ভেতর ফুটো ছাদের তলায় জলের ফোঁটায় মাপজোক ঠিক রেখে বালতি-গামলা সাজিয়ে রাখতে হয়। বরং সে ভাবতে পারে, এখানেই, বাবুদের গ্যারেজ খুলে গাড়ির ভেতরই লম্বা হয়ে শুয়ে থেকে, অথবা চাই-কি দিব্যি একটা ঘুমে কাটিয়ে দেবে আস্ত দুপুর। একটা লুঙি নয়তো ছেঁড়াফাটা একটা ধুতি চেয়ে নেবে নন্দদার কাছ থেকে। নন্দদা বহুৎ আচ্ছা আদমি। প্রভুসূত্রে সহকর্মী দোস্তকে সে ইতিমধ্যেই খাটিয়ায় পাশাপাশি বসিয়ে খোসগল্পে খৈনি ধরিয়ে দিয়েছে বিলকুল।

তাকে দেখে মাতাজি ঢুকে গিয়েছিলেন ভেতরে। বেরিয়ে এলেন আরো ত্রস্ততায়। হাতে তিনটে পঞ্চাশ-টাকার নোট এবং ছোটবড় দুটো নাইলনের ব্যাগ—'সেই সকাল থেকে শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম। বৈজু এসে পড়লে হয় একবার। বাস, আর আমার ভাবনা নেই। কী করব বলো! নন্দকে তো কোথাও পাঠানো যায় না এই জলবৃষ্টির মধ্যে। বুড়ো মানুষ। তার ওপর একটু কিছু হলেই এমন কঁকিয়ে-কাঁকিয়ে বিছানায়

গিয়ে পড়বে, সে-আবার দিন দশেকেব ধাক্কা। কাউকেই আমার দরকার নেই বাপু। তুমি যখন আছো...'

আরো এক শীতার্ত মানুষ বৈজনাথ হাত বাড়ায় অসম্বিতে। অবোধ চোখের চাউনি নিঝুম।

কিরণময়ী বললেন—'আনাজপাতি যা ভালো বুঝবে, আনবে বুদ্ধি করে। ভালো করে বেশ দেখেশুনে বড় বড় সাইজেব বেগুন আনবে গোটা সাত-আট। ভাজা হবে। বেগুন-ভাজাব জন্যে যে-বকম দরকার আব-কি। হাঁস হোক মুরগি হোক, অবিশ্যি মুরগি হলেই ভালো, দু-ডজন ডিম আনবে। ইলিশ মাছেব খোঁজ নেবে প্রথম। না পেলে রুই। দেড কেজি দু-কেজি যা হয়, গোটা মাছ কিন্তু। পেটিফেটি একদম নয়। ওগুলো রং করে বাখে ওরা। খুব খারাপ...'.

'জি...' ফিরেই যাচ্ছিল বিবশ বৈজনাথ।

'হ্যাঁ শোনো...' আবার পিছুডাক—'আজ যা দিন চলছে, বলা তো যায় না কিছু। বড মাছটাছ না পাও, চিকেনই নিয়ে এসো কেজি দেড-দুই। ব্রয়লার-ফ্রয়লার নয়। কী-একটা ভোঁটকা গন্ধ। আমার ঘেন্না করে। বেছেটেছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ড্রেস করিযে আনবে। ঘবে বাডতি কিছু রেখে দেওযা ভালো। বলা তো যায় না। ওবেলাও যদি এবকম বৃষ্টিবাদলা থাকে!'

'জরুব মাইজি...' পিছু ফিরল বৈজনাথ।

এবং তখনও মেঘে মেঘে ধাক্কায় পাথর ভাঙছে আকাশ। কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘববাড়ি। কিংবা কাঁপুনিটা সকাল পেবিয়ে দুপুর-গড়ানো বেলায় ঘরের ভেতর বুকেব ঘবে আর আতঙ্ক তুলছে না তেমন। তাঁর নবনির্মিত সৌধেব মজবুত আর নিরাপদ দুর্গে, তাঁর নিজস্ব অন্তঃপুবে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত থাকতেই পারেন কিবণময়ী—এক বর্ষার জলেই ধুয়েমুছে যেতে পারে না জবরদস্ত সংসার তাঁব। ববং অনেক গোলমেলে ছিল আজ এক দুপুরেব সঙ্কট—গোটাকয়েক বেগুন আর খান দশ-বাবো ডিম।

বৈজনাথ চলে যাচ্ছে অনুগত পায়ে, নিঃশব্দে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়সের একজন মানুষ সাহেবেব চেয়ে দু-এক বছরের বড় বৈ ছোট নয়। এই মুহূর্তে পেছন থেকে লোকটাকে মনে হচ্ছে বুঝি কোনো বরফ দেশেব প্রাণী। ঘাড়গর্দানপিঠবুক মুছে নেবাব পবও উদোল গা ঠাণ্ডা ভেজা-ভেজা। ঢলঢলে বেঢপ পেন্টলুনেব চোঙা চুঁযে চুঁয়ে এখনও জল ঝবছে। সিঁড়ি-বারান্দা যেটুকু শুকনো ছিল, ভিজে যাচ্ছে। সে-তো হতেই পারে। বর্ষাব দিনে ভিজে যেতেই পারে ভেতব-বাইরে সবটাই। কিন্তু রাস্তার জলকাদায় মাখামাখি থ্যাবডা-থ্যাবড়া পায়েব ছাপগুলি লেপটে যাচ্ছে। ওপবে উঠে আসাব ছাপগুলো শুকোয় নি এখনও। নেমে যাবার ছাপ পড়ছে নতুন কবে। কী বিচ্ছিবি। এত কাদা কেন থাকবে শহরের রাস্তায়? জুতো নেই বৈজুর? বলাও যায় না কিছু। এমন বেখাপ্পা ভোগান্তির দিনে একজন বুড়ো মানুষকে এভাবে কষ্ট দিতে তাঁব নিজেবও ভালো লাগছে না খুব। কিবণময়ী ঘুরে দাঁড়ালেন। অনেক কাজ বাকি। সংসারের হাল ঠিক মত ধরে রাখতে চাইলে করতেই হয এমন ভালো-মন্দ অনেক কিছু। বাড়ির ড্রাইভার। খুব বিশ্বস্ত। খুবই বিশ্বস্ত। খুবই ভালো লোক বৈজনাথ। শুকনো দিনে রোদ্দুবে ঘুরতে হয় না রাস্তায়

রাস্তায়। গাড়ি চালায়। গাড়িতেই থাকে ছায়ায় ছায়ায়। গাড়ি বেরুবে না আজ। বরং আজ ওর ছুটি। বাজার থেকে ফিরলে গোটা দিনই পেয়ে যাবে ফাঁকা।

বরং এবার হৃষ্টতায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিতে পারেন তিনি নিজেও। নোংবা জলে ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ-শায়ায় আছেন অনেকক্ষণ। ঘিনঘিন করছে গা। কুচ্ছিত। জগৎজোড়া প্লাবনে যখন ভিজে যাচ্ছে ঘরবাড়ি পথঘাট দশদিক, নিভৃতে শাওয়ার ছেড়ে নিজেব জন্য ছোট করে অন্য এক বৃষ্টিপাত তৈরি কবে নিতে পারেন তাঁব একাব—প্রসন্ন অবগাহন সুখময় ঝর্নাধারায়।

এবং তাদৃশ ভাবনায় এগোলেন পায়ে পায়ে। চাবপাশেব অবিবাম বর্ষণধ্বনি আব গঙ্গাজলের রঙে ঘোলাটে সকাল। সংসারেব এখানে-ওখানে কে কোথায কী করছে, আপাতত সবই স্থগিত। পিঠে ছড়ানো এলোচুল বুকে টেনে এনে দু-হাতেব আঙুলে জট ছাড়াতে ছাড়াতে এবাব নিশ্চিতভাবেই স্নানঘরেব দিকে যাত্রা। ঘরদোব অলিন্দ ডিঙিযে এগোতে এগোতে একসময় সত্যি সত্যি বাথরুমে পৌঁছোনোর পর, যদিও দক্ষিণমুখী বড বড জানালায় আলোবাতাসের অবাধ প্রবেশ, আজ বাদলা দিনের ঘোলাটে বঙেব সকালে আলো জ্বাললেন। মেঝে তো বটেই, চারপাশের দেয়ালে প্রায সাত ফুট উঁচু আগাগোড়া শাদা পাথরেব শুভ্রতায পরিচ্ছন্ন স্নানাগাব এবং পার্শ্ববর্তী টযলেট তাঁব নিজস্ব পবিকল্পনা। বলা ভালো, তাঁব প্রাত্যহিকেব কর্মসূচিতে প্রভাতী স্নান, স্নানেব অনুষঙ্গে সাবান-প্রলেপ, তৎসহ নিয়মিত অঙ্গমার্জনায নিজের শুদ্ধিকরণ এক অতীব পবিত্র ক্রিয়া। বযসের ভার নেমেছে দেহে। তথাপি আজও, বাথরুমে নিজস্ব নিভৃতিতে দীর্ঘ সময ধবে নিজেকে স্নিগ্ধতায় ভিজিয়ে রাখাব এই কর্মকাণ্ডই একমাত্র বিলাসী অবসর তাঁর। আজ জলঝড়ের দিনেও কোনো ব্যত্যয ছিল-না।

কেশচর্চায় মেয়েদের মতো প্রায নিত্যি শ্যাম্পু, বিউটি-পার্লারেব হাজাবগণ্ডা ফ্যাশন তাঁব নেই। ওসব আব পোষায় না এ-বযসে। ববং সাবেকি নিযমে প্রতিদিন ঘষে ঘষে তেল মেখে নিয়ে স্নান, তাঁব আশৈশব অভ্যাস। নারীস্বভাবেই আজ একবাব আবশির মুখোমুখি প্রতিবিম্বে তাকালেন। এক সময বড ভালোবাসতেন নিজের চুলকে। সম্প্রতি রুপোলি ঝিকিমিকিও অনেক স্পষ্ট। হেযাব-ডাই স্টিক আলতো বুলিযে বয়স ঢেকে বাখতে হয। ছেলেমেয়েবা বড হচ্ছে। অথচ তাঁব নিজেবও এভাবে ফুবিযে-যাওয়া সইতে বড় কষ্ট। প্রায় প্রতিদিন শান্ত দুপুবে যখন শুযে থাকেন, শিযবে বসে দু-চাবটে কবে শাদা চুল তুলে দেয বাধা। আবাম থাকে নিশ্চযই। মাঝে মাঝে ঘুমও পেযে যায। কিন্তু বযসটা কামড়ে ধরে থাকে বুকের ভেতর। মধ্যবযস কাকে বলে, ঠিক জানেন না। চল্লিশ পেবোলে? না-কী পঞ্চাশের পব। পঞ্চাশ ছুঁতে এখনও তাঁব বছব তিনেক বাকি।

হঠাৎ নাড়া খেলেন। অত্যাবশ্যক বাধাকে ডাকবেন, ভাবলেন একবাব। মনে পড়ল, একতলায ওদেব স্নানের ঘবে নাইতে গেছে বাধা। রোজই ভোববেলা মুখধোয়া দাঁতমাজা প্রাতঃক্রিয়াদিব আগে স্নানের আযোজনে নিজেব শাড়ি-শায়া ব্লাউজ ব্রা সবই গুছিয়ে বাখেন ঘরে। সকাল থেকে সমস্ত লণ্ডভণ্ডেব সঙ্গে জড়িযে যাবার পব কিছুই হযনি যথানিয়মে। ভুলেই গিয়েছিলেন, কাপড়চোপড বাদ দিযেই ঢুকে পড়েছেন বাথরুমে।

নজরে পড়ল। ওই এক মেয়ে! আশ্চর্য! কিছুই ভুল হয় না ওর। এরই মধ্যে কখন পাট করে হ্যাঙারে সাজিয়ে রেখে গেছে তাঁর আলাদা তোয়ালেসহ স্নানবস্ত্র সবই। প্রসন্নতায় যেন নিজের প্রতি এক প্রকার প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতা। এখনও মনে হয়, এই তো সেদিন ছেঁড়া একটা জাঙিয়া আর তেলচিটচিটে হতকুচ্ছিত ফ্রক পরে সোজাসুজি গ্রাম থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। সারা গায়ে ভোঁটকা গন্ধ ছিল। সব গরিব ঘরের মেয়েদের গায়েই থাকে যে-গন্ধটা। তারপর এত এত বছর ধরে নিজের মতো করে ঘষেমেজে তৈরি করেছেন ওকে। কাজকম্মো শিখিয়েছেন, রান্নাবান্না শিখিয়েছেন হরেক রকম। সেই একরত্তি বয়স্ থেকে দাদা-দিদিদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বড় হয়ে উঠেছে বোনের মতো। অথচ আজ রাধাকে বাদ দিয়ে অপরিহার্যতায় তিনি নিজেও ভাবতে পারেন না নিজেব সংসাব।

স্নানঘরে দেয়ালের খাঁজে থবে থরে সাজানো শ্যাম্পু-সাবান-হেয়ার ক্রিম বিবিধ প্রকার স্নান-বিষয়ক প্রসাধন সামগ্রী। তাঁর নিজের প্রয়োজনে সুগন্ধি কেশতেলের শিশিটাও ছিল। কিন্তু সেটা অবান্তর। প্রতিদিনই রাতে শোবার আগে মাথায় তেল ঘষে বাতভর নিদ্রা। এভাবেই তৈলাক্তকবণে বা শুশ্রূষায় চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল বাঁচে—এমত রমণীবিশ্বাসে পরদিন প্রভাতী স্নান। জলে জলে হাঁটাচলায় আজ গা ভরে একটা অস্বস্তি ছিল। শ্যাম্পুব শিশিটা টেনে নিলেন। ছিপি খুলে বাঁহাতের তেলোয় বাটি বানিয়ে খানিকটা ঢেলে নিয়ে দু-হাতের পাতায় মাখোমাখো করে একেবারে ব্রহ্মতালুতে প্রাথমিক প্রলেপ। দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো একটু হাতের আঁজলায় ঢেলে নিয়ে বুকের ওপর টেনে-আনা কেশগুচ্ছে পাঁচ আঙুলে, অনেকটাই চিরুনির ঢঙে, আদর বুলোতে বুলোতে ছোটখাটো জট ছাড়িয়ে, প্রতিটি কেশচূর্ণকে তৈলসিক্ত করার দীর্ঘ সময়ে সংসারের নানা ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন কিছুটা। কিন্তু এভাবে সময়ের অপচয়, বিশেষত আজ, নিজেরই অশেষ ক্ষতি। সতর্ক হতেই সর্বত্র এলোকেশে জল ঢালার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন মাত্র। হাতও বাড়িয়েছিলেন শাওয়ারের দিকে। ছেলেমেয়েদের দূরাগত দামাল হুল্লোড় শুনলেন। একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে ওদেব চিৎকাব বা হুড়োহুড়িটা এতই তীব্র, ওদেব তিন ভাইবোনের হল্লায মনে হয়, বুঝি প্রায় ত্রিশজনের চিৎকার। সুতরাং রইল পড়ে স্নান। মাথার বইল চটচটে শ্যাম্পুব তেল। আরো বিচ্ছিবি। বেসিনের কল খুলে হাত দুটো ধুয়ে নিলেন দ্রুত। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ছুটে বেরিয়ে এলেন। অশান্ত ক্রোধে জ্বলছে হাড়মজ্জা।

ঘরে নয়, খোলামেলা লাউঞ্জেই এবার হট্টগোল ওদের। তাঁর দমকা প্রবেশে 'মা...আ...আ...' তীক্ষ্ণ চিৎকার শ্রবণে যুবক-যুবতীদের উদ্দাম খুশির কেন্দ্রে পৌঁছে কিরণময়ী থমকে দাঁড়ালেন।

কলহও হয়ে উঠতে পারে এক প্রকার কৌতুকের খেলা। দেয়ালের ধার ঘেঁষে খাটো টেবিলে শায়িত ছিল নতুন ধরনের পুশ-বটম টেলিফোন। পাশের ঢাউশ টেলিফোন গাইড বইটা খোলা পড়ে আছে। কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে বুলবুলি। মুনমুন দেবে না। কেড়ে নিতে চাইছে টেলিফোন। বুলবুলিও দখল ছাড়ছে না। ওদের কাড়াকাড়িতে তারফার ছিঁড়ে গিয়ে এক্ষুনি যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

নতুন ধরনের টেলিফোন। অনেক বেশি দামি। বোধহয় পাওয়াও যায় না এদেশে। আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছিল সুমি আর আশিস। কর্ডলেস টেলিফোন আরো একটা। সেটা ওদের বাবার ঘরে। শুধুমাত্র তাঁরই ব্যবহারের জন্য।

ছুটে গিয়ে দুই মেয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কিরণময়ী। ধমকে উঠলেন—'কী, করছিস তোরা? আমাকে সত্যি তোরা পাগল করে ছাড়বি? এর চেয়ে তোদেব স্কুলকলেজ থাকা ভালো। অনেক শান্তি।'

'দেখো, দেখো মা, বুলবুলি কী করছে।' মুনমুন তাকাল মায়ের দিকে—'আফটার অল আওয়ার ফাদাব ইজ এ বেস্‌পেকটেবল ম্যান...'

ভ্রূ কুঁচকে ছোট মেয়েব দিকে তাকালেন কিরণময়ী—'কেন, কী হয়েছে? কাকে টেলিফোন করতে চাইছিস তুই?'

'চিফ মিনিস্টারকে...' ওদিকে থেকে বাবন হাসতে হাসতে, হাসির গমকে—'চিফ মিনিস্টারকে জিজ্ঞেস কববে হোয়াই সো মাচ শাওযাব? কত লাখ লাখ লোকেব ট্রাবল বাডছে এতে। কত বস্তিটস্তি ভেঙে যাচ্ছে, হাঁটু অব্দি জল ঢুকে যাচ্ছে ওদেব ঘবেব ভেতব। মরেও যাচ্ছে কত...'

বুলবুলি হঠাৎ সুযোগ পেয়ে সোল্লাসে, হাততালিতে—'দেখো মা, দাদা কিন্তু কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। হি স্পিক্‌স্ অব স্লাম ডুয়েলার্স...'

'মানে? বস্তি ভেসে যাচ্ছে তো তোদেব কী?' কিবণমযী ঝাঝিয়ে উঠলেন। জোব কবেই ছিনিয়ে নিযেছেন টেলিফোনটা। বাখলেন যথাস্থানে। কী সর্বনাশ। মস্ত ভাবি টেলিফোন গাইড খুঁজে খুঁজে সত্যি মুখ্যমন্ত্রীর টেলিফোন-নম্বব বেবও করে ফেলেছে নাকি? বন্ধ কবলেন। রাখলেন সেন্টার-টেবিলের তলায। এবং ক্রোধেব বিস্ফোবণে—'সব কিছুতেই ইযার্কি তোদেব? কখন কোথায কী যে কবে বসবি তোরা। আব তাই জন্যে যদি তোদের বাপিকে কোনো বিচ্ছিবি গোলমালে পডতে হয?'

'সো হোযাট?' সাহেবি কাযদায় কাঁধ ঝাকিযে খুবই সহজ ভঙ্গিতে বুলবুলি—'দিস ইজ সিম্পলি অ্যান্ অনেস্ট কোশ্চেন।'

'বৃষ্টি পডছে তো চিফ মিনিস্টার কী কববেন?'

'হি ক্যান স্টপ ইট। অ্যাট লিস্ট হি স্যুড ট্রাই ওযন্স...'

বাষ্ট্রীয প্রশাসন যেমন, সংসার-নিয়ন্ত্রণও এক জটিল প্রক্রিযা। বেযাদপ প্রজাপুঞ্জ। ভরাট দুই কিশোবী বা যুবতী কন্যা এবং ব্যাকরণমতে অবশ্যই সাবালক পুত্রের উচ্ছল বিলাপেব হট্টগোলে কিবণমযী দিশেহারাই কিছুটা। অতর্কিতেই মুক্তি পেলেন। বলা বাহুল্য—বাধা।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, দু-হাত উঁচিয়ে বড একটা ট্রে বুকেব কাছে লম্বিত বেখে সন্তর্পণে ঢুকছে রাধা। চোখের গোল-গোল গুলতিদুটো অপলক স্থির থাকে খাদ্যসামগ্রীর ওপর। তিন-তিনটে প্লেটের আয়তনে ট্রে-টাকেও অবশ্যই আনুপাতিক বৃহৎ হতে হয। অধিকন্তর সাবধানী হবার হেতু—তিনটে বড প্লেটে চাউচাউ ছাড়াও তিনজনের জন্য তিনটে কাচের গ্লাশে জল ছিল। সস বা নুন-মরিচগুঁড়োর আনুষঙ্গিক শিশি-কৌটো সবই

ছিল ব্যালেন্সের দোলাচলে। বিশেষত দাদাবাবুর প্লেটে আহার্যবস্তুর পরিমাণ অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবে দেড়জনের সমান। জোয়ানমরদ বয়স। ভোজনবিলাসী জিভ।

রাধার প্রবেশে হুবরে রবে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল বাবন।

'কী করছিস? অসভ্যতা করছিস কেন ছোটলোকের মতো? তোদেরই তো জিনিস। তোরাই খাবি...' ধমকে উঠলেন কিরণময়ী। অথচ বাঁ-পাশে রাধার দিকে তাকিয়ে তিনি নিশ্চিতই খুশি—'কী রে, এরই মধ্যে স্নান সেরে জলখাবারও হয়ে গেল তোর? দ্যাখ দেখি, কী লক্ষ্মী মেয়ে! কিন্তু তুই এগুলো এখানে নিয়ে এলি কেন? খাবার-টেবিলে ডাকলেই তো পারতিস। এখন দ্যাখ দেখি, কী বিচ্ছিরিভাবে হৈ-হল্লা করে খাবে। ঘরদোর নোংবা হবে।'

নিখুঁত কৌশলে টেবিলেব ওপব ট্রে নামিযে খাবারদাবারগুলো যথাযথ সাজিয়ে এক-বুক স্বস্তিতে সোজা হযে দাঁড়িযেছিল বাধা। নিজেব খুশিতে—'খাক না গ মা। ধীবেসুস্থে শান্তি করে খাক সবাই। নোংরা হয়, সে-আমি সাফ করে দেব।'

ট্রে-টা টেবিলে পড়েও নি ঠিকঠাক, নিজের প্লেটটা ছোঁ মেবে তুলে নিযেছিল বাবন। বেশ ধোঁযা উঠছে তখনও। অসম্ভব গবম। প্রথমই হালুমহুলুম দু-তিন চামচ মুখে পুরে এবং বেকায়দায় গালজিভ সামলাতে সামলাতে—'না বে, বেশ করেছিস। এখানেই ভালো। এখানে সোফায় বসে খাব আব ভি.সি.আব.-এ নতুন বই দেখব। ভাগ্যিস কাল সন্ধেবেলা নিয়ে এসেছিলাম দুটো ক্যাসেট।'

নিজের প্লেট নিযে আরেক পাশে সোফায় বসেছে বুলবুলি। উচ্চকিত হলো—'গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড আইডিয়া। কী বই? কী বই রে দাদা?'

সহসা মুষড়ে পড়ল রাধা। করুণভাবে তাকায় মায়ের দিকে।

আরো একবাব তিরিক্ষি মেজাজে খেপে উঠলেন কিবণময়ী—'খবরদাব! এই দিনদুপুরে সময় নেই, অসময় নেই, ঘরে বসে এখন ওসব চালাবি তো খুব খারাপ হবে কিন্তু! ও-ছাই আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব তোদেব ক্যাসেটফ্যাসেট। কেন, আর কোনো কাজ নেই তোদেব? লেখাপড়া না কববি, খেয়েদেয়ে নিজেদেব ঘবে গিযে যা-খুশি তাই কব।'

নিজের প্লেট নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মুনমুন।

'কোথায যাচ্ছিস?' কিরণমযী ফিবে তাকালেন।

'ঘরে।'

মায়েব খিঁচুনি বা মুনমুনের চলে যাওয়ার পরও বুলবুলিব দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বাবনের হাসি এবং গোগ্রাসে গেলা। বুলবুলিব চতুব চাউনিতেই স্পষ্ট হয়, সে দাদার সহচরী।

উত্তেজনায় অস্থিব কিবণময়ী। ডাকলেন বাধাকে—'তুই আয়, আয় দেখি এদিকে। আয় আমাব সঙ্গে....'

কোন্ এক অপ্রত্যক্ষ টানে হঠাৎ-ই মুখচোখের বিবর্ণ ছায়ায় বদলে যায় বাধা। মুখ বুজে গোগ্রাসে গিলছে বাবন আর বুলবুলি। খানিকটা চুপচাপ। চিনেমাটির প্লেটে টুংটাং চামচের শব্দ, বাইরে বিমঝিম বর্ষণধ্বনি। চারপাশের ঘর দিয়ে দীর্ঘ একটা চতুষ্কোণ।

ঘর হয়েও ঘর থাকে না। ছায়াচ্ছন্ন লিভিংরুমের একপাশে নীল জলে অ্যাকুরিয়মের মাছ, ইতস্তত সাজানো পেতলের টবে রবারেব গাছ, অদ্ভুত একটা ক্যাকটাস, মোজায়েকের মেঝেয় রঙিন নকশা বা চারদিক থেকে গাঢ় পীতবর্ণ দেয়ালের ঘেরাটোপে দূরবর্তী প্রান্তে ঢাকনা-ঢাকা টিভি বা ভি.সি.আব. সংসারের আর-পাঁচটা বিলাসসামগ্রীর মতোই শান্ত বোবা আপাতত। বাঘার মতো চাবপেয়ে জানোয়ার নয়, মানুষও নয় ঠিকঠিক। অথচ দেশদুনিয়াব সব রকমের মস্ত মস্ত মানুষ, কত নগরবন্দব, আজব সব কাণ্ডকাবখানা মেঘের ছায়ায় ভেসে যায় পর্দায়। তিনতলায় মায়ের ঠাকুর-ঘরে যাঁর পায়ে মুঠো মুঠো ফুলচন্দন তুলসীপাতা ঢেলেও মুখের বাক্যি শোনা যায না কোনোকালে, অথচ তাঁরই আদলে পুজোব আসনে বসে বিগ্রহদেবতার কত সুন্দর সুন্দব কথা, কত সদুপদেশ। বিশ্বরূপ চিনিযে দেবাব কথকঠাকুর। এ-এক আজব যন্ত্র। যন্ত্র নয, এ-বাড়িতে একমাত্র সচল অস্তিত্ব। একবাব সুইচ টিপলেই কত বং কত খেলা, নাচগান নাটক সিনেমা দেশবিদেশের কত ছবি, কত যাদু, বাংলা-খবব ইংরেজি-খবর, বড বড় নেতাদের মুখ। চোখেব পাতায় পলক পডবে না। ঠায বসে থাকা যায় ঘণ্টাব পর ঘণ্টা। রাধা অনাযাসে সব ভুলে যেতে পারে, যদি টিভি চলে, ভি.সি.আব. চলে সকাল-সন্ধে, গোটা বাত্তিব!

মাধ্যাকর্ষণ ছিঁড়ে উপগ্রহকে বিচ্ছিন্ন কবে নেবাব মতোই কোনো দুরূহ কর্ম, জেনেই, চোখের ইশারায় রাধাকে আবার ডাকলেন কিরণময়ী—'কী হলো তোর? ঠ্যাটা মেবে দাঁড়িয়ে বইলি যে বড়? আয, শোন এদিকে....'

বাধাকে এগোতেই হয। মায়ের হুকুম। সে জানে, মায়ের সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটাই তার বিধিবিধান। একবাব সে নিঃশব্দে তাকাল দাদাবাবু-দিদিমণির সতৃপ্ত আহাবেব দিকে, আবেকবাব ডানদিকে এই মুহূর্তের যন্ত্রটা—ভি.সি.আর.। মধ্যবর্তী টানে, দূবে, মায়েব ইশাবা।

এবং বাইরে এসে কিরণমযী তাঁব শ্যাম্পু মাখা চটচটে চুলে আঙুলের চিরুনি বুলোতে বুলোতে, স্নেহে আর্দ্রতায়—'ওবা যা কবে করুক। ও-ছাই ওদের বইফই কী আমি দেখছি? এখন আমাদের বসে থাকলে চলে? বল না। তুই যা দেখি মা, মুনমুন আব বাবনের ঘবে বিছানাপাটি তুলে ফ্যাল। গোপালের-মাকে দিয়ে তো কিছু হবে না। বৈজু বাজার থেকে ফিরুক। মাথায় শ্যাম্পু ঢেলে ঘুবে বেড়াচ্ছি তখন থেকে। স্নানটা পর্যন্ত কবতে দিলো না নচ্ছাবগুলো। আমি স্নান সেবে ঠাকুরের-আসন দিয়ে আসি। ওদিকে বান্নার দিকটা না-হয আমিই দেখব। এবপবও তো অনেক কাজ পডে আছে তোর। ববিব-মা এল না। ও আব আসবেও না। কাল বাতেব এঁটো বাসনগুলো পডে আছে। কারুবই স্নান হয়নি এখনও। অনেক কাচাকাচি। ঘরে ঝাঁট পড়ল না এত বেলা অব্দি....'

অষ্টাদশী যুবতীব মুখচোখেব পূর্ণ অবযবে মেঘলা দিনের রং পাল্টায না। গৃহকর্ত্রী কিরণময়ী, যিনি মা—ভিন্ন অর্থে অনেক বড় মা হয়ে উঠেছেন অনেক বছরের লালিত অভ্যাসে, তাঁবই নির্দেশে এগোয় বাধা। দুটো পা মন্থর হয়ে আসে। তবু এগোতেই হয় তাকে। এগোতেই হবে। কেন না, সংসার এক গতিময় কর্মপ্রবাহ। আকাশে সূর্য দৃশ্যমান না হোক, মেঘলা ভোরের অলক্ষ্যেও সূর্যোদয় থাকে। দ্বিপ্রহর হাঁটে। এক

বর্ষার জলে থেমে যেতে পারে না সাহেববাড়ির সচল সংসার। থামতে পারে না সংসারের 'কাজের-মেয়ে'। মূর্খ নিতান্তই। অভিমানে নির্বোধ। এই কাজের জন্যেই না সে কলকাতা পেয়েছিল একদিন। অথবা পানাপুকর ঝোপজঙ্গলের ওঁছা গ্রাম থেকে তুলে এনে এই কলকাতা শহরই কাজ দিয়েছিল তাকে।

মাথার চুলে এক আঁজলা শ্যাম্পু ঢেলে এবং এখনও জল ঢালতে না-পারার অস্বস্তিতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন কিরণময়ী। ছিটকে সরে যাবার মুহূর্তে আরো একবার ফিরে তাকালেন—'নে নে, আর ঢঙ করিস না বেশি। টিভিতে রোজই তো হাজারগণ্ডা কত বই দেখছিস তুই! সিরিয়াল-ফিরিয়াল কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ক্যাসেটফ্যাসেট এলে ওদের সঙ্গে কোন্‌টাতে থাকিস না শুনি! এখন কি ওসব দেখার সময়? ঘরের মেয়ে তুই। তোকেই তো করতে হবে সব। নে, হাতে-হাতে টুকটুক করে তুলে ফ্যাল কাজগুলো। স্নান সেবে আমিও আসছি এক্ষুনি.....'

এবং তখনই, ওষ্ঠাধরে খিল-তোলা নিরুচ্চারে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধটা। জানে না কেউ কিংবা সবাই জানে, এক প্রভাতের ঝড়বাদলে প্রতিদিনের একদিন এভাবেই আচমকা ওলটপালট হয়ে গেলে 'কাজের-মেয়ে' আর 'ঘরের-মেয়ে'—অনেক, অনেক বছরের সোহাগে-আদরে গড়ে-তোলা দুটো সুতোর শক্ত গেরো হঠাৎ-ই কেমন শিথিল হয়ে যেতে থাকে। 'ঘরের-মেয়েবা' ঘব পেয়ে যায়—লম্বা ছুটির ঘব। 'কাজের-মেয়ে' খোলামেলা একটু দম নেবাব, জিরোবার ফুরসত পায় না। ঘরের কাজ, অঢেল কাজ।

বেলা বয়ে যায়
অলস মন্থর দিন

এরপর ত্রিভুজে ত্রিকোণে ভাগ হয়ে যায় ঘরসংসার।

বর্ষার কালোমেঘ বাইরে থেকে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতব। অভিমানে-ক্ষোভে নিঃশব্দে কাজে ফিরে আসে রাধা। মুনমুনের ঘরেই প্রথম প্রবেশ। পড়ার টেবিলে বসে ঘাড নিচু করে কী লিখছিল মুনমুন। রাধা বলল না কিছু। এগোল চুপচাপ। গত রাতের পরিত্যক্ত শয্যা অগোছালো পড়ে আছে সকাল থেকে। পরিপাটি করে গুছিয়ে দিতে হবে।

বাইরে থিতিয়ে এসেছে বৃষ্টিধাবা। নিঃশব্দে ফুবিয়ে আসছে মেঘলা আকাশ। শ্যাম্পু শুকিয়ে গিয়ে বিচ্ছিরিভাবে চটচট করছে মাথার চুলে। শাওয়ার খুলে দিলে ঝর্নাধারায় নির্মল অবগাহন। দামি সুগন্ধী সাবানের ফেনায় ফেনায় দেহেমনে অপার শুদ্ধি। সর্বাঙ্গদাহে কিছুটা স্বস্তি গৃহকর্ত্রী কিরণময়ীর।

ছোটয়-বড়য, রঙিন বা শাদা-কালোয়, বাড়িতে দুটি টিভি সেট। পোর্টেবল শাদা-কালো তিনতলায় বাবনের ঘরে। তার একার মালিকানায়। ভি. সি. আর.-সহ রঙিন টেলিভিশন দোতলার লাউঞ্জে পারিবারিক। প্রয়োজনের তাগিদেই লিভিংরুমের বিশাল চত্বরকে সাতিশয় যত্নে সাজানো হয়েছে নানাবিধ রঙে রঙে আসবাবে অতি মনোহর

এক এন্‌টারটেনমেন্ট চেম্বারে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে বিশেষ তত্ত্বাবধানে নির্মিত একটানা অতি দীর্ঘ সোফাসেট। শুয়ে-বসে গা এলিয়ে অন্যূন দশ-বারোজন অনায়াসেই উপভোগ করতে পারে দূরবর্তী ভি. সি. আর. বা টিভির মোহিনীমায়া। যেহেতু প্রাসাদের অন্তঃপুর নিভৃত এক স্থান, বহিরাগত কোনো অবাঞ্ছিত ধ্বনির প্রবেশছিদ্র নেই। সোফাসারির সামনেই সমদূরত্ব মেপে তিনটি কাচ-ঢাকা সেন্টার টেবিল। শৌখিন ফ্লাওয়ার-ভাস, অ্যাশট্রে, রঙের বিস্ফোরণে পাতায় পাতায চমকানো ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ গোটাকয়েক ইংরেজি বাংলা সাময়িকপত্র। বিষয়গতভাবে খেলা নারী ফিলম্ বা বাণিজ্যজগৎ।

ক্রীড়া বিষয়ে এই মুহূর্তে বাবনের কোন উৎসাহ ছিল না। এমন কি, অফসেট ফটোপ্রিন্টের বঙিন মুদ্রণে বমণীদেহেও অরুচি আপাতত। মাতৃআজ্ঞা মানেনি। পবিচিত ভিডিও সেন্টার থেকে সে দু'টি ক্যাসেট নিয়ে এসেছিল কাল সন্ধেবেলা। দুটোই, বলা নিষ্প্রয়োজন, হিন্দি। এবং আনকোবা নতুন। এখনও কলকাতায় মুক্তি পায়নি যে-ছবি, সেগুলোই এখন তারা ভাইবোনে দেখে নিতে পারে ঘবে বসে আরামে। এবং অবশ্যই গোপনে।

চাউচাউ শেষ। ভোরে ঘুমভাঙাব পর রীতিমাফিক এক কাপ চায়ের পর অসময়ে চা বা কফিব বাডতি তাগিদ নেই বলেই হয়তো এখনও তিন ভাইবোন অপ্রাপ্তবয়সী। কিন্তু প্রাপ্তবয়সের মর্যাদা আদায়ের তীব্রতায় নিশ্চিতই বাবনের হাতে সিগাবেট। বাবা দিল্লী, মা বাথরুমে। আপাতত সে প্রকাশ্য স্থানেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বুঁদ হয়ে থাকতেই পারে কিছুক্ষণ। অদূরে দৃষ্টির নাগালে সুপারস্টার হট ব্লো-আপ। দারুণ বই। এগোচ্ছে গল্প—অতি তুচ্ছ এক ট্যাক্‌সি-ড্রাইভারের প্রেমে পড়ে গেছে কলেজ ছাত্রী ধনীর দুলালী। মহব্বৎ কি কসম, সে বেইমানি জানে না। বাপ-মায়ের সরাসরি মদতে দ্বিতীয় পাণিপ্রার্থী বিলেতফেবত ইঞ্জিনিয়ার সহসা ভিলেন হয়ে গেল। দলবল নিয়ে পেশীর জোরে নায়িকাকে অপহরণ চেষ্টা। ট্যাক্‌সি-ড্রাইভাব নিজেও জানে অন্ধকাবেব জগৎ। সুতবাং অচিরেই বোমাবন্দুক গোলাগুলি, মোটববাইকের বেস। তৎসহ নাচগান হোটেল ক্যাবারে..........

দাদার পাশে বসে বুলবুলি গোগ্রাসে গিলছিল গপ্‌পো। মগ্নতায অপলক কচিকাঁচা একজোড়া চোখ। এমন তো হয়। হতেই পারে।

একটু চড়া ভল্যুমেই বাঁধা ছিল ভি. সি.আব.। ভ্যাসভ্যাসে একটা আওয়াজ গোটা বাড়িতে চারিযে যেতে থাকে। উচাটন মন রাধার। ব্যাকুল হৃদয়। কান্না পায় তার। কিন্তু কাঁদে না। দাঁতে ঠোঁট চেপে থাকে। দূব থেকে সংলাপগুলো খুব স্পষ্টভাবে বোঝা না যাক, শুধুমাত্র গলার স্বরেই সে চিনে নিতে পারে অনেক দিনের জানাশোনা সুপারস্টার নায়ক-নায়িকাদের মুখ। 'বই'টা নতুন অথবা পুরনো, সে জানে না। যদি নতুন 'বই' হয়, ঘরে থেকেও এত ভালো একটা 'বই' না-দেখার আপশোস তার জীবনে ঘুচবে না।

সুতবাং বুকেব মধ্যে হাহাকার থাকে। সব হাবাবার বেদনায় নিরলস কাজ করে যেতে হয় তাকে। দোতলায় তিনতলায় ঘুরে ঘুরে ঘরদোর গোছানোর দায়। সাহেব বাড়ি নেই। মায়ের ঘরে দুটি সিঙ্গল-বেড খাটের একটি খালি পড়ে আছে আজ প্রায়

চারপাঁচ দিন। কিন্তু মা-র বিছানার চাদর, বেডকভার, শিয়রের বালিশ পাশবালিশের ওয়াড় পাল্টাতে হলে সব কিছুই পাল্টাতে হবে দুটো বিছানারই। নইলে রঙে মিলবে না। হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে পড়লে, ছি ছি.........ভাববেন কী সবাই? দুই দিদিমণির ঘর গোছগাছে সাজিয়ে দেবার পর তিনতলায় দাদুবাবুর ঘর লণ্ডভণ্ড। একা একটা ঘরে থাকে মানুষটা। কী যে হুটিপাটি দাপাদাপি করে দিন-রাত! কোথাও কোনো ছিরিছাঁদ নেই। পড়ার টেবিলে মোটা মোটা বই আর খাতাপত্তরের পাহাড়। নিজের বই নিজেই খুঁজে পায় না দরকার মতো। মাস্টারমশাইরা এলে হাঁকাহাঁকিতে চেঁচায়। সবই নাকি বাধুর দোষ। রাধা ওসব ছোঁয়ও না কস্মিনকালে। ঘর জুড়ে বিচ্ছিরি সব কাণ্ড। ছোট একটা টিভি, অনেক দামী একটা টেপ-রেকর্ডার ওপাশের বড় টেবিলে। পাশে কয়েক শো ক্যাসেট। ওয়ারড্রোব, বইয়ের আলমারি, জানালা-দরজার কাচে কত রকমের যে স্টিকাব! সবই ইংরেজিতে লেখা। লেখা পডতে জানে না রাধা। ছবিগুলো বোঝে। একা এঘবে ঢুকলে বুকেব ভেতব কেমন একটা ছমছম। নিষিদ্ধ ছবিগুলো ঘুরেফিরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সাধ হয়। এবং ভয! ছিঃ ছিঃ, একে পড়ালেখা শেখা বলে? মা দেখেন না এগুলো? দিদিমণিবা?

দেয়ালের গায়ে বড বড ক্রিকেট-প্লেয়ার ফিল্মস্টারদের রঙিন ছবি সেলোটেপে আঁটা। ওগুলোয় দোষ নেই। এমন ছবি রাধা নিজেও চেয়ে নিয়েছে অনেকগুলো। ছোটভাই পালানকে দিয়ে এসেছে গাঁয়ে। গাঁয়ের বড় ইশকুলে সাত ক্লাশে পড়ে পালান। ছবিগুলো আঠা দিয়ে সেঁটে বেখেছে মেটেঘরের দেয়ালে।

দাদাবাবুর বিছানা তুলতে গিয়ে বালিশের তলায় দুটো একশো-টাকার নোট পেল সে। আরো তিনটে দশ-টাকার নোট, একটা পাঁচ-টাকার। প্রায়ই থাকে এ-রকম। টাকাগুলো পডার টেবিলে বই চাপা দিয়ে রেখে যথানিয়মে সে বিছানা সাজাতে থাকে। নিত্যি চাদর পাল্টাতে হয় ওঁদের। চাদরের রঙে বঙ মিলিয়ে বালিশ, পাশবালিশের খোল। বেডকভার আলাদা নক্‌শায়। আলমারিতে সেট করে রাখা বিছানা সাজানোর জিনিসপত্তর! কত রঙ, কত ডিজাইন! ভাঁজভাঙা চাদর পেতে শক্ত কাঠির ঝাঁটায় চারপাশ টানটান করে বেডকভারে ঢেকে দিতে হবে গোটা বিছানা। হামা দিয়ে দিয়ে তাকে গোছাল দিতে হবে চাবদিক। কোথাও একটু কুঁচকে থাকা চলবে না। মায়ের নজব বড ত্যাড়া। মায়ের চেয়ে তাঁব ছেলের বায়নাক্কা হম্বিতম্বি দশগুণ বেশি।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে বোদের ঝিলিক। মেঘ ফুরোলে রোদের রঙ যেমন ফ্যাকাসে, হয়তো তেমনি কোনো ন্যাবাটে রঙে বিবর্ণ ছিল রাধার মুখভার। তিনতলার কাজ সেবে দোতলায় নেমে এসেছিল সে। খোলামেলা লাউঞ্জ পেরিয়েই যেহেতু যেতে হবে তাকে, এগোবার পথে নিতান্তই অভ্যাসে একবাব সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এবং দাঁড়াতেই, চকিতে, রক্তস্রোতে একটা অসহ্য মোচড়ানি—কটকটে রাগ অথবা অভিমান জানা নেই, সত্যি সত্যি একটা কান্না উগবে উঠতে চাইছিল ভেতর থেকে। এপাশে দাদা আর বোনের পাশে মুন্নিদিদিও এসে বসে গেছেন কখন! ওদিকের পর্দায় তার অনেক কালের চেনা, জগৎজোড়া সব মানুষের চোখের মণি—সেই নায়ক-নায়িকা। একটা ট্যাক্সির ভেতর ড্রাইভারেব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নায়িকা। কান্নায় ভাসছে...

আগেপিছে কিছুই জানে না রাধা। এক ঝলক তাকাতেই ঝাঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা। তাকাবে না। কিছুতেই না। অতি দ্রুত পা ফেলে সক্ষোভ প্রস্থান তার।

পেছন থেকে বাবনের উদ্দাম গলার স্বর—'এই রাধু শোন্, শোন্ এদিকে শুনে যা...'

সত্যি-সত্যি রাধা থামল না। তাকায় না পেছন ফিরে।

'বেলমুড়ি, অ্যাই বেলমুড়ি.....ধ্যাৎ, শোন্ না একটু....' লাফ মেরে উঠে এসেছেন দাদাবাবু। দিদিমণিদেব কলকল হাসিও শোনা যায়—'ক্যাসেটটা গোটা দিন থাকবে বে। আবাব দুপুরবেলা দেখব আমরা। তুইও দেখবি। তিন কাপ কফি করে নিয়ে আয় দেখি এখন। দুধচিনি বেশি কবে দিবি।'

রাধা অভিমানে আরো ক্ষিপ্রতব। শারীবতত্ত্বেব প্রাকৃতিক বিধানেই একটা আগ্নেয় ক্রোধ এবার তার সর্বাঙ্গীণ ত্বকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নিজেদের ঘরে বসে বসিযে বসিযে নতুন 'বই' দেখছে ওবা! দেখুক না যত খুশি। ওদের ঘর, ওদেব ভি. সি. আর, ওরা দেখবে, কার কী বলাব আছে? কিন্তু তাই বলে এমন কবে দেশগাঁয়েব নাম তুলে তাকে খ্যাপাবে কেন সবাই?

বেলমুড়ি। হুগলি জেলার অন্তর্গত হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে একটি গ্রামেব নাম। সন্নিহিত বেল স্টেশনেব বোর্ডে, বেলগাডির টিকিটে, সেটেলমেন্টের খাতায়, পোস্টাপিশের সীলমোহরে, বড ইসকুল বা পঞ্চায়েতেব নামে সর্বত্রই যথানির্দিষ্ট বেলমুড়ি বহাল থাকলেও, সমগ্র হুগলি জেলা তথা বহিবাঞ্চলেও একটি সুপ্রাচীন সংস্কার—ওই নামেব উচ্চারণ, এমন কি শ্রবণেও মানুষের অশেষ দুর্গতি—দিনেব ভাত জুটবে না কারুব। লোকজীবনে স্থানটির প্রচলিত বিকল্প নাম—মাঝেব-গ্রাম। রাধার সংকট, সেখানেই তাব দেশ। মাঝের-গ্রাম টিকিট কেটে তাকে বেলমুড়ি স্টেশনে নামতে হয়। স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে অথবা বাসে চেপে গেলে তার নিজের গ্রাম—দাঁড়গাছি।

ছোট বয়সে, এ-বাড়িতে বাধাব প্রথম প্রবেশের দিন থেকে প্রায় সমবয়সী দাদাবাবু-দিদিমণিদেব কাছে ব্যাপারটা একটা মজা হয়ে দাঁড়াল। দারুণ মজা। বাধা তার নিজের দেশগাঁযের কথা শুনতে নাবাজ। ভাত জুটবে না তাব। সে যতই খেপে যায়, ভাতের থালা নিয়ে বসলেই ওরা তিন ভাইবোন ঘাড়ের ওপর চেপে কানের কাছে চেঁচাত—'বেলমুড়ি বেলমুড়ি'। শেষ পর্যন্ত শ্রুতিদূষণ সেই ব্রাত্য নামই হয়ে দাঁড়ায় বাধার আরো একটি নাম, কিংবা তাকে খ্যাপাবার জন্য ওদের এক ভীষণ অস্ত্র। বাধাও খেপে যায়। একদিন যা ছিল ছেলেখেলা, আজ এত এত বছরের নিযত অভ্যাসে রাধাব জীবনে এ-এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

বিশেষত আজ, যখন সে জ্বলছে নিজের দহনে, দাদাবাবু-দিদিমণিদেব পিছু-লাগা, ওদের হাসাহাসি তাকে জলবিচুটিতে পোড়ায়। কিন্তু প্রতিরোধের শক্তি নেই। সে তো আর পডালেখা জানে না ওদের মতো। নিজের কাজ জানে। কান্নাকে বুকে নিযে চলে আসে তার নিজের আশ্রয়ে। মায়ের কাছে। রান্নাঘরে।

ঠাকুরঘরে পুজো সেরে কখন নিচে নেমে এসেছেন কিরণমযী। বাদলা দিনেব খিচুড়ি হবে। নিজেই রাঁধবেন বলে সাড়ম্বর উদ্যোগ। ওপাশে কলেব জলে চালডাল

ধুচ্ছিল গোপালের-মা। বাসমতী চাল। ঘর ভরে ম-ম একটা গন্ধ পেল রাধা। ভেজা চালেই যার এত মিষ্টি সুবাস, তার নিজেরই রাঁধতে ইচ্ছে করে সেই খিচুড়ি। কিন্তু মা নিজেই যেখানে হাত বাড়িয়েছেন, কেড়ে নেওয়া যায় না সেই ইচ্ছেটুকু।

ফ্রিজের ডালা খুলে কী করছিলেন কিরণময়ী! রাধার প্রবেশে, মনে হয় যেন অনেক আগে থেকেই রাধার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সহসা চঞ্চল হলেন—'দ্যাখ্ দেখি, বৈজু যদি মাছ না পায়, হয়তো চিকেন নিয়েই এসে হাজির হবে। ছ-লিটারের বড় কুকারটা তো এখনও কলতলায়। যা দেখি, ওটা এনে দে চট করে......'

'দাদাবাবু কফি করতে বললেন গ মা।' রাধার অভিমানক্ষুব্ধ গলার স্বর।

'কী? স্কুল-কলেজ নেই। ব্যস, আর কী? বাবুরা মজা লুটবেন ঘরে বসে আর অর্ডার হাঁকবেন। এই অনাসৃষ্টির দিনে করবে কে ওসব?' খিঁচিয়ে উঠলেন কিরণময়ী এবং পলকেই ফ্রিজের ডালা বন্ধ করে, ঘুরে দাঁড়িয়ে—'ঠিক আছে। সে-আমি দেখছি। গোপালের-মা আছে। দিয়ে আসবে। তুই যা, কুকারটা নিয়ে আয়।'

সুতরাং রাধাকে ফিরতে হয় আবার। এ-বাড়িতে তার পা ফেলার রীতিকানুন মায়ের ইচ্ছার মাপজোকে আঁকা। মায়ের পায়ে আলতা পরিয়ে কোনো কোনোদিন সে রক্তরেখায় সাজায় নিজেরও দু'টি পা। প্রাসাদপুরীর শান-বাঁধানো মেঝেয় হাজাফাটায় বিচ্ছিরি হবার সুযোগ নেই। ভেজা পায়ে হাঁটা নিষেধ। পায়ের ছাপ পড়ে না কোথাও। ছাপগুলো গোনার উপায় নেই। যদি গোনা যেত, মায়ের ইচ্ছাসমষ্টির হিসেব মিলত একটা। তাঁর ইচ্ছার 'হ্যাঁ' অথবা 'না' রাতভর দিনভর রাধার পায়ে ঘুঙুর হয়ে বাজে। তাই তো হবে। এমনই তো হওয়া উচিত। এভাবেই মায়ের পায়ে পায়ে জড়িয়ে বড় হয় ঘরের মেয়েরা। সংসার শেখে, কাজ শেখে মায়ের কাছে। সুতরাং ক্লান্তি নেই। ক্লান্তি থাকার কথাও নয়। রাধার বয়স মাত্র আঠার। গাগতর ঢেলে সব কাজ তুলে নেবার দমও অঢেল।

গত রাতের এঁটো বাসনের ডাঁই কলতলায়। এ-কাজ তাকে করতে হয় না রোজ। ঠিকে-ঝি ববির-মা আসে নি আজ। তাই বলে ঘরের কাজও পড়ে থাকতে পারে না এভাবে। ঘরের-মেয়ে সে। এ-তো তাকেই করতে হবে। ইংরেজি ইশকুলকলেজে-পড়া ফুটফুটে দিদিমণিরা কোন্ দুঃখে আসবেন এসব নোংরা ঘাঁটতে? না-কী মা আসবেন নিজে? ছিঃ ছিঃ, ভাবা যায় এমন পাপের কথা?

সবই প্রায় চিনেমাটির ডিশ-বাটি, কাচের গ্লাশ। গোটা কয়েক স্টিলের বাসন। শালপাতা বা হতকুচ্ছিত ছাইয়ের ঘসঘসও নয়। ঘুঁটে-কয়লার পাটই নেই এ-বাড়িতে। গ্যাসের উনুন নয়তো ইলেকট্রিক-স্টোভ। রান্নার বাসনকোসনেও কালিঝুলি পড়ে না সে-রকম। সবই পাউডারে ধোয়াধুয়ি নিয়ম। মস্ত প্রেশারকুকারটা ঘসেমেজে তুলতেই যা-একটু বাড়তি পরিশ্রম। কোনো গ্লানি নেই রাধার। ঘরের কাজ তার। নিজেরই ঘর।

যেন যুদ্ধশেষের শান্তি। ভরদুপুরে রোদ উঠল আকাশে। ভিডিও ক্যাসেটের দীর্ঘ বিনোদন ফুরোলো এক সময়। একে একে স্নানে এল ছেলেমেয়েরা। রান্না ফুরোল কিরণময়ীর। কাজ ফুরোয় না রাধার।

খাবার-টেবিলে যখন ভুনি-খিচুড়ি আর বেগুনভাজা, ডিমভাজা, ইলিশ মাছের কোলভাজায় পিকনিকের উল্লাস, কলতলা ছেড়ে রাধা বাথরুমে এল। নিজের স্নান নয়। স্নানেব পর জামাকাপড় ফেলে রেখে গেছেন সবাই। তাকে ধুতে হবে। বাসন মাজার পর গত রাতের বাসিকাপড়ে ধোয়াধুয়ি সেরে চলে যায় ববিব-মা। এত বেলা অব্দি থাকে না বুড়ি। সকলের স্নানের-কাপড় কাচা নিত্যি কাজ রাধার। আজ সেই কাজেব মাত্রাটা দ্বিগুণ। এক-গাদা বাসি-কাপড়ই ডাঁই হয়ে পড়ে আছে সকাল থেকে।

ওদের কাপড়চোপড় কাচতে ববং ভালোই লাগে তার। বড় একটা প্লাস্টিকেব গামলায় গুঁড়ো সাবানের ফেনা। সে যেন টিভির পর্দায় বিজ্ঞাপনের সেই মেয়ে, যার হাতে অলৌকিক যাদু—ফেনায় ফেনায় ধবধবে শাদা বুদবুদ, বুদবুদের পাহাড়। যা ফেলবে, যা ডোবাবে, তুলে নিলেই ধুয়েমুছে সাফসুফ ঝলমল ঝলমল। সাহেব ঘরে নেই। কিন্তু দাদাবাবু আছেন। তাঁর পাযজামা-পাঞ্জাবি গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া। মায়ের শাড়িশায়াব্লাউজ ছোটজামা। দিদিমণিদের হরেক অঙ্গবাস।

দিদিমণিদের নাইটি রাত্তিরবেলার। হরেক রঙের হরেক নকশার হাউসকোটম্যাকসিপ্যান্টিব্রা, বাথরুমের কোণে বাসি-কাপড়ের স্তূপে সবই প্রায শুকনো। মাঝখানে শাওযারের তলায যে-যার মতো স্নান সেবে ফেলে রেখে গেছেন কাপড়চোপড়। সবগুলোর দিকে একসঙ্গে তাকাতেই, আজ বিশেষ অভিমানের দিনে, তার বুকের ভেতর সেই পুবনো বিষাদ। বিষাদ এ-জন্য নয় যে, আজ তাব অনেক বাড়তি কাচাকাচি। বরং তার উল্টো। ওদেব পরিত্যক্ত পোশাকের জেল্লা তাকে ভেতর থেকে কাঁদায়। এত রঙেব বাহাব। বুঝি একরাশ সুন্দর সুন্দর ফুলের পাহাড় চারপাশে ছড়িয়ে থেকে মুচড়ে তুলছে তাব বুকেব ব্যথাটা। হাত বাড়িয়ে যেটা সে প্রথমই তুলে নিলো, ফুরফুরে অর্গান্ডিব কাপড়ে আগাপাশতলায় কত ডিজাইনেব কত যে ফুল-তোলা কুঁচিতে কুঁচিতে সুমনোহব একটা নাইটি মুন্নিদির। দু'হাতে কচলাতেও সুখ অঢেল। কিংবা দু-হাতের আঙুলেব চিমটিতে জামাটার কাঁধেব প্রান্ত ধবে নিজের কাঁধের সঙ্গে পুটের মাপ মেলায়। বুকেব ওপব দিয়ে হাঁটু ছাড়িয়ে গড়িয়ে যায় সম্পূর্ণ নাইটি। দু-পা এগিয়ে দাঁড়ায় আরশির মুখোমুখি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিজেরই অচেনাকে। এমনি এক বাহারেব নাইটিতে তাকে কেমন দেখাত? কিংবা কোনোদিন, জীবনে একবারও যদি এটা গায়ে চাপিয়ে বিছানায গড়িযে পড়ার সুযোগ ঘটত তাব! আরশির কাচে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একবাব সে ঘাড ফিরিয়ে তাকাল নিচের দিকে। আরো অনেক রঙ হরেক নক্‌শা, ঘুরিয়ে-ফিবিযে প্রতিদিন অসংখ্য জামা। দুই দিদির মাথায় মাথায় একই মাপ তার। পুরো ম্যাক্‌সি কিংবা ম্যাক্‌সি-স্কার্টের সঙ্গে ব্লাউজ, মিডিস্কার্ট-ব্লাউজ বা কাফতান—একটা কিছু নিজের মতো করে পেলে দিদিদের মতো তারও পেখম খুলে যেত নির্ঘাত।

এবং তখনই সেই পুরনো খেলাটা তার মগজে কালবোশেখীর ঝড় খেলিয়ে যায়। ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলো। সুযোগ পেলেই খিল-আঁটা বাথরুমের ভেতর আলো জ্বেলে এমন খেলা প্রায়ই সে খেলে নিজের সঙ্গে। বিশেষত আজ সুযোগটা বড়ই সহজ। ওদেব বাথরুমটা সে তার নিজের খুশিমতো বন্ধ রাখতে পারবে অনেকক্ষণ। ছেলেমেয়েরা খাচ্ছে। খাবার ঘরে ব্যস্ত থাকবেন মা। নিজেও খেতে বসবেন। তাছাড়া মা নিজে জানেন, ঘরে আজ অনেক কাচাকাচি। এরপরও যদি দরকার হয় কারুর, খাবার-ঘরেই বেসিন আছে হাত-মুখ ধোবার, মায়ের ঘরের লাগোয়া টয়লেট আছে আরো একটা।

সুতবাং চকিতেই তার খেলার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যায়। বড়ই সুখেব খেলা। নিজের গা থেকে আটপৌরে শাড়িটা খুলে ফেলল চটপট। এলোমেলো দলা পাকিয়ে ঝুলিয়ে রাখল ব্র্যাকেটে। ব্লাউজ বা ছোটজামা-শায়াটাও খুলে ফেলবে কিনা, দ্বিধা থাকে। ভবসা হয় না। কিংবা দ্বিধাকেও জয় করতে হয়। সাহস বাড়ে। টুকটুক কবে বুকের হুকগুলো খুলে ফেলে, পেছন থেকে ব্লাউজটাকে টেনে আনে। আঁটোসাটো হয়ে বুকটা কামড়ে থাকে ছোটজামায়। শাযাব দড়ি পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল দু-হাতের আঙুল। খটকা লাগে। চারপাশে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, যদিও একান্তভাবে নির্জন এ-ঘর, বাথরুম —নিজেব চোখজোড়াই হঠাৎ কখন পরের চোখ হয়ে যায়। শায়া আর ছোটজামার ওপবই নাইটিটা গলিয়ে দেয় সর্ব অঙ্গে। দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে, মাথা নুয়ে, লোভে লোভে সে নিজেকেই দেখে বারবাব, এবং এগিয়ে গিয়ে আরশিতে খুঁজে পায় নিজেরই আবক্ষকে। দারুণ দারুণ। সাতজন্মের কালকিষ্টি কালো মেয়েরও কেমন জেল্লা খুলে যায় এমনধারা রঙে রঙে, মেমসাহেবি নকশায়, পোশাকের বাহারে। শাড়ি থেকে নাইটিতে বদলে যাবাব সঙ্গে সঙ্গেই যেন এক মজাদার অনুভবে ভরে উঠল গোটা শরীর। শরীরটা আছে। মনে হয়, গায়ে কিছু নেই। লজ্জা ঢাকাব আবরণে থেকেও হাত-পা খেলিয়ে যেমন খুশি চলা অথবা পাখির মতো হাল্কা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর সুখ! আরশির গায়ে গাযে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে একটু ডানদিকে বেঁকে ফ্রিল দেওয়া সুন্দর কারিকুরি পবখ করে। কত টাকা দাম হতে পারে এটার? তার এক মাসের মাইনে?

বাইরে কী একটা শব্দ হতেই আচমকা নাড়া খেল সে। এখন ঘব ভবে কাজ পড়ে বয়েছে তার। তাকে কাজে ফিবতে হয়।

নাইটিটা গায়ে চাপিয়েই সে টিভির বিজ্ঞাপনের সেই মেয়ে হয়ে যায়, অবিকল সেই মেয়ে, যাব অনুকরণে কলের তলায় গামলা টেনে দুটো হাঁটু উঁচিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল সে। বাড়িতে গিজার এসেছে নতুন। এসব যন্তরপাতি সে মানে না। এক কেটলি জল গরম করে এনেছিল। হয়তো জুড়িয়েই গেল। কেটলি থেকে গামলার ওপব গরম জল ঢালতে থাকে সে। গামলাটা কানায় কানায় ভরে ওঠার পর প্যাকেট থেকে গুঁড়ো সাবান ঢেলে দিলো অনেক অনেক। ডানহাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো জলে। জলের তলানিতে যত বেশি ঢেউ খেলানোর হাত-নাড়া, শাদা ফেনায় গজিয়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বুদবুদ। গামলা ছাপিয়ে তার কনুই পর্যন্ত বেড়ে ওঠা ফেনায় প্রায় পুরো ডান হাতটাই ডুবে গেল তার। ওপাশ থেকে

শুকনো কাপড়গুলো ফেলল গামলায়। ওরা এখন ভিজবে খানিকক্ষণ। একটি একটি করে প্রতিটি কাপড়ে এরপর সাবান ঘষতে হবে। অ্যারারুট জ্বাল দেওয়াই আছে। কলপ দিতে হবে বাছাই কিছু ম্যাক্সি নাইটি ব্লাউজ পায়জামায়।

আপাতত সরিয়ে রাখতে হয় বালতিটা। কলের তলায় টেনে আনতে হয় স্নানের ভেজা কাপড়গুলো। সেখানে আলাদা নিয়ম। কিছুটা সাবান ঘষে আছড়ে আছড়ে সাধারণ জলকাচা। প্রথমেই একটা প্যান্টি হাতে উঠল তার। টকটকে লাল। হয়তো বুল্লিদিদির। মুন্নিদিদিরও হতে পারে। যত্ন করে সাবান ঘষতে ঘষতেই প্রতিদিনের মতো আজও তার মগজে খটকা বাজে। ম্যাক্সিই হোক, মিডিস্কার্ট-ব্লাউজ হোক কিংবা শালোয়ার কামিজ—রোজ রোজ কেন প্যান্টি পরে দিদিমণিরা? যদিও হিসেবটা জানা নেই তার, একটি গোপন সংবাদ—দিদিদের ছেঁড়াফাটা বাতিল গোটাকয়েক লাল নীল হলুদ প্যানটি সে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাক্সোয়। প্রতি মাসের বিদঘুটে ওই ক'টা দিন সে পরত নিয়মিত। কত যে আরাম। ঘরের কাজকর্ম করতেও সুবিধে অনেক। কিন্তু লুকোনো জিনিস ধোয়াধুয়ি করে কোথাও শুকোতে দেওয়াও এক ঝকমারি ছিল এ-বাড়িতে। একদিন সে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যায়। মা বলেছিলেন—'তাই বলে তুই ওদেরগুলো পরবি কেন? সংসারের এত কাজ করতে হয় তোকে। সত্যিই তো, এ-সময়ে তোর নিজেরই তো দরকার দুটো-একটা....'

সেই থেকে মা নিজেই কিনে দিচ্ছেন বছরে তিনটে-চারটে, যখন যা দরকার।

মায়ের এই ভালোমানুষীর জন্যই একটা চাপা অভিমান তার অনেক কালের। ঘরের-মেয়ে বলে মা যদি এত কিছুই দেবেন ওকে, সব দেবেন না কেন?

দাদাবাবুর একটা পায়জামায় সাবান ঘষতে ঘষতে সহসা আনমনা বাধা। হাঁটুর ওপর থুতনিটা এঁটে থাকে। সাবান ঘষার তালে পিঠ দোলে না আর। ডানহাত মন্থর। অদূরেই বুল্লিদিদির ফেলে যাওয়া রঙিন জামাটা চোখ ঝলসায়। কিংবা এই মুহূর্তে ওর গায়ে লেপটানো মুন্নিদিদির নাইটিটা কী ভীষণ মিথ্যে। কান্না পায় তার।

একই সঙ্গে খেলায় খেলায় বড় হতে হতে দিদিমণিরা আজও শাড়ি পরলেন না কোনোদিন। এ-বাড়িতে আসার পর প্রথম প্রথম ম্যাক্সি পরত সে। সুন্দর সুন্দর ফ্রক পেত। একবার পুজোর সময় মায়ের কাছে শালোয়ার-কামিজ আবদার ছিল তার। মা দিয়েছিলেন। তখন সে ছোট ছিল। খুব ছোট। কিন্তু তারপর বছর চার-পাঁচ আগে হঠাৎ এক পুজোর মাস থেকে শুধু শাড়িই তার জন্য। মা বলেছিলেন—'বড় হয়ে যাচ্ছিস তুই। আমার কাছে আছিস, সে-একরকম। কিন্তু তোদের গ্রামে তো তোর আসল মা আছে একজন। আত্মীয়কুটুমরা সবাই রয়েছে। বেশি বাড় ভাল নয়। ওরা বলবে কী আমাকে?'

সেই থেকে বুকের ভেতর পাথর বেঁধে আছে বাধা। ইংরেজি ইশকুলে-কলেজে পড়াশুনো করে দিদিমণিরা যা পাবেন, গ্রামের মুখ্যু মেয়ে হয়ে সে তা পাবে না। সাহেবি ইশকুলে বাড়ন্ত বয়সের দৌড়টা বড় খাটো। দেশপাড়াগাঁয়ে সেটা তালগাছ সুপুরি গাছের বাড়।

দাদাবাবুর পায়জামার পর বুল্লিদিদির জামাটা টেনে নিতে হয়। হলদ-শাদায় বাহারের

ফুলের নক্‌শা-আঁকা তুঁতে রঙের একটা ম্যাক্‌সি। তার জন্মের জন্মের সাধ জামাটা মেঝের ওপর ফেলে সে আদর বুলোয় বুকের দহনে। সাবান ঘষে।

অতর্কিতেই সচকিত হয়ে উঠল সে। দরজায় মৃদু ধাক্কা। মায়ের গলার স্বর— 'কী রে, দরজা বন্ধ করে কী করছিস তুই?'

সর্বদেহে রক্তের ঝলকে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল রাধা। এখন কী করবে সে? হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় শাড়িটা টেনে নেবার পর, কী মুশকিল, ব্লাউজটাও গায়ে আঁটতে হবে তাকে—কোনো হদিশ না পেয়ে শাড়ি-ব্লাউজ দু-হাতে জাপটে ধরে হুঁশ হলো, তারও আগে মুন্নিদিদির জামাটা খুলে নিতে হবে। যেন নিজেরই ছালচামড়া টেনে তোলার যন্ত্রণা, কিংবা নিজের ছালচামড়ায় নতুন করে ফিরে আসার স্বস্তি।

'কী হলো? কাপড় কাচবি তো দবজা বন্ধ কেন? খোল্ দরজা...'

'খুলছি। খুলছি গ মা...' নাইটিটা ঝটপট খুলে ফেলে ব্লাউজে ডানহাতটা গলানো গেল তো বাঁদিকের হাতটা খুঁজে পাওয়া যায় না। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুকের ঢিপঢিপ বাড়ে। ব্লাউজটা কোনোরকমে বুকেপিঠে এঁটে শাড়ির আঁচলের কোণটুকু শায়ায় গুঁজে গায়ে জড়াতে জড়াতে হুটোপুটিতে এগোল দরজার দিকে। ছিটকিনি খুলল।

ভ্রূকুঞ্চনে তাকিয়েছেন কিরণময়ী—'পায়খানায় গিয়েছিলি তুই?'

'না, না গ মা। বিশ্বেস করুন....' রাধা নতুন সঙ্কটে। আকুল আর্তিতে—'সে-ও আমি চানের সময়ই গিছলুম গ একতলায়। এখেনে কেনে যাব আপনেদের বাথরুমে?'

'তাহলে কী করছিলি তুই দরজায় ছিটকিনি তুলে? শাড়িটা তো এই মাত্তর গায়ে জড়িয়েছিস। ব্লাউজটা উদোম খুলে বেরিয়ে এসেছিস! এত বাড ভালো নয়। বুঝলি। তোদেব জন্যে নিচে আলাদা ব্যবস্থা নেই? তোকে এখানে আসতে হবে কেন?'

রাধার জবাব নেই। ধরা পড়ে যাবার মতোই বিহ্বলতা। চোরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে গলগল ঘামতে হয়। ব্লাউজের হুকগুলো আঁটতে থাকে মাথা নিচু করে। আলুথালু শাড়িটা সামলাবার সাহস নেই মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টিভেজা শান্ত দুপুরে তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে বাঘা। দূরে বোসবাবুদের ছাদের অ্যান্টেনায় বসে দুপুর ভাঙছে দুটো ভেজা কাক। আর কোনো ধ্বনি নেই। কিংবা শহবেব সব স্তব্ধতাকে বুকে নিয়ে রাধা স্থির পাথর।

আরো এক ভয়ের ব্যাপার। বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়েছেন মা। নিজের মধ্যে ভয়ে সিঁধোতে থাকে রাধা। মায়ের নজর বড় কড়া। মুন্নিদিদির নাইটিটা মেঝেতে পড়ে আছে আলাদাভাবে। গুঁড়ো সাবানের গামলায় ভেজানো হয়নি। স্নানের কাপড়ে ভেজাও নয়। ববং পেছনে থেকে যাওয়ার যেটুকু সুযোগ, তারই মধ্যে সে শাড়িটা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করল চটজলদি। ঠিক জায়গায় ধরা পড়ে যাওয়াটাই যেন এই মুহূর্তের প্রার্থনা হয়ে ওঠে তার। না-হয় একটু বকুনিঝকুনি খাবে। সে-অনেক ভালো। কিন্তু চারপাশ ঘিরে দেয়ালে দেয়ালে চৌকো চৌকো শাদা পাথর-বসানো এত ঠাণ্ডা আর তকতকে ওদের স্নানের ঘর! তেল শ্যাম্পু সাবানের এমন মিষ্টি সুবাস সারাক্ষণ! ঘরটাকে কেমন ঠাকুরদেবতার মন্দির-মন্দির মনে হয় তার। ওপাশে পায়খানার কমোডটাও এত

বেশি শাদা ধবধবে পরিষ্কার, মনেই হয় না, সেটা কখনও নোংরা করতে পারে কেউ। সেই ছোট্টবেলা থেকেই ওটা একটা আজব জিনিস তার কাছে। সত্যি অদ্ভুত। ওখানে বসে বসে কি করে যে কী হয়? কী যে ছাই আরাম পায় ওরা? ঘেন্না করে না? জল ছিটকোয় না পাছায়? একদিন যে একটু বসে দেখার সাধ ছিল না, তা নয়। ঘেন্নাই লেগেছে। তাহলে আজই বা বসতে যাবে কেন সেখানে....ছিঃ ছিঃ, কী ভাবছেন মা? আমি কেন নষ্ট করব সেটা?

ঘরের চারদিক দেখলেন কিবণময়ী। আড়চোখে কমোডেব দিকে তাকালেন একবাব। ফ্লাশ টানার কোনো শব্দ শোনা যায়নি। দূর থেকে বোঝাও যাচ্ছে না কিছু। কাছে গিয়ে উঁকি দেবার ইচ্ছে নেই। বিশেষত খাবাবদাবারেব পর পান মুখে দেন নি এখনও। ববং পলকে দেখে নিতে চাইলেন শাদা পাথরেব চারপাশ। না ছুঁয়ে প্রমাণ পাওয়া কঠিন ভেজা কিনা। ঘুবে দাঁড়ালেন। একই ভ্রূকুঞ্চনে—'ঠিক আছে। সে-পবে দেখা যাবে। কুকুরটা চিৎকার করছে। কানে যাচ্ছে না তোর? কত বেলা হলো খেয়াল আছে? গোপালের-মা বৈজু আর নন্দকে খেতে দিচ্ছে। যা, তুই টাইগারকে খাবাব দিয়ে আয়...'

কিরণময়ী বেরিয়ে গেলেন। তাঁব নিঃশব্দ প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে রাধা প্রায় কান্নার কাছাকাছি। তার অবোধ বোবা চোখজোড়াব প্রতি মা-র কোনো ভ্রূক্ষেপ না থাক, সে তার নিজেব জ্বলুনিতে মরে। বুঝতে পারে, মায়েব মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে যাচ্ছে। হয়তো গোটা দিন ধরে এভাবেই গোমড়া মুখে থাকবেন। একটাও কথা বলবেন না ভালো করে। কান্না পায় তাব। সবার মন পাবাব জন্যে বাতভর দিনভব প্রতিদিন এত পরিশ্রম তার। মা-র ধমক খেলে কোনো বাগ হয় না তেমন! কিন্তু মিছিমিছি রাগ করে মা যদি পর-পর হয়ে যান, তাহলে যে নিজেকেও বড় বেশি দাসী-দাসী মনে হয় তার। সে-ও পর হয়ে যায়!

কিংবা তার নিজের সত্যিটাও এমন মিথ্যে! ওঁদেব কমোডে বসেছিল সে? প্রতিদিন অ্যাসিড ঢেলে ব্রাশ ঘষে ঘষে যে-কমোড তাকেই সাফ করতে হয়? মায়েব সন্দেহটাই সত্যি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে তক্কো চলে না। মুখ ফুটে বলাও যাবে না কাউকে। রাগ হলো তাব এবং সেই বাগে পায়ের কাছে পড়ে থাকা মুন্নিদিদির জামাটা সে তুলল না হাত দিয়ে। লাথি মারল। পায়ে পায়ে ঘেঁষড়ে সেটা তুলল গুঁড়ো সাবানেব গামলায়। হাত নয়, পা দিয়েই ঠেলে ডুবিয়ে দিলো জলে। ডান পায়ের গোড়ালি ছাপিয়েও ডুবে গেল খানিকটা। ফেনায় ফেনায় ভরে উঠল। ধুয়েমুছে নেবাব দায় নেই, সময় নেই হুঁশ নেই। এত বড় সংসাব জুড়ে এখনও অনেক....অনেক কাজ বাকি।

বাঘা চেঁচাচ্ছে খিদেয়। ওকে খাবার দিতে হবে। তারপব আবার কাচাকাচি।

খিদে তাব নিজেরও থাকে। বাথরুম ছেড়ে বেবিয়ে এল বাইরে। ভাতেব ঘুমের আলসেমিতে গোটা বাড়িটাই অদ্ভুত শান্ত এখন।

ঝিমিয়ে পড়েছে নিঝুম দুপুর। ঝলমল রোদের ঝালর। দুটো কাক ওপাশের বাড়িব ছাদে টিভির অ্যান্টেনায়। ওদের চিৎকার পড়ন্ত বেলায় শুনশান গোটা দুপুরটাকেই ইটপাথর ভাঙার মতো ফালাফালা করে তোলে। ঘরে ঘরে ঘুমোচ্ছে সবাই। সেই ভোরবেলা থেকে একটানা খাটাখাটুনি আর হৈ-হুল্লোড়ের পর বুঝি আর শিরদাঁড়ায় শক্ত থাকতে পারে নি কেউ। এমন কি, মা নিজেও তাঁর ঘরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন।

একতলায় বাঘাকে খাইয়ে এসে আবার কাচাকাচিতে বসেছিল রাধা। এত এত জামাকাপড় ছাদে টানটান প্লাস্টিকের দড়িতে গোছগাছ কবে রোদ্দুরে দিয়ে আসার পর দোতলায় ডিনাব-টেবিলের ধারে মেঝেতে বসে হাঁড়ি-গামলার অবশিষ্টটুকু নিয়ে গোপালের-মার সঙ্গে ভাগাভাগিতে তার আহার। গোপালের-মা বুড়ি মানুষ। দিনেব শেষে খাওয়াদাওয়ার পর মেঝেতে কাঁথা-বালিশ-মাদুর ছড়িয়ে বেচাবিকে একটু জিরিয়ে নিতেই হয়। এত বড় বাড়িতে রাধা এখন একা। একা জেগে থাকে।

ঝড়বাদলায় ভেসে গেছে সিঁড়ি-বারান্দা। ভোর রাত্তিরের দিকে জলের ছাঁটে ভিজে গিয়েছিল অনেকগুলো ঘর। যে-বাড়িতে উদোম পায়ে যেখানে খুশি দাঁড়ালেই ঠাণ্ডায় শিরশির করে পায়ের পাতা, নিচু হয়ে তাকালেই সব দিকে তকতকে মোজায়েক বাহারের চিত্তির। এমন সুন্দর সব ঘরদোব নোংরা হয়ে থাকলে রাধাব নিজেরও খুঁতখুঁত। সুতরাং তাকে ভাতের কুঁড়েমি ছেড়ে কাজে লেগে থাকতেই হয়। তাছাড়া ঘুম! ঘরে ঘবে ঘুমোচ্ছেন সবাই। তাকে সাবধানে কাজ করে যেতে হবে। কোনো রকম আওয়াজ চলবে না এখন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনাবফিনাবের কায়দা-কৌশল সবই জানে সে। বাদলা দিনের জলেঝড়ে ঘরদোরের যা হাল, ধোয়াপাকলা সাফসুফ আজ আর যন্তরফন্তরের কম্মো নয়। মায়ের মনও উঠবে না। সুতরাং সাবেকি নিয়মে তার গাগতরই থেকে যায়। ভেজা মেঝেয শুধু ঝাঁটায় চলে না। বালতির জল টেনে ন্যাকড়া ডুবিয়ে প্রতি ইঞ্চি জমি তাকে নিকোতে হবে নিঃশব্দে নিঝুমে।

বর্ষার দিনে রাধা অচিবেই এক ব্যাঙেব আকৃতি পেয়ে গেল। হাঁটু দুটো ভেঙে বসাব পর কোমরের তলানি যখন মেঝের সমতল ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়, শিবদাঁড়াটা ঝুঁকে আসে সামনেব দিকে এবং এভাবেই বসে বসে পা-ফেলা বা হামা দিয়ে এগোনোব দাদুরীভঙ্গি মুখ্যত দুটি হাতকেই সক্রিয রাখার চেষ্টা। পাশেব ছোট বালতি থেকে ভেজা ন্যাকড়া তুলে এবং একই বালতিতে জলগুলো নিংড়ে ফেলে, নিজের দু-পাশে যতটা হাত যায়, অর্ধবৃত্তাকাবে জলের আঁচড় টেনে টেনে চলাব প্রক্রিযায় প্রতিবাব বালতিটা পাশে পাশে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়।

বলা বাহুল্য, পদ্ধতিটা প্রাচীন এবং যথেষ্ট গ্রামীণ। এত বড় বাড়ির সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ, বিশেষত দরজা-জানালার ফাঁকে উড়ে এসে ঘবের মেঝেতে বা নানা ধবনের ফার্নিচাবে যেভাবে ধুলোর আস্তরণ পড়ে, তাকে পবিশোধন কবা এক অতীব দুরূহ এবং অমানুষিক পবিশ্রমসাপেক্ষ কাজ এব, গৃহকর্মীদেব শ্রম লাঘব হেতু শুধুমাত্র ফ্লোর-ওয়াশিং ছাড়াও আব সব ঝাড়পোঁছের জন্য কিবণময়ী ইতিপূর্বে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের

সঙ্গে বিভিন্ন মাপের যে-ক'টি নজ্‌ল্ কিনে এনেছিলেন, কয়েক দিন ব্যবহারের পর রাধা সে-সব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে এক অলৌকিক নাগরিক জগতে বসবাস সত্ত্বেও কতগুলো অত্যদ্ভুত প্রাচীন ব্যাধি থেকে মুক্তি ঘটল না তার। যেমন সে মনে করে, সুগন্ধি টুথপেস্ট বা টুথব্রাশের চেয়ে নিম গাছের ডালই নাকি দাঁতের পক্ষে অধিকতর স্বাস্থ্যকর অথবা শাদা ধবধবে চিনেমাটির প্লেট সরিয়ে রেখে স্টেনলেস স্টিল, চাই কি, এনামেলের থালা-বাটিতেও ভাত খেতে তার বেশি পছন্দ। একই কারণে কর্পোরেশনের জমাদারদের মতো হেঁটে হেঁটে বা দাঁড়িয়ে বুরুশ টেনে টেনে ঘরদোর সাফ করার নতুন কায়দায় যতই সুবিধে থাক, তার মন ভরে নি। ওতে নাকি ঘরের অচলা লক্ষ্মী সচলা হন। নিজের হাতে নিজের ঘর জলন্যাতাব লেপনে যে-ভালোবাসা থাকে, যন্ত্রপাতি দিয়ে হুটোপাটি কাজে কী আর সেসব পাওয়া যাবে? নিশ্চিতই কিরণময়ী খুশি। এজন্যেই রাধা তাঁর ঘরের-মেয়ে। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় দীর্ঘ দিনের লালনেপালনে শুধু রাধার নয়, এ-সংসারের প্রতি রাধার ভালোবাসাবই বয়স বেড়েছে।

শুধু দোতলারই দক্ষিণ-খোলা অন্তত তিনটি ঘর বড় বিতিকিচ্ছিরি হয়ে আছে। তিনতলায় দাদাবাবুর ঘর আরো হতচ্ছাড়া। সিঁড়িবারান্দাগুলো মানুষজনের চলাফেবায় জলেকাদায় একশা। সব মিলিয়ে কত বর্গমিটার? হিসেব জানা নেই। কিংবা ডান হাতে জলন্যাতা বুলিয়ে নিজেকেই ঘিরে ঘিরে মেঝেতে যে-ব্যাসার্ধ এঁকে চলা, তার গোনাগুনতিও হয়নি কখনও। কিন্তু কাজ! ঘরেরই কাজ। সব ঘর, সমস্ত সিঁড়িবারান্দার জলকাদা বা মেঘলা রঙ ধুয়েমুছে তুলতে হবে তাকে, ঘুম ভেঙে মা যখন চা খাবেন, তার আগেই।

দিদিমণিদের ঘর ছেড়ে মায়ের ঘরে এসে ঢুকল সে। জলের বালতিটা আলতো করে ঘরের মাঝখানে মেঝেতে রাখল সন্তর্পণে। যেন একফোঁটা শব্দ না হয়। পাশবালিশ জড়িয়ে বাঁ-কাত হয়ে ঘুমোচ্ছেন মা।

কিংবা তার নিজেরই কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। ফুরফুরে পাখার তলায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে খানিকটা তাজা নিঃশ্বাস চাইল। তাকিয়ে রইল। এভাবে ঘুমন্ত মাকে দেখলে সব কাজ ভুলে যেতে পারে সে। কী সুন্দর একটা খাট! শিয়রে বা পায়ের দিকে কোনো বাজু নেই। চারপাশ থেকে গড়িয়ে নেমেছে চাদর। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে বিছানাটা। চাদরের সঙ্গে শিয়রের বালিশ পাশবালিশ একই রঙে মাখামাখি। এক নক্‌শা। সেখানে তুলতুলে নরম শয্যায় বুঝি কোনো রাজরানী। হাতের শাঁখা-পলা-লোহা সিঁথির-সিঁদুরে কোন্ ভাগ্যিমানী মা গ! সাতজন্মের পুণ্যিতে এমনটা হতে হয়। মুগ্ধতায় তাকিয়ে থাকে রাধা। রামায়ণের সীতা-মাকে মনে পড়ে তার। মহাভারতের দ্রৌপদীকে! এমন সোনার পালঙ্ক ছেড়ে ওনারা নাকি সোয়ামির সঙ্গে বনেজঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিলেন সবাই? ধ্যাৎ, যত্ত সব ঢপের কথা। সব মিথ্যে।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। আবার তাকে বসে পড়তে হয়। মায়ের ঘরে দু-দুটো সিঙ্গল বিছানা। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে তিন-তিনটে আয়রন-সেফ, বাহারি সাইডবোর্ডে ঢাকা দু'দিকের দেয়াল, ড্রেসিং-টেবিল, আরো হরেক আসবাবপত্তর। উবু হয়ে জল-ন্যাতা

নিকোনোয় নিজেব কাজ করতে কবতে আড়চোখে ভাগ্যিমানী মাকেই সে দেখে বারবার। এলোচুল তোলা আছে শিয়রের বালিশ ছাপিয়ে ওপরের দিকে। ফুরফুর উড়ছে পাখার বাতাসে। আলুথালু হযে আছে বুকের কাপড়। তলার দিকেও ডান পায়ের হাঁটু অব্দি উদোম হয়ে গিয়ে পাশবালিশে উঠে এসেছে নিটোল গোল মাংসল ঠ্যাং। মনেই হয় না, এতটা বয়সেব ভাব নেমেছে মায়ের শরীরে। পরশু রাতেও যে-পায়ে সে আলতা পরিয়ে দিয়েছে, এখনও টকটকে লাল। ধর্ম-মা তার! জীবনভর পেন্নাম সেই পায়ে।

ঘবে আসবাবপত্র বেশি বলেই মেঝেটা ছোট হয়ে যায়। খাটুনিটা বাড়ে। স্টিলের আলমাবি, ওয়াবড্রোব, ড্রেসিংটেবিল সাইডবোর্ডের তলায় যে-ধুলো জমে থাকে, বালতিব জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেগুলো টেনে আনতে হয়। জল গড়িয়ে নামলে শুকনো ন্যাকড়া ভিজিয়ে বালতিতে নিংড়ে তোলা অথবা বাববার গিয়ে বাথরুম থেকে জল টেনে আনা বড্ড কষ্ট। একটানা কোমর ভেঙে বসে, হাঁটুভাঙা পায়ে পায়ে এগোনোয় পিঠ ঝুঁকিয়ে জলন্যাকড়া ঘষে ঘষে হামা দেবার যন্ত্রণায় একটি-দু'টি ঘবের পব পিঠ-পাছা-হাঁটু ভেঙে একসঙ্গে গোটা শরীব টনটনিয়ে ওঠে ব্যথায কাতবানিতে। গা-গতরে যখন আর সয় না, বসে বসে হাঁপাতে হয। মেঝেতেই লেপটে বসে পড়ল সে। শাড়িটা ভিজে যাচ্ছে তলায়। হুঁশ নেই। বুকেব হাড়পাঁজব ভেঙে বড় নিঃশ্বাস টানে কাতলা মাছের মতো মুখেব হাঁ তুলে। তাকিযে দেখে, ঘুমোচ্ছেন মা। আলতায রাঙা ভগবতী মায়ের চবণ।

হঠাৎই একটা খুশিব মেজাজ এসে যায়। ভবদুপুরের নিঝুম কাঁপিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল আচমকা। ঘুমের ঘোরে ধরবে না কেউ, জেনেই, নোংরা হাত আঁচলে মুছতে মুছতে দুরন্ত ছুট তার। দোতলায চারপাশের ঘরগুলি গোল হয়ে ঘিরে যে ঘব গড়েছে মাঝখানে, লিভিংরুম না লাউঞ্জ কী বলে ইংরেজিতে, অথবা রাধা যাকে ঘবেব-উঠোন বা উঠোনেব-ঘর বলেই জেনে এসেছে এতকাল, সেখানেই ভি. সি. আব, টেলিফোন, বঙিন মাছের ঘব, সাজগোছে সাজানো সোফাকোচ, সেণ্টার-টেবিল, পায়ের তলায় ঘন সবুজ কার্পেট।

'হ্যালো....অ্যাঁ। কাকে চাইছেন আপনি? না না, ও-নামে কেউ থাকেন না এখানে। বং নাম্বার...'

যখন পুরনো টেলিফোনে রিসিভার কানে তুলতে হতো, গোলচাকতি ঘুরিয়ে ডায়াল করতে পাবত সে। বোতাম টিপে একতলায় সাহেবের আপিসঘরে পাঠিয়ে দিতে পাবত লাইন। এখন নতুন নিয়মে বোতাম টিপে টিপে লাইন ধরতেও শিখে ফেলেছে। ইশকুলেব পড়ালেখা না শিখলেও ইংবেজি এক দুই তিন চাব সে জানে। নয় পর্যন্ত। শূন্যই নাক দশ। মুন্নিদিদি শিখিয়েছেন। হাটবাজার করে টাকাপয়সার হিসেব গুনে দিতে পারে মাকে। সাহেববাবুদেব লাখ লাখ টাকাব হিসেবপত্তব নাকি এভাবেই হয় কাগজে-কলমে। তার কাগজ-কলম নেই।

নতুন করে কাজে হাত দিতে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন কিরণময়ী। মুখেচোখে দিবানিদ্রার বা ভালো করে ঘুম না-হবার অবসাদ। অসম্বৃত শাড়ি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন পিঠটানে—'কী রে, এত বেলা হলো! তুই এখনও করে যাচ্ছিস এসব? একটু শুস নি দুপুরে?'

রাধার সাড়া নেই। মায়ের খুশিটুকু তাব নিজের খুশিতে নীবব হয়ে থাকে।

'এজন্যেই বলি, এ-তোর একার কাজ নয়। তোব মতো আবো একজন কাজেব মেয়ে দরকাব। পুষ্প ছিল, নারায়ণী এল, বমাব-মাও বইল কিছুদিন...'

মাযেব ঘবেব শেষ কাজটুকুর জন্য হাঁটু ভেঙে বসেছিল বাধা। মুখ নুয়ে, ভেজা নুড়িটা মেঝেয় বুলোতে বুলোতে বলল—'ওরা নেই বলে আপনাব ঘবের কোন্ কাজটা আটকে আছে গ মা?'

'মুখে মুখে বেশি কথা বলবি না। বুঝলি....' ড্রেসিংটেবিলেব দিকে এগোচ্ছিলেন কিরণময়ী। ঝাঁঝিযে উঠলেন—' সেই সকাল থেকে একা একা এভাবে খেটে মবছিস। এ-তো দেখতেও খারাপ লাগে। ওদিকে আর কাউকে বাখলে টিকতেও দিবি না একদিনেব বেশি দুদিন। খালি খালি ঝগড়া কববি...'

মাথাটা ঝুঁকে থাকে সামনেব দিকে। বাহাবেব নকশা-আঁকা মোজায়েক মেঝের মসৃণে জলন্যাতা বুলিয়ে হামা দিয়ে পিছোতে পিছোতে দবজাব কাছাকাছি পৌঁছে যায় বাধা। এ-বাড়িব ঘবদোব নোংবা কবাব মতো হাজাফাটা ধুলোকাদাব পা নেই কাকব। সবাই শ্লিপাব-পায়ে হাঁটে। এমন একটা সুন্দব বাড়িতে প্যাঁচাপেঁচিখেঁদিরা এসে কেন ঘুবঘুব কববে সাবাদিন? যে-ঘব সে সাজিযে-গুছিযে বাখে। মাযের মুখেব বাক্যি তাকে ভেতব থেকে পোড়ায়। নিজেবই ধোয়ামোছা জলেব আঁচড়গুলিব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যায় তাব। চোখেব কোলদুটো ভাবি হযে ওঠে। তার নিজেব পাযেও অবিশ্যি ঘবে-পরার চটি থাকে না সব সময়। কিন্তু মা নিজেই এক জোড়া ববাবেব হাওযাই জুতো কিনে দিয়েছেন তাকে। এমনটা দেবেন কাউকে?

দুপুরে মাথায শ্যাম্পু ঘষাব পব পাখাব বাতাসে বাতাসে শুকিযেছে চুলগুলো। ওপাশে আবশিতে মুখ বেখে চিরুনিব দীর্ঘ আঁচড়ে পিঠেব চুলকে বুকে টেনে এনে বিন্যস্ত কবছিলেন কিরণমযী। চিরুনি আটকে যায এবং জট ছাড়াবাব প্রতিটি টানে বাধাকেই দেখছিলেন কাচেব ছাযায। কাজেকর্মে এমনিতেই আলাভোলা হয়ে থাকে সাবাটা দিন। তাব ওপব আজ আবাব এমন একটা দিন পড়ল হঠাৎ. মেযেটাব ভোগান্তিব শেষ নেই। মাথা নুয়ে ঘব মুছে যাচ্ছে চুপচাপ। ডানহাতে জলন্যাকড়া। আঁচল টেনে মুখচোখকপাল ঘষে নিচ্ছে বাঁ-হাতে। যে-কাজ সকালে কবাব কথা, ববিব-মা আসে নি বলে তাব পাট চুকোতে চুকোতে বিকেল গড়িযে যাচ্ছে। কাঁচা বযস। গা-গতবে খাটতে পাবে অনেক। আবশিতে প্রতিবিম্বে ওবই দিকে তাকিযে থেকে তাঁব এক ভিন্ন অনুভব—যে-মেযে নিজের মতো কবে তাঁর ঘবসংসাবেব দেখে সব কিছু, এভাবে খেটে মবে, ওর জন্যে তাঁকেও তো ভাবতে হবে খানিকটা। অসুখবিসুখও তো হযে যেতে পাবে হঠাৎ! মৌন সংলাপে যেন তাঁর নিজেব মধ্যেই স্বগত উচ্চাবণ—'নে. আমার কী? গোটা দিন ধবে তোকেই খাটতে হচ্ছে খামোকা। সঙ্গে আব-কেউ থাকলে তোবই লাভ হতো। বিশ্রাম পেতিস একটু।'

কিরণময়ীর শব্দগুলি যেন কারুর শোনাব জন্য নয়। কিংবা যাব শ্রুতির নিশানায় পৌঁছোবার কথা. বাধা, বসে-বসেই পায়ে পায়ে পিছোবাব পদ্ধতিতে বেরিযে যাচ্ছে ঘব ছেড়ে।

কিরণময়ী ঘুরে দাঁড়ালেন—'সব ঘর-বারান্দা মোছা হয়ে গেছে তোর?'

ব্যথাযন্ত্রণার পিঠটানে সোজা হয়ে মাথা তুলল রাধা। অভিমানে চাপা গলার-স্বর—'তিনতলায় দাদাবাবুর ঘরে যাইনি এখনও। দোতলার সিঁড়ি বাকি।'

কোনো সাড়া দিলেন না কিরণময়ী। কাজটা জরুরি।

পেলমেটের পর্দা দুদিকে সরানো ছিল। দরজা খোলা। যেখানে ঘরের মেঝের বুটিদার সবুজ আলপনা বারান্দার গোলাপী নকশার প্রান্তে এসে মিশেছে, ঘর-বাহিরের সীমান্তে কুঁজো বুড়ির মতো মাজার ব্যথার টনটনানি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রাধা। তার যুবতী-দেহের তরঙ্গে যন্ত্রণাটা সামাল দেবার ভঙ্গিতে যখন মুখচোখেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাঙচুর।

কিরণময়ী এগোলেন। এই মুহূর্তে বেসিনে গিয়ে মুখেচোখে জল দেওয়া তাঁর নিতান্তই প্রয়োজন। ভ্রূ কুঞ্চনে—'ববির-মা এসেছে?'

রাধা চুপ।

'ওবেলা আসে নি। সে-না-হয় বৃষ্টি ছিল। কিন্তু এবেলা আসবে না কেন? আর তো পারাও যায় না ওদের নিয়ে। কখন যে কাব কী মর্জি! গোপালের-মা উঠেছে ঘুম থেকে?'

রাধা পিছু ফিরে এক পলক তাকাল। কেন তাকাল, কী দেখল, অবিশ্যি নিজেও জানে না। ভ্যাবাচাকা ভঙ্গিতে—'দেখে আসব গ মা? ডেকে দেব?'

'না, তুই যা। আমি দেখছি।'

একটানা লম্বা একটা দুপুর পেরিয়ে খাটো-গোছের ছোট একটু বিকেল। এর পর বড় দ্রুত গড়িয়ে যেতে থাকবে বেলা। যেন সময়ের সঙ্গেই পাল্লা। বালতির নোংরা জল দোতলায় নর্দমার ঝাঁঝরিতেই ফেলে দিলো রাধা। জল বয়ে তিনতলায় উঠতে হবে না তাকে। ছাদে আলাদা কলতলা।

কিন্তু খালি-বালতি আর ঝাঁটা নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতেও এখন ক্লান্তি অগাধ। যেন নিজেরই শরীরকে বহন করে করে টেনে তোলার বাড়তি পরিশ্রম।

তিনতলায় দরজায় খিল তুলে ঘুমোচ্ছেন দাদাবাবু। এত বেলায়ও ওদের ঘুম। সাহস হয় না কড়া-নাড়ার। এ-বাড়িতে যেন কেমনতরো ওই একটা মানুষ! বড় বেশি খ্যাঁকখ্যাঁক করে তার সঙ্গে। কিংবা অন্য কিছু? অবিশ্যি রাধা নিজেও জানে না, এত বছর বাদে ইদানীং কেন যে এ-ঘরটায় একা ঢুকতে তার গা-ছমছম ভয়!

তিনতলা থেকে দোতলার দিকে গড়িয়ে-নামা সিঁড়িগুলোই ধুতে শুরু করল সে। পিঠকোমরে টাটানি নিয়ে উবু হয়ে কাজ করার আর সাধ্যি নেই। ওপর থেকে প্রতিটি সিঁড়িতে জল ঢালা শুরু হলো তার। জলের ঢল নামে তলার দিকে। একই জল পর পর সিঁড়ি ছুঁয়ে যায়। শক্ত কাঠির ঝাঁটা টানে রাধা। ধাপে ধাপে নিজেও নামতে থাকে। জলের ছাঁট আরো বেশি করে ভিজিয়ে দিচ্ছে তলার দিকের শাড়ি। হুঁশ নেই। আরো জোরে লম্বা লম্বা ঝাঁটার টান। বিকট একটা আওয়াজ উঠতে থাকে। ভাবনা নেই। এখানে ঘুমের ভাঙন নেই। ধমকাবে না কেউ। কিন্তু মুশকিল, কেউ ঘুমোচ্ছে না বলেই এখানে পাখা ঘুরছে না মাথার ওপর। চটজলদি শুকবে না জল। খুঁতখুঁত থেকে যায় নিজের মধ্যেই। নানা ধরনের স্লিপার পায়ে দিয়ে ছুটোছুটি হাঁটাহাঁটি করেন দাদাবাবু

দিদিমণিরা। যে-কেউ হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন। আবার তাকে মাজা ভেঙে উবু হয়ে সব কটা সিঁড়ি শুকনো ন্যাকড়ায় মুছে দিতে হবে।

কিন্তু হতোদ্যম নয়। কাজ করতে করতেই হঠাৎ একটা নেশা চেপে যায় মগজে। হাড়গোড় ভেঙে যতই কষ্ট বেড়ে যেতে থাকে, কাজটা শেষ করার জন্যেই একটা জেদ। ভোররাত্তির থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে গোটা বাড়িটাকে বাইরে থেকে স্নান করিয়েছে আকাশ। সেই বাড়ি একই নিয়মে জলে জলে সাফ করে রাধা। সে ওদের ভেতর-বাড়ির আকাশ হয়ে যায়। সিঁড়িবারান্দা ঘরদোর নিয়ে বিশাল বাড়িটা যেন তার আরো একটা পুষ্যি হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন বাঘা। বাঘা অনেক টাকা দামের সাহেবি ইজ্জত! ওদেব পুষ্যি। রাধার ভালোবাসা।

সূর্যাস্তে
বদলে গেল রং

রাধা জানত না, বিকেলে চায়ের টেবিলে নতুন করে হুল্লোড় উঠবে আবার। সুখের ঘরে অঢেল আমোদ ওদেব। আনন্দ অপার।

রাধা এ-বাড়িতে পুষ্যি নয় কারুর। সকলের ভালোবাসা।

দিবানিদ্রার শেষে মায়ের ওপর হামলে পড়ল ওরা। ঘবে বসে-বসেই যদি এভাবে খামোকা কেটে গেল দিনটা, আজ একটা কিছু চাই-ই চাই—টু সেলিব্রেট দ্য নাইট উইথ জয় অ্যান্ড থ্রিল অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার...

খেপে গেলেন কিরণময়ী—'কী বলছিস? চাস কী তোরা?'

'সিনেমায় যাব। বাড়িতে রান্নাবান্না করতে হবে না। পার্ক স্ট্রিটে বড় হোটেলে খাব।'

যথেষ্ট ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা সেয়ানা হয়ে উঠেছে ছেলেমেয়েবা। তেমন আর ধার নেই মাতৃশাসনের। দামাল আবদাব রুখতে অথবা প্রতিরোধে কিরণময়ী নিজেও বেসামাল-—'তোদের বাপি ঘবে নেই বলে যা-খুশি মজা পেয়ে গেছিস তোরা? রাত্তিরবেলা সিনেমা দেখতে যাবি? হোটেলে খাবি? ইয়ার্কি নাকি? এত বড় একটা জলঝড় হয়ে গেল। কোথায় কী হচ্ছে কলকাতা শহরে, কেউ জানে না...'

'হবে? কী আবার হবে? এই না হলে বলে মেয়েছেলের বুদ্ধি...' হৈচৈ-এর লাফালাফিতে বাবন এক পরাক্রান্ত যুবা—'বৃষ্টিফিষ্টি সব মিটে গেছে সেই দুপুরবেলা। আর সে-কিছু জ্যামফ্যাম জলফল হয় তো কী করে গাড়ি বের করতে হয়, আমারও জানা আছে।'

'গাড়ি?' কিরণময়ী উত্তেজিত আরো—'গাড়ি কোথায়? বৈজুকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। এখন অব্দি ঘরে যায় নি, সে-রাস্তায় জল ছিল বলে। এবার যাবে। কেন? ঘরবাড়ি নেই ওর? তোদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে মরবে নাকি রাত্তিরবেলা?'

'না না, সে-সব কথা হয়ে গেছে। বৈজুদা আর নন্দদা থাকবে বাড়িতে। আমরা

ফিরে আসব রাত নটা সাড়ে-নটার মধ্যে।' বাবন তার হেঁড়ে গলায়, প্রায় দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে উদ্দাম।

'বৈজু বাড়ি থাকবে? গাড়ি চালাবে কে?'

'কেন? দাদা ড্রাইভ করবে।' প্রাণময় বুলবুলি খুশিতে কাঁপছে।

'একটু বৃষ্টি হলেই কলকাতার রাস্তায় কী রকম বিচ্ছিরি জল জমে থাকে। এমনিতে গাড়ি বের করে না কেউ....' ওদের হুড়োহুড়িতে উত্যক্ত কিরণময়ী ছেলের দিকে তাকালেন—'এখন তুই দুটো মেয়েকে নিয়ে রাত্তিরবেলা হোটেলে খেতে যাবি? কত বাড় বেড়েছিস তোরা? কী ভেবেছিস?'

'বারে...' বুলবুলি একইভাবে লাফিয়ে যাচ্ছে—'আমি আর দিদি একা যাব কেন? তুমিও তো থাকবে সঙ্গে।'

'না না, আমার শখ নেই। যা যা, তোরা ঘরে যা। পড়তে বোস। ওসব হবে না। গাড়ি বেরোয় নি সারাদিন। আর বেরোবে না।'

সন্তানদের উৎপাত ঠেলে সরে যেতেই চেয়েছিলেন কিরণময়ী। বুলবুলি, ছোটমেয়ে, সবচেয়ে পাজি। দুহাতে আগলে ধরল মাকে। আরো বেশি খুকু-খুকু ভঙ্গি—'মা...মা...মা...'

অসহায় কিরণময়ী। যখন ওরা শিশু ছিল, মনে পড়ে, কত সাবধানী মা ছিলেন তিনি। আজ ওরা বড় হয়ে ওঠার পর জানেন না কিশোরী বা যুবক-যুবতীদের মা হতে হয় কোন্ কায়দায়? শেষ পর্যন্ত গলার স্বর কিছুটা দ্রবীভূত—'সারাটা দুপুর ঘরে বসে বসে কী বই দেখলি তোরা। ওতে হলো না? এখন এই বিচ্ছিরি দিনে আবার বেরুবি? তোদের বাপি বাড়ি নেই। শেষে যদি হয়ে যায় কিছু একটা?'

'কী আবার হবে? এই কদিন আগে সার্ভিসিং থেকে একেবারে ফ্রেস হয়ে এল গাড়িটা...' বুঝি সেই তেজী স্টিয়ারিংটা দু-হাতে খাবলে ধরার জন্যেই হাতের পাতায় আঙুলগুলি নিসপিস করছিল। বাবন খেপে গেল। শিক্ষানবিশি ছাপিয়ে যখন তার আইন-মোতাবেক সাবালক ড্রাইভিং-লাইসেন্স অনুমোদিত, তখনও তার দুর্বার ইচ্ছাগতিকে লাগাম টেনে ধরে রাখার গোঁয়ার্তুমি বা মা-বাবাদের ফালতু ন্যাকামো সিম্পলি ইনক্রেডিবেল্। তার বেসামাল যৌবনরক্ত টগবগিয়ে ফোটে। নিষ্ক্রমণ চায়। নিশীথরঞ্জন ঘরে থাকলে গাড়ি নিয়ে বেরুবার খুব একটা সুযোগ ঘটে না তার। সুতরাং আজ সে খেপে যেতেই পারে, এবং খেপে গেলেই সে বীভৎস ভয়াল। বদলে যায় মুখ চোখের আদল, মুখের ভাষা, দুটো চোখ শাণিত হয়ে ওঠে। ঘাটাঘাটিতে সাহস থাকে না ঘরের মানুষদেরও।

জননীসূত্রে, এমন-কি, কিরণময়ী নিজেও দিশেহারা। জানেন, এ-ছেলেকে ঘরে বেঁধে রাখা যাবে না। এর পর আরো বেশি বাধা দিলে তাঁর নিজেরই অশান্তি। তাকালেন মেয়েদের দিকে—'তোদের মাস্টারমশাইরা কেউ আসবেন না পড়াতে? ডেট নেই কারুর?'

'ওই...ওই আরেক ভাট কথা বেরুল মগজ থেকে...' বাবন সগর্জনে খেঁকিয়ে উঠল। চারপাশ কাঁপে—'বাসফাস চলছে কি চলছে-না ঠিক নেই। ত্রিশ চল্লিশ টাকা ট্যাকসি-ফেয়ার দিয়ে প্রফেসর মিত্র আমাকে পড়াতে আসবেন ভেবেছ? কেন আসবেন? ফেরার সময় আবার চল্লিশ। পকেট থেকে একদিনে আশি টাকা খসাবে লোকটা? শুধু একটা

টুশানির জন্যে? মরে যাবে, স্রেফ মরে যাবে...'

বলার ভঙ্গিটাই এমন, বুলবুলি সশব্দে হেসে উঠল। একপাশে মুনমুনের মুখেচোখে কৌতুকের ভাঁজ। কিন্তু এপাশ-ওপাশ ভাবনার ভারে ললাটের কুঞ্চন থেকেই যায় কিরণময়ীর। হঠাৎ এভাবে ঘর ছেড়ে বেরুনোর হাজার ঝঞ্ঝাট—'আমরা সবাই চলে যাব? তাহলে রাধা?'

'বাঃ, এ-যেন খুব একটা নতুন কথা বললে মা।' বুলবুলি, চোখ নাচিয়ে—'আমরা বই দেখতে গেলে এর আগে রাধা যায় নি আমাদের সঙ্গে? যাবে, সি উইল বি উইথ আস.'

অগত্যা নিরুপায়। নিজের মধ্যেও একটা প্রসন্ন উৎসাহ অঙ্কুরিত হয়তো-বা। প্রার্থীদের দাবিদাওয়া মেনে নিতেই হলো কিরণময়ীকে।

শেষপর্যন্ত স্থির হলো, রাধাও সঙ্গে যাবে। এমন সোমত্ত বয়সের মেয়ে। এত বড় বাড়িতে রাত্রিরবেলা একা থাকবে কেন?

ঘর-বাহির

এবং অচিরেই ঘর ও বাহিরের তারতম্যে নিজেদেরই পাল্টে নেবার একটা তৎপরতা শুরু হয়ে গেল ঘরে ঘরে। স্বগৃহে প্রতিটি চোখই প্রতিদিনের চেনা। সেখানে একজন আরেকজনকে ফাগের রং মাখিয়ে সুখ নেই। হোলির মজাটা জমে যায়, যদি রং ছড়িয়ে দেওয়া যায় ঘরের বাইরে। দর্শনে-প্রদর্শনে সবাই সবাইকে দেখবে দেখাবে হাসবে ভাসবে হাততালি দেবে প্রাণের উচ্ছ্বাসে। ভুবন জুড়ে প্রতিদিনই যে-রঙের বিস্ফোরণ, সেখানে নিজেদের যথাযথ সংস্থাপনে বর্ণময় হয়ে উঠতে হয় রূপচর্চার বিধিবিধানে।

কোন্ শাড়িটা পরবেন কিরণময়ী? কোন্‌টা ম্যাচিং ব্লাউজ হতে পারে? ওয়ারড্রোব খুলে ডাকলেন মেয়েদের। পরামর্শ চাইলেন। মাকে মা থাকতে হবেই যেহেতু, চওড়া লালপাড়ে শাদা জমিনের একটি দামি তাঞ্চোর বেনারসীই পছন্দ হলো মুনমুনের। বরং ব্লাউজটা পুরো লাল হোক। অন্তত বছর পাঁচেক কমে যাবে বয়সটা। বুলবুলি পরোয়া করে না কারুর। কেউ জানে না, কী তার ইচ্ছে। সিনথেটিক ফেব্রিকের গাঢ় ভায়োলেট রঙের কামিজ, শাদা শালোয়ারের সঙ্গে ভায়োলেট ওড়না টেনে নিয়েছে মুনমুন। এ-নিয়ে দু-বোনের তর্কও বেধে গেল খানিকটা। ডিপ ভায়োলেট আসলে আরো ফর্সা মেয়েদের জন্যে। ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ব্যাড চয়েজ। এসব বিষয়ে মুনমুন স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নীরব। গায়ের রঙে সে খুব ফর্সা নয় ঠিকই, গতানুগতিকতার বাইরে বেগুনি রঙটা তার প্রিয়। দুই বিনুনি করবে না সে। একুশ বছর বয়সেই তার সাবালিকার দাবি। বুলবুলির কেশবিন্যাস দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এক জটিল শিল্পরচনা। বরং এই দীর্ঘ লম্বিত কেশভার তার নিজস্ব হিসেবে এক অবাঞ্ছিত বোঝা। অনাবশ্যক লাগেজ বইতে হয় মুটেদের মতো। সেকেলে মায়ের জন্য সেটা যদিও হচ্ছে না আপাতত,

আই. সি. এস. ই. পরীক্ষার পর কলেজে ভর্তি হয়েই মনোবাসনা পূর্ণ করবে সে। চুলগুলো ছেঁটে ফেলবে। 'বয়েজ কাট'-এ সুবিধে অনেক।

একমাত্র পুরুষমহিমায় বাবন তার নিজের ঘরে, তিনতলায়, কীভাবে তৈরি করছে নিজেকে, কেউ জানে না।

এবং এভাবে হঠাৎ-ই যদি লটারি জেতার মতো একটি ভরপুর নিটোল সন্ধ্যা জুটে গেল বরাতে, অবিশ্বাস্য সেই আকস্মিকতাকে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে নেবার প্রক্রিয়ায় রাধার অঙ্গে অঙ্গে রক্তপ্রবাহে শিহরনে উৎসবের ম্যারাকাস ব্যান্ডের বাদ্যি। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততায় সে এখন অনায়াসে ভুলে যেতে পারে আজকের দীর্ঘ দ্বিপ্রহর, অবিশ্রাম ক্লান্তি, গাঁটে গাঁটে ব্যথাযন্ত্রণা এবং তাব বুক-চাপা অভিমানগুলি।

এ-বাড়িতে তারও ঘর আছে একটা। কিচেন আর ডাইনিং রুমের ফারাকটা সে বুঝতে পারে না ঠিকমত। কোমর-উঁচু একটা পাঁচিল তুলে এঘর-ওঘর। খাবাব-টেবিল থেকে পিছু ফিবে তাকালে পুরোপুরি দেখা যায় না কিচেনটা। রান্নাঘর থেকে উঁকি দিলে বোঝা যায় খাবার-টেবিলে কখন কী চাইছেন সবাই। কী ওঁদের প্রয়োজন। সাজগোজে চকচকে এমন একটা খাসা ঘবে মাটিতে বিছানা পেতে দিব্যি রাত কাটিয়ে দিতে পারে সে। ভারি মিষ্টি একটা গন্ধ রাতভর। কিন্তু সেখানে নয়। আরো সুন্দর ব্যবস্থা তার। রান্নাঘরের উত্তরমুখো একটা দরজা ডিঙোলেই ভাঁড়ার ঘর। আর-দশটা সংসাবের মতোই চাল-ময়দা-আটা-ডাল-তেল-মশলাপাতি—গোটা মাসের বাজার থরে থবে সাজিয়ে রাখার জন্য বড় বড় প্লাস্টিকের ড্রাম, টিন, শিশিবোতলবয়ম। এ-বাড়িতে আসার পর প্রথম বছরখানেক ভাঁড়ার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পেতে শুতো সে। তারপর যেদিন থেকে সে আর এ-বাড়ির আর-পাঁচটা দাসীর মতো কেউ নয়, সে একটা ঘর পেল। ভাঁড়ার ঘরের পেছনে উত্তরদিকের বারান্দায় পৌঁছোলে, পেছনে আরো একটা ঘর। ঘবটাকে কেন জানি, এ-বাড়িরই কোনো ঘর বলে মনে হয় না রাধার। কী রকম আলাদা আলাদা! সেখান থেকে হাঁক পেড়ে ডাকলেও ঘরের-মানুষদের কানে আদৌ পৌঁছবে কিনা, জানা নেই। তবু ঘরটা তার। তার একার। সে-ঘর যে শুধু রাধার, শুধুমাত্র রাধারই জন্য একার—এমন কথা অবিশ্যি কবুল করেন নি কেউ কোনোদিন। ঘরের এক পাশে পুরনো তক্তপোশ, তার নিজের শয্যা। গোপালের-মা বা আরো যারা নিত্যিনতুন গোপালের-মায়েরা বছরে-বছরে আসে থাকে, খায়, কাজ করে, মাইনে পায়, চলে যায়—আরেকজন মেয়েছেলের শোবার জন্য ওপাশে একটা ক্যাম্প খাট থাকে। কিন্তু ঘরটা যেহেতু রাধারই জন্য স্থায়ী বরাদ্দ এবং তক্তপোশটা রাধার জন্যই অনড়, আইন মোতাবেক মৌরসীপাট্টায় ঘরটা তার নিজস্ব হয়ে ওঠে। ছোট একটা পাখাও আছে ঘরেব সিলিংয়ে। আজ রাত্তিরে গাড়ি চেপে সিনেমা দেখতে যাবে সবাই। হোটেলে খাওয়া হবে। রাধাও সঙ্গে যাবে। সিদ্ধান্তটা পাকা হবার পর ঘরে এসে সুইচটা টিপে দিয়ে খুশির বাতাসে দাঁড়িয়ে থেকে রাধা একটু জিরিয়ে নিতে চায়। আহ্ কী আরাম! ঝি-চাকরদের ঘরে পাখা থাকে না কারুর। কিন্তু রাধার ঘরে আছে।

তক্তপোশের তলায় তার টিনের বাকশো। বছরে গোটা তিন-চার ঘরে-পরার শায়াব্লাউজশাড়ির সঙ্গে প্রতি বছর পুজোর সময় মা যেসব সুন্দর সুন্দর সিলকের শাড়ি

দিয়েছেন তাকে—সিফন জর্জেট সুইশ-কটন হরেক ধরনের প্রিন্ট, সবই সযত্নে লুকোনো আছে সোনাদানার মতো। কালেভদ্রে এ-রকম কপাল খুললে সে সাজায় নিজেকে। শাড়িগুলো প'রে বছরে দু-চার দিন রেলগাড়ি চেপে দেশের বাড়িতে যায়। চোখ টাটায় স্বজন-স্বজাতির ঘরে বউ-ঝিদের। গেঁয়ো-ভূত তো সবাই।

সুতরাং সাজগোজের বাছাই তারও থেকে যায়। ঘরের দুটি মাত্র জানালা ভেঙে বিকেলের রঙ আবছা করে তুলেছে ঘরের আলো। ঘুম থেকে উঠে গোপালের-মা ঘরের বাইরে কোথায় চলে গেছে। কুটনি-বুড়ির নজর এড়িয়ে তক্তপোশের তলা থেকে বাকশোটা টেনে আনল মেঝেয় উবু হয়ে বসে, মাথায় খাটো হয়ে। তার বিছানায় আদ্যিকালের পুরনো তোশকের নিচে চাবি থাকে। খুলে ফেলল বাকশো। তার লুকনো রত্নসম্পদ। গাঢ় নীল জর্জেট না নকশা-পাড় হলুদ সিফন? কিংবা তার বড় পছন্দের শাড়িটা? সুতি হলেও হালকা তুঁতে রঙের ওপর শাদা ডুরিকাটা নকশা। নিজের হাঁটুতে রাখে, তক্তপোশে সাজায়, বাকশোতেই থাকে। লাফিয়ে গিয়ে ঘরের আলোটা জ্বালে। টিউব-বাতি নেই এ-ঘরে। ষাট কিলোওয়াটের ম্যাটমেটে একটা বালবের যেটুকু তেজ, সেই আলোয় নিজের চোখের ওপরই ভরসা থাকে না ঠিকমতো। যে-কটা শাড়ি, সবগুলোর সঙ্গে রং মিলিয়ে হরেক রকম ব্লাউজ নেই তার। কার সঙ্গে কোন্‌টা মিশ খাবে? বুঝি এক দুরূহ সঙ্কট। এবং নিজের মধ্যে কোনো হদিশ না পেয়ে মুশকিল-আসানে গোটা তিনেক শাড়ি আর দুটো ব্লাউজ হাতের মুঠোয় চেপে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঘরবারান্দা ডিঙিয়ে লম্বা ছুট।

ঘরের দরজা মাত্র খুলেছে মুনমুন। রাধা হামলে ঢুকল ভেতরে—'কোন্ শাড়িটা পরব গ মুন্নিদি?'

'পর না যা তোর খুশি। এ-আবার দেখাবার কী আছে?'

'এ-শাড়িটার সঙ্গে মিলবে গ এই....এ-ব্লাউজটা?'

'হ্যাঁ, পর...' খুবই আলগাভাবে মুনমুন বলেছিল কথাটা। নিজের ড্রেসিং-টেবিলে বসার আগে একবার ফিরে তাকাল—'কী বোকা রে তুই? এটা কী করছিস? এ-শাড়ির সঙ্গে মেরুন কালার মেলে কখনও? এটা পর না! ডিপ ব্লু। লাইট টার্কিশ ব্লু-র সঙ্গে পার্ফেক্ট ম্যাচিং...'

রাধা খুশি। একজোড়া পায়ে তখন তার চতুষ্পদ কুরঙ্গীগতি। নিজের ঘরে ফিরে এসে, দুরন্ত ছুটোছুটিতে, সে হাঁপাচ্ছে সুখের তোলপাড়ে। খুলে ফেলল এলোখোঁপা। পিঠে ছড়িয়ে পড়ল দীর্ঘ কেশরাশি। চুলটা বাঁধতে হবে প্রথম। চুল-বাঁধার ক্লিপ আছে কাঁটা আছে ফিতে আছে তার। একটা আরশিও আছে আলাদা। কিংবা ওই আরশিটাই তার মস্ত এক দুঃখ জীবনের। কাঠের ফ্রেমে বাঁধা ছোট একটা আরশি দেয়ালে পেরেক ঠুকে ঝোলানো থাকে তার জন্য। মরা-মানুষের ফোটোর মতো। নিজের মুখটুকুই দেখা যায় না ভালো করে। তথাপি দর্পণ। নিজেকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার দেখা। পিঠের এলোচুলকে চিরুনির আঁচড়ে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করার হুটোপাটিতে চিরুনির দাঁতে চুল উঠে এলেও আপাতত কোনো দুঃখ নেই। আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে থতু ছিটিয়ে জানালায় ছুঁড়ে ফেলে যত তাড়াতাড়ি আর যত সুচারু ক্রিয়ায় সম্ভব, কেশ-প্রসাধনের ব্যস্ততায়

মরা-মানুষেব ফোটোর আদলে দেয়ালের একরত্তি কাচে নিজেব জ্যান্ত মুখটুকুর দিকে অপলক থেকে সে মনে মনে একটা হিসেব কষে নেয়। যেভাবেই হোক, মা বা দিদিমণিরা সাজগোজ সেরে বেরিয়ে আসার আগেই তাকে গিয়ে পৌঁছতে হবে ওঁদের ঘবে। বড় বড় লম্বা কাচের ড্রেসিং-টেবিল রয়েছে ঘরে ঘরে। পা থেকে মাথা অব্দি গোটা শরীরটাই ছায়া ফেলে সেখানে। নিজেকে চেনা যায। এত বড় সংসারে ওই একমাত্র জায়গা, যেখানে ভাগ বসালে টেরটি পায় না কেউ। এ-তো আর দেশগাঁয়ের ঠাকুরদালানের পুকুর-ইঁদারা নয় যে, ছায়া পড়লে সব জল অপবিত্তির হবে। কালো মেয়ের ছাপ লেপটে থাকে না ওদের কাচে। ক্ষয়েও যায় না, চল্‌তাও ওঠে না ছিঁটেফোঁটা।

রাধার আইঢাই বাড়ে। বড্ড দেবি হয়ে যাচ্ছে তার। হাঁপিযে ওঠে। চুল-বাঁধার শেষে, যেহেতু মেয়ে, একটু তো প্রসাধন সাবতেই হবে। তিন মাস চার মাস অন্তর একটা কবে পাউডারের কৌটো আর স্নোর-শিশি সে মাযের কাছ থেকে এমনিতেই পেযে থাকে। তাছাড়াও দিদিমণিদেব ড্রেসিংটেবিল থেকে বাতিল হয়ে-যাওয়া বা ফেলে-দেওযা নখের পালিশ, লিপস্টিক, ভ্রু-আঁকাব পেনসিল, ক্রিমেব টিউব, নানাবঙেব টিপ, কুড়িয়ে বাড়িযে যা সে পায়, সবই লুকিয়ে বাখে বাকশোব ভেতর। যখের ধন তার। এমন দিনে সবই কাজে লেগে যায। বাঁ-হাতেব আঙুলেব নখ কাটেনি আজ প্রায় তিন মাস। আস্তে আস্তে আলতো কবে পালিশ বুলোতে বুলোতে ধবধবে শাদা ঝিনুকেব মতো নখগুলো রং বদলে টশটশে পাকা করমচাব আদলে লাল হয়ে ওঠে। আঙুল পাঁচটা ফাঁক কবে হাতেব-পাতা চোখেব ডগায ফেলে পরখ করল। লিপস্টিকটা বড় ছোট হযে এসেছে। শেষ যেটুকু আছে, জোব করে বুলোলে একটা ঠোঁটেই রং ধরে না। ওষ্ঠে রং ধবিযে অধবে চাপ দিতে হয়। দুটো ঠোঁটেব ঘর্ষণে যেটুকু রঙিন হলো, মন না ভরুক, মেনে নিতে হয় বাস্তবকে। দিদিমণিদেব কাছে চাওয়া যায় না এসব। চাইলে আস্তটাই চাইতে হয। অন্যের এঁটো, বিশেষত বাধার এঁটো, ছোঁবেন কেন ওঁরা? আবেক মুশকিল, টিপ আছে অনেকগুলি। তুঁতে বঙেব শাড়ি আর নেভি-ব্লু ব্লাউজই যদি পছন্দ হলো, রঙ মিলিয়ে টিপ নেই তাব। এটুকু সে অবিশ্যি চাইতেই পারে মুন্নিদিদিব কাছে। ওঁদের অঢেল।

গলায একটা ইমিটেশন আছে তাব। মা দিয়েছিলেন। আরো একটি হাব—খাঁটি চাঁদিব ঝলমলে স্টেনলেস-স্টিলেব চেনে চুনি পাথবেব লকেট। টকটকে লাল পাথব ঘিবে শাদা-শাদা মুক্তো অনেকগুলো। আসলে সবই নকল। পাথব বা কাচ—জানে না কে। আমেরিকা থেকে মুন্নিদিদিকে এনে দিয়েছিলেন ওদের জ্যাঠতুতো দিদি-জামাইবাবু। দু-চারটে নকল মুক্তো খসে পডাব পর যখন সবটাই বাতিল, বড় সহজেই সেটা পেয়ে গিয়েছিল বাধা। সেটা সে পবে না কখনও। একবাব গলায বেঁধে গাঁয়ে গিয়েছিল। হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল ঘরে ঘরে। সেটা সে আজও পরবে না। দিদিমণিদের পাশে অত বেশি ঝকমকানিতে মা ভ্রূ কুঁচকোবেন। ববং মাযেব-দেওয়া ইমিটেশনই ভালো। খাঁটি সোনার আদল। কান দুটো ফাঁকা থাকবে। দুটো হাতই ন্যাড়া। কোনো আপশোশ নেই। মাযের ব্যাঙ্কের লকারে কাঁড়িকাঁড়ি সোনা। দিদিমণিরা ছুঁয়েও দেখেন না কেউ। বাজকন্যে সেজে রাস্তায় বেরুলেই নাকি চোর-ছিনতাইযের ভয়। ওঁরা সবাই মেমসাহেব

হয়ে যেতেই লুটেরা লোকগুলোকে বড় ভালো লেগে যায় রাধার। ওঁদের অঢেল সোনাদানা এবং রাধার কিছুই না-থাকা এক জায়গায় এনে মিলিয়ে-মিশিয়ে সবাইকে এক করে দিয়েছে মস্তানরা। দিদিমণিদের হারাতে হয়েছে অনেক কিছুই। সবটুকুই পেয়ে গেছে রাধা—ফ্যাশন।

রান্নাঘরের দিকে মা-র গলার স্বর! কী সব্বোনাশ! চঞ্চলতা বাড়ে। ছুটে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দেয়। তার এখনও অনেক বাকি। আসল কাজই যে হল নি গ। দিশেহারা রাধা হাঁসফাসে ঘামতে শুরু করল। ঘামে ঘামে বিচ্ছিরি লেপটে যেতে পারে মুখের স্নো-পাউডার। এবং তখনই ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে দিতে হয়। সিল্কের শাড়ি পরা যায় না ফুরফুরে পাখার তলায়।

ঘরে-পরার ন্যাতান্যাতা লাল-সবুজে ডুবিকাটা বিচ্ছিরি শাড়িটা সে হুড়ুম-হাড়ুম টানে গা থেকে খুলে ফেলল। দ্রুত, অতি দ্রুত, চিকনের কাজ করা শাদা একমাত্র ভালো সায়াটা তার, পুরনো বলে মা যেটা ফেলে দিয়েছিলেন, সে কুড়িয়ে রেখেছে, তড়িঘড়ি মাথায় গলিয়ে দিলো। সিল্কের শাড়ি পরবে যদি, তবে আর খয়েরি রঙের কালকুষ্টি ছেঁড়া সায়াটা কেন? এবং একই তাগিদে ইলাস্টিক-ফেঁসে-যাওয়া ঢলঢলে ছোটজামাটাও বদলে নিতে হয়। মাকে লুকিয়ে, নিজের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে বছর দুয়েক আগে সে কিনেছিল ছত্রিশ সাইজের 'মেইডেনফর্ম'। ধোওয়া-কাচার সময় রোজই দুই দিদিমণির জামাগুলো সে দেখে। একদিন কলতলায় বসে নিজের বুকের মাপটাও সে বুঝে নিয়েছিল আড়ালে। বড় শখ ছিল, এ-রকম একটা নিজের জন্য পাবার এবং একদিন স্বপ্নটা যদি সত্যিই সত্যি হলো, সেটা ব্যবহারের খুব বেশি সুযোগ জোটে না কপালে। ভাঁজে ভাঁজে পাট করে বাক্সের ভেতরই গুটিয়ে রাখতে হয় বারোমাস। মাঝেমধ্যে এমন সাজগোজের দিন এলে যা-হোক এভাবে বুক চিতিয়ে হাঁটার আরাম দু-চার দিন। সত্যি আরাম। দুটো হাত পেছনে নিয়ে পিঠের দিকে হুক আঁটতে গিয়ে শিরদাঁড়াটা টানটান সোজা হয়ে উঠল। দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় চোখ রেখে পায়ে পায়ে পিছোতে থাকে সে। যতক্ষণ না মুখ-গলা থেকে নামতে নামতে কাচের ফ্রেমের সবটা জুড়ে তার আঁটোসাটো নিটোল বক্ষ আবৃত হয়েও অর্ধনগ্নতায়, তার কালো কুচ্ছিত চামড়ায় ধবধবে শাদা সুস্পষ্ট দুটি শাঁখের আদল ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। মুগ্ধতা বাড়ে। কত মনোলোভা হতে পারে সে? খুব একটা ফ্যালনা নয় নিশ্চয়ই।

গাঢ় নীল বর্ণে ঢেকে যায় সবটাই। বুকের দিকে ব্লাউজের হুকগুলো এঁটে দেবার পরও গোটা দুয়েক সেফটিপিন দরকার হয়। সিন্‌থেটিক শাড়িটা তুলে নিতে হয় হাতে। ভাঁজ ভাঙার পাট নেই। হাত ফসকে অনেকটাই হড়হড়িয়ে গড়িয়ে যায় মাটিতে। ঘুরে ঘুরে পাকে পাকে শাড়িটা গায়ের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে রূপবতী হয়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্তে হৃদয়ে মৃদঙ্গবোল।

নিত্যিদিন হাজারগণ্ডা ফাইফরমাশ খাটতে হাটেবাজারে দোকানপাটে যাওয়া-আসায়, রাস্তায়, অন্যদের চোখে সে চিনেছে নিজেকে। এবং সেই রাস্তায় আজ যদি সে মা-দিদিমণি-দাদাবাবুর সঙ্গে একই গাড়িতে সিনেমায় হোটেলে—রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠার পর নিজের মধ্যেই কী অদ্ভুত শিহরন। ভাবতেও সারা শরীরে কাঁটা দিচ্ছে তার। বিভোর

হয়ে পড়ার দিগদারিতে বারবার ভুল হয়ে যায়। বারবার শোধরাতে হয়। আঁচলের কুঁচি সাজিয়ে পিঠে ফেলে কিংবা পিঠ বাঁকিয়ে, নিচু হয়ে নাভিমূলের কুঁচিকে হাঁটুর তলায় তড়িঘড়ি বিন্যস্ত করার কৌশলে যত তার ছটফটানি, বুকের ঢিপঢিপ বাড়ে। যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতাই ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে চাইছে। ওদিকে যদি তৈরি হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মা-দিদিমণিরা? যদি ওরই জন্য শুধু অপেক্ষা করতে হয় সবাইকে? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা কী লজ্জা! মা বকবেন। খ্যাঁকখ্যাঁক করবেন দাদাবাবু।

কিন্তু যার শেষ নেই, কোথায় যে তাকে থামিয়ে দিতে হয়, ঠিক-ঠিক জানে না বলেই রাধা আরো বেশি দিশেহারা। পায়ের তলায় গোল হয়ে পড়ে-থাকা পরিত্যক্ত শায়াশাড়ি দলা পাকিয়ে তক্তপোশের দিকে ছুঁড়ে ফেলেই খাটো আরশিতে আরো একবার নিজেকে পরখ করে নেবার বাসনায় দু-চার পা এগিয়ে, ছায়াপাতে, নিজেরই বদলে যাওয়া মুখশ্রী, বুঝি-বা অন্য কেউ—নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার নেশায় অচেনা-নিজেকে খুঁজেপেতে দেখার মজাকেই ভালো লাগতে শুরু করে। রাধা দেয়ালে-টাঙানো কোনো সুন্দরীর ফোটো হয়ে যায়। তাকিয়ে থাকা যায় না স্থিরভাবে। চোখের পাতায় পলক পড়ে যায়। রাধা টিভির পর্দায় প্রতিদিনের সংবাদ-প্রচারক খৈ-ফোটানো ইংরেজি-বুলির সেই মেমসাহেব হয়ে ওঠে। আরশিতে চোখ রেখে আপন মনে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বললও কিছু নিবর্থক প্রলাপ। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখজোড়াকে তেরচা করে তাকাল আরশির কাচে। ঘাড়টা একটু বেঁকে যায় পেছনের দিকে। বুকটা ঢেউ খেলিয়ে উঁচিয়ে উঠল আরো। নিজেকেই ভ্রূকুটি। সিনেমার নায়িকা হয়ে ওঠে রাধা। শেষ পর্যন্ত আরশিটাকেই বড় বেশি ভালো লেগে যায়। পরম সম্পদ জীবনের। মানুষের কত আপন হতে পারে একরত্তি একটা ফ্রেমে বাঁধা কাচ!

হঠাৎ নাড়া খেল। দরজায় ধাক্কা—'বলি, অ ভালোমানুষের মেয়ে। রাজকন্যের ডাক পড়েচে গ। গাড়ি চেপে কোথায় নিকি যাবে? ভালোমন্দ খানাপিনা, মণ্ডামিঠাই, ছিনিমা বায়েস্কোপ.........'

রাধা ঘুরে দাঁড়িয়েই সহসা দরজা খোলে না। এলোমেলোভাবে যা কিছু ছড়ানো-ছিটোনো ছিল তক্তপোশে—স্নো-পাউডার, ভিখ-মাগা বা কুড়োনো প্রসাধনী শিশি কৌটো টিউব সবই হুড়মুড়িয়ে বাকশোয় গুঁজে দিতে লাগল। বাক্‌শোটা বন্ধ করে তক্তপোশের তলায় ঠেলে দিতে হবে। চাবিটা লুকোনো থাকবে। খিটকেল বুড়িকে বিশ্বাস নেই। ঘর ফাঁকা পেলে ও-বুড়ি নির্ঘাৎ ঘাঁটাঘাঁটি করবে সব। এ-বাকশোয় রাধার অনেক টাকাপয়সা।

দরজার বাইরে তখনও বুড়ির ঘ্যানোর ঘ্যানোর—'বাঁদি হ'ল শাহাজাদি, পুঁটি বলে, আমিও তবে ইলিশ চাঁদি......'

গোটা শরীরের রাগে-জ্বালায় রাধা ফুঁসতে থাকে। দরজা খুলতেই হয়। গোপালের-মা আচমকা একটু ভড়কে গিয়েই হয়তো ঘাড়টা ছুঁচোল করে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল—'আ মরণ......'

রাধা নিশ্চিতই এসব মরসুমী ঝি-চাকরদের আমল দিতে বাধ্য নয়। ঘর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবার মুখে একবার ঝাঁঝিয়ে উঠল—'মরণ? মরণ আমার না তোমার

গ বুড়ি? কেনে, চোখ টাটাচ্ছে? হিংসেয় হিংসেয় অতই যদি গ্যাস জমে পেটে, যাও না......বয়েস ত' হয়েছে গ, মরো না গিয়ে এই বারে। তুমিই মরো......'

পনেরয় বিধবা গোপালের-মা পরের দোরে দোরে এভাবে কামড়াকামড়ি করেই তিন-কুড়ি বয়সে এসে ঠেকেছে যেহেতু, জিভটা তার খুবই শাণানো। খেঁকিয়ে উঠল —'যা ছেমরি, যা। মর গে তুই। তুই-ই মর। পেট ভরে না ভাতে, সোনার আংটি হাতে। পরের ঘরে ন্যাতা মুছবি আর নিজের ঠোঁটে আলতা ঘষবি। মরণ ত' তোব রে। এ-বাড়িতে তোর ওই মরণ দেখে তবে আমি যাব লো পোড়াকপালী....'

বাক্‌যুদ্ধে, বলা বাহুল্য, আরো দৃপ্ত তেজে ফেটে পড়তে পারত রাধা। কিন্তু তার সময় নেই। বুড়িকে ভেংচি দেখানোর ভঙ্গিতেই একলাফে ঘুরে দাঁড়িয়ে চঞ্চলা হরিণীছন্দে ছুটতে শুরু করল। দূর থেকেই মা আর দাদাবাবুর গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল। বকুনিঝকুনি কাউকে। নিশানাটা সে নিজেই কিনা, ভয় ছিল। বুকের ভয়েই পায়ের উদ্দাম গতি মন্থর হয়ে আসে। তারই জন্য দেরি হয়ে গেল না তো ওঁদের? ছিঃ ছিঃ, এবার কী হবে?

হয় না কিছুই। যেটা ওদের লিভিংরুম বা বাধা যাকে উঠোনের-ঘর বলেই জানে, শিথিল ভীরু পায়ে সেখানে পৌঁছে এক বুক নিঃশ্বাস ফিরে পেল সে। কিংবা বিষাদ। তাকে লক্ষই করছেন না কেউ। অথচ তারই স্তম্ভিত বিস্ময়ের নাগালে মা—তাঁকে মা হয়ে থাকতে হবে বলেই যেন চিরকাল রাজরানী। কোথাও কোনো সাজগোজের জেল্লা নেই। টুকটুকে ফর্সা গালে গলায় কপালে থুতনিতে সামান্য স্নো-পাউডারের প্রলেপ হয়তো আছে। ঠোঁটে পানের লাল,সিঁথিতে সিঁদুর রেখা, কপালে লাল টিপ। দেখলেই ভক্তি জাগে। ঠিক যেন দুগ্‌গা পিতিমের মুখখানা। বাহারের নক্‌শা-আঁকা তাঞ্চোর বেনারসী। শাড়ির পিস কেটে বাহারের ব্লাউজ। দু-হাতে শাঁখা পলা লোহার সঙ্গে কয়েক গাছা চুড়ি, একটা করে চওড়া বাউটি, গলায় ঝলমলে পাথর-সেট চন্দ্রহার। রাধা জানে, সবটাই সোনা নয়। আবার ফ্যালনাও নয় খুব। চাঁদি-রুপোর ওপর জেল্লামারা সোনাব জল। সোনা বলেই ভুল করতে পারে কেউ। থাবা মারতে পারে গাড়ির ভেতর হাত গলিয়ে। সেখানে হাত তুলবে যে, রাধার বিশ্বাস—কুষ্ঠ হবে তার। মায়ের দিকে তাকিয়ে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোকে। টিভির 'বই'-এ দুশমনগুলোকে প্রায়ই দেখা যায়। সামনাসামনি জ্যান্ত এসে দাঁড়ালে হয়তো ভয় করবে একটু। একটা পরিকল্পনার ছক্‌ও চট করে মগজে ঝলকে উঠল তার। গাড়ির পেছনের সিটে মাকে মাঝখানে [illegible] বসবে ওরা তিন বোন। যদি হাত বাড়ায় কেউ, আচ্ছাসে কামড়ে দেবে। চিৎকার করবে। শয়তানরা পালাবে। মানুষজন ছুটে আসবে। বেধড়ক মার আঁটকুড়ের ব্যাটা বদমাশ বজ্জাতগুলোকে।

ওপাশে মুন্নিদিদির খুব একটা ধড়াচূড়া নেই। বেগুনি রঙের কামিজ আর শাদা শালোয়ার শাদা ওড়নায় এক বিনুনি ঝুলছে পিঠে।

শার্টপ্যান্ট চুলের বাহারে দাদাবাবু পাক্কা সাহেব।

রাধার ভরপুর প্রাণের উচ্ছ্বাস অকুস্থলে এসে সহসা থেমে গেছে। অনুল্লেখ্যভাবে এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে সে বুকের দুরুদুরুতে হিসেব বুঝতে চায়। বুল্লিদিদি কাছেপিঠে

নেই। নির্ঘাত গড়বড় কোথাও। ওঁদের মেজাজমর্জি বিগড়ে গেলে, বুকের ভেতর ভয় কাঁপে। শেষে যদি বেরুনোই বন্ধ হয়ে যায়!

স্বভাবে গোঁয়ার ভঙ্গিতে ঝাঁঝিয়ে উঠল বাবন—'চলো, চলো তো, আমবা চলে যাই। ও থাকুক একা। ওকে যেতে হবে না।'

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত কিরণময়ী যথেষ্টই বিরক্ত। এগোলেন অন্য দিকে। বুলবুলির দরজায় পৌঁছে অসহ্য তিক্ততায়—'কী করছিস বল্ দেখি তুই? এই দ্যাখ রাধুর অব্দি হয়ে গেল। আব তুই.....তোবা একেবারে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মাবলি আমাকে......'

বন্ধ ঘবের ভেতর থেকে আওয়াজ এল—'বলছি তো, আব মাত্র পাঁচ মিনিট......'

বাবনেব ক্রোধ বাড়ে—'হ্যাঁ, সে-তো আধ ঘণ্টা ধবে বলছিস তুই, আর মাত্র পাঁচ মিনিট। এখানেই যে পাঁচটা বেজে গেল।'

বেহাল কিবণময়ী—'ন্নাহ্ কোথাও বেরুবার কথা উঠলেই যদি এরকম করিস তোবা! এ-তো কোনো বিয়েবাড়ি কি বাপির সঙ্গে কোথাও পার্টিতে যাচ্ছিস না তুই! আব এতই যদি তোর সাজেব ধাক্কা, তাহলে আগে থেকেই বসলে পারিস......'

বাবন তাব বাগঝালে চারপাশ কাঁপিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। তাব সর্বশেষ প্রস্তাব —'নেমে এসো সবাই। ও থাক। আর মিনিট পাঁচেক দেখব। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বেব করতে কবতে যদি নেমে আসে তো ভালো। যাবে। নইলে থাকবে বাড়িতে।'

বাইরে প্রবল চাপ ছিল। দরজা খুলতে বাধ্য হলো বুলবুলি। ঝলকে উঠল চোখগুলো। অতশত বোঝে না রাধা। ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধবল দু-হাতে—'তুমি......তুমি নিরা গুঁড়ো সাবান গ বুল্লিদিদি!'

হাসছে মুনমুন। হাসিটা উচ্চকিত হলো—'এ নাইস ইমিটেশন, নো ডাউট। বাট হোয়াট দ্য শিট আব ইউ ডুয়িং ফব সো লঙ?'

মেয়ে কী সাজল, সাবান না চকোলেট অথবা আতসবাজি—এই মুহূর্তে খুব একটা উৎসাহ ছিল না কিরণময়ীব। বরং ভালোই লাগে সন্তানদেব এই ফুবফুরে সাহেবি দস্তুর। নিজে যা পান নি ছেলেবেলায়, যদি ওবা পায়! কিংবা নিজেব জীবনে কিছু একটা হতে চাওয়া এবং কিছুই হয়ে উঠতে না-পাবার যোগবিয়োগগুণভাগশেষে ওদেব দাপাদাপি-হল্লায় যে-ভরাট সংসাবসুখ, আপাতত সেখানেও উদ্দীপিত হতে না-পাবাব হেতু—ছেলেব গোঁ। বৈজু ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে নিজেই গাড়ি চালাবে বাবন? তাকালেন বুলবুলির দিকে। খিঁচিয়ে উঠলেন—'ঢের হয়েছে। সাজগোজ ফুরিয়েছে তো তোর? নে, এবাব চল....'

'না। তোমরা যাও না, নিচে যাও। আমি আসছি এক্ষুনি।

'সে কি? এখনও হয়নি? আর....আর কী কববি তুই?'

'আঃ, বলছি তো, তোমবা নিচে গিয়ে গাড়ি বের করো। আমার হয়ে যাবে।'

নাজেহাল কিরণময়ী। কথা শোনে না কেউ। কোনো দিকে নাড়ানোও যায় না কাউকে। বিবস মুখভারে এগোলেন সামনের দিকে। মেয়েদের চেয়ে এই মুহূর্তে ছেলের ভাবনাটাই বড়। একবাশ বিবক্তিব ঝাঁঝে, আপন মনেই—'সব কিছুরই সীমা আছে একটা। দ্যাখ্ দেখি, এমনিতেই এত হুড়মুড়িয়ে গাড়ি চালায় বাবন। তাব ওপর এখানেই কত

সময় নষ্ট করে দিচ্ছিস তোরা। আজ যে কী কাণ্ডটা ও করবে রাস্তায়! আমার বাপু ভয় করছে। তার চেয়ে বরং বৈজুকেই বলি, আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'ওফ্ ফ্যান্টাস্টিক! মা দেখে যাও, দেখে যাও বুলবুলি কী করছে........' বুঝি জানালা থেকেই কিছু দেখে ফেলেছিল মুনমুন। চিৎকার— 'এ লিভিং অ্যাড-ফিল্ম গার্ল ইজ নাউ উইথ আস....'

ফিরেও তাকালেন না কিরণময়ী। প্রয়োজন নেই তার।

ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে মুনমুন। টবে টরে ছিল বাধা। এভাবেই কোনো ছুতোয় ওদের কারুর ঘরে ঢুকে পড়ার ছুকছুক ছিল তার। মুন্নিদিদির পিছু পিছু পা বাড়িয়ে চলে এল বুল্লিদিদির কাছে। প্রবল উচ্ছ্বাসে—'এ কী গ! নিরা সাবানের সেই মেয়েটার ছবিটা এমনধারা তুলে নিয়েছ গ গালেমুখে? কী সুন্দর লাগছে তোমাকে! ঠিক......ঠিক যেন সেই টিভির অ্যাডভার্টাইসের মেয়েটা......'

বুলবুলি ফিরে গিয়ে আবার বসেছে ড্রেসিংটেবিলে। বাঁদিকে রঙিন ছবিটা খোলাই ছিল। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজি সিনেমা পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে অফসেট ফোটোপ্রিন্টের উজ্জ্বল মুদ্রণে 'নিরা'—ডেটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনে হাস্যোচ্ছল যুবকযুবতীদের সেই ছবি, টিভির বিজ্ঞাপনেও সবাক সচলতায় দেখা যায় যাদের,মত্ত নৃত্যোৎসবের পুরোভাগে ক্লোজ-আপের সেই মেয়ে, যাকে বাঁ-পাশে মডেল রেখে তিলে তিলে অসম্ভব যত্নে নিজেকে গড়ে তুলেছে বুলবুলি। অ্যাসিড-ওয়াশ জিন্সের প্যান্ট, গায়ে কত যে সেলাইফোঁড়াই, কত যে পকেট! ঢিলেঢালা হলুদ শার্ট, শার্টের বুকে বড় বড় লাল হরফে—'ওয়ন স্টেপ ফার্দার, প্লিজ......'

মাথার চুলে হরেক বাহাদুরি। হাসতে হাসতেই ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় মুনমুন। একতলায় নিশ্চয়ই তুলকালাম চলছে দাদার। ওপরে উঠে আসতে পারে আবার। বুলবুলির ওপর গোঁয়ার রাগটা বোনেদের ওপর পড়লে খামোকা তাকেও সইতে হয় জ্বালা।

বাধা ছাড়তে পারে না তার বুল্লিদিদিকে। বইয়ের ছবি আর জ্যান্ত মানুষকে সে রঙে রঙে মেলায়। তার চোখের কালো কালো ডিমদুটো মাছির মতো ঘনঘন এপাশ-ওপাশ ঘোরে। সবটাই এক রকম নয়। ফারাকও নেই খুব বেশি। পয়সা থাকলে এমনটা হয়। হাজারগণ্ডা সাজগোজের জিনিসপত্তর আর ইংরেজি ইশকুলের পড়ালেখা জানা থাকলে তামাম দুনিয়ার সব মেয়েই এক ছাঁচে হয়ে উঠতে পারে একই রকম। ব্যাটাছেলেদের ধরনধারণ অনেকটাই কেড়ে নিতে পারে। বইয়ের ছবি জ্যান্ত মেয়েছেলে হয়ে যায়। জ্যান্ত মেয়েদের ছবি বইয়ে ছাপা হয়।

পড়ালেখা জানে না বাধা। কিন্তু বুল্লিদিদির শার্টের বুকে ছবির মতো সুন্দর টানা টানা হরফগুলি দেখতে পায়। নিশ্চয়ই খুব ভালো ভালো কথা।

ড্রেসিং-টেবিলের কাচে ছায়া রেখে ঢেউ-খেলানো টুলে বসে দাঁতে ক্লিপ কামড়ে দু'হাতের আঙুলে বাঁ-দিকে কানের পাশে চুলের গোছ বিন্যস্ত করছিল বুলবুলি। সেখানেই ক্লিপটা গুঁজবে বলে। পাশেই মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে বাধা তার অবাক চোখের হাপিত্যেশে তাকিয়ে থাকে—কাগজের ছাপ থেকে কত বুদ্ধি খাটিয়ে ফিনফিনে শ্যাম্পুকরা

চুলগুলোকে অবিকল ছবি বানিয়ে ফেলা যায়? পিঠ-ছাপানো চুলকে ভাঁজে-ভাঁজে নানান কায়দায় খাটো করে আনতে ক'-ডজন ক্লিপ লেগেছে বুল্লিদিদির? আঁটোসাটো বাঁধুনির পরও শুকনো খেজুরপাতার মতো এক গোছ চুল ঝুলে পড়েছে কপালে! বাড়তি চুলগুলো কোত্থেকে এল? রাধা হিসেব পায় না। ড্রেসিং-টেবিলে, টেবিলের খোলা ড্রয়ারে ছড়ানো-ছিটোনো অসংখ্য উপকরণসামগ্রীর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে বুক টেনে ভরাট একটা নিঃশ্বাস নেবার লোভ হলো তার। সব মিলিয়ে কী ম-ম মিষ্টি একটা গন্ধ ঘর ভরে! সব গন্ধই এখন বুল্লিদিদির গায়ে। ছাপা-কাগজের ফোটো হয়ে উঠতে কত পেন্ট ঘষতে হয়েছে গালেমুখে? ভুরু আঁকায় বা চোখের পাতায় পেনসিল বা আইলাইনার বা ম্যাশকারা-ব্রাশ টেনে ঠাকুর-দেবতার পিতিমের ঢঙে সত্যি সত্যি কেমন টানা টানা হয়ে উঠতে পারে খুদে খুদে একজোড়া চোখ! কিংবা যে-লিপস্টিকের আলাদা কোনো রং নেই, কমলালেবুর কোয়ার ঢঙে তেলতেলে আর চকচকে ঠোঁট অথবা বয়সগোটা আর ব্রণে ব্রণে কী বিচ্ছিরি ফোল-ফোলা গাল দুটো হরেক স্নোপাউডার আর লোশন ঘষে ঘষে, আমগাছে হিমসাগর পাকতে শুরু করলে যেমন হয়, বাহারের মোলায়েম আর নরম তুলতুলে হয়ে উঠেছে। অবোধ শিশুর চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাধার অবাক লাগে—বুল্লিদিদির যখন বিয়ে হবে, সেদিন কী হবে? মুণ্ডুটা মেয়েছেলের আর গাগতর ব্যাটাছেলের? পোশাকআশাকে এমনধারা সাজবে? মস্ত পয়সাওলা ঘরের জবরদস্ত সাহেব-বর হবে বুল্লিদিদির। লাখ লাখ টাকা খরচা হবে সে-বিয়েতে। বুল্লিদিদিও মেমসাহেব।

বিজ্ঞাপন চেনে বুলবুলি। ডেটারজেন্ট পাউডার জানে রাধা। বড়সড় বালতি বা গামলার গরম জলে এক মুঠো ছড়িয়ে দিয়ে নাড়লে গজগজিয়ে উঠবে ফেনা। ফেনার পাহাড়! কী যে মাহাত্ম্য তার। অপার মুগ্ধতায় তার দুটো হাত বুলবুলির গায়ে উঠে আসে। জিনসের প্যান্ট আর হলুদ জামায় বিলি কেটেও কত সুখ! বুঝি সবই সেই 'নিরা' গুঁড়ো সাবানের আলৌকিক যাদু। শুধু সাবানের ফেনায় কাপড় কাচলেই বুঝি জ্যান্ত মানুষ এমন ছাপা-বইয়ের ছবি হয়ে উঠতে পারে।

আরশির কাচে মুখ রেখে আত্মমগ্ন বুলবুলি মাথাটা বাঁদিকে ঈষৎ বাঁকিয়ে, দুটো হাত তুলে প্রায় হাত-চুড়ির আয়তনে ঢাউশ একটা স্টেনলেস স্টিলের রিং বাঁধছিল কানে। হঠাৎ-ই গায়ের ওপর পেট বা বুকের পাশে, বগলের ধার ঘেঁষে আরেক জনের ছোঁয়ায় গোটা শরীর জুড়ে চকিত তড়িৎপ্রবাহে কেঁপে ওঠে হাত। খসে পড়ে স্টিলের রিং। ধমকে উঠল সে—'কী? কী করছিস তুই?'

'ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছি গ তোমাকে।'

'ছুঁয়ে দেখছিস মানে? আমি কি তোর বয়ফ্রেন্ড?'

হাত বাড়িয়ে রিংটা তুলে দিলো রাধা। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে—'কী গ? সে-আবার কী?'

'বয়ফ্রেন্ড জানিস না?' বুলবুলি চোখ টিপে হাসে—' ছেলে রে, ছেলেবন্ধু।'

'এম্মা ছিঃ ছিঃ, আমি মুখ্যু মেয়েছেলে......' রাধা জিভ কাটল—'সে-আমার থাকবে কী? কী কইবে দশজনে? আমি কি তোমাদের মতোন ইংজিরি জানি?'

আরশিমগ্ন বুলবুলি নতুন করে ঝুঁকে পড়ল নিজেরই ছায়ায়, দর্পণে। অন্যমনস্ক

সুরে— 'বেশি বকিসনি। যা দেখি, নিচে যা। রেগে কাঁই হয়ে আছে সবাই। দ্যাখ তো গিয়ে গাড়ি বের করেছে কিনা। আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।'

রাধা নড়ল না। তাকিয়ে রইল। বুল্লিদিদিকেই দেখে সে। প্রতিদিনের চেয়ে একটু আলাদা নিয়মে। ঠাকুরঘরে বসে নিত্যি সকালবেলা মা যেমন করে তাঁর গোপালকে ফুলচন্দন তুলসীতে সাজান, বুঝি আরশির এপারে বুল্লিদিদি বুল্লিদিদিই থাকে। ওপারে নিজেই নিজের গোপালঠাকুর হয়ে যায়। জিন্‌সের প্যান্ট আর শার্ট গায়ে চাপিয়ে যদি ব্যাটাছেলে হবারই সাধ, ভক্তি দিয়ে সোহাগ দিয়ে খুঁটে খুঁটে যত্ন করে তার নিজেরই পুজো আরশিতে।

বুল্লিদিদি যদি গোপালঠাকুর, রাধা চকিতেই একটা সুযোগ পেয়ে যায়। সত্যি সত্যি রাধা হয়ে উঠল সে। শাড়িব্লাউজ বা চুলের বাঁধুনিতে বাঙালি ঘরের বাঙালি মেয়ে হয়ে বুল্লিদিদির পেছনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। যেন যমুনা পুলিনে নির্মল স্বচ্ছ জলের নিস্তরঙ্গতায় ভরাট হয়ে ওঠে আরশির কাচ। সেখানে ছোট-বড় নেই, ফর্সা-কালোর ফাবাক নেই, ধনী-নির্ধন নেই। রাধা চিনে নিতে পারে নিজেকে। দু'হাতের আঙুলে বুকের ওপর আঁচলের ভাঁজগুলি পাট করে নেবার ভঙ্গিতে ঘাড় সোজা রেখে তাকায় নিজের ছায়ায়। খুব একটা ফ্যালনা নয় একেবারে। ওঁদের সঙ্গে গাড়িতে যেতে অথবা পাশাপাশি গা ঘেঁষে চলতে অচ্ছুত কেন সে তবে? দিদিমণিদের হাতে-গলায় সোনাদানা কিছুই থাকে না কারুর। হাতেব কব্জিতে ঘড়ি থাকে। যদি দু'-গাছা করে চুড়িও থাকত তার! সামান্য খুঁতখুঁত।

এবং সেই ঘড়ির কাঁটাই জোরদার এক গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলল এর পর। নিচের তলায় আগুন জ্বলছে—গাড়ি বের কবা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। দাদার চিৎকার, মা-র অশান্তি। বুলবুলি তলা থেকে অগ্নি-উত্থিত ধোঁয়ার গন্ধ পেল। কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে সুচারু রূপচর্চার শেষ আঁচড়টুকু সম্পূর্ণ করতে সে বেপরোয়া। দুনিয়ার সব কাজ ফেলে রাখা যায়, মানুষ ফেলে রাখতে পারে না নিজেকে। এর জন্যে যদি দাদার সঙ্গে মায়ের সঙ্গে ফাটাফাটিও করতে হয়, কুছ পরোয়া নেই। সে-ও লড়াকু মেয়ে।

যতটা সম্ভব ব্যস্ততায় নিজের কাজ শেষই করে এনেছিল বুলবুলি। দরজায় এসে দাঁড়াল বুড়ো নন্দলাল, ভগ্নদূতপ্রায়—'দাদাবাবু যে বড্ড রাগারাগি করছেন গ দিদিমণি......'

'সে-আমি কী করব? আমার ভারি বয়েই গেল......' এলোমেলো রইল পড়ে সব! উঠে দাঁড়িয়েছে বুলবুলি। তাড়াতাড়ি-হাতে প্রসাধনের উপকরণগুলি ড্রেসিং-টেবিলে গোছাতে চেষ্টা করে রাধা। ওপাশে মর্যাদার লড়াইয়ে বুঝি আরো বিলম্বিত হবার গোঁ। আরো চড়া বুলবুলির আওয়াজ—'যেমন তেমন করে তো আর যাওয়া যায় না সব জায়গায়। আফটার অল, আওয়ার ফাদার ইজ এ স্যোসালি রেসপেক্‌টেবল অ্যান্ড অনারেবল পার্সন......'

অর্থ বোঝে না নন্দলাল বা রাধা। কিন্তু বাবু-বিবিদের গোঁসা বোঝে। এ-সময় কথা কইতে নেই। চাকরি বাঁচাবার নিয়ম—যার কাছাকাছি আছো, তাকেই সত্য বলে মানো। শার্টপ্যান্টে পুরুষালি, প্রসাধিত শৃঙ্গারে কিশোরী লাবণ্যময়ী—প্রবল দাপটে ঘর

থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলবুলি। নন্দলাল দরজার বাইরে সরে দাঁড়াল। রাধা পিছু পিছু সহচরী ভঙ্গিমায়—'জুতো পরবে না গো বুল্লিদিদি? কোন্ জুতোটা?'

'চল্ দেখি।'

দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটা ছোট ঘরে ওঁদের পাঁচজনের জুতোর পাহাড়। সেটা জুতোরই ঘর। কত যে জুতো! নতুন-পুরনো হরেক ডিজাইন, হরেক সাইজ, হরেক রং। মাসমাইনের একজন মুচি রোজ আসবে সকালবেলা। সব জুতোয় পালিশ দিয়ে যায়। রাধা দেখল, বেছে বেছে সেই হাইহিলের জুতোজোড়াই পায়ে বেঁধেছে বুল্লিদিদি। ধান-ভানার ঢেঁকির ওপর উল্টোদিক থেকে পা রাখলে যেমন, গোড়ালির তলায় প্রায় ইঞ্চি দেড়েক উচুঁ হয়ে থাকে মাটি থেকে। ছোট একটা গোল চাকতি পেছনের দিকে ঠকঠক আওয়াজ তোলে ঠিক ঢেঁকির নালেরই মতো। পায়ের সামনের দিকটা গড়িয়ে নেমে মাটি ছোঁয় দশ আঙুলে। অসম্ভব! ওভাবে হাঁটা যায় না। কিংবা হাঁটা যে সত্যি যায়, অ্যাদ্দিন ধরে দিদিমণিদের দেখেও রাধার কাছে এ-এক অনন্ত রহস্য। এ-বাড়িব আরো হাজারটা হেঁয়ালির মতোই।

কটিভঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে দুলকি চালে নেমে যাচ্ছে বুলবুলি। মন্থর হরিণীক্ষুরধ্বনি। পেছন থেকে দুটো পায়ের ছন্দগতি বা চলার কৌশলে উৎসুক চোখ রেখে পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভাঙে রাধা। হাঁটুজোড়া কি নড়বড় করছে বুল্লিদিদির? ছেঁড়া জুতোয় চলার অভ্যাস নেই যার, তাকে কেন এমনধারা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে? রাধা স্থির পলকে তাকিয়ে থাকে। পাশের রেলিং ধরে সিঁড়ি ভাঙছে বলেই রক্ষে। ডানদিকে বাঁদিকে আচমকা বেকায়দায় হেলে পড়লেই বিপদ। কিংবা তার নিরক্ষর মগজেও ভাবনাটা চকিতে ঝিলিক মেরে ওঠে—আসলে ওদের গাড়ি আছে। ওদের হাঁটাটাই গাড়ি হয়ে যায়। গাড়িই ছোটে, যেভাবে ওরা ছুটতে চায়।

এবং এজন্যেই......শুধু এরই জন্যে ধনী মানুষদের ঘর বড় ভালো লাগে তার। নিচে নেমে এসেই ঝকঝকে তকতকে গাড়ি পেল রাধা।

গাড়িতে ওঠার সময় মায়ের সঙ্গে, দাদাবাবুর সঙ্গে বুল্লিদিদির একচোট তক্কাতক্কি হলো খুব। বুল্লিদিদিও ডাকাবুকো তেডিয়া মেয়ে। লড়ে গেছে একা। অন্য দিকে মায়ের কথাটাও ফেলে দেওয়া যায় না। বুল্লিদিদিব জন্যেই ঘড়ির সময় খাটো হতে হতে পথটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কুড়ি মিনিটে পৌঁছোতে হবে এসপ্লানেড।

সেই গাড়ি দুরন্ত হলো। স্টিয়ারিংয়ে বসে দাদাবাবু মরিয়া।

প্রবল বর্ষণশেষে শেষদুপুরেব বোদ্দুর পেয়েও গোটা কলকাতা তার ঝক্কি সামলে উঠতে পারেনি সূর্যাস্তের পর এখনও সন্ধেবেলায়। এ-তো আর ছাদে বা বারান্দার রেলিংয়ে ভেজা-কাপড় শুকোতে দেওযা নয়। দেশগাঁয়ের মতো মাঠ-মাটিও নেই শহরে। ভেজা ভেজা ন্যাতান্যাতা কলকাতা। ধুয়েমুছে সাফ। সন্ধেবাতির আলো জ্বলতেই হঠাৎ-ছুটির আমেজ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ। রাস্তায় ফুটপাতে লাখো লাখো মানুষের ভিড়। দোকানপাট খুলেছে কিছু কিছু। বাস-মোটরগাড়ি কম। দু'-চারটে ট্রামও চোখে পড়ল। তবু জল। বড় বড় রাস্তার মোড়ে দেশগাঁয়ের এঁদো ডোবার মতো হাঁটুজল কোমরজল আটকে আছে এখনও। গাড়ি গড়ালে ঢেউ ওঠে। ট্র্যাফিক জ্যাম। দূর থেকে বাস-

লরি-মোটর গাড়ির দলা-পাকানো দেখলেই দাদাবাবুকে গাড়ি ঘোরাতে হয়। ফাঁদে আটকে-পড়া ইঁদুর যেমন, নিজেরই চেনা শহরে বেরুবার পথ খুঁজে নিতে হয় অলিগলি ফাঁকফোকরে। দু'মিনিট-তিন মিনিটের পথ পাঁচ মিনিট-সাত মিনিট।

এবং চওড়া বড় রাস্তাকে ফাঁকায় পেয়ে গেলে দিক্‌বিদিক হারিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লায় দুরন্ত ছুট। উদ্বেগে হাঁসফাসে কিরণময়ী অস্থির হয়ে উঠেন। ছেলের নিয়ন্ত্রণে গাড়ির স্টিয়ারিং-ব্রেক-অ্যাকসেলারেটর-ক্লচ যন্ত্রপাতিগুলো তাঁর বুকের হাড়পাজরে ঝমঝমিয়ে বাজে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বারবার করুণ আর্তি—'আস্তে, আস্তে বে বাবন। আর একটু রয়েসয়ে চালা না ছাই। নতুন হাত তোর......'

'ননসেন্স। বকবক করো না তো বেশি। ডিস্টার্ব করো না। বসে থাকো চুপচাপ...' পেছনে না তাকিয়ে স্টিয়ারিংয়ে একাগ্র থেকে ছেলের মুখ-ঝামটা। এবং যখন ন্যাশনাল পারমিটের পাহাড়-উঁচু পেল্লাই একটা লরিকে প্রচণ্ড স্পিডের মাথায় ওভারটেক করতে গিয়ে একজন বুড়ো মানুষকে প্রায় থেঁতলে দিচ্ছিল বাবন অথবা যখন চারপাশে জনরবে হৈ-হৈ-চিৎকার ফেটে পড়ল আচমকা, অঁক করে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন কিরণময়ী। রাধা আর মুনমুন দু'দিক থেকে মাকে জাপটে ধরল। গাড়ি নিয়ে বাবন ছিটকে বেরিয়ে যেতেই সামনের সিটে দাদার পাশে বসে বুলবুলির উচ্ছল হাততালি—'চিয়ার আপ চিয়ার আপ দাদা। স্পিড স্পিড...'

উৎকণ্ঠ শঙ্কায় বুকের হাঁসফাসে হাঁপাচ্ছেন কিরণময়ী। শান্ত মুনমুন যথেষ্ট বিরক্ত যদিও, এই মুহূর্তে, ড্রাইভিংয়ের প্রথম পাঠ তার নিজেরও জানা আছে বলেই হয়তো, হাইস্পিড নেশায় উন্মাদ মানুষকে কিছু বলতে রাজি নয় সে। বরং গলা উঁচিয়ে সম্মুখবর্তী রাস্তার শূন্যতায় নজর রাখে প্রতিটি দামাল মুহূর্তের।

প্রথম ঝলকে ভয় পেয়েছিল রাধা। ভয়টা থাকে না এক সময়। গা-ঘামানিটা থামে। ডান পাশের খোলা জানালায় ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটে ঝাপটে চোখে-মুখে নাকে-বুকে আইঢাই সামলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্তের উত্তেজনায়, যেন নিজেই এক ঝড়, নিজের মধ্যে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়ে মনে মনে ঠাকুরের নাম জপে। হাঁপায়, হাঁপাতে থাকে। কানের পাশে বা কপালের ওপর ছোট ছোট কেশগুচ্ছ এলোমেলো হয়ে যেতে চায়। পিন-করা বুকের আঁচলও ধরে রাখা কঠিন। কিংবা সে নিজেই যখন ডানা মেলে পাখির মতো উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়, বুকের টিপটিপে ভয়ডর থাকে না কিছুই। কোটি কোটি টাকার বিষয়সম্পত্তি দু'জন মাত্র বুড়ো মানুষের জিম্মায় রেখে মা যদি দাদাবাবু-দিদিমণিদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন রাত্তিরবেলা, তবে সে, নিতান্তই এক তুচ্ছ প্রাণী, বেশ তারিয়ে তারিয়ে চেখে চেখে উপভোগ করে নিতে পারে এ-মরণখেলা। গাড়ির ভেতর হু-হু বাতাসে ঘুরে ঘুরে পাক খায় যুঁই, বেল, শিউলি, চাঁপা ফুলের মিষ্টি সুবাস। এঁদের গায়ের দামী দামী সেন্ট বা আতর। চোখ বুজে ঘন নিঃশ্বাসে সুঘ্রাণ বুকে টেনে নিতে নিতে অথবা চোখ খুলে জানালায় চোখ রেখে কলকাতাকে দেখে— পিছিয়ে যাচ্ছে আলোয় আলোয় উজ্জ্বল ঘরবাড়ি দোকানপাট রংবেরংয়ের মানুষের ঝাঁক। চারপাশ দুমড়ে-মুচড়ে মাড়িয়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছে দাদাবাবুর গাড়ি। টিভির পর্দায় অনেক দেখেছে সে এমন মরণখেলা। এভাবেই বনজঙ্গল

পাহাড় ডিঙোয় স্কুটার-মোটরবাইক, তকতকে ঝকঝকে হাইওয়ের রাস্তায় ছোটে গাড়ির পব গাড়ি। কিংবা টিভির পর্দায় রোজই দেখা যায় যাদের, রঙচঙ জলুসে জেল্লামারা জোয়ানমরদ ছেলেমেয়েদের মতোই সাহেবি কেতাদুরস্তে ঝলমল দাদাবাবু-দিদিমণিরা এই মুহূর্তে তার একেবারে নাগালের মধ্যে জ্যান্ত, ভীষণভাবে জ্যান্ত বলেই ওঁদের হৈ-হল্লায় অদ্ভুতভাবে ঠাঁই পেয়ে গিয়ে অশান্ত উদ্বেল রাধা ঘর ও বাইরের সীমানা হারায়—খোলামেলা উদোম শাদা নেটের স্কার্ট, পায়ে দড়ি বাঁধা জুতো, ছেঁড়াফাটা জিনসের শর্টস আর জ্যাকেট, ছেলেদের মতো করে মেয়েদের বয়েজ-কাট হাল্কা হাওয়ায় ওড়ে, মেয়েদের মতো করে ছেলেদের লম্বা চুল ঘোড়ার মুণ্ডু হয়ে লাফায়...মেয়েদের পায়ে কোমরে শেকল, ছেলেদের গলায় স্টিলের চেন, হাতে কর্ডলেস মাইক্রোফোন—কান-ঝালাপালা মাতাল উৎসবে পপ-সঙ পপ-মিউজিক...ইংরেজি গান বিলিতি বাজনা...প্রতি বুধবার রাত ন'টায় 'কাহানিয়া' সিরিয়ালের আগে পপ-টাইম মিনিট দশেক...নাম জানে, ধাম জানে, আজকাল সবই শিখে ফেলেছে রাধা। মুখ্যু মেয়েমানুষ। কিন্তু ফ্যল্‌না নয়। ঘরে বসে সবার সঙ্গে মিলেমিশে গোটা শরীরের রসরক্ত-কাঁপানো সেই উদ্দাম নাচে-গানে বিভোর হয়ে যাবার মতোই, আজ, তুফান-ছোটানো গাড়ির সঙ্গে পাল্লায় সাহেবি দাদাবাবু-দিদিমণিদের গায়ে গা-লেপটে একাকার মাখামাখি হয়ে ভেসে যায়, ভাসতে থাকে। এবং ভাসতে ভাসতে এক সময় গাড়িটা পৌঁছে যায় কোথাও, যেখানে আলোয় আলোয় ছয়লাপ পুজো-প্যান্ডেল অথবা দেবমন্দিরের মতোই প্রাসাদ-মঞ্জিল ঘিরে ঠাকুরদেবতার আদলে দুনিয়া-কাঁপানো সুপারস্টার মহাত্মনবর্গ, যাঁদের দর্শন প্রত্যাশায় ভেতরে-বাইরে, এমন কি, রাস্তায় ফুটপাত ছাপিয়ে অগুনতি ভক্ত সমাবেশ। ভাষা-ধর্ম-বর্ণ ধনী-নির্ধন কোনো ভেদ নেই। কলরব গুঞ্জন ভ্রমরকূজনে সর্বভারতীয় বা জাতীয় পরাগ। গাড়ি থেকে নেমেছে সকলেই। বুলবুলি প্রায় আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে—'এই...এই দাদা, কী হবে? হাউসফুল।'

'কোয়ায়েট ন্যাচারাল। ফিফ্‌থ অর সিক্সথ্ ডে আফটার রিলিজ...'

'দেন্! হোয়াট দ্য হেল্ উই হ্যাভ টু ডু নাউ?'

'কোই বাত নেহি। আলম ঔর ল্যাংড়া বন্ধু ইয়ে দোনো হ্যায় ইধার। মেরি উন্‌সে আভি জান পহচান হ্যায়...' গাড়ির স্টার্ট অব্যাহত ছিল। নতুন করে অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিয়েই স্ফীতবক্ষ অধুনা নায়কভঙ্গিই বুঝি চাগিয়ে উঠল উধ্বগ্রীবায়। বাঁ-হাত স্টিয়ারিংয়ে, ডান হাত জানালার বাইরে। বোনদের দিক তাকাল বাবন—'আজ বহুত ভাও লড়াবে শালারা। ঠিক আছে। তোরা একটু দাঁড়া। আমি গাড়িটা রেখে আসছি এক্ষুনি।'

এক থি লেড়কি

উপচে পড়েছে ভিড়। মাছি-ভনভন কোলাহল-গুঞ্জন হট্টমেলার জটলায় রঙচঙে বাহারের পোশাকে মেক-আপে হরেক নারীপুরুষ যুবক-যুবতী। এদের সকলের জন্যই আজ এক

অতি দীর্ঘ বাদলা দিন ছিল। অলস দুপুর ছিল। দিবাশেষে ম্যাজম্যাজে শরীরের খোয়ারি ভাঙতে ছুটে ছুটে এসে মিলেছে সবাই একই কেন্দ্রে, যেখানে শালোয়ার-কামিজ-ওড়নায় বা জিন্‌সপ্যান্ট হলুদজামায় ফুরফুরে রঙের সমুদ্দুরে মিলেমিশে যায় মুন্নিদিদি বুল্লিদিদিমণি। রাধা গাড়ি থেকে নামে মায়ের সঙ্গে সাবেকি শাড়ি-ব্লাউজে। সর্বাঙ্গে শিহরন কাঁপে তার। কিংবা সে কুণ্ঠায় মলিন। গাড়ি থেকে নেমেও ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ। রাধা মায়ের পাশে, কিছুটা পেছনে, একটু আলাদা। বড় বেশি চুপচাপ।

কী আশ্চয্যি ! দাদাবাবু জানেন ঘাঁতঘোত শুলুকসন্ধান। মোটাসোটা থলথলে চেহারায় এমনিতেই আঠার মাসে বছর। আলসের ডিম। আজ বড়ই চটপটে হড়বড়ে। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলে আলুথালু হয়ে, ঘেমেনেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে যেন মস্ত এক যুদ্ধ জিতে পাঁচ-পাঁচটা টিকিট নিয়ে ফিরলেন। রাধা তার চকমকে চোখে তাকিয়ে দেখল—গোলাপী রঙের পাঁচ-পাঁচটা ছাপ-মারা কাগজ সত্যি। ভীষণ, ভীষণভাবে সত্যি। দুর্লভ টিকিটগুলো ছেড়ে সে তার দাদাবাবুর দিকেই তাকিয়ে থাকে আরো গভীর তন্ময় বিস্ময়ে। পাক্কা সাহেবি প্যান্টজামায় অসাধ্য সাধনের তেজী জোয়ান পুরুষ।

মূল ছবি শুরুর আগেই, প্রবেশ মুহূর্তে, প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গিয়েছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার হলঘরে সুবিশাল পর্দা জুড়ে 'পল্লি উন্নয়নে প্রান্তিক জনসমষ্টির নতুন জীবনসমৃদ্ধি'-বিষয়ক তথ্যদৃশ্যে এক ঝলকে কেঁপে উঠেছিল রাধা। তার গ্রাম! সেই একই রকম খানাখন্দ ঝোপজঙ্গল ডোবাপুকুর মাঠঘাট গাছপালা নিয়ে মেটেঘর গাইবাছুর মানুষজন। বই দেখতে এসে কিছুই সে হারাতে রাজি নয়। কিন্তু ঝঞ্ঝাট—অন্ধকারে সামনে পেছনে তাকে ঠেলছে সবাই। কানের কাছে মায়ের ধমক। দেরিতে ঢুকলে যা হয়—এক ফালি সরু ঘুপচিতে পা ফেলে এগোনোয় বসে-থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি এবং টর্চ নির্দেশিত আসনে বসতে বসতে ওপাশে তার গ্রাম ফুরিয়ে যায়। বুকের ভেতর খামচি আঁচড়ায়। কত কাল, আজ ক-মাস সে গাঁয়ে যায় নি। সেই গাঁয়ে তার মা থাকে। পালান—তার ছোট ভাই।

কিন্তু মজা থাকে। আনন্দ সুখ। একদিকে মা আর আরেক পাশে মুন্নিদিদিকে রেখে গদির চেয়ারে বসল রাধা। মায়ের বসার ভঙ্গিটা লক্ষ করল আড়চোখে। হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে, পিঠের আঁচল কোলে টেনে এনে গদিতে পিঠ ঠেসে, আরামে। মায়ের হাতে সুন্দর একটা ব্যাগ। তার বাঁ-হাঁতের মুঠোয় ছোট একটা রুমাল।

'এক থি লেড়কি'— সেন্সর সার্টিফিকেট পর্দায় ছায়া ফেলতেই সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে সোল্লাস শিসধ্বনি সহস্র জনতায়। তের হাজার ফিট—দ্রুত পড়ে নিয়েছেন দাদাবাবু। মা তাঁর ব্যাগ থেকে পানের কৌটো বের করেছেন অন্ধকারে। দামী জর্দার ঘ্রাণ।

অন্ধকারের সমুদ্দুরে ডুবে যায় মানুষের সমুদ্দুর। কিংবা রঙিন পর্দায় অন্য এক অলৌকিক আলোর জগৎ। শত শত ঝিনুকের মতো চোখগুলি এক লক্ষ্যে স্থির। রাধা অপলক। শিরায় শিরায় রক্তস্রোতে ঢেউয়ের তোলপাড়ে রোমাঞ্চ কাঁপে। টিভি, ভি.সি.আর. বা সিনেমা হলে 'বই' দেখতে বসলেই কী-রকম যে হয় শরীরটায়— ক্ষণে ক্ষণে কান্না

পায়। কত দুঃখ গ মানুষের! কত সুখ! সব সত্যি। সত্যিই যদি না হবে তো বইগুলো এমনধারা সুন্দর হবে কেন? দেখবে কেন এত মানুষ?

আস্তে আস্তে মায়াকুশল সেই রঙিন সত্যে ডুবে যেতে থাকে সে। মিথ্যে হয়ে যেতে থাকে পার্থিব জগৎসংসার। ঠাণ্ডা হিম রক্তে হয়তো-বা সে নিজেও অবাস্তব কিছু। চোখ আর কান ভিন্ন অন্য কোনো ইন্দ্রিয় নেই। অনুভূতিগুলি ভোঁতা। আদ্যিকালেব বুড়ি ঠাকুরমারা যেমন, পাঁচালি বা ব্রতকথায় নিজেকে সমর্পণে বুঝি ওঁদেরই মতো পরমার্থ চেনা।

> এক যে ছিল মেয়ে। দেশপাড়াগাঁয়ের পরমা সুন্দরী। নাচ জানে গান জানে। গুণবতী সে-কন্যার সঙ্গে ভাব ছিল একটি ছেলের। বড্ড গরিব। জমিদাব-মহাজনের অত্যাচাবে যেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরল ওর বুড়ো বাপটা, বদলা নিতে চাইল সে-ছেলে...

'গ্‌গুরু গুরু...' প্রলয় চিৎকার বিপুল অন্ধকারে। টানটান শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে বসল রাধা। এসব খুনখারাপি মারদাঙ্গার দৃশ্যগুলোতে তার বড় ভয় করে। কিংবা এ-রকম সব রক্তাক্ত ঘটনায় তাজা তেজী গাঁট্টাগোট্টা ব্যাটাছলেদের দেখতে বড্ড ভালো লাগে তার। গা-গতর ঝমঝমিয়ে বাজে। যখন কেউই কাউকে দেখছে না সেভাবে, সাহস হলো না দুই দিদিমণির মাথা ছাপিয়ে দাদাবাবুকে এক পলক দেখে নেবার। পাশেই মা।

শুধু বন্দুকবাজি খুনখারাপিই নয়। পলকে বদলে যায় মেজাজ। হলঘর ভরে সমস্ত মানুষ সহসা উদ্বেল। চেয়ারে চেয়ারে সেঁটে থাকাও মুশকিল। পিংপং বলের মতো দুলছে হৃদয়মন। পর্দা জুড়ে নৃত্যগীত। সেই গান, ছবি রিলিজের আগেই দুনিয়া কাঁপিয়ে ঘরে-বাইরে রাস্তায় দোকানে রেডিওর 'বিবিধ-ভারতীতে' বেবাক মানুষের ঠোঁটে শিসে যে-গান ভাসছে নিত্যিদিন

> খুনীকে ধরতে এসেছে পুলিশের বড়কর্তা। সঙ্গে গাড়িভর্তি সেপাইসান্ত্রী। মাথায় কলস বয়ে ঘরে ঘরে দুধ ফিরি করতে যাচ্ছিল সে-মেয়ে। মরদকে বাঁচাতে গাছতলায় দুধের কলস রেখে রাস্তায়ই নেমে পড়ল। ফুলের মালায় ঘাগরায় নূপুরে প্রস্তুতই ছিল। হঠাৎ নৃত্য এবং সেই গীত। বিভোর মুগ্ধতায় পাথর হয়ে গেলেন পুলিশ সুপার। সেপাইরা বন্দুক ফেলে খৈনি টিপছে হাত-হাতে। গোঁফের তলায় ঝকঝকে খুশির হাসি। পেছনের পথে পালিয়ে যাচ্ছে সেই যুবক। গাঁয়ের মানুষজন দেখল সবাই। বলল না কিছুই। খুনের বদলা খুনে খুনীও মহান...

রাধা অস্থির হয়ে ওঠে। এ-আরেক যন্ত্রণা। গোলাবারুদের কাটাকাটি যুদ্ধ। আওয়াজে আওয়াজে ঝিমঝিম ধরিয়ে দেয় মগজে। গলা অব্দি আটকে থাকে ভয়। পরক্ষণে নাচগানের হুল্লোড়, রঙ্গরস, তামাশা। নরমে-গরমে প্রতি মুহূর্তে দোল খেয়ে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। কারুর দুঃখু সইতে পারে না সে। উৎকণ্ঠা বাড়ে। এবার কী হবে? ওরা আলাদা হয়ে গেল। মেয়েটা দেশের বাড়িতে একা

দেশ ছেড়ে পালিয়ে খুনে ডাকাত হলো সে-যুবক। ডাকাতের দল গডল। গুটিসুটি

ভয়ে কাঁপে দেশের তাবড-তাবড় মানুষ। জ্যান্ত বা মরা মুণ্ডুটার জন্য সরকারের লাখ টাকা পুরস্কার।

ভোটের বাবুদের সঙ্গেই বেধে যায় লড়াই। স্থানীয় এম.এল.এ-ই হয়ে ওঠেন কুচক্রী খলনায়ক। ডাকু রাজিন্দব সিং, ওরফে রাজার হুঙ্কার—ভণ্ডামি জানে না সে। ভোট চায় না। প্রেম চায়। চাঁদের দেশ দিল্লির চেয়ে আমজনতার মধ্যে বনেজঙ্গলে গ্রামেই গরিব মানুষের একজন হয়ে বাঁচবে...

অন্ধকার কাঁপে হাজার মানুষের করতালিতে। গোলাগুলির আওয়াজেব চেয়ে সে-আরো মারাত্মক। জনতা উত্তাল। হাতের আঙুলে ঠোঁট চেপে এপাশে ওপাশে ঘনঘন প্যাক। দুহাত তুলে অন্ধকারে শুশুকের মতো ঘাই মারছে কারা! দাদাবাবু দিদিমণিবা হামলে পড়েছেন সামনের দিকে। নতুন করে পানের কৌটো বের করেছেন মা।

রাধা ডাকাত দেখে নি কোনোকালে। নেতাদের দেখেছে দূর থেকে। নেতাবা বক্তৃতা দেন। গরিব মানুষের দুঃখু ঘোচে না। রাজিন্দাব সিং বনেজঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকে। গরিবদুঃখীদেরই একজন।

সহসা ব্যাকুল জনতা রুদ্ধশ্বাসে পাথর হয়ে গেল। গোটা শরীরে চামড়ায় চামড়ায় প্রতিটি রোমকূপে কাঁটা দিচ্ছে তাব। শিশুরা শেলেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেমন কবে বর্ণমালা শেখে, বাধা রুদ্ধশ্বাস উন্মুখ। তাব জীবনেব পাঠ

গাঁয়ের গরিব মানুষদের ভোটে জিতে হিল্লিদিল্লি করে বেড়াচ্ছেন যে-নেতা—আমজনতা কি দুশমন, তাকেই সরাসরি গুলি করে খতম। মরে যেতেই পারত বাজা সিং। পুলিশের বড়কর্তার নিশানায় কোনো গোলমাল ছিল না। দোতলাব জানালায় কাচ ভেঙে চৌচিব। কিন্তু গুলিটা পৌঁছোবাব আগেই নিচে লাফ দিয়েছে বাজা। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল মাটিতে। দুটোপা ফাঁক করে সোজাসুজি ওর পিঠে ঝাঁপিয়ে পডতেই লম্বা দৌড়

গোটা হল ফেটে পড়েছে হাততালিতে। তুমুল হৈ-চৈ। রাধাও খুশি। অঙ্গে অঙ্গে ঢেউ খেলে যায়। যাক, রাজা সিং মরে নি। ভালো মানুষবা মরে না কখনও। কিংবা নতুন করে ভয়। অথবা ভয় থেকে আচমকা খুশির হুল্লোড়

অন্ধকার রাত। গভীর বনেব ভেতর বাজা সিংয়েব ডেরা। মদ্যপান চলছে সঙ্গীদেব। চাবপাশের গ্রাম থেকে নারীপুরুষরা দল বেঁধে এসেছে রাজাব মনোরঞ্জনে। নাচছে মেয়েরা, গাইছে ছেলের দল।

নৃত্যবাদ্যেব সভায় হঠাৎ তালভঙ্গ। কোন্ এক গ্রাম থেকে যুবতী নাবীকে লুট কবে নিযে এসেছে সাঙাতবা। সর্দারের সামনে উপঢৌকন বাখতে সভাসুদ্ধ সকলেই হতবাক—মদ স্পর্শ কবেন না রাজা, জননী ভিন্ন অন্য কোনো বমণীদেহ ছুঁযে দেখেন নি জীবনে। তবে কেন আজ এই ব্যভিচার?

সিনা ফুলিযে রক্তচক্ষু নিযে এগিযে এল দ্বিতীয সর্দাব— 'কভি নেহি। অ্যাযসা কভি নেহি হো সাকতা। নাবীহবণকে পাপসে লঙ্কা নগবী জ্বল কর বাখ হো গয়ী থি। হামলোগ বাবণকে আদমি নেহি হ্যায়। হাম দুনিয়া ভরকে গবিবোঁ কে দোস্ত হ্যায়...'

কিন্তু পাথরের চেয়েও শক্ত মানুষ সর্দারের চোখে জল? আরেক আশ্চয্যি, সেই লুটের-মেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে কুখ্যাত এক ডাকাত পুরুষের নাগালে? মাথা উঁচু রেখে দস্যু বাজা সিং আলিঙ্গনে টেনে নিল তার নারীকে। সগর্ব ঘোষণা তার— 'গরিবোকি রোটি ঔর কাপড়ে যো ছিনতে হ্যায় উনকা খুন মাঙ্গতা হ্যায় মেরা রাইফিল। লেকিন মহব্বত কি কসম। দুনিয়াকে লোগোসে আগর প্যার করনা হ্যায় ত দিলমে মহব্বত চাহিয়ে। ইহ্ মেরে বচপন কি সাথী হ্যায়। ইস্‌নে মেরে লিয়ে বহুৎ সারে দুখো কো ঝেলা হ্যায়। ময় উসে লায়া হুঁ...'

উদ্দীপিত রাধা। দাঁতে দাঁত চাপে। নয়নজলে ভাসে। এমন তো হয়! হতেই পারে। এত বড় বড় সব আর্টিস্টের কথা কি মিথ্যে হয় কখনও? ঘর পেয়ে গেল গাঁয়ের গরিবদুঃখীর মেয়ে? কী ভাগ্যি নিয়ে জম্মো! কত পুণ্যির জোর। সামনের দিকে হামলে পড়ে, ওত পেতে, কিংবা নিজেরই ডানে-বাঁয়ে ভাগ্যিমানী মা...ধম্মো-মা তার, অথবা দাদাবাবু-দিদিমণিদের ঘন সান্নিধ্যে লেপটে থাকার সৌভাগ্যে সে তার নিজের সুখের খলবলকে আরেক মেয়ের সুখের ওজনে মাপে।

পর্দায় বিস্তর নাচগান হুল্লোড় তখন। বনের ভেতর গোপন আখড়ায় বিয়ে হয়ে গেল রাজা সিংয়ের। জলপ্রপাতের তলায় পাথরের ওপর বসে দু'জনের গান। ছুটে ছুটে গাছের আড়ালে হারিয়ে যায় মেয়ে। ডাকাতের সর্দার একই গানে সুর ধরে তাকে গানে গানে খোঁজে।

পিঠটানে সোজা হয়ে বসল রাধা। রাজিন্দর সিং কত বড়। কত জবরদস্ত পুরুষ মানুষ! কিন্তু আবাগি বউটা বোঝে না ওর কপালগুণ

জঙ্গলের ভেতর গোপন আখড়ায় মায়ের থান বানিয়েছে রাজা সিং। দিনভর সেখানে হত্যে দিয়ে থাকে ডাকাতের বউ। যতবার পেটে বাচ্চা আসে, কী-এক গাছের ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। পাষাণী মায়ের পায়ে কপাল ঠুকে কান্না— 'খুনী ঔর ডাকাইত কা সন্তান নেহি। মুঝে ইজ্জত কা বাচ্চা দো মাতাজি...

ডাইনি! ডাইনি! রাধা মাথা ঝাঁকিয়ে তড়তড়িয়ে উঠল। সে তার যুবতী দেহের নিভৃত গোপনে কোন্ এক সুখের খামচানির অস্পষ্ট অনুভবে মুচড়ে উঠতেই পাশ থেকে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন কিরণময়ী— 'কি রে, কী হলো তোর?'

ডানদিক থেকে মুনমুনও বিরক্ত কিছুটা। চোখ টেরিয়ে তাকাল একবার।

রাধার হুঁশ নেই। ঠাণ্ডা ঘরে বসেও ঘামছে সে। গরিব দুঃখীর মেয়ে! বরাত জোরে অমন একজন সোয়ামি পেল তো কদর বুঝল না আবাগি? তাঁকেই অপমান! কিন্তু দৃশ্য বদলে গেল। হেরে যায় রাধা। মায়েব-থানে কপাল ঠুকে জীবনের জিৎ লুটে নিলো সেই মেয়ে

চোখ তুলে তাকালেন ভগবান। ভোটের বাবুদের থেকে শুরু করে দেশের তাবৎ মানুষ কবুল করল, ঠ্যাঙাড়ে দলের সর্দার নয় রাজিন্দার সিং। দেশে দেশে গরিব মানুষদের জন্য কত তাঁর দানধ্যান। রাজা সিং দীনদুনিয়ার মালিক। নতুন গর্ভে ফুটফুটে একটা বাচ্চা এল সে-মেয়ের। রাজপুত্তুর মানল সবাই। গাঁয়ের

তাবৎ মানুষ। মায়ের চোখে স্বপ্ন ভাসে। স্বপ্নের কথা বলে সে দশজনকে —ছেলে তার বড় হবে। বাহারের রঙচঙে জামা পেন্টলুন জুতো মোজা পরে ইংরেজি ইশকুলে যাবে। বাপের মতো শাহানশা মানুষ হবে একদিন। দশজনের একজন।

ঝলকে উঠল রাধা। ঝামটা মেরে তাকাল ডান দিকে। একেবারে পাশাপাশি সিটে তারই গা ঘেঁষে মুন্নিদিদি বুল্লিদিদি দাদাবাবু পর পর। পাশেই রাজরানীর দেমাকে মাথা উঁচু করে ধম্মো-মা তার—ইংলিশ মিডিয়াম মা! ইংরেজি-ইশকুলের-পাশ চকচকে ঝকঝকে ওঁরা তিন ভাইবোন কোনো সিনেমার লোক নয়। ওঁদেরই ঘরে তার নিত্যি বসবাস। তাহলে এমনটা হয়? গাঁয়ের গরিব দুঃখী মেয়ের জীবনেও এমনটা হতে পারে? নিশ্চয়ই হয়। তা-নয়তো বইয়ে উঠবে কেন এমন সব কথা? মুখ্যু আবাগি বেটির গভভোয় অমন ফুটফুটে হীরের টুকরো সাহেব?

বেমক্কা ফুরিয়ে গেল সব। অন্ধকার ভেঙে দিকে দিকে আলো। বুঝি-বা স্বপ্নভঙ্গ শেষে সর্বাঙ্গে নাড়া খেয়ে রাধা নিজেকে ফিরে পেল। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের ভেতর এতক্ষণ সে একা ছিল এবং তার চোখের পাতায় এক অলৌকিক জগৎ ছিল। আলোগুলো জ্বলে উঠতেই একই ভাবে রঙিন জগৎটা থেকে যায়। কিন্তু সে একা থাকে না। উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। দু-পাশের সারি সারি আসনের মধ্যবর্তী প্যাসেজে কাতারে কাতারে মানুষ। মানুষগুলো গায়ে গায়ে লেপটে মিছিল হয়ে যায়। মিছিলটা কেন্নোর মতো, যার একটাই শরীর, শতসহস্র পা। পেছনের দিকে কড়া শিস, প্যাক, উদ্দাম হল্লা। পেল্লাই বড় কেন্নোটা হলঘর ছেড়ে পায়ে পায়ে হামা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে।

সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। একই সারির আরো অনেকের সঙ্গে পরপর দাদাবাবু-দিদিমণিরা, সবশেষে মা। সকলের সঙ্গে কেন্নোর শরীরে মিশে যেতে যেতে রাধা অচেনা মুখের মিছিলে, রংবাহারি শোভায় বুঝি-বা নিজেকেই খোঁজে। তারই মতো অন্য কোনো মেয়ে—শুধু কালো মেয়ে বা গরিবদুঃখী নয়। তারই মতো ভাগ্যিমানী কেউ।

বাইরে এসে ভিড়ে কোলাহলে মিশে থেকেও ঘোর কাটে না মগজের। আলোয় আলোয় মানুষে-মানুষে মাখামাখিতে ঘুরেফিরে, চারপাশে চোখ রেখে প্রতিটি পলকপাতে বুঝি কিছু হারাবার ভয়। রাধা লুটে নিতে চায় তার মোহিনী জগৎ। কিংবা হাজার চোখের সামনে সে নিজেকে ঘনিষ্ঠ রাখে দুই দিদিমণি বা ভগবতী মায়ের পাশে। কোনো যুবকের চোখ পড়ার ছোঁয়াছুঁয়িতে নাড়া খেলে ডান হাতের আঙুল বুলিয়ে বুকের কাপড় গোছগাছের আছিলায় ঘাড় উঁচিয়ে তাকায় অন্য দিকে। সে-ও ভ্রূভঙ্গির কপট উপেক্ষা জানে।

কিংবা হিতোপদেশ-কথার তারতম্যটুকুও সর্বাংশে লুপ্ত হয়ে যায়, গাড়িটা আবার নতুন করে সচল হবার পর। কেন না, ধাবমান কলহাস্যে বা উল্লাসগতির মুখরতায় ইতিমধ্যে রাধা নিজেও তার পেখম পেয়ে গেছে।

বাক্সোবন্দি হয়ে চারজন যুবক-যুবতী খুশিতে খুশিতে উত্তেজনায় লাফাচ্ছে তখন —'দারুণ, দারুণ বই। ফ্যানটাস্টিক...'

দু'হাতে স্টিয়ারিং চেপে, যদিও একাগ্র চোখজোড়া সামনের দিকে স্থির, বাবন এখনও সেই আগ্নেয় উত্তাপে সেঁকছে নিজেকে এবং এক তেজস্ক্রিয় প্রভাবেরই প্রচ্ছন্ন পরিণাম —কব্জির মুঠোয় বেগবান গতির বলগা ধরে ভরাট যৌবনপ্রাণে উদ্বৃত্ত পেশীশক্তিকে সংহত রাখতে পারছে না কিছুতেই। ভারি গলায় হাউহাউ হল্লা তার— 'টপ! আজ একেবারে টপঅপ দিয়েছে গুরু। বই করতে হয় তো, হ্যাঁ, জরুর অ্যায়সা হোগা। সুপার...সুপারহিট। কত কী বোঝার আছে।'

'উঃ, আর বলিসনি বাপু। থাম...' রাধার পাশে বস্তুতই কাতর কিরণময়ী। রুমালে মুখকপাল ঘষছেন—' এ-তো দেখছি, একেবারে গোড়া থেকেই মারপিট খুনোখুনি বোমাবন্দুকের আওয়াজ। বসে থেকে থেকে মাথায় আমার ঝিমঝিম ধরে গেছে। এখনও টনটন করছে দু-দিকটা...'

'মারপিট? হোয়াট মারপিট?' সামনের সিটে, দাদার পাশে এক ঝটকায় ঘাড় ফিরিয়ে ঘুরে বসেছে বুলবুলি—'স্টোরি যেমন হবে, তেমনি তো বই হবে। রাজা সিং ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি মার্সিনারি। এ ম্যান ইউথ গান ইন হ্যান্ড। অল হি ডিড ফর দ্য কজ অব দ্য পুয়োর পিপল...'

কথায় কথায় সন্তানদের ইংরেজি বুকনি কিরণময়ী যে বোঝেন সব সময়, নিশ্চয়ই নয়। অভ্যাসে বোঝার চেষ্টা করেন। না বুঝলে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে কিছুটা আপসের ভঙ্গি— 'বাড়িতে বসে টিভি দেখলে, নয় তো তোরা যখন ভি. সি. আর. চালাস, মাঝে মাঝে উঠে যাওয়া যায়। কিন্তু এখানে...'

মায়ের পাশে মুনমুন সহসা উচ্ছল— 'মা বোধ হয় আর্ট-ফিলমের কথা বলছেন রে।'

'ওফ্ মা প্লিস...' বুলবুলি লাফিয়ে উঠল— 'ইউ আর নট সো ওল্ড এনাফ! ওগুলো তো যত রাজ্যের বুড়োবুড়িরা দেখে আর কিছুই না বুঝে আহা-আহা করে...'

'আর্ট ফিলম? ফক্‌কো...' বিকট আওয়াজে হেসে উঠল বাবন। অথবা তলাব দিকে অন্ধকারে ব্রেক কষতে গিয়ে খোঁচাখাঁচির যন্ত্রণা কিনা কোথাও, বোঝা না গেলেও, পার্ক স্ট্রিটেব ক্রশিংয়ে লালবাতির হুঁশিয়ারিতে গাড়িগুলো পর-পর দাঁড়িয়ে যাবার পর ডানদিকে যে-শাদা গাড়িটা একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাব ভেতবকাব এক ঝাঁক ভ্রূ-কাঁপানো তরুণী বাঁদিকে চমকে তাকানোয়, হয়তো সেটাই বাড়তি প্রেরণা, আরো উদ্দাম হাস্যে—'সেই সেবারে কী একটা বই দিয়েছিল টিভিতে। রাধুদেব ওই গ্রামক্রামেব ব্যাপার! ওফ কী বোর কী বোর। নাচ নেই গান নেই, স্টোরিফোরি মাথামুণ্ডু কিছু

নেই। হাসপাতাল না নার্সিংহোম থেকে তুলে এনেছে কটা লোক। মিনমিন করে কী-সব বকছিল...'

'এগ্‌জাক্টলি...' জ্যামজট খুলে গেছে। গাড়িগুলো এগোচ্ছে। এগোচ্ছে বাবন। বুলবুলি খুশিতে মাতোয়ারা— 'হোয়াইল দ্য ম্যান ইজ প্লাকিং পটলস ফ্রম দ্য ট্রি, উই হ্যাভ টু নো দ্যাট হি ইজ ডেড...'

'পটল? হোয়াট পটল?' সকৌতুকে ঝুঁকে বসল মুনমুন। দারুণ মজা।

বাঁদিকে, পার্ক স্ট্রিটে ঘুরছে গাড়ি। তুলকালাম কাণ্ড চলছে খাঁচার ভেতর। বুঝে বা না-বুঝে রাধাও ফুটছে টগবগ। ভ্রূ-কুঁচকোলেন কিরণময়ী— 'পটল? পটল মানে? আমরা যে-আনাজ খাই, তুই সেই পটলেব কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ গো মা...' বুলবুলি একইভাবে উচ্ছল— 'এই দেখলে একটা লোক সিক-বেডে শুয়ে আছে, পরের সিনেই দেখবে—গাছে উঠে কী পাড়ছে। আমাদের বুঝে নিতে হবে, লোকটা পটল তুলছে।'

প্রচণ্ড হাসির বিস্ফোরণ। ডান হাতে স্টিয়ারিং, বাঁহাতে গিয়ারে কৌণিক মোচড়। স্পিড বাড়ে পায়ের তলায়। বাবন উথলে উঠল—'ঠিক বলেছিস। বই দেখতে বসে আমাকে ভেবে ভেবে বার করতে হবে, কী বলতে চায় লোকগুলো? খুব নাকি হাইথট! ধ্বুস...'

রাত্তিরবেলা দুরন্ত-ছুট গাড়ির মিছিলে অশান্ত প্রাণের উল্লাসে উল্কাগতি একটি বিশেষ গাড়ির উড়ে যাওয়ার দৃশ্যে চমকে উঠতেই পারেন পথচারী কেউ। কিংবা গাড়ির ভেতরই বুরবক পথচারীদেরই একজন, বাধা, এত কথা এত হাসাহাসির কোনোই মানে না বুঝে হঠাৎ-পাওয়া বোনাসের সুখ বা গতির নেশায় নিজেকে হারিয়ে, যেন এখনও সিনেমা হলের ভেতরই রয়ে গেছে সে অথবা নিজেই ঢুকে পড়েছে বাহারি পর্দায়, দুপাশে আলোয়-উজ্জ্বল চৌরঙ্গি পার্ক স্ট্রিটের বিলাসী কলকাতা, বাহারি কলকাতার রূপমুগ্ধ অনির্বচনীয়তায় কী যে মতিভ্রম ঘটল আচমকা, বলে বসল—'পটল ত চড়ার ডাঙায় গাছে হয় না গ বুল্লিদিদি, শীতের সময চাষ হয় মাঠের জমিতে.....'

'ওই......ওই আমাদের আরেক পণ্ডিত এসে গেছেন......' গাড়ির গতিবেগ শিথিল হয়ে এসেছে। বাঁদিকেব ফুটপাত ঘেঁষেই ভিড়ছে কোথাও। বাবন প্রায় বাঘের হালুমে ধমকে উঠল—'মাঠে চাষ হয় তো কী হয়েছে? গাছ হয না সেখানে? ভেজিটেবিল গাছে হবে না তো কী হাঁসমুর্গির মতো ডিম পাড়ে নাকি তোদের গ্রামের লোকেরা?'

'ওক্ ফ্‌ফাইন......' হাততালিতে মুখর বুলবুলি— 'গ্রিন পটল আমি দেখেছি। রিয়েলি ইট লুকস লাইক এগস্। কার ডিম রে দাদা? রাধুর?'

'ঘোড়ার।'

আবো হাসি, আরো উচ্চকিত কলরব। পরিহাসেব বিপুল তরঙ্গে বিদ্ধ হতে হতে রাধা নিজেব সঙ্কোচনে বোবা বনে গেছে। চাষের ফসল আব গাছের ফল এক হলো? কান্না পাচ্ছে তাব। হদিশ পায না, কী ভুল? গোলমালটা কোথায়?

বাঁচালেন মা। পাশ থেকে ঝাঁঝিযে উঠলেন কিরণময়ী— 'তোবা এবকম কবছিস কেন বল তো ওর সঙ্গে? না-হয বলেই ফেলেছে একটা কথা। পটল গাছ তোবা

নিজেরা দেখেছিস কোনোদিন? জানিস, কেমন দেখতে? ও-ছাই আমিও দেখি নি কোনোকালে।'

ফুটপাতের ধারে গাড়ি রেখে দরজা খুলে ডানদিকে রাস্তায় নেমেছে বাবন। ওপাশ থেকে বুলবুলি। মায়ের কথায় আমলই দিলো না কেউ।

খটকা লাগে। কান্না থাকে না। নিজের মধ্যেই একটু একটু করে ভাঙতে থাকে রাধা। চাষের ফলনে ধানগাছও তো গাছ। অড়হর আখ পাট চাষের গাছ কত বড় বড়? লাউ কুমড়ো ঝিঙে উচ্ছের মতো পটলও কেন গাছ হবে না তাহলে? এত এত পড়ালেখা-জানা দাদাবাবু-দিদিমণিরা কি ভুল বলবেন কখনও?

কিংবা মূর্খ যুবতী! জানে না জগৎবিধান। ফারাক একটা থাকবেই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায়--নড়বড়ে লতানে গাছ আর সবল বৃক্ষকাণ্ডে, ফি-বছর নতুন নতুন চাষের ফলনে বা পত্রপল্লবের বৃক্ষশাখায় প্রকৃতি কেন ঋতুতে ঋতুতে রজঃস্বলা?

পেছনের সিটে দরজা ঠেলে নেমে গেছে মুনমুন। দরজাটা ধরে থাকে। মধ্যবর্তী কিরণময়ীকে নামতে হবে এর পর। দুহাতে দুদিকের সিট ধরে মাথা নুয়ে অবতরণ প্রক্রিয়ায় একবার তাঁকে থেমে যেতে হয়। গলার স্বরে কাতরতা—'দ্যাখ দেখি, কী যে করিস তোরা? এ-কোথায় মেয়েটা একলা থাকবে গাড়ির মধ্যে?'

'তাতে কী হলো?' এভাবে 'ধ্যাত্তোর'-ভঙ্গিতেই চলতে অভ্যস্ত বাবন। হাতে চাবির-রিং ঘোরাতে ঘোরাতে— 'এ-কী কচি খুকি নাকি? কেউ লুটে নিয়ে যাবে? এত লোকজন চলছে রাস্তায়। বসে থাকবে যেমন বসে আছে।'

এরপর বসে থাকবে রাধা। গাড়ির ভেতর ঘাপটি মেরে এক কোণে চুপচাপ। মায়ের দুঃখুটা কাঁটা-তোলার নরুণ হয়ে তার বুকের মধ্যে খোঁচায়। ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার। কান্না পাবার হক আছে এবার। চোখজোড়া জলে জলে ভরে উঠতে চায়। বাইরে কাচের জানালায় মুখ বাড়িয়ে অবোলা গাভীর ভঙ্গিতে মায়ের দিকে তার একজোড়া আকুল নয়ন।

বাইরে থেকে শাঁখা পলায় সোনায় সোনায় মোড়া একটি স্নেহময়ী হাত ঢুকে পড়েছে গাড়ির ভেতর। তার পিঠে সোহাগী আদর—'তুই একটু সাবধানে থাকিস মা। জায়গাটাও খুব ভালো নয়। খবরদার, গাড়ি থেকে বেরুবি না কিন্তু। কতটুকু আর সময়? এই তো, আমরাও এসে পড়ব এক্ষুনি......'

অনেকটাই এগিয়ে গেছে ওরা তিন ভাইবোন। ফুটপাতের ওধারে, যেখানে ফুলের-টবে সাজানো ব্যালকনিতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোকাচাপকান পাগড়ি-মাথায় তাগড়াই দারোয়ান, সেখানে পৌঁছে মায়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে ওরা। মাকেও এগোতে হয় সন্তানদের টানে। এবং এগোবার পথে আর পিছু ফিরে তাকাচ্ছেন না। বুঝি-বা সেখানেও সন্তান থাকে।

রাধা তাকিয়ে থাকে। গাড়ির বাঁপাশের দরজায় কাচটা নামিয়ে দেবার পরও যেটুকু চাগিয়ে আছে, সেখানে থুতনি রেখে চেয়ে থাকে অপলক। বাঘাকে নিয়ে কোথাও বেরুলে এভাবেই ওকে গাড়িতে রেখে যান ওরা। দাপাদাপি করতে জানে বাঘা। অপছন্দ হলে তুমুল গর্জন তুলে জানান দিয়ে দেবে চারপাশের লোকজনকে—বঞ্চনা। কিংবা বড়ই

পোষ-মানা বন্য প্রাণী। চুপচাপ ঠায় বসে থাকবে গাড়িতেই। অনেকটাই পুতুলের মতো। এই মুহূর্তে যেমন রাধা। বৃষ্টিশেষে গাছের পাতার মতো তার এক জোড়া সজল চোখের পাতায় লেপটে থাকে সকরুণ দৃশ্যমালা। বুঝি এখনও কোনো টিভি বা ভি.সি.পি. বা ভি.সি.আর. বা সিনেমার পর্দায় রঙিন ছবিই দেখছে সে— দূরে, রাজরাজড়ার সেপাইদের আদলে একজন দারোয়ান লম্বা শিরদাঁড়ায় সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরল ওঁদের জন্য। ওঁরা ভেতরে ঢুকে গেলেন।

এবং তক্ষুনি গাড়ির নরম গদিতে পিঠ ঢেলে আছড়ে পড়ল না সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাও নয়। একই ভাবে দূরবর্তী সেই আলো-ঝলমল বন্ধ-দরজা আর বাজার-সেপাই দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে রইল। ওটা হোটেল, সে জানে। এমন সাহেবি হোটেল-রেস্তরাঁ সে অনেক দেখেছে টিভিতে, হাজারটা সিনেমায়। নাচগান হয় সেখানে, মদ খায়, অনেক খানাপিনা। মায়ের কাছে ও-রকম হোটেলের বিলিতি রান্নাবান্নাও সে শিখেছে বেশ কিছু। কিন্তু অ্যাদ্দুর এসেও জ্যান্ত চোখে দেখা হলো না টিভি-সিনেমার মানুষগুলোকে। আর হবেও না কোনোকালে। কালো-মেয়েরা ঢুকতে পায় না ভেতরে। 'পরের মেয়ে' হয়ে যাচ্ছে সে? সাহেববাড়ির 'কাজের মেয়ে'?

হঠাৎ নাড়া খেতে হলো। পাথর থেকে আচমকা অহল্যায় প্রাণ পেয়ে যেতেই নাকের ডগায় এক ঝলক তাজা বেলফুলের ঘ্রাণ। সশব্দে আঁতকে উঠে, আঁচল টেনে দু'-হাতে মুখ চেপে কোমর ঘেঁষড়ে ছোট একটু খাঁচায় যখন আর পিছুবার ঠাঁই নেই, বাঁ-পাশের দরজা আর সিটের কৌণিক প্রান্তে পিঠ ঠেসে ঘন নিঃশ্বাসে বুকে হাপর তুলতে থাকে। তাকিয়ে থাকে। ওপাশের দরজায় বুড়োমতো কুচ্ছিত চাউনির একটা মানুষ। বাঁ-হাতের কব্জিতে ঝুলছে অসংখ্য বেলফুলের মালা। বাড়িয়ে-ধরা হাতের আঙুলের ডগায় লাল গোলাপ—'বেইলি চাহিয়ে কেয়া? বেলফুল, ভালো বেলফুল......'

লোকটাকে চেনাও যাচ্ছে না ভালো করে। বাইরের আলোয় নিজেরই ছায়া গায়ে মেখে রোগাপটকা কাঙাল-কাঙাল ঢঙের একজন বুড়ো। ও কী? লোকটা মালাশুদ্ধু হাতটা ভেতরের দিকে বাড়িয়ে আনছে কেন?

রাধা হঠাৎ মরিয়া। লাখ টাকার গাড়িতে বসে থেকে ফালতু একটা কাঙাল-ভিখিরিকে ভয় পাবার কিছু নেই। এখন......ঠিক এই মুহূর্তে দিদিমণিরা হলে কী করতেন? ডুব-সাঁতার থেকে মাথা চাগিয়ে তোলার ভঙ্গিতেই ভয়ডর ঝেড়ে ফেলে সে খিঁচিয়ে উঠল—'নেহি নেহি, আগে বাড়ো......'

'দিদিজি, ইয়ে দো মালা লে লিজিয়ে না! লাল গুলাব ভি হ্যায়। আপকি সজনেসে মুঝ গরিবকা কুছ ফয়দা হোগা।'

'গরিব মানুষ ত আমি কী কবব? আমাদের জামাকাপড়ে কত দামি দামি সেন্ট থাকে, জানো? একটা ছোট শিশির দাম পাঁচশো-সাতশো টাকা। ওসব ফুলটুল লাগে না আমাদের। যাও, ভাগো ভাগো।'

বরং রাধাই ঘাবড়ে গেল। 'ওভাবে ফিকফিক করে লোকটা হেসে উঠল কেন? হাসতে হাসতেই চলে যাচ্ছে। লোকটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। সামনেই

একটা গাড়ি এসে থেমেছে। সাহেব-মেমসাহেবরা একে একে নেমেছেন। বেছে বেছে ফুল কিনছেন। ফুলের মালা।

লক-করা গাড়ির ভেতর আলো-আঁধারির খাঁচায়, দাঁড়ের ময়না বা কাকাতুয়া-টিয়া পাখিরা যেমন, নিজেকে নিয়ে আবার তৃপ্ত হয়ে উঠতে পারে রাধা। নিশ্চিতই 'ঘরের মেয়ে'। ঘরের-মেয়েই যদি না হবে, মায়ের সঙ্গে এখানে......সাহেব-মেমসাহেবদের দেশে সে এসে পৌঁছোল কী করে? বসে আছে লাখ টাকার গাড়িতে একা!

সুতরাং কোনো খেদ থাকে না। গাড়ির চারপাশেই খোলামেলা জানালা, ঝকঝকে কাচের পর্দা। এপাশে-ওপাশে ঘাড ফিরিয়ে সে লুটেপুটে দেখে নিতে পারে নয়নাভিরাম অলৌকিক জগতের চতুর্দিক। কলকাতায থাকে সে। কলকাতাকে জানে। সবটা জানে না। এসব সাহেবপাড়ায় এর আগে সে মায়ের সঙ্গে এসেছে কিনা কখনও, এলেও কোথায় এসেছিল অথবা এখনই বা সে কোথায়—কোনো ঠাহর নেই। কী বিশাল চওড়া রাস্তা! দু'পাশে ছুটছে গাড়িগুলো! ঝাঁকের পর ঝাঁক। কত যে গাড়ি, গুনবে কার সাধ্যি? টিভি সিরিয়ালে বামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ যেমন, ছুটন্ত গাডির হেডলাইটগুলো যেন আগুনের তীর রাম-রাবণ কি কৌরব-পাণ্ডবের। ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা তালসুপুরি গাছের আদলে স্ট্রিটলাইটের থামগুলো জিভের ডগায় বাহারের তেজী আলো ঝুলিয়ে সারি বেঁধে কোথায় যে চলে গেছে কদ্দুব! কত বড় বড় বাড়ি দু'দিকে। দোকানপাট নেই খুব বেশি। যে-ক'টা চোখে পড়ে, ফিনকি দিয়ে আলো ছুটছে সেখানে। কত যে আলো! কত রং! রাস্তায়-ফুটপাতে পায়ে-হাঁটা মানুষজন কম। বুঝি রাত্তিরবেলাব সাহেবপাড়ার নিয়ম।

হিসেব নেই, কতক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকা। শিউরে উঠল। পেছনে আরো একটা গাড়ি এসে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই হেডলাইটের তীক্ষ্ণ আলো পেছনের কাচ ভেদ করে ঝলসে উঠল অন্ধকার খাঁচার ভেতর। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতেই বুকের মধ্যে গা-ছমছম ভয়। গাড়ির চারপাশ ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারা? বাঁ-দিকের ফুটপাতের ওপর একেবারে গাড়ি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে জোয়ানমরদ দুটো লোক! মাথা-ভর্তি লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল। একজনের গাল ভরে দাড়িগোঁফ, অন্যজন সাফসুফ ফর্সা। শার্টপেন্টলুনের চেহারায় ভদ্দরঘরের ছেলে বলে মনে হয় না কাউকেই। কিংবা ভদ্দরঘরেব ছেলেরাও এ-রকমই হয় আজকাল। লোকদুটো চোখ টেরিয়ে দেখছে তাকে। বলাবলি করছে কী-সব! হাসছে ফিকফিক।

বাধার রাগ হলো। অথবা ভয। রাগটাই সত্যি। বুকের কাপড় আলতো কবে গোছগাছ করে, মাথার চুলে খামোকা হাত বুলিয়ে সোজা হয়ে বসল পিঠটানে। মনে মনে যেন একটা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত। ভাগ্যি ভালো, বাইরে থেকে লক-করা গাড়ি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ। যদি কেউ হাত বাড়ায় ডানদিকে বা বাঁ-দিকের জানালায়, সে থুতু ছিটোবে মুখপোড়াদের কপালে। যদি গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করে, কামড়ে দেবে। চিৎকার করে হল্লা বাঁধিয়ে দেবে চারদিকে। আর যদি দূরেই থাকে, দূরে দাঁড়িয়ে চোখে চোখে চাটতে চায় ওকে—দেখুক, দেখুক। বারবার বুকের কাপড়ে আঙুল বুলোয় রাধা। গাড়ির দরজায় চাবি ঘুরিয়ে কাচ তুলতে জানে সে। তোলে না। কারুর ছোবলের

জন্য এবং তার থুতু ছিটোবার জন্য অথবা মুক্ত বাতাসের প্রয়োজনে জানলাগুলো উদোমই থাকে।

বুকটা ঝলকে উঠল। গাড়ির লক খুলে আচমকা হাত বাড়িয়েছে কে? মস্ত একটা প্যাকেট! গোটা শরীরের ঝাঁকুনি সামলে রক্তস্রোত থিতু হয়ে আসতেও সময় লাগে একটু—'দাদাবাবু গ? আপনি?'

'নে ধর, গরম-গরম খেয়ে নে...' বাইবে থেকেই হাত বাড়িয়ে বাবন প্যাকেটটা তুলে দিয়েছে হাতে-হাতে।

মাথা হেঁট করে গাড়িব ভেতর ঢুকতে চাইছেন দাদাবাবু! রাধা সরে আসে। পিঠ ঠেসে যায় পেছনেব দবজায়। এমন শুনশান নিশুতিতে বেপাডায এ-লোকটাকেও তাব ভয়। বড়ভাই না পুরুষমানুষ? ফ্যাসফেসে গলার স্বর—'আমাব ভয় করছে গ দাদাবাবু।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'এই এখেনটায় দাঁড়িয়ে ছিল দুটো লোক। কেমন-কেমন দেখতে।'

বাবন তাকায ডানে বাঁয়ে পেছনে—'কে? কার কথা বলছিস? কোথায?'

রাধাও অবাক। সত্যি কেউ নেই।

'ধ্যাৎ, রাস্তায় কত লোক যাচ্ছে-আসছে। কে এসে দাঁড়াল, তাতে তোর কী? কত গাড়ি দাঁড়িযে আছে আগে-পিছে, দেখছিস না? হবে ওদেব ড্রাইভারবা কেউ। নে, খেয়ে নে। আলাদা করে স্যালাড আছে ছোট প্যাকেটে। দেখে নিস্...'

দাদাবাবু চলে গেলেন। রাধা তার নিজেব গাড়িতে বন্দীদশায়, আবাব একা। দারুণ একটা ম-ম গন্ধ গাড়ির ভেতব। দামি সাহেবি দোকানের খানা বরাতজোরে জোটে এমন। প্যাকেটটা হাতে পেযে তার আরেক বিপদ, কোথায় বাখবে সে অমৃতসুখ? খাবে কী করে? কোলে নিযে বসা যায় না, ভালো শাড়িটা নষ্ট হযে যেতে পারে। পাশে নবম গদির আসনে বেখে খাওয়া যায় না, অন্ধকারে এঁটোকাটা পড়ে থাকলে দেখা যাবে না। শাড়িতে বা জামায় দাগ ধরে যাবে মা-র বা মুন্নিদিদির। গোটা প্যাকেটটাই বাঁ-হাতের তেলোয় তুলে ধবে বাখতে চাইল সে। বেশ ভাবি। ডান হাতে একটু একটু খোলার চেষ্টা। ভেতর থেকে যতটা লোলার টান, বাইরে থেকে ভয়। চারপাশে নজর রাখতে হয়। দূরবর্তী স্ট্রিটলাইট থেকে যেটুকু আলোর আভাস, স্পষ্ট চেনা যায়, প্যাকেট ভরে বিরিয়ানি। হালুমহুলুমে গরাসে গরাসে সবটাই গিলে ফেলতে পারে সে এখন। হাতে ঠেকে চিকেন বা মাটনের বড় বড় দুটো কাটলেট। স্যালাডেব আলাদা ঠোঙাটুকুও খুঁজে পাওয়া গেল। অন্য একটা পলিপ্যাকে ছোট ছোট বড়ার মতো কী যেন সব! এক টুকরো মুখে পুরতেই দাঁত-জিভ জানান দিয়ে দেয়—আঃ, চিলি ফিস চিলি ফিস...

'খানা দেকে বাবুলোক কাঁহা গিয়া হো?'

ফের...ফের সেই ইতর লোকটা! এবার সত্যি-সত্যি ভয় পেল রাধা। ভীষণ ভয়। জিভে-টাকরায় লালায়-লালায় জমে উঠেছিল যে-স্বর্গীয় স্বাদ, সুখেব অন্ন তাকে ভুলে যেতে হয়। ধীরেসুস্থে বসে রসিয়ে রসিয়ে একটু যে খাবে স্বস্তিতে, উপায় নেই। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল বজ্জাত দুটো লোক, যাদের একজন...রাধার গোটা শরীর থরথর

করে কেঁপে উঠল, কী সাহস লোকটার—বাঁদিকের দরজায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হঠাৎ-ই এক-মুখ ধোঁয়া গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে কোথায় ছুটে পালাল, বিটকেল গন্ধে রাগে-দুঃখে-ভয়ে রাধা ধুকপুকানিতে মরে। দেখা যাচ্ছে না আরেকটা শয়তানকে। হয়তো গাড়ির পেছনের দিকে কোথাও। খ্যাকখ্যাক হাসি—'হোটেল কি অন্দর খানাপিনা ঔর বাহারমে খুপসুরৎ ! অন্দরমে ওয়াইফ রহনে ত বাহারমে এ-কৌন হ্যায় ইয়ার ?'

দুটো লোকই নেংটি ইঁদুরের মতো। চোখের পলকে ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক এবং হঠাৎ-ই চোখের বাইরে। খুবই কাছাকাছি আবার। এ-তার কী এক নতুন যন্ত্রণা। রাধা সন্ত্রাসে কাঁপে। কান্না পায়। কিন্তু ডুকরে ওঠে না। দাঁতে দাঁত চেপে চোখের ঝাপসায় তাকায় এপাশ ওপাশ। হোটেলের দরজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জায়গাটা এত অন্ধকার কেন ? কী ছাই মরতে এখানে কেন গাড়িটা রাখলেন দাদাবাবু ? দাদাবাবু বললেন —ওরা আর সব গাড়ির ড্রাইভার। ড্রাইভারই যদি, এমনধারা লোচ্চামার্কা চেহারা হয় কারুর ? হতকুচ্ছিত নোংরা কালকিস্টি জামাপ্যান্ট, বুকের চক্রাবক্রা গেঞ্জি ! অসভ্য ইতর বদমাশ। বৈজুদা কত ভালোমানুষ ! সামনে-পেছনে আরো তো গাড়ি আছে কতগুলো। বৈজুদার মতো ভালোমানুষ যাঁরা, দেখছেন না কেউ—কী করছে গুণ্ডাদুটো ? সে একা মেয়েছেলে।

কলকাতা থেমে নেই। ছুটছে। হাওয়ার বেগে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে মিনিটে ষাট সত্তর আশি নব্বুই একশো রংবেরংয়ের গাড়ি। যার প্রান্তে রাধা নামে এক মেয়ে বড়ই বিপন্ন এ-মুহূর্তে।

রাধা শিউরে উঠল। লোকদুটো একেবারে গায়ের ওপর হামলে পড়ার মতোই গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝি গাড়িটা ওদেরই। নিজেদের গাড়ির দরজায় এভাবে যেমন-খুশি দাঁড়ানো যায়। গাড়ির মালিক কেউ যদি ভেতরে থাকে। তবু?

চব্যচোষ্য মাথায় উঠল। সত্যি-সত্যি মাথায়। পেছনের ব্যাকগ্লাসের তলায় প্যাকেটটা তড়িঘড়ি ছুড়ে ফেলে, তেলতেলে এঁটো হাতটা মুছে নেবারও ফুরসত নেই, বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চাবি ঘুরিয়ে কাচ তোলার পর যখন ওদের চমকে-ওঠা এবং বিচ্ছিরিভাবে হাসতে হাসতে কী একটা বিকট আওয়াজ ছুড়ল রাস্তায়, বোঝার বা শোনার অবকাশ নেই, অন্য প্রান্তে সরে গিয়ে রাধা একইভাবে ডান দিকের দরজায় আত্মরক্ষার পাঁচিল তুলতে ব্যস্ত। হাঁপাচ্ছে সে। ঘামছে গুমোট গরমে। কিন্তু ঢিলেমি দিলে চলবে না একফোঁটা। লড়াইটা যদি তার বেঁচে-থাকা বা মরে-যাওয়া, যদি তার নিজেরই ইজ্জত বাঁচানোর, খাঁচার ভেতরই ঘাড় থেকে পিঠ অব্দি শিরদাঁড়া ভেঙে, নিজেকে বাঁকিয়ে, ঝুঁকে পড়ে সামনের সিটে তলপেটের ভার রেখে জলে ডাইভ দেবার নিখুঁত ভঙ্গিতে ড্রাইভার-সিটের বাঁদিকে কাচ-তোলার চাবির নাগাল পেতে চাইল এবং তখনই কী সব্বোনাশ, লোকদুটো এসে দাঁড়াল সেখানে, অর্থাৎ চাবির নাগাল পাবার আগেই সে নিজেই পৌঁছে গিয়েছিল ওদের খপ্পরে। হাত বাড়ালেই খপ করে ধরে ফেলতে পারত তার কব্জি। চকিতেই সে ঝপ করে বসে পড়ল পেছনের সিটে নিজের জায়গায়। নিশ্চিতই ওদের আওতার বাইরে। কিন্তু রেহাই নেই। খামচি মেরে পেটের ভেতরটা

আঁকড়ে ধরেছে কেউ। যন্ত্রণাটা উঠে আসছে ওপরের দিকে। বুকপাঁজরা ভেঙে ঘন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাঁপিয়ে ওঠার ক্লান্তিতে দুঃসহ হয়ে ওঠার পর এবার তার চিৎকার করে ওঠাই সঙ্গত ছিল। বিপদে পড়লে মেয়েরা যা করে। কিন্তু কী একটা দলা আটকে আছে গলায়। সে গোঙাতেও পারছে না ঠিকমতো। অথচ কালান্তক বীভৎসায় দুটো লোক তখন তার খুব কাছাকাছি। একেবারে ঘাড়েব ওপব অতীব বাস্তব।

'রূপয়ে নিকালো...'

চক্রাবক্রা জামায় বুক-খোলা, গলায় চেন, ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফওলা তাগড়াই জোয়ান লোকটা কথা বলল শেষ পর্যন্ত। চোখদুটো কী ভয়ঙ্কব? বিমূঢ় রাধা জানে না কী করবে সে, কী তার কবা উচিত? তাকিয়ে থাকে। চোয়ালের হাড়দুটো ব্যথায় ব্যথায় শক্ত হয়ে উঠছে। ঠোঁটদুটো কাঁপছে থরথব। শয়ে শয়ে গাড়ি ছুটছে অভিজাত পল্লির প্রশস্ত সড়কে। পোড়া ডিজেল-পেট্রোলের ধোঁযা। দিগন্তব্যাপী আলোর মালায জ্বলছে কলকাতা। কাছেপিঠে আপন মানুষ কেউ নেই তার। হোটেলের দরজা অনেক দূর।

'লাইনমে নই আযি হ্যায ক্যায়া? কানুন জানতি নেহি?' লোকটাব গলাব-স্বব আরো ভারি—'নিকালো রূপেয়া। শ-শ কবকে দো। হামলোগ দো হ্যায়...'

ওদের পকেটে পিস্তল থাকে। কথায় কথায় ক্ষুর চালায়। বাধা জানে। টিভি সিনেমাব অনেক বইয়ে দেখেছে সে। এবং আজ যখন অতর্কিতে সে নিজেই এক ভিলেনের কব্জায়, নায়িকা হবাব সাধ থাকে না। কেননা তার হিবো নেই। কোথায় রাজা সিং? গরিবদুঃখীর আপনজন। দুশমনের দুশমন! কিংবা আশা থাকে, এসে যাবে কেউ। ওরা শহরেই থাকে।

দূরবর্তী হোটেলেব দিকে তাকায় আকুল প্রত্যাশায়। সে-ও তাব পোড়াকপালেরই মতো। দরজা খোলে না। সুতরাং সে ডুকবে উঠল। জলভবা মেটে-কলস ভেঙে পড়লে যেমন হয়, আঁচল টেনে মুখ চেপে পুরোপুরি হেলে পডল বাঁ-পাশে। সর্ব অঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে অঝোর কান্না।

'কিউ রো রাহি হো?' হবিণস্বভাবে মুণ্ডুটা ঝোপঝাড়ে লুকিয়েই বাধা মনে ভাবে, বুঝি বাঁচানো গেল নিজেকে। কান্নার হিক্কায় শুনতে পায়, দুর্বৃত্তেব গলার স্বরেও সোহাগী ঢঙের আদল—'আধি বাত কো কিস নবেলিকো গাডি মে রাখ কব বাবুসাব আংরেজি শবাব পিনে গয়ে হ্যায, হামে পাতা হ্যায়। সাবি রাত ফূর্তি করকে কাফি পয়সে অ্যাঠোগি। বাবু কি পাশ ত গাডিকা লাইসেন্স হ্যায়। জোয়ানি ভরি তোমহারে বডিকা লাইসেন্স হ্যায় কি নেহি?'

থরথর কাঁপে বাধা। গোটা শরীবের গাঁটে গাঁটে কাঁপুনি তুলে ভাষাশূন্য শব্দহীন নিরর্থক ধ্বনিপুঞ্জ। হাঁটু মুড়ে মাথা নুযে একটানা বসে থাকায় টনটনে ব্যথা পিঠে-শিরদাঁড়ায়। ভিজে যাচ্ছে. ভিজে যেতে থাকে বাবুদেব গদিব আসন। মা আব দিদিমণিদের নিয়ে কখন ফিরবেন দাদাবাবু, সে জানে না। কখন ফুবোবে ওদের ভালোমন্দ সাহেবি খানাপিনা? রাধা মরে যাবে। মনে মনে ঠাকুরদেবতাব নাম জপেও বুঝি বেহাই নেই। তার নিয়তিনির্বন্ধ দুটো লোক নড়ছে না। কিংবা যখন নিজের কাছেই দুর্বল মনে হয এভাবে কান্নাকে টেনে চলা, মরিয়া চেষ্টায় গোটা সাহেবপাড়া কাঁপিয়ে গলা ছিড়ে চিৎকারে

ফেটে পড়ার জন্য সাহস চাইল সে। খুলে যাক হোটেলের দরজা। ছুটে ছুটে আসুক ভদ্দরবাবুরা। গোঙানি থেমে যায়। একটু একটু করে মাথা তোলা, শেষ লড়াইয়ের জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলতে যেটুকু সময়...

কিন্তু তার আগেই পেছনের বন্ধ-কাচে থাপ্পড়ের পর থাপ্পড়। লক-করা গাড়ির দরজায় হাতল ধরেও বারকয়েক টানাটানি। গোটা গাড়িটাই দোল খেল এপাশ-ওপাশ। অসম্ভব গায়ের জোর ষণ্ডাগুণ্ডাদের। ওরা কি দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারে? এভাবেই কি মেয়েমানুষ লুট হয় শহরের রাস্তায়? নাকে মুখে আঁচল চেপে, অন্ধকারে শুধু চোখজোড়া ভাসিয়ে রেখে গোটা শরীরে রাধা ওর বেঁচে-থাকার শেষ দমটুকুও নিঃশেষ করে ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল। শক্ত বরফ। কিংবা সে নিজেকেই চিনল নতুন করে। ঘাটের-মড়া মেয়েমানুষের শরীরটাই তার বড় শত্তুর! এবং চিৎকারে চিৎকারে ফেটে পড়ার মুহূর্ত যখন, সামনের খোলা জানালায় সেই লোকটার প্রচণ্ড হুঙ্কার—'ছোড়ো, ছোড়ো, দো খাজুর ছাপ ছোড়ো জলদি। টায়ার পাঞ্চার কর দেঙ্গে। আগ্ লাগা দেঙ্গে গাড়িমে। তু শালি কিউ জ্বল্ কর মরেগি?'

'আআআআ...' মরণভয়ের স্বাভাবিক আর্তনাদে আলাদাভাবে কোনো সাহস সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল না। অথবা এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠে অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি বিপন্ন রাধা দু-হাতে কান চেপে গলা চিরে চিৎকারে সত্যি সত্যি সাহেবপাড়ার নিশুতি কাঁপায়।

নতুন করে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে দেশলাই জ্বেলেছে লোকটা। নিজের ঠোঁটে আগুন ছোঁয়াবার আগে আঙুলের চিমটিতে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির ভেতর। সাপের লকলকে জিভের আদলে একরত্তি আগুন, কিংবা আবছা অন্ধকারে কালো হাতটাই বুঝি কোনো খরিস-গোখরোর শরীর, অথবা তাকানো যাচ্ছে না আরো পেছনে—শয়তানের চোখ! প্রথম আর্তনাদের পরই দিশেহারা গোঙানিকে জিইয়ে রেখে এবং আগুনটুকুর ওপর সতর্ক নজরে কোমর ঘেঁষড়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে নামতে থাকে সে। দুটো সিটের মাঝখানে যে-সঙ্কীর্ণ গর্তটুকু, সেখানেই অনেকটা সজ্ঞানে কবরে শয্যা গ্রহণের ভঙ্গিতে, আত্মনিবেদনে, অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে, আচারের বয়মে তেলে-ভেজানো শুকনো আমসির মতো হয়ে, নিজেকে ভেঙেচুরে হাত-পা গুটিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সম্ভ্রান্ত কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এলাকায় মাটি পাবে না সে। কিন্তু লাখ টাকার গাড়ির তলানিতে আশ্রয় থাকে, যেখানে সুন্দর সুন্দর জুতোসুদ্ধ চরণ রাখেন সাহেব বা মা, দাদাবাবু দিদিমণিরা। তাঁদেরই চরণধুলোয় মাখামাখি হয়ে যায় শখের শাড়ি, তৎসহ তার সুন্দরী হয়ে ওঠার সমস্ত আহ্লাদ।

অথবা কবর নয়, সে 'সতী' হয়ে উঠতে থাকে। সে জানে, অগ্নিকণার বিপদ। যদি হাত ফসকেও দেশলাই-কাঠি থেকে ছোট একটু আগুনের দানা খসে পড়ে হঠাৎ, সামনের দিকে গদির আসনে পলিথিনের আস্তরণ বা ভেতরকার নারকেল-ছোবড়া দাউদাউ জ্বলে উঠবে চোখের পলকে। পেট্রোলে চলে যে-গাড়ি, যদি আগুন ছুঁয়ে ফেলে...ভাবতেই পারছে না সে—লক-করা গাড়িটা খুলে দেবে না কেউ। ছিটকে বেরুতে পারবে না সে নিজেও। কাঠ-কাঠ শুকনো গলার তেষ্টায়, নিঃশ্বাসের কষ্টে, পেটের খিমচানি আর অবশ হাত-পায়ের ঠাণ্ডা রক্তে অন্ধকার গর্তের ভেতর গুটিসুটি মেরে থেকে স্পষ্ট

দেখতে পায়—লাখ টাকার গাড়ি তার চিতা হয়ে জ্বলছে আগুনে। তার হাত পুড়ছে, পা পুড়ছে, পেট পুড়ছে, বুক পুড়ছে, মাথার চুল পুড়ছে, চোখ পুড়ছে, যোনি পুড়ছে, জরায়ু পুড়ছে, স্তন পুড়ছে—মাত্র আঠারো বছরের দেহটা দগ্ধে দগ্ধে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার, সেই 'সতী'-র মতো...আছাড়িবিছাড়ি কান্নায় হা-হুতাশেও সে ভাবতে পারে—অনেক, অনেক কাল আগে টিভির কোন্ এক বইয়ে মাত্তর ষোল বছরেব বাচ্চা একটা বউকে স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়ে মরতে দেখেছিল। আবাগি মেয়েটার একটা পুণ্যি ছিল তবু। অনেক ঢাকঢোল শাঁখের বাদ্যি ওকে ঘিবে। কিন্তু রাধা-নামের এমনই কপাল তার। মরদ জোটে নি। সতী হতে পাবে নি এখনও। কোনো পুণ্যি নেই।

অবাক কাণ্ড। আস্তে আস্তে মাথা তুলল রাধা। কতক্ষণ হতে পারে একরত্তি একটা দেশলাই-কাঠির পবমায়ু? জ্বলছে না গাড়ি। পুড়ছে না সে। কিন্তু নতুন উৎপাত। বাইরে কাদের যেন হল্লা-চেঁচামেচি। ছুটে পালাচ্ছে কাবা। কারা এসে নতুন করে হামলে পড়ছে গাড়ির ওপব! উঁকিঝুঁকি চারপাশ ঘিবে। এবাব একসঙ্গে অনেক মানুষ। কোনো ভরসা নেই। সাহেবপাড়া এক ভয়ঙ্কব স্থান। যেটুকু মাথা তুলেছিল সে, সেটুকুও আবার টুপ কবে অন্ধকার গর্তে ডুবে যায়। বুকের কান্না শুকিয়ে আসে চোখেব পাতায়। আস্তে আস্তে আবাব থিতিয়ে ঠাণ্ডা হযে আসতে থাকে সাহেবপাড়া। সাহেবপাড়া বলেই এখন আরো বেশি ভয। মাথা তোলে না বাধা। ছোট একটা গর্তের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে বাঘার মতো। কাঁপে যন্ত্রণায। এভাবেই বাবুদেব পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পডে থাকে বাঘা। বাঘা সাহেবি জানোযার। সাহেবপাড়ার ইজ্জত। চারপেযে জানোয়াবের বুকপোড়ানি নেই। কিন্তু শবীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথায়-যন্ত্রণায় মবে যাচ্ছে সে। সাহেবপাড়ায় মবণ রাধার।

গদির আসনে উঠে বসতে ভয। মনে হয়, ভয়ঙ্কর লোকদুটো আছে এখনও। ওত পেতে আছে কোথাও। সে মাথা তুললেই ফেব মেয়েমানুষ চাইবে ওরা।

এভাবেই পড়ে রইল। কতক্ষণ। হিসেব নেই। হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল লক-করা গাড়ির দরজা। অতর্কিতে ফুরফুবে বাতাস এক ঝলক। বাধা চমকে উঠল। খলখল হাসিতে নিজেদের ভরভরাট রেখে হেঁটে আসছিলেন দিদিমণিবা। ওঁদের দুলকি চালে হাঁটার চলনটা দূর থেকেও স্পষ্ট চেনা যায়। কাছাকাছি এসে হাসিটা থমকে দাঁড়াল। দবজা খোলার পর অকস্মাৎ মাযের ব্যাকুল গলার স্বব —'রাধু? বাধু কোথায়? রাধু...'

বাবন লাফিয়ে উঠে গাড়িব ভেতরকাব আলো জ্বালল। আরো এক অভাবনীয় মজাদার দৃশ্যে উচ্ছল হাসি চেপে রাখা সত্যি কঠিন, বিশেষত মুনমুন বা বুলবুলির পক্ষে। কিবণময়ী বা বাবনের ক্ষেত্রে সেটা আর কৌতুক থাকে না, কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় সবিস্ময় উদ্বেগ—'কী রে, কী করছিস তুই? ওখানে কেন?'

রাধার প্রাণান্ত তখন। রাস্তায় হাইড্রেনের পাতাল ফুঁড়ে নোংরা জলকাদা গায়ে মেখে বেরিয়ে আসে যারা, তাদেরই মতো গাড়ির সিটের অন্ধকার গুহা থেকে উঠে আসছে কেউ। অবশ্যই রাধা। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় প্রথম কোমবটাকে উঁচু করে তুলে নিতে হয়। তাবপর বাঁ-হাতে সামনের সিটেব মাথাটা ধবে, পেছনের সিটে ডানহাতের কনুইয়ের চাপ রেখে কাতরেকুতরে ঘন নিঃশ্বাস টেনে টেনে গদির আসনে নিশ্চিন্ত আবোহণ

যদিও, বুকের কাপড় এলোমেলো, বসনভূষণ ছন্নছাড়া। লণ্ডভণ্ড মাথার চুল। নাক-মুখ-চোখ-ঠোঁট বা ফোলা-ফোলা নিটোল দুটি গালে বোকা-বোকাভাবে স্নো-পাউডার রংচং ঘষার অবশেষটুকু চোখের জলে-জলে লেপটে এখন কোনো মূকাভিনেত্রীর চেহারায় আরো অদ্ভুত। সুতরাং রাধার আতঙ্কের চাউনি বা আপনজনদের চোখের কৌতুক—উভয়তই অস্বস্তির। যথাক্রমে অভিমান এবং বিস্ময়।

'তুই এখানে শুয়ে ছিলি কেন? ওখানে শুয়ে শুয়ে কি করছিলি তুই?' কিরণময়ী ভেতরে ঢুকলেন। সোহাগে হাত রাখলেন ওর কাঁধে।

রাধার সাড়া নেই। সমস্ত বিহ্বলতায় আপন মানুষদের ফিরে পেয়ে, নিশ্চিতই আপন মানুষ, স্বাভাবিক নিঃশ্বাসে ফিরে আসতে সময় লাগে তার। কি জানি কেন, মনে হয়, লোকটাকে সে চেনে। দেখেছে কোথাও? সে-তার মনে-হওয়া। শুধুই মনে-হওয়া। আসলে মিথ্যে। কিংবা সত্যি! সত্যিমিথ্যের ভয়ঙ্করে, ঘন নিঃশ্বাসের তোলপাড়ে তাকায় সামনের দিকে, বাঁদিকের ভৌতিক জানলায়। লোকটা নেই। লোকগুলোর মুখও মনে পড়ছে না। ভালো করে দেখাই হয় নি তখন। লোকদুটো আদৌ ছিল কিনা—এখন সংশয়।

মুনমুন আর বুলবুলি যথারীতি বসে গেছে যে-যার জায়গায়। সহসা কিরণময়ী—'এ কি রে, তুই খাস নি এখনও? সবই যে তুলে রেখেছিস। জানিস কত টাকা দামের একটা প্যাকেট?'

আঁচল টেনে সজোরে মুখ ঘষতে ঘষতে রাধার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি—'থাক। ঘরে গিয়ে খাব...' ক্ষীণকণ্ঠে শব্দগুলি উচ্চারণের পর আঁচলটা আর নেমে আসে না। দু-হাতে মুখ চেপে, শিরদাঁড়া ভেঙে মাথাটা ঢলে পড়ল তলাব দিকে, নিজেরই দুটো হাঁটুর ওপর। যেন দীর্ঘ, দীর্ঘ এক দুঃস্বপ্নের প্রহর কাটিয়ে নিজের জগতকে ফিরে পেয়ে এবার সে প্রাণ ভরে স্বস্তি পেতে পারে বলেই ভেতরের চাপটা বুকের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

নিশ্চিতই এ-ধরনের কান্নাকাটি বা ফ্যাঁচফ্যাঁচের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। চাবি ঘুরিয়ে শেলফ মেরে সবে স্টার্ট নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল বাবন, ঝামটা মেরে তাকাল পেছনে—'এই...এই সব এই মা-র জন্যে। সবটাতেই বেশি-বেশি। বাড়িতে থাকলে কী হতো ওর? নন্দদা আছে, বৈজুদা আছে। ওকে খেয়ে ফেলত কেউ? না, এতবড় মেয়ে ঘরে একা থাকবে কেন? এখন বোঝো ঠেলা। গাড়ির ভেতর ফালতু ভেউ-ভেউ! হোয়াট দ্য আদার পিপল উইল থিংক অব আস? আরে, এসব ক্যালানে-কেলটেদের নিয়ে যাওয়া যায় নাকি কোথাও? যত্ত গেঁয়ো ভূত!'

মুনমুন পাশে ছিল। আস্তে গলা বাড়াল—'সি মাস্ট হ্যাভ এ প্রব্লেম। গাড়িতে ও একা ছিল!'

'একা ছিল ত কী হয়েছে? সে-অনেকেই থাকে...' দেড় ফুট দু'-ফুট তফাতে সামনে-পেছনে দুটো গাড়ি। নিজের গাড়ি বের করতে ডানদিকের জানলায় মুখ বাড়িয়ে কায়দা খুঁজতে হচ্ছিল বাবনকে। পেছনে না তাকিয়েই ঝাঁঝাল গলায়—'গাড়ি লক-করা ছিল। কেউ কি গাড়িশুদ্ধু লুটে নিয়ে যাবে নাকি ওকে? মাজাকি নাকি? অতই সস্তা?'

সামনের সিটে থুতনি ঠেকিয়ে ঘুরে বসেছিল বুলবুলি। তাকেও কিছু বলতে হয়—'সি ইজ্ উইপিং বিকজ উই ডিড'ন্ট টেক হার উইথ আস...'

মেয়ের কথার অর্থ বোঝেন না কিরণময়ী। রাধার ওপরেই ধমকে উঠলেন—'কী হয়েছে বলবি তো তুই। কেঁদেই যাচ্ছিস তখন থেকে...'

'গুণ্ডা মতো দুটো লোক...,' ফ্যাসফেসে গলা। মাথা তুলতে চাইল রাধা। বাক্যটা অসম্পূর্ণ।

'দুটো লোক? দুটো লোক মানে? কারা?'. সন্ত্রস্ত কিরণময়ী।

আগুপিছু সামলে গাড়ি বের কবাব কসরত চলছিল তখনও। আবার ঝাপটা মারল বাবন—'সেই এক কথা তখন থেকে। দুটো লোক! এত লোক চলছে বাস্তায়, এত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কারা এসে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির সামনে! তাতে তোব কী? তোকে ধরে টানছিল? বলছিল কিছু? এ-কি মামদোবাজি নাকি? হোটেলের দরজাব সামনে পুলিশের গাড়ি। একটা হাঁক দিলে কত লোক জমে যায় এখানে।'

কোনো উত্তর নেই বাধার। থাকাব কথাও নয়। কেননা, লোকদুটো এখন সত্যি নেই। লোকদুটো যে এক সময় সত্যি ছিল এবং রাস্তা থেকে লুটে নিলে যা হতে পারে একজন মেয়েমানুষেব, তাব চেযে কম কিছু হয় নি তার ওপর—কিন্তু কথাগুলির কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ না থাকলে, বলাবাহুল্য, অভিযোগ মিথ্যে। মিথ্যে অভিযোগে এ-ধরনের কান্নাকাটি নিশ্চিতই একটা বানানো-সাজানো ব্যাপাব। বানানো কান্নার আওয়াজটা একটু আলাদা রকম হয়ে যেতে বাধ্য। রাধা আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়ল। সত্যিকাবের কান্না দুঃখের কান্না ভয়েব কান্না আলাদা-আলাদা নিয়মে কী কবে কাঁদতে হয়, সে জানে না।

কোনো খোঁচাখাচি ছাড়াই গাড়িটা বের করে এনেছে বাবন। ডান পায়েব অ্যাকসেলারেটর-ব্রেক বা বাঁ-পাযের ক্লাচ অথবা দুটো হাতে গিয়ার-স্টিয়ারিং ঘোরানোয় নিপুণ কৃৎকৌশল। কিন্তু রাস্তার মূল স্রোতে মিশে যাবাব আগে নতুন অনর্থপাত। ন্যালবেলে ঢিলেঢালা শার্টপ্যান্টের দুজন মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে পথ। এগিয়ে আসছে। শুধু রাধা নয়, প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এবার সমবেতভাবে সকলেই উন্মুখ। মুখে আঁচল চেপে একমাত্র বাধাই আলাদা নজরে চিনে নিতে চেষ্টা করল মুখগুলি। মনে হয, এ-তার নিতান্তই মনে-হওয়া—অন্য মুখ, ভিন্ন চেহাবা। গাল ভরে দাড়ি নেই এদের কারুব।

'আপনারা এখানে এভাবে আলগাভাবে রেখে গেছেন গাড়িটা?'

'কেন, কী হয়েছে। লক-করা ছিল।'

'কিন্তু কাচগুলো তোলা ছিল না সামনের দিকে। দিন দশেক আগে এখানেই গাড়িচুরিব কেস ঘটে গেছে একটা। একেবারে নতুন কন্টেশা। তিন হাজার কিলোমিটারও চলেনি।'

'সে-কি! আমাদের গাড়িরও সে-রকম কিছু হচ্ছিল নাকি?' চড়া টেনশনে কিরণময়ীও আর স্থির রাখতে পারেন না নিজেকে। গলা বাড়িযে ছেলের কাঁধের পাশে সামনের জানালায়।

'হয় নি মা। সে-তো দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু হতে পারত। দুটো লোক কিছু

একটা মতলবে ছিল। খুবই খারাপ লোক ওরা। হামেশাই এসব বাজে লোক ঘুরে বেড়ায় এখানে।.....'

'অ্যাঁ! হাউ হরিবল!' মুনমুন-বুলবুলির ঢেকুর-তোলা আর্তনাদ। অথবা শঙ্কিত চোখগুলি একইসঙ্গে ঘুরে যায় রাধার দিকে—'কি রে, তুই দেখেছিস লোকদুটোকে? কী সাহস রে তোর। আমি মরে যেতাম। সিম্পলি আই উড হ্যাভ ডায়েড...'

আতঙ্কিত কিরণময়ী পিঠে হেলান দিয়ে ঢলে পড়েছেন পেছনের দিকে। দক্ষিণের জানালায় কিঞ্চিৎ বাতাস চাইলেন—'এ-যে কী হলো দেশটার! নিজেদের গাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথাও যে-একটু যাব, তারও সোয়াস্তি থাকবে না? গাড়ি চুরি যাবে কী? অ্যাঁ, সে-কি কথা? গাড়ির ভেতর যে একটা বয়স্থা মেয়েও ছিল।'

এবং রাধা, সেই মেয়ে, মুখ থেকে ফেলে দিয়েছে ভয়ের আঁচল। এখন সে অনেকটাই চাঙা হয়ে উঠতে পারে নিজের শিরদাঁড়ায়। কেননা, তার মরণবাঁচনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলি সত্যি হয়ে উঠছে এবার। সত্যি করে তুলেছেন রাস্তারই মানুষ যাঁরা। অন্য মানুষ।

সুহৃৎ ব্যক্তিদের, সতর্কীকরণে এগিয়ে এসেছিলেন যাঁরা, নিশ্চিতই অন্য মানুষ, তাঁদের কাউকেই খুব একটা আমল দেয় নি বাবন। দুর্দম হাইস্পিড তার নিজের কব্জায়। অভিজাত পার্ক স্ট্রিটের প্রশস্ত সড়ক ছুঁয়ে, হয়তো পাখিব চেয়েও দ্রুততর কোনো গতি, গাড়িটা আবার নতুন করে দু'পাশে ভারি বাতাসের ঝড় তুলে উড়ে যেতে থাকে, এবং অভ্যন্তরে নিজেদের যথেষ্ট নিরাপদ জেনে মেয়েরা কলকল কলরবে অজ্ঞাতকুলশীল দুই দুষ্কৃতীর ক্রিয়াকাণ্ডকে ঘিরে আরো এক রোমাঞ্চকব শিহরনে মেতে উঠল, যে-উত্তাপ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় নি—ভীষণভাবেই সত্যি। অথবা সমগ্র পরিবারের তরফে যে-উত্তেজনা শুধু রাধাই উপহার দিতে পারে তাঁদের এবং সেই মেয়ে, রাধা, যেহেতু একমাত্র সে-ই দেখেছে মরণছায়া, ভয়ের খোলস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে ঘটনাকে আরো রঙিন করে তুলতে থাকে—ওদের হাতে পিস্তল দেখেছিল সে। মরে যেতেই পারত। কিন্তু মরে নি। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরেই বেঁচে গেছে আজ। লাখ টাকার গাড়িটা বাঁচিয়েছে।

রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের প্রহর কাটিয়ে. ঘরে ফিরে, কবুল করলেন কিরণময়ী—বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যাচ্ছিল আজ। তেমন কিছু যে ঘটে নি, সে-শুধু রাধা...তাঁর রাধা সঙ্গে ছিল বলেই।

এবং রাধা, যতই বাহাবা পাক, একান্ত নিভৃতে নিজেকে নিয়ে তার গণ্ডগোলটা থেকেই যায়। বুকের তরাস ঘোচে নি এখনও। কামড়ে ধরে থাকে ভয়—সাহেবপাড়ায় রাতদুপুরে ভূতে ধরেছিল তাকে। অদ্ভুত ভূত।

কিংবা সে-ভূত তাব চেনা। সত্যি চেনা কিনা নিজের কাছে নিজেরই অজানায় বুকের তরাস অলীক হয়ে ওঠে। তার একান্ত গোপন।

রাধার তমালছায়া:
চাটুজ্জেপরিবার সংক্রান্ত কিছু তথ্য

'কিরণময়ী'—বাঙালি মধ্যবিত্তের অতি পবিত্র হৃদয়াবেগ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের উদ্দাম নায়িকা। পাঁচ দশক আগে পঞ্চাশের মন্বন্তর—ভয়াবহ সেই আকালের বছর সেপ্টেম্বর মাসে মধ্যম পুত্র শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্যের গৃহে সংসারের প্রথমা কন্যার জন্ম-আবির্ভাবে, 'নভেল-পড়ুয়া' ঠাকুরমা পরম সন্তোষে নামকরণ করেছিলেন নবজাতকের। তৎকালীন দিনে নিশ্চিতই এক দুর্ধর্ষ আধুনিকতা। ঠিকুজিকোষ্ঠীতে এই আধুনিকতাই যে বিধিনির্দিষ্ট ছিল, সেটা প্রমাণ হলো অনেক পরে। বিবাহলগ্নে।

আদিনিবাস অধুনা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমা অঞ্চলে ফকিরহাট থানা এলাকায় বাহিরদিয়া গ্রাম। দেশবিভাগের লজিকে উদ্বাস্তু পরিবার হলেও বঙ্গদেশীয় রীতিকানুনে কিরণময়ী সর্বাংশে পূর্বদেশীয় বা বাঙাল নন। দেশত্যাগী হয়েও ভারতবর্ষ নামক এক সুবিশাল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে খুব বেশিদূর এগোতে পাবলেন না। সীমান্তের অদূরবর্তী উত্তর চব্বিশ পরগনার মসলন্দপুর স্টেশনের নিকটস্থ উত্তর চাতরায় পিতৃদেব স্বতন্ত্রভাবে একটি সাধারণ স্তরের নতুন ভদ্রাসন নির্মাণ করেছিলেন। আজও সেখানে গার্হস্থ্য-বসবাসে দাদা বা ভাইরা নিরাপদ সুখেই আছেন। জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য অদূরবর্তী একটি কলেজে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। তদীয় পত্নী প্রতিমা দেবী স্থানীয় একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা। মধ্যম অগ্রজ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ইঞ্জিনিয়ার। সুদূর বোকারো ইস্পাত কারখানায় সস্ত্রীক বসবাস। সেক্ষেত্রে কিরণময়ীর একমাত্র অনুজ শিবতোষ কিছুটা কমজোরি। নিজের জোরকে বাড়িয়ে তুলতেই স্থানীয় রাজনীতির একজন জবরদস্ত পাণ্ডা। বনগাঁ লোকালের নিত্যযাত্রায় কলকাতা আসেন। সরকারি আপিশের কর্মচারী। দ্বিপ্রাহরিক চাকরিবাকরি সেরে সন্ধেবেলা শিয়ালদা থেকে আনাজপাতি মশলার বাজার নিয়ে ঘরে ফেরেন। বলা বাহুল্য, ভগ্নীগৃহ তাঁদের সকলের কাছেই একটি পারিবারিক গৌরব। কেন না, বিত্তমোহ এক সাংঘাতিক জীবনপ্রক্রিয়া।

অন্যদিকে, এই সুমহান বিত্তনির্মাণের একমাত্র স্থপতি শ্রীযুক্ত নিশীথরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আশ্চর্য এক পুরুষমহিমা। কবে কোন্ পুরাকালে অধুনা বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তিক চট্টগ্রাম জেলায় কর্ণফুলী নদীতীরে কোথায় কোন্ এক অখ্যাত মুড়াগাছি গ্রামে পিতৃপুরুষরা কে কোথায় কী ছিলেন, এতদ্বিষয়ক বৃথা স্মৃতিবিলাসের বাসনা বা ন্যাকামি বা আদিখ্যেতা বা সময় কোনোটাই তাঁর পর্যাপ্ত নয়। দেশবিভাগজনিত রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের পর পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রয়াত সুখরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কীভাবে এক অতিপ্রাকৃত ঝড়ঝঞ্ঝাকে প্রতিহত করে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ সমগ্র পরিবারকে রক্ষা করেছেন—এতদ্সংক্রান্ত অতীতচিন্তাও তাঁর বর্তমান জীবনবিন্যাসে এক অনাবশ্যক চিত্তবিভ্রম। একদা যৌবনকালে যৌথ পরিবারে 'মেঝেতে বসে পাত পেতে পংক্তিভোজ' বা বছরে একদিন-কি-দু'দিন এক বাটি মাংস বা একখণ্ড ইলিশ মাছের ঝোলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠার ছেঁড়া-চটি ছেঁড়া-ছাতা জাতীয় কেরানিপনা নিয়ে কাব্যি করা তাঁর জীবনভাবনায় এক প্রকার দুষ্ট ব্যাধি। কেন

না, দ্রুতগতি কালস্রোত এবং তদ্‌বিপরীতে মানবজীবন অনন্ত নয়। জীবনের প্রাথমিক পর্বে মাতাপিতার আশ্রয় অবশ্যই জরুরি ছিল। কিন্তু স্বনির্ভরতাই যে প্রাণধারণের একমাত্র সিদ্ধি, এবম্বিধ জ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. কম. এবং অনিঃশেষ শ্রমে নিষ্ঠায় একজন পরিপূর্ণ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তৎসহ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেব-সমীক্ষক সংস্থার সম্পূর্ণ মালিকানা। তামাম ভারতবর্ষব্যাপী ক্রমান্বয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্তরে স্তরে বিগত ত্রিশ বছরে তাঁব নিজেরও পঞ্চবর্ষগুলি উন্নতিশীলতার চড়াইয়ের দিকে শুধুই ঊর্ধ্বমুখী। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, অনুন্নত অতীতের গ্লানিমোচন বা আত্মসমৃদ্ধির দীর্ঘপ্রতিক্রিয়া শুধু আত্মকেন্দ্রিক নয়। পারিবারিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তাঁর বিবিধ কৃতকর্তব্য তাঁকে নিজস্ব আত্মীয়-পরিজনবৃত্তে এক অপরিমেয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রভুত্বে স্থাপন করেছে। তাঁর এবম্বিধ ক্রিয়াকর্মেব মোটামুটি হিসেব:

ক. প্রয়াত পিতৃদেব পার্কসার্কাস অঞ্চলে যে-ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করে দেহরক্ষা করেছিলেন অথবা যেস্থানে তাঁর কৈশোর যৌবন তথা বিবাহোত্তর জীবনের প্রথম কয়েক বছর অতিবাহিত, সমগ্র ত্রিতল প্রাসাদভবন ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রজ-অনুজদেব বিপুল পরিমাণ অর্থপ্রদান।

খ. প্রয়াত জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতার স্ত্রী, অর্থাৎ বৌদির ইচ্ছাপূরণে তাঁর কন্যার বিবাহে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়। অনুপম বাবাজীবন পরবর্তী সময়ে আমেবিকাব নাগরিকত্বগ্রহণে বংশমর্যাদাবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে তাঁর নিজেরও সম্ভ্রমবিস্তার।

গ. অনুজ দুই ভাইয়ের একজন এম. বি. বি. এস. পাশ করার পর দক্ষিণ কলকাতায় ভাড়াভিত্তিক এক সুরম্য প্রাসাদে প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিসহ জাঁদরেল জাঁদরেল স্পেশালিস্ট সমাহারে পলিক্লিনিকের পত্তন। এক্ষেত্রে নিজস্ব প্রভাববিস্তারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ অতি সহজেই নিশ্চিত করা গেছে।

ঘ. সর্বকনিষ্ঠ নিতান্তই গোল্লায় চলে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত তাঁকেও উন্নয়নশীলতায় যুক্ত করা গেল। রাজ্য-প্রশাসনের কতিপয কর্তাব্যক্তিব সহযোগিতায় একটি ভালো রুটের বাস এবং দুটি মিনিবাসের পারমিট। এক্ষেত্রেও মৌল মূলধন ব্যাঙ্ক-ঋণ এবং নিশীথরঞ্জনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

দেশীয় উন্নয়নশীলতার অবশ্যম্ভাবী পবিণামে যেমন বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে-নগবে 'প্রথম প্রজন্মের শিক্ষা' অগণিত মানবসন্তানের অমৃতলাভ, একই ভাবে 'প্রথম পুরুষের ধনাঢ্যতা' কতিপয় সুধীজনকে এতদ্দেশীয় অনগ্রসব সমাজে যথাবিহিত যোত্রবান করেছে। নিশ্চিতভাবেই এ-এক অপার পুরুষকার মহিমা। নিশীথরঞ্জনের ন্যায় মহিমময় কৃতীপুরুষের ক্ষেত্রে এতাদৃশ সাফল্যের গোপনসূত্র তাঁব তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা এবং যথাসময়ে যথানির্দিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করার পরিকল্পিত উদ্যোগ। প্রাক-ত্রিশেই একটি আনুষ্ঠানিক বিবাহ এবং পরবর্তীকালে যথারীতি ধারাবাহিক সন্তানলাভ, বলা বাহুল্য, জীবনসংক্রান্ত তাঁর সামগ্রিক ছকেব অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া।

'কিন্তু মাটি আর বেটি ভোগ করতে হলে পৌরুষ লাগে......' বলেছিলেন বৃদ্ধ প্রাণানন্দ বাচস্পতি মশাই। ঝকমকে গাড়ি চেপে ডাকসাইটে চার্টার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্ট

সাহেবকেও যাঁর টোলে নিয়মিত আসতে হয়। বিতর্কশূন্য শ্রীচরণ, নিজেরও প্রাণের শান্তি। প্রভু বললেন—'বেটি তো হলো রে তোর। আচ্ছা বেটি। কিন্তু মাটি কোথায়? বসুন্ধরা বীরভোগ্যা...'

কিরণময়ী তখন সলজ্জ তরুণী। এক পাশে বসে গুরুদেবের জন্য কড়া পাকের সন্দেশ সাজাচ্ছিলেন রুপোর থালায়। মাটি বলতে কী বুঝলেন নিশীথরঞ্জন! বিদ্যুৎস্পর্শে লাফিয়ে উঠলেন—হবে হবে। পার্কসার্কাসের এজমালি বাড়ির বাইরে করতেই হবে নিজস্ব আবাসন। 'মাথা গোঁজার ঠাঁইফাই'-গোছের এলেবেলে ব্যাপার নয়। পাকাপোক্ত মজবুত বসতদুর্গ। চোর-ডাকাতকে প্রলুব্ধ কবার চুম্বকশক্তি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কালনাগিনী প্রবেশের কোনো ফাঁকফোকর থাকবে না।

সাবেকি আর বনেদী কলকাতা গলে-পচে-হেজে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঘরে ঘবে ইঁদুর-আবশোলা-ছুঁচো, রাস্তায় রাস্তায় পাইপফাটা দূষিত জল আর নোংরা আবর্জনার পাহাড়। হাই-টেকনলজির নতুন কলকাতা বাড়ছে পুবে-দক্ষিণে। ষাটেব দশকেব গোড়ায় ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথবিটি, ওরফে সি. এম. ডি. এ-র পত্তন। কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা হচ্ছে। কবি জীবনানন্দ দাশেব কবিতার একটি চরণ শ্লোগান হয়ে উঠল। যা ছিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির ধ্বনি, শ্লোগানে এসে শব্দগুলি অর্থ হারাল। জনগণের হিস্যায় শ্লোগানটুকু বেঁচে থাকে, রূপবতী তিলোত্তমা বাজার প্রাসাদে ঘর পেয়ে যায়। দেশোন্নয়নস্বার্থে এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তাবে মহানগবীব পূর্বাঞ্চলে বনমর্মরগুঞ্জিত সবুজে-সবুজ, অতি দীর্ঘ সুপ্রশস্ত যে-নবনির্মিত রাজকীয় পথ বিমানবন্দরের দিকে গড়িয়ে গেল, সবকারি তহবিল ব্যয়িত হলেও বলা বাহুল্য, মুখ্যত মাননীয় ব্যক্তিরাই তার ওয়ারিশন পেয়ে যান। সরকাবিভাবে 'কাজি নজরুল ইসলাম এভিন্যু' নামকৃত হলেও লোকমুখে 'ভি. আই. পি. বোড' সসম্ভ্রম ডাকনামই স্থায়িত্ব পেয়ে গেল। দেশবিদেশে আকাশপাড়ির শেষে ভূমিস্পর্শে সেখানে শুধুমাত্র তাঁদেব তুবঙ্গগতি গাড়িই ছোটে না। ভি. আই. পি. মাননীয়রা নিজেবাই সশরীরে এসে দাঁড়ালেন বাস্তার দুপাশে। প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে জমিদখল। মধ্যযুগে বা তদতীতে যা-ছিল বাহুবল, অদ্যকার দিনে সেটাই বহুবল। বহু বিত্ত যাঁর, তিনিই মান্যবর। প্রযুক্তিদিনের বহুব্রীহি।

নতুন রাজসড়কের একদিকে একদা যেখানে দিগন্তব্যাপী রুপোলি জলের বিস্তারে শত শত মাছের ভেড়ি ছিল, সেখানকাব সুখদুঃখের ঘবদোর গ্রামগুলি ছেড়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন বংশানুক্রমিক মৎস্যজীবীরা? জানে না কেউ। সুদুব ভাগীবথী থেকে পলিমাটি ফেলে তৈরি হলো নতুন অভিজাত পল্লি—'সল্টলেক সিটি'।

কিংবা ভি. আই. পি. রোডের অন্যপ্রান্তে ধানের জমি ডোবাপুকুব বনবাদাড় সাফ করে নতুন নতুন সম্ভ্রান্ত উপনগরী একের পর এক—শ্রীভূমি, লেকটাউন, বাঙুব, দমদম পার্ক। হদিশ নেই পুরনো দিনের চাষি-কৈবর্তদের। তাদের ভিটেয় বড় বড় প্রাসাদের স্পর্ধিত চূড়ায় বাঘসিংহের হুঙ্কার।

সেই হুঙ্কার নিশ্চিতই নিশীথরঞ্জনের ছিল। লেকটাউন এলাকায় আগেই সাত কাঠা জমি ক্রয় করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ সন্তান বাবনের জন্মের পর বৃদ্ধ বাচস্পতিমশাই অনুপুঙ্খ কোষ্ঠীবিচারে নির্দেশ দিলেন—'জাতকের ললাটে সুস্পষ্ট রাজটিকা। বৃশ্চিক রাশি শুভ

লগ্নে জন্ম। যথার্থ সিংহকে অরণ্য দিতে হয়, পুরুষসিংহকে রাজগৃহ...' গুরুবচনশ্রবণে আর বিলম্ব করলেন না নিশীথরঞ্জন। অগত্যা জাঁদরেল আর্কিটেক্ট, জবরদস্ত কণ্ট্রাক্টর, বাজারসেরা বিল্ডিং মেটেরিয়ালস, সুনিপুণ ইন্‌টেরিয়ার ডেকরেটর—সর্বসমাহারে এক রাজকীয় সুখাবাস। অতঃপর টাকাকড়িবাড়িগাড়িফ্যানফোনফ্রিজকুলারব্যাঙ্কলকারসোনাদানাটিভি-ভি.সি.আর. দাসদাসীডোবারম্যান-সহ সালঙ্কার গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবিধ ইলেকট্রনিক, অত্যাধুনিক তৈজস বা আসবাবপত্র এবং স্বামীর বিশ্রামের জন্য নিজের অবসর, নিজের অবসরে ছাদে ঠাকুরঘর, ঠাকুরের আশীর্বাদে ছেলেমেয়েদের জন্য ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদয় বৈভবসৃষ্টির পর কিরণময়ীর ভরাট সংসারে একদিন একটি অতি ক্ষুদ্র শূন্যতা দৃষ্ট হলো।

অথচ ছোট্ট এই ফাঁকটুকু পূর্ণ হওয়া সেদিন বড়ই জরুরি ছিল। বাড়ির পুরনো এবং বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে ডাকলেন একদিন—'কী কালী, এভাবে যে চলছে না আর। আমার একটা উপকার করতে পারো?'

বুড়ো কালীধন বেরা গলিত চোখের পাতায় সপ্রশ্ন তাকায়—'বলুন গ মা, হুকুম দিন। আমায় দিয়ে যদি কোনো কাজ হয় আপনেদের!'

'এত বড় বাড়িতে এত এত ঘরদোর, এত এত জিনিসপত্তর! এ-যে দেখছি আমার আরেক জ্বালা হলো। এসব দেখাশুনো গোছগাছ কি সোজা কথা? এ-কি আর একটা বুড়ি রাঁধুনি আব একটা কি দুটো ঠিকে-ঝি দিয়ে হয় কখনও? আর ওরা করবেই বা কেন এত কাজ? আমি একা-একা নিজেও যে পেরে উঠছি না......'

কী এক প্রত্যাশায় একটু একটু করে ঝলসে উঠছিল কালীধন বেরার মুখ।

নতুন একটা পান মুখে পুরেছেন কিরণময়ী। ফুরফুরে জর্দার গন্ধ—'ওদিকে গোটা দিনের জন্যে একজন কাউকে যে রাখব, সেও তো সাহস হয় না। বাসুর-মাকে বললে কালই নিয়ে আসবে কাউকে। বস্তিটস্তি থেকে আসবে সব। বড্ড নোংরা। আমার বাপু পছন্দও হয় না ওদের হাতের কাজ। ভয়ও করে। কোত্থেকে কী যে হয়ে যাবে একদিন। সাহেবকে নিয়ে তুমি চলে যাও আপিসে। দুপুরবেলায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকে। গোটা বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। একতলায় নন্দ আর দোতলায় আমি একা.....'

মায়ের মুখের বাক্যির দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে কালীধন। এরপর যেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে বাক্যিটা, সেখানে পৌঁছে মা নিজেই যদি কথাটা পাড়েন!

'বাচ্চা মেয়েটেয়ে এমন কেউ নেই তোমাদের গ্রামে? বেশ কাজটাজ জানে। মেয়ে কিন্তু! ছেলে নয়। ঘরে দু-দুটো মেয়ে বড় হচ্ছে আমার...'

সহসা উথলে উঠেছিল কালীধন—'নিবেন গ মা? এট্টা গরিবের মেয়েকে রাখবেন গ মা আপনার কাছে? আপনেদের পায়ে ঠাঁই পেলে বাপ-মরা মেয়েটার বড্ড উপকার হয়....'

'বয়স কত?'

'বয়েস আর কী গ মা! এক্কেবারে দুধের বাচ্চা। এই হবে আট-নয়...'

'ন-বছরের বাচ্চা? কী বলছ?' ভ্রূ কুঁচকেছিলেন কিরণময়ী—'ও-মেয়ে কাজ করবে কী? এখানে এসে তো মায়ের জন্যেই ম্যা-ম্যা করবে সারা দিন.....'

'না গ মা, যা ভাবছেন তা নয়। পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ে। হাড়গোড় খুব শক্ত। আমার বাড়ির লাগোয়া এট্টা পুকুর। পুকুরের ওধারে ওদের ঘর। বেধবা মায়ের সঙ্গে হাতে-হাতে কত কাজ করে দিনভর! করতেই হয়। পেটের টান গ মা! সে-যে কী যন্তরনা...' একটি অনাথ বালিকার জন্য সেদিন বড়ই ব্যাকুল ছিল কালীধন--'আমাদেরই স্বজেত, মাহেষ্যঘর গ মা। ওর বাপ, অনাদি কুঁতি মানুষটা বড় ভালো ছিল গ। আমার ছোটভাই কেষ্টর চাইতেও বয়সে ছোট। কিন্তু হলে হবে কী? এটুকুন ছেলে, বলা-নেই-কওয়া-নেই টুক করে মরে গেল। এই ত দু-সন আগে। একটা মেয়ে আর একটা ছেলেকে নিয়ে বেধবা বউটার কী ভোগান্তি। কিছুই ত নেই। থাকার মধ্যে ওই এক শতক কি দেড় শতক জমির ওপব একফালি বাস্তুভিটে, একটা ভাঙা মেটেঘর আর দুটো কবে হাত-পা আর গতর। হ্যাঁ, আছে গ মা, মরার আগে কোত্থেকে যে এট্টা গাইগরুর বাছুর নিয়ে এসেছিল অনাদি...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি...' লম্বাচওড়া বকবকানিতে কালীধন এত কী বোঝাতে চাইছে, কিরণময়ীর কাছে নিষ্প্রয়োজন তথ্য। ছোট কবে হাসলেন—'সে-তো হলো। কিন্তু আমাদেব এখানে যে গোয়ালঘব নেই কালী। সকালবেলা মাদাব-ডেয়ারির দুধ আসে। ছেলেমেয়েবা কৌটোর দুধ খায়...'

'না গ মা, আপনি যা বলবেন, যেমনটি বলবেন, ও-মেয়ে তাই করবে। বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, ঘরদোব ঝাঁট দেবে। ফাইফরমাশেব কেনাকাটা করতে দোকানপাটেও যাবে...'

'হ্যাঁ, তুমি যখন বলছ এত করে, সে-কি আর না ভেবেচিন্তে এমনি-এমনি বলছ?'

উৎকণ্ঠ তাকিয়ে ছিল কালীধন। হঠাৎ যদি একটা সুযোগ এসেই গেছে, মালিকগিন্নিব অনুমোদনটুকু আদায় করতে না পারলে বেমক্কা হাবিয়ে যাবে তার গাঁয়েরই এক আবাগি মেয়ের বরাতজোর।

অন্যদিকে ললাটে ভ্রুকুঞ্চন জিইয়ে রাখতেই হয় কিরণময়ীকে। আবো ভাবতে হবে তাঁকে। এদিকে বাসুর-মা সকাল-বিকেল এসে ওর কোন্ এক বোনঝির জন্য উমেদারি করে যাচ্ছে রোজ। কাছাকাছি কোন্ এক উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকে। উনিশ-কুড়ি বয়সের আইবুড়ো মেয়ে। হাতের-কাজও নাকি ভালো। কিন্তু তিনি নিজেই ভেবেচিন্তে কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না কোনো কিছুর। এত বড় বাড়িতে সব কিছু আগলে তিনি একা থাকেন দুপুববেলা। সে-মেয়ে যদি খুব বেশি চালাকচতুব হয়? যদি হাতটান থাকে? শহুবের চালাক কাক আর গ্রামের নিরীহ ছোট্ট চড়ুই! সিদ্ধান্তের জন্য একবার কথা বলতে হবে স্বামীর সঙ্গে।

কথা দিলেন না মা-ঠাকরুণ। কিন্তু টবে টরে থাকে কালীধন। এদের ঘবে ঢুকে পড়ল কিনা নতুন কোনো দাসী। তাহলেই গেল, সব গেল। আবাগি মেয়েটার মরণবাঁচন। বেতনভুক নফর হিসেবে তাকে সর্বদাই দ্রবীভূত তরল রাখতে হয় মগজের যন্ত্রপাতি —বিনীত থাকার ভঙ্গি। জানতে হয় আদায়ের কৃৎকৌশল। মা-ঠাকরুণ নিজেই প্রস্তাবটা তুলেছেন যখন, এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে সে নারাজ। এই দুনিয়ায কারুর জন্য ভালো কিছু করার হিম্মৎ তার খুবই কম। মোটামুটি বছর চল্লিশেক একটানা

গাড়ি চালিয়ে ছোটখাটো কিছু অ্যাকসিডেন্ট তো অবশ্যই করতে হয়েছে। অল্পবিস্তর জখমও হয়েছেন কেউ কেউ। পুলিশ-কেসও গোটা কয়েক জুটেছে কপালে। বিভিন্ন সময়ে যখন যাঁর কাছে ছিলেন, সেসব মালিকরাই বাঁচিয়েছেন অথবা মিথ্যে সাক্ষী বানিয়ে নিজের রেহাই নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়েছে।

অনাদির কোনো পাপ ছিল না। এখনও চোখের পাতায় লেপটে আছে মানুষটা। দেশগাঁয়ে ফিরলে, দেখা হলেই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দাদা বলে ডাকত। সুখদুঃখের কথায় পরামর্শ চাইত। মান্যি করতে খুব। গাঁয়েরই একটা জুনিয়ার-হাই ইশকুলে ক্লাশ-ফোর-স্টাফের একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল কর্তাদের হাতে-পায়ে ধরে। মাইনে বড্ড কম। ছিটেফোঁটা বাড়তি আয় ছিল না। অথচ সংসারে তিনটে-চারটে পেট। কালীধনের ওপর খামোকা একটা ভরসা করত—শহরে মস্ত মস্ত সাহেববাবুদের গাড়ি চালায় বলে সাহেবদেব বলেকয়ে ভাইয়েরও একটা হিল্লে করে দেবেন দাদা। কলকাতা শহর কেমন শহর, কত বড় শহর, সেখানে তার দাদা কালীধনই বা কতটুকু, কোনো ধারণাই ছিল না মুখ্য লোকটার। কিন্তু আজ যদি কিছু করা যায়? নিদেন ওর মেয়েটার জন্যে! একটা খোরাকি কমে যায় অনাদির বউটার। মাসে মাসে বেশ কিছু টাকাও পাবে ঘরে বসে।

সুতরাং কালীধন হাল ছাড়ল না। লেগে রইল। সময়-সুযোগ পেলেই ওপরে এসে মা-ঠাকরুণের কাছে আর্জি। বুঝি নিজেরই মেয়ে। দুবেলা দুটো ভাতের নিশ্চয়তায় বেঁচে থাক হতভাগী।

অবশেষে একদিন গাড়িতে ওঠার আগে নিশীথরঞ্জনই বললেন হঠাৎ—‘কী হলো? তোমার গ্রামের কী-একটি মেয়ের কথা নাকি বলেছিলে মাকে? কই, ওর মা-র সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক করে নিয়ে এসো ওকে। যদি আসে তো ভালোই...’

কিরণময়ী ডাকলেন ওপরে— ‘সেই ভালো কালী, তুমি নিয়ে এসো। বড্ড বেশি বাচ্চা। তা হোক। বরং কাজটাজ শিখিয়ে গড়েপিটে নেওয়া যাবে। আমার মুনমুন-বুলবুলিরই বয়েসী। কাজকম্মো করবে, সমবয়েসী দিদিদের সঙ্গে খেলাটেলাও করবে। থাকবে ঘরের-মেয়ের মতো...’

রাধাসংবাদ

এই হয়। প্রাকৃতিকবিধান নিয়মের রাজত্ব হলেও হঠাৎ-হঠাৎ সংঘটিত তুলকালাম কাণ্ডকারখানার কার্যকারণ সম্পর্কগুলি যেমন বইপুঁথি ঘেঁটে পেতে হয়, সার্বিক দেশোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আপাত বিস্ময়ের ঘটনাবলী এভাবেই ঘটে থাকে। কয়েক সহস্র কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের কোন্ অগ্নি-নৈঋতের বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলো, বঙ্গদেশের গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবল বর্ষণ, নদীনালায় উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস। অথবা মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার উড়িয়ে কোথায় কোন্ আরব দুনিয়ায় মহাযুদ্ধ, কলকাতায় পুঁই ডাঁটার দাম বাড়ে। সুদূর কলকাতা শহরে রাজা হলেন কারা, রাজপ্রাসাদ গড়ে উঠল কাদেব, গরম ভাতেব ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সুঘ্রাণ গিয়ে আছড়ে পড়ল প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে হুগলি জেলার হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে বেলমুড়ি স্টেশনের নিকটবর্তী অখ্যাত কোন্ এক দাঁড়গাছি গ্রামের হা-ভাতের ঘরে।

প্রস্তাব নিয়ে যেদিন ওদের উঠোনে এসে দাঁড়াল কালীধন, এক হাত ঘোমটা টেনে মেটেঘরের দাওয়ায় চটের-বস্ত্র ছড়িয়ে উপবেশনের আসন সাজিয়ে দিলো অনাদি কুঁতির বিধবা বউ সুমতিবালা। গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে, বৃত্তান্ত শুনে এমন কোনো সুসমাচার তার পোড়াকপালে লেখা থাকতে পারে আদৌ, বিশ্বাস করতে না পেরে এবং প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে সুস্থির হবার পর আরো একবার খাড়াখাড়ি ভেঙে পড়ল জ্ঞাতিপড়শি ভাসুরঠাকুরের পায়ে। নয়নজলে বুক ভেসে যায়— 'এমনধারা না হলে কি আপনজন গ দাদা? আপুনের ভাই মরণকালে আপুনের নাম করে বলে গেছলেন- –বেপদআপদে বলবে দাদাকে। কলকাতা শ'রে কত বড় বড় সাহেবসুবোর সঙ্গে নিত্যি ওঠ-বোস্ দাদার! বিহিত এট্টা করে দেবেন। ফেলতে পারবেন নি আমার পালান আর রাধুমাকে...'

'সে-তো হল। কিন্তু তোমার ওই এটুকুন মেয়ে! ও পারবে ত গ বাবুদের বাড়ির সব কাজকাম করতে?' দাওয়ায় বসে বিড়ি ধরিয়েছে কালীধন। ললাটে দুর্ভাবনার ভাঁজ যতটুকু, বিড়ির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সুখের নিঃশ্বাস ততোধিক। পাডাপড়শিরাও এসে দাঁড়িয়েছিল দু-চারজন। সকলের দিকে তাকিয়ে বরং প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারই কিঞ্চিৎ—'বড্ড বড়-গলা করে বলে এয়েচি মা-ঠাকরুণকে—দেখেন নি ত গ মা ও-মেয়েকে। একা হাতে ও যা কাজ করবে, চোখে ভিরমি লেগে যাবে আপনেদেব...'

কাছেই ছিল রাধা। আদর করে ডেকে ওকে কোলে টেনে নিলেন কালীধন। সোহাগে গাল টিপে— 'কি লো, যাবি ত তুই? পারবি ত মাকে ছেড়ে থাকতে?'

বাঁহাতে ঘোমটা টেনে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল সুমতিবালা। শিউরে উঠল—'যাবে নি? অমন কথাটি বলবেন নি গ দাদা। এক বেলা করেও দু-মুঠো অন্ন জুটছে নি এখেনে। পেটে শুটকি মেরে মেরে হাড়মাসে এক হয়ে গেল শবীল। শ'রে যেয়ে বাবুদের থানে এট্টু ভালোমন্দ খাবে থাকবে....'

'অ্যাঁ, দেখবি কলকাত্তা শ'র। তোর বাপও দেখল নি জেবনে। তুই দেখবি। কত বড় বড় বাড়িঘর! সব দালানকোঠা। হেই উঁচু উঁচু বিশতলা পঁচিশতলা অব্দি আছে। ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে চাইবি ত মাথার খোঁপা খসে পড়বে র‍্যা তোর। বামুনঠাকুরের টিকি-লাগানো ট্রাম দেখবি রাস্তায়। কত যে গাড়ি ছুটছে পয়সাওলা বাবুদের....বাস-ট্যাকসি-লরি....পয়সা র‍্যা, কলকাতা পয়সার শ'র। মেয়েছেলে তুই, বাচ্চা মেয়ে। তোকে ত আর পয়সায় খাবে নি...' যেন হঠাৎ-ই এক জাদুকর হয়ে ওঠে কালীধন। গোল-গোল চোখে মাথা নেড়ে, দুহাতের পাঁতায় দশটা আঙুল খেলিয়ে নাড়ু দেখাবার ভঙ্গিতে অলৌকিক সেই নগরবর্ণন—'আর তুই যেখানে থাকবি, সে-ত রাজার-বাড়ি র‍্যা! পেল্লাই রাজপ্রাসাদ। ঘরে ঘরে কত কী যে ভেলকি ওঁদের—রেডিও টিভি......গান বাজাবার জন্যি, ঘরে শুয়েবসে নিত্যি বই দেখার জন্যি কত যে হরেক যন্ত্রপাতি, সে-আমি সবটা জানিও না ছাই। ওঁদের হেঁসেলও কী আজব জায়গা র‍্যা মা, সে-তুই নিজের চোখে না দেখলে বুঝতেই পারবি নি। ঘুঁটে নেই কাঠ নেই কয়লা নেই ধোঁয়া নেই—শুধু গ্যাস। গ্যাসের উনুনে চোখের পলকে কাঁড়িকাঁড়ি রান্নাবান্না। সেও কী একটু-আধটু? মাছমাংস ডিমকালিয়া-কোর্মাপোলাও পিঠেপায়েস কত রকমের কত যে সাহেবি খানাপিনা....'

কাছেই ছিল নকড়ি পাত্রর মেজমেয়ে বাতাসী। ঝলকে উঠল—'ওরে বাপস! এত এত রোজ-রোজ খায় গ রাজার-বাড়ির লোকেরা? রাজার পেটও কি বাখখুসের পেটের মতন গ জেঠু?'

মুখে আঁচল-চাপা খিলখিল হাসি পড়শি বউ-ঝিদের। খেপে গেল কালীধন। কিছুই মিছে বলছে না সে। কিন্তু ঘুঁটেগোবর-চটকানো পচা পচা গন্ধমাখা মেয়েগুলোকে বোঝাবে কী করে বড় বড় শহরের বড় ঘরের জেল্লা, শখসুখের চেকনাই? অবশেষে মুখ খিঁচিয়ে বিচ্ছিরিভাবে—'যা জানিস নে বুঝিস নে সবটাতে কথা বলিস কেনে বল্ দিকিন তোরা? অ্যাঁ! এ-কেমনধারা ব্যাভার? থালা ভরে ভাত চেপেচুপে ডাঁই করে সাজিয়ে নিয়ে সাহেবরা খাবেন কেনে তোদের মতন হাভাতেপনায়? বেড়াল ডিঙোতে পারে না তোদের ভাতের থালায়। আর তেনারা খাবেন একটু একটু, রসিয়ে রসিয়ে। হাত এঁটো হবে নি। চেয়ারটেবিলে বসে কাঁটাচামচে টুংটাং সুরেলা শব্দ তুলে পড়ালেখার গপপো করতে করতে হাসতে হাসতে খাওয়া। কিন্তু ঘর বোঝাই করে থাকবে ভালো ভালো সব খাবারদাবার। কোনো কিছুর অভাব নেই। মা-লক্ষ্মী অচলা তেনাদের ঘরে। কিছুই ত ফ্যালনা যাবে নি। ভয় কী! ফিরিজ জানিস? না, সে-তোরা দেখিস নি এখনও। আমাদের গাঁয়ে আঁষ বাড়িতে, হালদার আর মুখুজ্জেদের ঘরে টিভি কিনেছে শুনেছি। এখনও ফিরিজ আনে নি কেউ। ঠিক লোহার আলমারির মতোন। বরফের বাশকো। তিনদিন চারদিন ধরে রেখে দে রান্না-করা অন্নব্যঞ্জন। কিছু নষ্ট হবে নি। তাজ্জব, তাজ্জব ব্যাপার সব। পয়সা থাকলে কী না হয় র‍্যা মা! বাঘের দুধ কী বলছিস? জ্যান্ত মানুষের মুণ্ডুও ওরা রেখে দিতে পারে ওদের বরফের বাশকোয়....'

শেষ বাক্যে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে আস্তে আস্তে ভারি আর থিতিয়ে এসেছিল কালীধনের গলার স্বর। অতর্কিতে একটা ঝাঁকুনি।

'রাধু! আমাদের রাধু সেখেনে যাবে গ জেঠু?'

পড়শিঘরের সোমত্ত বয়সের মেয়েরা, পুকুরের জলে দানা ছড়ালে যেমন হয়, চারপাশ থেকে ছোট ছোট মাছেরা এসে ঠুকরে ঠুকরে খেতে চায়, একরত্তি বয়সের মেয়ে রাধার দিকে তাকিয়ে, যে-রাধা এখনও মেয়ে হয়েও ওঠেনি পুরোপুরি—নিতান্তই শিশু, শিশুর দিকে অপলকে একসঙ্গে দলা পাকিয়ে যেতে থাকে সবাই। মুহূর্তে বদলে গেছে চাউনিগুলি। ওটুকুন মেয়ে রাধু কিছুই না কবে, শুধু ঘরে বসে বসে একটা-কিছু, মস্ত কিছু হঠাৎ পেয়ে গেছে। আর সব মেয়েদের হেরে যাওয়া! হেরে-যাওয়ার একটা দুঃখু থাকে। দুঃখু থেকে রাগ হয়। ক্রোধের জ্বলুনিটা ঘুরে যায় বাঁদিকে, বুড়ো কালীধনের ওপব। গাঁয়ে থাকে না বুড়ো। বড্ড একচোখো। কেন? গাঁয়ে কি আর মেয়ে নেই কারুর ঘরে?

কিংবা চোখগুলি চিনে ফেলেছিল সুমতিবালা। দাওয়ায় কালীধনের গা লেপটে বসেছিল রাধা। ছুটে এসে হ্যাঁচকা টানে মেয়েকে নামিয়ে আনল নিচে। আচমকা টানে লাফিয়ে নামতে অথবা হাতেব হাড়গোড়ে লাগল বোধ হয়, রাধা ককিয়ে উঠল। সুমতিব হুঁশ নেই। নজব পড়তে পারে কারুব। বিষের চোখ দশজনের। মেয়েকে বাঁচাতে, নিজের সঙ্গে মেয়েকে সাপটে নিয়ে, ভাসুরের সামনে ঘোমটাও থাকে না ঠিকমতো, খেঁকিয়ে উঠল—'যা তোরা, যা দিকিন এখন এখেন থিক্যে। আমার ঘরে কী হচ্চে না হচ্চে তাতে তোদের কী লা মুখপুড়িরা। যা, যা তোরা। তোদেব ঘরে যেয়ে মব...'

কুচুটেপনাব গন্ধ ছিল। জটলা থেকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে তিনকালখেকো বুড়ি মঙ্গল ঘোষের মা এসে গিযেছিল কখন। দাঁত নেই, তোবড়ানো গাল। উঠোনের ওপাশ থেকেই হাঁক—'কী লা? হল কী তোদের?'

'বাধু গ। রাধু আমাদেব। শ'বে রাজার ঘরে যাচ্চে...'

'শ'বে যাচ্চে? কেনে লা? বে-থাব কতা হচ্চে বুঝি? তা ভালো...'

কলকলিয়ে উঠল মেয়েরা—'না গ, বে-থা পরে হবে। সোহাগী মেয়ে দুয়োরানীর ঘরে ছিল অ্যাদ্দিন। এখনে যাবে সুয়োবানীব ঘর। সেখেনে পাবে বাজপুত্তুর বব...'

মেয়েকে জাপটে ধরে আগুনের চোখে তাকিয়ে ছিল সুমতিবালা। দাঁতে দাঁত চেপে বাগ সইতে সইতে যখন তাব ফেটে পড়াব মুহূর্ত, দাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে নামল কালীধন। ধমকে উঠল—'বলচিস কী, করচিস কী তোবা? অ্যাঁ! দয়ামায়া, বলি এট্টা আক্কেল বলেও কিছু নেই ব্যা তোদেব? তবু যা হোক বাপদাদাবা দুবেলা দুটো অন্ন জুটিয়ে যাচ্চে তোদের! সময়মতো বে-থাও হবে। ঘরসংসাব করবি। আর এই বাপ-মবা আবাগি মেয়েটা? ছ্যা ছ্যা ছ্যা.. ইশকুলেও নাক গোঁজিস তোরা কেউ কেউ! এই...এই নিকি পড়ালেখাব ছিরি?'

ধমকেধামকে হাটিযে দেওযা যায ওদের। কিন্তু সুমতিবালাব উঠোনের বাইরেও স্বজনস্বজাতির ঘরে-ঘরে এজমালি উঠোন থাকে। সেখানে ঠোঁট বাজে, দাঁত ঝলকায়, কান সুড়সুড় করে। এক দুপুরেই কথাটা চাউর হয়ে গেল পাড়ায়—কলকাতা শহরে রাজার-বাড়ি যাচ্ছে অনাদি কুঁতিব বেটি রাধু। সোনার পালঙ্ক সেখানে। দিনভর রাতভর

বিজলি-পাখার হাওয়া। ঘি-দুধ মাছ-মাংসের রসে এবার গতর ফুলবে মেয়ের। ডাগরডোগর বাড়ন্ত হবে শরীর। কার ভাগ্যে কার ভোগ! বিধিই করেন উদ্যোগ।

যে-রকম ভাবা গিয়েছিল, ঘটনাটা সেভাবে খুব সহজ হলো না। নেহাত-ই শিশু, অনেকটাই হাঁস-মুর্গির মতো। মনে হয়েছিল, দুটো হাত ধবে, চাই-কি পাঁজাকোলে করেই তুলে নেওয়া যাবে। এবং তুলে নিয়ে যাবার সময় যখন এল, বোঝা গেল, বালিকার আচরণ যথারীতি মনুষ্যজাতীয় হলেও বৃক্ষের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য বেশি। বৃহৎ কাণ্ডে বা বলিষ্ঠ শাখাপ্রশাখার বিস্তারে সবল জোর না থাক, ক্ষীণাঙ্কুর গাঁদা দোপাটি নয়নতারা বা তুলসী-গাছের আদলে, যতই আলগা হোক, জলকাদার মাটিতে প্রোথিত তার পা।

সারাটা দিন অঝোর কান্নায় ভেসেছে রাধা। খায়নি দুপুরবেলা। পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে মায়ের নাগাল ছেড়ে। গোটা গাঁ-টাই তাব নিজের রাজত্বি। নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে তার গ্রামটুকু অনেক বড পৃথিবী। গাছপালা ঝোপজঙ্গল আছে বিস্তর, মাঠে মাঠে হারিয়ে যাওয়া যায়, পুকুবের জলে গলা ডুবিয়ে ঘাপটি মেবে পড়ে থাকতে পারে অনেক বেলা অব্দি, বনেজঙ্গলে গিয়ে উঁচু গাছের ডালে বসে থাকতে পারে। কাকপক্ষী টের পাবে না কেউ।

মেয়েকে খুঁজে পেতে, পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ঘুরে পাগল হয়ে উঠেছিল সুমতিবালা। গোটা দুপুরটা জ্বলছিল রোদের আগুনে। গাছপালার ডালে ডালে দৃশ্যমান নানান জাতের পাখির ছুটোছুটি। পাতার আড়ালে হরেক কিচিরমিচির। মায়ের বুকের হাহাকারে রাধা, অতি তুচ্ছ সেই মেয়ে, দুধেল গাইয়ের চেয়েও আরো বেশি মূল্যবান হয়ে উঠতে থাকে। দুপুরপোড়ানি সুয্যির আগুনে বর্ষণ ছিল। মায়ের বুক আকাশ নয়। ফোঁটা-ফোঁটা নয়নজলের হদিশ পায় না জগৎসংসার।

শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল ওকে। পালানই খবর নিয়ে এল। গ্রামেব প্রান্তে যেখানে ফুরিয়ে গেছে মানুষের ঘরবাড়ি অথবা যেখান থেকে লম্বা মাঠের শুরু, সেখানে ঘন গাছপালা বনবাদাড়ের ভেতর অনেক কালের পুরনো ভাঙা মন্দির। ঠাকুরদেবতার মূর্তি নেই, পুজোআচ্চা হয় না কখনও। সবাই জানে, লম্বা লম্বা বিষধর সব সাপেব আখড়া। অথচ সেখানেই সোনামণিকে চরানি দেবার অছিলায় সর্বনাশা ভাঙা মন্দিরের সিঁড়িতে একা চুপচাপ বসে আছে মেয়ে। সোনামণি ঘাস পায় না। নিজে আড়াল পায় রাধা। না, সে যাবে না। কোথাও যাবে না ঘর ছেড়ে।

কৈলা বাছুরকে ঘরে ফিরিয়ে আনার মতোই মেয়েকে টেনেহিঁচড়ে আনার শ্রমে সুমতিবালা হাঁফিয়ে উঠল। কিংবা সেই একই কান্না ছিল মায়ের বুকের পাথরে। পাথরটা গলতে থাকে—'এমনধারাই ত হয় র‍্যা মা। মেয়েমানুষের যে পরের ভাগ্যেই খাওয়া-পরা। এ-ত আর সেই সুখেব অন্ন নয়। যাবি, দু-চার-পাঁচ-দশদিন থাকবি। ভালো লাগে তোর, থেকে যাবি। নয়তো ফিরে আসবি তোর জেঠুর সনে। একদলা ভাত আর শুকনো চচ্চড়িতে যেমনটা চলছে আমাদের, চলবে তেমনি....'

পাড়াপড়শি যারা শুনেছে জেনেছে, পায়ে পায়ে এল কেউ কেউ। বেআক্কেল

মা-টাকে দাঁত ঝেড়ে শোনাল বেশ দু-চার কথা—'এত্ত তোর পয়সার নোভ লা রাধুর-মা? এক ফোঁটা দুধের বাচ্চা! ওকে তুই বিদেশবিভুঁয়ে পাঠাচ্চিস লা পয়সা কামাতি? কত ট্যাকা চাই লা তোর ভাতারখাকী মাগী? এখনে মেয়েটার পয়সায়......ছ্যা ছ্যা ছ্যা....'

কিন্তু অন্য পড়শিও ছিলেন দু-চারজন। তাঁদের অন্য হিশেব—'গরিব মানুষ মানুষ নয়—পক্ষী, পেটের দায়ে দুঃখী। মেয়েছেলে ত হলটা কী? কালীদার সনে যাচ্চে। সে-কি ভালোমন্দ না বুঝেই নিয়ে যাচ্ছেন গ অমন একজন পাকা-মাথাব লোক?'

কিংবা অপরাধী হয়ে ওঠে কালীধন বেবা নিজেই। কিন্তু হাতে সময় নেই একদম। সাহেবের কাছ থেকে শুধু এক বাত্তিরের ছুটি নিয়ে এসেছে সে। শনিবার সন্ধেবেলা সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই সোজা হাওড়া স্টেশন। রাত্তিরটুকু কাটিয়ে রবিবারই বিকেলে তাকে ফিরে যেতে হবে। দশজনের দশ কথা, মেয়েটার কান্নাকাটি বড় বিচ্ছিবি লাগছিল তাব। ডাকল সুমতিবালাকে—'তা'লে থাক গ বউমা। মেয়েটা যেতে চাইছে নি...'

ঘোমটার আড়াল থেকে কেঁপে উঠল সুমতি—'ও-কথা বলবেন নি। বলবেন নি গ দাদা। অ্যাদ্দিন বাদে মুখ তুলে তাইক্যেচেন ভগমান....'

সেদিন বিকেলেব আলোয দাওয়ায় বসে মেয়ের চুল বেঁধে দিলো সুমতিবালা। গোল কবে বেড়া-বিনুনি। তেল-চিটচিটে লাল-ফিতের ফুল মাথার ওপর। মোটামুটি ফর্সা একটা কাঁথা ছিল। হাতে-কাচা, কিছুটা ছেঁড়াফাটা দুটো ফ্রক আর একটা জাঙিয়ায় পুটলি বাঁধা হলো। দাঁতে দাঁত চেপে সন্তর্পণে চোখের কোলে বারবাব আঁচল মুছে যদিও-বা নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা সুমতির, গলাব-স্বরকে লুকোতে পারে না। কান্নায় কান্নায় হিক্কায় হিক্কায় অবশ হয়ে এসেছে মেয়ে। পালান, আরো বেশি শিশু, জানে না দিদি কোথায় যাচ্ছে। অবোধ চোখের চাউনিতে মুখভার।

অবশেষে প্রস্থানের সময় উপস্থিত হলো। আছাড়িবিছাড়ি কান্নায গোয়ালঘরের ঘুঁটেগোবরে সোনামণিকে জাপটে ধরে ভেঙে পড়ল সেই মেয়ে। বাপটা মরার আগে ঘরে একটা গাইগরু এনেছিল। বুড়ি বলেই ডাকত সবাই। বুড়ি যখন বিয়োল, আবো একটা গাইগরু—সাধ করে রাধা নিজেই নাম রেখেছিল—সোনামণি। সোনামণি তার পুতুলখেলায জ্যান্ত খেলনা। যেন তার নিজেরই সঙ্গে প্রায় সমান বয়েসে পাল্লা দিয়ে দুজনের বড় হয়ে ওঠা। শীতগ্রীষ্মবর্ষার বকমফেব নেই। সোনামণিকে নিয়েই তার সকালসন্ধে। গোযালঘর সাফ কববেন মা। সে চরানিতে যাবে, পোয়াল দেবে, পুকুবে নাইতে নামবে একসঙ্গে। মা যদি দুধ দুইবেন, গাঁয়ের ঘবে ঘরে সেই দুধ বিকোতে যাবে রাধা। নিজেদের পেট চলুক আব না-ই চলুক, গাইবাছুরের খোলটা খডটা চাই। কিংবা ওরাই দেবে অন্নের যোগান। দুধ বেচে, ঘুঁটে বেচেও দুটো পয়সা। খরচাপাতির অভাবে কতবাব ওদের ছেড়ে দিতে চেয়েছে সুমতিবালা। রাধা জাপটে ধবেছে। সে ছাডবে না। সোনামণিকে বাদ দিয়ে বাঁচবে না সে।

এবং সেদিন, সত্যি-সত্যি ছেড়ে যাবার লগ্নে, ঘুঁটেগোবরের কাদামাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে অবোলার গলকম্বল দুহাতে জাপটে নিয়ে মাথায় মাথায় সমান হয়ে যায় দুজন। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে চতুষ্পদ। বিকারহীন। মাঝে মাঝে লেজের ঝাপট গায়ে। লম্বা জিব

টেনে নাকের ফুটোয় নিকোনো। চোয়াল দুটোয় মৃদু ওঠা-নামা—জাবর কাটার আয়েসী ঢং। ওর ড্যালাড্যালা চোখের বোবা চাউনিতে জল দেখল রাধা। কিংবা তার নিজেরই সজল চোখের বিভ্রম। দুজোড়া চোখ, দুজনেরই চেনা—কিছু একটা বলতে চায় নিজেদের বোবা ভাষায়। সোনামণির গায়ে হাত ঘষে রাধা। ঝাঁপিয়ে উঠে পুষ্যির পিঠে মাথা রেখে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে আদর বুলোয় গলকম্বলে পেটে শিরদাঁড়ায়। বুকের হাহুতাশে তাকাল মা-ভাইয়ের দিকে—'ওদেবকে দেখবে গ তোমরা। কত যত্নআত্তি করতুম গ আমি। ওদের জন্যি কত কত দিন ভাতের-ফ্যানা চেয়েচিন্তে এনেচি এঘর-ওঘর থিক্যে। অসুখবিসুখ করেচে ত গরুর ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেছি ছুঁচ ফুটুতে। শারবন-ভাদ্দর মাসে ফের বাচ্চা বিয়োবে বুড়ি। সোনামণি আরো বড় হবে। আমায় যেমনধারা বিদেয় করলে, ওদেরকে ছেড়ে দিয়ো নি গ মা...'

কিংবা রাধা নিজেই সেদিন সোনামণি হয়ে গিয়েছিল। দুধ দুইবার সময় বাছুরকে যেভাবে টেনে ধরে রাখতে হয় তার মায়ের নাগালের বাইরে, একই ভাবে মাতৃস্তন থেকে শিশুকে ছিঁড়ে নেবার নির্মমতায় একটা যুদ্ধ বেধে যায় মায়ে আব ঝিয়ে। দেশগাঁযের মাটি আঁকড়ে ধরে বাখতে চায় যাকে, আজন্ম লালনের ঘর থেকে উপড়ে তুলে তাকেই দূরের বাস-বাস্তার দিকে টেনে নিয়ে যাবার শ্রমে সুমতিবালা প্রাণান্ত হয়ে ওঠে। অথচ সেখানেই অপেক্ষা করছেন কালীধন বেরা। সময়মতো পৌঁছোতে না পারলে হয়তো বুড়ো চলে যাবে একা।

মেয়েকে বাসে তুলে দিতে ফিডার রোড অব্দি এল সুমতিবালা। সঙ্গে পালান। চারপাশের চেনাজানা গাছপালা দোল খেলো না কোথাও। মস্ত আকাশ ভেঙে পড়ল না মাথার ওপর। এত বড় গাঁযেব কতটুকুই-বা ঘটনা? এভাবে সব মেয়েকেই একদিন পব হয়ে যেতে হয় অন্যেব ঘরে। পেটের টানেও যায কেউ কেউ। রাধা অন্নেব ঘরে যায়।

তখনও সূর্যাস্তের বং ধরে নি আকাশে। গাছগাছালির ডালে ডালে, ইলেকট্রিকেব তারে পাখিদেব ছটফট ওডাউড়ি, হরেক পাখির ডাক। শেষ বিকেলের রঙে ঘরদোর গাছপালা মানুষজনের দীর্ঘ ছায়া।

চুঁচুড়া থেকে মগরা ঘুরে অনেক গ্রামগঞ্জ ডিঙিয়ে বাস এসে দাঁড়াল ফিডাব রোডেব মোড়ে পাকুড় গাছের ধারে। বুঝি-বা কোন্ বাজরাজড়ার দেশ থেকে রথ এসেছে তাব জন্য। কালীজেঠুই টেনে তুললেন। দেশগাঁয়ের মাটি ছেড়ে সেই প্রথম দুটো পা তুলল রাধা। রাধা বাজাব-বাড়ি যায়।

ইস্টিশনের নাম—বেলমুড়ি। যে-নাম মুখে আনতে নেই, কানে শুনতে নেই। ভাত জুটবে না কপালে। হয়তো সেজন্যেই, ভাতেব জন্যেই দীর্ঘযাত্রা সে-মেয়ের।

কবে কোন্ বাপঠাকুদ্দার আমলে কোথায় কী কাণ্ড ঘটেছিল, জানে না কেউ। বংশপরম্পরায় বিধিনিষেধের লোকাচার—সাত পুরুষের ভিটেয় দাঁড়িয়ে গাঁয়ের মানুষ কবুল করতে পারবে না তাদের নিজেদের দেশের নাম। তাঁতশিল্পের জন্য অনতিদূরের

ধনিয়াখালি জগদ্বিখ্যাত। ভাণ্ডারহাটিকেও জানে অনেকেই। কিন্তু এ-দুনিয়ায় কে চিনবে চ্যাঁচড়াগড় ধলা মাকালপুর হাঁসনান পুঁইনান হাঁড়াল কোটপুর সংসারা রাধাবল্লভপুর মানিকপুর দাঁড়গাছি গোবরআড়া জোথাবাং কানাজুলি—ব্রাত্য নাম, ব্রাত্য গ্রামগুলি। ভূগোলে নাম থাকে না যাদের। সেক্ষেত্রে সংলগ্ন রেলস্টেশনই একমাত্র স্বদেশ-পরিচয় হতে পারে স্থানীয় ব্যক্তিদের। যদি সত্যিকারেব সেই নামও লোকসংস্কাবে নিষিদ্ধ উচ্চারণ, 'মাঝের-গ্রাম' নামের মিথ্যেটাই বিকল্পে সত্যি হয়ে উঠতে থাকে। নিজের দেশের মাটি অন্য নামে ভিন্ন দেশ হয়ে দাঁড়ায়। বেলমুড়ির মানুষ মেঝের-গ্রামে বাঁচে। হাবায় স্বদেশ।

স্বদেশশূন্যতাব অপয়া মাটি বেলমুড়ি স্টেশনেব প্ল্যাটফর্ম থেকেই জীবনের প্রথম বেলগাড়িতে চাপল বাধা। জানে না বালিকা—পৃথিবীর দিকে তাব পা।

জীবনের প্রথম বেলগাড়ি! ছুটছে অথবা উড়ে উড়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝে উঠতে না পেবে তাব নববিস্ময়ের ডাগর দুটি চোখ দুরন্ত গতির সঙ্গে পাল্লায় এপাশে-ওপাশে দুষ্টু প্রজাপতির মতো খেলে বেড়াতে চায়। কিন্তু সাহস হয না নডবাব। কালীজেঠুব পাশে লেপটে বসে থাকে জানালার ধাব ঘেঁষে। বেলগাডিব কামরাও পাকাবাডিব দালানকোঠার মতো। ঘরটা দুলছিল। সেখানে প্রতিটি আসনে ঠাসাঠাসি অচেনা মানুষেব ভিড। গাঁযের বাসেব-মেলা বথেব-মেলার বাইরে এত মানুষ বাধা দেখে নি কোনো কালে। বিজলী বাতিব চড়া আলোয ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা প্রতিটি মানুষেব মুখের দিকে তাকিযে তার ছোট্ট বুকের ভেতর কেমন খামচানি ধরছিল। কালীজেঠুর পাশে জানালাব ধার ঘেঁষে আরো বেশি সিঁধিযে যাচ্ছিল গর্তের মধ্যে। এত এত মানুষেব সঙ্গে কোথায যাচ্ছে সে, কতদূর, কোথায বাজাব-বাড়ি—কিছুই জানা নাই। মাকে মনে পড়ছিল; পালানকে, সোনামণিকে। যে-বযস কান্নার, সেখানেও কাঁদতে মানা। কালীজেঠুকে ভয়। ভয়—এটুকুন বযসে এমন কবে একা-একা আলাদা হয়ে যাওয়াব। ভয—নানা ধরনেব এত অসংখ্য অচেনা মানুষজনের জটলাকে। কিংবা ফোঁপানিটা থাকে। বুকেব ভেতর যন্ত্রণা। ঘাড় ফিরিয়ে বাঁদিকে চোখ ফেলতেই তাব চেনা জগতের ছবি, যত ছুটছে গাড়ি, পবতে পবতে পলকে পলকে প্রতি মুহূর্তে তাব আকাশ-মাঠের আপন পৃথিবীটা লম্বা থেকে আবো লম্বা হতে থাকে। সাঁঝেব বেলার আলো-আঁধারিতে আবছা হতে হতে ঘন আঁধারে ডুবে যাচ্ছে চারদিক। কত যে ইস্টিশনে থামছে গাড়ি! কত আলো, ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে বাচ্চাবুড়ো কত যে মানুষ। হাজারগণ্ডা সওদা নিয়ে কত যে লোক উঠছে গাড়িতে! হল্লা তুলে দর হাঁকছে, ভিড় ঠেলে ঘুরছে এ-মাথা ও-মাথা, বেচাকেনা সেরে নেমেও যাচ্ছে—গবম চা শোনপাপড়ি চানাচুব পড়ার-বই কলা-কমলালেবু গামছা সেফটিপিন সূচ মাথাব-চিরুনি......বাধা তাব হাঁলুম-মারা চোখে গেলে চারপাশ। গিলতে থাকে। বেলগাডিও কি বিকিকিনির হাট? দুটো লজেন্স কিনে দিলেন কালীজেঠু। অনেক বলা-কওয়াব পর একটা মুখে পুবল সে। কিন্তু অমন সুস্বাদু জিনিস গালে ফেলে চুষতেও পাবে না। আরেকটা হাতে নিয়ে থ মেরে যায। পালান! ছোট ভাই তাব। পালানকে সে দেবে না একটা?

কড়ে-আঙুলের মাপে একরত্তি মুখ্যু মেয়ে। তার হাতপা পেটবুক বা মুখের হাঁ-টুকুর মতো চোখজোড়াও বড্ড খুদে খুদে। করবে কী বেচারি, যদি এক বেলাতেই এমন চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্রের মহাকাশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে মাথার ওপর!

যেখানে পৌঁছে একেবারেই থমকে দাঁড়াল রেলগাড়ি, প্রথম দিকে ঝামেলাটা ঠিকমত বুঝতে পারে নি রাধা। ভিড়ের মধ্যে দলা পাকিয়ে সব লোক নেমে যাচ্ছে গাড়ি ছেড়ে। একই দরজায় বাইরে থেকে ঢুকে পড়তে চাইছে আরো আরো বেশি লোক। হুড়োহুড়ি গুঁতোগুঁতি হল্লার তাণ্ডবে মানুষে-মানুষে কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ? পেটমোটা একটা র‍্যাশনব্যাগ কালীজেঠুর নিজেরই ছিল। বাঁ-বগলে রাধার পোঁটলাটা। এরই মধ্যে ডান হাতে রাধাকে টেনে নিয়ে গুঁজে দিচ্ছেন ভিড়ের মধ্যে—'কচ্চিস কী তুই? চ' চ' পা চালিয়ে ছুটে চ'। এখনও বাসে চেপে যেতে হবে কদ্দুব। তোকে সেই লেকটাউনে বাবুদের বাড়ি রেখে আমাকে ফের ফিরতে হবে আহিরিটোলা......'

কিন্তু এগোবে কী? পা ফেলতে পারে না রাধা। শহরের মাটিতে পা ফেলার আগেই মানুষের সঙ্গে তার যুদ্ধ। চারপাশের ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা মানুষজনের কোমব ছুঁয়ে পেট ছুঁয়ে তার মাথা। মা-মাসিদের মতো মেয়েছেলেরাও রয়েছেন অনেকেই। তার বয়সী বাচ্চারাও রেয়াত করছে না কেউ কাউকে। এবং সেই রণক্ষেত্রে জটলার ভেতর ঠেসে গিয়ে গুটিসুটি মেরে চেপ্টে যেতে যেতে কিছুই করার থাকে না তার। জনস্রোতই যেন ঠেলে বের করে দিচ্ছে কোথাও, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে যন্ত্রণা সইতে হয়। হাঁপায়। প্রাণান্ত হয়ে মরে যেতেও পারে সে এখন। কিন্তু মরে যায় না। মুখপোড়া দস্যি মানুষগুলো কোথায় কীভাবে গুলতির মতো ছুঁড়ে মারল তাকে, প্রথম ধাক্কায় কোনো হদিশ না পেয়ে, নিজেকে সামলে হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই ভিরমি লাগল। দিন ফুরলেও সুয্যি ডোবে না যে-দেশে, সেখানে পা ফেলে প্রথম পলকেই আগুনে আগুনে চোখজোড়া ঝলসে যাবাব পর, নিতান্তই শিশু, রাধা সইতে পারে না একসঙ্গে এত তাজ্জব! মানুষের সমুদ্দুর আলোর সমুদ্দুর হল্লাচিৎকারেব সমুদ্দুরে যখন তাব কানে তালা এঁটে যাচ্ছে, ভোজবাজির দুনিয়ায় তার একজোড়া অবোধ চোখে কান্না বা ভয়। কিংবা সবটাই মিলিয়ে-ঝুলিয়ে এই মুহূর্তে ভুলে যায় সদ্য-হারানো মা ভাই সোনামণি বা তার নিজের গাঁয়ের কথা। অনেক জরুরি তার নিজেব বাঁচা, নিজেকে টিকিয়ে রাখা। এ-কোথায় এসেছে সে? ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার। কোথায় কালীজেঠু? তার হারিযে যাবার ভয়।

ভারি র‍্যাশনব্যাগ আর বোঁচকাবুঁচকি দু'হাতে সামলে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে কালীধন নিজেও গলদঘর্ম। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে এক লহমায় যেভাবে কেঁপে উঠেছিলেন, হঠাৎ খুঁজে পেয়ে, ঘেমো গায়ে বাতাস লাগার মতোই, কিছুটা স্বস্তিতে—'এ-ত আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লুম র‍্যা তোকে নিয়ে। হাঁ হয়ে দেখছিস কী অত? ইস্টিশন র‍্যা, হাওড়া ইস্টিশন এটা। কলকাতা যাচ্চিস, আরো কত-কতবার তোকে আসতে-যেতে হবে এখেন দিয়ে। এখন চ', চ' দিকিন, তাড়াতাড়ি চ'। পা চালা......'

ইস্টিশন? ইস্টিশন এত বড়? এখানে পুব-পশ্চিম নেই? উত্তর-দক্ষিণ? সুয্যি ওঠে না এদেশে? সুয্যি ডোবে না? আঁধার নেই কেন? হাজার হাজার বিজলী বাতি বিজলী পাখা আর মানুষ আর চিৎকার। ছোট্ট রাধা হদিশ পায় না—আস্ত একটা রেলগাড়ি ঢুকে পড়েছে মস্ত লম্বা ঘরের ভেতর? কত উঁচু, কী বিশাল হতে পারে সেই ঘর? মাথা তুলে তাকায়। ছাদের হদিশ খোঁজে। কালীজেঠুর হ্যাঁচকা টান। তাকে ছুটতে হয়। কত রঙের কত হরেক মানুষের জটলায় ফাঁকফোকর খুঁজে কালীজেঠুর পায়ে পায়ে হাঁটতে চেয়ে বারবার হোঁচট, গায়ে গায়ে ধাক্কা। একে শহর বলে? শহরে মরণ মানুষের। একটা কাক মরলে দেশগাঁয়ের দুপুর কাঁপিয়ে হাজার কাকেব চিল্লানি যেমন, শহরের মানুষ অনেক বেশি......অনেক বেশি মড়াখেকো। এখানে থাকবে না সে। কিছুতেই না। ফিরে যাবে মায়ের কাছে।

প্রথম পলকেই ভ্রূ কুঁচকেছিলেন কিরণময়ী—'এ-তুমি কাকে নিয়ে এসেছ কালী? এটুকুন পুঁচকে মেয়ে কী করবে আমার?'

যে-উৎসাহে এত লাফঝাঁপ কবে মেয়েটিকে নিয়ে আসা, মা-ঠাকরুণের কাছে এসে দাঁড়াবার পর কালীধনও মুষড়ে পড়েছে অনেকটা—'কিন্তু আপনিই বলেছিলেন গ মা। ওকে নিয়ে আসতে......'

'সে-তো বলেছিলাম। কিন্তু......' সংশয়ের ভ্রূকুটিতে মেয়েটির দিকে আরো একবার তাকালেন কিবণময়ী। পায়ে জুতোফুতো, নিদেন একটা সস্তাব চটিও বেচারিকে কিনে দেয় নি কেউ। ছেঁড়াফাটা কালকিষ্টি পুরনো রঙচটা একটা ফ্রক। এমনিতেই কালো। কতকাল যে সাবানটাবান পড়ে নি গায়ে। গায়েব চামড়ায় পুরু করে নোংবা পলেস্তারা। আস্তে বললেন—'কী নাম তোর?'

শুনল না রাধা। বাসেটাসে চেপে কোথা দিয়ে কীভাবে হাজার কাণ্ড করে এখানে পৌঁছোল সে, মগজের ঘোর কাটেনি তখনও। কিংবা তার খুদে খুদে চোখদুটো পলক ফেলাব ফুরসত পাচ্ছে না। রাজাব বাড়ি? হাতিশালে হাতি কোথায়? ঘোড়াশালে ঘোড়া? পাইকববকন্দাজসেপাইসান্ত্রীরা সবাই? বানীমাকেও দেখে কেমন মানুষ-মানুষ মনে হচ্ছিল তার। ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে। মস্ত বড় বাড়িটা রাজার-বাড়ি নয়, ববং একটা ঠাকুবদালান বা মন্দির-মন্দিব লাগছিল চোখে।

'কী গো কালী, ও তো শুনছেই না কিছু। কালাকালা নয় তো তোমাদের মেয়ে।'

'না গ মা, বড্ড হাঁ-কবা মেয়ে। আসার সময় বাস্তায় এমন করেচে, দু-ধাবে যা দেখে তাতেই থেমে থেমে যায়...' ঘাড় ফিরিয়ে তিবিক্ষি মেজাজে দাবড়ে উঠল কালীধন—'অ্যাই, অ্যাই তুই কী কবচিস। মা-ঠাকরুণ কী বলচেন তোকে?'

নাড়া খেল বাধা। ভ্যাবাচাকা তাকিয়ে থাকে। মুখে বাক্যি সবে না। এগোতেও ভয়। নকশা-কাটা কাঁথাব মতো এত পিচ্ছল পায়ের তলায় পাথরের মেঝে! যদি হড়কে যায় পা!

'কী হল।' আবার ঝাঁঝাল কালীধন—'বল্, নাম বল্ তোর।'

'রাধা......' ছোট্ট মেয়ে তাব হাতপাবুকপেটেব সমস্ত কুঞ্চন থেকে নিজেকে চাগিয়ে

তুলে অস্ফুট উচ্চারণ করল শব্দটা।

ভ্রূ কুঁচকোলেন কিরণময়ী—'কী? কী নাম বললি?'

'রাধা গ মা......' অবশেষে কালীধনকেই হাল ধরতে হয়—'রাধু বলেই ডাকে সবাই।'

'রাধা'? রাধা কী?'

'কুঁতি।'

'কী? কী বললি? পুঁতি?'

'না গ মা, কুঁতি......' নিজেরও ভ্রূকুঞ্চনে 'কুঁতি' শব্দটুকুর ওপর উচ্চারণে জোর রাখল কালীধন—'বাপঠাকুদ্দা থেকে সেই-ই ত জানি আমরা।'

'কুঁতি? রাধা কুঁতি? বাপের জন্মে শুনিনি বাপু ওসব নাম। কত যে অদ্ভুত-অদ্ভুত টাইটেল থাকে তোমাদের গ্রামের লোকদের। সে-যাক গে......' কিবণময়ী রাধার দিকে তাকালেন—'এই মেয়ে, মাকে ছেড়ে যে চলে এলি হুট করে, কী করবি? কাজটাজ জানিস কিছু?'

কী করবে, কী বলবে রাধা? সামনেই কালীজেঠু। ভ্যাবাচাকায় ঘাড কাত কবে অনেকটাই বেঁকে গেল বাঁদিকে। সে অনেক কাজ জানে।

'কী জানিস? কী কী করতে পাববি তুই?'

রাধা আবার ঝঞ্ঝাটে। কথা ফুটছে না মুখে। কিন্তু বলা দরকার, সত্যি সত্যি সে অনেক কাজ জানে—ধান ঝাড়তে, ধান সারতে, মুড়ি ভাজতে, চিঁড়ে কুটতে, পুকুরধারে শাক তুলতে, গাইবাছুরকে চরানি দিতে, জাব দিতে......কিন্তু সেসব বলবে কী করে সে এক্ষুনি? সাতমহলা রাজার-বাড়িতে কত কত ধান এঁদের? কটা পালুই কতগুলো মরাই, গোয়ালে কত গাই বলদ—কিছুই জানা নেই।

কিংবা ওটুকুন বাচ্চা মেয়ের মুখের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে না কেউ। কিরণময়ী ব্যস্ত হলেন— 'এত রাত্তিরে ওকে নিয়ে এলে কালী! এখন ওকে নিয়ে তুমিই বা যাবে কোথায়! তাহলে এখানেই থাক কটা দিন। দেখা যাক...'

বুঝি মস্ত এক ঝামেলা থেকে রেহাই পেল কালীধন। .গা ঝাড়া দিয়ে, খুশিতে — 'না গ মা, যা ভাবছেন তা নয়। এটুকুন দেখলে কী হবে, দেখবেন—পারবে। ঠিক পারবে।'

'আচ্ছা, সে-দেখা যাবে।' খাটের ধার ঘেঁষে কিরণময়ী বসেছিলেন রাজবাজেশ্বরী ভঙ্গিমায়। উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন রাধার দিকে— 'কিরে, জামাপ্যান্ট সঙ্গে এনেছিস কিছু?'

'হ্যাঁ গ মা, ওর মা বেঁধেছেঁদে দিয়েছে যা ছিল...' তড়িঘড়ি ব্যস্ততায় কালীধন, নিজের ব্যাশনব্যাগের সঙ্গে দেয়ালে ঠেস দেওয়া ছিল যে-কাঁথার পুঁটলিটা, তুলে নিয়ে এল।

'ধ্যাৎ ছাড়ো ছাড়ো। ফেলে দাও...' ঘরের অন্য প্রান্তে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন কিরণময়ী। থেমে গেলেন। চোখমুখ কুঁচকে মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে— 'বাগ করো না বাপু। ও-ছাই কী বিচ্ছিরি নোংরা আর গন্ধ তোমাদের কাঁথাকাথায়। কিলবিল কিলবিল

করে গুচ্ছের ছারপোকা ঢুকে পড়বে আমার ঘরে। শেষে আমি মরি আর-কি। তার চেয়ে ও-ছাই তুমিই নিয়ে যাও। রান্নাঘরে পুষ্পর-মার সঙ্গে শোবে কটা দিন। তারপর দেখা যাক, কী হয়। এ-তো দেখছি মুনমুনের মতোই হবে বয়সে। নয়তো বুলবুলির চাইতে খানিকটা বড়। না-হয় ওদেরই পুরনো জামাটামা বের করে দেব একটা-দুটো...'

'হ্যাঁ মা, সে-আপনি করবেন, যা ভালো বুঝবেন। আমি আর কী বলব?'

'আর শোনো...'

গুটি গুটি ফিরে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছিল কালীধন। ফিরে তাকাল।

'ওকে তো রেখে যাচ্ছো একা। শেষে রাতদুপুরে ম্যা-ম্যা করে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে না তো? সে-আরেক অশান্তি। তখন অত বাত্তিরে কোথায় পাব তোমাকে ?'

'না মা, সব ত বলেকয়েই এনেচি। এ-খুব শক্ত মেয়ে। সব বোঝে...' রাধার দিকে এগিয়ে কাঁধে-পিঠে হাত রেখে একটু ঝুঁকে পড়ল কালীধন। যথার্থই পিতার ভূমিকায়, অপত্য মমতায়—'কি রে, শুনলি ত! কোনো ভয় নেই তোর। কাল সকালেই ফের চলে আসব আমি। মায়ের কথামতো চলবি, কাজ করবি। জানিস নে মাকে। আমি ত দেখচি এত বছর ধরে। সাক্ষাৎ ভগবতী মা-ঠাকরুণ...'

ঘরের কোণে শ্বেতপাথরের ছোট টেবিলে পান সাজানো থাকে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের সুন্দর রেকাবিতে। নতুন পান মুখে পুরলেন কিরণময়ী। এবং জর্দা। ফুরফুরে পাখার বাতাসে ঘর ভরে বড় মিষ্টি অথচ চাপা সুঘ্রাণ।

ভীরু খরগোশের গুটিসুটিতে বুকের নিঝুমে তাকিয়ে ছিল রাধা। কালীজেঠুর চোখের ইশারায় গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে, পিঠ বাঁকিয়ে গড় হয়ে পেন্নাম রাখল ভগবতী মায়ের চরণে।

পান চিবুতে চিবুতে প্রসন্নতায় মৃদু হাসলেন করুণাময়ী।

মাত্র ন-বছরে রাধা বিদেশবিভুঁইয়ে রাজার-বাড়িতে সেই প্রথম নির্বাসিত হলো। দুপুর গড়িয়ে বারবেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে রেলগাড়ি চেপে এক সন্ধেয় এমন করে সগ্‌গে পৌঁছে যাওয়া যায়? ছোট্ট মগজটুকুতে একটা মস্ত ধাঁধা ঘোরপ্যাঁচে জড়িয়ে গিয়ে এমন তালগোলে ফেলে দিয়েছে তাকে, কালীজেঠু চলে যাবার পর বোকাহাবা মেয়ে একা একা আরো বেশি অনাথ অসহায়। এখনও জানে না, কত প্রকাণ্ড রাজার-বাড়ি! কত কত ঘর এঁদের? চারপাশে কত বাহার, ঘরের ভেতরে-বাইরে খাটপালঙ্কচেয়ারটেবিলআলমারি কত রকমারি আসবাব যন্ত্রপাতি! ঝকঝকে তকতকে সবই নতুন। কী যে হয় এত জিনিসপত্তরে, কোন্‌টা কোন্ কাজে লাগে—অপার রহস্যের গোলকধাঁধায় দিশেহারা সেই মেয়ে চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোয় রানীমার পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে মাথা তুলতে পারে না কোথাও। শুধু অবাক...অবাক কাণ্ড সব। তাদের গাঁয়ে লক্ষ্মীদির বুড়ি ঠাকুমাকে মেটেঘরের দাওয়ায় পুরোনো ছেঁড়া ধুতি শাড়ি ছড়িয়ে, চার কোণে জল-ভরা ঘটি নয়তো ইট পেতে টানটান রেখে, শাড়ির-পাড়-তোলা রঙিন সুতোয় প্রমাণ সাইজ বড় বড় কাঁথা সেলাই করতে দেখেছে সে। হরেক রঙের কত বাহারের সব নকশা। এখানেও

রাজার বাড়িতে যেখানেই পা পড়ছে, পাথরের মেঝেয় সুন্দর সুন্দর চিত্তির! রানীমার চোখের আড়ালে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে ঘষে ঘষেও দেখল একবার— সুতে নড়ে না। শক্ত পাথর-পাথর লাগে! পাথরের কাঁথা হয়? লক্ষ্মীপুজোর দিন নয়তো বিয়েবাড়িতে কি ব্রতপাব্বনের দিনে বাবুদের বাড়ি-বাড়ি চালবাটা জলে আঁকা মা-মাসিদের আলপনাগুলো যেমন জলে জলে ভেসে যায়, জলন্যাকড়ায় নিকোলেও ধুয়েমুছে যাবে না নকশাগুলো? একজোড়া চোখের পাতায় এত সব তাক-লাগানো কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে দিশেহারা রাধা গুটিসুটি মেরে নিজের মধ্যে সিঁধিয়ে যেতে থাকে। কিংবা তার চোখ দুটো স্বপ্ন দেখার উপযোগী একটা ভূগোল পেয়ে যায়। চোখ বুজে থাকলেও আঁধার হবে না সবটা।

এদিকে ঘুবে ওদিকে বাঁক নিয়ে যেখানে এসে পৌঁছোলেন রানীমা, এক পলকে রাধাও বুঝে নিতে পারে—রান্নাঘর। রান্নাঘরও এত বড়, গোছগাছে এত সুন্দর হতে পারে— নতুন হেঁয়ালিতে তার বোবা চোখজোড়া ইতিউতি চারদিকে প্রজাপতির মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এটা-ওটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। দেয়ালে দেয়ালে খাঁজ-কাটা তাকে, ঝকঝকে কাঠের আলমারিতে কত যে রকমফের বাসনকোসন শিশিবোতল কৌটোকাটার বাহার, ঠিক দোকানঘর যেমন। ঘরের ভেতর একজন বয়স্ক মানুষের কোমর অব্দি নয়তো তার বয়সী বাচ্চা মেয়ের মাথার মাপে আধাআধি পাঁচিল তুলে আরেকটা ঘর ওপাশে। ওঘরে কী হয়? এগিয়ে গিয়ে দেখার ইচ্ছে হলো। সাহস হয় না পা বাড়াবার। রান্নাবান্নার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ। শব্দটা কোত্থেকে আসছে? উনুন কোথায় এঁদের? উনুনই যদি থাকবে, দেয়ালে-ছাদে কালিঝুলি নেই কেন?

ঘরে ঢুকেই দুধের রঙে ধবধবে শাদা একটা লোহার আলমারি খুললেন রানীমা। দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাধা। অবাক চোখে দেখল, ওঁদের আলমারির ভেতরও বিজলীবাতি। খাঁচায় খাঁচায় নানা ধরনের সব খাবারদাবার! খানিকটা নিচু হয়ে রানীমা কী খুঁজছেন সেখানে। বড়সড় একটা সন্দেশ, চার টুকরো পাঁউরুটি বের করে হাত বাড়ালেন রাধার দিকে— 'নে ধর...'

ভক্তিভরে দু'হাতের আঁজলায় ভালোবাসা বা আদর গ্রহণ করল রাধা। বড্ড খিদে পেয়েছে তার। পেটটা কামড়াচ্ছে। এত ঠাণ্ডা কেন সব? মনে হয়, বুঝি বরফ আছে পাঁউরুটি-সন্দেশের ভেতর!

আরো একটু সোহাগ পড়ল তার হাতে। আলমারির ডালা বন্ধ করেই ওপাশে হাত বাড়ালেন রানীমা। ঝুড়িভর্তি আনাজপাতির সঙ্গে গোছ-গোছ কলা। রাধাকে ছিঁড়ে দিলেন দুটো— 'কলার খোসাটা যেখানে সেখানে ফেলবি না যেন। পুষ্পর-মাকে বলবি। কোথায় ফেলতে হবে, দেখিয়ে দেবে।'

কিন্তু কে পুষ্পর-মা? কাকে বলবে সে?

আর ফিরে তাকাচ্ছেন না রাধার দিকে। সত্যি সত্যি রাজারানী। আধাআধি পাঁচিলের ওধারে ঢুকে পড়লেন — 'কী চাপিয়েছ? স্টু? ঠিক আছে। চিকেনটা সেদ্ধ হলে ডাকবে আমাকে। ওপাশে কী বসিয়েছ?'

পাঁচিলের আড়ালে আছেন কেউ একজন। রাধা হাঁ হয়ে শোনে। মেয়েছেলের গলা—'মাছের ঝোলটা গরম করতে কইলেন তখন।'

'স্যালাডের বিটগাজরগুলো সেদ্ধ করেছ? শসা পেঁয়াজ কুঁচিয়েছ? আঃ, কী যে করো তোমরা, বুঝি না। খাবাবদাবারের জিনিস এভাবে খোলা রাখতে কতবার বারণ করেছি তোমাদের। একবার বললে কোনো কথাই শুনবে না তোমরা...' রানীমা নিজেই ছুটে গিয়ে কী সব ঢাকা-চাপা দিয়ে ফিরে তাকালেন—'দাদাবাবু দিদিমণিদের জন্যে লুচি হবে। সাহেবের জন্যে পাঁউরুটি সেঁকতে হবে। সে-হবে খন...পরে, খাবার আগে। মাছের ঝোলটা নামিয়ে ময়দাটা মেখে রাখবে। হ্যাঁ শোনো...'

ঘবের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন রানীমা। হঠাৎ রাধার দিকে— 'এই শোন। কী যেন নাম বললি তোর? রাধা? আয়, শোন্ এদিকে...'

বুকের ভেতর পাঁজরা কাঁপিয়ে একটা ঝাঁকুনি হঠাৎ। ঝমঝমিয়ে উঠল রাধা। এখন? এবার সে কী করবে? ফ্রকের তলায় হাঁটু ঢেকে পোষা বেড়ালের মতো এক কোণে দেয়াল ঠেসে বসেছিল চুপচাপ। ফ্রকের কোঁচড়ে বরফ ঠাণ্ডা সন্দেব পাঁউরুটি। পুবো কলাটাই ছাড়িয়ে নিয়েছিল। ভারি মিষ্টি, নবম তুলতুলে আর সুন্দর করে কাটা রুটিগুলো। গোগ্রাসে গিলছিল। বড় করে কামড় দেওয়াও যায় না। ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আচমকা বানীমার ডাক পড়তেই দিশেহারা সেই মেয়ে সবই এক পাশে মেঝের ওপর ফেলে বেখে লাফিয়ে দাঁড়াল। মুখভর্তি কলা পাঁউরুটি চিবুতে চিবুতে এবং সামাল দিতে না পেরে সবটাই গিলে ফেলার বিষম সামলে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল সামনে।

'কালী, আমাদেব ড্রাইভার ওদের গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে ওকে। একে দিয়ে যে কী কাজ হবে, আমার মাথায় ঢুকছে না। তা-তোমার কাছে রাখো কটা দিন। কাজকম্মো শিখে নিতে পারে তো ভালো। থাকবে। আমার তো সত্যি-সত্যি লোকেব দরকারই। বাতাসীটা এমন হুট করে কাজ ছেড়ে চলে গেল...'

কথাগুলো যাকে শুনতে হবে, বরং তারই কোনো হুঁশ নেই। চৌকো চৌকো শাদা পাথরে গড়ে তোলা পাঁচিলের ওধারে গুটি গুটি ঢুকে পড়ে আরো একবার অবাক মানল রাধা—এমন গোছগাছের রান্নাঘরে কলের জলও হাতের কাছে। ঘরের কোণে কলতলায় বসে স্টেনলেস স্টিলের কী একটা গামলা ধোয়াধুয়ি করছিল তার মায়েব চেয়েও বয়সে বড়...ঠাকুমাগোছের একজন বুড়ি।

রানীমার কথার ফাঁকে একবার মাত্র ঘাড় ফিরিয়ে নতুন মানুষকে এক পলক দেখে নিয়েছে বুড়ি। কোনো উচ্চবাচ্য নেই। এবং রানীমা ঘর ছেড়ে বেবিয়ে যাবাব মুখে অসম্ভব খিঁচুনিতে—'এই...এই শোন্ এদিকে। এদিকে আয়...'

রানীমার গলার স্বরে এবার ভ্রূ কুঁচকে এসেছে অনেকটাই। ছুঁচোল চোখ জোড়ায় পলক পড়ছে না। রাধা নিজের মধ্যে সিঁধোতে সিঁধোতে নিজের কাছেই মোটামুটি একটা মাংসপিণ্ড হয়ে উঠেছে। ভিন্ দেশে পবের ঘরে পরের দোরে, রাজার-বাড়িব বিরাট জলুসে এবার তার মরণ। এগোয় গুটি গুটি। নিশ্চিত কানমলার দিকে।

'এগুলো খেতে দিয়েছি তোকে। ফেলে দিয়েছিস যে-বড়? ভালো লাগছে না খেতে?'

ঘরের কোণে মেঝেতে পড়ে ছিল যে কলাসন্দেশ পাঁউরুটিগুলো, যা এই মুহূর্তে নিশ্চিতই যখের-ধন সেই শিশুব, ছুটে গিয়ে সে প্রায় দুর্লভ ভোজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, রানীমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই, দু'হাতে তুলে নিয়ে কামড় মারল খোসা-ছাড়ানো কলার বাকিটুকুতে। কৎকৎ গিলে খাবার ব্যস্ততা।

'অ্যাঁ! এটা কী? কী করছিস তুই?' রানীমা অস্থির হলেন—'ফেলে দে, ফেলে দে বলছি। ধুলোবালির মধ্যে ফেলে রেখে গেছিস, সেগুলোই গিলছিস আবার? কী নোংরা, কী নোংরা রে তুই? দ্যাখো, দ্যাখো গো পুষ্পর-মা, কী আরেক উৎপাত এসে হাজির হলো ঘরে। হাভাতে ভিখিরির মতো এসব কী অসভ্যতা! এ-মেয়ে তো চলবে না আমার ঘরে...'

পুষ্পর-মা নামেব সেই বুড়িকে দেখা যাচ্ছে না এপাশ থেকে। হয়তো কলতলায় বাসনমাজা চলছে এখনও। রানীমার হুকুমহাকুমেও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সাড়াশব্দ নেই।

অথচ বানীমা একই ভঙ্গিতে—'যা যা ওখানে। সব ফেলে দিয়ে আয়। পুষ্পর মাকে বল্ কোথায় ফেলতে হবে। ভালো মনে যা-হোক দুটো হাতে দিলাম, আর তুই সেগুলো ধুলোবালিতে নষ্ট করে খাচ্ছিস? পোকাও তো চাটতে পারে। বিষ। পরেব-মেয়ে ঘরে এসে অসুখবিসুখে পড়বি, আর আমার ভোগান্তি। যদি শুনি, তুই এগুলো খেয়েছিস, কালই কালীকে বলব, তোকে দেশে রেখে আসবে...'

রানীমা চলে যাবার পব রাধা হদিশ পায় না—কী হলো? অবোধ বোকা চোখে তাকায় এদিকে-ওদিকে—রাজবাড়ির রন্ধনশালায়, ঘিমাখনমাছমাংসের ঘরে। নকশা-কাটা কাঁথা-সেলাইযের পাথর যদিও পায়ের তলায় নেই এখানে, শাদা-সবুজ বুটিদাব তকতকে ঝকঝকে পাথরের মেঝেয় কোথায ধুলোবালি? আরশোলা ওড়ে না, পোকামাকড় নেই। এত পেছল, পিপড়েও হাঁটে না পা হড়কে যাবে বলে। কিংবা সেই মেয়ে নিজেই পিছলে যাবে ভয়ে হাঁটে পায়েব আঙুল চেপে চেপে। সোহাগের সন্দেশ-পাঁউরুটি বুকে আগলে রাখে বুকের দুরুদুরুতে। সত্যি-সত্যি যদি কেড়ে নেয় কেউ? যদি ফেলে দিতে হয়! ওপাশে কলতলায় জলের শব্দ। বুঝি এখনও ধোয়াধুয়ি করে যাচ্ছে বুড়ি। উঠে আসছে না কেউ। ঘরের ভেতর হঠাৎ-ফাঁকায় সন্দেশটুকু তার হাতের মুঠোয় পরম সম্পদ হয়ে উঠতেই ঝাঁ করে মুখে পুরে ফেলল। কুটুশ-কুটুশ দাঁতে কামড়ে, মুখের লালায় ভিজিয়ে, দাঁতে-জিভে তোয়াজ করে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগের সুযোগ কম। বেড়ালের মতোই চোখ জোড়া এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে ইতিউতি নজর রাখতে হয়। কান দুটো টানটান থাকে। শুকনো ছানায় গলাটা কাঠ-কাঠ হয়ে ওঠে। জলের তেষ্টা। বোঝে না, এত বড় রাজার-বাড়িতে কোথায় জল চাইতে হয়। ভীষণ কষ্ট। তড়িঘড়ি গিলতে গিয়ে বিষম ওঠে। বুঝি সন্দেশেই মরণ।

কিংবা জানে নাবালিকা—দয়ার দানে যে-ভালোবাসা, ভালোবাসার দানে সেই দয়া থাকে না।

অথবা ভালোবাসা থাকেই কোথাও। সে-বড় নির্দয়।

আলোয় আলোয় রাজার বাড়ি আসলে এক নিঝুম রহস্যপুরী। রানীমাকে দেখার পর থেকেই একটা খটকা ছিল—দুটো হাত ভরে এত এত সোনা, গলায় মোটা দানার হার, কানে ফুল! এমন ঝাঁকুনি মেরে কথা বলেন—কালীজেঠুও পোষা বেড়ালের মতো কেমন নেতিয়ে থাকেন। গাঁয়ে যাত্রাপালায় অনেক রানী দেখেছে সে। রানীমা ঠিক রানীর মতো নন। এত বড় রাজপ্রাসাদে কোথায় থাকেন রাজামশাই, কেমন দেখতে রাজপুত্তুর রাজকন্যেরা, কিছুই জানা নেই। কোন এক অলৌকিক যাদুর খেলায় যদি সে পৌঁছেই গেছে ওঁদের ঘিমাখনমাছমাংস সাতব্যঞ্জন পাকশালায়, নিষেধের সন্দেশ গিলে শুকনো গলায় এক ঢোক জলের জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠতে চাইল হঠাৎ। এখানে আস্ত একটা জলপ্রপাতই জানা হয়ে গেছে তার।

সেখানে বসে আছে আদ্দিকালের এক বুড়ি। সে-বুড়ি কথা বলে না। রানীমার কথায়ও সাড়া দেয় না। হতেই পারে ডাইনিদের কেউ। এক গলা ভয় নিয়ে বুকের টিপটিপে পা টিপেটিপে সেদিকেই এগোতে হয় তাকে। ডাইনি বুড়ি লম্বা লম্বা নখের আঁচড়ে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ের রক্ত শুষে খায়।

মাত্র কয়েক কদমের সুমসৃণ পথটুকু বড়ই সঙ্কুল। মধ্যবর্তী পাঁচিলটা ডিঙিয়ে ওপাশে রান্নাবান্নার অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছিল সে। কিন্তু কোত্থেকে হঠাৎ যে কী-সব হয় এখানে। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ ভূতুড়ে-বাড়ির নিঝুম কাঁপিয়ে ঘরের ভেতর রেলগাড়ির হুইসলের চেয়েও মারাত্মক তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ ফেটে পড়তেই, গোটা শরীরে থরথর কাঁপুনি সামলে দু'হাতে কান চেপে ঝপ করে বসে পড়ল মেঝেতে। মাথা তুলে তাকাবার সাহস নেই। অথবা সাহস করে মাথা তুলে চারপাশ খুঁজতে খুঁজতে যখন সে খুঁজে পেল বিদঘুটে হাড়মজ্জা-কাঁপানো সেই আওয়াজের উৎস, হুট করে সবটাই থেমে গেছে।

'মায়ের বুকের দুধ ছাইড়া আইলি যে-বড়। মায়ের বুক টনটনাইব না?'

পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কী করছে সেই বুড়ি। কিছু বলছে তাকে? রাধা ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। শুধু বুড়িকে নয়, রাজার-বাড়ির হেঁসেলের সবই তার চোখ ভোলায়। আসলে পাঁচিলটা পাঁচিল নয়। এপাশে শান-বাঁধানো লম্বা টেবিল বানিয়ে পাকাপোক্ত রান্নার ব্যবস্থা। বুঝি দাঁড়িয়েই সব কিছু করতে হয় এখানে! সেখানেই উনুন। উনুনটা উনুন নয়, স্টোভ নয়। কাঠের পিঁড়ির মতো, অনেকটাই স্টোভের আদলে একটা যন্তর। তার ওপর পাশাপাশি দু-জায়গায় একসঙ্গে রান্না—হাতলওলা অদ্ভুত একটা হাঁড়ি আর ঢাকনাওলা গামলা। সবই চকচকে ঝকঝকে রুপোর মতো। স্টেনলেস-স্টিল জানে রাধা। গাঁয়ে চক্কোত্তিবাবু, হালদারদের বাড়িতে দেখেছে অনেক। কিন্তু কারুর ঘরে উনুনও যে এমন লোহালক্কড় দিয়ে তৈরি হতে পারে—অপার বিস্ময়ে সে উনুনকে উনুন বলেই চিনতে পারল। কেন না,তার নাক ছুঁয়ে ওঁদের শান-বাঁধানো টেবিলের মাপ এবং সে পায়ের দশ আঙুলে চাপ রেখে গোড়ালি তুলে ঘাড় উঁচিয়ে স্টেনলেস-স্টিলের একই পিঁড়িতে হাঁড়িগামলার তলায় দু-দুটো লাল-নীলচে আগুনের শিখা দেখল। একের পর এক ভেলকি দেখারও বোধ হয় ক্লান্তি আছে। অস্থিরতায় সে-মেয়ে শুকনো গলায় তেষ্টা ভুলে যায়।

‘ঘর কই? কোন্ গেরাম?’

‘দাঁড়গাছি।’ ভ্যাবাচাকা চাউনি থেকে গলার নলি ফুটে বেরুল শব্দটা। রাধা তাকিয়ে থাকে। ওপাশের হাতের কাজ সেরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ি। উনুনের পাশে।

‘হ, হেই ত জিগাই। হেইডা কোনখানে?’

‘জানি নে, সেই মাঝের-গাঁ ইস্টিশন থেকে বাসে করে যেতে হয়। হেঁটেও যাওয়া যায়।’

‘আ ল ছেমরি, কোন্ জ্যালা হেইডা কইবি ত! হাওড়া হুগলি বধ্ধোমান....’

‘জানিনে...’

‘বাপঠাকুদ্দার কুষ্ঠিঠিকুজি আছে? না-কী রিফুইজি? বাপেব ভিটায় কাঙাল? না, বাঙাল?’

হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে রাধা। মানুষের ভাষা বোঝে না। ভাষার অর্থ?

মুখটা নামিয়ে এনে, গলা বাড়িয়ে ছুঁচোল করে ঝামটা মারল বুড়ি—‘নাক টিপলে দুধ পড়ব। দ্যাশগেরামেব নামধাম জানস না ত রোজগার করতে বাইরইয়া পড়ছস এই বযসে? মাইয়ালোকের শরীল! শিয়ালশকুনের মতন শয়তানগুলান ঘুইর‍্যা বেড়াইতাছে চাইরদিকে....’

কী বলছে বুড়ি? মানুষের ভাষায় কত দুর্গতি ঘটতে পারে মানুষের? বুড়ির বকবক ছাপিয়ে হঠাৎ-ই গুলতি-খাওয়া কাকপায়রার ডানাঝাপটানি চিৎকারের মতো ঘরের ভেতর আবার সেই বীভৎস চিৎকার? সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠে রাধা বুড়িকে পাশ কাটিয়ে প্রাণে বাঁচতে চায়।

উচ্ছ্বাসশূন্য সেই বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—‘আ ল, খাড়া খাড়া, যাস কই? আরো একবার বাজব। ইস্টু হইতাছে বাবুদের। তুইও পাবি। তরেও দিব একটু।’

বিদঘুটে দুর্দৈব ভাষার নাগাল ছাড়িয়ে ঘরের কোণে জলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল রাধা। কী আশ্চয্যি! কলের মাথায় প্যাঁচটা একটু নাড়তে-চাড়তেই, ভাগ্যিস, জল-খোলাব কায়দাটা সে একবারেই শিখে ফেলল। গরুর বাঁট ঠেলে বাছুরের দুধ টানার মতো হাতের আঁজলায় মুখ বাখতে তাকেও পিঠ বাঁকিয়ে অনেকটাই নিচু হতে হয। আঃ জল। ঢোঁকে ঢোঁকে টেনে নিতে নিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। আকণ্ঠ তৃপ্তি।

‘করছ কী, করছ কী ল তুই? বাবুদের বাড়ি পেরথম আইস্যা ঝি-চাকরের জল খাইলি?

হুঁশ নেই রাধার। আসলে ক্ষ্যাপাটে বুড়ির ভাষার যেমন ছিরি, কোনো মানেও নেই বকবকানির। এক-পেট জল গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল রাধা এবং হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে তলার দিক থেকে ফ্রকটাই তুলে নিয়ে দু-হাত মুছল, গাল-মুখ-থুতনি ঘষে নিয়ে তাকাল বুড়ির দিকে।

‘জলের দরে টাকা ওড়ে ল ছেমরি। এই বাড়িতে জলের দাম অনেক। সকালে কেরাসিনের এস্টোভে দুই হাঁড়ি জল গরম হইব। বিকালে ঠাণ্ডা হইলে, ওই যে দেখতাছস ঢোঙার মতন ফিলটর, হেইখানে একপ্রস্থ ঢালন হইব। শ্যাষে ফিলটরের কলে বোতল ভইরা ফিরিজে যাইব জল। টাকার গরম বাবুগো, জল বড় ঠাণ্ডা....’

উনুনে তৃতীয় কিস্তি হুইসল। এবার আর সেভাবে কেঁপে উঠল না রাধা। বরং কৌতূহল। বেঢপ হাঁড়িটাব মাথায় লোহার বল ফুঁড়ে ধোঁয়া বেরুনোর কী তেজী হুঙ্কার! বুড়ি সেখানেই তৎপর হয়ে ওঠার পর রাধা এগোল পায়ে পায়ে। খুবই কাছাকাছি। টেবিলের তলায় লাল রঙের বড় একটা জালা, টেবিলের ওপর স্টিলের পিঁড়িতে উনুন। ওপরে-নিচে কোথায় কী কল টিপতেই উনুনেব আগুন নিভে গেল। ঘনঘন ঘাড় উঁচিয়ে উঁকিঝুঁকিতে রাধা দেখে, কত সব নতুন নতুন আজব কাজকারবার। হাঁড়ির লম্বা হাতলে বাঁ-হাত, ডান হাত ওদিকে কোথায়—দুহাতে ধরে হাঁড়িটা নামাতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঝুঁকে পড়েছে বুড়ির শবীর। বড্ড কষ্ট। অথবা বুড়িকে দেখে বাধার নিজেরই কষ্ট হলো। এগোল সে। ধরতে চায় ঠাকুমাকে।

বুড়ি চেঁচায়—'ছুঁইস না, ছুঁইস না ল ছুঁড়ি। জাতবেজাত জানা নাই। হুটহাট কইর‍্যা ছোঁয়াছানি করবি না সক্‌রি কড়াই কুকর। এইটাও ত বামুনবাড়ি ল। ছাদে ঠাকুরঘরে সকালে-বিকালে রোজ পূজা হয় মা-ঠাকরুণের....'

অদ্ভুত স্টিলের হাঁড়িটা টেবিলে নামানোব পরও খুঁটোয় বাঁধা তেজী ষাঁড়েব মতো কী ভীষণ ফুঁসছে ভেতর থেকে! ঢাক্‌না খোলারও কায়দা আছে এবং সেটা উদোম হতেই চমকের পর চমকে এক সময় আরো বেশি হকচকানোর শক্তি হারিয়ে যখন বোবা পাথব বনে যেতে হয়, রাধা এক ঝলকে কোন্ এক স্বর্গসুখের মাতাল ঘ্রাণে বিভোর হয়ে গেল। হাঁড়িব ভেতব হাতা ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করছে বুড়ি। পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে হালকা মিহিরঙের ধোঁযা। ধোঁয়ায় কী আশ্চর্য এক মিষ্টি সুবাস। চাবিযে যাচ্ছে, ছডিয়ে যাচ্ছে ঘরময়। ছোট মেয়ে তার বুকের হাজার নিঃশ্বাস টেনেও লুটে নিতে পারে না সবটা। ঘ্রাণেই যদি অর্ধভোজ মানুষের, রাজকীয় আহারের প্রথম আস্বাদনে সে সভয়ে তাকাল রাজবাড়ির রাঁধুনির দিকে—'রাজার বাড়িতে এমনধাবা রান্না নিত্যি হয় গ ঠাকুমা?'

'রাজার-বাড়ি?' হাতা নেড়ে মাংসের সেদ্ধ পরখ করে ঢাকনাটা আবার বন্ধ করছিল বুড়ি। হঠাৎ ফ্যাঁচ করে উঠল রাধার দিকে তাকিয়ে—'আর বেশি ঢং দেখাইস না বাপু। রাজা আবার কেডা? এইটা ত সাহেববাড়ি ল। মেলেচ্ছযবন কতকগুলান। মায়ে গিয়া ঠাকুরঘরে পূজা করব আর ঢ্যাঙা মাইয়ারা সিমিজের মতন ম্যাসকি না কী কয় গুষ্টির পিণ্ডি, হেইসব পইর‍্যা লাজলজ্জা নাই, বুকপাছা নাচাইয়া সারা দ্যাশ চইষ্যা বেড়াইব। সকবিফকরি মানব না। অখাদ্য-কুখাদ্য সব খায়। পোলাটা আরো ঠ্যাটা। সাযেব-মেমসাযেব ল। রাজা কই দ্যাশে? রাজা থাকলে কি তর-আমার মরণ হয় এমন?'

কথাগুলির কী মানে, রাধা জানে না। কিন্তু দুর্বোধ্য ভাষা থেকেও সাহেববাডি জেনে ফেলার পর, রাজার বাড়িটা হঠাৎ সাহেববাড়িতে বদলে গেলে শুধু শব্দই বদলায না। ফিনকি ছোটানো আলোয়-আলোয় বর্ণময় প্রাসাদ-অট্টালিকায় যেন প্রায় সবটাই পাল্টে যেতে থাকে রাধাব চোখে। সাহেব কারা? কেমন মানুষ তাঁরা সবাই? বাজারানীব অনেক গপ্‌পো শুনেছে সে। সাহেবদের বেত্তান্ত কেউ জানে না তাদেব গাঁয়ে। শুধু কালীজেঠু জানেন।

এবং তখনই সন্ত্রস্ত রাধা সরে দাঁড়াল একপাশে। ঝোড়ো বাতাসের কাঁপুনি তুলে

আবার ঘরে এসে ঢুকেছেন রানীমা। হাতে রাধার জন্য জামা-জাঙিয়া; আস্ত একটা সাবান।

'তুমি যাও তো পুষ্পর-মা, বুলবুলির একটা জামা বের করে দিয়েছি। সাবান দিচ্ছি। নিচে একতলায় নিয়ে গিয়ে বেশ ভালো করে রগড়ে রগড়ে গাহাতপা ধুইয়ে নিয়ে এসো ওর। যা গন্ধ ওদের গায়ে। আজ তো আর হচ্ছে না। মনে করাবে তো, নন্দকে দিয়ে কাল বাজার থেকে আলাদা একটা গামছা কিনে আনাতে হবে ওর জন্যে। আজ তোমারটা দিয়েই চালিয়ে দাও....' হঠাৎ-ই রাধার দিকে ফিরে তাকালেন—'আজ রাত হয়ে গেছে। থাক। কাল দুপুরে স্নানেব সময় চুলে সাবান ঘষবি ভালো করে। উকুনটুকুন নেই তো মাথায়? দেখিস বাপু....'

প্রায় একই নিঃশ্বাসে পুষ্পর-মাকে—'স্টু-টা নামিয়েছ? আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি কলতলা থেকে ফিবে এলে না-হয় হাতে হাতে লুচিগুলো ভেজে নেওয়া যাবে। আমারও তো ওদিকে দেরি হবে আধঘণ্টাটাক...'

আবার রাধার দিকে চোখ—'কি বে, লুচি বেলতে জানিস?'

বাধা কাঁচুমাচু তাকিয়ে থাকে। লুচি? সে-তো নেমন্তন্নবাড়িতে হয়। তেল-ঘি লাগে বিস্তব। সে তো বামুনবাড়িব কায়েতবাডির হালদাবদেব ঘবের মেয়ে নয়।

রানীমা খিঁচিয়ে উঠলেন—'কী জানিস তুই তাহলে? তোকে দিয়ে আমার কোন্ কম্মোটা হবে শুনি? মাথায় কী যে হুজুগ চাপল কালীর। আর ওরই বা দোষ কী? আমিই তো বলেছিলাম। যাক গে, সে-দেখা যাবে। থাক দুটো দিন....'.

আরো একবার পুষ্পর-মাব দিকে—'ওর জামা-প্যান্ট সব রইল এখানে। তুমি আর দেরি করো না। ওকে স্নান করিয়ে নিয়ে এসে ডাকবে আমাকে....'

পুষ্পব-মা, অর্থাৎ সেই বুড়ির কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। লম্বা শান-বাঁধানো টেবিলেব ধারে পাট-করা জামা-জাঙিয়া রেখে বানীমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর, বানীমাব চলে-যাওয়াব ফাঁকার দিকে তাকিয়ে আলতো করে ঠোঁট ভাঙল—'চল্ ছেমরি, তরে সান কবানর নূতন হুকুম হইছে। বাটা-হলুদ নাই। উলু দিয়া সান করাইয়া আনি। পরে মা-ঠাকরুণের মনে ধরাইতে পারস ত থাকবি এইখানে। বর না জোটে, ঘব ত পাবি একটা।'

মানুষের ভাষা না বোঝার মস্ত সুবিধে এই—বাগ করতে হয় না, হাসতে হয় না, দুঃখও পেতে হয় না। ভিনদেশে কোথায় এসে অচেনা মা-ঠাকুমাদের কথা-চালাচালির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাধা, যথার্থই এক অবোলা প্রাণী, বুঝে নিতে পাবে না নিজের অবস্থান। কাঁদতেও পারে না অসহায় শৈশবধর্মে। কেন না, তখনও আরো কিছু নতুন বিস্ময় বা পবমপ্রাপ্তি তার জন্য প্রতীক্ষায় ছিল।

ওপাশে পিঠ ফিরিয়ে কী করছিলেন ঠাকুমা। ঘুবে দাঁড়িয়ে হাতে একটা স্টিলেব-বাটি নিয়ে এগিয়ে এলেন কাছে—'নে খা। ওইখানে....হ, ওইখানে বইস্যা ধীরেসুস্থে শান্তি কইর‍্যা খা...'

নুলোর মতো হাত বাড়ায় রাধা। অভিভূত চোখজোড়া আটকে থাকে আদ্দিকালের এক বুড়ি ঠাকুমার মুখের দিকে।

'নে ল ল, খা। ডর নাই তর। টিভিতে চিত্রমালা হইতাছে এখন। বাড়িতে ডাকাইত পড়লেও হুঁশ থাকব না কারোর। কেউ আইব না এইদিকে...'

তেল-চুকচুক মাছভাজা বাটিতে। একটি নয়, দু-দুটো টুকরো। চোখের আশ আব জিভের লোলায় যতটা উত্তেজনা, বালিকা হিসেব পায় না ভালোবাসার। দাঁতে-জিভে কামড়ে নেবাব আগে নাসিকার টানে বাটিটা উঠে আসে ওপরের দিকে, মাথাটা নেমে যায় তন্ময়— এমন ম-ম গন্ধ দুটো মাত্তর মাছভাজার? বুকেব ভরাট নিঃশ্বাসে গন্ধটা বারবার শুঁকে নিতে নিতে আহার্যেব অতি ঘনিষ্ঠ বাস্তবটা প্রায় অবিশ্বাস্য হয়ে উঠতে থাকে। ডানহাতের তর্জনীটা অজান্তেই ছোট করে একটু তেল তুলে নেয়। জিভে ছোঁয়া লাগতেই সমস্ত টাকরা জুড়ে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। এভাবেই শুধু ভাজা তেল চুষতে চুষতে এগোয় পায়ে পায়ে—'এটা কী মাছ গ ঠাকুমা? এমনধারা বাস!'

নিজের কাজে ফিরে গিয়েছিল পুষ্পর-মা। ঝামটা মেরে তাকাল—'হা ভগবান। কোন্ দ্যাশের মাইয়া ল তুই? আর আমাবে কয বাঙাল? ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছও চিনস না?'

ইলিশ মাছ! নামটা সে শুনেছে এর আগে। গাঁয়ের নিত্যি-বাজারে, যেখানে সে মায়েব সঙ্গে পুকুরপাড়ের হবেক শাকপাতা নয়তো ঘবের মাচায ডাগব হয়ে ওঠা লাউটা-কুমড়োটা বেচতে যেত, হযতো সেখানে ইলিশ মাছ দেখেওছে কখনও-সখনও। খায়নি কোনোকালে। এমন সুখ পেতে হলে আদর খেতে হয়। মাছেব-বাটি হাতে নিয়ে অভিভূত শিশু আদর চেনে পৃথিবীর।

সাহেববাড়ির বসুইশালায নিরিবিলিতে আদব খায় রাধা। ভেতরে ভেতরে টলমল দোল খায়। আদব পাবার আদব খাবার খুব একটা অভ্যাস নেই বলেই কিছুটা সতর্ক থাকতে হয়। এঁটোজ্ঞানে মাছভাজাব বাটিকে একটু তফাতেই রাখতে হবে যেহেতু, ঘরেব কোণে মেঝেতেই হাঁটু গুটিয়ে, শুধুমাত্র একজোড়া পাযের পাতায শরীরেব ভর রেখে বসে জীবনের প্রথম ইলিশ মাছ চিবোতে চিবোতে, শুধু ইলিশ মাছই নয, স্বাদগন্ধের অনির্বচনীয়তা রূপেবর্ণেস্পর্শেশ্রবণে গোটা সাহেববাড়িটাই আলোয আলোয যেন এক অলৌকিক ইলিশ মাছ হয়ে উঠতে থাকে কিংবা মাছভাজার দুটো মাত্র টুকরো আস্ত একটা সাহেববাড়ি। বানীমাব-দেওয়ার সন্দেশটা বড তাড়াতাড়ি এক গালে গিলে ফেলতে হয়েছিল তাকে। একটু একটু করে চিমটি কেটে ভাজা মাছ ভাঙাব কৃপণতায় দীর্ঘ সময বয়ে যেতে থাকে। এত বেশি কাঁটা—দাঁতের পাথরে প্রতিটি অনুকণা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে থেঁতলে ছাবাছোবড়া বানিয়ে রসিয়ে বসিয়ে খাবাব বিপদ—যে-কেউ ওঁবা বান্নাঘবে ঢুকে পড়তে পারেন এখন। বালিকাও জানে, পরেব ঘবে এভাবে মাছ-খাওযা মূলত মার্জাব ধর্ম। গৃহস্থের তাড়া খাবার ঝুঁকি।

অন্যদিকে উপভোগকে দ্রুততব কবাব সঙ্কট, ছোট ছোট একজোড়া চোখের পাতা ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসে। দূর-প্রবাসে এক রাত্তিরও কাটেনি এখনও। ভুলতে পারে না, কোথায় কোন্ দাঁড়গাছি গাঁয়ে আকাশমাঠজোড়া থকথকে বিপুল আঁধার রাতে পড়ো-পড়ো ভাঙাচোরা মেটেঘরে ছোট একটা লম্ফ টিমটিমে। সন্ধে গড়িয়ে যাবাব পর এত

রাত্তিরে লম্ফটুকুও নিভে গেছে নির্ঘাৎ। সেখানে তার মা, ভাই পালান, গোয়ালঘরে সোনামণি।

জানে না বালিকা, জীবনের উত্তরণে এভাবে ভুলতে হয় অনেক কিছুই। এই বিস্মৃতিই কলকাতা। কলকাতা যাদুকর।

সাহেববাড়ির একতলায় আঁস্তাকুড়ের ধার ঘেঁষে দাসদাসীদের জন্য আলাদা স্নান পায়খানার ব্যবস্থা। বাইরে কলতলা, বড় চৌবাচ্চা। পাশেই খুপরি গোছের একটা ঘর। নতুন ঠাকুমার নির্দেশে বালতি ভরে জল তুলে নিয়ে এল রাধা নিজেই। ঘরের ভেতর অদ্ভুত এক বিদঘুটে ভাষায় ধমকেধামকে একেবারে ন্যাংটো করেই ওর সারা গায়ে হাতে পায়ে সাবান মেখে, পাকা ঝিঙের ছোবড়ায় ছালচামড়া তুলে শুধু গা-ধোয়া নয়, পুরোপুরি স্নানই করিয়ে ছাড়ল বুড়ি। বিনুনি-বাঁধা মাথার চুলটা শুকনো রইল শুধু। বাচ্চা মেয়ে! নতুন জায়গায় নতুন জলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

'পরের কথায় লাথিচড়, নিজের কথায় ভাতকাপড়, পরের ঘরে ঢুকতে ডর, নিজের ঘরে হাইগগা মর...' রাত্তিরবেলা এ-এক নতুন উৎপাত হয়ে উঠল পরেব ঘরের বুড়ি ঠাকুমা কিংবা এই-ই তার সোহাগ। রাধার বুকেপিঠে পাছায় সাবান ঘষতে ঘষতে তোবড়ানো গালে অনর্গল বকবক—'দ্যাশগেরামের বাড়িতে মায়ের কোলে যেমন আছিলি, আছিলি রে বাপু। এইখানে চলব না হেইসব। রোজ রোজ চুলে তেল ঘইষ্যা গায়ে সাবান মাইখ্যা কলের জলে সান করতে হইব ল তরে। বেরাশ দিয়া মলম ঘইষ্যা দাঁত মাজতে হইব। ফর্সা জ্যামা পইরা বিবি সাইজ্যা থাকবি। সাহেববাড়ির নেয়ম....'

সিলকেব জামা পরলে বোধ হয় এমনটা হয়। সাবানের ফেনায় ফেনায় গা-গতব পিচ্ছল হয়ে উঠলে কী যে মজা। বরফের মতো ঠাণ্ডা মনে হয় নিজেকে। সেসঙ্গে কী মিষ্টি একটা গন্ধ! বিভোর রাধা নিজের খলবলে ভুলেই গিয়েছিল এটা তার নিজের ঘর নয়, বিদেশবিভুঁইয়ে সাহেববাড়ি। বুড়ির সাবান-ঘষার লাঞ্ছনার কিলিকিলিই হয়তো পাছায় বগলে, নাচতে নাচতে হাসির খলখলে—'তুমি এমন করে কথা বলো কেনে গ ঠাকুমা?'

'ক্যান্? কী খারাপটা কইছি?'

'সাহেববাড়ির সব্বায় এমনধারা কথা বলেন গ?'

'শুন কথা মাইয়ার....' বুড়ি ভেংচি কাটল—'শুনছি ত চাটগার দিকে কোন্খানে নাকি বাড়ি আছিল বাপঠাকুরদ্দার। তা এখন হেইসব নাই। কাড়িকাড়ি টাকা আছে। আ ল, পয়সা থাকলে কি বাঙাল থাকে নাকি কেউ? সাহেব হইয়া যায়। হগগলে ইংজিরিতে কথা কয় তখন। দেখবি, বাচ্চা-বাচ্চা পোলামাইয়াগুলান কেমন ফুরুৎ ফুরুৎ উইড়া বেড়ায় আর কথায় কথায় ইংজিরি ঝাড়ে....'

ইংজিরি। মগের পরল মগ জল রাধা নিজেই ঢালছিল গায়ে। হাত থেমে গেল। জলঢালা বন্ধ। গোল-গোল চোখে তাকিয়ে থাকে। তাহলে সে, থাকবে কী করে সাহেববাড়িতে? সে তো মুখ্যু মেয়ে। পড়ালেখা জানে না। গাঁয়ের সত্য মাস্টারমশাইর প্রাইমারি ইশকুলে ওকে পাঠাবেন বলে অনেকবার ঠিক করেছিলেন মা। মায়ের সঙ্গে

গেরস্তদের বাড়ি চিঁড়ে কুটতে মুড়ি ভাজতে রোজ খাটতে গাইবাছুর চরানি দিতে হতো যাকে, দুপুরবেলার ইশকুলে কোনোদিনই আর যাওয়া হয়নি তার। পালানভাই যায়।

স্নানের শেষে জাঙিয়াটা পরল রাধা। একটা জামা পরেই ভাবল, বুঝি শেষ। ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ি—'কী হইল? এইটা ত ট্যাপজ্যামা ল। আরো একটা জ্যামা আছে তর। হেইটা পর....'

আরো একটা জামা? রাধা অবাক চোখে তাকায়।

'ম্যাসকি জ্যামা ল। মেমসাহেবের জ্যামা। তরে দিছেন মা-ঠাকরুণ।'

পাশবালিশের খোলের মতো একটা কিছু। মাথায় গলিয়ে জামাটা পরল রাধা। ঢেউ খেলে যায় শরীরে। কাঁধ থেকে বুকপেটকোমর তো বটেই, হাঁটু ছাড়িয়েও আরো নিচে পায়ের গোড়ালি অব্দি সব ঢেকে গেছে তার। এ-রকমই জামা গাঁয়ের বাবুদের ঘরে অল্প বয়সী মেয়েদের কাউকে কাউকে পরতে দেখেছে সে। কিন্তু জানত না, সে-জামা তার কপালেও জুটে যাবে একদিন। এক সন্ধেয় সে নিজেও হঠাৎ মেমসাহেব।

ইলিশমাছ যেমন, ফুরফুরে সাবান-ফেনা যেমন, সেদিন রাতেই প্রথম সাহেব দেখল রাধা।

হেঁসেলের লাগোয়া মস্ত বড় ঘরটাকে সন্ধে থেকে পড়ালেখার ঘর বলেই মনে হয়েছিল তার। গোটা ঘর জুড়ে পায়ের তলায় নকশা-কাটা পাথরের কাঁথা, চারপাশের দেয়ালে হালকা গোলাপী রং। ঘরের মাঝখানে পেল্লাই একটা টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। সেখানে বিজলী বাতি বিজলী পাখার তলায় ফুরফুরে বাতাসে খেতে বসলেন সবাই। পাটভাঙা ধবধবে শাদা পায়জামা আর পাঞ্জাবিতে ভারি চেহারার একজন ঢ্যাঙা মানুষ। মাথার তিন দিকে ছোট ছোট চুল রেখে চকচকে গোল টাকটা কপালের সঙ্গে এসে মিশেছে। চোখে চশমা। উনিই কর্তাবাবু? উনিই সাহেব? কথা বলেন না। দাদাবাবুর সঙ্গে আলতো করে কী কী কথা বললেন, ভুরুদুটো ওপরের দিকে উঠে গেল। ভাঁজ পড়ল কপালে। কিছুটা আগেপিছে রাধারই বয়সে ফুটফুটে দাদাবাবু-দিদিমণিরা। তার মতো কেলে-কুচ্ছিত নয় কেউ। কী সুন্দর! ফর্সা পুতুলের ঢঙে পোশাকের বাহার। হলুদ-সবুজ নকশায় একজন, শাদা বুটিদার লাল জামায় আরেকজন। গোটা শরীর ঢেকে অবিকল সেই জামা দুই দিদিমণির গায়ে, স্নানের পর যে-জামা সে নিজেও পরেছে আজ। রান্নাঘর আর খাবারঘরের মাঝখানের দরজায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে রাধা, সেদিকেই পেছন করে টেবিলের এপাশে একা একদিকে চেয়ারে বসেছেন সাহেব। রাধা শুধু তাঁর পিঠ দেখতে পাচ্ছে। তাঁর ডানদিকের সারিতে পর-পর দুটি চেয়ারে দুই দিদিমণি। বাঁদিকের চেয়ারে বাদামি রঙের পায়জামা-পাঞ্জাবিতে যেন এক রাজপুত্তুর।

ওদিকে এই মাত্র পাঁউরুটি সেঁকা হয়েছে সাহেবের জন্য। লুচি ভাজা চলছে গরম গরম। এদিকের ঘরে টেবিলের ওপর ছোট ছোট আসন পেতে চিনেমাটির বড় বড় প্লেট সকলের সামনে। কত রকমের কত রঙের ঝকঝকে চামচ, শিশিবোতল। চোখ-ধাঁধানো বাসনপত্তরে রান্নাবান্নার খাবারদাবার সব টেবিলের ওপর একসঙ্গে সাজিয়ে নিয়ে প্লেটে তুলে দিচ্ছেন মা-ঠাকরুণ। খাবেন সবাই।

খাওয়া শুরুর আগেই লাফঝাঁপে মেতে কত কথা যে বলে যাচ্ছেন দাদাবাবু-দিদিমণিরা। রাধা যেটুকু চিনতে পারে, সেটুকু বাংলা। দুর্বোধ্য শব্দগুলি, ধরে নিতেই পারে, নির্ঘাৎ ইংজিরি। রাধার বুক কাঁপে।

কোনো কাঙালপনা ছিল না রাধার। চোখজোড়াই কাঙাল হয়ে ওঠে। সাহেববাড়ি আসলে সত্যি সত্যি রাজার-বাড়ি। রাজার-বাড়িই যদি না হবে, মাত্তর কটা মানুষেব খাওয়াদাওয়ার জন্য এমন বাহারের লম্বা একটা ঘর? এভাবে চেয়ারে বসে খাবেন কেন সবাই? ওতে পেট ভরে? এঁটো হয় না টেবিল? না-কী পড়ালেখা খাওয়াদাওয়া ওঠা-বসা সবই চেয়ারটেবিলে সাহেববাড়িতে? গরম গবম ফুলকো লুচি দাদাবাবু-দিদিমণিদের টেবিলে। ভাজাভুজি ইলিশ মাছ, মাংসের ঝোল। শুধু সাহেবের জন্য তেলঝালমশলাপাতি বাদ দিয়ে আলাদা রান্না—বড় একটা চিনেমাটিব বাটি ভরে মুরগির মাংসের সুক্তো। ওকেই ইস্টু বলে? এক সন্ধেয় অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে রাধা। কিংবা তাব চোখেব ধাঁধায় হেঁয়ালি হয়ে ওঠে সবটাই। শীতের সময দেশগাঁয়ে বাবুদের ছেলেবা শখ করে মাঝেমধ্যে যে চড়ুইভাতি করে, সে-সব গাছতলায হয়। সাহেববাড়িতে নিত্যি চড়ুইভাতি দুবেলা?

দুটো চেযারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই মেয়েকে মাছের-কাঁটা বেছে দিচ্ছিলেন মা-ঠাকরুণ। হঠাৎ বললেন—'আমাদের কালী যে ওদের গ্রাম থেকে একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে, দেখেছ ওকে?'

এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাধার দিকে চোখ—'এই শোন্, ধ্যাত্তেরি তোর নামটাও তো মনে থাকে না ছাই। রাধা....বাধাই তো বললি....'

খোলাখুলি দরজায় ছিল না রাধা। পাল্লার পেছনে নিজেকে আড়াল দিয়ে উঁকির্ঝুকিতে দেখছিল আজব স্বপ্নের ছবি। ছোটদের কথাবার্তা, দুষ্টুমি, খেতে-না-চাওয়া, মায়ের ধমকানি, সাহেবের আলগা হাসি, চিনেমাটির বাসনে টুংটাং চামচের শব্দ—মানুষের আহারও যে কখনও এমন সুমনোহর দৃশ্য হতে পারে, তার ছোট্ট মগজটুকুর পক্ষে একসঙ্গে সম্পূর্ণ ছবিটা অতিরিক্তই হয়ে যাচ্ছিল কিছুটা। কিন্তু মোহ থাকে। অন্যের পরিতৃপ্তিকে নিজের মুগ্ধতায় উপভোগ করার লোভ। পালিয়ে যেতে পারছিল না কোথাও। অথচ এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার বিপদ—আচমকা ডাক পড়েছে তার। তাকে সাহেব ছুঁতে হবে।

হৈহুল্লোড় থামিয়ে সবগুলি চোখ মোড় ঘুবেছে তার দিকে। সাহেবও পেছন ফিরে তাকিয়েছেন একপলক। রাধা তাব বুকের টিপটিপে বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে। বেরুতেই হবে তাকে।

ধমকে উঠলেন মা-ঠাকরুণ—'কি রে, ওরকম করছিস কেন? তোকে গিলে খাবে নাকি কেউ? এরকম করলে কাজ করবি কী করে তুই? আরো চটপটে হতে হবে তোকে। আয়, আয় শিগগির....'

এক-বুক ধুকপুকানি নিয়ে এগোল বাধা। তকতকে মোলায়েম পাথরের কাঁথায় পা পড়ে। বুঝি হড়কে যাবার ভয়। বর্ষার জলকাদায় গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় যেমন পা ফেলার ঝকমারি। সর্বত্রই বিপদ একই রকম।

'ইজ সি এ ভিলেজ গার্ল মাম্‌মি? সি নোজ সুইমিং....'

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! ওটুকুন মেয়ে? অ্যান্ড সি উইল ওয়র্ক ফর আস?'

'আই মাস্ট বি ওন্ডার দ্যান হার। সি উইল হ্যাভ টু কল মি দিদি....'

সন্তানদের এবম্বিধ সংলাপাদি সত্ত্বেও নিরুত্তাপ নিশীথরঞ্জন টেবিলে দুটো কনুই ঠেকিয়ে একটা মুরগির ঠ্যাং দুহাতে দুদিক থেকে ধরে টুকটুক মাংস ছিঁড়ছিলেন দাঁতে। পাশ ফিরে তাকাতেই, অদ্ভুত ভুতুড়ে কাণ্ড....মেয়েটা নেই।

উচ্ছল হাসিতে হাসিতে ভরে উঠল ঘর। ফান, এ গ্রেট ফান্। তামাশা মজাদার।

খুঁজে পাওয়া গেল ওকে। টেবিলের ধার ঘেঁষে নিশীথরঞ্জনের পায়ের কাছে।

টেবিলের তলায় অন্ধকারে সাহেবের পা খুঁজে বের করার দিগদারি ছিল। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ইঁদুরের মতো ঠোকরাতে হতো এদিক ওদিক। ররং তার চেয়ে বাধা নিজেকেই পুষ্যির আদলে বদলে ফেলল হঠাৎ। বশংবদ বেড়াল হয়ে গেল। টেবিলের কাছাকাছি পৌছেই টুক করে বসে পড়ল নিচে। দুটো পায়ের দশটা আঙুল, হাঁটু এবং একটিমাত্র কপাল একসঙ্গে মেঝে স্পর্শ করতেই, প্রণিপাতে, সর্বাঙ্গ-ঢাকা জামায় পুঁচকে শরীরটুকু একটা ইঁদুরের চেহারাই পেয়ে যায় হঠাৎ। হাত দুটো বাড়ানো থাকে অন্ধকারে সাহেবের পায়ের দিকে। সাহেবদের খাবার সময় যেখানে যেভাবে থাকে পুষ্যিরা।

'হোয়াট? হোয়াট ইজ সি ডুয়িং মা?'

'পেন্নাম করছে বাপিকে? আমরা পুজোর পর মামাবাড়ি গিয়ে দিদাকে যেমন করি?' মুখভর্তি খাবার পুরে গাঁকগাঁক হাসি আর হল্লা বাবনের—'বাট হোয়াই ইন দিস ফ্যাশান? সে-তো শুধু হাত দিয়ে পা ছুঁতে হয়।'

সকলের সঙ্গে কিরণময়ীও দুলে দুলে হাসছিলেন খুব। হাসতে হাসতেই কপট ক্রোধে ধমকে উঠলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। খুব হয়েছে। আর বেশি ভক্তি দেখাতে হবে না তোকে। যতসব পাগলছাগল এসে জোটেও আমার কপালে। নে ওঠ্, ওঠ্ বলছি....'

কিরণময়ীর ডানহাতে এঁটো। নিচু হয়ে বাঁ-হাতেই ধরলেন ওকে। টানতে হলো না। বাধা নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে। তাকে ঘিরে দারুণ মজা, মজাদার কৌতুকের উচ্ছল হাসি। বিপর্যস্ত সে। কোথাও নাজেহাল না হবার বিদ্যে জানা নেই তার।

ডানদিকে চোখ টেরিয়ে তাকালেন নিশীথরঞ্জন। ললাটে ভাঁজ তুলে মাথাটা ওপরে-নিচে মৃদু নাড়লেন বারকয়েক—'কী? মাকে ছেড়ে এসে মন খারাপ লাগছে না তো? এখানেও তো মা আছেন একজন। দাদা-দিদিরা রয়েছে। কোনো ভয় নেই। কিছু দরকার হয় বলবে মাকে। কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে....'

দুটো হাতের মুঠো থুতনির তলায় বুকের ওপর নিয়ে স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে থাকে বাধা। অবাক হলো। এত বড় ডাকসাইটে সাহেব তো তেমন কিছু নন। ওদের গাঁয়ে বিস্তর জোতজমি ধানকলের মালিক গুয়ে হালদারের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেছিল সে। ঢাউশ ভুঁড়ি। থলথল চর্বি ঝুলে ঝুলে পড়ছে সারা গায়ে। কালো ধুমসো বুড়ো হাঁটুর ওপর লুঙি তুলে, উদোল গায়ে চষে বেড়াবে গোটা গাঁ। গরিব ঘরের বাচ্চাবুড়ো কাউকে দেখলেই দাঁত খিঁচোবে। বুঝি সবাই তার চাকরবাকর।

এত এত পয়সার মালিক যে-সাহেব, রাধা তাজ্জব বনে যায়, তার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন আলতো করে। কথাও বললেন দুটো।

সেদিন রাতেই সাহেববাড়ির ছেলেমেয়েরা ঘিরে ফেলল তাকে।

'গ্রামে বাড়ি তোদের? ভিলেজ্রে? স্নেক-বাইটিংয়ে ভয় করে না তোর?'

কথা বলে না রাধা। অবাক চোখে জ্যান্ত পুতুল দেখে।

'নদী আছে তোদের ভিলেজে? রিভার?

'আমরা যে-ভাত খাই, সেই রাইস হয় তোদের ওখানে?'

মাথায়-মাথায় প্রায় সমান দুই দিদিমণির মধ্যে যে ছোট আর সবচেয়ে দস্যি, টুকুশ করে একটা চিমটিই কেটে বসল আচমকা। কাঁদল না রাধা। আঃ-উঃ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সইল ব্যথাটুকু।

যন্ত্রণাটা বাড়ল সে-রাতেই, আরো কিছু পরে। হেঁশেলের কাজকম্মো ফুরলে যখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে সাহেববাড়ি, রান্নাঘরেরই এক কোণে কানা-উঁচু কাঁসি-থালায় ভাতের ওপরই ব্যঞ্জন সাজিয়ে রাধাকে খেতে দিয়েছিল পুষ্পর-মা। বিজলী বাতির তলায় মেঝেয় হাঁটু ভেঙে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে আরো একবার ইলিশ মাছের সুবাস পেল রাধা। চোখ আর জিভের লোলায় হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকার মগ্নতায় তার নতুন উৎপাত। কোথায় ছিল এরা? হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল সাহেববাড়ির ছেলেমেয়েরা। শোবার আগে আকাশ-পরীর আদলে ফুরফুরে রঙিন আলাদা পোশাক ওদের।

'মাই গুডনেস। ইউ আর ফ্রম আঙ্কলস ভিলেজ? দ্যাট বেলমুড়ি?'

'দেখি তো, কেমন ভাত জোটে না তোর?'

'বেলমুড়ি বেলমুড়ি বেলমুড়ি...' কালী আঙ্কলের কাছেই যে-ফানি স্টোরি শুনেছে শিশুরা, সেখানকারই কোনো একজন পুয়োরকে কাছে পেয়ে হাততালি আর হুল্লোড় তুলে ওদের মজা। দারুণ মজা।

অসহায় রাধা দুটো হাঁটুর ভেতর গালশুদ্ধু থুতনি গুঁজে, পাখিরা ঘুমোয় যেভাবে, আরো বেশি মাথা নুয়ে কান চাপল দুহাতে। তারই গাঁয়ের ইস্টিশনের নাম! যে-নাম মুখে আনতে নেই, কানে শুনতে নেই। অপয়া। যে-নাম শুনলে ভাত জোটে না মানুষের, ভাতের-থালার সামনে বসে সেই নামের শ্রবণে একরত্তি শরীরের ভেতর কান্না জমতে থাকে। আরো জোরে কান চেপে, মাথা গুঁজে থরথরিয়ে কাঁপে রাধা।

অথচ তখনও ওর কানের ওপর হামলে ওদের উল্লাস চলতেই থাকে—' বেলমুড়ি বেলমুড়ি বেলমুড়ি....'

'নে, খা না তুই। খা....' রাধার ঘাড়টা ধরল বাবন। জোর করে ওর ঘাড়টাই ভাতের থালায় গুঁজে দিতে চায়—'লেট আস সি হু ক্যান রেসিস্ট ইউ ফ্রম হ্যাভিং ইয়োর ভাত।'

কিন্তু লাঞ্ছনারও শেষ আছে কোথাও। দাদাবাবু-দিদিমণিদের চাপে থেঁৎলে গিয়েও, সাহেববাড়ির-ভাত তার থাক বা না-ই থাক, নেহাতই হঠাৎ, সে ফুঁসে উঠল। ভাতের থালায় বসেই সে কাঁদছে অঝোরে।

নিজের খাবার ফেলে রেখেই ওদিকে কী করছিল পুষ্পর-মা। বাবুদের ছেলেমেয়ের ওপর তার কোনো সামাল নেই জেনেও ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ি—'তোমরা পোলাপানেরা কী আবার আরম্ভ করলা কও দেখি এই রাইত দুপুরে। যাও, যাও, শোও গিয়া। মায়েরে ডাকুম?'

ডাকতে হয় নি। হৈ হট্টগোলের আওয়াজেই ছুটে এসেছেন কিরণময়ী। সন্তানদের বেয়াদপি আর অবাধ্যতায় ক্ষিপ্ত—'এই মাত্র ঘরে শুইয়ে দিয়ে এলাম তোদেব। তোরা উঠে এসেছিস যে বড়? এত সাহস....'

এবং ছোট্ট চড়ুই, ভূমিলগ্ন রাধাকে ভগ্নদশায় খুঁজে পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন আবো—'এ কি, ওকে এভাবে বিবক্ত কবছিস কেন তোরা? নতুন এসেছে বেচারি। এমনিতেই ঘাবড়ে চুপসে আছে। তোদের কথাবার্তা বোঝে নাকি কিছু?'

ভর্ৎসনায় শাসন করলেন ছেলেমেয়েদের। চড় তুললেন। ধমকে ধমকে দবজা অব্দি তাড়িয়ে নিয়ে তাকালেন রাধার দিকে—'নে তুই খা তো, খেয়ে নে। একদম কথা বলবি না ওদের সঙ্গে। ওরা ভীষণ দুষ্টু।'

চলে যাবার আগে জিভ বের করে ছোট একটা ভেংচি কেটে গেলেন ছোট দিদিমণি। কানেব কাছে মুখ এনে দাদাবাবু—'যার নাম রাধা, সি ইজ এ গাধা....'

রাগ করার অবকাশ নেই। কেন না, সাহেবি ভাষা জানে না পূর্ণ নিবক্ষর। অথচ মজা পায়। চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোয় থালাভর্তি ভাত আর ঘিয়ে-ভাজা লুচির সুবাসে, শরীরে ঢেউ-কাঁপানো কান্নার হিক্কায় আর ইলিশ মাছের ঝোলে সবটাই খেলা। সমবয়সীদের সঙ্গে সে-ও একদিন খেলবে এখানে। অনেক মজার মজার খেলা।

সত্যি-সত্যি সব কিছুই খেলা হয়ে উঠল এরপর। সে-এক দুর্দান্ত খেলা।

অচিরেই যথার্থ ভগবতী হয়ে উঠলেন মা-ঠাকরুণ। সবই 'হয়ে-ওঠা'। যেভাবেই হোক, কাউকে কোনো কিছু হয়ে উঠতে হবে জীবনে। অনেক, অনেক পড়ালেখা শেখার দৌলতে যেমন 'সাহেব' হয়ে উঠতে হয়েছে কর্তাবাবুকে। সাহেব হবার সুবাদে তাঁব ঘরসংসার সাহেববাড়ি হয়ে উঠেছে। ইংরেজি ইশকুলে পড়ে ছেলেমেয়েরা সকলেই সাহেব মেমসাহেব। রাধা কিছু-একটা হয়ে উঠতে চাইল।

ইশকুলের গাড়ি আসে সাতসকালে। জলখাবার খেয়ে, একই রঙের স্কার্ট আব টিউলিপে সাজগোজের শেষে বইখাতার ব্যাগ আর ফিলটারের জল কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে যায় দুই দিদিমণি। একটু বেলায় আপিশ যাবার পথে দাদাবাবুকে নিয়ে বেবোবেন সাহেব নিজেই। ইশকুলে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। এত বড় সাহেববাড়ি ফাঁকা হয়ে যায়।

গোটা দুপুর ভগবতী মা-ঠাকরুণের পাযে পায়ে লেপটে থাকে রাধা। কত কত কাজ তার। দোতলা-তিনতলায় সব ঘরে বিছানাপাটি তুলতে হবে তাকে—একা। গুঁড়ো-সাবান ছড়িয়ে জল-ন্যাকড়ায় এত এত ঘর মুছতে হবে—একা। সকালে এসে এঁটো-বাসন আর বাসি-কাপড় সাফসুফ করে ববির-মা চলে যাবার পর একই কাজ বাকি থেকে যায়। নতুন করে চা-জলখাবারের কাপপ্লেট জমে ওঠে কলতলায়। সাফসুফ

করে সাজিয়ে রাখতে হবে—একা। সকলের স্নানের-কাপড় ডাঁই হয়ে উঠতে থাকে বাথরুমে। ধোয়াধুয়ির শেষে ছাদে উঠে তাকেই রোদে দিয়ে আসতে হবে—একা। বোতলেব দুধ আনতে হয় সকালে। হাটেবাজারে দোকানপাটেও যেতে হয় হুকুম হলেই। দুরন্ত ছুটোছুটি দিনভর, রাত প্রায় এগারটা সাড়ে-এগারটা অব্দি। তারই বয়সী কত কত গাঁয়ের ছেলেবা শহরে এসে কাজ করে চাযের দোকানে মিষ্টির দোকানে ছোটখাটো কারখানায়—সে দেখেছে। মেয়ে হয়ে জন্মে তার কপালই বা এমন মন্দ কী? সে-ও সাহেববাড়ির একজন।

একতলায় বাজার-সরকাব বা দারোয়ান বুড়ো নন্দদা, গাড়ির ড্রাইভার কালীজেঠু, রাঁধুনি-বুড়ি পুষ্পর-মা, ঠিকে-ঝি ববিব-মা—সবাইকে নিযে মা-ঠাকরুণ যদি সত্যি দশভুজা, রাধা তাঁর দক্ষিণ হস্তের আয়ুধ হয়ে উঠতে চায়।

বাড়িব ড্রাইভাব কালীধনের সঙ্গে কথায় কথায় একদিন মোটামুটি একটা হিসেব কষলেন গৃহকর্ত্রী স্বয়ং। মুনমুন বাধাব চেয়ে দেড়-দুই বছরেব বড়ই হবে বয়সে। বুলবুলি অবশ্যই ছোট। কমপক্ষে বছব দেড়েকের। একমাত্র ছেলে বাবন সন্দেহাতীতভাবে দাদা। নিদেন বছর পাঁচেকের জ্যেষ্ঠ তো বটেই।

সাহেববাড়ি এসে আধো-আধো বোলে মুনমুনদিদিকে একদিন 'মুন্নিদিদি' ডেকে ফেলেছিল রাধা। চোখে চোখ রেখে ভ্রূকুটি তোলাব তারতম্যে বুলবুলিও দিদি হয়ে উঠল সহজেই—বুল্লিদিদি। তাবপর মাথায় মাথায় একই মাপে তিনজন, ম্যাকসি-মিডি, ম্যাকসিস্কার্ট-ব্লাউজ—একই ধরনের জামায় বড় হতে হতে রাধা যখন পুরোদস্তুর 'কাজের মেযে', প্রায় ঘরেরই মেয়েব মতো, ডাকগুলো পাল্টায না। পাল্টাতে দেয না দিদিবাই — 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওভাবেই ডাকবি তুই। দে সাউন্ড বেটাব...'

'বুল্লি মিন্‌স স্ক্রিমেজ...এ টাশল ইন ফুটবল অ্যান্ড এ বেগুলার টার্ম ইন হকি। মুন্নি মিন্‌স নাথিং।'

'হোয়াই? দ্যাট মিন্‌স মুনলাইক। এনিথিং রিলেটেড টু মুন। আই লুক লাইক এ মুন টু হার...'

'ওঃ, দ্যাট ইজ মুনি, নট মুন্নি ডিয়ার...'

বাধা বোঝে না, কেন এত তককো দিদিদেব? হাঁ হযে তাকিযে থাকে। কী বলল সে? কড়ফড়িয়ে এক গাদা ইংবেজি বেবিয়ে এল তার মতো একটা আকাট মুখ্যু মেয়েব কথায়?

আস্তে আস্তে এভাবেই এক অলীক স্বপ্নে মাখামাখি হযে যেতে থাকে রাধা। দেশগাঁয়েব মাঠে-মাঠে ডোবায়-পুকুবে গেবস্তবাড়িব উঠোন জুড়ে যে-আঁধার বাত্তিব মাসের পনের দিন ভিজে যেত দুধ-শাদা চাঁদনি আলোয়, চাঁদেব দেশে পৌঁছে যাবার পব মাসের একটা দিনেও আব তাব আঁধার রাত নেই। আরো আশ্চয্যি। সাঁঝেব বেলায় আলো জ্বললে ঘর থেকে ঘবে নিত্যিদিন ছুটোছুটিতে ছায়াটুকু পর্যন্ত পড়ে না মাটিতে। পালক ফেলার অবসর পায় না খুদে খুদে এক জোড়া চোখের পিদিম। কান দুটো সজাগ থাকে। তার এক রত্তি শরীর যা পারে, যতটুকু সম্ভব, তাবও চেয়ে আরো

বেশি, অনেক বেশি ঘাম ঝরিয়ে, সবাইকে খুশি রেখে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় চন্দ্রলোকের জমি। যদি এভাবেই পৌঁছে যাওয়া যায় স্বাদেগন্ধে ভবপুর কোনো অলৌকিক স্বপ্নে।

সাহেববাড়ির ঘ্রাণ

লেকটাউন সল্টলেক বাঙুব.....অভিজাত পূর্ব কলকাতার ঘরে ঘরে কোটি কোটি মশা প্রতিদিন সন্ধেবেলা। সুগন্ধী ধূপকাঠি শুধু ঠাকুব-ঘরে। সন্ধেবাতিব সঙ্গে ধুনো দেবার বালাই নেই। জানালাদরজা খোলাই থাকে। কেননা, পুব-দক্ষিণ খোলা ঘরে-বাবান্দায় অঢেল বাতাস। মশা-রুখবাব-জাল দিয়ে ঘিবে দেওয়া হবে দক্ষিণের বারান্দা—এ-বকম একটা প্রস্তাব হয়েছিল এক সময়। কিন্তু সেটা কার্যকর না-কবার হেতু, তুচ্ছ মশাব সঙ্গে যুদ্ধ করে খোলামেলা আলোবাতাস আব দুর্মূল্য সময নষ্ট কবতে বাজি নন সাহেবসুবোবা।

রাধা তাজ্জব বনে যায়, ছোটোখাটো ব্যাপারেও সাহেবদের মগজে কী বুদ্ধি! ঠিক বেব কবে ফেলেছেন একটা কায়দা।

ঘরে ঘরে আজব যন্ত্র? গোল-গোল নযতো চৌকো ছোট ছোট কৌটোর মতো। ভেতরে নীল রঙের একটা বড়ি ঢুকিযে, ঘরের কোণে কোথাও রেখে কিংবা সুইচবোর্ডেও সেঁটে দেওয়া যায—বিজলী বাতির প্লাক লাগিযে দিলেই, অবাক কাণ্ড, মশাগুলো কোথায় উড়ে পালায। কী-নাকি গন্ধ আছে একটা! বাড়িব এত এত মানুষ শব্দ করে লম্বা লম্বা শ্বাস টেনে টেনে অথবা যন্ত্রটার ওপব হুমড়ি খেয়ে পডে নাক ঘষে ঘষেও যে-গন্ধেব হদিস পায় না, মশাগুলি দিব্যি পেয়ে যায়। হয়তো মশা বলেই।

বাধা মশা নয়। মশাব মতো তুচ্ছ কোনো প্রাণী বলেই হয়তো সাহেববাড়ির বাতাসে বাতাসে সে একটা মিষ্টি সুবাসেব আভাস পায, যাকে সে চেনে না। এমন কত কত গন্ধ আছে দুনিয়ায যাব কোনো ধরন নেই, প্রত্যক্ষ কোনো উৎস নেই। অনেক...অনেক কিছুব মিলমিশে অদ্ভুত একটা বাস। বর্ষার প্রথম জলে দেশগাঁয়ের কাদামাটি ঝোপ-জঙ্গল বুনো ঘাসে ঘাসে যে-সোঁদা গন্ধ কিংবা ডেটল আয়োডিন ফেনায়েলেব মাখামাখি ঘ্রাণে যেমন চেনা যায় হাসপাতাল, গা-ঘুলনো হতচ্ছাড়া তেমন কোনো চেনাজানা বাস নয। সাহেববাডির অচিন ঘ্রাণ! তার জাতই আলাদা। হাজার বলেও সে বোঝাতে পারবে না কাউকে—কী সে ঘ্রাণ? কেমন তার আদল? ধূপে চন্দনে ফুলে ফুলে ঠাকুরঘর বা মন্দিরেব মিষ্টি আঘ্রাণে পাপী-তাপীব মনও যেমন করে উদাস হয়ে ওঠে, এক-বস্তি বাচ্চা মেয়েব বুক ভবে সেই ভক্তি। ভক্তিব টান। সাবাদিন সাবাক্ষণ, এমন-কি ঘুমের মধ্যেও কোনো কোনো দিন টেব পেযে যায—গন্ধটা আছে। একই ভাবে আছে তার সঙ্গে। হয়তো-বা সে-তার নাকেরই কোনো কঠিন অসুখ। তাই যদি না হবে, তবে সাহেববাড়িব আরো হাজারগণ্ডা সুবাসে-কুবাসে সেই পাগল-করা অলীক গন্ধ

তাকে নেশা ধরিয়ে রাখবে কেন দিনভর রাতভর? হেঁসেলে প্রতিদিনের কাজেকর্মে ঘি-মাখন-মাছ-মাংস হরেক মশলাপাতির জগাখিচুড়িতে যে-উগ্রতা, অথবা ওঁদের বাথরুমে ঢুকলেই তেল-শ্যাম্পু-সাবানের যে-হালকা আমেজ বা দিদিমণিদের ড্রেসিং-টেবিলে স্নোপাউডারসহ হরেক প্রসাধনসামগ্রী বা মায়ের মুখের দামি জর্দা বা দাদাবাবুর গোপন সিগারেট বা সাহেবের আফটার শেভ্ লোশন বা ফুলদানিতে তাজা রজনীগন্ধা বা কোথাও বেরুবার প্রস্তুতিতে ওঁদের জমকালো পোশাকে দামি সেন্ট বা আতর......সবই সুখকর ঘ্রাণ। রাধা নিঃসন্দেহে মাতাল হতে পারে। কিন্তু তার নাকের ব্যামো বা সেই সুখের সুবাসের সঙ্গে এ-সবের কোনো মিল নেই। সে জানে খুদে মশা বা পিঁপড়ের যাদু। ডায়মন্ডহারবারে মেঘ জমলে কলকাতার ছাদে কাপড় তুলতে যায় যে-মেয়ে অথবা দিদিমণিদের ছাড়া-কাপড় কাচতে বসে শুধু নাকে শুঁকেই আলাদাভাবে চিনে নিতে পারে কোন্ জামাটা কার গায়ে ছিল—সেই মেয়ে বুঝে নিতে পারে না নাকছাবির মতো তার নাকের ডগায় সেঁটে আছে কোন্ অচেনা সে-ঘ্রাণ? সাহেববাড়ির গোলকধাঁধায় সে নাক সিঁটকোয় না কোনোদিন। ওঁদের টয়লেটের কমোড সাফ করার সময় অ্যাসিড আর ফেনাইলের যে-উৎকৃষ্ট গন্ধ বা রান্নাঘরের সিলিন্ডারের গ্যাস লিক করলে যে-বিদঘুটে নাকের-জ্বালা ও ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুললেই যেভাবে এক ঝলক ন্যাপথলিনের ঝাপট বা মাঝেমধ্যে রাত্তির বেলা সাহেব ঘরে ফেরার সময় মুখে যে-ভোঁটকা গন্ধ নিয়ে ফেরেন—সেখানেও তার নিত্যসহচর দুর্জ্ঞেয় ঘ্রাণের হদিস থাকে না কোথাও। অথচ গন্ধটা থাকে। অতীব বাস্তব। সবার অলক্ষ্যে সাহেববাড়ির ঘরে ঘরে হরেক রঙের দেয়ালে, জানালা দরজার পাল্লায় পর্দায়, পায়ের তলার পাথরের কাঁথায়, খাটপালঙ্ক সোফাকোচ টেবিলচেয়ার ডিভান আলমারি সর্বত্রই লাফিয়ে লাফিয়ে মাছির মতো শুঁকে শুঁকে খুঁজে বেড়িয়েছে অপরিচয়ের ঘ্রাণের সন্ধান, যা তার একান্ত আপন, শুধুই তার নিজের, তার একার। পিঁপড়ের মতোই প্রাকৃতিক বা নিদারুণ নাসিকাব ব্যাধি। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা হালকা মিহি একটা সুগন্ধী সকালসন্ধে লেপটে থাকে তার নাকের ফুটোয়। সাহেববাড়ির তাল-তাল জিনিসপত্রের কোথাও সে-ঘ্রাণ নেই। অথচ শুধুমাত্র সাহেববাড়িতেই পাওয়া যায় যাকে। সব মিলিয়ে-ঝুলিয়ে এ-শুধু আস্ত সাহেববাড়ির ঘ্রাণ।

সাহেববাড়ির রং

দোতলায় চারপাশের ঘর দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটা ফাঁকা জায়গা। সাহেববাড়ির নিয়মে ‘লিভিংরুম’ বা ‘লাউঞ্জ’। রাধা বলে—‘উঠোনের ঘব’।

দু’পাশেব দেয়াল ঘেঁষে অনেক লম্বা করে নরম গদির আসন এক কোণে এসে মিশেছে। আলাদাভাবে সোফাসেট সেন্টার-টেবিল। একদিকে বড় পেতলের টবে রবার গাছের চারা বেড়ে উঠছে। অন্য দিকে প্রকৃতির আলোবাতাস ছাড়াই মানিপ্লান্টের লতা দক্ষিণের ফাঁকায় বিস্তীর্ণ গ্রিল বেয়ে ঘন সবুজ। দেয়ালে দেয়ালে বাহারের ওয়ালল্যাম্প,

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-মা স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজি আর ইন্দিরা গান্ধীর বড় বড় ফোটো। এখানেই, সকলের নজর পড়ে এমনভাবে পুব দিকের দেয়াল ছুঁয়ে টি ভি, ভি সি আর।

উঠোন-ঘরের আরেক ধারে শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর বেশ বড়সড় মাপের একটা অ্যাকুরিয়াম। মাছও পোষেন সাহেবরা? গায়ে হরেক রঙের ছোপ-লাগানো ছোটবড় নানান জাতের মাছ। দাদাবাবু-দিদিমণিদের হাজারগণ্ডা দামি-দামি খেলার পুতুল। ভেঙেচুরে অকেজো হয়ে যাবার পর, নয়তো মায়ের ঘর-সাজানোর আলমারিতে ঠাঁই পেয়ে গেলে শুধু এই একমাত্র খেলা টিকে থাকে—কাচের বাকশোয় রঙিন মাছ আস্ত আর জ্যান্ত। রাতদিন অনেক খেলা খেলতে খেলতে যেমন কোনো খেলাতেই আর মন থাকে না ওদের, মাছের ঘরের ধারেকাছেও আজকাল আর আসে না কেউ! রাধাকেই দেখতে হয়। মাসে অন্তত একবার সব মাছ আলতো করে সরিয়ে গোটা মাছের ঘরকেই ধুয়ে মুছে সাফ করতে হয়—চারপাশের কাচ, ভেতরের প্লাস্টিকের গাছপালা, পাথরের কুঁচি, বুদবুদ তোলার যন্ত্র। পুরো একটা সকাল লেগে যায় তার। এ-ছাড়াও কাচের টিউবে কেঁচো ভবে খাবার দেওয়া নিত্যি তার কাজ। ক্লান্তি নেই রাধাব। সাহেববাড়ির অগুনতি কাজকর্মের ভিড়ে বরং বড় শখের কাজ এটা। এক সঙ্গে এত রং? বাকশোর ভেতরকার নীল বাতি জ্বেলে দিলে নীল জলে হরেক রঙের চিত্তির-আঁকা মাছেরা স্বপ্নের ছবি হয়ে ওঠে। পলক না ফেলে রাধা তাকিয়ে থাকতে পারে অনেকক্ষণ। কাজকর্মের ফাঁকে, অবসরের দুপুরে যখন বকুনিঝকুনির ভয় বা ফাইফরমাস নেই, মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে কাচে নাক ঠেকিয়ে একা চুপচাপ বসে বসে দেখে মাছের খেলা।

জলের মাছও যে প্রজাপতির মতো রংবেরঙে এমন সুন্দর হতে পারে, কোথায় এদের চাষ হয়—কোন্ নদীতে কোন্ পুকুরে, জানে না সে। দিন নেই রাত নেই, একটা কাচের বাকশোয় হরেক জাতের এতগুলো মাছ সাঁতার কাটে অষ্টপ্রহর। বিশ্রাম নেই, জিরোনি নেই, ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, গায়ে গায়ে লাগছে না কেউ কারুর। শুধু পিংক রঙের ফাইটারটা! বড্ড দস্যি আর বেয়াড়া-গোছের একটা মাছ। রাধাব ভীষণ রাগ ওর ওপর। সবার মতোই তো দিব্যি খাচ্ছিস-দাচ্ছিস চরে বেড়াচ্ছিস রে বাপু। তোর অত মাতব্বরি কেন সবার ওপর? ইচ্ছে করলেই লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন সে সরিয়ে দিতে পারে গুন্ডাটাকে। বলবে—মরে গেছে। কিন্তু সাহস হয় না। ধরা পড়লেই বিপদ। দাদাবাবুকে ভয়। এই দস্যিটাই সবচেয়ে বড় পুষ্যি দাদাবাবুর। তাব চেয়ে বরং অনেক ভালো লাগে পম্পলেট মাছের মতো দেখতে লম্বা লম্বা শুঁডওলা অ্যাঞ্জেল দুটোকে। মনে মনে ওদের দুজনকে সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। বর-বউ কখনও মুখোমুখি হয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে বড্ড দুঃখু হয় তার। সাদা-কালোয় ডোরাকাটা কুলিলোকগুলো কী বিচ্ছিরি! কেঁচোর মতো দেখতে। তার চেয়ে হলুদ পুঁটিমাছেব আদলে রোজি-বার্ব অনেক ভালো। লাল হলুদ গোলাপী হরেক রঙের বাহারে চটকদার সোর্ড-টেল গোল্ডফিস গাপ্পি। সারা গায়ে বুটি-বুটি পার্ল গোরামিন। জেব্রা গোটা তিনেক। খুদে খুদে ব্ল্যাকমলি অনেকগুলো।

রঙিন জলে বঙিন মাছ। কাচের বাকশোয় আস্ত একটা রঙিন পুকুর। হাঁ হয়ে

তাকিয়ে থাকার নেশায় রঙের খেলা দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে গোটা সাহেববাড়িটাই মাছের-ঘর হয়ে ওঠে একদিন। রাধা নিজেই সেখানে কোনো ব্ল্যাকমলি।

মাছের ঘরের ঢঙেই রঙে রঙে ঘর থেকে ঘরে বদলে যায় সাহেববাড়ির দেয়াল মেঝে বা মেঝের নকশা। ওপাশে সাহেব আর মায়ের ঘরের দেয়াল গোলাপী, তিনতলায় দাদাবাবুর ঘর হালকা সবুজ। মুন্নিদিদির ঘর হলুদ রঙের। মাঝখানের দরজা ডিঙোলেই বুল্লিদিদির ঘরে শেলেট রঙের দেয়াল। খাবারঘরে হালকা গোলাপী ফিরে আসে আবার। উঠোনের ঘরে সবটাই অদ্ভুত শাদা। শুধু চুনকাম নয়। প্লাস্টিকের-রং না কী যেন বলে ছাই। অনেক পয়সা খরচা। রাধা সে-সব হিসেব জানে না। ঘরে ঘরে দেয়ালের রঙে রং মিলিয়ে পাথরের-কাঁথার রং, রঙের নকশা পুরোটাই বদলে যায় অন্য ঘরে। যে-ঘরে যেমন রং, একই রঙে হবে জানালায় দরজায় পেলমেটের পর্দা। বিছানার বালিশ পাশবালিশ চাদর যদি একই রং, একই নকশায় ঘরের রং থেকে যদি আলাদা, বেডকভারকে পেতে হবে ঘরের রং। যেভাবে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ মেলান মা, ওড়না-শালোয়ারের সঙ্গে কামিজের রং-মিলান্তি দিদিমণিদের, প্যান্টের সঙ্গে শার্টের হিসেব সাহেব আর দাদাবাবুর — একইভাবে ঘর সাজাতে অসংখ্য রঙের-অঙ্ক কষতে হয় মাকে। রাধা তাঁর পাশে পাশে থাকে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুললেই এক ঝলকে কত যে রংবাহারি শাড়িব্লাউজ শার্টপ্যান্ট পোশাক-আশাকের জেল্লা! সন্ধেবেলা টি. ভি.-তে বসলে বা ভি. সি. আর.-এ নিত্যি নতুন বইয়ে রং...রং...রং, মাত্তর দুটো চোখে সামাল দেওয়া যায় না, ফিনকি দিয়ে রং ছোটে এমন। সাহেববাড়ি মানেই রং, রঙের চিত্তির, ফাগের উৎসব।

চোখ ধাঁধিয়ে থাকে রাধার। সে-আবেক যন্ত্রণা। যন্ত্রণাও সুখ। দেশগাঁয়ের বাড়িতে আকাশ-মাটি-গাছপালা-ফুল-ফল-পাখি দেখে দেখে শাদামাটা যে-কটা রং জানা ছিল, তাই নিয়ে চোখ দুটো ঠাণ্ডা ছিল বেশ। কিন্তু সাহেববাড়িতে কী কারুর মুখ্যু থাকলে চলে? আর-সব বুড়োবুড়ি দাসীবাঁদিদের কথা আলাদা। কাঁচা বয়সের টানে দাদাবাবু-দিদিমণিদের সঙ্গে যতটা সম্ভব পাল্লা দিয়ে ছুটতে চেয়ে, হয়তো দম থাকে না সব সময়, খেই হারিয়ে যায়। তবু লেগে থাকার জেদটা জিইয়ে রাখতেই হয় তাকে। চিনে নিতে হয় বর্ণময় পৃথিবীর রূপ।

শুধু লালই তো কত রকমের হতে পারে! স্কার্লেট লাল ক্রিমসন লাল সিঁদুরে-লাল কমলা-লাল। পিংক কি লাল রং? কক্ষনোই না। বেগুনি বলে যাকে, মভ বা মেজেন্টার সঙ্গে তার অনেক ফারাক। সবই প্রায় ইংরেজি নাম। সাহেববাড়ির ভাষায় নামগুলি থাকে। রাধা দেখে, রাধা শোনে। মনে রাখার চেষ্টা করে। নীল রংয়ের কটা জাত? আকাশী-নীল তুঁতে-নীল। নেভি-নীল সে চেনে। কোবাল্ট নীল না কী যেন আছে একটা নাম। ঠিকমতো বোঝে না। শাদা বাংলায় যাকে বলে খয়েরি রং, তাকেই বলে আম্বার? সেদিন মায়ের একটা নতুন শাড়ি নিয়ে জোর তককো বেধে গিয়েছিল ওদের দাদা-বোনদের মধ্যে— সবুজ! সবুজ মানে কী? এমারেল্ড গ্রিন না অলিভ গ্রিন? দূরে দাঁড়িয়ে শোনে রাধা। শব্দগুলো খটমটে। মনে থাকে না সব সময়। চোখে যা দেখে, ফারাকটা বোঝে। সাহস হয় না মুখ ফুটে বলার। কিছু বোঝাতে গেলেই যদি ঠোঁট আর জিভের ডগায় বেরিয়ে আসে বুলু গিবিন এসকার্লেট কিরিমসন শব্দগুলি?

হৈচৈয়ের হাসাহাসিতে ফেটে পড়বে ওরা। বেলমুড়ি-বেলমুড়ি করে চেঁচাবে দাদাবাবু। ভীষণ রাগ হয় রাধার। দেশগাঁয়ের নাম করে খ্যাপালে কার না রাগ হবে?

নিদারুণ চক্ষুরোগ। এক জোড়া জ্যান্ত চোখ নিয়ে তার নতুন বিপদ—প্রতিদিনের চলায়-ফেরায়, দিনভর রাতভর জেগে থাকায় তাকে শুধু রং দেখতে হয়। চতুরতায় ইংরেজি নামগুলি শিখে ফেলার পরও সাধ করে বলা যাবে না কাউকে। সাহেববাড়িতে মুখ্যু মেয়ে মুখ্যুই থেকে যাবে চিরকাল! সে-আরেক জ্বালা।

কিংবা তার চোখের অসুখ আরো জটিলতর। নিজেকে নিয়ে আবার বিপন্ন রাধা। সাহেববাড়ি আসার আগে এমন করে জানা ছিল না তার, জগতের সব কিছুই এমন রংদার। মানুষের তৈরি সব জিনিসপত্রেরও একটা রং থাকে। দুটো চোখ আসলে এই রংবেরঙের বাহার দেখার জন্য। শাদাও একটা রং। মুন্নিদিদি বুঝিয়েছিলেন একদিন। ওদের ইশকুলের বইয়েও নাকি লিখেছে— কোন্ কোন্ সাতটা রং মিলমিশ করে যে-রং হয়, সেটাই শাদা। কী আশ্চয্যি! তাহলে তো তার গাঁয়ের গরিব বিধবা মা শাদা থানকাপড়েও রঙিন?

তিন মাস চার মাস বাদে বাদে সাহেববাড়ির ছুটি নিয়ে মা-ভাইয়ের কাছে গ্রামে আসে বালিকা। মন টেকে না। চোখের আধিব্যাধিও আরেক নতুন ঝঞ্ঝাট— সেখানেও খোলা চোখে কিছু-না-কিছু রং দেখতে হয়। আকাশ মাঠ গাছপালা ফুল ফল পাখি — শাদামাটা চোখে কোনো একদিন যা সহজ ছিল, আজ সাহেববাড়ির চোখে রং মেলাতে গিয়ে হিসেব মেলে না। ডাক পাখির গায়ের রং কি শাদা? না-কি হালকা ছাই রং? কচি কলাপাতার রঙকে টার্কিশ ব্লু বলবে কেন ওরা? কেন হালকা সবুজ নয়? শেয়ালকাঁটা গাছের রঙই তো খাঁটি-খাঁটি তুঁতে-নীল। দেশগাঁয়ের গাছপালা আকাশমাটি ফুলফল পশু পাখি—বড় একঘেয়ে শাদাসিধে। যেমন-যেমন হয়, সে-রকমই। পয়সার রং নয়। পয়সার রং মানুষের ইচ্ছের রং। বাহার অনেক বেশি। গ্রাম ছেড়ে পালাতে চায় মন।

গাঁয়ের মানুষ মেয়েটাকে মাথা-খারাপ ভাবল সবাই। রাধা সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যায়। শহরে যাবার আগে কনকনে শীতের ভোরে লাফিয়ে উঠে পড়ল আমগাছের ডালে। ছিঁড়ে আনল কচি তাজা নতুন আম্রপল্লব। পৌষ মাসের শেষে আমগাছের নতুন পাতা। দাদাবাবু-দিদিমণিদের উপহার দেবে। আসল ইয়েলো অকার-ওরা দেখে নি কখনও।

সাহেববাড়ির ধ্বনি

সাহেববাড়ির সুখে মাঝেমাঝে মায়ের জন্যে ভাইয়ের জন্যে আইঢাই করে বুকের ভেতরটা। গাঁয়ে এলে মন টেকে না মেয়ের। দিন রাত্তির সব সময়ই চারপাশটা কী ভীষণ শান্ত চুপচাপ।

সাহেববাড়ির দুপুর বেলাটাও এ-রকমই থমথম নিঝুম। বড্ড বিচ্ছিরি। কী যে

এক নতুন ব্যামো ধরেছে কানের ফুটোয়, চারদিক শুনশান ঘ্যাম মেরে থাকলেই ঝিঁঝির-ডাকের মতো সর্বক্ষণ ভঁ-ভঁ করে ভেতরটা। নিজেকে বধির মনে হয়।

বেলা দশটা নাগাদ অফিসে চলে যান সাহেব। দাদাবাবুর ইশকুল দুপুরে। ওদিকে দুপুর বারোটার আগেই ইশকুলের-গাড়ি এসে পৌঁছে দিয়ে যায় দিদিমণিদের। মেয়েদের স্নান করিয়ে, নিজের সঙ্গে বসিয়ে মা-র খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে বেলা প্রায় একটায় পৌঁছে যায় ঘড়ির-কাঁটা। একতলার সদব দরজায় কলাপসিবল গেট টেনে, যদিও জেগে থাকার কথা, বুড়ো নন্দদা খাটিয়া টেনে ঝিমোয় গোটা দুপুর। মেয়েদের ঘুম পাড়ানোর জন্য মায়ের হাঁকডাঁক থাকে দোতলায়। ঘুমোয় না কেউ। মটকা মেরে থাকে বিছানায়। মাত্র দুটি মেয়ের হুড়োহুড়িতে ভরে ওঠে না এত বড় বাড়ির শূন্যতা। রাধাকে ওরা তিনের মধ্যে চায়।

কিন্তু রাধাব কাজ ফুরোয় না তখনও। বাথরুমে নতুন করে জমে-ওঠা ওদের স্নানের জামাকাপড় ধুয়েটুয়ে ছাদে দিয়ে এসে. পুষ্পর-মা বুড়ি বলেই তাঁর সঙ্গে হাতে-হাতে রান্নাঘর গোছগাছ সাফসুফের কাজকম্মো সেরে নিজের স্নানাহার চুকোনোর পরও মায়ের শিয়রে গিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হয় তাকে। শোন দিয়ে খুঁজে খুঁজে মাথা থেকে গোটাকয়েক শাদা চুল তুলে দেবার কাজটুকু তার আবশ্যিক ডিউটি না হলেও প্রাত্যহিক। মায়ের জন্য তার নিজস্ব ভালোবাসা। মায়ের কাছে তাঁর মেয়ে হয়ে ওঠা। পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দেবে বুল্লিদিদি। পেছন ফিরে নিঃশব্দে চোখ টিপবে রাধা। রঙিন-ছবিওলা সিনেমা-পত্রিকা বুকে নিয়ে পড়তে পড়তে মা হাই তুলবেন এক সময়। তখনই সত্যিকারের উসখুসটা চাগিয়ে ওঠে একরত্তি বুকের ভেতর। ঘন ঘন পেছন ফিরে পর্দার দিকে চোখ। এবং তখন আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে গাঢ়তর মনোযোগে চুল-তোলার ভান। চুল-তোলার চেয়ে ব্রহ্মতালুতে আঙুলের সুড়সুড়িটা বাড়িয়ে দেওয়া শুধু। আরামে আরামে ঘুমিয়ে পড়বেন মা। যতক্ষণ না চোখ বুজে অসাড় হচ্ছেন, সময়ের প্রতীক্ষা। হাত থেকে আস্তে আস্তে পত্রিকাটা খসে পড়ার পর, ছোট কবে ঠোঁটদুটো হাঁ হয়ে এলে, বোজা চোখদুটোকে বারকয়েক পরখ করে সন্তর্পণে পা তুলে, খাট থেকে নেমে, ঘুমন্ত মায়ের দিকেই চোখ রেখে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে-আসা এবং দরজা ডিঙোলেই মুক্তি। অবাধ স্বাধীনতা।

দিদিমণিদের ঘরে ক্যারম লুডো চাইনিজ-চেকাব, চাই কি, কোনো কোনোদিন একতলা দোতলা তিনতলা সিঁড়িবারান্দাছাদ দাবড়ে বেরিয়ে চোর-চোব খেলা। গোটা বাড়িতে যদি তখন মা-ই একমাত্র বাঘ-ভাল্লুক, ঘণ্টা দেড়-দুই যতক্ষণ ঘুমোবেন, একতলায় নেমে এসে অথবা তিনতলার ছাদে উঠে তিনজনের তুমুল হৈচৈ।

আসলে ঠাণ্ডা ববফ গোছের দুপুরটাই বড় দুঃসহ সাহেববাড়িতে।

কিংবা কোনো খেলাই নয় কোনো কোনোদিন। বড্ড ডাকাবুকো তেরিয়া মেয়ে বুল্লিদিদি। এটুকুন বয়স। ভয়ও করে না কাউকে। ঘাঁটঘুটও জানে সব। উঠোনের-ঘরে এসে নতুন বা পুরনো, হাতের কাছে যা-পাবে, যে-কোনো ক্যাসেট চালিয়ে দেবে ভি. সি. আব-এ। নয়তো টেপ-রেকর্ডারে কোনো ঝমঝমানি উদ্দাম গান। সঙ্গে সঙ্গে রক্তে রক্তে ঝলকানি দিয়ে তাজা হয়ে ওঠে শরীরটা। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে নাচে বুল্লিদিদি।

টেনে নেয় রাধাকে। রাধা নাচতে জানে না। লজ্জা পায়। নাচের চেয়ে খলখলিয়ে হাসে বেশি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। পাশেই জোর হাততালি মুন্নিদিদির।

এই গান— হিন্দী ফিলমি গান, সাহেবি নাচের গান সারাক্ষণ জমজমাটি রাখে সাহেববাড়ি। বাড়িতে দু-দুটো স্টিরিও ক্যাসেট টেপরেকর্ডার। একটা দাদাবাবুর ঘরে —ছাদে। অন্যটি দোতলায় এজমালি উঠোন-ঘরে। প্রায় রোজই গানের ক্যাসেট কেনা হচ্ছে। নিত্যি নতুন হিট গান। ক্যাসেটের পাহাড় জমে উঠছে। নষ্ট হচ্ছে কত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকছে এখানে-ওখানে। হট্টগোলের গান বা গানের হট্টগোলে পূজাপ্যান্ডেল কি বিয়েবাড়ি প্রতিদিন। রাতদিন ঘরকন্নার কাজের চাপেও বুঝি কোনো পাল-তোলা নৌকায় সারাক্ষণ দোল খায় রাধা। অঙ্গে অঙ্গে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে। কী যে হয় শরীরেব ভেতরটা! কিশোরকুমাব হোক কিংবা মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকার নয়তো আশা ভোঁসলে...একই গান হাজারবার শুনে পচে পচে হেজে যাক, হাড়পাঁজর কাঁপিয়ে গোটা শরীরটা ভেতবে ভেতরে গান গায়। কথাগুলো মুখস্থ, মানে জানে না সবটা। সুরগুলো চেনাজানা, গাইতে পারে না ছিটেফোঁটা। তবু গানে গানে এভাবে ঘরবাড়ি গমগমিয়ে থাকলে কী এক অদ্ভুত দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় শিরায় শিরায় রক্তের চঞ্চলতায় একটা নেশার মাদকতা। কী গান, কেমন গান, সে-গান আদৌ হয়তো শোনার জন্যই নয়। চারপাশ ঘিরে একটা ঝড়। ঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-থাকা। চাঙা হয়ে ওঠে গা-গতর। সুখের ঘরে রাধা গরিবি ভুলে যায়।

তিনতলায় ছাদের ট্যাঙ্কে জল-তোলার পাম্প একতলায় আচমকা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হয়, দারুণ অস্বস্তি— ম্যারাকাসের হল্লা-তোলা আর দারুণ হৈ চৈয়ের কনসার্টে চড়া গলার চড়া সুরের গান থেমে গেলে কানের ফুটোয় সেই ব্যাধি —বধিরতা। তালা ধরে থাকে অনেকক্ষণ। সইতে পারে না নিঝুম।

সাহেববাড়িতে এসে প্রথম দিনই প্রেসার কুকারের মাথায় হুইসল বেজে ওঠার আওয়াজে দুহাতে কান চেপে ধড়ফড়িয়ে কেঁপে উঠেছিল যে-মেয়ে অথবা টেলিফোন বেজে উঠলে ঘন ঘন ছুটে-আসা যার বিস্ময়ের স্বভাব ছিল একদিন, জানা ছিল না তার—ইস্তিরি-করা পাট-ভাঙা বাহারি সাজপোশাকের আদলে ঝলমল যে-সাহেববাড়ি, যেখানে ছুঁচো নেই ইঁদুর নেই উই-আরশোলা নেই, যাদের ঘরে কালেভদ্রে একটা টিকটিকি পর্যন্ত ডাকতে সাহস পায় না কোনোদিন, সেখানেও শব্দ থাকে, আওয়াজ থাকে। হরেক রকম সুরেলা ধ্বনি—মায়ের ঘরে পুরনো একটা দেয়াল ঘড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং ঢং, ওঁদের খাবার-টেবিলে চিনেমাটির কাপপ্লেটে কাঁটা চামচে টুংটাং টুংটাং, বাথরুমে শাওয়ার খুলে দিলে অঝোর বৃষ্টিপাতে ঝমঝম ঝমঝম, মায়ের দু-হাতে শাঁখাপলালোহার সঙ্গে খাঁটি খাঁটি সোনার বালাবাউটিচুড়ির মৃদু রিমঝিম কিংবা গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে কালীজেঠু যেমন করে ওপরতলায় জানান দেবেন হর্ন বাজিয়ে বাজিয়ে অথবা নন্দদা সদরে না থাকলে যেভাবে কলিং-বেল বেজে ওঠে নিচের-তলা থেকে— এভাবেই আরো অনেক কিছু নৈঃশব্দ্যের ধ্বনি সাহেববাড়িতে থেকে যায় দেশপাড়াগাঁয়ের পাখির-ডাক ঝিঁঝির-ডাকের মতো। শব্দগুলি এখন আর তেমন করে কানে বাজে না রাধার।

এক সময় পাথরের-কাঁথায় রবারের স্লিপারে পা ফেলে সাহেব এগিয়ে এলে দূর থেকেও শুনতে পেত সে।

কিংবা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই নিঝুমই অগাধ সুখ হয়ে ওঠে চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিতে। দেশের বাড়িতে যেভাবে এক সঙ্গে দল বেঁধে বসে মঙ্গলচণ্ডী বা পুণ্যিপুকুরের ব্রতকথা শোনে মাসিপিসি বউ-ঝিরা, সাহেববাড়ির দোতলায় উঠোনের-ঘরে বসে যায় সবাই। অথবা সময়মতো বসতে হবে বলেই দ্রুত হাতে সব কাজ সেরে নিতে হয় চটপট। নতুন ক্যাসেট এসে গেছে ভি. সি. আর.-এ। রাত জাগতে হবে অনেক। নয়তো রোজকার টেলিভিশন— কবে কখন কোন্ চ্যানেলে কী সিরিয়াল, সপ্তাহ ভরেই রোজই প্রায় নতুন নতুন মজাদার নাচগান, নানান অনুষ্ঠান, হরেক বিজ্ঞাপনে চোখের ধাঁধা, শনিবার সন্ধেয় বাংলা ছায়াছাবি, রবিবার সন্ধেয় হিন্দি। বছর ভরেই খেলা খেলা...হরেক খেলা। হকি টেনিস গোছের সাহেবি খেলাটেলা হলে তেমন চনমনানি জাগে না রাধার। ক্রিকেট-ফুটবলে পাগল। খবর রাখতে হয় কবে কোথায় সারাদিন ধরে টেস্ট-ক্রিকেট কিংবা ওয়ান-ডে, কোন্ দূর বিদেশ থেকে কবে সরাসরি 'বিশ্বকাপ'! ধ্বনিময় কোলাহলের সাহেববাড়িটা অদ্ভুত থিতিয়ে আসে তখন। সর্ব মনপ্রাণ সমর্পণে এক হয়ে গিয়ে দাদাবাবু -দিদিমণি বা মায়ের সঙ্গে আর ফারাক থাকে না নিরক্ষরের। কিংবা ফারাক একটাই — নরম কুশনে গা এলিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসবেন ওঁরা। রাধা মায়ের পায়ের কাছে মেঝেয়, বিস্তীর্ণ পাথরের-কাঁথার ওপর সোফাসেটের যে-অংশে রঙিন নকশা-আঁকা লিনোলিয়াম।

এভাবেই রঙিন পর্দার দিকে নিরন্তর তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরো এক নতুন চক্ষুরোগ। অচেনা পৃথিবীর এত রং, নানান দেশের রকমারি মানুষজন, মানুষের অবাক-অবাক সব কাণ্ড-কারখানায় তার চোখ দুটোই চৌকো গোছের অদ্ভুত কিছু হয়ে যায়। কিংবা টিভির বাইরে সমস্ত জগৎসংসারই ফ্রেমে-আঁটা চতুষ্কোণ। কী যন্ত্রণা! বারবার চোখ রগড়ে, জলের ঝাপটা দিয়েও রেহাই নেই। মস্ত কলকাতা শহর বা আস্ত সাহেববাড়িটাই টিভির পর্দা হয়ে ওঠার পর টিভির পর্দায় রোজ সে কলকাতা শহর আর সাহেববাড়ি দেখে। বুঝি সে নিজেই একটা টিভির ভেতর ঢুকে আছে সারাক্ষণ।

এবং তখনই বিদঘুটে এক মস্তিষ্ক ব্যাধি। তৎসহ কানের ব্যামো।

পড়ালেখা থাকে দাদাদিদিদের, ইশকুলের পরীক্ষা থাকে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে মায়ের। দামি দামি যন্ত্রপাতির ওপর অধিকার থাকে না রাধার। সাহেববাড়ি বোবা হয়ে গেলে তার নিজেরও সব কথা ফুরিয়ে যায়। কথা-বলার জন থাকে না। নিরিবিলি চুপচাপ থাকার ঝকমারি— মাথাটা ঝিমঝিম করে। অসময়ে ঘুম পায়।

তখন খামোকা বড় বেশি দাসীবাঁদি মনে হয় নিজেকে।

এবং এভাবেই সাহেববাড়িতে দিন আর রাত। খেলায় খেলায় গানে গানে মাছমাংস-ডিমঘিমাখনের উৎসবে অষ্টপ্রহর, প্রতিদিন। ছোট মেয়ে রাধার অঙ্গ জুড়ে ঝমঝমিয়ে বোল বাজে—টাগডুম টাগডুম। ঘর থেকে ঘরে, একতলায় দোতলায় ছাদে নিরন্তর ছুটোছুটিতে, কাজে আর কাজে, শ্রমেরও যে-একটা ছন্দ আছে তাল আছে লয় আছে

—অনুভবে, বুকের তোলপাড়ে হাঁপ টেনেও সুখের প্রাসাদে আনন্দ অঢেল। ছোট্ট চড়ুই এভাবেই যদি চিল-বাজপাখির আকাশ পেয়ে যায়, তাকেও কিছু-একটা হয়ে উঠতে হবে। মেঘলোকেই চাঁদ-সুয্যি।

ফ্রিজ চিনল রাধা। পুডিং গড়তে দেখল মাকে—কাস্টার্ড পুডিং, ফ্রুট কাস্টার্ড, ম্যাঙ্গো। কেক তৈরি হতে দেখল ঘরে— নারকোল কেক, ক্রিসমাস কেক, ফ্রুট কেক, সাধারণ কেক। ঘরের মেয়ের মতোই সংসারের দামি দামি সব যন্ত্রপাতিতে হাত দেবার অধিকার পেয়ে গেল একদিন। জলের ফিলটার সাফ করা নিয়মিত ডিউটি হয়ে দাঁড়াল সপ্তাহে দু-দিন তিনদিন। ফ্রিজটা নিজে সাফ করেন মা। তাঁকে পাশে থাকতে হয়। প্রেসার-কুকারের বিকট হুইসল আর ভয় কাঁপায় না বুকে। সিলিন্ডার আর ওভেনের দু-দুটো চাবি ঘুরিয়ে সে-উনুনই সে জ্বালাচ্ছে রোজ সকাল সন্ধে হরবখৎ। রান্নার বই পড়ে পড়ে কত যে নতুন খাবার মা-ঠাকরুণের আবিষ্কার, রাধা তার সব জানে—চিলি চিকেন, চিকেন ফ্রায়েড রাইস, চাউমিয়েন, বিরিয়ানি, স্টাফড টমেটো, পাঁউরুটির পোলাও, চিজ স্যান্ডউইচ, ধোসা, ইডলি, আলুর টিকিয়া— এভাবেই আরো হবেক রান্নায় রাধার নিজস্ব 'হয়ে-ওঠা'-র প্রক্রিয়ায় জলখাবারটা তারই দপ্তর হয়ে উঠল এক সময়। রোজই সন্ধেবেলা মাস্টারমশাইরা কেউ না কেউ, কোনো কোনোদিন একসঙ্গে দুজন বা তিনজন, পড়াতে আসবেন দাদাবাবু-দিদিমণিদের। রাধাকে হিসেব রাখতে হয়। তাঁদের জন্য জলখাবার। দফায় দফায় চা-কফি।

ঘড়ির কাঁটা দেখে সময় মাপতে শিখল রাধা। টেলিফোন ধরে ডেকে দিতে শিখল, যাঁর জন্য ডাক, তাঁকে। দোতলা থেকে বোতাম টিপে টেলিফোন-কল ঘুরিয়ে দিতে শিখল একতলায় সাহেবের আপিশ ঘরে। ভ্যাকুয়াম-ওয়াশারে দরকারমতো হবেক সাইজের নজল সেঁটে খাট আলমারি আসবাবপত্তরের ধুলোঝাড়া তার এক মজার খেলা। শুনে শুনে কত ইংরেজিও শিখে ফেলল। কথায় কথায়—ফ্যানটাস্টিক। নয়তো নাক সিঁটকে—কী বোর কী বোর...

এভাবেই প্রতিনিয়ত অনেক.......অনেক কিছু শিখে বা শিখতে শিখতে এগোনোর প্রক্রিয়ায় রাধা তার অত্যুজ্জ্বল জগতের পরবাসকেই আপন ভুবন জেনে ঘর্মাক্ত শ্রমে নিষ্ঠায় প্রাণপাতে সাহেববাড়ির অণু-পরমাণুকে কামড়ে ধরে থাকায় ক্লান্তিশূন্য নিশিদিন। কোন্ এক ঐশীমায়ায় সব-পেয়েছির-দেশে পৌঁছে যাবার পর যদি প্রতি মুহূর্তে সব-হারাবার ভয়, দিনভর রাতভর হাড়ভাঙা খাটুনি তুচ্ছ নিতান্তই। নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে গলদঘর্মে যে-কোনো মূল্যে মায়ের মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু সে জিইয়ে রাখতে চায়। ভগবতী মা-ঠাকরুণ তার, নতুন ধম্মো-মা। সুগন্ধী জর্দা-পানে বঙ্কিম ওষ্ঠাধর। আলগাভাবে হলেও সেখানে যে-হাসিটুকু ঝুলতে থাকে, কোন্ এক দুর্নিরীক্ষ সূত্রে সেই প্রফুল্লতা বিধিলিপি রাধার। প্রতিদিনের শঙ্কা—সেখানে হাসি শুকোলেই, দেবসভার তালভঙ্গে স্বর্গভ্রষ্ট উর্বশী যেমন, আচম্বিতে ছিটকে সরে যেতে হতে পারে তাকে সেই মর্তলোকে, যেখানে জন্মদায়িনী মা তার, নিজেই এক পিদিম-জ্বলা আঁতুড়ঘরে। রূপরসগন্ধবর্ণস্পর্শময় পৃথিবীর আলো পেলে কে চায় মাতৃগর্ভের সেই আঁধারে ফিরে যেতে, যেখানে মরণ।

এবং এভাবেই চোখ-ধাঁধানো আলোর জগতে শৈশব ছাপিয়ে বয়স ছাপিয়ে আস্তে

আস্তে পরতে পরতে বাড়তে থাকে রাধা। অপার সুখভোগ ছাড়াও শ্রমের বিক্রয়মূল্য মাসান্তে এক শত টাকা। টাকাটা সে নিজের হাতে গ্রহণ করে না। সন্ধানও জানে না। কালীজেঠুই মাসে মাসে দিয়ে আসেন গাঁয়ের মাকে। ভাঙা মেটেঘর চাঙা হবে। সোনামণিকেশুদ্ধু গরুটা বেচে দিয়েছেন মা। ফের গাইগরু কেনা হবে। মুখ্যু দিদির গতর খাটানো রোজগারে পালানভাই ইশকুলে যাবে। পড়ালেখা শিখে অনেক বড় মানুষ হবে।

রাধা ভাবে না সেসব। দুঃখ ভুলেছে সে। পিছুটান নেই। ডিম্নিপানা আর ফলিডল আর পাটপচা বিষজলের এঁদো ডোবা থেকে উঠে এসে চিনে ফেলেছে জলের প্রবাহশক্তি কিংবা জলের প্রবাহ ছেড়ে ডাঙায় সাঁতার-কাটার কৃৎকৌশল। ধম্মো-মায়ের ঘরই আপন-ঘর তার। এখানে সে পরের-মেয়ে নয। বরং ঘরের-মেয়ে হয়ে ওঠাই তার নিজস্ব 'হয়ে-ওঠা'। চক্ষুকর্ণ নাসিকা ভোলায় প্রতিদিন। অঙ্গে অঙ্গে শিহরন কাঁপে।

ঘরে বসে একদিন রাত্তিরবেলা সুন্দর একটা গপপো শোনাল মুন্নিদিদি। ওঁদের ইংরেজি বইয়ে লেখা আছে। সিন্ডারেলার গপপো। দুঃখী মেয়ের কথা।

> বাপের অনেক পয়সা ছিল। মেয়েটার অনেক আদর ছিল। ওর মা-টা মরে যাবার পর নতুন মা এল। কুচ্ছিত দুটো বোন হলো সৎমায়ের পেটে। বোন দুটো বড় হলো। হিংসুটে তিন ডাইনি দু-চক্ষে দেখতে পারত না মা-মরা দুঃখী মেয়েটাকে। বড় কষ্ট সে-মেয়ের।
>
> একদিন রাজবাড়িতে নাচতে যাবে দেশের ধনী-ঘরের সব মেয়েরা। বোনদুটোও গেল বাহারের সাজগোজ করে। অন্ধকারে কুঠুরিতে একা চুপচাপ বসে কাঁদে দুঃখী মেয়ে। আঁধার ঘর আলো করে দেখা দিলেন সগ্‌গের পরী। বললেন— 'আর চোখের জল থাকবে না তোর। একটা ইঁদুর ধরে নিয়ে আয় দেখি বাগান থেকে। গিরগিটি আর প্রজাপতিকে আসতে বল্। লতাপাতা ফুল তুলে নিয়ে আয়...'
>
> পরী-মার ইচ্ছেয় ইঁদুর হলো সুন্দর একটা গাড়ি। গিরগিটি তার কোচোয়ান। প্রজাপতির পাখনা থেকে তৈরি হলো রংবাহারি এক জামা। লতাপাতাফুল থেকে মাথার-টুপি, গায়ের গয়নাগাটি। তার পুরনো ছেঁড়া জুতোজোড়াই হয়ে উঠল হীরেমুক্তোয় চটকদার।
>
> পরী-মা বললেন— 'রাত বারোটার মধ্যে ঘরে ফিরে আসতে হবে কিন্তু! রাত দুপুর হয়ে গেলে গাড়ি আবার ইঁদুর হয়ে যাবে, কোচোয়ান গিরগিটি। জামা টুপি গায়ের গয়না সব ফিরে যাবে নিজের নিজের চেহারায়...'
>
> পরমাসুন্দরী সেই কন্যা চারদিকে ঝলকানি দিয়ে এল রাজার-বাড়ি। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সবাই। হিংসুটে বোন দুটোও চিনতে পারল না ওকে। মুগ্ধ রাজকুমার সবাইকে ছেড়ে দুঃখী-মেয়েকেই নাচের সঙ্গী করল সে-রাতে। শুধু ওরই সঙ্গে নাচবে বলে রাজপুত্তুর নাচের আসর ডাকল আবার। রাতদুপুর যেন শত্তুর। বারবারই চলে আসতে হয় তাকে। পালায় উৎসব

ছেড়ে।

এক রাত্তির, দু-রাত্তির। তৃতীয় বার ওর সঙ্গে সারারাত নাচতে চাইল রাজপুত্তুর। বুঝি সব ফাঁকিই ধরা পড়ে যাবে এরপর। কী লজ্জা কী লজ্জা! রাত যখন ঠিক বারোটা, কিছুটা মরিয়া হয়েই সেই মেয়ে আসর ছেড়ে ছুটে পালাল। ধরে রাখতে পারে না রাজকুমার। মেয়েটার অদ্ভুত কাণ্ড দেখে পেছনে হাসল সবাই।

তাড়াহুড়োয় এক পায়ের জুতো কোথায় পড়ে রইল নাচের ঘরে। পরদিন বাকি এক-পাটি জুতো নিয়ে দেশের ঘরে ঘরে ছুটল রাজার লোক। যে-মেয়ের পায়ে জুতোটা ঠিক-ঠিক খাপ খেয়ে যাবে, রাজপুত্তুর বিয়ে করবে তাকে। ঘুরতে ঘুরতে ওদের বাড়িও এল। বড় সাধ করে পা বাড়াল সৎবোনেরা। একজনের পায়ে বেঢপ বড় হলো। আরেক জনের পায়ে বেশ ছোট। খাপে খাপে এঁটে গেল দুঃখী মেয়ের পায়ে।

রথে চড়ে রাজপুত্তুর এসে তুলে নিয়ে গেল সেই মেয়েকে। দুঃখী মেয়ে রানী হলো। রাগঝাল কিছুই নেই তার। ভুলে গেল পুরনো সব ব্যথা। ক্ষমা করল ডাইনি মা আর হিংসুটে বোন দুটোকে।

সাহেববাড়ির ভাঁড়ার ঘরের পাশে রাধা তার তক্তপোশে শুয়ে অনেক রাত অব্দি অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে শিয়রের জানালায়। আকাশ দেখা যায় না শহরে। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা আকাশ থাকে। চোখের তারায় আকাশ ভরে লাখো লাখো পিদিম জ্বলে। দেশগাঁয়ের আকাশে এমন শিউলি-ছড়ানো উঠোন থাকে মাথার ওপর—দেখা যায় রাত্তিরবেলা। শহরের ঘরে, অন্ধকারে, জানালায় চোখ খুলে রেখে মনে মনে রাধা সেই আকাশ খোঁজে একা। ওই জানালায় আলো জ্বলে উঠতে পারে এক্ষুনি। ঘর ভরে চাঁদের আলো নিয়ে এসে যেতে পারেন সগ্‌গের কোনো ফুলপরী। কাঙাল মেয়েদের ঘরে এমনি করেই এসে যান ওঁরা। গরিবগুব্বোর দুঃখু ঘুচে যায়।

এবং তখনই গা-গতরে মোচড় দিয়ে কী-একটা কাঁপুনি নিজের মধ্যেই। কী পাপ, কী পাপ গো! সাহেববাড়িতে কেন আসবে ফুলপরী? মা-ঠাকরুণকে ডাইনি ভাবছে সে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ধম্মো-মা তার! ভাতকাপড়ের মা। আর দিদিমণিরাই বা হিংসুটে হতে যাবে কোন্ দুঃখে? ওরা তো নিজেরাই ফুলপরী। বছর বছর ইশকুলের পাশ দিয়ে কত বড় হয়ে উঠছে দুজনই।

বড় হয়ে উঠছে রাধা নিজেও। সাহেববাড়ির হেঁশেলে সে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওজন বুঝে নিতে চায়।

পুষ্পর-মা, সেই বাঙাল বুড়ি কাজ ছেড়ে চলে গেল একদিন। রান্নাবান্না ছাড়াও সব কিছুতেই কাজের-হাত বড় ভালো ছিল বুড়ির। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মায়েরও পছন্দ ছিল খুব। কিন্তু হলে হবে কী? যত কাল হলো বুড়ির চাঁছাছোলা জিভটা। কবে কত যু আগে বাংলাদেশের বড় ঘরের মেয়ে ছিল, বড় গেরস্ত ঘরের বউ— সব খুইয়ে এখন যদি পরের ঘরে হাতাখুন্তি ঠেলাটাই সত্যি, ওসব শুনবে কেন লোকে? যার

খাবে যার পরবে তাকেই চাটাং-চাটাং কথা! নিত্যি অশান্তি। মা জবাব দিয়ে দিলেন।

বড় দুঃখু পেয়েছিল রাধা। ঠাকুমা বড় ভালোবাসত তাকে।

সে-ভালোবাসার রকম আলাদা। রাজপ্রাসাদের ঝলমলে নজর ছিল না কারুর। অথচ সাহেববাড়িরই অন্তঃপুরে রাধার জন্যে দেশপাড়াগাঁয়ের একচিলতে ছোট জায়গা। মাকে মনে পড়ে যেত। পাড়াপড়শি আর-সব বুড়িগুলোকে। মাঝেমধ্যে সত্যি-সত্যি বিদেশবিভুঁই হয়ে উঠত কলকাতা। সাহেববাড়িতে এমন করে তাকে চুল-বাঁধার কথা বলত না কেউ। হাজার কাজের ভিড়ে বুড়ি নিজেই বসে যেত চিরুনি নিয়ে। সোহাগ করে সামনে বসিয়ে চিরুনি টেনে টেনে ঝিমঝিম ধরিয়ে দিত মাথায়। আরাম লাগত খুব। বিনুনি গড়তে গড়তে, ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বিদঘুটে বাঙাল ভাষায় কত কথা! এর আগে এসব কথা কেউ শোনায় নি তাকে— সুয্যি ডুবলে এলোচুলে বাইরে যেতে নেই মেয়েদেব —ভূতে ধবে। রাত্তিরে আয়নায মুখ দেখতে নেই, দেখলে কলঙ্ক হয। থালাবাসনের ধাক্কায় শব্দ করতে নেই, করলে চোর আসে ঘরে। বঁটি খাড়া রাখতে নেই। সন্ধেয় মেযেদের ধোয়া-কাপড বাইরে রাখতে নেই...আরো অনেক নেই-নেই, অসংখ্য মানা। বাঙাল-বুড়ির থুতু-ছিটনো তোবড়ানো গালে শুধু নাই...নাই...নাই। হরেক নিষেধের বেড়াজালে কোথায যেন শাসনে শাসনে আদর পেত রাধা।

শুধু রাধা জানে, কোনো হাতটান ছিল না বুড়ির। থাকবেই বা কেন? ত্রিভুবনে কেউই তো নেই ওঁর। এক সাধের গোপাল ছাড়া। ভাঁড়াব ঘরের কোণে নিজের মতো করে এলোমেলো একটা ঠাকুরের-আসন বসিয়েছিল বাঙাল ঠাকুমা। পেতলের গোপালঠাকুরে নিত্যি ফুলবাতাসা। তুলসী পাতায় চন্দন। রোজ সকালে দুধ নিয়ে ফেরাব সময় মায়ের জন্য বাজার থেকে পুজোর-ফুল কিনে আনতে হয় রাধাকে। রাধা বুড়ির জন্যে ফুল তুলসী চুরি করত রোজ।

বুড়ি ঠাকুমা চলে যাবার পর এত বড় বাড়ির অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তার। আড়ালে কেঁদেওছিল খুব।

একজন নতুন বউ এল সাহেববাড়িতে—হারানের-মা। ত্যাঁদড় মেয়েছেলেটাকে প্রথম দিনই বুঝিয়ে দিয়েছিল রাধা—হেঁশেলের দখল তার নিজের হাতে। এ-বাড়িতে কার কেমন জিভেব স্বাদ—সে জানে। কাকে কখন কোন্‌টা কীভাবে দিতে হবে, কে কী ভালোবাসে বা বাসে না—সবই তাকে ঠিকঠাক মনে রাখতে হয়। কাজকম্মে গোছগাছে মায়ের পছন্দ-অপছন্দের হিশেব শুধু তারই জানা। এই জানাটাও একটা বিদ্যে। অনেক দিন ধরে বহু মেহনতে আহরণ করতে হয়েছে তাকে। এই বিদ্যের জোরেই এ-সংসারে সে কোনো দাসীবাঁদি নয়, ঘরেব-মেয়ে।

গলা চড়িয়ে খ্যাচাখেঁচি চেঁচামেচির সুযোগ কম। পয়সাওলা ভদ্দরলোকদের বাড়িতে ছুঁচোর-কেত্তন গাইবার সাহস নেই কারুর। এক কথায় দুর-দুর করে তাড়িয়ে দেবেন মা। কিন্তু এক নম্বরের কুঁদুলে বউটা, কোথাকার কোন্ বস্তিফস্তি থেকে এসেছে কে জানে, হুঁশ নেই সে-সবের। বয়সে প্রায় তিন ডবল, হয়তো আরো কিছু বেশিই হবে। এমন একটা খেঁকুড়ে মেয়েছেলের সঙ্গে সব সময় এঁটে উঠতে পারত না রাধা। জ্বলেপুড়ে মরত নিজের মধ্যেই নিজে। কথা বলত না দিনের পর দিন। তাতেও কি স্বস্তি ছিল?

একই সঙ্গে একই ঘরে নিত্যি ওঠা-বসা। খটাখটি লেগেই থাকত। সংসারের অশান্তি। কান-ভাঙানি দিয়ে দিয়ে মেয়েছেলেটা এমন বিষিয়ে তুলছিল মাকে, নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে মা একদিন রাধাকে ধমকালেন বিস্তর। বুঝি সব দোষই ওর। বয়সে ছোট বলে নিজের কথাগুলো সে গোছগাছে বোঝাতেও পারছিল না কাউকে। বুঝতেও চাইছে না. কেউ।

সুতরাং অসহায়ত্বের কান্না ছিল। মেয়েছেলেটার ওপর রাগও ছিল। কোত্থেকে উড়ে এসে খেঁকুড়ে একটা বউ সাহেববাড়ি কেড়ে নিচ্ছে তার! সাহেববাড়ি ফুরিয়ে গেলে মরণ রাধার।

জমিদখলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সেদিন যা করেছিল সে, এরপর আর কোথাও চাকরি থাকে না কারুর।

রাত্তিরের রান্নাবান্না সেরে কোথায় একটু গিয়েছিল হারানের-মা। হেঁশেলের দিকটা একেবারেই ফাঁকা। সাহেবের চিকেন-স্টুতে টুক করে এক মুঠো নুন ফেলে দিয়েই ভালোমানুষের মতো টিভির সামনে গিয়ে বসে পড়েছিল রাধা। মা-র পায়ের কাছে। পোষা বেড়ালের ভঙ্গিতে।

সেদিন রাতে খাবার-টেবিলে সে-এক কাণ্ড। ঘরে বড়সড় অগ্নিকান্ডও বোধ হয় এর চেয়ে কম বিপদজনক। টেবিলের ওপর চিকেনের ঝোলে ভরাট চিনেমাটির বড় বাটি, পাঁউরুটির টোস্ট হাফ-পাউন্ড, স্যালাড—সব ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে উঠে পড়লেন সাহেব। এমন একটা ঘটনা, এত বড় বেয়দপি এভাবে ঘটে যেতে পারে এ-বাড়িতে —প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই দিশেহারা মা লাফিয়ে পড়ে চিৎকারে-চিৎকারে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিলেন রান্নাঘরে। বুঝি রাতদুপুরেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবেন সবাইকে— 'এত বড় সাহস? এটা এভাবে হয় নি। নির্ঘাৎ বজ্জাতি কারুর। বলতেই হবে কে করেছে। আজই বলতে হবে। এক্ষুনি...'

রাধা থরথরিয়ে কাঁপে। হিশেবের অঙ্কে গড়বড় হয়ে গেছে সব। নিজের ঘরসংসারে খোদ সাহেব উপোসে থাকবেন সারারাত? ছিঃ ছিঃ, কী পাপ, কী পাপ গো! দাদাবাবু-দিদিমণিরা ছাড়া আর খাওয়াই হলো না কারুর। মা নিজেও খেলেন না। অথবা কী করলেন, কী খেলেন নিজেদের ঘরে বসে, জানল না গোলামবাঁদিরা। সাহেববাড়িতে সেই একটা রাত, ভয়ঙ্কর রাত, দাপাদাপি করে মরেছে রাধা। এখন কী হবে? সাহেববাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে তার। সাহেববাড়ি ফুরিয়ে গেলেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে...আবার সেই মেটেঘর পানাপুকুর জলকাদা মশামাছি ঘুঁটেগোবরের দেশ। এখন আর সে ভাবতেই পারে না শুকনো শাকচচ্চড়ি, নয়তো হড়হড়ে কলাইর-ডাল আর পোস্তবাটায় এক থালা ভাত!

মেঝেয় পড়ে মায়ের পায়ে মাথা রেখে আছাড়িবিছাড়ি কাঁদল রাধা। তার ছোট বুকে কালো মেঘ। দু-চোখ ভেঙে পুরো এক বর্ষার জল।

কালীজেঠুর ডাক পড়ল পরদিন সকালেই। সাহেব গম্ভীর মানুষ। সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাটেই ঝি-চাকরদের সঙ্গে কথা বলেন না। মা-ই জানিয়ে দিলেন—'নিয়ে যাও তোমাদের মেয়েকে। এতটা যে পারে, সে তো খাবারের সঙ্গে বিষও মিশিয়ে দিতে পারে কালী!

হতভাগী মেয়েটাকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু এটুকুন একটা মেয়ে! গাল টিপলে এখনও দুধ বেরোয়! ওর পেটে পেটে এত?'

অবাক কাণ্ড! শেষ পর্যন্ত রাধাই বহাল থেকে গেল। দুটো বেড়াল ঝগড়া করলে ঘরের পোষা বেড়ালই রেহাই পেয়ে যায় যেহেতু, হারানের-মা খারিজ হয়ে যাবার পর রাধার নিজেরও স্বস্তির নিঃশ্বাস! মস্ত বড একটা ফাঁড়া কেটে গেল তার। প্রমাণ হলো, পরের-মেয়ে বা কাজের-মেয়ে নয়—সাহেববাড়িতে ঘরের-মেয়ে সে।

রাধা এবং
ডোবারম্যান

কিংবা তখন রাধা বড় বেশি জরুরি ছিল সাহেববাড়িতে।

খুব ঘটা করে বছর-বছর জন্মদিন হয দাদাবাবু-দিদিমণিদের। সাজপোশাকে সোনাগয়নায় ঝলকানি দিয়ে কত কত মানুষজন গাড়ি চেপে আসেন সবাই। রঙিন কাগজে বা সোনালি ফিতেয় বাঁধা কত কত উপহার ডাঁই হয়ে ওঠে টেবিলের ওপর। দুপুরে সাতব্যঞ্জনের সঙ্গে পায়েস খাইয়ে ধানদুব্বো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করেন মা-মাসিরা। রাত্তিরে গুনে গুনে মোমাবাতি জ্বেলে কেক কাটে দাদাবাবু বা দিদিদের কেউ, যার জন্মদিন, সে। দল বেঁধে ঘিরে থেকে হাততালি দেবেন সবাই। আলোর ফুলকি জ্বেলে খিচ-খিচ ফটো তোলা হয়। ভি.ডি.ও.-এ ছবি তোলার জন্য লোকজন আসেন বাইরে থেকে। বছর ভরে ঘরে বসে-বসে দেখা যায় নিজেদের তুমুল হৈ-হল্লা। টিভির রঙিন পর্দায় রাধা নিজেও দেখেছে নিজেকে। অনেক বার।

ওদের তিন ভাইবোনের প্রতিটি জন্মদিনে বছবে তিনবার করে বয়স বাড়ে রাধার। কেননা তার নিজের কোনো জন্মদিন নেই। মুন্নিদিদিব চেয়ে ছোট, বুল্লিদিদির চেয়ে বড়—এমনি একটা হালকা কথা-চালাচালির মাঝখানে সত্যি হিসেবটা বলবে কে? দেশের বাড়িতে উঠোনের আঁতুড়ে জন্মানো মেয়ের কোনো হাসপাতাল নেই। মুখ্যু মা বলতে পারে না কিছু। একটা বাপ ছিল। সে-ও মরে গেছে। দাদা-দিদিদের জন্মদিনে খুশিতে খুশিতে গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজায় সে। নিজের বয়স মাপে।

ছেলেমেয়েদের আবদার ছিল অনেক আগে থেকেই। সেবার বাবন-দাদাবাবুর জন্মদিনে একটা কুকুর এল বাড়িতে। খুবই বাচ্চা। কোলে তোলা যায়। আড়াই মাস নাকি বয়স! এটুকুন বয়সেই এমন খেঁকুড়ে আর তেড়িয়া, হাত বাড়াতে সাহস পায় নি কেউ। প্রথম দিনই আদরে-আদরে ওকে একবার বুকে টেনে তোলার চেষ্টা করেছিল রাধা। চার-চারটে পায়ের ছোঁড়াছুড়ি আর বীভৎস কেঁউ-কেঁউ থেকেই এমন দামাল একটা জানোয়ার, দজ্জাল-দস্যিকে কায়দামতো বাগে আনতে এটুকুন মেয়ে রাধাও নাজেহাল। হাঁপিযে উঠল। হাতে-গলায় আঁচড় লাগল, ফ্রক ছিঁড়ল। কিন্তু হার মানা নেই। দুহাত বাড়িয়ে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছে ওর গলা—বাৎসল্যের ভঙ্গিতে ওর কানে-গলায় নিজের কান-গলা ঘষে নেবার ঢঙ দেখে দূরে দাঁড়িয়ে হাসলেন সবাই। বরং

কিছুটা বিচলিত কিরণময়ী। ছুটে এলেন—'কী করছিস? করছিস কী তুই? এ-কি তোদের রাস্তার নেড়ি কুকুর ভেবেছিস নাকি?'

কোনো বিভ্রম ছিল না রাধার। কুকুরটাকে পুরোপুরি জাপটে ধরে কোলে তুলে নেবার চেষ্টা তার—'কিছু হবে নি গ মা। ওকে আমি চিনি।'

'তুই চিনিস? তুই ডোবারম্যান চিনিস?'

ডোবারম্যান চেনে না রাধা। গাঁয়ের মেয়ে চতুষ্পদকে জানে। বাবা মরে যাওয়ার পরও অনেকদিন দেশের বাড়িতে একটা গাইগরু ছিল ওদের। 'সোনামণি' বাছুর ছিল। সোনামণিকে মনে রেখেই সোহাগে-আদরে নতুন চতুষ্পদকে আপন করে নেবার উদ্ভট আহ্লাদেপনায় কী-এক মাদকতা পেয়ে যায় সে, দৃশ্যত অদ্ভুত হলেও, প্রভুজনরা নিশ্চিতই খুশি। কেন না, আরো একজন বাড়তি লোক রাখার ঝঞ্ঝাট নেই। যদি এভাবেই একটি অবোধ গেঁয়ো মেয়ে অনায়াসে মিশে যেতে পারে এমন তেজী আর হিংস্র শ্বাপদের আশ্লেষে।

যিনি বিক্রেতা, তিনিই সারমেয় বিশেষজ্ঞ। পালনবিধি জানালেন—এদের ঘরে রাখার ঝুঁকি অনেক। সুবিধেও খুব বেশি। সকালে দুপুরে বিকেলে বা রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর তিনবার পার্কে নয়তো বাইরে কোথাও নিয়ে যাবেন। রোজ রোজ একই সময়ে পায়খানা-পেচ্ছাব করালে, দেখবেন, ওরা স্বভাবের বাইরে যায় না কখনও। প্যাভলভ না কে-যেন একজন সাহেব ছিলেন বিলেত দেশে, তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে কুকুরদের খাওয়াতেন...

লোকটার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। খাদ্যতালিকা দিলেন—কখন কী খাবে, কী খাবে না। কুকুরের জন্যে আলাদা বিস্কিট আছে, পাউডার আছে। অসুখবিসুখ কিছু হলে আপনাদেরই পাড়ায়, ওই রাস্তার মোড়ে মেডিকেল স্টোরে কুকুরের ডাক্তার বসেন সন্ধেবেলা...

এক কেজি মাংস দিনে চারবার এতটুকুন বাচ্চা একটা কুকুরকে? মাথা ঘুরে গিয়েছিল রাধার। এর পরও দুধ বিস্কিট? স্নানের সাবান আলাদা? গায়ে পোকা-মারার পাউডার? ডাক্তার? অষুধপত্তর? ওতেও শেষ নেই। ট্রেনিংয়ে পাঠাতে হবে। মাসে দেড়শো দুশো টাকা? একটা কুকুর? তারও পাঠশালা?

সাহেবি ঢাকঢোলে যতই জবরদস্ত আহামরি হোক, গৃহপালিতকে রাধা অতি সাধারণ একটি শাদাসিধে চারপেয়ে জীব বলেই জানল, বুঝল। প্রতিপালনবিধিতে সামান্যই হেরফের—ভাতের ফ্যানায় খড়খোলের জাব সাজাতে হবে না, মাংস রাঁধতে হবে। চরানিতে নিয়ে যেতে হবে না। সাহেব নিজেই সাতসকালের মর্নিওয়াকে শেকলে বেঁধে পার্কে নিয়ে যাবেন। পুকুরে নামিয়ে খড় ঘষে গা ধোয়াতে হবে না, কলতলায় সাবান মাখিয়ে জল ঢাললেই চলবে সপ্তাহে একদিন দু-দিন। লেজকাটা জানোয়ার মশামাছি গায়ে বসলে তাড়াবে কেমন করে? ওর জন্য পোকা তাড়ানোর পাউডার থাকবে আলাদা। অসুখবিসুখ হলে অবিকল মানুষের মতোই চিকিৎসা হবে ওষুধে-ডাক্তারে। শুধু যত্নআত্তি দেখভালের জন্যে মুনিশ চাই একজন। বলা বাহুল্য, রাধাই নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ইটপাথরের নিষ্করুণ দেশে রাধাও পেয়ে যায় তার একমাত্র ভালোবাসার প্রাণ, আরেক পুষ্যি অন্য

নামে। এবং তার নিয়মিত কাজের তালিকায় যেটুকু বিশ্রাম ছিল, জীবপ্রেমে সেটুকুও ফুরিয়ে গেল। অথবা সে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে গেল সাহেববাড়ির ভিন্নতর সেবাধর্মে। যতই সাহেবি আর খেঁকুড়ে আর জল্লাদই হোক, চারপেয়ে অবোলা বৈ তো নয়।

প্রথম দিনই হাঁটু ভেঙে বসে, ওর গলা জড়িয়ে গায়ে মুখে ঝোলা-কানে লোমে লোমে গাল ঘষে ঘষে সোহাগ করেছিল সে। কুকুর তো বটেই। কিন্তু চেহারাটা ঠিক কুকুরের মত নয়। বড় বড় দুটো কাঁঠাল-বিচির আদলে ড্যাবডেবে চোখের ভেতর কাচের মার্বেল গোছের কটা-কটা গুলতি। এখনও বাচ্চা। ভীষণ কিচ্ছু নয়। ওকে 'টাইগার' ডাকলেন সবাই। ইংরেজি জানে না রাধা। অথচ কীভাবে দুই বুলিতে একই বোল মিলেমিশে যায় শিক্ষিতে-নিরক্ষরে। রাধা ডাকল—বাঘা।

নেপথ্য সমাচার

কিরণময়ীর আপত্তি ছিল। কুকুর-বেড়ালে বড্ড ঘেন্না—'না বাবা, ওসবে দরকার নেই। কী পাচ্ছিস না তোরা? যখন যা চাইছিস, সে-দশ টাকা হোক আর দশ হাজার লাগুক সবই তো কেনা হচ্ছে। হাজাবগণ্ডা জিনিসপত্তরে ঘর ভরে গেল। তাই সামলাতে পারছি না। এর ওপর আবার এক জ্যান্ত উৎপাত...'

ললাটে কুঞ্চন তুললেন নিশীথরঞ্জন—'বাট হোয়াই ডোবারম্যান? আমি যা শুনেছি, সে-তো হাইলি ডেঞ্জারাস। মোর অর লেস ওয়ান ম্যান ডগ...'

'সো হোয়াট...' নাছোড় সন্তানবর্গ—'ডোবারম্যান? থাকে না কারুর বাড়িতে? ডগশো-এ দেখোনি? ডোবারম্যান ইজ এ প্রেস্টিজ...'

কিরণময়ীর ধমকানি—'হুঁ, ইজ্জৎ দেখাচ্ছিস যে খুব! বলি, গোটা ঘরবাড়ি যখন নোংবা করে বেড়াবে তার কী হবে? দিনবাত দেখবে কে ওকে? খাওয়ানো-দাওয়ানো চান করানো, যত্নআত্তি করা...'

'কেন? রাধুই তো আছে আমাদের?'

'আর কত কাজ করবে বল্ তো মেয়েটা?' কিরণময়ী যথার্থ ক্রোধে—'সারাদিনে একটু জিরোবার সময় পর্যন্ত পায় না বেচারি। এখন তোদের কুকুরের সেবা করতেই যদি ওর গোটা দিন চলে যায়, সংসাবের আর বাদবাকি কাজ কি করে হবে শুনি? তোরা তো হুকুম চালিয়েই খালাস। কোত্থেকে কী হয় খবর রাখিস কিছু? ওকে ছাড়া চলে না একটা দিন। ধর, তোদের কুকুর যদি ওকে কামড়েই দেয় কোনোদিন...'

'কামড়ে দেবে?' মেদল দেহে বাবনের গাল এমনিতেই ফোলা-ফোলা। আরো বেশি ফুলিয়ে তাকাল মায়ের দিকে। টেবিলে সজোর ঘুসি—'ইনক্রেডিবল। যাও যাও, তুমি ওই রাধুর সঙ্গে...ওই ওদের কোথায় যেন গ্রামফ্রাম কী আছে? কিং অশোক সিরাজদৌল্লারা রাজত্বি করে এখনও, সেখানে চলে যাও...'

মুনমুন কিছুটা শান্ত—'এ ডোবারম্যান ইজ মোর দ্যান এ পোলিশম্যান মা। থিংক

অব আদার সাইড। দুপুরবেলা লেকটাউনের মতো একটা জায়গায় একা থাকো তুমি। রাত্তিরবেলা আমরা সবাই ঘুমোই...'

'কর বাপু, কর। মাথায় যখন উঠেছে একবাব, সে-তোবা কুকুব কেন, বাঘভল্লুক হাতিঘোড়া যা-খুশি আন। তোদের বাবা টাকা দেবে তোরা আনবি...' বলতে বলতেই কিরণময়ী চেয়াব ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ডানদিকে বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে, এঁটো হয়নি যেসবে, প্লেট বাটি চামচ গ্লাস সস বা ভিনিগার, নানা ধরনেব আচারের শিশি বোতল, নুন-কাঁচালঙ্কার বাটি গোছাতে শুরু করলেন।

ডিনার-টেবিলে এ-রকমই ঘটে থাকে প্রতিদিন। কাজে-কাজেই গোটা দিন ফুরিয়ে যাবার পর রাতে আহারের শেষে সন্তানদের সঙ্গে কিছু কথোপকথন। আজ, সাবমেয়-সঙ্কটে স্ত্রীর ভ্রূকুটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন নিশীথবঞ্জন। সন্তানদেব প্রতি—'তাব মানে, আদর পেয়ে পেয়ে তোমবা বড্ড টায়ার্ড ফিল করছ? এখন নিজেরাই আদব কবার জন্যে চাইছ কাউকে?'

'ননাইস...' খলবলিযে উঠল ছেলেমেয়েরা। মুনমুন সংযত হাস্যে—'প্রিসাইসলি দ্যাট বাপি।'

'কিন্তু তোমাদেব আদরের কাজটুকুও রাধু কববে? দ্যাট ভিলেজ গার্ল অব ইয়োর এজ! নোয়িং ওয়েল, ডোবারম্যান ইজ কম্প্লিটলি এ ডিফারেন্ট থিংগ...' চেযার ছেড়ে উঠলেন নিশীথবঞ্জন। গৃহকর্তাকে ভাবতেই হয় কিঞ্চিৎ—'হাইব্রিড ভয়ঙ্কর কুকুর। ওসব নিয়ে তো ছেলেখেলা চলে না এভাবে। অশিক্ষিত মুখ্য একটা মেয়ে দেখবে-শুনবে? কিছু একটা যদি হয়ে যায় এবপর? এসব সফেস্টিকেটেড টেকনিকাল ব্যাপারের ও জানে কী?'

খিঁচিয়ে উঠলেন কিরণময়ী—'হ্যাঁ, শেষে যদি তোদের ওই কুকুরের ভযে মেয়েটা বাড়ি ছেড়ে পালায়? আব পাবি ওবকম কাউকে? একেবারে ঘরের মেয়ের মতো হযে গেছে মাত্তর এই কটা বছরে...'

কোনোই তাৎপর্য নেই এম্ববিধ মাতৃবিলাপের। প্রাপ্তিভোগের অধিকতর ঐহিকবোধে সন্তানগণ অবশ্যই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারে— বেগবান চতুষ্পদ হিসেবে অটোমোবাইল নিতান্তই এক প্রয়োজনীয় সম্পদ। নিছক প্রয়োজনে গ্ল্যামার আছে, বীবত্ব নেই। দাপট চাই জীবনে, হেককর চাই। অ্যান্ড ডোবারম্যান ইজ অব ফেবোসিয়াস মার্ডারাস লুক। যথাযথ চতুষ্পদ-গৌববই দ্বিপদজনেব পবাক্রান্ত বাহুবল। আলেকজান্ডারেব যেমন বুসফিরাস, রাণা প্রতাপের চৈতক। ঘোড়া চলে না টেকনলজিব যুগে। শার্লক হোমসের হাউন্ড অব বাস্কাবভিল। লালবাজারে পুলিশ হেডকোয়ার্টাবে রাইফেল-রিভলবাবও কিছু না। ক্রাইম ডিটেকশনে দুর্ধর্ষ অ্যালসেসিয়ান। ডগ ইজ অলমাইটি। বানানটা উল্টে দিলেই হলো।

ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণের এতাদৃশ বাক্যালাপে বুলবুলি অকস্মাৎ

মা-র ঠাকুরঘর আর গ্রাউন্ডফ্লোরে দ্যাট ডেভিল অব ফ্যান্টম...'

'অ্যান্ড বিটুইন দ্য টু, উই আর ইন দ্য ফার্স্ট ফ্লোর...' বাবন তার দৃপ্ত ভঙ্গিমায়।

'অ্যান্ড রাধা ইজ ডায়না অ্যাজ নোবডিজ মিসেস...'

ইত্যাদি সংলাপে-ভাষ্যে রাধা ছিল না কাছাকাছি। কিন্তু সে থেকে যায় ওদের ভাবনার ছকে। এবং যথারীতি একদিন ডোবারম্যান এসে যায় ঘরে। রাধা গেঁথে যায় ডোবারম্যানে।

নিচে দাসীবাঁদীদের কলতলার পাশে ফ্যালনা দুটো ঘর। বাড়ি-তৈরির আমল থেকেই বাঁশ, কাঠের-তক্তা, সিমেন্ট-বালির বস্তা, ভাঙা চেয়ার-টেবিল, বাচ্চাদের তিন-চাকার সাইকেল হ্যানোত্যানো হাজাব জঞ্জালের স্তূপ। দুটো ঘরের একটিকে নতুন করে রঙ করা হলো, পাখা বসানো হলো সিলিংয়ে। আরো একটি টেবিল-ফ্যান মাটি ছুঁয়ে দেয়ালের গায়ে। দিনের বেলায় বারান্দায় বেঁধে রাখা যায় ওকে। কিন্তু জলঝড় বা দারুণ গরমের দিনে ঠাণ্ডা ঘর দরকাব। রাধা বলল—'গোয়ালঘর।'

সবাই হেসে কুটিকুটি। মুনমুন সুবিস্ময়ে—'হোয়াট? হোয়াট ডাজ ইট মিন?'

'গরুর ঘর। গ্রামদেশে গরুমোষ বাখার জন্যে আলাদা ঘর থাকে না? সেই ঘর...' স্বদেশ-তৃণমূলে পৌঁছোতে পেরে কিরণময়ীব মুখেচোখে তৃপ্তির আভাস।

'হোয়াই কাউ? ইট ইজ ডোবাবম্যান!'

'ধ্যাৎ, অতশত বোঝে নাকি ও? গ্রামের মেয়ে, বলল একটা কথা। ও যেমন জানে, বোঝে...'

'ডোবারম্যান অ্যান্ড এ কাউ?' লাফিয়ে-ঝাঁপিযে পিংপং বলের খলবলে হাসছে বুলবুলি —'হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া! ওনলি সি...সি ক্যান থিংক অব দ্যাট...'

'বিকজ সি নোজ হারসেলফ ওয়েল...' বাবন ওর গোলগাল কৌতুকে— 'দেখিস নি, গরুগুলোকে গরু বললে চটে না? সি ইজ লাইক দ্যাট, নেভার গেটস অ্যাংরি...'

'সো হোয়াট' ?

'সি লুকস অ্যাট দ্য ডোবারম্যান যাস্ট অ্যাজ হোয়াট উই থিংক অব হার...'

অট্টহাস্য সকলেবই। শুধু কিরণময়ীই কিছুটা সরে থাকেন। সন্তানদের মাতৃভাষা তাঁর যথাযথ আয়ত্ত নয়।

হরেক লোকজনের আসা-যাওয়া সাহেববাড়ির দস্তুর। সাহেবের আপিশের বাবুরা, দাদাবাবু-দিদিমণিদের জন্যে ঘরে-পড়ানোর মাস্টারমশাইরা সপ্তাহে প্রায় দশ-বারোজন পালা করে আসবেন রোজই, ইশকুল-কলেজের বন্ধুরাও আসেন কখনও-সখনও। ওঁবা এলে দফায় দফায় চা-কফি জলখাবার। মাঝেমধ্যে জ্ঞাতিকুটুমরাও এসে যান কেউ কেউ। তখনই ঝঞ্ঝাট। দশজনের দশ রকম ফাইফরমাশের যোগান দিতে দিতে রাধার জেরবার। ভালোও লাগে। ঘরদোর ভরে থাকে মানুষজনে। ভালোয়-মন্দয় ইংরেজি-বাংলায় নানান ধবনের মানুষ। যাবার সময় বকশিশও দিয়ে যান অনেকেই। রাধা ভালোবাসা পায়।

সবচেয়ে খুশি সে, মা-র বাপের-বাড়ি থেকে কেউ এলে। ওঁরা সবাই এত ভালো আর মিশুকে, রাধা ওঁদের সকলের সঙ্গেই খাপ খেয়ে যেতে পারে চমৎকার। অতিথি হয়ে এলেও রান্নাঘরেই পড়ে থাকবেন বড়মামিমা। কুটোটি নাড়তে দেবেন না কাউকে। বাঙালদের রান্নায়—ইলিশমাছ-ভাপানো কি আমিষ বা নিরামিষ শুক্তো নয়তো মাছের মুড়ো দিয়ে কচুর-শাক? কোনটা ছেড়ে কোনটা বলা যায়? আর মুড়িঘণ্ট? আঃ সে-

এক কাণ্ড! ভাবাই যায় না, কী রান্না! বড়সড় রুই-কাতলার মুড়ো আর ভালো সুগন্ধি চাল! তার সঙ্গে আদাবাটা পিঁয়াজ রসুন ঘি গরম-মশলার খুবই সাধারণ মশলাপাতি। ব্যস, ওতেই অমমেত্ত। সেই কবে খেয়েছে! আজও জিভে লেগে আছে রাধার। সবই বড়মামিমার হাত। হাতের গুণ।

একবার পুজোর সময় মোটরগাড়ি চেপে রাধাও গিয়েছিল সকলেব সঙ্গে। সেই কোথায় অনেক দূরে উত্তুরে না দখ্নে চাতরা কী নাম! শহর আর পাড়াগাঁয়ে মাখামাখি একটা জায়গা। মামাদের সকলেরই রোজগারপাতি বেশ ভালো। কিন্তু সাহেববাড়ি নয়। দোতলা দালান বাড়ি। ওপরে-নিচে অনেকগুলো ঘর। বাড়ির ভেতব বড় উঠোন। বাইরে আম কাঁঠাল নারকেল গাছ অনেকগুলো। ঘাটবাঁধানো মাঝারি একটা পুকুরও আছে পেছনেব দিকে। টিভি আছে ফ্রিজ আছে গ্যাসেব-উনুন আছে। ওখানেই কোথায় কোন্ কলেজের প্রফেসর বড়মামা। ঘব ভবে কত যে বই, বইয়ের-তাক, বইয়ের আলমারি। কিন্তু হলে হবে কী? মামাবাড়িতে এক রাত্তিরও থাকতে চায় না দাদাবাবু-দিদিমণিবা। ছেলেমেয়েদেব নিয়ে মাকেও পালিযে আসতে হয়। দুটো দিনও তিষ্ঠোতে পাবেন না বাপের বাড়িতে।

বড়মামিমাকে নিযে সেবাবে সাহেববাড়ি এলেন বড়মামা। থাকবেন কিছুদিন। পেটের ভেতর কী নাকি পাথরটাথব হযেছে বড়মামিমার। কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখাবেন। পয়সা তো মামাদেবও খুব একটা কম নেই। অত বড় একটা সংসারের গিন্নি। নিজেও ওখানে কোন্ একটা বড় ইশকুলের বড় দিদিমণি। কিন্তু মোটেই সাহেববাড়িব মায়ের মতো নন। হাউসকোট পরেন না। শুধু শাড়ি। গরদ তসরের বর্ণে দুধে-আলতায় গাযের চামড়া। বয়স হলে কী হবে? লাবণিমাখা এমন সুডোল সুন্দবপানা একটা মুখ, শাঁখাসিঁদুরে সত্যি-সত্যি মা-দুগ্গাব আদল। বডমামিমাব নামও তো প্রতিমা। রাধা জানে। সত্যি যেন সোনার-ববণ পিতিমের মুখ।

কী অবাক কাণ্ড। এত বড সাহেববাড়িতে কোথাও নাকি মন বসে না তাঁর? ডাক্তার-হাসপাতাল চলছে। গাগতর ভরে এত যে যন্ত্রণা, ঘুরেফিরে সেই রান্নাঘরেই এসে পড়বেন। খাবার-ঘব থেকে চেয়ার টেনে এনে দেবে বাধা। হয়তো বসবেন কিছুক্ষণ। ফের উঠে দাঁড়াবেন। দিনের বেলায় জানালায়-দরজায় রোদ পডলে অথবা রাতে টিউববাতির ঝলমলে গোটা রান্নাঘরটাই যখন নিউমার্কেট বা কোনো সুপারমার্কেটের সাহেবি দোকানপাটের ধাঁচে চোখ ধাঁধিযে দিতে থাকে, হাত বাড়িয়ে ধরেন এটা ওটা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবেন কিছুক্ষণ বা নিজেই ঘুরেফিরে বেড়াবেন ওদিক-ওদিক। দেশেব বাড়িতে তাঁর নিজেব সংসারে আছে অনেক কিছু। নেই অনেক বেশি। কৌতূহলের দুটো চোখ তখন শুধু রাধাকেই খোঁজে— 'এটা কি রে রাধু? ওটা কী? কী হয এগুলো দিয়ে? তুই জানিস?'

রাধা জানে। বিলক্ষণ চেনে। মায়ের বয়সী এমন কারুর চোখে মুগ্ধতা দেখে, খুবই স্বাভাবিক, সে প্রাণের উত্তাপ পায়— 'এটা মিক্সি গ মামিমা। এটা আরেক ধবনের বেলেন্ডাব। মশলাপাতি গুঁড়নোর জন্যে আর হাড়গোড় ভাঙতে হয় না গ। হলুদ লঙ্কা জিরে সবই তো ভাঙিয়ে আনা যায় বাজার থেকে। এখেনে মাখামাখি সব হয়ে যায়। আটা ময়দা মাখারও কত সুবিধে। কখন কি চাই, যন্তরপাতিরগুলো পাল্টেপুল্টে ঠিকমতো

সাজিয়ে নিলে সব পেয়ে যাবেন গ গ্যারাইন্ডারে...' দোকানী যেমন করে খদ্দের ভোলায়, রাধা বিবিধ সামগ্রী হাতে নিয়ে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, উল্টেপাল্টে অথবা বিভিন্ন অংশ খুলে খুলে এবং জোড়া লাগিয়ে মায়াময় কৌশলগুলি সোৎসাহে উন্মোচন করে যেতে থাকে মুগ্ধ শ্রোতার সমীপে, এবং প্রতিমা, ঠোঁটের ভাঁজে আলগা হাসিটুকু ভাসিয়ে রেখে সোৎসাহে শিখে নিতে চান নিজের অচেনা নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞান, হয়তো-বা কোনো এক বালিকার কাছেই— 'এটা পেশার-কুকর নয় গ মামিমা, রাইস-কুকার। ভাত রান্নার পরও চার-পাঁচ ঘন্টা গরম থাকবে। কিছু হবে নি...' ছুটে ছুটে যায় রাধা। এপাশ-ওপাশ থেকে খুঁজেপেতে আনে যা সে আনতে পারে, যা তার নাগালের মধ্যে— 'স্যান্ডুইচ টোস্টার বলে এটাকে। ইলিকটিরিক টোস্টারও আছে। ইলিকটিরিক কেটলি, ইলিকটিরিকের জুসমেকার। ফলের বসটস করা যায়। নন্-ইস্টিক ফ্যারাইং প্যান। যতই ভাজাভুজি হোক, তলায় লাগবে নি। প্যানহোল্ডার কী বাহারের। অ্যাকুয়গাড গ! জলের জন্যে...' রাধা খেই হারায়। বড়-ইশকুলের হেড-দিদিমণিকে হরেক কিছু শেখাতে চেয়ে নিরক্ষর কিশোরী, অন্য পক্ষের গালেমুখে হালকা একটা হাসিব আস্তবণ একইভাবে জিয়নো থাকতে দেখে, কিছুটা ঘাবড়ে যায়।

মার্বেল-টপ ওয়ার্কিং টেবিলের এক পাশে মশলাপাতির কৌটোকাটা শিশিবোতল অনেক কিছুই এলোমেলো পড়ে ছিল। ওরই মধ্যে একটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে নিজের মনেই নেড়েচেড়ে দেখছিলেন প্রতিমা। ঠিক যেমন দোকানে গিয়ে সবাইকেই পরখ করতে হয় সাধআহ্লাদের জিনিসপত্তর। কপালে ভাঁজ তুলে হিসেব কষতে হয় মনে মনে।

রাধা আরো একবার ছলকে উঠল—'এটা পারলপেট গ মামিমা। আছড়ে মারলেও ভাঙবে নি। এমনধারা আরো কত কি আছে! কত বলব? সবই ত আর নিত্যি কাজে লাগে না। খাবার-ঘরে কাচেব আলমারিতে সাজানো থাকে। এ-বাড়িতে ঘরে ঘরে আলমারি। কত কী যে আছে সেখেনে। কত কিছু—টি-সেট কফি-সেট ডিনার-সেট, নানান সাইজের কী সুন্দর-সুন্দর সব নকশা-আঁকা কাপ পেলেট বাটি গেলাশ...কাঁসা পেতল নেই গ মামিমা। সে-ত দেশগাঁয়ের বাড়িতে পয়সাওলা গেঁয়ো বাবুদের ঘরে থাকে। এখেনে রান্নাবান্নার জন্যে সবই ইস্টিলের বাসনকোসন; খাবারদাবারের জন্যে চিনেমাটি কাচ নয়তো...'

'ডালের বড়ি দিস কি করে তোবা? নাড়ুমোয়া? ওসবের জন্যেও কি মেশিন আছে নাকি তোদের?'

'ওমা, সে-কি কথা?' বাধার মজা লাগে। হেসেই লুটোপুটি—'সবই কি ঘরে হয় নিকি গ? বড়িফড়ি? ওসব ত বাজারের লিস্টিতে থাকে। কিনে আনেন নন্দদা...'

'হুঁ...' নড়ে উঠলেন। হালকাভাবে পা ফেলতেই রাধা আবার উচ্ছল— 'আইসকিরিম করার জন্যে ফিরিজ আছে দু-দুটো। আমি কেক বানাতেও পারি...'

রান্নাবান্নার নতুন লোক এসেছে ঝুমার-মা। ওর কাজকর্ম দেখবেন বলে পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রতিমা—'ওটা কী করছ? পাঁচতরকারিতে এত এত জিরেবাটা কী হবে? মশলাফশলা একদম দিতে নেই। শুধু হলুদ আর একটা-দুটো কাঁচা লঙ্কা...'

হয়তো হাতাখুন্তি কেড়ে নিয়ে নিজেই হাত লাগিয়ে দেবেন কখন! দু-দিন বাদে ছুরি কাঁচি চলবে যাঁর পেটে, তাঁর কাণ্ড দেখে রাধা ভয় পেল। ছুটল মায়ের কাছে।

নিশ্চিতই বাড়াবাড়ি। তড়িঘড়ি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কিরণময়ী— 'কেন এত অশান্তি করছ বলো তো বৌদি? এসেছ অসুখবিসুখ সারাতে। আর আমার ঘরে এসেও তুমি খুন্তি নাড়বে আর লঙ্কা-ফোড়নের গন্ধ শুঁকে হেঁচেকেশে মরবে? কেন, এরা নেই? এরা কে তোমার কথা শুনছে না, শুনি?'

'না, আমি তোমার সংসার দেখছি কিরণ।'

'সংসার কি শুধু আমাব রান্নাঘরেই নাকি?'

'হ্যাঁ গো, সেই তো দেখছি। কত কি দেখার আছে, শেখাব আছে তোমার এখানে। মা-লক্ষ্মী কোথায় গো তোমাব? এ-যে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের সংসাব...'

'আঃ বৌদি, আদিখ্যেতা কববে না তো এ-রকম...' হাসতে হাসতেই প্রতিমাকে দু-হাতে ধরলেন কিরণময়ী। হাতে-পিঠে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন— 'যাও দেখি, আর কিছু না পাবো, ঘবে গিযে শুয়ে থাকো চুপচাপ। ডাক্তাব সেন বলেছেন, এখন তোমার বেস্ট দরকার...'

বয়স্ক মাসিপিসি-মায়েদের কথায় থাকতে নেই ছোটদের। সেখানে প্রবেশের কোনো পথ থাকে না বাধার। ববং এখন তাব অনেক বেশি কাজের সময। রাত হয়েছে। একটু বাদেই খেতে বসবেন সবাই। সব কিছু ধুয়েমুছে সাফ করে তাকে টেবিল সাজাতে হবে। কিন্তু সে তাকিয়ে দেখল, দু-ধবনেব দু-জন মা চলে যাচ্ছেন ঘব ছেড়ে। তাব হরেক মায়ের ভিড়ে, কি-জানি-কেন তাব মনে হয়, বডমামিমার জাত আলাদা। রাধাব লোভ হলো। অনেক বয়সেব বৌদি আব ননদ! ঘরসংসারেব কথাই তো বলবেন ওঁবা? যদি রাধার নাম বলেন একবারটি। সকলের জন্যে সব বকমের যত্নআত্তিতে পরের মুখে একটু নিজের নাম শুনতে চায় সে। কাজকম্মো ফেলে লোভী বেড়ালেব মতোই, ধমক খাবে জেনেও, এগোয় পিছু পিছু। কোনো কিছুই না-শোনাব ভান করে সব কিছুতেই কান পেতে থাকার ইচ্ছে।

'এখন ওখানে বসে টিভিফিভি দেখো একটু। সবাই আছে, কথাবার্তা বলো। আমি এদিকটা দেখছি। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো...' যেতে যেতে বললেন কিরণময়ী — 'বাবনের-বাবার আবার টাইমে-টাইমে লাঞ্চডিনার। ডাক্তার গুহকে দিযে একটা ডায়েট-চার্ট করিয়ে নিয়েছি। সেবাযত্নের একটু গোলমাল হলে তো চলবে না। সারাদিন এত পরিশ্রম করতে হয়। সবই তো শুধু মাথার কাজ...'

'সেবাযত্ন?' হেসেই ফেললেন প্রতিমা— 'সে-কি গো? এসব কথাও চলে নাকি তোমাদের এখানে? এসব শুনলে তো তোমার দাদাবা ধমকেই শেষ করে দেবে আমাদেব।'

'কেন? পুরুষমানুষ! সারাদিন খাটাখাটনি করে ফিরবেন, একটু দেখতে হবে না ওঁকে? বয়সও তো বাড়ছে...'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই। নিশীথবাবু কাজের মানুষ। তাঁর ভালোমন্দ পছন্দ-অপছন্দ তুমি দেখবে না তো দেখবে কে? সবার সব রকম সুখসুবিধে দেখার জন্যেই তো ঘবসংসার মেয়েদের...' শরীর ভরে সত্যি বড় কষ্ট বড়মামিমার। পিছু পিছু হেঁটে রাধা

তাকিয়ে দেখে—এগোচ্ছেন আস্তে আস্তে, পা টেনে টেনে। কথা বলার স্বরও মিহি আর চাপা— 'আমাকে তো আবার রোজ স্কুলে গিয়ে হেডমিস্ট্রেসগিরি করতে হয় দশটা-পাঁচটায়। কখন আর কার সেবাযত্ন করব, বলো। জানি না, কী ভাবেন তোমার দাদা।'

'তোমার আর ভাবনা কি বৌদি? দুটো ছেলেই রত্ন তোমার...' হঠাৎ-ই গলার স্বরে বিষাদ কিরণময়ীর— 'জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পেয়ে গেছে পিনু। কত ভালো ছেলে! কিন্তু কী যে করলে তোমরা? দেখো, এখনও সময় আছে। সুনুকে ইংলিশ-মিডিয়ামে নিয়ে এসো। দিনকাল যা পড়েছে, ইংরেজি না জানলে কিছু হবে না। করবে কী জীবনে?'

'না গো, থাকি কোথায় ঢ্যাড়ঢেড়ে-গোবিন্দপুর চাতরায়-ফাতরায়। মফস্বলের পাড়াগাঁয়ে কি অত সব মিডিয়াম-ফিডিয়াম নিয়ে ভাবলে চলে? সে-হবে যা হবার। ওসব তোমাদের কলকাতার রোগ।'

'আমি কিন্তু...বুঝলে বৌদি, গত বছব বেনারস গিয়ে বাবনের নামে মানত করে এসেছি...' কিরণময়ী সহসা উদ্বেল—'আমার বাবন তো আসছেবার আই. সি. এস. ই. দেবে। তাবপর দু-বছর সাইন্স পড়বে। ভালো একটা লাইন পাইয়ে দিতে হবে তো। ওর বাবা বলছিলেন, আই. আই. টি.-তে ভর্তির জন্যে গোড়া থেকেই অঙ্কের আলাদা একজন কলেজের প্রফেসার-টফেসার রাখতে হবে ভালো। হাজার-বারোশোর মতো বাড়তি খরচ হবে মাসে। তা হোক। ইলেকট্রনিকস কি ও-রকম কিছুতে একবার যদি ঢুকে পড়তে পারে, প্রণাম করে বলে এসেছি, তিন ভরি সোনা দিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে পুজো দিয়ে আসব...'

টিভিব জায়গায়, লাউঞ্জের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ওঁরা।

রাধা আচমকা ধরা পড়ে গেল। চকচকে মোজায়েক ফ্লোরে খালি-পায়ে চোরের মতো হাঁটায় শব্দ ছিল না কিছু। কেন যে পিছন ফিরে তাকালেন মা? বুঝি ওর গায়েরই গন্ধ পেয়ে গেছেন হঠাৎ! চোখ পড়তেই ধমকে উঠলেন— 'তুই? তুই এখানে কী কবছিস? এই দেখো, ন-টা বেজে যাচ্ছে। আমি তো ভাবছি, খাবার-ঘরে সব ধোয়াধুয়ি শুরু করে দিয়েছিস তুই। সেসব নয়, ঘুরঘুর করছিস এখানে?'

দুটো হাতের মুঠো একসঙ্গে ঠোঁটে তুলে ভয়ে সিঁধিয়ে গিয়েছিল রাধা। কী-যে ছাই বলাবলি করছিলেন দুজন মা, মাথামুণ্ডু কিছুই মগজে ঢুকছিল না তাব। কেন যে ছাই পিছু-পিছু এল বোকার মতো! নিজের বোকামি বা আপশোসে চুপসে গিয়ে যখন তার এক ছুটে পালানোর উদ্যোগ, হাত বাড়িয়ে খপ করে ওকে ধরে ফেললেন প্রতিমা —'তোমারই-বা এমন কি ভাবনা কিরণ? বিশ্বকর্মা ঠাকুরের সংসারে থাকতে থাকতে কত ইঞ্জিনিয়ার-ফিঞ্জিনিয়ার এমনিতেই গজিয়ে ওঠে তোমার ঘরে...'

'কেন, এ-কথা বলছ কেন? কী হয়েছে?' ভ্রূকুটি কিবণময়ীর।

দূরবর্তী আলোয় পিঠ রেখে ছায়ার আবরণে প্রতিমার মুখ। আরো বেশি ঘনিষ্ঠতায় মেয়েটাকে বুকে লেপটে নেবার পর, সেই ছায়ার আশ্রয়ে নিজেরও আড়াল পেয়ে যায় রাধা।

'এটুকুন বাচ্চা একটা মেয়ে। লেখাপড়াও তো শেখে নি কিছু। এ-তো দেখছি,

তোমার কিচেন-টেকনলজির সব জানে। অপারেটও করতে পারে যখন যা দরকার। কত কি নতুন নতুন জিনিস শিখলাম ওর কাছে। খুবই ইনটেলিজেন্ট। একে তুমি জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

ভ্রূকুটি থেকে প্রসন্নতায় ফিরলেন কিরণময়ী। নড়েচড়ে দাঁড়ালেন—'এ-কি আর এমনি পাওয়া যায় গো? গড়েপিঠে বানিয়ে নিতে হয়। আমাদের ড্রাইভার কালী নিয়ে এসেছিল ওদের গ্রাম থেকে। যখন এসেছিল, উঃ সে-যদি দেখতে। ছেঁড়া ময়লা একটা জামা পরে ভিখিরির মতো। এখন দেখছ তো! কি-রকম বদলে গেছে। ওকে ছাড়া এখন আর চলেই না আমাব...'

বড়মামিমার বুকেব সঙ্গে সেঁটে গিযে শীতল থেকে শীতলতব হতে থাকে রাধা। এমন সোহাগ দিযে তাকে আগলে ধরে নি কেউ কোনোদিন। নিত্যিদিনের মায়ের দিকে তাকাল চোখ তুলে। তার মরণ বাঁচনেব-মা। মালিকমনিব-মা। সেখানে শুধু একটু নাম চেয়েছিল সে। অনেক বড় বড় ঘবের ভাগ্যিমানী মাযেদের মুখে এমন করে নাম ফেটে পড়বে তার, ভাবনার মধ্যে ছিল না বলেই হয়তো, আচম্বিতে বড়মামিমাকে আরো নিবিড় করে নিয়ে, জাপটে ধরে পৃথিবীতে কারুর একজনেব, কোনো একজন মায়ের মেয়ে হয়ে ওঠার সাধ হলো তার।

রাধা যা জানে না

আজীবন শহরতলির মানুষ তথা মফস্বল কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রবীণ অধ্যাপক ভবতোষ ভট্টাচার্য নিতান্তই প্রয়োজনবোধে স্ত্রীর সুচিকিৎসার তাগিদে ভগ্নীগৃহে এসেছেন। ভগ্নীগৃহ উপলক্ষ মাত্র। অভীষ্ট—কলকাতা। কলকাতা শহরে ভুবনজোড়া খ্যাতির স্পেশালিস্টরা থাকেন। নামীদামি নার্সিংহোম, সর্বাধুনিক মেডিকেল টেকনলজির প্রয়োগকৌশল, পাঁচতারা হোটেলের সাযুজ্যে মৃত্যুঞ্জয় হাসপাতাল।

জীবনরক্ষাহেতু এতদ্দেশীয় কতিপয় লোকমান্য মহাত্মার প্রায়ই পশ্চিমী দুনিযায় পাড়ি দেবার একটি রেওয়াজ স্থায়ী হয়ে উঠেছে। সুতরাং মফস্বলবাসী সুধীজনদের সংক্ষিপ্ত ভূমণ্ডলে কলকাতা শহরই হয়ে উঠতে পারে সেই প্রার্থিত চন্দ্রলোক।

কিন্তু মুশকিল, ভবতোষ বা তদীয় পত্নী প্রতিমা গ্লোবাল টেন্ডারে খেলতে জানেন না।

কলকাতায় কোনো হোটেলে ওঠা যেত অথবা ভবানীপুরে নিজস্ব শ্যালিকাগৃহে অথবা নিউ আলিপুরে সরকারি আবাসনের ফ্ল্যাটে, বাল্যবন্ধু সুধীব বড়ুয়ার আতিথ্যে। সেক্ষেত্রে, বলাবাহুল্য, নিশীথবঞ্জন নিশ্চিতই অসম্মান বোধ করতেন। কেন না, পারিবাবিক বা সামাজিক কর্তব্যপালনে তিনি যথার্থই অকৃপণ এবং উদার।

অথচ ভগ্নীগৃহের সংকট—এবা পাড়ার-ডাক্তার মানে না। যৎসামান্য সর্দিকাশিজ্বর গলা-ব্যথা বা সাধারণ কাটাছেঁড়ায় পর্যন্ত ডাকসাইটে ডাক্তারের চেম্বারে ছোটে অথবা নিদেনপক্ষে টেলিফোন। হাজার টাকা মাসোয়ারায় কী-এক স্থায়ী ব্যবস্থাও নাকি আছে

সল্টলেকে কোন্ এক ধনাঢ্য সমবায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সুতরাং ভবতোষ-প্রতিমা যেদিন এসে পৌঁছলেন, কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করে কিরণময়ী তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে দাদা-বৌদির প্রতি ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতায়, গাড়ি চেপে দক্ষিণ কলকাতার বেকবাগান এলাকায় যে-ডাক্তার বা যে-নার্সিংহোমে বৌঠানকে এনে উপস্থিত করলেন, সেখানে ব্যাধির উপশম অবধারিত জেনেই ভবতোষের রক্তচাপ বৃদ্ধি পেল। বিবিধ প্রকারে, ই. সি. জি. নানাবিধ রক্তপরীক্ষা, মলমূত্রেব হিসেবনিকেশ, আলট্রাসোনোগ্রাফ, এল. এফ. টি. ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়াকাণ্ডের শেষে দিনকয়েকের মধ্যেই তাঁর নবতর উপলব্ধি—বেঁচে-থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনে সাধারণ গৃহনির্মাণশেষে যদি আই.টি.ও.-রা হানা দেন, তবে রোগনিরাময়ের অর্থব্যয় আয়করমুক্ত হয না কেন? অথবা আরোগ্য-প্রার্থনাব দাবিতেই কৃষ্ণবর্ণ মুদ্রার গোপন সঞ্চয় কেন এত জরুরি!

নিতান্তই মফস্বল কলেজের ছা-পোষা অধ্যাপক। সবকারি অর্থে দূরদেশে কোনো সেমিনাব বা কংগ্রেস-ফংগ্রেসের আমন্ত্রণ কোনোকালেই জোটে নি কপালে। নিজেব পয়সায় দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতাও খুব বেশি নেই। বড় শহরের বড় হোটেলে সুখবাসের একটা কাল্পনিক ধাবণা অবশ্যই ছিল কিন্তু তদ্সংক্রান্ত কোনো রকম অভ্যস্ততা ব্যতিবেকেই তাব সমস্ত প্রাপ্তিটুকু সলুভ যেখানে, ভগ্নীগৃহে আরো এক বাড়তি সুবিধা—এটা আপনঘর তাঁর। সহোদরার আতিথ্যেও খামতি ছিল না কিছু। ববং অতিবিক্ত স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর সবিশেষ মনোযোগই অস্বস্তির হেতু হয়ে উঠল খানিকটা। দোতলায় যে-দুটো ঘরে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তাব একটিতে অতিথি-দম্পতি শীতার্তবোধে বড় বেশি কুঞ্চিত। ভাইফোঁটার দিনে ভগ্নীগৃহে সপরিবার আগমন এবং উৎসব শেষে ফিরে যাওয়া, বড়জোর এক রাত্রির অবস্থানই চিরাচবিত প্রথা। কিন্তু দীর্ঘকালীন রাত্রিবাসে ভিন্নতর সমস্যা—এ-বাড়িতে গোটা সাতেক ওয়ার্ড্রোব থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোনো ধুতি নেই। অনেক খুঁজে পেতে যেটা পাওয়া গেল, প্রায় হাত খানেক চওড়া মেটে রঙেব মোটা-মোটা দাগে জলচুড়ি-পাড় এখনও তাজা। কবে কোন্ এক সময় কোথায় নিশীথরঞ্জন উপহার পেয়েছিলেন, অব্যবহারে আজও আনকোরা নতুন। সেটা বাতিল করলে আরেক ঝকমাবি—উচ্চতার মাপে ভবতোষ প্রায় দশ-বারো সেন্টিমিটার খর্বকায় এবং প্রস্থে মেদসঞ্চয়ে কিছুটা স্ফীত বলেই ভগ্নীপতির গৃহবাসের আলিগড়ি পাযজামাগুলো বেঢপ লম্বা এবং কোমরে-হাঁটুতে যথেষ্ট আঁটোআঁটো। অগত্যা ভরসা করতে হয় নিজের ওপরই। প্যান্টশার্ট ছাড়া ঘরে-পরার জন্য যা তিনি সঙ্গে এনেছেন, সেগুলো তাঁব নিত্য-অভ্যাসের গোটা কয়েক লুঙি।

নিতান্তই শিশুর সারল্যে ছোটমেয়ে বুলবুলি বলে বসল আচমকা—'বড়মামা, ইউ লুক লাইক আওয়ার নন্দদা অ্যাট দ্য গেট। আর ইউ সো পুয়োব লাইক হিম?'

এবম্বিধ শব্দগুচ্ছ বা বাক্যে গুরুতর কোনো অপরাধ ছিল না। কেন না, শিশুদের কোনো অপরাধ থাকে না। কাছাকাছি যারা ছিল, হেসে ফেলল সকলেই।

'এ-কি? এ-কী অসভ্যতা? এ-রকমই বাঁদরামো শেখা হচ্ছে তোদে-? বড়মাম্ গুরুজন না?' হাত উঁচিয়ে মেয়ের গালে একটা চড়থাপপড় মারতেই উদ্যত ছিলেন কিরণময়ী।

ভবতোষ রুখে দিলেন—'কী করছিস? ওটুকুন বাচ্চা শিশু। ওর কী দোষ? ওসব গরিব মানুষফানুষ ওরা দেখেছে নাকি কোনোদিন? যা জানে, যেটুকু দেখেছে, তাই বলেছে।'

'বাঃ, তাই বলে তোমাকেও বলবে এসব?' শাসনের ঝাঁঝে প্রবল দাপট ছিল। সন্তানদের দিকে তাকালেন কিরণময়ী—'জানিস, আমার চেয়েও কত বড় তোদের বড়মাম্? আমিও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আমরা কত ভালোবাসি আমাদের বড়দাকে।' সন্তানরা স্তম্ভিত। হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে। হোয়াট এ ক্যুইয়ার ওয়র্ল্ড? বড়মাম্ কলেজের প্রফেসর? বাড়িতে গেস্ট হিসেবে লাইক অল আদার বেঙ্গলি ধোতি অর লোঙিওয়ালাস, ভারিক্কি চালেব মানুষটা দো নট এ ব্যাড ম্যান, এ বিট আউটডেটেড অ্যান্ড আউট-অব-ফ্যাশন ওল্ড গাই। ক্রিকেট বোঝে না, স্পোর্টস-ওয়র্ল্ড ফিলম-ওয়র্ল্ড মডার্ন-ফ্যাশন-ক্রেজের খবর কিছুই জানবে না, রক-ওয়র্ল্ডকে বলে মড়াকান্না, কমিক-বুক দেখলে চটে যায়, ক্যুইজকে বলবে হাফজান্তার পণ্ডিতি, স্টোনওয়াশ জিনস নাকি ভুসোকালিব কাকতাড়ুয়া। কাকতাড়ুয়া কি জিনিস, সে-ওরা জানে না অবিশ্যি। মাকে-মামিমাকে হাসতে দেখেছিল। ওদেব ভাইবোনদের রাগটা চড়ে গিয়েছিল আরো বেশি। ভাইফোঁটাব ধানদুব্বো আর গাল-ফোলানো শাঁখের-ফুঁযে স্নিয়ারিং নেই। অথচ টিভি-অ্যাড হিন্দি-ফিলম পপসঙ পপ-মিউজিক ওয়াকম্যান ব্রেকড্যান্স—কিছুই দেখে না শোনে না বোঝে না চেনে না জানে না...ওল্ড ম্যান উইথ লোঙি অ্যান্ড থানকুনি লিভস অ্যান্ড ইশপগুল পাউডাব...আ! হোযাট এ প্রফেসর? যাস্ট এ কপিবুক অব নন্দদা...

এবং ভবতোষও তাঁর বাংলা না-জানা ইংরেজি-না-শেখা বাবলগাম লালপপ ভাগনে ভাগনীদের হৈহল্লায় বিপন্নবোধে অথবা কৌতুকে অথবা আত্মসংবক্ষণে পাটভাঙা লুঙি আর পাঞ্জাবিও যে ভিন্নতর কোনো সম্ভ্রম-আভিজাত্যের ভার বইতে সক্ষম—এমত হৃষ্ট প্রমোদে অথবা ওদের চোখে দাবিদ্র্যের প্রচ্ছদ নিয়েই তাঁর টানটান ঋজুতায় নিজেকে ভাঙতে চাইলেন।

রাধা যা জানে—
পরিত্রাণায় সাধুনাম্

কিবণময়ীর ঘরে বসে একদিন সন্ধেবেলা কিছুটা ঢিলেঢালা ভঙ্গিতেই কথাপকথন চলছিল সকলের— ঘরকন্নার কথা, অতীতস্মৃতি, আত্মীয পবিজনবার্তা। ছেলেমেয়েরা চঞ্চল ছিল। কাছে ডাকলেন ভবতোষ— 'জানিস, তোদেব মা যখন ছোট ছিলেন, ঠিক তোদের বয়সী...'

বাচ্চাগুলো লাফিয়ে উঠল। হোয়েন মাদার ওযজ এ চাইল্ড? আ, হ্যাড সি এভার বিন চাইল্ড লাইক আস? হোয়াট এ গ্রেট ফান! এবং কৌতূহলে—'দেন দ্য মম হ্যাড হার মম ওয়ানস টু স্কল্ড হার?'

'অব কোর্স সি হ্যাড। তোদের দিদা, গ্র্যান্ডমাদাব...'

অলস শিথিল ভঙ্গি থেকে আচমকা নড়েচড়ে বসলেন কিরণময়ী। তাঁর শৈশব? খুলনা জেলা? কী যেন গ্রামের নাম? বাহিরদিয়া? এখন বাংলাদেশে। দেশটা বিদেশ ছিল না তখন। মাঠ আকাশ খাল বিল দীঘি পুকুর গাছপালা নিয়ে মস্ত শরিকি উঠোন ঘিরে টিনের চালে নিজেদের কাঁচাঘরটা মনে পড়ে যায়। সবটা নিয়ে পুরোপুরি মনে পড়ে না। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের কাটা-কাটা ছোঁড়া-ছেঁড়া পুরনো দিনগুলি? তাকালেন অগ্রজের দিকে। শুধু দাদারা, বড়দাই তো একমাত্র মানুষ এখন, এক ঝামটায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই বিদেশের শৈশবে যেখানে চাইলেই পাওয়া যেত না সব। পাবার আকাঙ্ক্ষাগুলি মরে যেত না-পাবার যন্ত্রণায়। বাবা স্বদেশী করতে গিয়েই মাকে বড় কষ্টে ফেলে দিয়েছিলেন। অনেক বড় যৌথ-পরিবারে এতগুলো ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর খরচ মেটাতেই মা ফতুর।

'আমাদের মা ছিলেন ঢাকা জেলার মেয়ে...' ভবতোষের স্মিত ওষ্ঠাধরে, ছোট পাখি ময়না বা চন্দনা ডানা ছড়ালে যেমন, ভরাট গালের মাংসল হাসিটুকু ছড়িয়ে থাকে প্রসন্ন বিস্তারে—'ঢাকা থেকেই মা আমাদের গ্রামে আমদানি করলেন মাঘমণ্ডল ব্রত। তাঁর একমাত্র মেয়ে তোদের মা। ওনলি ডটার। তাঁরই ইচ্ছেয় আমাদের দেশের বাড়িতে তোদের মাকে সেই ব্রত করতে হতো রোজ ভোরবেলা...'

'ইউ সে ব্রাটো? হোয়াট ইজ দ্যাট?' কিশোর বাবন। বিস্ময়ে।

'অনেক রকম পুজো হয় না আমাদের? সে-রকমই একটা পুজো। মাঘমণ্ডল...'

'ম্যান্ডেলা?' মুনমুন, নেহাতই অবোধ চোখে—'দ্যাট ব্ল্যাক লিডার আব সাউথ আফ্রিকা?'

ভবতোষের মাথায় হাত। কী সর্বনাশ।

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন কিরণময়ী—'আরে ধ্যাৎ, সে-তোরা বুঝবি না। তোদের মতো এত সুখের শরীর ছিল নাকি আমাদের? মাঘ মাস রে। আমাদের খুলনায় দেশের-বাড়িতে সে-যে কী কনকনে ঠাণ্ডা রোজ ভোরবেলা! কুয়াশায় ঘরবাড়ি গাছপালা দেখা যেত না কিচ্ছু। সেই হাড়কাঁপানির শীতে, পুরো মাঘ মাস, রোজ সূয্যি ওঠার আগে ভোরবেলা মা ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতেন পুকুরঘাটে। পা ফেলতে পারতাম না মাটিতে। ঘাসের ওপর মুক্তোর মতো টশটশ করত হিম। পায়ে জুতো পরারও চল ছিল না তখন। খালি-পায়ে যেতে হতো। উঃ, কী যে কষ্ট! পাড়ার আর সব মেয়েরাও থাকত সঙ্গে। পুকুরের জলে হাত ছোঁয়ানো যায় না। তোদের ফ্রিজের চেয়েও ঠাণ্ডা। আর আমরা, ছোট ছোট কুমারী মেয়েরা... কত হবে তখন বয়স? এই বুলবুলির চেয়েও ছোট, অনেক ছোট—পাঁচ ছয়। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে কাদামাটি দিয়ে সূয্যিঠাকুরের পুতুল গড়ে পুবদিকে মুখ করে সুর করে ব্রতকথা গাইতাম—ওঠো ওঠো সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া, তোমারে পুজিব আমি বনফুল দিয়া...'

কথা আর কথা! কথায় মেতেছেন কিরণময়ী। ছেলেমেয়েদের সামনে রেখে এ-যেন তাঁর সত্যি-সত্যি নতুন করে শৈশবে ফিরে যাওয়া—'বড়দা, দেখো দেখো...কী আশ্চর্য! এখনও মনে আছে আমার? ছড়াটা পুরোটা বলতে পারি। ওবে বাব্বা, কত...কত বছর হলো, বলো তো? সেই কবে! উঃ, ভাবাই যায় না...

হঠাৎ-ই পাক খেয়ে, কিরণময়ী, নিজের ভালো-লাগার উত্তাল খুশিতে প্রতিমাকে জড়িয়ে ধরে—'জানো বৌদি, সকালে মাঘমণ্ডল আব রাতে উঠোনে চালেব পিটুলিগোলা দিয়ে আলপনা এঁকে তারাব্রত...'

মাথামুণ্ডু কিছুই না বুঝে বাচ্চাগুলো তাকিয়ে ছিল। দেখছিল মাকে। মা হঠাৎ খুশি। খুশিতে খুশিতে বদলে-যাওয়া মায়েব অঙ্গভঙ্গে, সুহাসিনী মায়ের প্রাণময়তায ওবা নিজেবাও অবাক। এ-যেন অন্য এক মা হয়ে যাওয়া।

বাবন ফ্যালফ্যাল চোখে—'হোয়াট আর ইউ স্পিকিং অ্যাবাউট বড়মাম? কী ব্রত-ব্রত বলছ? হোয়াট ইট মিনস্ অ্যাকচুয়েলি?'

'ব্রত? ব্রত মিনস...' ভবতোষ আচমকা বিপাকে। দু-হাতেব পাতায আঙুলগুলো অনেকটাই গোলকিপাবেব বল ধরার ভঙ্গিতে শূন্যে নড়তে থাকে—'এই...এই ধব ব্রত মানে এ-টাইপ অব বিচুয়াল। সামথিং লাইক...'

কিবণমযী অকুতোভয়—'আঃ, কী যে হযেছিস তোবা আজকাল। তাবাব্রত রে। তাবা চিনিস না? আকাশের তাবা। কি যেন বলে? ধ্যাত্তেবি। বল্‌না ছাই। হ্যাঁ নক্ষত্র। নক্ষত্র মানে স্টার। স্টাবের পুজো...'

'ফিল্ম্ স্টার মা? ফিল্মস্টারের পুজো?'

মাত্র দশ বছরে খুকি মেয়ে বুলবুলি অবশ্যই নিষ্পাপ। কিন্তু ঘর ভেঙে পড়েছে ভবতোষ আব প্রতিমার হাসিতে। লজ্জিত কিবণময়ী—'দেখেছ? শুনেছ বৌদি? বলো দেখি, কি করি এগুলোকে নিয়ে? মুখে যা আসবে তাই বলে যাবে যেখানে-সেখানে? তোমবা রয়েছ। তোমাদের সামনেই?'

এমতাবস্থায় ভবতোষ জানেন না, কী বলতে হয়। বিবাহিতা সহোদরা এখন আব তাঁব নিজস্ব লাটাইয়ের সুতো নয়।

অষুধ খাবেন প্রতিমা। চিনেমাটির প্লেটে কাচের গ্লাশ সাজিয়ে ফ্রিজ এবং অফ্রিজেব মেশামেশি জল নিয়ে ঘবে ঢুকল বাধা। ভবতোষের বেহাই—'এই যে বাধু। কি রে বাধু, তুই তো জানিস। ব্রতকথা হয না তোদের গ্রামে? দেখেছিস?'

'বর্ত গ মামাবাবু?' সাহেববাড়িব বড়মানুষদের বৈঠকি-আলাপে হঠাৎ এমন সাদব পাত্তা পেয়ে রাধাও ভরপুর খুশি। খলবলিয়ে উঠল সে—'সেই পুণ্যিপুকুব মঙ্গলচণ্ডী আমবাবুণি...সেই বর্ত? হুঁ, কত্ত হয। কত্ত দেখেছি আমাদেব গাঁয়ে। মাসিপিসি দিদিবা সব্বায় কবেন...'

'হ্যাঁ রে,...' হঠাৎ কিবণময়ী—'আমি যখন তোর বয়সে তোর মতো গ্রামের মেয়ে ছিলাম, আমিও ব্রত করেছি, উপোস করেছি কত। সে-কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ।'

গাঁয়েব মেয়ে ছিলেন মা? চমকানিতে ছলকে উঠতে পারত জল। হাত ফসকে পড়ে যেতে পারত কাচের-গ্লাশ। ঘবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাধা চলচ্চিত্র-কায়দায ফ্রিজ। আড়বুঝ একজোড়া চোখ কথা বলতে ভুলে যায়। মায়ের দিকেই তাকিযে থাকে সে। মাকে দেখে। রাজার ঘরের রানীরা তো রাজকন্যে থাকে বিয়ের আগে। ঘরে পড়ার আটপৌরে শাড়িতে যাঁর ভাঁজ কুঁচকোয় না কোনোদিন, হাউসকোটের বং বদলায সকালে-বিকেলে, হাতেকানেগলায় গা ভরে নিশিদিন সোনা ঝলসায় যাঁব কিংবা মস্ত সাহেববাড়ির

জৌলুসে এতগুলো দাসদাসী ওঠে বসে নড়ে কাঁপে যাঁর দুটো হাতের দশ আঙুলে, তিনি ব্রত করে নাইতে যাবেন পানাপুকুরে শ্যাওলা-পেছল ঘাটে? কোন্ দুঃখে?

'কি রে, কী হলো তোর?' ঘরের মানুষগুলো সবাই তাকিয়ে আছেন এবং কিরণময়ী — 'ভ্যাবলারমতো দাঁড়িয়ে কী দেখছিস তুই?'

রাধা নাড়া খেল। এগিয়ে এসে সন্তর্পণে জলের-গ্লাশটা সে রাখল বড়মামিমার হাতেব নাগালে সাইড-টেবিলে এবং তখনও মগজের সুড়সুড়িতে নতুন বিস্ময়ের ঘোর লেপটে থাকে। বড়মানুষের ঘরে বড় বড় হেঁয়ালিগুলো সে বোঝে না ঠিকমতো। তবু একটা হিসেব মেলানোব চেষ্টা থেকেই যায়। তিনতলার ছাদে মায়ের ঠাকুরঘরে মায়ের নিত্যিপুজোর মাহাত্ম্যই আস্তে আস্তে বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে থাকে। এমনটাই হয় হৃদয়ে ভক্তি থাকলে। দেশগাঁয়ে বামুনবাড়ির ঠাকুমার কাছে শুনেছে সে—ভক্তি করে ব্রত পালন করলে গবিব ঘরেব দুঃখী মেয়েবাও বাজপুত্তুর বব পেযে যেতে পারে। ধাঁধাটা থেকেই যায়। বাববাব মায়ের দিকে তাকায়। নতুন কবে দেখে সাহেববাড়ির মাকে। হয়তো এমনি কোনো ব্রত করতেন মা-ঠাকরুণ। ব্রত করে, পুজো দিয়ে, উপোস কবে কবেই এখন এমন বাজরানীব সুখ!

'মেয়েদেব ব্রতকথাগুলো, বুঝলে, আমাব মনে হয়, আদৌ পুজোটুজোর কোনো ব্যাপাবই নয়। ধর্মটর্মের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই...' শাড়ির তলায় গোড়ালি অব্দি ঢেকে খাটের ওপব হাঁটু ভেঙে বসে ছিলেন প্রতিমা। রাধার হাতে জল দেখেই রাংতাব খোলস ছিঁড়ে ক্যাপসুল তুলে নিযেছিলেন। হাত বাড়ালেন গ্লাশের জন্য—'মন্ত্রটন্ত্র নেই, পুরুতঠাকুব নেই। মেয়েরা নিজেদের ভাষায় নিজেদেব মতো কবে কিছু প্রার্থনা জানায। ইট ইজ বেটাব টু সে, প্রেযার...'

'ইআআ, সে দ্যাট...' বুলবুলি লাফিয়ে উঠল হঠাৎ কিছু খুঁজে পেয়ে—'ইয়োর ব্রত ইজ সামথিং লাইক আওয়ার প্রেয়াব? হোয়াট উই ডু ইন আওয়ার প্রেয়াব ক্লাশ ইন স্কুল। উই রিড বাইবল, উই প্রে টু যেশাস ক্রাইস্ট...'

'ওই হলো আব কি। এবাব তোদের ফটফট থামা দেখি একটু...' ঘরগেরস্তালির কাজে ব্যস্ত হযে ওঠাব আগে কিরণময়ী—'তোদের যিশুখৃষ্ট! আর আমাদের সময সেটাই ছিল আকাশেব চন্দ্রসূয্যিতাবা...'

অসম্ভব। তড়াক কবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছেন ভবতোষ।

ওকে ছাড়ল কে এভাবে? কিংবা বাত নটার পর ওকে ছেড়ে রাখাই নিয়ম যেহেতু, নেহাতই ডিউটি পালন কবেছে নন্দ এবং ছাড়া পেয়ে ওদের নৈশ প্রহরী, হায়না গোছের ভয়ঙ্কর জানোয়াবটা লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে ঢুকে পড়েছে দোতলায ঘরের ভেতর। বাইরের চোবডাকাতকে ঘবে ঢুকতে না দেবার জন্যেই যার এত রেয়াত, ঘবেব অতিথিকে বাইরে চালান দেবাব ভিন্নতর কোনো কৌশলও হতে পারে। লোকবিশ্রুত জননেতাব গৃহে টেবরিস্টের প্রবেশ যেমন, গদি-আঁটা স্টিলের-চেয়ারের আরাম কেন যে এমন কণ্টকাসন অকস্মাৎ—এক লহমার হৃদচাঞ্চল্যে, আচমকা হার্টব্রেকের পক্ষে যথেষ্টই হতে পারে সেটা, এবং গলদঘর্মে দু-হাত তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ভবতোষ পরিত্রাণ খোঁজেন।

কৈফিয়ত বা জরুরি এস. ও. এস. চাইবার কেউ নেই। রাধাকে নিয়ে কখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে কিরণময়ী।

অন্যদিকে, আর্তনাদে, মোচড় দিয়ে গোটাতিনেক পাক খেয়ে, খাটের ভেতরের দিকে চলে গিয়ে সন্ত্রাসে কাঁপছেন প্রতিমা। ভয়ার্ত চোখের সান্ত্বনা—বুঝি খাটের ওপর লাফিয়ে উঠতে পারে না চতুষ্পদ। হেডমিস্ট্রেসগিরির শাসনে—'এ কি? ঘরের ভেতরে এটা কেন?'

কিন্তু কী অসভ্য ছেলেপুলেগুলো? দু-দুটো মানুষকে ঘরের মধ্যে এ-অবস্থায় দেখেও হাসছে লাফাচ্ছে? বকলসটা ধরছে না কেউ? বরং চেঁচিয়ে উঠল বাবন— 'ইট ইজ ডোবারম্যান বড়মাম, নেভার ট্রাইস ইটস টিথ অন এনিওয়ন। ইফ সামওয়ান হু বিপালসেস কাম হোম, ইট যাস্ট মেকস হিম প্যানিকি...'

শিশুবাক্য মিথ্যে নয়। সত্যি, কিছুই করে নি জন্তুটা। করোটি সদৃশ মুণ্ডুটা উঁচিয়ে তুলে শিকারী চোখে একবার তাকিয়েছিল মাত্র। কিংবা যখন হাঁ-হাঁ জিভের ক্রূরাচারে হাঁটুর কাছে গন্ধ শুঁকতে এল, ভবতোষ তাঁর ছাপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ়ত্বে পেটের ভেতর হাত-পা-সিঁধনো আতঙ্কে বিভীষিকায় লাফঝাঁপে তামাশা বানিয়ে তোলা, বিশেষত হৈ-হট্টগোলে মেতে-ওঠা বাচ্চাগুলোর সামনে যথেষ্ট ছেলেমানুষী জেনেই এবং ভেতরে ভেতরে যেহেতু কাঁপুনিটাও মিথ্যে নয়, হিসেব বুঝে নিয়ে পিছোলেন এক-পা দু-পা এবং যখন ডাকসাইটে বাঙাল মামাকে অসহায় করুণ অবস্থায় দেখে অবোধ মজায় হাততালিতে হুল্লোড় তুলেছে বাচ্চাগুলো, নিজেকে স্বাভাবিক রাখার দিগদাবিতে বাঁ-হাতের মুঠোয় লুঙির কোঁচাটা তুলে রাখতে হয় উঁচু করে। পা ফেলার কায়দা খুঁজতে হয় সাবধানে। যথাসাধ্য সসম্ভ্রম পলায়ন প্রক্রিয়ায় নিচু মাথায় তাকিয়ে থাকতে হয় জানোয়ারটার দিকে। চশমাটা গড়িয়ে পড়তে চায়। ডান হাতের আঙুলের ডগায় ঠিকঠাক রাখতে হয় যথাযোগ্য নাসিকাস্থানে। চৌদ্দ বছরের বনবাসে একটাও বাঘভল্লুকের উল্লেখ নেই রামায়ণে। বালী সুগ্রীবরা দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ—বিতর্ক আছে। দশমুণ্ডওলা রাবণ ছিলেন একজন। লোকটার সঙ্গে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধানো সম্ভব। ভয়ঙ্কর হিংস্রতা দেখেন নি শ্রীরামচন্দ্র। বনবাস মনোরম। কিন্তু একটা নেকড়ে যদি ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর? ভবতোষ নিরস্ত্র মেঘনাদ। গৃহবাস অরণ্য।

কিরণময়ীর গলার স্বর শোনা যায় ঘরের বাইরে। কেন চেঁচাচ্ছে, কাকে ধমকাচ্ছে, কার মুণ্ডপাত—বোঝা মুশকিল।

'টাইগার টাইগার, নটি...ভেরি নটি। কাম হিয়ার...' নচ্ছার বাচ্চাগুলো হাসছিল তারস্বরে। অথচ মজা করেই জানোয়ারটাকে ধরছে না কেউ। হয়তো ওদের প্রলয়োচ্ছ্বাসকেই, ঘরের ভেতর মজাদার কিছু ঘটছে মনে করে নেহাতই তামাশার লোভে ছুটে এল রাধা এবং ঘরে ঢুকেই এক পলকে ঘটনাটা বুঝে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝেয়। হাঁটু ভেঙে বসে দুর্ধর্ষ ভয়ালকে জড়িয়ে ধরে যখন দুজনই মাথায়-মাথায় সমান-সমান, জানোয়ারটার গায়ে গাল ঘষে মাথা ঘষে চুমু খেয়ে আদরে-আহ্লাদে উচ্ছল সে-মেয়ে— 'কিছু হবে নি গ মামাবাবু। কিছু করবে নি আমাদের বাঘা। আমার সোনামণি...'

সোনামণি? সোনামণি কী? কেন সোনামণি? অতিথিরা জানেন না ইতিবৃত্ত। ফ্রক-পরা বাচ্চা একটা মেয়ের আশ্লেষে বীভৎস ভয়ঙ্করকে এভাবে শান্ত দেখে নিজেদের নিরাপত্তা বোধেই যখন স্নায়ুকেন্দ্র থেকে বরফ গলছে সারা দেহে—বরফ নয়, আসলে দেহের ভেতরে-বাইরে নিশ্চয়তার স্বেদস্রোত এক প্রকার, স্বস্তির আরাম। ভয়টা অকারণ ছিল, নিশ্চিত জেনেই, অহেতুক আতঙ্ক থেকে নিষ্কৃতির পর শান্ত হতে সময় লাগে এবং নতুন করে নিঃশ্বাস ফিরে পেয়ে ভবতোষ পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল টেনে ঘাড়গর্দানা গাল কপাল মোছেন। হাঁপাতে থাকেন। মিথ্যে সন্ত্রাস বা নিজের মূঢ়তায় ক্লান্তি অগাধ।

তাকালেন স্ত্রীর দিকে। রুগ্নদেহে কোমর ঘেঁষটে খাটের সামনের দিকে এগিযে এসে, বুকেব মধ্যে হাত-পা গুটিযে সিঁধিযে থাকাব সংকোচন থেকে খোলামেলায় হঠাৎ মুক্তি পেযে পিঠেব আঁচল টেনে, হাঁপ ছেড়ে, গালগলা মুছছেন প্রতিমা। এরপবও রেহাই থাকে না। সম্মুখবর্তী আরো এক দৃশ্য চমৎকাব।

মেঝেতে লেপটে বসে জানোয়ারটাকে দু-হাতে জাপটে ধরে ওর পিচ্ছল রোমশ গাযে গাল ঘষছে চুমু খাচ্ছে সে-মেযে। দুটো গালে এপাশ-ওপাশ হঠাৎ দুটো সজোর থাপপড়—'মামাবাবু রে, মামাবাবু আমাদের। বড়মামিমা! কত বড মানুষ। কত মান্যিজন। পফেসার রে! বড় ইশকুলের বড়-দিদিমণি। মুখপোড়া, রাস্তার নেড়িকুত্তা হয়ে গেলি বে তুই? অ্যাদ্দিনেও চিনলি না ঘরের মানুষদেরকে?'

এবং ঘরের-মানুষ ভবতোষ ঠিক-ঠিক ঘরেরই মানুষ কিনা, সংশযে, এদের বাড়ির বন্যসম্পদ অথবা আরণ্যক বিভীষিকায় হাসতেও পারছেন না চটজলদি। রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক থেকে যে মুক্তি দিতে পারে মানুষকে, যত বাচ্চা খুকিই হোক, মূল্য দিতেই হয় অভয়াকে। ছোট করে হেসেই ফেললেন প্রতিমা। হাসিটুকু রাধার জন্য। ওষ্ঠাধরে ঝলসে উঠে, স্বামীর চোখে চোখ পড়তেই, চকিতে মুছে গেল। যতই ওকে আগলে রাখুক মেয়েটা, এমন একটা জ্যান্ত উৎপাত তো থেকেই যাবে এদেব ঘরে! গোড়ালিব দিকে শাড়ির ঘের ডান হাতে চেপে ধবে, গোটা শরীরে মোচড় দিয়ে আস্তে আস্তে খাট ছেড়ে পা দুটো ফেললেন মাটিতে। ঘর ছেড়ে কোথায় আব যাবেন? ভয় নয় সবটা। ক্রোধ বা বিবক্তিও হতে পাবে। এমন করে নাস্তানাবুদ হওযাব চেয়ে বোধ হয় কোনো হোটেলও ছিল ভালো।

নিশীথরঞ্জন কাজের মানুষ। তদুপরি পাক্কা সাহেব। জীবনযাপনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো আঁটোসাটো শক্ত জোয়ারিতে বাঁধা। কোথাও কোনো ব্যত্যয় ঘটলেই সমূহ বিপর্যয়। সুবিশাল দেশেব অর্থনৈতিক মহামণ্ডলে যে-তীব্রগতি উত্থান-পতন বা ধাবমানতা, সেখানে প্রতি মুহূর্তের ঘূর্ণিপাকে টাল সামলে চলতে হয় যাঁকে, তাঁর সময় নেই, অবসর নেই। বিশ্রম্ভালাপের বাসনাও খুব কম। অনাবশ্যক তরল আবেগ না থাকারই কথা। সম্ভ্রম বক্ষায় অবশ্যই মিতভাষী। শিষ্টাচাবে অতিশয় সজ্জন।

কলকাতাবাসে পর্যাপ্ত অবকাশ ভবতোষেরও খুব বেশি নেই। স্ত্রীর সুচিকিৎসার স্বার্থেই যাবতীয় ব্যবস্থাপত্র অর্থসংস্থান বা দুরন্ত ছুটোছুটিব টেনশনে তাঁকেও শান্ত থাকতে

হয় পববাসে আত্মীয়ভবনে। রাতে খাবার-টেবিলে অথবা অধিকতর রাতে নিরিবিলি বসে দু-জনের বাক্যালাপে যখন ব্যক্তিগত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে জাগতিক বিষয়গুলি আলোচ্য হয়ে ওঠে, স্নায়ুসংঘর্ষে, বলা বাহুল্য, ভবতোষকেই পিছিয়ে থাকতে হয় কিঞ্চিৎ।

'কোনো ওয়র্ক-কালচার নেই যে-দেশে, ডেভেলপমেন্ট কি সেখানে হাওযায হবে নাকি? করাপ্ট... অল কবাপ্ট... দেখছেন তো কম্যুনিস্টদের হাল? ক্রামব্লিং ডাউন এভবিহোয়ার রাউন্ড দ্য ওয়র্ল্ড। কেবানিবা রাজনীতিব পাণ্ডা হলে এই-ই হবে। এভাবেই চলবে সব কিছু...' বিত্তবৈভব মূলত ঋজুতার জোর। অনায়াসেই উচ্চারিত হয়ে যেতে পারে এবপর— 'দিজ পিপল ডিজার্ভ দ্য অর্ডাব অব বুটস। কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চাই। ভোটফোট দিয়ে চলে না এসব। হোযাট উই নিড টুডে, উই নিড এ ট্রং অ্যান্ড রুথলেস ডিক্টেটরশিপ...' জ্বলন্ত পাইপ দাঁতে চেপে কথা বলায এমন একটা দাপট থাকে গৃহকর্তাব, বিতর্ক বৃথা। ভবতোষ বড় বেশি অতিথি বনে যান। সামান্য কলেজেব মাস্টাব, দ্বিতীযত মফস্বলবাসী। মহাবিশ্বেব কতটুকু অংশীদাব আব হতে পাবেন তিনি? শুনতে হয। শুনে যেতেই হবে—'ইংবেজরা ছিল। এত কবাপশন এত ডিসঅর্ডাব দেখেছেন কখনও? ইউবোপ আমেবিকায গেছি। কোথাও এমন ক্যাওস এমন স্টেটলেসনেস নেই। আর আমাদেব দেশে এ বিগ কনকোর্স অব ইনএফিসিয়েন্ট ইললিটাবেট আইড্‌ল পিপল। আরে বাপু, আন্ডার-ডেভেলপড কান্ট্রি তো এই আন্ডাব-ডেভেলপড লোকগুলোর জন্যে। অ্যান্ড ইট ইজ ফর দেযার বেনিফিট...ফর দ্য টোটাল ডেভেলপমেন্ট ইউ হ্যাভ টু বিলাই আপন সাম এক্‌সপার্টস, সাম ডেভেলপড পার্সনস। শুধু মিছিল করে চেঁচালেই তো হবে না। রিযেলিটিটা বুঝতে হবে। কাজ কবতে হবে। কাজ কবে বড হতে হবে। একটা ডিসিপ্লিন চাই...'

বিজ্ঞান জানে না নিশীথরঞ্জন। জানা নেই—উপগ্রহকে অন্য বৃহতেব মাধ্যাকর্ষণ মেনে নিযেই বুঝেশুনে টিকে থাকতে হয। অথবা ভবতোষ, অচেনা মহাকাশে, আত্মীযভবনে কোথাও নিজেব আকর্ষণ খুঁজে না পেয়ে, বুঝি কোনো স্খলিত নক্ষত্র, যত দ্রুত সম্ভব সুখাবাস ছেড়ে নিজেব দেশে ফিরে যাবাব জন্য ব্যস্ত হযে উঠলেন এবং তাব সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়ে উঠল একদিন। প্রতিমার নার্সিং হোমে ভর্তি হওযাব দিন নির্দিষ্ট হযে যাবার পব, আগেব দিন রাতে, তিনি বিচলিতও কিছুটা।

এবং অন্যদিকে, জীবনে প্রথম হাসপাতাল, প্রথম ছুরিকাঁচি—স্বভাবে শান্ত বলেই গভীবতব কোনো উদ্বেগ স্পষ্ট ছিল না প্রতিমার আচরণে। বেচাল শবীরটা নিযে বড বেশি কাবু হযে পড়েছিলেন বলেই হযতো সন্ধেবেলা সামান্য কিছু খেয়ে শুযে পডেছিলেন সাততাডাতাড়ি। বাধা সঙ্গে এসেছিল। আজ বাদে কাল হাসপাতালে যাবেন বডমামিমা। তাঁব দেখভালে এ-ওব নিজের টান।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঘবে-বাইরে মশা-তাড়ানোর-জাল-আঁটা জানালাব পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিতে হয়। সন্ধেবেলা ঘরে-ঘরে বিছানা সাজিযে রাখতে হয সকলের--রোজকাব কাজ বাধাব। শুধু মশারি টাঙানোর কাজটুকুই বাকি থাকে। সেটা পরে হয। বাত্তিরে যে যখন শোবে, তার আগে। কিন্তু ঠাণ্ডা-মেশিন আছে বড়মামিমার ঘবে। মশারি, যদি দবকারই হয়, সে-তো একটু পরে হলেও চলত।

আজ বড় তাড়াহুড়ো ছিল রাধাব। সব কিছুতেই কেমন গোলমাল বেঁধে যাচ্ছে কাজকর্মের। বড্ড ভালো একটা সিরিয়াল ফুরিয়ে যাচ্ছে টিভিতে। এক হপ্তা দেখতে না পেলে সাত দিন কেমন অস্থির-অস্থির লাগে সব সময়। সিরিয়ালের পর আজই আবাব সিনেমার গান 'চিত্রমালা' আছে দিল্লীব প্রোগ্রামে। তাছাড়া সব কিছুর মিলমিশে ভালো স্যালাড বানাতে জানে না ঝুমার-মা। দাদাবাবু আর বুল্লিদিদিব ঘরে মাস্টারমশাইরা এসে গেছেন। চা-জলখাবাব দিযে এসেছে। মুন্নিদিদির ঘরে আজ যাঁর আসার কথা, এখনও আসেন নি। দেখে আসতে হবে আরো একবার।

বডমামিমা শোবাব পব, পাযেব কাছে ভাঁজ করে রাখা হালকা চাদরটা গাযে ছডিয়ে দিযে, সাইডটেবিলে জল বেখে বেরিয়েই আসছিল রাধা। থমকে দাঁড়াল।

'এই যে, এই তো মেয়েটা...' বন্ধ দরজা-জানালার ঘবে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ভবতোষ। বাইবে ছিলেন। ঘবে ঢুকে প্রথম পলকে রাধাকে দেখেই ভাবিক্কি গলায, ছোট হাসিতে—'এ যে দেখছি, ছাড়তেই চাইছে না তোমাকে। ওব এই নার্সিংযের জন্যেও অ্যাট লিস্ট কিছুটা ধন্যবাদ দিতে পাবো আমাকে। ভবানীপুরে চন্দ্রিমাদের বাড়ি কি অন্য কোথাও এতটা হয়তো না-ও পেতে পারতে...'

ভবতোষেব ভগ্নীগৃহ থেকে প্রতিমাব সহোদবা বোনেব আতিথ্যে অসুবিধা নিশ্চয়ই কিছু বেশিই হতো। অস্বস্তি কিছু কম হতো কিনা, একটা চাপা সংশয় ছিলই ওদের স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত অনুচ্চাবে। কিংবা এখানে সর্ববিধ আতিশয্যে যেটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য, সেটাও খুব একটা অস্বস্তিকব কিনা অথবা নিজেদেরই বানানো সংকট, উভযেব ভাবনায টানাপোডেনও অবশ্যই ছিল। ঘরের নিরিবিলিতে, বাধা, তৃতীয অস্তিত্বে, উপলক্ষ হযে যায।

'সত্যি, মেয়েটা আমার জন্যে কবছে অনেক...' খাটেব ওপাশে ডান কাত হযে ছিলেন প্রতিমা। নড়ে উঠলেন। কাতব গলাব স্বর—' সবগুলো জানালা এমন বন্ধ কেন বে তোদেব ঘবে? হ্যাঁ বে বাধু, খোলা যায না ওগুলো?'

'ঠাণ্ডা মিশিন আছে গ এ-ঘবে।'

'ধ্যাৎ, ও-মেশিনফেশিন ছাই লাগে না আমাদেব। দম বন্ধ হয়ে আসে আমাব। ঘুমও হয না ভালো কবে। বাইবে এত বাতাস। ওগুলো খুলে দিলে খোলামেলা হাওয়াও তো আসে একটু! কেন, ফ্যানও তো আছে ঘরে...'

'এযার-কুলাব মেশিনটা তুই বন্ধ করতে জানিস?' তাকালেন ভবতোষ।

'কেনে জানব নি।' বাধা উচ্ছল। খাটের দিকে ঝুঁকে পড়ে—'তাই দেব গ মামিমা? বন্ধ কবে দেব?'

'হ্যাঁ, দে। তাই দে।'

হট্টগোলের সাহেববাডিতে অদ্ভুত নিশুতি ছিল ঘরের ভেতব। নিঝুম পড়ে আছেন মামিমা। ঠাণ্ডা চুপচাপ। মাঘ ফুবিয়ে ফাল্গুন। এত গরমেও হাডেমজ্জায শীতের মিঠে শিবশির অসুখবিসুখেব ঘবে। বাধা তৎপব হলো। মেশিনের ঠাণ্ডা যদি বেশি হাড়মাস কাঁপায, আলাদা ব্যবস্থাও আছে ঘরে। জানালা খুলে, ঘরেব ঠিক মাঝখানে সেট করা খাটের ওপবদিকেব সিলিংয়ের পাখাটা চালু কবে দেওয়া যায়।

টিভির সিরিয়াল শেষ হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই এলেন মুন্নিদিদির ঘরে? রাধার চঞ্চলতা বাড়ে।

বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিমা কিছুই দেখছেন না হয়তো। ঘরের এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভবতোষ স্তব্ধতায় দেখে টেকনলজির লীলা বা অচেতনের দক্ষতা। ঘরের ভেতর ছুটোছুটিতে সেই একরত্তি মেয়ে কী যেন সব করল খুচখাচ, কোথায় কোন্ সুইচ অফ, কোথায় অন—শীত ফুরলো তো বসন্তের দামাল বাতাস। দখিন-খোলা বড বড় জানালাগুলো খুলে গেছে। বাড়ির বাইরে লেকটাউনের অগুনতি গাছপালা। ঘরের সিলিংয়ে ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে বনবন বনবন।

সিরিয়ালের পর টিভিতে 'চিত্রমালা'। মন উচাটন রাধার। কিন্তু সে জানে, দখিনা বাতাস যতই মলয় হোক, ওপাশের কৃষ্ণপুরের খাল থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে লাখো-লাখো কোটি-কোটি মশা। ঘুমবেন কি করে মামিমা? খাটের তলার দিকে নিচু হয়ে কোত্থেকে সে বের করল মস্ত একটা মশারি। সিঙ্গল বেডের দুটো খাটকে জোড়া দিয়ে তেপান্তরের মাঠ লম্বা বিছানা। মশারিটাও বিশাল। মায়ের মতো একজনকে শুইয়ে রেখে, খাটের ওপর উঠে সাবধানে পা ফেলে ফেলে, শব্দ না তুলে চার কোণে চারবার মশারির ফাঁস ঝুলিয়ে, নিচে নেমে, বাইরে থেকে এত বড় খাটকে এক পাক ঘুরে ঘুরে গুঁজে দিতে সময়ও লাগে অনেকক্ষণ।

দরজার পাশে একটা চেয়ারের হাতলে ডান হাতের কনুই রেখে শিরঃপীড়া সামলানোর ভঙ্গিতে ললাটে আঙুলের সাঁড়াশি চেপে বসে ছিলেন ভবতোষ। দৃকপাত ছিল না কোনো দিকে।

মশারি টাঙিয়ে ভাবতেই পারে রাধা—কাজ ফুরলো তার। এবার সে যেতে পাবে। অবশ্যই যেতে পারত। কিন্তু খাটের কাছে গিয়ে মশারিতে নাক ছুঁয়ে বলল যখন—'যাব গ মামিমা? আর কিছু লাগবে গ আপনার?'

ঘরের ভেতর ঘর, মশারির তলা থেকে আরো একবার কাতরে উঠলেন প্রতিমা—'যাবি? বেশ, যা। যাবার আগে এই আলোটা একটু নিভিয়ে দিয়ে যাবি রে মা? বড্ড চোখে লাগছে।'

'সে-দিচ্ছি। দেয়ালের সুইচটাও দিয়ে দিচ্ছি। বেডসুইচ আছে আপনার মাথার কাছে। ওপাশের কমজোরি দেয়ালবাতিটা জ্বেলে নিন। না, না, আমি...আমিই করে দিচ্ছি সব। আপনি একটু ঘুমোন শান্তি করে। হাসপাতালে যেতে হবে কাল।'

'উঃ, কত কী জানে বলো তো মেয়েটা?'

নাড়া খেলেন ভবতোষ। ঘাড় উঁচিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।

'এদের বাড়ির কাজকম্মো? এ-তো চাট্টেখানি কথা নয়...' মশারির ভেতর থেকে প্রতিমার শান্ত নরম কম্পিত কণ্ঠস্বর নিশুতির ঘরে দেয়ালঘড়ির ধ্বনিতে বেজে ওঠে—'এটুকুন একটা বাচ্চা মেয়ে। এসেছেও কোন গ্রামফ্রাম থেকে। মাত্র এই দুটো-তিনটে বছরে কত কি শিখে ফেলেছে। এত সব সফেস্টিকেটেড জিনিসপত্র। এদের টোটাল সিস্টেমটাই আলাদা। এসব বোঝার জন্যে তো একটা মিনিমাম এডুকেশন চাই...'

আলো জ্বেলে, আলো নিভিয়ে মামিমার সব চাওয়া মিটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

যাচ্ছিল রাধা। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন ভবতোষ— 'গ্রামের মেটেঘর থেকে কলকাতা শহরে একেবারে সাহেবসুবোর বাড়ি? ফ্রম ফ্রিজিং পয়েন্ট টু হাই বয়েলিং টেম্পারেচার? তা তোর সাহেবেরও তো সাহেব আছে রে। তাঁর কী হবে?'

'আঃ এখন ওর কাজের সময় এসব কী শুরু করলে আবার? তোমাদের এত সব কায়দার কথাবার্তা ও বোঝে নাকি কিছু? ছাড়ো, ওকে ছেড়ে দাও...' ঘুমের-অষুধ খেয়ে যখন অলস ঝিমুনি, স্বভাবতই বিরক্ত প্রতিমা— 'তুই যা তো বাধু, যা। তোর মা এই এক্ষুনি ডাকলেন বলে তোকে...'

হাসছেন ভবতোষ। চেযাবে বসেই ডান হাতে রাধার কোমর জড়িয়ে, আদবে-– 'হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টেব নামে যে-যাব মতো সবাই তো সব কিছু করে নিচ্ছে বে। তুই-ই বা বাদ যাবি কেন? দরিদ্রনারায়ণ সেবায তোকেও তো পেতে হবে কিছু। আদর্শ কাজেব-মেয়ে হয়ে উঠতে হবে তোকে। আইডিয়াল সেবাদাসী। ডিভোটেড অ্যান্ড ডেভেলপড মেইড-সার্ভেন্ট...'

কিছুই বুঝল না রাধা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল এক-বুক ফুর্তি নিয়ে। শুধু বোঝে, মামাবাবুরা খুব নাম গাইছেন তার। বড়-মানুষের ঘরে পড়ালেখা-জানা বড়-মানুষরা কখন কী বলেন, সবই তাব বোঝার জন্য নয়। যদি বাংলা ভাষাই হয়—শব্দ চেনে, ভাষা বোঝে না বালিকা।

মেডেল নয়, আস্ত একটা একশো-টাকার নোট।

পেটেব কাটাছেঁড়া শেষ করে দিন দশেক হাসপাতালে থেকে, সুস্থ হযে, দেশে ফিরে যাবার সময় রাধা গড হয়ে পায়ে পেন্নাম করল যেদিন, ওর হাতে কডকডে একটা একশো-টাকাব নোট ধরিয়ে দিলেন বড়মামিমা।

বকশিশ নয। কিংবা বকশিশই মেডেল হয়ে উঠল ভালোবাসায়। নন্দদা কালীজেঠু ববির-মা বা আর সবাই কে কত পেল, আদৌ কেউ কিছু পেল কিনা, জানা নেই তার। কিন্তু রান্নাঘরে বুড়ি ঝুমার-মাকে হাত বাড়িয়ে পঁচিশটা টাকা তুলে নিতে দেখেছে সে। দুটো দশ-টাকা, একটা পাঁচ-টাকাব নোট। আলাদা একটা ইজ্জত থেকেই যায় রাধার। দাসীবাঁদিরা নয়,—ঘরের মেয়েরা যা পায়, যেমন করে না চাইতেই পেয়ে যায়, সেখানে ভালোবাসার পাওনাগণ্ডা থাকবেই বাড়তি কিছু।

মামিমাকে নিয়ে ছুটোছুটি-ব্যস্ততার অনেক...অনেক কাল বাদে সাহেববাড়িতে আবেক হুলুস্থুল। এবার খোদ সাহেবকে নিয়েই তোলপাড়। এই বয়সে মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল এমন হাঁকডাকের বিশাল মানুষটাব। একটা ভীষণ কিছুই ঘটে যেতে পারত। তেমন কিছু যে ঘটে নি, সে-নেহাত মা-ঠাকরুণেব ববাতজোর। শাঁখাসিঁদুরের পরমায়ু।

রাধা ভাগ্যিমানী মায়েব দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিযে থাকে, যেখানে সিঁথিব সিঁদুররেখায় সাহেবের প্রাণকলজে পিদিম হয়ে জ্বলে।

প্রথম ঝটকায় বুঝতেই পারে নি কেউ, ঘটনাটা কী? কতটা মারাত্মক? ঘটনা নিম্নরূপ—

রোজকার মতো রাত প্রায় ন-টায় ঘরে ফিবলেন নিশীথরঞ্জন। পেটমোটা ভারি ব্যাগ আর হরেক রঙের ফাইলের বোঝা কাঁধে বয়ে পিছু-পিছু ওপরে উঠে এসেছিল নন্দলাল। দোতলার লাউঞ্জে বসে টিভি দেখছিলেন সবাই। শুধু মুনমুন ওর পড়ার ঘরে।

যা হয় না কখনও, অফিস থেকে ফিরে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে না গিয়ে হল্লাখুশির মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে একটা সোফায় আচমকা বসে পড়লেন নিশীথরঞ্জন এবং বসেই গালগলার ছালচামড়া তোলার ক্রূরতায় রুমাল ঘষতে লাগলেন এমনভাবে, মুখচোখের ঘর্মাক্ত চেহাবায় প্রতিদিনের কাজকর্মেব বাইরে ভিন্নতর কোনো টেনশনেব চাপ বড় বেশি স্পষ্ট ছিল এবং ভাবভারিক্কি মেজাজের এমন একজন পুরুষমানুষ, তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রমে বলা-নেই-কওয়া-নেই এভাবে লেপটে বসে পড়লে, খুবই স্বাভাবিক, আশেপাশে যাঁরা থাকেন, সবাইকে সন্ত্রস্ত হতেই হয়।

‘কী হলো? কী হয়েছে তোমার?’ শাড়ির আঁচল সামলে ঝাঁপিযে উঠে এলেন কিবণময়ী।

বাবন আর বুলবুলিও উঠে এসেছে ব্যাকুলতায—‘হোয়াট হ্যাপনস টু ইউ বাপি। ইউ লুক সামথিং ডিফাবেন্ট...’

টিভিতে গান চলছিল। চলতে লাগল।

ফুল-ভল্যুম গান আর বিস্ফাবিত চোখের উৎকণ্ঠায় যখন সবাই টলোমলো, কথা বলছেন না নিশীথরঞ্জন। অসুখবিসুখ বা শরীর খারাপ হলে যেমন হয়, সে-বকম মনে হচ্ছে না কিছু। সোজা হযে বসে আগুনেব চোখে তাকাচ্ছেন এদিক ওদিক। রুমাল টেনে টেনে যেভাবে ঘাড়গর্দানা মুছছিলেন, মুছতে লাগলেন।

‘কি গো, বলছ না কেন কিছু? ডাক্তাব ডাকব? ডাক্তাব সেনকে একটা টেলিফোন...’ উতলা কিরণময়ী কান্নায় ভিজে উঠেছেন।

বাঁদিকেব সাইডটেবিলেই ছিল টেলিফোন। লম্বা হাত বাড়িযে বিসিভাবটা চেপে ধবলেন নিশীথবঞ্জন এবং অচিরেই হাত তুলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর মধ্যমাব অর্ধচন্দ্রে দীর্ঘ ললাট টিপে ধবে ঢলে পড়লেন সোফার ধার ঘেঁষে। বাঁ-হাত তুলে ইশাবায়—এক গ্লাশ জল।

গৃহকর্তার নীরব ইশাবা কিবণময়ীব চোখে ভ্রূরেখায ঢেউ কাঁপিযে তোলে। ঘাড ফিবিয়েছেন পেছনের দিকে।

এবং সবটাই যন্ত্রবৎ। বাধা, ভ্যাবাচাকা মেয়েটা, পেছনেব দিকে এক কোণে দাঁড়িযে ছিল চুপচাপ। মাযের তেবচা চাউনি গায়ে পড়তেই এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে বান্নাঘবে ফ্রিজ খুলল। সবচেযে বেশি ঘামে-ভেজা ঠাণ্ডা জলের বোতল বেছে নিতে হয। ঝকঝকে দুটো বাছাই কাচের-গ্লাশ আলাদা কবে ধুয়ে নিতে হয় বেসিনে। সাহেবের জল। কাচ আব জলের স্বচ্ছতায় একটা পিঁপড়ের পাযের ছাপও থাকতে পাববে না কোথাও। জলকেই কাচ মনে হবে অথবা কাচ নেই—গ্লাশশুদ্ধু সবটাই জল। ট্রে-ব ওপব পাশাপাশি দুটো চিনেমাটির প্লেট সাজিয়ে, প্লেটেব আধারে দু-গ্লাশ জল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,

নৈবেদ্যর ভঙ্গিতেই দু-হাতে ধরে খুবই সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘরবারান্দা ডিঙিয়ে এসে রাখতে হয় পূজ্যসমীপে নিবেদনে।

ইতিমধ্যে সেখানকার পুরো চেহারাটাই বদলে গেছে অনেক। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে, দুটো হাতেব কনুই দুটো হাঁটুর ওপব রেখে, যা ঘটেছে, বলে যাচ্ছেন সাহেব। মা-ব জন্যে বাংলা, দাদাবাবু-দিদিমণিদের জন্যে মাঝেমাঝে ইংরেজি। এভাবে মাঝখান থেকে গপপো শুনলে ভীষণ রাগ হয় রাধার। যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেই হাঁটু কাঁপে তাব, হাত-পা সিঁধিয়ে যায় বুকের ভেতর, খোদ সেই সাহেবের নিজের মুখে বলা গপপো— আধখ্যাঁচড়া অর্ধেকটাই শুনতে হলো শেষপর্যন্ত। কী-নাকি রাস্তায় গাড়ির গণ্ডগোল হয়েছে একটা। দোষ কালীজেঠুব।

কিন্তু শুধু তো গপপো শোনাব জন্য নয় রাধা। কাজ করতে করতেই গপপো শুনতে হয় তাকে। সামনের দিকে লম্বা করে পা দুটো বাড়িয়ে রেখেছিলেন সাহেব। মায়েব চোখের ইঙ্গিতে সেখানে হাঁটু ভেঙে লেপটে বসে পড়তে হলো নকশা-আঁকা কার্পেটে। আস্তে আস্তে কথা বলে যাচ্ছেন সাহেব। ভয়ে-ত্রাসে চোখ গোল-গোল কবে শুনছে সবাই। ঘনিষ্ঠ মনোযোগে, মাথা নুযে, সাহেবের নীল রঙেব প্যান্টের তলায ভাবি জুতোর ফিতে খুলতে থাকে রাধা। মোজা জোড়াও খুলে নিয়ে বুট জুতো সরিয়ে স্লিপার দুটো এনে দিতে হয় পায়ের কাছে।

ঘটনাক্রম ঠিকমতো ধরতে পারে নি রাধা। শুনেছিল পরে।

'বাপি আজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন...' যেহেতু বাংলা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না বাড়ির কাজের-লোকজনরা, রাতে ঘটনাটা এভাবেই বোঝাতে চেয়েছিল বাবন।

অঘটন বৃত্তান্ত

অপরাধী কালীধন। বুড়ো মানুষ। মনমেজাজ শরীরস্বাস্থ্য ভেঙে ভেঙে পড়ছে। খামোকা কী এক কঠিন ব্যামো ধবেছে চোখে, অনেক দিন থেকেই কিছুদিনেব ছুটি চাইছিল সাহেবের কাছে। খুব বেশি না হোক, অন্তত মাসখানেক। চিকিৎসা তো চালিয়ে যেতেই হবে। একটু বিশ্রামও বড় প্রয়োজন। নিদেন দুটো চোখকে যদি ফিবে পাওয়া যায় আগেব মতো, হাতের কব্জিদুটো শক্ত থাবা হযে উঠতে পারে আবার। দুটো হাতের শক্ত কব্জি আব দুটো চোখেব সতর্ক মণি জীবনভর শাসনে রেখেছে পায়েব তলায দুরন্তগতি অ্যাকসেলেরেটবকে। স্পিডোমিটাবেব পুরো হিসেব বাখা যায় নি। গত চল্লিশ বছরে কত হাজার হাজার, লক্ষ-কোটি কিলোমিটার পাড়ি? এক জীবনে চাঁদে পৌছতে আর কত বাকি ছিল?

কিন্তু সাহেবদের হিসেবপত্রে চাঁদেব অঙ্ক আলাদা। সেখানে একটাই গাড়ি, একজনই ড্রাইভার। ড্রাইভাবকে হঠাৎ ছুটি দিলে গাড়ি কি গ্যারেজেব ভেতর পড়ে-পড়ে মরচে ধরাবে গায়ে? সাহেব নিজের হাতে স্টিয়ারিং ধরেন না খুব বেশি। কলকাতাব রাস্তায় গাড়িতে চুপচাপ বসে থেকেই হাঁপিযে ওঠেন মিটিং মিছিল মানুষ আর ট্রাফিকের জঙ্গলে।

সারাক্ষণ রুমাল চেপে থাকেন বায়ুদূষণের ঘ্রাণে। সেক্ষেত্রে কোনো ড্রাইভার যদি তাব খেয়াল খুশিমতো হঠাৎ-ই লম্বা ছুটি চেয়ে বসে এবং যদি কোনো বিকল্প বিশ্বস্ত ড্রাইভার সেই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া না যায়, নিয়োগকর্তা নিজেও অসহায়। পুরাকালেব সাবথি ভিন্ন মহারথী যেমন নিশ্চল।

ড্রাইভার যদি বিকল হয় এবং গাড়ি জড়বৎ, প্রতিদিন অফিস যাতাযাতের কি হবে? শুধু তো অফিসই নয়, নানা জায়গায় পার্টি কনফাবেন্স সেমিনার বা ইমপর্টেন্ট অ্যাপযেন্টমেন্টস। তাছাড়া গৃহস্বামীব প্রয়োজনই তো সব নয়। একটি গাড়ি নানাভাবেই অপরিহার্য এ-সংসারে। স্কুলের গাড়ি আসে মেয়েদেব জন্য। আই.সি.এস.ই. পাশের পব ছেলের সাবালকত্বেব দাবি অন্যত্র কিযদংশে মেনে নিলেও, ট্রামবাসেব নিত্য-যাতায়াতে আজও ওকে একা ছাড়তে রাজি নন কিরণমযী। বিশেষত সকালে অফিসযাত্রাব পিক-আওযারে। এতদ্‌ভিন্ন গাড়ি তো গৃহকর্ত্রীব নিজেব জন্যও অত্যন্ত জরুবি মাঝেমাঝেই —মার্কেটিং, আত্মীযপবিজনদেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, বিবিধ আমন্ত্রণবক্ষা সামাজিকতা সিনেমাথিযেটার।

সুতবাং সাবাদিনেব ঘাম-ঝবানো ব্যস্ততায দুর্বাব গতিব সঙ্গে পাল্লা দিযে চলতে হয যাদেব, গাড়িটা সেখানে অবশ্যই কোনো শখ বা বিলাসসামগ্রী নয। অত্যাবশ্যক জীবনসহচর। যার স্থবিরতায পরিবাবস্থিত সকলে নিজেবাই ব্রেকডাউন। সেক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, কালীধনেব ছুটিব আবেদন অনুপুঙ্খ ভাবনাচিন্তা ব্যতিরেকে কিছুতেই মঞ্জুব হতে পারে না। এতকালেব পুরনো এবং বিশ্বস্ত একজনকে ছেড়ে নতুন কোনো নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার খুঁজে পেতে সময় লাগবেই একটু। দক্ষতাব বিচারে নতুন লোক যদি যোগ্যতব বা তরুণতর কেউ হয়, সেক্ষেত্রে কালীধনের ছুটি সাময়িক না-ও হতে পাবে। অথবা নিজেকে কাজে বহাল রাখতে চাইলে কালীধনকেই খুঁজে এনে দিতে হবে অস্থায়ী এবং উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি। অবশ্যই তার যাবতীয দাযদায়িত্ব কালীধনেব নিজস্ব এবং একাব। হয়তো এভাবে বাতিল হয়ে যেতে চাযনি কালীধন নিজেও। পুরনো গাড়ি বাতিল আব লজঝব হয়ে উঠলে তারও কিছু দাম থাকে। শস্তা দরে পার্টস বিকোয। কিন্তু গাড়িব ড্রাইভাবকে, চোখে ছানি পড়ুক বা চশমাব কাচ ঘোলাটে থেকে আবো ঘোলাটে হোক, টিকে থাকতেই হয ব্রেকঅ্যাকসেলাবেটরক্লাচগিয়ারস্টিয়ারিংয়েব কৃৎকৌশলে। কেননা চাকরি। গাড়ি চললে সামনের কাচে যে-ঝাপসা, গাড়ি না চললে জগৎসংসাব আবো বেশি অন্ধকাব।

এবং আজও, অতি মূল্যবান যে-জীবন—সাহেবেব সারথ্যে ধনুকেব ছিলাব টানে ঘাড়গর্দানা শিবদাঁড়া যথেষ্ট শক্ত সোজাই রেখেছিল কালীধন। ভাঙাচোরা ফ্রেমে আঁটা চশমার কাচে নড়বড়ে দুটি চোখের দৃষ্টি যথারীতি একাগ্রতায় তীক্ষ্ণ ছিল। কব্জিব আঁটুনিতে স্টিযারিং। বিপরীত টানে ধাবমান শাযিত লম্বিত পথের বিস্তাব যখন তেড়ে আসছিল চোখের ধাঁধায় অথবা দুরন্তগতি এ-ধাবমানতাই যাঁর জীবন ও জীবিকা, নিশ্চল স্নাযুভাবে যে-কোনো বকম শিথিলতায়...মুহূর্তেব ভ্রমেও ঘটে যেতে পাবে সাংঘাতিক কিছু। গত চল্লিশ বছরের পবনবেগে সবটাই শাদা শ্লেট ছিল না নিশ্চয়ই। দু-চাবটে পুলিশ-কেসও ঘটে গেছে মাঝেমধ্যে। ঘটে যেতেই পারে। কিন্তু আজকেব ঘটনায় সাহেবকে আপদবিপদ

থেকে কোনো রকমে বের করে আনতে পারলেও, সে জানে, রেহাই নেই তার।

রাত্তিরে ঘরে-ফেরার পথে মানিকতলার মোড়ে তুমুল ট্র্যাফিক জ্যাম। দূর থেকেই আর সব গাড়ির মতো ডান দিকে বেঁকে, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের গলি ঘুরে মানিকতলা ব্রিজের ওপর উঠে এসেছিল নিরাপদেই। গড়পাড়ের দিকে সেকেন্ড গিয়ারে নামছিল গাড়ি। গাড়ির পেছনে গাড়ি। প্রায় শূন্যতায়, দুই...চার...পাঁচ দোলাচলে কাঁপছিল স্পিডোমিটারের কাঁটা। তলার দিকে ব্রেকঅ্যাকসেলারেটারে সতর্ক পা। সামনেই পেল্লাই জবরদস্ত হাইলি-ইনফ্লেমেবল পেট্রল-ট্যাঙ্কারের বিরাট বাধা। ডান দিকে ট্রাম। ব্রিজের ওপর থেকে গড়িয়ে নামার ঢালুতে অগ্রবর্তী ট্যাঙ্কার হঠাৎ-ই স্পিড পেয়ে যেতে নিজের লগ্ন ছুটেও কোনো খামতি থাকে না কালীধনের। ডান দিকে ডাউনের গাড়িগুলোর হেডলাইট জ্বেলে ছোটার বেয়াদপি জখম চোখ দুটোকে সূচ ফোটাচ্ছিল অকারণ নির্বিচারে এবং এরই মধ্যে অল্পবয়সী ভদ্দরবদস্তুর এক ছোঁড়া, আসলে উজবুক, বউবাচ্চাকে স্কুটারের পেছনে চাপিয়ে ডানদিক থেকে হাই-স্পিডে তেড়ে এসে, বেঁকে, এক চিলতে ফাঁকে প্রায় বনেটের কোণ ছুঁয়ে এমন বেমক্কা সামনের লাইনে ঢুকে পড়ল আচমকা, চোখে পড়তেই, যখন চাকার তলায় অবধারিত থেঁতলে যাচ্ছিল বাচ্চাশুদ্ধু ওরা বাপ-মা দুজনই, মুহূর্তের ভগ্নাংশে কিছুমাত্র কূলকিনারা না পেয়ে বিমূঢ় কালীধন তড়িঘড়ি স্পিডের মাথায় আরো বাঁদিকে ঘুরিয়ে নিতে চাইল স্টিয়ারিং, যেখানে ফুটপাত ছাপিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে গায়ে-গা-লেপটে হাজার-হাজার লাখো-লাখো মানুষ, মানুষের স্রোত। এক ঝটকায় বুঝে নেবারও ফুরসত ছিল না—কী আছে বাঁদিকে? কতটুকু ফাঁক? এবং তখনই শুধু এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল, জনা পাঁচ-সাত নারীপুরুষ, বাচ্চা শিশুও ছিল এদের মধ্যে, চিৎকারে আতঙ্কে লাফ মেরে ছিটকে গিয়েছিল এদিক-ওদিক এবং দুজন...অন্তত দুজনকে খাড়াখাড়ি পড়ে যেতে দেখল গাড়ির সামনে। বিচলিত সাহেব হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপিতে ধমকে যাচ্ছেন পেছন থেকে। গাড়ির মালিক আর স্টিয়ারিংয়ের মালিক এক ব্যক্তি না হলে এ-রকমই ঘটতে পারে। ঘর্মাক্ত কালীধন, দিশেহারা কালীধন, সন্তপ্ত কালীধন যথাযথ সময়ে যান্ত্রিক চিৎকারে ব্রেক কষে, শখের খেলনা ভেঙে যাবার নৈরাশ্যে দুঃখিত শিশুর চেয়ে কিঞ্চিদধিক বেদনায়, স্বস্তিই বোধ করছে মনে মনে। আরো ভয়ঙ্কর কিছুই ঘটে যেতে পারত অবশ্যই। চোট পেয়েছে কেউ কেউ। বড় রকমের রক্তপাত কিছু ঘটে নি নির্ঘাৎ।

তবু, এত করেও আত্মতুষ্টির অবকাশ ছিল না কোথাও। মানুষ? অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন পথচারী মানুষই কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে মানুষেরই কাছে? জিঘাংসায় নিষাদ।

কোথায় ছিল এরা? আগোছাল এলোমেলো মানুষগুলিই চারদিক থেকে ছুটে এসে যখন জনতার আদল পেয়ে গেল, মানুষগুলো মানুষই থাকে। ঈষৎ নীলবর্ণ গাড়িকে মধুভাণ্ড ভেবে, মনে হতেই পারে, পিপীলিকা আচরণ। কিন্তু অতি তুচ্ছ পিপীলিকাও কী ভীষণ আসুরিক? চারপাশ ঘিরে ফেলার পর ক্রুদ্ধ জনতার আলাদা কোনো ভাষা নেই— শুধুই চিৎকার। আলাদা কোনো অবয়ব নেই—বৃক্ষশ্রেণী যেমন। সদসৎ ভালোমন্দের আলাদা কোনো যুক্তি নেই—পশুশক্তির রোষ।

উদ্‌ভ্রান্ত বিপন্ন নিশীথরঞ্জন তাঁর অতি মূল্যবান কোটপ্যান্টজুতোমোজা শিক্ষা ভাষা

বিত্তবৈভব আত্মাভিমান—দীর্ঘ অনুশীলনের সব কিছু নিয়েই ভয়াবহ কোনো আশঙ্কায় এক মুহূর্তে গাড়ির ভেতরে-বাইরে নিজের বিচ্ছিন্নতায় আলাদা হয়ে, একা হয়ে যেতেই হাঁসফাসে দ্রুত, অতি দ্রুত দু-পাশে দুটো লক-করা দরজায় কাচগুলো তুলে ফেলতে চাইলেন তৎপবতায়। এভাবে নিজের বিবর নিজেরই হাতে সম্পূর্ণ হযে ওঠার পব পকেটের রুমাল টেনে গলদঘর্মে গালগলা কপাল ঘাড় গর্দানা মুছে নিতে নিতে নতুন করে ভয়—ঢিল ছুঁড়ে কাচগুলো ভেঙে দিতে পারে ওরা! কে কী কবছে বাইরে, কিছুই জানেন না। টাযারের হাওযা খুলে দিতে পাবে! আগুনও ধরিয়ে দিতে পাবে পেছন থেকে? হরিবল্। শিহরিত নিশীথরঞ্জন। নিজস্ব সংকটে এমন বিশ্রীভাবে বিপন্ন বোধ কবার অভ্যাস তাঁর নেই। আব যদি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেই যায শেষপর্যন্ত, ভাবতেই পাবছেন না, দরজা খুলে ছিটকে বেরিযে পডতেই হবে বাইবে। বাইবে মানুষ...কালো-কালো অদ্ভুতদর্শন উত্তেজিত জনতা। আনরুলি মব। বোধ হয এদেবই জনগণ বলে। মাননীয জগতে সদা বিচবণের যে-দাপট, ঘামে-ঘামে ত্রাসে আতঙ্কে সবই ঝরে ঝবে ঝুরঝুর খসে খসে পড়ে। কালো-বেডাল নেই তাঁব, কমান্ডো নেই। ঢালতলোযাব এমন কোনো কাজেব কথাও নয। ববং জনগণেব ভগ্নাংশ, কালীধন, তাঁরই বেতনভুক। পাকা লোক। অনেকটাই ভবসা।

সেখানেও এক ভীষণ দুর্বিপাক। শুধু তো গাড়ির ভেতবে-বাইবে নয়, গাডিব অন্দরেই সামনের-সিট আর পেছনেব-সিটে ব্যবধান ঘটে গেছে বিস্তব।

ড্রাইভাব-সিটে বাঁ-দিকেব দরজায় কাচ তোলার জন্য হাত বাড়াবার কোনো সুযোগই পায় নি কালীধন। তাব আগেই ডান দিকের খোলা জানালাব ফাঁকে ঢুকে পড়েছে একটা কালো হাত। চেপে ধরেছে বুডোব জামার কলার। সজোবে টানছে বাইবে থেকে। টেনে বের করে নিয়ে যাবে আস্ত মানুষটাকেই। জামায় চশমায চেহারায় নিতান্তই ভদ্রযুবা —'গাড়ি চালাচ্ছেন? কর্পোবেশনের রাস্তা মশাই আপনাদেব একার? বাস্তায চলবে না মানুষ? মরতে হবে? কেন? বেবোন, বেরোন বলছি...'

এবং কালীধন, বড়ই হীনবল এক বৃদ্ধ, লক-করা হাতলটাকে চেপে ধবে প্রতিবোধের চেষ্টায়, যতটা সম্ভব, এখনও বাঁচতে চাইছে। ব্যগ্রতায় সামনেব দিকে ঝুঁকে পড়লেন নিশীথরঞ্জন। হয়তো এখনও...এখনও কিছু কথা বলা যায় যুবকেব সঙ্গে।

কিন্তু সে-যুবক একা নয়, ওকে ঘিবে আবো অসংখ্য মানুষ, সকলেই ছেলেছোকবা, ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাড়ির ওপর, এবং যখন, চোখের সামনে গাযের জামাটা পতপত ছিঁডেই গেল কালীধনেব—ইনক্রেডিবল, ডান দিকের দরজাব হাতলে হাত বেখেই থমকে গেলেন নিশীথরঞ্জন। যেভাবেই হোক, যদি মোকাবিলা করতেই হয এবপর, তাঁর সমস্যা দ্বিবিধ—অটোমোবাইলই হোক, অথবা কম্পিউটার বা হাই-টেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির চেয়ে জনগণ আরো ভীষণভাবে জটিল আর টেকনিকাল ব্যাপাব। তিনি অপাবেট করার কায়দা জানেন না। দ্বিতীযত, তাঁর সঙ্গে এখন জরুরি ফাইল অনেকগুলো। বড় বড় দুটো কোম্পানির কনফিডেনসিয়াল কাগজপত্র। অ্যাটাচিতে হাজাব ত্রিশেক টাকার নোট। কোনো ঝুঁকি নেবার আগে ভেবে দেখতেই হয় একবার। তথাপি হঠাৎ, একেবাবেই

ঝোঁকের মাথায় দবজা খুলে লাফিয়ে নামলেন। সেই যুবককেই সরাসরি—'আই অ্যাম স্যরি, রিয়েলি স্যরি...'

দৃশ্যমান হলেও কে যুবক? জনগণে কোথায় সে? নিশীথরঞ্জন চমকে তাকালেন।

'ইম্‌পালা চড়ে বিলাইতি সরি ঝাড়ছে মাইরি...'

'দে শালা ডুংরি চমকে। সব ভিত্তার হয়ে যাবে...'

এবা কারা? কোত্থেকে এল? কী ভাষা? কোলমাইনারদের মতোই ভূতের চেহারায় প্যান্টশার্টে কালো-কালো কিছু যুবক, রাস্তার আলোয় আবো বেশি শিল্যুট, ঘিবে ফেলেছে তাঁকে।

'আমরা কিছু করলেই শালা এন্টিসোশাল? আর এরা বিলাইতি চাপিযে মানুষ খুন কবলে একসিডেন্ট? সব ভদ্দবলোক বে?'

'অত কথাব কি আছে বে? দে শালা দিশি এমবেসেডরকে অক্সফোর্ড বানিয়ে। এমেবিকার ফোর্ড গাড়ি রে। বহুৎ দাম। এখেনে অক্সে টানবে...'

চাবপাশের হৈ হট্টগোল তুলকালামে কিছু একটা বলতে চাইলেন নিশীথবঞ্জন। একটা আপস চাইলেন। কিন্তু কাকে বলবেন? কিভাবে বলতে হয় কথা? টাকা দেবেন? কাকে দেবেন? সর্বাঙ্গে ঘামছেন। নিজেবই গাযেব ঘেমো দুর্গন্ধে, হল্লায় বিভীষিকায আটকে গিযে লাঞ্ছনায় অপমানে টেনশনে টেনশনে রুমাল ঘষে ঘাডগর্দানা মুছতে মুছতে অসহায় অস্থিবতায ভাবতেই পাবছেন না—কী করবেন? লুম্পেন হুলিগানস, স্কাউন্ড্রেলস...শব্দগুলোর কোনো মানে নেই। বড়সড় একটা টাকাব অঙ্কই যদি একমাত্র পবিত্রাণ এমন দুর্ঘটের, এবং তাঁব কাছে যদি সেটাই শত্রুবিনাশেব সহজতম অস্ত্র, ঘুরে দাঁডালেন গাড়ির দিকে, দরজা খোলাব হাতলে হাত বেখে।

টকটকে লাল শার্টের বুকে 'মাই লাভ' হরফ এঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারার বয়স্ক একজন যুবক এসে দাঁড়াল সামনে। ভবাট গোঁকদাড়ি, লম্বা চুল। দয়াভিক্ষা নয়, চাইবাব ভঙ্গিটাই উত্তমর্ণের দাপট—'ছাড়ুন দেখি স্যব, ছাড়ুন। পেসাদ চাড়িয়ে আজ পেসাদি-সন্তান হবো। রোজ-রোজ বাংলা অনাস আব ভাল্লাগে না। পাত্তি ছাড়ুন কিছু। আজ বাবণ ব্যাটার দশমুণ্ড-কাটাব ছিবোকে নিয়ে একটু রংবাজি করব।'

শুভ প্রস্তাব। অনেক আগেই সেটা মেনে নিয়েছেন নিশীথরঞ্জন। প্রস্তাবের শর্তপালনে তডিঘডি ব্যস্ত হলেন। ওদের খুশি কবতেই অ্যাটাচিটা চাই। অ্যাটাচির জন্যেই গাড়িব ভেতবে যাওয়া দবকার। দবজা খুলে মাথাটা গলিযেও দিযেছিলেন অনেকখানি। কিন্তু বেহাই।

বাষ্ট্র আছে। সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থায সংবিধান আছে, সত্য আছে। ন্যায ধর্ম থাকবেই কোথাও। সবটাই নৈরাজ্য নয়। বিপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের ধনপ্রাণরক্ষায ল-অ্যান্ড-অর্ডাবেব প্রতিহারী বাষ্ট্রেরই বেতনভুক।

আরো এক ভয়াবহ জটিলতা তৈবি হয়ে উঠছিল পশ্চাদ্‌বর্তী গোলকধাঁধায়। ফুটপাতেব ধাব ঘেঁষেই দাঁড়িযে ছিল গাড়িটা। তবু হৈচৈ সোরগোল, মানুষের জটলায় যেভাবে প্রশস্ত রাস্তার মাঝামাঝি পর্যন্ত চারিযে যাচ্ছে ভিড়, যানজট দানা বেঁধে উঠতে

চাইছে। গাড়ির পব গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পেছনে। একসঙ্গে এতগুলো হর্নের আওয়াজ। মানুষের কোলাহলে মিশে নাদব্রহ্ম তোলপাড়।

জনাকযেক কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে গেছেন একজন অফিসাব। ভিড় সবাতে গিযে জনতাব সঙ্গে তীব্র বচসা পুলিশেবও এবং গাড়ির মালিককে দেখে অভিজ্ঞ অফিসার এক পলকেই বুঝে নিলেন একজন সম্ভ্রান্ত নাগবিকেব মর্যাদা। স্যালুট দিলেন না। বিনত হলেন। তাঁর মধ্যস্থতায আরো একবার গাড়ি থেকে নেমে এলেন নিশীথরঞ্জন। যারা টাকা চাইছিল এতক্ষণ, টাকার দাবি ছেড়ে সকলেই এখন ঘোরতব মানবিক, মানবপ্রেমিক। তাদেবই দাবিতে বিধ্বস্ত দেহে জনগণ ঠেলে এগোতে হলো নিশীথবঞ্জনকে। ঘটনা যা দেখলেন, দুঃখিত হতেই হয়। লজ্জিতও বটে। যে-দুচাবজন গাড়ির ধাক্কায হুমড়ি খেযে পডেছিলেন রাস্তায়, খুব বড়সড় আঘাত হযতো নয কারুবই, একজন মধ্যবযসী মহিলা বাস্তাযই পড়ে আছেন তখনও। হাঁটুর মালাইচাকিতে হাত বুলোচ্ছেন শাড়িব ওপবই। মুখেচোখে কাতব যন্ত্রণা। কোমবে ব্যথা। গৃহস্থবধূ খোলা রাস্তায এত এত মানুষেব সামনে খোলামেলা অবিন্যস্ত—লজ্জা আব সঙ্কোচ। নিশীথরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন সবিনয মিনতিতে। চিকিৎসাব যাবতীয ব্যযভার বহনেব প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু ভিড়েব মানুষ আলাদা মানুষ। অসংবদ্ধ জনতাব উত্তেজনায যা হয়—ভাষানিবপেক্ষ উত্তাল কোলাহল এবং সেখানে জট-পাকানো সুতোব ডগা বা লেজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রে জনগণ বোঝেন পুলিশ-অফিসাব। কথা হলো নিভৃতে। একটা রফা হলো জনতার অংশ মানবদবদীদেব সঙ্গে। শ-পাঁচেক টাকা হাতছাড়া নিশীথবঞ্জনেব। কিংকর্তব্যেব বিমূঢ়তায ভযভাবনা অবশ্যই ছিল। দিশেহারা বিভ্রমে দুর্গানামজপেব আকুতিও যখন খুব একটা স্পষ্ট নয়, ফাইলপত্র আর ব্রিফকেস সামলে গাড়িতে এসে বসলেন চুপচাপ। গাড়িটা অচিবেই পাবলিক ভেহিকল হয়ে গেল। আহত ভদ্রমহিলাকে ধবে ধবে এনে তোলা হলো ভেতরে। অন্যান্যবা কে বা কাবা বা কতজন এসে ঢুকল, গোনাগুনতির বাসনা নেই। বড় বেশি ঠেসাঠেসি। দুঃসহ অবস্থা। গাযের ওপব লেপটে বসেছে যে-ছোঁড়া, হতকুচ্ছিত নোংবা জামাগেঞ্জি তো বটেই, মুখেও উৎকট গন্ধ। লিভারের দোষ।

হাসপাতাল নয়। কাছাকাছি কাঁকুড়গাছিব মোড়েই মাঝাবি ধবনেব একটা নার্সিং হোম। একটা কবে টেটভ্যাক আব মোটামুটি ফাস্ট-এডেই মিটে গেল সব। ভদ্রমহিলাব ক্ষেত্রেই জটিলতা একটু বেশি। এক্স-রে প্রয়োজন। ভাঙচুব না হলেও জখমটা থাকবে কিছুদিন।

যথার্থই অনুতপ্ত নিশীথরঞ্জন। যাব মা, কালীধনের জামাব কলাব চেপে ধবেছিল যে-যুবক, ওকে ডাকলেন কাছে— 'টাকাগুলো বাখো। এক্স-বে মেডিসিন...তাছাড়া এক্ষুনি যদি বাড়ি ফিবে যেতে হয়, একটা ট্যাকশি...'

ভ্রূকুটি তুলে তাকাল সে-যুবক।

নিশীথরঞ্জনের ভ্রূকুঞ্চন দীর্ঘতর— 'কী কবো?'

'শিবপুর বি. ই. কলেজ। ফোর্থ ইয়াব...'

করজোড় ললাট ছুঁয়েছে—'আর দেরি নয়। বটঠাকুবের পুজো দেব এই শনিবারেই...'

দুটো হাতের মুঠো মুখে চেপে এতক্ষণ অদূরেই ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে ছিল রাধা। অবোলা গাভীর সাদৃশ্যে এক জোড়া শূন্য চোখ নীরব হয়ে ছিল। সাহেববাড়ির ভাষা দুর্বোধ্য তার শ্রুতিতে। এবং যেহেতু বোবা নয়, বধিরও নয়—এলোমেলো কিছু একটা বুঝে নিতেই হয় নিজের মতো করে এবং চোখে-দেখা কানে-শোনা সতিাকে নিয়ে রান্নাবান্না চলছিলও মগজে ঘিলুতে। হুড়মুড়িয়ে কান্না পাচ্ছে তার। কাউকে কাঁদতে দেখলেই কী যে হয় বুকেব ভেতরটায়, বুল্লিদিদির অঝোব কান্নায় জলে-জলে ভরে উঠেছিল তাব চোখ। মা-ব অস্থিবতায় সে নিজেও ধৈর্য হারাল। সাহেব মরে যাবেন? সে-কেন হবে? এত কাঁড়ি-কাঁড়ি পযসা যাঁদেব, তাঁদের কেন কপাল ভাঙবে? যাদেব পযসা টাকাকড়ি নেই, তাদেরই তো বাপ মবে যায় বাচ্চা বয়সে। কিংবা কালীজেঠু? আবো এক বিদঘুটে জটিল ধাঁধা। কালীজেঠু মেবে ফেলেছিল সাহেবকে? যাব খাই নুন, তাকেই কবি খুন?

বাড়ির ছাদে অনেক ঘটা করেই পুজো হযে গেল শনিবার সন্ধেবেলা। দুরন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে, ব্রেকডাউন অটোমোবাইল যেমন, কালীধন বেরা তাব জীবনের এত এত বছরের চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে এসে নিজেই থেবড়ে বসে পড়ল মাটিতে। নিজেব অন্ত্যেষ্টিতে নিজেবই পিণ্ডি গিলল সত্যনারাযণের সিন্নি আব শনিঠাকুবের পেস্যাদ।

চোখ। এক জোড়া তেজী হেডলাইট জীবনের। অথচ চোখের-ছানি এমন কিছু মারাত্মক ব্যাধি নয়। আপিশপাড়ায় গাড়িব লাইনে বড বড় কোম্পানির স্টাফ-ড্রাইভাব অনেককেই চেনে সে, যাবা চোখের-ছানি কাটার পর এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দিব্যি এবং সে নিজেও দেহেমনে ফুরিয়ে না যাবার প্রবল বাসনায় ডাক্তার-হাসপাতাল ছুটোছুটি করে চলেছে নিরন্তর। আরোগ্য চায়। যে-কবেই হোক, চাকরিটা ধরে রাখতেই হবে আরো অন্তত বছব কয়েক। পেনশন নেই গ্র্যাচুইটি নেই প্রভিডেন্ট-ফান্ড নেই। ইউনিয়ন-ফিউনিয়নও থাকে না ছন্নছাড়া একা মানুষদেব। গাড়িব ইনসিওরেন্স থাকে মালিকদের। দুর্ঘটনায় ডেমাবেজ থাকে। নেহাতই ববাতদোষে রাস্তায় কিছু একটা ঘটে গেলে আইন-মোতাবেক শাস্তি থাকে গাড়ি-চালায়-যারা, তাদের। বেধড়ক মার থাকে পাবলিকের। ক্ষতিপূরণ থাকে দুর্ঘটনায়-মবে-যারা, মৃতদেব। জীবন থাকে না, আপদবিপদ কাটিয়ে বেঁচেবর্তে থাকে যারা, জ্যান্ত মানুষদেব।

চিকিৎসাবাবদ এককালীন কিছু টাকা দেবেন দয়াময়ী মা-ঠাকরুণ। অন্নপূর্ণা মা।

সাহেববাড়িতে নতুন ড্রাইভাব এসে গেল একদিন। আঁতকে উঠল রাধা।

আতঙ্কের হেতু, কালীজেঠুর হাত ধরেই সে সাহেববাড়িতে এসেছিল একদিন, এবং আজ, সেই জেঠুকেই যদি খাবিজ্র হযে যেতে হয়, নিজের একাকিত্বে এ-বাড়িতে সে তাব নিজের অবস্থানকে বুঝে নিতে চায় নতুন কবে। অবিশ্যি নিত্যি কাজেকম্মে জেঠুর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতও হতো না নিয়মিত। গাড়ি নিয়ে বাইরে-বাইরে ঘুবে বেড়ানোই যার কাজ, সকালবেলা কখন আসেন, রাত্তিরবেলা কখন এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করেই

মেসবাড়িতে ফিরে যান, সব সময় হদিশও পেত না রাধা। কিন্তু দেশগাঁয়ের ভিটের টানে কালীজেঠুই তো এখানে ছিলেন একজন, তার স্বজাতি আপনজন।

সেই কালীজেঠুই বরখাস্ত হয়ে গেলে, এতটুকুন বাচ্চা মেয়ে সে, ভাবতেই পারে না তার কি হবে এবপর? সাহেবের রাগ বা মায়েব ভুরু-কাঁপানো তেরচা খরদৃষ্টি যদি কোনোদিন তাকেও ছুঁয়ে ফেলে? ভ্যাবলা চোখের চাউনিতে ঘোলাটে হয়ে ওঠে সাহেববাড়ির রঙের জেল্লা, চেনা-মানুষের মুখগুলি। দিনভর কাজেকর্মে ঝিমিয়ে আসে শরীরটা। ঠাণ্ডা হয়ে আসে হাত-পা। ঘুম নেই রাতভব। সাহেববাড়ির দালান খিলান যদি আঁকড়ে ধরে থাকতেই হয় তাকে, মায়েব সঙ্গে গায়ে-গায়ে পায়ে-পায়ে লেপটে থাকাব চেষ্টা তাব। মায়েব চোখেব করকরে দুটো কালো মণি এদিক-ওদিক নড়লে, প্রতিটি পলকেব তালে তালে ডানে-বাঁযে নড়তে জানে সে। যাকে পছন্দ নয় মা-ব, তাকে নিযে কানেব পাশে ফিসফিসিয়ে নিন্দা গাইতেও জানে।

কিংবা সে খুশি। সুখের ডুগডুগি বাধার মগজে, শিবায শিরায।

এতদিন ধবে সাহেববাড়িতে কাজ কবে যাচ্ছে সে। মাসমাইনেব বেতনও নাকি আছে একটা! একশো-পঁচিশ থেকে বাড়তে বাড়তে মাত্তর কটা বছরে এখন নাকি তিনশো টাকা। শুনেছে সে। আজ অব্দি চোখেও দেখে নি কোনোদিন। কালীজেঠু নিজেব মাইনেব সঙ্গে পেযে যেতেন তাব গতর-খাটানো টাকাগুলোও। দেশের বাড়িতে মাযেব কাছে পাঠিয়ে দিতেন মাসে মাসে।

অথচ কলকাতার রাস্তায় মোড়ে-মোড়ে ফুটপাতে সন্ধেবেলা কত যে খাবারেব স্টল। স্ন্যাকবার বলে এদের—বাধা জানে। চাউমিন চাউচাউ কাবাব টিকিয়া, হবেক বোল—মাটন চিকেন এগ। ফাস্টফুড এদের নাম—জানে রাধা। ঠাণ্ডা কিছু পেতে হলে কত বকমেব কত ধরনের দামি দামি আইসক্রিম, ছিপি-আঁটা হরেক বঙের নানান স্বাদের ঠাণ্ডা মিষ্টি জলেব বোতল—কোল্ডড্রিঙ্ক বলে এগুলোকে—সবই তাব চেনা। দোকানের বয়মে বয়মে ছোটবড় নানান মাপের টফি চকোলেট বাবলগাম চুয়িংগাম কিংবা গুজরাটি ভুজিওয়ালাদেব পলিপ্যাকে ডালভাজা ডালমুট ঝুরিভাজা পটেটোচিপস নযতো বাস্তার ঝালমুড়ি ভেলপুরি তেলেভাজা আলুকাবলি চুবন ফুচকা—ইচ্ছে তো হয়ই। শুধু নিজের ইচ্ছে নয়। আশেপাশের আর-সব বাড়ির কাজের-মেযেরা, যারা তাবই বয়সী, সন্ধেবেলা কোথাও দাঁড়িযে দুটো কথা কইতে গেলে, যেহেতু সাহেববাড়ির ইজ্জত তাব নিজেবও ইজ্জত, মাঝেমধ্যে সবাই মিলে দল বেঁধে খাবার ইচ্ছে হলে, সবাই যেমন দেয়, তাকেও ছাড়তে হয় কিছু। কিন্তু তার রোজগারপাতির সবই যদি কালীজেঠুই তুলে নিযে যাবেন, সে কোথায় পাবে টাকা? সাহেববাড়ির ফাইফরমাশে বোজই বাব দুই-তিন দোকানপাটে যেতে হয় তাকে। সেখান থেকেই দু-চার-পাঁচ টাকা কবে প্রায়ই হাতসাফাইয়েব বাড়তি রোজগার হযে যায় কিছু। আসলে লাখ টাকার মানুষগুলো সিকি-আধুলিতে এত বোকা, হদ্দ বোকা—হিসেবের ঘোবপ্যাঁচে মাকেও সে ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে খুব সহজেই।

সইদেব কাছেই সে এসবের তালিম পেয়ে যেতে থাকে। বুঝে যায় পয়সার ইজ্জত। ওবা দুপুরবেলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিনেমায়ও যায় কেউ কেউ। সে-সাহস রাধার হয়

নি কোনোদিনই। তার ঘরে বেশ বড়সড় একটা মাটির-ভাঁড় এসে যায়। গোল কুমড়োর ঢঙে পেটমোটা একটা ভাঁড়। সরু লম্বা একটা ফুটো থাকে ওপরের দিকে। এক-টাকা অব্দি গোল চাকতি গলে যায় ভেতরে। সবাই বলে—মাটির ব্যাঙ্ক। রাধা জানে, তার মা-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। রোজই সে সংগ্রহ করবে কিছু। পাঁচ-পয়সা দশ-পয়সা বিশ-পয়সায় আপত্তি নেই। কিন্তু যত বেশি সম্ভব, সিকি-আধুলি আস্ত টাকা সে ফেলবেই দু-চার-পাঁচটা। খুচরো জমে। জমতে থাকে। পয়সা জমতে জমতে টাকা। অনেক টাকা। মাঝে মাঝেই দু-হাতে তুলে নিয়ে ভাঁড়ের ওজন বুঝে নেবার নেশা। কত ভারি? কতটা ফাঁক আছে এখনও? এভাবে একটি নয়, দু-দুটো ভাঁড়ই জমে জমে ভরে উঠতে পারে বছরে। প্রতি বছর পুজোর আগে ভাঁড় দুটো ভাঙা হয় খোলামেলা সকলের সামনে। সে-এক দারুণ হৈচৈ কাণ্ড। দাদাবাবু-দিদিমণিরা সবাই গোল হয়ে বসে যাবে ঝকঝকে মেঝেয়। নারকেল-ভাঙার মতো করে দুটো ভাঁড়ই ফাটানো হবে দুড়ুম-দুড়াম শব্দ তুলে। পয়সাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে চারদিকে। একসঙ্গে কুড়িয়েবাড়িয়ে জড়ো করে এনে পয়সার-পাহাড়। রাধার টাকায় লোভ নেই ওদের। শুধু গুনে দেবার মজা। সিকি আধুলি টাকা বা পাঁচ দশ বিশ পয়সার খুচরোগুলো আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে টাকাব হিসেব গড়ে-দেওয়া। পুজোর মাসে, উৎসবের দিনে, যা খুশি যেমন খুশি খাবে দাবে কিনবে ছড়াবে ফুর্তি করবে রাধা। কারুর বলার নেই কিছু। এ-ওর নিজের সঞ্চয়।

সে-তো খুচরো পয়সার। সবই খোলামেলা। চোখ মেলে সবাই দেখতে পায়। রোজকাব দোকানপাটের নানা ধরনের সওদা থেকে খুচরোখাচবা রেজকি ফেরত এলে, এমন তো প্রায়ই হয়, ফিরিয়ে দিয়েছেন মা— 'যা রাখ, ও-ছাই রেখে দে তোর ভাঁড়ে...'

কিন্তু টাকার নোটে এসব বলে না কেউ। অথচ মুদির দোকান মনোহারি দোকান বা খাবারের দোকানেব কেনাকাটায় একশো দেড়শো দুশো টাকা খরচপত্তর তো হামেশাই হচ্ছে রাধার হাতে। তখনই কেমন গোলমাল হয়ে যায় মাথাটা। হরেক রকম ফন্দিও এসে যায় মগজে। বড়সড় দাঁও মারা? সে-তো আর সম্ভব নয়। সাহসও নেই। মাঝেমধ্যে দু-চার-পাঁচ-দশ টাকার হিসেব এদিক-ওদিক হলে কীঈঈঈ বা এসে যায় সাহেববাড়িতে? তখন খুচরোর হিসেব আর নোটেব হিসেব আলাদা। খাবার ঘরের পাশে তার শোবাব-ঘরে তক্তপোশের তলায়, টিনের বাকশোয়, দু-টাকা পাঁচ-টাকা দশ-টাকা...এমন কি কুড়ি-টাকার নোটও কোনো কোনোদিন, যেভাবে জমে উঠছে একটু একটু করে, কেউ জানে না তার খবর।

প্রথম দিকে হাতখড়িতে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করত খুব। হিসেবের-বুঝ দিতে গিয়ে মায়েব কাছে ধরা পড়তে পডতে রেহাইও পেয়ে গেছে কতবার! এরপব নিয়মিত হতে হতে হাতটা যখন আবো বড় হয়ে উঠতে থাকে, ভয়ডরেব ছমছম নিয়েও অবুঝ একটা নেশার টান। এক-টাকা দু-টাকার নোট মাঝেমধ্যে খরচ হয়ে যায়। পাঁচ-দশ-কুড়ি টাকার নোটের বান্ডিল খুব একটা বেশি হয়ে গেলে গোপনে চেনা দোকানে গিয়ে পঞ্চাশ-টাকা, চাই কি একশো টাকাব নোটেও খাটো করে নেবার পর টাকার অঙ্ক হয়তো বাড়ে না, নোটের গোনাগুনতিতে তাকে ছোট থেকে আরো ছোট করে আনার কৌশলে

এখন, মাত্র এই কটা বছরে, সাতটা পঞ্চাশ-টাকার নোট আর তিনটে একশো-টাকার নোট গোপন হৃদপিণ্ড তার।

গোপন টাকা এভাবে বাড়তে থাকলে, গোটা শরীর ভরে জ্বরজারি যেমন, ভয় আঁকড়ে থাকে সারাক্ষণ। সাহেববাড়ির টাকা সাহেববাড়িতেই লুকিয়ে রেখে হিসেবের কারচুপি? আলাদা একটা গানের মেশিন কিনবে সে। টিভিওফিরিও বাহারি দামি কিছু নয়। খুবই শাদামাটা একটা টেপরেকর্ডার। অনেক...অনেক ক্যাসেট—মহম্মদ রফি আশা লতা কিশোরকুমার হেমন্তকুমার কুমারশানু...ঝমঝমিয়ে থাকবে তার ঘর।

কিন্তু কী করে কী হবে? বুকের মধ্যে খিঁচ ধরে থাকে। মগজ পোড়ায়। কোথায় সে রাখবে যন্তরটা? কোন্ চুলোয়? দেশের বাড়িতে চাষিপাড়ায় মেটেঘরে বিজলীবাতি নেই। পালানভাই গেঁয়োভূত। ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেবে। আর এত দূরে দেশের বাড়িতেই যদি থাকবে সেটা, কাঁড়িকাঁড়ি খরচা করে সে কিনবে কেন শখের জিনিস? সে-যদি না হয়, সাহেববাড়িতে নিজের ঘরে বসে নিজের যন্তর বাজিয়ে গান শুনবে সে? ওরে বাপস! ভাবাই যায় না এমন একটা কাণ্ড ঘটতে পারে আদৌ। হিসেবের-বুঝ চাইবেন মা। কোথায় পেল সে এত টাকা?

বুকের তরাস বুকে নিয়েই বাধা হঠাৎ খুশি। দারুণ খুশি সুখসংবাদে। তার ছোট মগজে একটু একটু করে পাপড়ি মেলতে থাকে নতুন চতুর ফন্দি। কীভাবে কী হবে, পুরো ছবিটা খুব পরিষ্কার নয় যদিও, সারা দিনের কাজেকর্মে জিরোবার যো নেই। ছোট মগজটুকু ভারি হয়ে থাকে নতুন ভাবনায়। মনে মনে নতুন ফিকির নিয়েই ব্যস্ত সারাক্ষণ। এবার সে তার নিজের মতো করে ভাবতেই পারে নোংরা হাত ধুয়েমুছে সাফসুফ হবার কথা। তার মরণবাঁচন।

কালীজেঠুকে যদি সাহেববাড়ি ছেড়ে চলে যেতেই হয়, এবার থেকে মাসমাইনের টাকা তো সে নিজেই পাবে হাতে-হাতে। সবাই যেমন পায়। এ-রকমই একটা ভাবনা মাথায় চারিয়ে ওঠার পর খুশিতে-খুশিতে সবার অলক্ষ্যে অঙ্গে অঙ্গে দোল খায় বাধা-—মাস ফুরলেই তার হাতে তিন-তিনটে আস্ত একশো-টাকার নোট? মনে মনে একটা হিশেবও সে সাজিয়ে ফেলেছে চটজলদি বুদ্ধি খাটিয়ে—দেশের-বাড়িতে মা-ভাইকে সে টাকা পাঠাবে ঠিকই। তবে সবটা নয়। পঞ্চাশ ষাট, চাই কি একশো টাকা অব্দি মাঝেমধ্যে সে রেখে দেবে নিজের কাছে। ছ-মাস আট-মাস এক বছর...চোখ বুজে কটা মাস কাটিয়ে দিতে পারলে সে তো বলতেই পারে তখন, বাকশোর ভেতর যা আছে, যত টাকা, সবই তার গতর-পোড়ানি রোজগার। সবই হকের টাকা তার।

কালীজেঠু ভালোয়-ভালোয় বিদায় নিলে তার মিছিমিছি টাকাগুলো সবই সত্যি হয়ে যাবে। মজা, রুজিরোজগারও কী এক দারুণ মজার নেশা।

সাহেববাড়িতে কাটাকুটির খেলা অনেকটাই সাপলুডোর মতো। মইয়ের ঘরে কারুর দান পড়ল তো ধাঁই-ধাঁই উঠে যাবে দুই সারি তিন সারি পাঁচ ধাপ দশ ধাপ ওপরে। সাপের মুখে পা—নিরানব্বুইর ঘরে পৌঁছেও তলিয়ে যেতে পারে তেষট্টিতে। বিরানব্বুই থেকে পঁচিশে, ছাপান্ন থেকে হড়কে পড়ে একেবারে এক-এ। আবার শূন্যি থেকে শুরু।

কালীজেঠুর মরণ যদি চোখের ব্যামোয়, নতুন ড্রাইভার এসে গেল চশমা ছাড়াই গোল-গোল তেজী দুটো চোখ নিয়ে। মায়ের সঙ্গে গা লেপটে থেকে রাধাব যদি পৌষমাস, সর্বনাশ ঝুমার-মার। এই বয়সে নতুন করে অন্নবস্ত্রেব ঠাঁই খুঁজতে বুড়ি পিছলে গেল রাস্তায়।

বলা বাহুল্য, সেখানেও রাধার সুচতুর অতিবুদ্ধি ছিল।

রান্নাঘরে মশলাপাতির বয়মের তলায় একদিন দুটো দশ টাকার নোট পেয়ে গেল ঝুমার-মা। মা-ঠাকরুণ কাছে ছিলেন। তেরচা ভ্রূকুটিতে— 'কার টাকা? এখানে কোত্থেকে এল?'

সত্যি কিছুই জানত না ঝুমার-মা। ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ি— 'সে-আমি কী করে বলব? আপনেদের ট্যাকাপয়সা ছুঁই নিকি আমি?'

স্বাভাবিকভাবেই রাধা শনাক্ত হযে যায়। তড়বড়িয়ে অনেক মিথ্যেকথা। বিস্তর অভিনয়। শেষপর্যন্ত আব ধবে রাখা গেল না সেগুলো। হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। হাজারটা ধানাইপানাই বকে সামাল দিতে হয় অনেক কষ্টে—টাকাগুলো সে ফেরত দেবে বলেই তো ওখানে রেখেছিল অনেকদিন আগে। নানান কাজে একদম ভুলে গেছে। কটকটে ঝাল খাবাব পর জিভের শোসানি ছিল। টরে টরে রইল কয়েকদিন। তারপরই খুশকি-পোড়া বুড়িব চুলে উকুন বাছার শুরু—মাত্রা ছাড়িয়ে বড় বেশি তেলমশলা খবচ হয়ে যাচ্ছে। কই, এ-বাড়িব রান্নাবান্নায় এত তেলঝাল তো থাকে না কখনও। অথবা ধোয়ামোছা বাসনকোশনের আডালে যে-দুটো আপেল আর এক গোছ টশটশে আঙুর খুঁজে পাওয়া গেল, সেগুলো এল কি করে এখানে? কে রেখেছে? অথবা একেবারে নতুন ছ-লিটারের একটা প্রেশার-কুকার ভাঙে কী করে? কে ভাঙল? কিংবা স্টিলের বাসনপত্রের গোটা কয়েক বাটি গেলাস কম মনে হচ্ছে যেন! কোথায় গেল...ইত্যাদি কুটকচালে সাতগলায় চেঁচামেচি করেও বোঝাতে পারে না বুড়ি—সে নির্দোষ।

এবং কিরণময়ী, গৃহশান্তিই কাঙ্ক্ষিত যাঁর, এসব ইতরজনের হল্লাচিৎকার খেয়োখেয়ির উৎপাত সইবেন না অবশ্যই। রাধাকে ডেকে ধমকালেন বিস্তর— 'চালাকি পেয়েছিস? সবই ঝুমার-মার দোষ? কিছু বুঝি না আমি? কেন? সবটাতে তোর এত মাতব্বরি কিসের? একটার পব একটা রান্নার লোক আসবে, কাউকে টিকতে দিবি না তুই। দাঁড়া, এবার তোকেই বের কবে দেব ঘর থেকে। বড্ড বাড় বেড়েছে তোর...'

ভয় পায় না রাধা। কাঁপে না। ধমক খেতে, ধমক সইতে শিখে ফেলেছে সে এখন। ভযের-কাঁপুনিতে নিজেকে ভিজিয়ে রেখে ভ্যাবলা চোখে কাঁচুমাচু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এ-সময়। ঘরের-মেয়ে হয়ে থাকার শর্ত সেটা।

নিঃসাড় সহনের নিখাদ লাভ—ঝুমার-মা জবাব পেয়ে গেল।

অসহায় বুড়ি যদিও জানে—তিন মেয়েছেলে যেখানে, কাজির বিচার সেখানে, এবং জেনেও, বড়লোক-বাড়ির হালচালে কাজির আঁচল ছুঁতেও পারল না ছিটেফোঁটা। গায়ের জ্বলুনিতে, যাবার আগে ওয়াক্-থু ওয়াক-থু থুতু ছিটিয়ে গেল রাধার গায়ে—'নাক-টিপলে-দুধ-পড়ে গিদেল মেয়ে, তুই মর। কুষ্ঠ হয়্যা পচে পচে গলে গলে মরণ হবে লা তোর। বে-থা হবে নি। আর সে-হয় ত, গুখাকি পোড়ামুখি, ভাতারের নাথিঝ্যাটা খেয়ে

মরবি লা তুই। না, মরবি নি। তেরাত্তিরে বেধবা হবি। বেধবা হয়্যা পরের দোরে দাসীবিত্তি করে জ্বলবি পুড়বি মরবি জেবনভর...'

এসব শাপশাপান্তিতে কিছু যায়-আসে না এখনও ফ্রক-ছাড়ে-নি যে-মেয়ে, রাধার। কিন্তু একদিন-দুদিন কেউ রাঁধুনি না থাকলে সবকিছুতেই বড় তালগোল পাকিয়ে যায় সাহেববাড়ির হেঁশেলে। তখন তারই মরণ। খাটুনি বেড়ে যায় অনেক।

ভালো-ভালো শখের রান্না বেশির-ভাগ মা নিজেই রাঁধেন প্রায়ই। রাঁধতে ভালোবাসেন। রান্নাঘর তাঁর ঠাকুরঘরের মতো। একদিকে রাধা থাকে। কিন্তু অন্যদিকে পাকা বাঁধুনিও তো চাই কাউকে। হাতাখুন্তিটা নাড়বে অন্তত, যেমন-যেমন চাইবেন মা-ঠাকরুণ।

তেমন কেউ না থাকলে, রোজকার রান্নায় একা, হাঁসফাস হাঁকুপাকু বড় বেশি বেড়ে যায় মা-র। তিবিক্ষি মেজাজ। তখন সব ধকল সইতে হয় রাধাকেই। সেও একা। মা-র শাড়িব্লাউজ সবই আলনায়-আলমারিতে তোলা থাকে এ-সময়ে। হাউসকোটে হরেক রং, নানান নকশা, রকমারি চিত্তির। ঘর থেকে ঘরে ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ ছাড়াও, এমন দুর্ভাগ্যের দিনে, রান্নাবান্না সবই করতে হয় যাঁকে, তাঁর হাউসকোটে দাসীবাঁদিদের মতো হলুদলঙ্কার ছোপ-ছোপ দাগ লেগে যায়। সোনায়-মোড়া দুটো হাতে মশলাপাতির গন্ধ। ছপছপ জল! ঘাড়ে গলায় নাকে মুখে কপালে গলগল ঘাম আর বুকের হাপরে ঘন ঘন হাপুসহুপুস নিঃশ্বাসের টান। হাউসকোটের আঁচল থাকে না। আরো বেশি কষ্ট। পয়সাওলা ঘরের মানুষদের গতর খাটানো এমন কষ্ট রাধা সইতে পারে না একদম। সে মেম-মায়ের পাশে পাশে থাকে। তার ভাতকাপড়ের-মা। যেমন হুকুম, যেমন আজ্ঞা, তামিল করতে করতে, এটুকুন বাচ্চা বয়সে যেটুকু দম, সব নিয়ে তার নিজেরও মরণ। কাজ আর কাজ আর কাজ। ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে একতলায় দোতলায় ছাদে উঠতে হয়, নামতে হয়, ছুটতে হয়। শুধু তো মায়ের রান্নায় যোগান নয়, রান্নাবান্নার বাইরেও ধোওয়া-মোছা কাচাকাচি দোকানপাট বাঘার-সেবা সকালসন্ধের সব কাজই থেকে যায় রোজকার নিয়মে। ছিটেফোঁটা ফুরসত থাকে না একটু জিরিয়ে নিঃশ্বাস নেবার। ভরসা একটাই—অঢেল পয়সার ঘরে দুঃখুকষ্ট থাকে না বেশি দিন। একদিন দু-দিন, বড়জোর দিন চার-পাঁচ। কেউ একজন এসে যাবেই নতুন লোক। খোঁজখবর চলছে। আসুক না কে আসে। দিন দুই বাজিয়ে দেখবে রাধা। তার সঙ্গে বনিবনায় আসতেই হবে নতুন বাঁধুনিকে। নইলে তার নিজের জমি সে নিজেই বা ছাড়বে কেন?

তাছাড়া মা তো বলেই দিয়েছেন—এবার আর বুড়িধাড়ি এলেবেলে কেউ নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালো হাতের পাকা লোক চাই। সাহেববাড়ির কাজকম্মো বোঝে, কোনো নিপুণ কারিকর। এবং অবশ্যই মেয়েছেলে।

নতুন রাঁধুনি এল— যূথিকা। সল্ট লেকে কোন্ এক পয়সাওলা ডাক্তারের-বাড়ি রান্না করত এর আগে। মুন্নিদিদির ইশকুলের বন্ধুর বাড়ি। সেখান থেকেই ও-বাড়ির গিন্নির সঙ্গে টেলিফোনে টেলিফোনে কথা বলে ওকে নিয়ে এসেছেন মা।

নতুন মাসির সঙ্গে রাধাকে মানিয়ে নিতে হয়। সাত চড়ে রা কাড়ে না— এ-

আরেক অদ্ভুত মেয়েছেলে। বাড়িতে বসে টিভি দেখার এমন ভালো ব্যবস্থা, সেখানেও যাবে না। শনি রবিবারে 'বই' দেখার সময় মা নিজে ডাকলে মাঝেমধ্যে গিয়ে এক কোণে চুপচাপ গিয়ে বসবে হয়তো, তাপ-উত্তাপ নেই। কোনো কথা বলবে না।

যূথিমাসি বোবা মেয়েছেলে নয়। ভালোই কথা বলে সবার মতো। অনেক কথা। রাধা তার সব কিছু ঠিকঠাক বোঝে না অবিশ্যি। এমন সব দুঃখু-দুঃখু কথা শুনলেই মুন্নিদিদিব মুখে শোনা সিন্ডারেলার বেত্তান্ত মনে পড়ে যায় তার। নিজের মাকে মনে পড়ে। পালানভাইকে।

বয়স, নিজেই বলে কমবেশি তিরিশ-বত্রিশ। শাঁখাসিঁদুর আছে হাতে-সিঁথিতে। সোযামি থেকেও নেই। বিয়ের পর পুরো একটা বছরও নাকি ঘর করে নি এক সঙ্গে। গুণ্ডাবদমাশ একটা লোক। শাশুড়িটা আবো দজ্জাল। লাথিঝাঁটা খেয়ে সেই যে বেবিযে এসেছে, আব ওমুখো হয় নি। বিয়েতে তিন ভরি সোনা দিয়েছিল গবিব বাপ। দু-হাজার টাকা নগদ। সব খুইয়ে পোড়াকপালী যদি ফিরেই এল, বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার মুরদ নেই বাপ ভাইয়ের। সব দিকেই যদি ভেতব থেকে ঘব বন্ধ, রাধার মনে হলো, মাসি যেন তাব মতোই আবেক রাধা—গতব খাটাতে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। সোমত্ত বয়সের একা মেয়েছেলে তো ঘুরে বেড়াতে পাবে না বাস্তায়, ঘর একটা খুঁজে পেতেই হয়। ঠোক্কব খেতে খেতে আপাতত রাধার সঙ্গে সাহেববাড়িতে ঠাঁই।

বয়সে অনেক বড হলেও সাহেববাড়িতে নতুন মাসি একেবাবেই আনকোরা। সবার পছন্দ-অপছন্দ বা মা-ঠাকরুণের মর্জি জানা আছে বলেই রাধা তাকে তালিম দিতে পারে কিছুটা। সারাদিনেব খাটাখাটুনির পব অনেক রাতে পাশাপাশি শুয়ে দুজনের ফিসফাস ফিসফাস।

বাঙাল ঠাকুমা বা হারানের-মা ঝুমার-মা সকলের জন্য আলাদা একটা ক্যাম্প-খাট ছিল। ওসব হুজ্জতিতে কোনোদিন যেত না বুড়িরা কেউ। কাঁথা মাদুর পেতে মেঝেতেই শুযে পড়ত সাহেবদের খাবারঘরের এক পাশে। চার কোণে চারটে চেয়ার টেনে মশাবি টাঙাত ভারি সুন্দর। নতুন মাসিব জন্যও একই ব্যবস্থা করেছিলেন মা। বাধা তাকে তুলে নিয়ে এল নিজের তক্তপোশে, এক মশারিব তলায়। এবং এভাবেই একদিন কথায়-কথায় জানল প্রথম—মাসির ছেলে আছে একটা। বেশ বড়সড়। বছর সাতেক হবে বয়স। বাজারহাট বিষ্ণুপুরে মামাবাড়িতে থাকে বুড়ি দিদিমার কাছে।

'সে কি গ, তোমার ছেলে আছে? বলোনি কাউকে?'

'চুপ।' অন্ধকাব ঘরে পাশাপাশি শুয়ে কেউ দেখছে না কাউকে। তবু বোঝা যায়, ঠোঁটে আঙুল চেপেছে মাসি। ভাবি গলাব স্বর— 'কোথাও নতুন চাকরি পেতে হলে প্রথম-প্রথম বলি না সে-কথা। ছেলে আছে জানলে কাজ দিতে চায় না কেউ। ছেলের জন্যে উড়ু-উড়ু কববে মন। মন দিয়ে কাজ করবে না, ভাবে সবাই...'

'তুমি যে মিছে কথা বলছ, মা যদি ধরে ফেলেন?'

'কী করে ধরবে? ছেলের কথা কি মায়ের গায়ে লেখা থাকে নিকি? সে-যদ্দিন পেটে থাকে ততদিন...'

খুবই ধোঁয়াটে মাসি। রাধা হঠাৎ-ই বোকার মতো—'তোমার বরেব কথা বলেছ গ মাকে?'

'হ্যাঁদা নিকি লো তুই? কানা নিকি?' ঝাঁ করে মশারির তলায় উঠে বসেছে মাসি। ঝাঁঝিয়ে উঠল— 'দেখছিস না শাঁখা পরি হাতে? সিঁথিতে লম্বা করে সিঁদুর, কপালে ঢং দেখিয়ে কত বড ফোঁটা? গুণ্ডা বদমাস লোকটা যে আছে, দশজনের কাছে সেটা আমাকে জানান দিয়ে বেড়াতে হয়। নইলে রেহাই আছে? থুতু দেবে না? কেচ্ছা গাইবে না সবাই?'

আস্তে আস্তে শিযরের বালিশ ছেড়ে নিজেও উঠে বসেছে বাধা। চাপা গলায়— 'কেন গ মাসি, তোমার বব নেয় না তোমাকে।'

'নেয় না কী? নিতে চাইলেও কি যাব নিকি আর? লোকটা যদি মবেও যেত, তাহলেও না-হয় একটা হিল্লে হতো। আপদ চুকত। কিন্তু সে-ও ত আবেক জ্বালা। লোকটা যদি থাকে ত শাঁখাসিঁদুবে সতীপনার পোস্টাব সেঁটে ঘুরে বেড়াতে হবে চেবটা কাল। আর যদি না থাকে থানকাপড পরে ঘুবে বেড়াতে হবে আমাকে। ছোটলোকটা যে নেই, তারও জানান দিয়ে ঘুরতে হবে দশজনেব কাছে,...'

পরের দুঃখু শুনলেই কেমন কান্না পায় রাধাব। সবটা বুঝে বা না-বুঝেই অবশ হয়ে আসে শরীর। দেশগাঁযে বর্ষাকালে সাপেব মুখে ব্যাঙ পড়লে যেমন ডাকে, গোঙাচ্ছে মাসি— 'আর আমাব ছেলেটা! ছেলেটা যে-আছে, একটু চোখের দেখাও যে দেখতে পারি নি কতদিন...'

রাধা চমকে উঠল। দুটো হাঁটু যেখানে হাঁড়িকাঠের মতো উঁচিয়ে আছে, ঘাডগর্দানশুদ্ধু নিজের মাথাটা সেখানে ঠেলে দিয়ে ভেঙে পড়ল মাসি। কান্নাব বিশেষ কোনো আওয়াজ ছিল না। অথচ অন্ধকারে কোনো কিছু চোখে না দেখেও, শুধু কানে শুনে বোঝা যায়, কাঁদছে কেউ। মশাবি থেকে বেরুল না বাধা। আলো জ্বালবে না? কিন্তু ভয। গোটা সাহেববাড়িটা রাতদুপুরে নিঝুম। কান্নার শব্দটা মাথাব ওপরকাব পাখা-চলাব শব্দেব চেয়েও অনেক খাটো। কিন্তু কান্নাটা কান্নাই। বুক-পোড়ানি যন্ত্রণা। বাধা নিজেই জানে না—এভাবে কেউ কাঁদলে কী করতে হয়? মাসি যে বয়সে অনেক বড। তাব বাঁ-হাতটা আস্তে আস্তে মাসির পিঠে উঠে এল।

মাসি নিজেই মাথা তুলল ফোঁসফোঁসানিতে। গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, গম্ভীব— 'নে শো, শুয়ে পড। রাত অনেক হয়ে গেছে। কাল আবার ভোববেলা উঠতে হবে। সাহেব কোথায যাবেন সাড়ে সাতটাব আগেই...'

বাধাব উদ্বেগ নেই। সে আরো একটু ঝুঁকে পড়ল—'তুমি ত পডালেখা শিখেছ গ মাসি!'

'ধুস, সে ত কেলাস সিক্স অব্দি। ওতে কী হয়?'

'বছর-বছর ইশ্‌কুলের এতগুলো পাশ দিলে! কিছু হয় না বলছ?'

'হবে না কেন? মুখ্যুর সঙ্গে বিয়ে হয়।'

'দিদিমণিরা অনেক বড় বড় ইংবেজি ইশকুলে পড়ে অনেক বড বড পাশ দিচ্ছেন, সে-না-হয় আলাদা। রাজপুত্তুর বর পাবে।'

'বাজপুত্তুর? সে-আবার কী? ডাক্তার এঞ্জিনার পফেসার বল্। এ-বাডির সাহেবের

মতো চাটার না কী যেন...'

'এই হল আর কী। আমি কি তোমার মতো অতশত জানি? ইশকুলে এত্গুলো কেলাশের পড়া করে তোমার যদি এই হাল গ, আমার কী হবে? আমি মুখ্যু মেয়ে। এক্কেবারে-মুখ্যু...'

ঘুটঘুট্টি নিঝুম মাখামাখি একাকারে কালো করে দিয়েছে দুটো কালো মেয়েকেই। ঘনিষ্ঠ লগ্নতা সত্ত্বেও মাসিকে খুব একটা আপন করে পাচ্ছে না রাধা। এ-যেন কেমন-কেমন! হঠাৎ-হঠাৎ কথা থেমে যায়। রাধা কী জিজ্ঞেস করল, শুনেছে ঠিকই. সাড়া দিচ্ছে না ইচ্ছে করে। পড়ালেখার গুমর!

কিংবা অন্ধকারই কথা বলে ওঠে—'আর মাত্তর কটা মাস। পরের বাড়িতে দাসীবিত্তি করব না আর...'

রাধা চমকে উঠল।

'একটা কথা বলব? বলবি নি কারুক্কে...'

'মা কালীর দিব্যি...' ঝামটা মেরে আধশোয়ায় মাথা তুলল রাধা। কোমর অব্দি ভর থাকে বিছানার ওপর। নিজেকে আলগা করে উঁচিয়ে রাখতে হয় বাঁ-হাতের কনুইয়ে। ডান হাত উঠে আসে চিৎ হয়ে শোয়া মাসির বুকে। বুঝি নতুন বেত্তান্ত কোনো। ফুলপরীর গপপো।

'চার-পাঁচ মাসের খোরাকিটা যদি জমিয়ে তুলতে পারি, ঘরে চলে যাব...'

'সেখানে কী করবে?'

'আমার বাপ-ভাই ত ফুটে কাটা-কাপড়ের হকারি করে। আমিও একটু-আধটু সেলাইফোঁড়াই শিখেছিলাম বিয়ের আগে। আমার পয়সায় একটা সেলাইয়ের মেসিন কিনে নেব। দিনরাত খাটব। ছেলেকে নিয়ে ঘরের মেয়ের মতো ঘরেই থাকব। ডালভাতে যে-ভাবে হোক, চলে ত যাবে...'

রাধা শুয়ে পড়ল আবার। এ-কোনো ফুলপরীর গপপো নয়। বিচ্ছিরি।

ঘরের মেয়েদের ঘর থাকে, কাজের মেয়েদের জন্য কাজ। কাজের জন্য ঘর ছাড়তে হয় যাদের, পরের ঘরে নতুন করে 'ঘরের মেয়ে' হয়ে উঠতে চায় তারা। ঘর ছাড়তে হয় না যাদের, তারা খুব সহজেই পরের মেয়েকে পেয়ে যেতে পারে নিজেদের ঘরে। অন্নে বশ মানে অন্যরা।

পরের ঘর, আপন ঘর, ঘরের মেয়ে, কাজের মেয়ে ইত্যাদি জটিল গাণিতিক সমীকরণে সামান্য-লক্ষণ—দুটি ঘর এবং একই মেয়ে। ঘর ছেড়ে ঘর পেয়েছে রাধা। বুঝতে শিখেছে সবে—মেয়েদের ঘর পাবার আলাদা নিয়ম। নিজেকে মেয়ে বলে জানত যেটুকু, সহসা হদিস পেল, সেটা সব জানা নয়।

পুরোপুরি. মেয়ে হয়ে উঠল যেদিন, বিভীষিকার সশঙ্ক প্রহরে চিনল নিজেকে—শৈশব ফুরিয়ে গেলে কাজের-মেয়েকে ভুলতে হয় পুরনো সব খেলা। যারা ঘরের-মেয়ে, পূর্ণতায় প্রবেশে তাদের অনেক খেলাই বাকি থেকে যায়।

খাঁচার পাখি আকাশের পাখির ফারাক।

ধরিত্রীর বিভীষিকা,

প্রথম লজ্জায়

এর আগে আরো কিছু ধনী মানুষেব ঘরে কাজ কবার সুবাদে সাহেববাড়িব আদবকাযদা অনেক কিছুই জানে নতুন মাসি। সারাক্ষণ গায়ে গা লেপটে থেকে কাজের ধবনধারণ লক্ষ কবে বাধা। নিজেও কাজ শেখে। নিজের কাজকর্মের অতিরিক্ত, যা-কিছু গা-গতরে খেটে দিতে হয়, নিজেই হাতে-হাতে তুলে নেয়। মাসি বড ভালো।

বাজারের সেরা জিনিস আসবে সাহেববাড়িতে। কাছাকাছি কোন্ তেলকল থেকে সরষে ভাঙিযে আনতেন নন্দদা। মায়ের মনে খুঁতখুঁত থেকেই যায়। যতই দাম হোক, ডবল বিফাইনড বাদাম তেলে বান্নাবান্নাব নিযম চালু হয়েছে কয়েক বছব থেকে। সবাব জন্য রেশন কার্ড আছে যদিও, খবব ও বাখেন না মা। একমাত্র চিনি ছাডা আব সবই ঝি-চাকববা তুলে নেয ফি-হপ্তায়। দেশেব বাডিতে কি নিজেদের ঘবসংসারে নিযে যায। রাধা নিজেও মা-ভাইয়ের জন্য গম পাঠিয়েছে কতবাব! কালীজেঠু নিয়ে গেছেন। নতুন-মাসির কাছে শুনেছে—কোন্ এক সাহেববাড়িতে কাজ কবতেন মাসি, সেখানে ছিল আলাদা নিয়ম। রেশন তুলতেন বাবুবা। দু-বকমের রান্না হতো। ঝি-চাকরদেব জন্য রেশনেব চাল। অনেক সময় তবিতরকাবি মাছমাংস, বিশেষ কবে জলখাবারে ভাগেব হিসেবও আলাদা। এ-বাড়িতে যদিও সে-রকম ভাগাভাগি তেমন কিছু নেই, মাযেব খ্যাপামিতে রাধাব মরণ। বাজাব-কেনা কোনো বকম গুঁড়ো-মশলা চলবে না সাহেববাডিতে। কী-নাকি সব বিষফিসের ভেজাল থাকে হলুদলঙ্কাধনেজিবের গুঁডোয। তাছাড়া মাইনে-করা এতগুলো দাসীবাঁদিই যদি থাকবে ঘরে, সাহেবরা বিষ খাবেন কেন?

গা-টা ম্যাজম্যাজ করছিল রাত্তিব থেকেই। কাজকর্মে মন বসছিল না। এরই মধ্যে সকালবেলা প্রতিদিনেব নিয়মে রান্নাঘরের কোণে বাটনা বাটতে বসেছিল রাধা। বযমে বযমে মশলাপাতি আদা-পিঁয়াজ, জলের বাটি, বাটা-মশলা সাজিয়ে রাখাব প্লেট নিযে হাঁটু ভেঙে বসে, শিলনোড়ার পাথরে-পাথবে মশলা গুঁড়োনোর নিত্যকর্মে পা থেকে মাথা অব্দি গোটা শবীরটাকেই নাচিয়ে দুলিযে, যখন টানটান দুটো হাতেব ব্যথাবেদনাও গা-সওয়া, বড্ড বেশি হাঁপিয়ে উঠছিল খামোকা। শিরশির অন্য ধবনেব। আবেক যন্ত্রণা, ঘাম মুছতে চাইলে হলুদলঙ্কায় মাখামাখি দুটো হাতের পাতা আলগা রাখতে হয। কনুই তুলে ঘষতে হয গালগলাকপাল। ম্যাকসি-জামাটায় রং ধরানো চলবে না কিছুতেই।

ভেতর থেকে একটা অস্বস্তি হঠাৎ। অপরিচয়ের সেই দহন শুরু হতেই, অচেনা অনুভবে দিশেহারা মেয়ে হদিস পায় না নিজেরই গন্ডগোলগুলি। নতুন কোনো অসুখবিসুখই হয়তো এবং শবীরটবির এ-রকম খারাপ হলে যা হয়, প্রথম দিকে মুখ ফুটে বলাও যায় না কাউকে। সইতে হয। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে যখন আর সহনটুকুও সইতে পারা যায় না, হাত-পা ঢিমেতালে অবশ হয়ে এলে নাকেমুখেচোখে মন-খাবাপিব ছাযা যদি মায়ের নজবে পড়ে যায, নন্দদা নয়তো কালীজেঠুকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন পাড়ার ডাক্তারখানায়। নয়তো আনিয়ে দেবেন দু-চারটে চেনাজানা ট্যাবলেট। এতকাল এভাবেই রোগ সেরেছে রাধার।

কিন্তু আজ কনকনে ব্যথাযন্ত্রণা বা গা-বমি-বমি, মাথাব ঝিমঝিম বা সব মিলিয়ে কোনোটাই সেভাবে বুঝে উঠতে না পেরে অথবা সব মিলিয়েই নিজের শরীরকে না চেনায় বা শরীরের কলকব্জাগুলির অদ্ভুত ঘোরপ্যাঁচে, কী অবাক কাণ্ড... নিতান্তই অবোধ বালিকা জটিল বিভীষিকায় নাড়া খেয়ে...বইল পড়ে শিলনোড়া হলুদবাটা জলের-বাটি বাটনার-থালা বা সমস্ত কাজকম্মেব বুঝ, আচমকা লাফিয়ে উঠে, যখন হেঁসেলের ওপাশে রান্নায ব্যস্ত যূথিমাসি, ঠিকে-ঝি ববির-মা কাজ সেরে যায় নি তখনও, মা বাবকয়েক ঘুরে গেছেন রান্নাঘরে, কাউকে কিছু জানান না দিয়েই—কী হচ্ছে শরীরের ভেতর, কিছু একটা হচ্ছে কোথাও জেনেই, শুধু বুঝে নেবার তাগিদে ছুটে যেতে যেতে করিডবে লাউঞ্জে বারান্দায় সিঁড়িতে কারুর চোখে চোখ পড়ে যাওয়াব নজর এড়িয়ে কিংবা নিজেব মধ্যেই নিজেকে লুকোবার চেষ্টায় নিচে একতলার স্নানঘরে, লোকচক্ষুব আড়ালে যেখানে...যেখানেই একমাত্র তার আড়াল হতে পাবে, নির্জনে, কোন্ এক বিদঘুটে গোলকধাঁধায় নতুন আধিব্যাধিকে চিনে নিতে চেয়ে অথবা আধিব্যাধিব পাট্টাসেলামিতে নিজেব অচেনাকে বুঝে নেবার উৎকণ্ঠায় ভীষণভাবে আঁতকে উঠল বিষেব কাঁপুনিতে। ভীষণভাবে কান্না পাচ্ছে তাব। কী করবে সে এখন? এটুকুন বয়সে আজ অব্দি বড়সড কোনো অসুখবিসুখে পডতে হয় নি তাকে, এবং আজ, নিজেব অস্তিত্বকে গাঢতর কোনো সংকটে বিপন্ন জেনে ভ্যাবাচাকা ফ্যালফ্যাল চোখের চাউনিতে চারপাশে তাকাতেই শাদামাটা বাথরুমের জলেশ্যাওলায ছাতাপডা দেযালে, যেখানে শাওয়ারফাওয়ার কিছু নেই—সাধাবণ জলের কল, চৌবাচ্চার জল আর ফাটা প্লাস্টিকের মগে তাচ্ছিল্যের যে-দীনতা, মনে হয এই মুহূর্তে সেটাই আপন ঘর, গোপন ঘর তার। গোপন ঘবে সারা গায়ে মগে-মগে জল ঢেলেও তো হবার নয় কিছু। দোলখেলার দিনে যেমনটা হয়। পিচকিরিব রঙে বঙে জামা নষ্ট হয়ে যায়। নাকেমুখেগালেগলায় হাতেপাযে মাথাব চুলে আবিব মেখে বং মেখে ভূত হযে এলে সাবান ঘষে শ্যাম্পু ঘষেও সাফ হওয়া যায় না এক দুপুরে। সে-তো খেলা। হোলির খেলা। ঘরে-পরার জন্যে কদিন আগেই মুন্নিদিদির একটা পুবনো ম্যাকসি পেয়েছিল সে। বঙিন জামায় নতুন বঙেব মবণদশায় আকণ্ঠ ভয়ের দলা দম চেপে আটকে রেখে ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে চোখের-জলে ভিজে চুপচাপ। কাঁদতেও পাবে না বড় করে। যে-কান্নায় হাঁক পেড়ে ডাকা যায় না কাউকে। মুখ ফুটে বলা যায না—কোথাও কিছু নেই, কেন এমন হলো তাব? নতুন ব্যামো কী বিচ্ছিবি! কী সব্বোনেশে কী লজ্জার গ! সুবিশাল সাহেববাড়ি এই প্রথম তাব হাবাগোবা চোখেব পাতায সর্বশূন্যতায় পাথর হয়ে আসে। এমন রোগবালাইয়ের দিনে অঝোব কান্নায় মাকে মনে পডছে তাব। তাকে পেটে-ধরার মা, ঘুঁটেকুড়ুনি মা তাব। গবিবদুঃখী মা। অনেক দূবের দেশগাঁয়ে ভাঙা মেটেঘরে, যেখানে তাব জন্য এখনও একটা খোলা আঁচল হয়তো আছে কোথাও, যার তলায় আজ সে মাথা লুকোতে পাবত। বলতে পারত, যা কাউকে বলার কথা নয়।

কিংবা সেই স্নেহাঞ্চল সাহেববাড়িতেও ছিল।

আপিস-টাইমের রান্নাবান্নায় যূথিকাও রীতিমত ব্যস্ত তখন। মেয়েটার এভাবে চলে-

যাওয়া চোখে পড়ে নি অথবা প্রথম দিকে সেটা এমন কিছু ব্যাপারও ছিল না তেমন এবং যখন কড়াই-উনুনের তাগিদেই বাটা-হলুদ বা ধনেজিরেলঙ্কাব প্রয়োজন হলো, শিলনোড়ায় একজনেব না-থাকাটা নজরে পডল। অদ্ভুতই লাগল কিছুটা। কেন না, রাধা সে-রকম বেআক্কেলে আডবুঝ মেয়ে নয় আদৌ। বাটনাবাটি প্রায় সবটাই বাকি। গোটাকয়েক হলুদ থেঁতলানোর পব একটার বেশি দুটো নোড়াঘষা হয় নি পুরোপুরি। সুতরাং মেয়েটার ওপর তাব রাগই হলো কিছুটা। তাড়াহুড়োর সময় উনুন কামাই যাবে। এরপর যে তাকেই বসতে হবে শিলনোডায়।

সকালের দিকে এ-সময়ে মোটামুটিভাবে রান্নাঘরেই থাকেন কিরণময়ী। নন্দলালকে বাজারে পাঠাবেন। ভাঁড়ারে বিলিবণ্টন বা কাজকর্মেব বিলিব্যবস্থা তদাবকি করবেন। নিজেও হাত দেবেন টুকটাক। হেঁশেলে এসে শুনলেন সব। স্বচক্ষে দেখলেন। ক্ষেপে গেলেন। এভাবে কাজ ফেলে, না বলেকয়ে হঠাৎ কোথায যেতে পারে মেয়েটা? কেনই বা যাবে? দোকানপাটে পাঠায় নি কেউ। টয়লেটে গেলে সে-আব কতক্ষণ? রান্নাঘব থেকে বেরিয়ে বারান্দায দাঁড়িযে এদিক-ওদিক ডাকাডাকি করলেন বারকয়েক। খোঁজাখুঁজিও হলো কিছুক্ষণ। ক্রোধই বাড়তে থাকে। মেয়েটার হঠাৎ-হঠাৎ বেয়াডাপনার জন্য কত আব ছুটোছুটি করবেন? যূথিকাকেই পাঠালেন। মুনমুন বা বুলবুলির ঘরে আছে কিনা অথবা একতলায় সাহেবের আপিশঘরে, নয়তো ছাদের ঘরে বাবনও ডেকে নিতে পারে কোনো কাজে।

মোটামুটি একটা হুডমুড়িই পড়ে গিযেছিল মেয়েটাকে নিয়ে এবং যখন গোটা বাডি চক্কর দিয়ে খুঁজে খুঁজে একতলায নেমে এসে আউটহাউসে টয়লেটের দবজায় ধাক্কা মেরে, দরজা খুলিয়ে যখন পাওয়া গেল ওকে, সাহেববাড়ির ফেলে-দেওয়া ভাঙা-পুতুলের আদলে বিপর্যস্ত সেই মেয়েকে দেখে নতুন ঝকমারিতে যূথিকা বিচলিত যদিও, প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ভ্রূ কুঁচকলো—'কী? কী হলো তোর? এমন করছিস কেন?'

'এ-কী পাপ গ মাসি?'

'পাপ?' একরত্তি একটা মেয়েব পাকামি হয়তো ক্ষমাঘেন্নায় মেনে নেওয়া যেত। গাধামো অসহ্য আরো। যূথিকা ঝাঁঝিযে উঠল—'পাপপুণ্যি আবার কি লো? ঢং দেখাচ্ছিস? ন্যাকা? দাঁড়া, দাঁড়া তুই এখেনটায়। দাঁড়িয়ে থাক। আমি আসছি এক্ষুনি...'

রাধা দাঁডিয়ে থাকে। খটকাও লাগে। যূথিমাসির তেরচা চোখের চাউনিব সঙ্গে ভাঙা ঠোঁটের হাসিটুকুও দেখে ফেলেছে সে। হিসেব মেলে না। বুকের ভেতব খামচি-মাবা ভয় আর হেঁয়ালিব ঘেরাটোপে নিজেব মধ্যেই সঙ্গীহীন একা সেই সেই মেয়ে চার দেয়ালেব গাবদে আটকে থেকে যূথিমাসিকেই বড কাছেব-মানুষ আপনজন ভেবে প্রতীক্ষায থাকে শূন্যতায়।

যূথিকা ফিরে আসে। দ্বিতীয় জন্মেব সেই শুরুর দিনটি যদিও আজ আর মনে নেই তাব। জীবনভর নিরর্থক সিঁথিব-সিঁদুর মাথায় বয়ে বয়ে টিকে থাকার পব আজ এতকাল বাদে আপাতত তার এক অত্যদ্ভুত কর্ম—একটি গাধাকে এবং ও যে সত্যি-সত্যি একটা গাধাই,' প্রমাণ দেবার বিবিধ কৌশলের সঙ্গে বিশ্বরূপ প্রদর্শনও একটা কর্তব্য হয়ে উঠল। এমন হলে কিভাবে কী করতে হয়—ইতিকর্তব্য-নির্দেশে গোছগাছে

তালিম দিতে দিতে পঞ্চম জননী। যদি জানাই আছে—এটা হয়। এ-রকমই নিয়ম। মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিযায় এভাবেই সব মেয়েকে মেয়েমানুষ হয়ে উঠতে হয় এক সময়।

বাইরে থেকে পাল্টায় নি কিছু। এক সকালে এক প্রহরে নিজেই অনেকটা বদলে গিয়ে সাবধানী যূথিমাসির পায়ে পাযে দোতলায় উঠে আসতে শিথিল চরণ। আশ্চয্যি! এত বড় সাহেববাড়িতে টেরও পেল না কেউ? সবটাই কেমন ঢাকঢাক গুড়গুড় লুকোছাপাব আবডাল। ভীরু বেড়ালের মতো গুটিগুটি এসে দাঁড়াল রান্নাঘবে। মায়েব মুখোমুখি চুপচাপ গোবেচাবি চেহারায়। বুঝি ভ্রষ্টাচাবই ঘটে গেছে কিছু। এবার জবাব দেবাব দায়।

কিরণময়ী ভ্রূকুটি তুললেন—'বেছে বেছে আব সময় পেলি না বে তুই? এই সাতসকালে কাজের হাত সকলের...'

হাবাগোবা রাধা অনাথ চাউনি তুলে শূন্যে কৈফিয়ত খোঁজে। কাজ সে করবে। কামাই দেবে না কোথাও।

'দেখিস বাপু, ছোঁয়াছানি কবিস নে ঠাকুরঘবে। আলগা হাতে যা পারবি, করবি ঘরের কাজ...' কিরণময়ী, পলকেই যূথিকার দিকে—'নাও, তোমাব আবাব কাজ বেড়ে গেল। নিজেই বুঝেশুনে কটা দিন চালিয়ে নাও। কী আর কবা যাবে? আমাব হয়েছে জ্বালা। একটা সামলাই তো হুটপাট কোত্থেকে যে এসে যায় আবেকটা ঝঞ্ঝাট...'

এবং একই নিঃশ্বাসে আবো একবাব রাধার দিকে চোখ—'নে নে, ঢের হয়েছে। তুই যা, যা দেখি এখান থেকে। সর্। কোথাও গিয়ে বসে থাক চুপচাপ।'

মায়ের গলায় ঝাঁঝ ছিল। ঝাঁঝের গলায় তাব ছুটি এসে যায়। মায়ের বাগঝালকে চেনে রাধা। নিজের ছুটিকে জানে না। সাহেববাড়িতে বসে থেকে এমন কবে ছুটি পায নি কোনোকালে, এবং আজও যেখানে মায়েব তিরিক্ষি মেজাজেব বকুনিঝকুনি নিশ্চিতই সত্যি, কিন্তু তাব ছুটিটা সত্যি কিনা বুঝতে না পেবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দাঁতে কামড়ে বান্নাঘবের এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে নিঝুম। চোখেব জলে ভেজা ছিল গাল। ফুঁপিয়ে ওঠার সাহস ছিল না। জলে-জলে কান্নায গলে যেতে পাবত যে-বরফ, ববফেব পাথব বুকে নিয়ে ঠায দাঁড়িয়ে থেকে মাযেব দিকেই নিষ্পলক। জানালা-গলানো অকৃবান রোদ্দুরে, বোদ্দুব-ঠিকবনো আলোয়-আলোয চিনেমাটি কাচ স্টেনলেস স্টিলেব হাজাবটা বাসনকোসনেব রুপোলি ঝালবে ঝলমল বান্নাঘবে আকাশি বঙের শাদা বুটি-বুটি হাউসকোট পবে মা-র ছুটোছুটি ব্যস্ততা, ঘাড়েপিঠে ভেঙে পড়েও পুবোপুবি গড়িয়ে পড়ছে না যে-এলোখোঁপা কিংবা অল্প-অল্প ঘাম আর তেলতেলে গালেমুখ উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে নিজেই হাত দিয়েছেন বান্নায়, খুন্তি নাড়ছেন কড়াইয়ে—রাধা বুঝতে পাবে, বাগী-বাগী দুটো চোখ কাঠ-কাঠ শক্ত হয়ে উঠছে গায়েব জ্বালায়।

মা-ব কড়াইযে ছ্যাকছ্যাক শব্দ। পাশেই কুকারে সেদ্ধ হচ্ছে কিছু। ওদিকের কলতলায় নিচু হযে চাল ধুচ্ছিলেন যূথিমাসি। মা হঠাৎ ফ্রিজ থেকে মাখনেব বাটিটা এনে দিতে বললেন। ফ্রিজটা রাধাব নাগালে এবং সে জানে, একমাত্র সেই জানে ফ্রিজের

ভেতরকার হিসেব। কিন্তু সাহস হয় না হাত বাড়াবার। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে পাশ ঘেঁষে যাবাব সময় যূথিমাসি যেমন করে আলগা ঠোঁটে মুচকি হাসলেন, বাধা তারও অর্থ বোঝে না।

কিংবা সেটাই হয়ে যায় গা-পোড়ানি তেঁতুলে-বিছেব কামড। গতর ভরে বিষের জ্বালা। মা যদি নিজের হাতেই উনুন কেড়ে নিলেন, রাধার কাজগুলো সবই চলে যাচ্ছে যূথিমাসিব হাতে? সাহেববাড়িতে নাকচ হয়ে যাচ্ছে সে? থরথব কাঁপছিল ঠোঁট আর মাংসল গালদুটো। জলে-জলে ঝাপসাই ছিল চোখজোড়া। বুক-ঠেলে উগরে-ওঠা একটা ফোঁপানিকে গলাব নলিতে চেপে রাখাব যন্ত্রণায় গা-গতবের হাড়মাস পুড়িয়ে শরীবটা কাঁপছিল মাংস-রান্নার কুকাবে বাঁশি বাজার আগে ভাবি ওজনটা কাঁপে যেমন। কেন? কী করেছে সে? অসুখবিসুখ হয না মানুষের? ডাক্তার ওষুধেব বালাই নেই? একটু ভালোমন্দ শুধোবারও গবজ নেই মা-র? কেন? ওঁদেব পযসা আছে বলে? সে দাসীবাঁদি বলে? ভাতকাপড়েব-মা আসলে তার নিজের মা নন বলে?

যখন আব আগলে বাখা যাচ্ছে না ফোঁপানি, দুটো হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে, এবং তখনও, নিজেকে বেঁধে বাখাব কঠিন চেষ্টা নিয়েও নিজেকে আগলে বাখতে না পেবে যখন সত্যি-সত্যি ডুকবে উঠল বাধা, আওয়াজটা তীক্ষ্ণ হলো কুকারে বাঁশি বেজে ওঠাব ঘবে। বুঝি মানুষের কান্নাবও কোনো আলাদা মানে নেই শিশুব কান্নাব মতো। কিংবা বাধা হযতো-বা এখনও সেই অবোধ শিশু, এমন-কি আজ, মা-মাসিদেব সঙ্গে সমান পাল্লায় বয়োধর্মে অভিষিক্ত হওয়ার দিনেও লজ্জা জেনেছে, ভাষা বোঝে নি বেদনার্তিব। চেনেনি নিজেব অচেনাকে।

ঘরেব মাঝখানে কুকিং-বেঞ্চটপ ছাপিয়েও কিছুটা উঁচু পাঁচিল। বুক অব্দি আড়াল পড়ে শুধু মাথা দুটো দেখা যাচ্ছিল মা আর যূথিমাসির। কান্নাটা সবব হতেই ঘাড উঁচিয়ে তাকিযেছেন ওঁরা। মা ধমকে উঠলেন—'কি হলো? তুই ক্যাবলার মতো দাঁডিযে আছিস কেন তখন থেকে? তোকে দেখলেই এখন গা জ্বলছে আমাব। তোকে যে বলছি, চুপচাপ গিয়ে শুয়ে থাক ঘরে। কথাগুলো কানে যাচ্ছে না? শুনছিস না কেন?'

বাধা বোঝে না, কী কববে সে এখন? মায়েব চোখের বিষ হযে দাঁড়িযে থাকাব সাহস নেই। এত দিনেব আপন কবে চেনা মায়েব মুখ, সাহেববাড়িব বান্নাঘবে হাজাবগণ্ডা বঙেব জৌলুস, হরেক যন্ত্রপাতি বাসনকোসন মিষ্টি সুবাস সবই যদি একদিনে, এক সকালেই এমন কবে বদলে যেতে পাবে, ব্যথায বেদনায় দুঃখে বা যন্ত্রণায সেই মেয়ে তবতরিযে ঘব ছেড়ে বেরিযে গেল দ্রুত, লম্বা ছুটে। তাব অভিমানেব দাম নেই। হাডপিত্তি জ্বালিযে কটকটে একটা রাগই চাগিয়ে উঠছে ভেতব থেকে। বাগটা আসলে মাযেবই ওপর। রান্নাঘব ছেড়ে খাবার-ঘব পেবিযে ভাঁড়ার-ঘরের পাশের খুপবিতে যেখানে তাব তক্তপোশ, উপুড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্না...অঝোর বেহুঁশ কান্নায় বুক ভেসে যায়--এমনধারা এত বড শাস্তি কেনে গ ভগমান? কোনো পাপ কবি নি কোনোকালে...

বাধা দুমড়ে-মুচড়ে কাতরায়। খাঁচার ভেতব পাখিপাখালি যেমন, যখন বুকেব খোঁয়াড়ে আছাড়িবিছাড়ি ডানা ঝাপটে মবছে ভয, যখন কী কুচ্ছিত আর নোংরা ব্যামোয় মবে যাচ্ছে সে—ঘরের মা ফিরেও তাকাচ্ছেন না একবারটি? আসলে মা নয় কেউ।

কোনো মা নেই তার। ছোট্টবেলায় চরানির গাইবাছুরের মতো ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে একজন। আরেকজনের ঘরে শুধু হাড়ভাঙা খাটুনির জন্যেই ভাতকাপড় আর যেটুকু আদর। কাজ করতে না পারলে এমন ঘেন্নাও থাকবে গো মানুষের? ছোঁয়াছানিতেও বাবণ?

কতক্ষণ? কাজকম্মো ছাড়া এভাবে কতক্ষণই বা শুয়ে বসে কাটানো যায় ঘরে? টরে টরে থাকতেই হয়। বারবার উঁকিঝুঁকির শেষে যখন সময়, মা রান্নাঘব ছেড়ে বেবিয়ে যাবাব পব যে-একটুখানি ফাঁক—গেরস্তের ভয়ে ইতিউতি চোখে ফেলে গুটিগুটি পায়ে এগোল সে। বোজকার বাজার রেখে গেছেন নন্দদা। মেঝেতেই পড়ে আছে ব্যাগগুলো। একা হাতে আর সামলাতে পারছেন না যূথিমাসি। পেছন থেকে এসে বাধা ফ্যাসফেসে ভীরু গলায়, যেন কিছু একটা কাজের হাপিত্যেশেই করুণ প্রার্থনা তার—'মাছগুলো কুটে দেব গ মাসি?'

ব্যস্ত ছিল যূথিকা। নিচু হযে গ্যাসসিলিন্ডাব অফ করে দিতে দিতেই চোখ না ফেলে হিমশিমে—' না না, ঘি-দুধেব সোহাগ ঢলছে তোদের গায়ে। খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে। শেষে সবাই দুষবে আমাকে...'

'না গ মাসি, কিছু হয় নি আমার। দেখো, দেখো তুমি...'

'কী দেখব? এ-আবার দেখার কি আছে? কারুর কিছু হয় নিকি এতে? ঢঅঅং...'

গলার স্ববে খ্যাঁকানি ছিল। কাজের তাড়ায, তাড়াহুড়োয় কোনো বকম ন্যাকড়ানুড়ি সাঁড়াশি ছাড়াই দু-হাতের আলতো আঙুলে ওভেন থেকে তাতানো কড়াই নামাতে নামাতে, এবং নামিয়ে, দু-পাশে হাত নেড়ে নেড়ে ছ্যাঁকা সামলাতে সামলাতে, যূথিকা—' পয়সা লো, তোকেও পয়সার বেহুঁশে পেযেছে দেখছি। মরবি এবারে। এতই যদি সুখ কপালে, তবে কেন কঁ্যাথা বগলে?'

হাঁ হযে তাকিয়ে থাকে রাধা। জানে না, কেন এত কথা? সকাল থেকেই কেন এমন ধাতানি খেয়ে মরতে হচ্ছে তাকে?

'কি-না-কী একটা কান্ড কবে ফেলেছিস রে তুই? কই, সোহাগ কবে কেউ তো এমন ছুটিছাটা দেয় নি আমাদেবকে। ফিরেও তাকায় নি। নিকি এ-মরণ নেই আমাদের কারুব? তোরই একার?'

রাধা অবাক হলো, সেদিনই মাছ কাটতে বসে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের অনেকটাই কেটে ফেলল যূথিমাসি।

নতুন কবে আবার রক্ত দেখল রাধা। গলগলিয়ে বিস্তর বক্ত। আঁতকে উঠল—'ডেটল আনব গ মাসি? আয়োডিন তুলো ব্যাণ্ডেজ সব আছে মা-র কাছে।'

'ধ্যাৎ...' পাশেই গামলাব জলে হাত ডুবিয়ে ডান হাতে টিপে টিপে বেশ খানিকটা বক্ত বেব করে, যখন মাছেব বক্ত আব মানুষের বক্তের ফারাক মুছে যায়, সাবেকি নিয়মে আঙুলটা মুখে তুলে জিভে চুষতে চুষতে ছোট করে হাসল যূথিকা—'এ-আর কী দেখছিস? মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছিস লো, অনেক...অনেক রক্ত ঢালতে হবে জেবনভর। তারপরও মন পাবি নি কারুব। লাথিঝাঁটা মারধর...বউগুলোর ওপব কত কেরদানি বীরপুরুষদের।'

‘মুন্নিদিদি ত আমার চেয়ে দেড়-দু বছরের বড় গ মাসি! ওরা ত আর বঁটি নিয়ে বসবে নি তোমার আমাব মতন! এমনধারা দাসীবাঁদি থাকবে কত। ওদের বাপের কত পয়সা...’

‘সে-ও ত আরেক জ্বালা। লেখাপডা কবে পাশ দিতে দিতে বয়েস গডিয়ে বে-থা করবে। ছুরিকাঁচিতে পেট চিবে বাচ্চা বের করতে হয় ওদের ঘরেব অনেক মায়েদেব। পযসায় কী করবে? শবীলটা যে মেয়েমানুষেরই লো...’

আবার...আবার সেই হেঁয়ালির কথাবার্তা! ধোঁয়াটে। এমন বিদঘুটে আব গোলমেলে কথা শোনার সুবিধে এই, জবাব দেবার দায থাকে না। রাধা উঠে চলে আসে।

কিন্তু উঠে এলেও যে-দুপুরকে ছুটি বলে ভেবে নিতে পাবত সে, সেখানেও রেহাই থাকে না কাজের। আসলে বান্নাবান্না থেকে সে দূবে সরে থাকলে কিছুই যায-আসে না সাহেববাড়ির বামুনবাড়ির। কেননা নতুন-মাসিই আদত বাঁধুনি। হেঁসেলটা সামাল দিতে পারেন একাই।

বরং বান্নাঘরেব বাইবেও কাজ থেকে যায় অঢেল। সেখানে এঁটোকাঁটার বালাই নেই, শুচি-অশুচি নেই। দিদিমণিদেব দুপুরেব ইশকুল হয়ে যাবাব পব থেকে সারাটা দিন নানা দিকে ওপবে-নিচে ঘববাবান্দা সিঁডিব্যালকনিব পেখম ছড়িয়ে এত বড বাডিব দোতলা-তিনতলা ঝিম মেরে থাকে বিকেল অব্দি। এই দীর্ঘ সময়ে রাধা, একমাত্র এবং যথার্থই ঘবের-মেয়ে হয়ে সচল থাকে মা-ব পাশে পাশে। অনেক কাজ তার। এত বড় সংসাবের রক্ষণাবেক্ষণেব পুরো দাযিত্বে মাঝেমধ্যে বাজকন্যাই ভাবতে পাবে নিজেকে!

কিংবা সে আচমকাই ছুটি পেয়ে যায়।

কালীজেঠু চাকরি ছেড়ে দেবেন—নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। বুড়ো-বুড়ো হয়ে এতটা ভেঙে পড়াব মতো বযস ছিল না মানুষটার। শেষ পর্যন্ত চোখ দুটোই বড় কাহিল কবে দিলো। সুগাবফুগার আরো কী-নাকি ঝঞ্ঝাট রয়েছে সব। শরীবটাও তেমন জুতসই নয়। অপাবেশন হতে পারছে না এক্ষুনি। দেশে ফিবে যাবেন।

সন্ধেবেলা মা নিজেই এলেন বান্নাঘরে—‘কালী তো কলকাতার পাট চুকিযে দেশে চলে যাচ্ছে। ওকে ছাড়াতেও খারাপ লাগছে। কিন্তু রাখাও যাচ্ছে না সেভাবে। চোখ বলে কথা? একলাফে চশমাব পাওযার বেড়ে গেছে প্লাশ সাত না আট! বুডো মানুষ! একা একা অ্যাদ্দুর রেলগাড়ি ঠেঙিয়ে যাবে? বরং এক কাজ কর। তুইও সঙ্গে যা। গ্রামে গিয়ে ঘুবে আয় এ-কটা দিন। এ-সময়ে তোব মা-র কাছে থেকে আসাই ববং ভালো...’

মা যখন কথা বলেন, শুনতে হয়। মুখে-মুখে কথা বলা বাবণ—এ-বাডিব নিয়ম। মায়ের হুকুমেই যদি তার ছুটি, বুকটা উছলে উঠলেও, আপাতদৃশ্যে উচ্ছ্বাসশূন্য ছিল বাধা। সারা দেহে কাঁপুনি তুলে কী যে একটা নতুন শিরশির, রাধা তাব নাম্ জানে না। এ-কটা দিনের ছুটি? কটা দিন মানে? কী লজ্জা, কী লজ্জা গ! এবং লজ্জাও যে কীভাবে গায়ে কাঁটা দিয়ে কাউকে এমন ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে, প্রথম অনুভবে, সে মাথা তুলে তাকাতেই পারছিল না ঠিকমত। বুঝি হাজার কয়েক পিঁপড়ে গুঁড়ি-

গুঁড়ি হাঁটছে ম্যাকসি টেপজামার তলায়, চামড়ায়। চোখ বুজে আসে, দাঁতে ঠোঁট চাপতে হয়। কে জানত, আজই তার নানাভাবে শরীর চেনার দিন!

কিন্তু ছুটি? হঠাৎ ক-টা দিনের?

ঘরের-মেয়ে এভাবে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেলে ছুটির-খুশিও কেমন গোলমেলে হয়ে উঠতে থাকে বোকাহাবা মগজেব খাঁচায়। ঘর আব 'পর' গুলিয়ে যেতে থাকে। যাঁদের পয়সা অঢেল, তাঁদের ঘবের মেয়েরা এমন ছুটি পেলে কত ফুর্তি ওঁদের! চুটিযে শখ মেটায় লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘুবে বেড়িয়ে। কিন্তু কোন্ ঘব ছেড়ে কোথায় যাবে সে? দুটো ঘরের মধ্যে কোন্‌টা সত্যি, দুজন মায়ের টানাপোড়েনে কোথায় সুখেব ঢল বেশি? কিংবা অজান্তেই চিনে ফেলে, সুখ আর অসুখ বিপবীত শব্দ নয। কদিনের জন্য সুখ ছেড়ে পালালেই অসুখ হয় না কারুর। অসুখী হয় না কেউ। বাসমতী চালের ভাতে পাগল-কবা সুবাস যেমন সত্যি, জামবাটি ভবে কাঁচালঙ্কা আব লেবুপাতা চটকানো পান্তাভাতও মিথ্যে নয। জিভেটোকবায় এখনও লালা ঝরায়। এভাবে হুট কবে হঠাৎ...একেবারেই হঠাৎ মায়ের কাছে ছুটি পেয়ে গেলে টগবগ ফুর্তি ঘাই মারে বুকের ভেতব। ভালোই লাগে।

দেশগাঁযে যায় নি কতদিন! পালানভাই আব মাকে মনে পড়ে। অন্য মা।

ব্যস, ওইটুকুই। রাধাকে আমল দেবাব দায় ফুরিয়ে গেল মা-র। ওপাশে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন নতুন মাসি। মা এগিয়ে গেলেন। বাত্তিবেব রান্নাবান্না নিয়েই শলাপরামর্শ দুজনের। রাধা নিঝুম তাকিযে থাকে। দুজন বয়স্ক মেযেছেলে। দুজনেব ফারাক অনেক। কিন্তু গিন্নিবান্নি চেহারায় দুজনই অনেক বড। বড্ড ছোট সে। বডদের কথায় থাকাব নিয়ম নেই ছোটদেব। এবং আজই হঠাৎ বড় হযে ওঠার পর যদি একইভাবে ছোটই থেকে যায়, অস্বস্তি বাড়ে। কিংবা, সর্বাঙ্গের তোলপাড়ে বোমাঞ্চে ভেতরে ভেতবে তার সদ্য-কিশোবী শরীরটাই নিভৃতে কথা বলে তাব সঙ্গে। মাযেব ওপব পুরনো রাগটা তার বহাল থেকে যেতেই পাবত—এক মা থেকে আবার সে চালান হযে যাচ্ছে অন্য মায়ে? কিন্তু হঠাৎ-ছুটি একটা দমকা বাতাস। একলাফে ছুটে পালায় সেই মেয়ে। জলকলেব তলায ফাঁকা কলস কানায কানায় ভবে উঠলে এভাবেই তার ধ্বনি বদলে যেতে থাকে। আজ থেকে উঠতি বয়সেব গোটা শরীবটাই লজ্জায় ঢাকা পডে গেল। নিজেকে খোলামেলা রেখে নিজের আড়াল শুরু।

অনেক রাতে চোখ টিপে হাসলেন নতুন-মাসি—'তোব সাহেববাড়ির ভাতে বুকে-পাছায় এখনই যা হযে উঠেছিস লো তুই, এ-যে আমারই দেখলে ভয় কবে। কে বলবে, এ-বাড়িব মুনমুনের চেয়ে দেড়-দু বছরের ছোট তুই। তোকেই তো দিদি মনে হয়।'

ঝমঝমিয়ে উঠল বাধা। শ্যাম্পু-ঘষা ফুরফুরে এলোচুলে মাতন দিয়ে ঢেউ কাঁপায় শরীরের। বুঝি সে জিতে যাচ্ছে কোথাও। আঁটোসাটো বাঁধুনিতে কষ্ট নেই কোথাও। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে ঢেউ ওঠে। শিরদাঁড়ায় টান লাগে। মাথা তুলে অনেক লম্বা করে ঘাড় উঁচোনোর ভঙ্গি। শুভ্র সুনির্মল রাজহংসী।

মূর্খ নিতান্তই। অক্ষরজ্ঞান নেই যে-মেয়ের, মাসির সঙ্গে কথায় কথায় জেনে যায়

রহস্য জীবনের—রঙিন খামে-আঁটা গোপন প্রেমপত্রের মতোই আস্ত একটা মেয়ের শরীর এভাবেই আব্রু পেয়ে যায় একদিন। এটাই নিয়ম। স্নেহে যত্নে আদরে তাকে নানাভাবে আড়াল দিতে হয়। ধনী বা নির্ধন হোক, কালো বা সুন্দরী—খাজুবাহো সকলেই।

এমন হাজারগণ্ডা ছবি টাঙানো থাকে সাহেববাড়ির দেয়ালে দেযালে। তিনতলায় দাদাবাবুর ঘরে বড় বড সব খেলোযাড়, ফিলিম-আট্রিস আব অসভ্য-অসভ্য মেযেছেলেদের ছবি। ইংবেজি হবফে কী সব লেখা থাকে। বলে না কেউ কিছু। হ্বেক রকম রঙচঙে কত ক্যালেন্ডার আসে বছরেব শুরুতে। কত যে ফেলা যায়। বাধা তার অনেকগুলোই কুড়িযেবাড়িযে বাখে। নিজে ঘরে দেয়ালে ঝুলিযে দেয। গাঁযে পালানভাইকে পাঠায়।

মুন্নিদিদিব ঘরে ক্যালেণ্ডার আছে একটা। কী-নাকি কোথায় কোন্ মন্দিবের গাযে পাথবেব ওপর খোদাই করা মূর্তি। পাছা থেকে মাথা অব্দি তার ফোটো। পাথব-খোদাইযে তৈবি বলেই হাডমাসে ভরভবাট যুবতীদেহে খড়খড়ে গুটিবসন্তের দাগ। মন্দিরেব খিলানে আলতো কবে গা ঠেসে, পিঠ ফিবিযে খানিকটা বেঁকে কোন এক মেযে পাথবেব শেলেটে চিঠি লিখছে কাকে! পাথবেব শেলেট, পাথবেব পেনসিল। না-কী আবশিতে সাজগোজেব মুখ দেখছে নিজেব? পাশ ফিরে আছে দেয়াল হেলান দিয়ে। টিকলো নাক, ডাগব চোখ, ভবাট গাল। পাথব দিযেই তৈবি গয়নাগাঁটি। গায়েব শাডি কাঁচুলি সবই যদি পাথরেরই হয়, পাথরের শরীবে পাছাব কাপড় বুকেব জামা আছে-কি-নেই বোঝাও যায় না ছাই। একরাশ চুলেব গোলগাল ঢাউশ খোঁপাব ভাবে নুযে পড়েছে মাথা। যেন তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে, সব ছাপিয়ে সামনেব দিকে ভবাট কলস গোছেব সুডোল বুকেব ভাব, ভারি পাছা... ছিঃ ছিঃ, কী অসভ্য গ। এমনধাবা ছবি থাকবে কেন মুন্নিদিদিব ঘরে? ধাঁধাব জগতে অনেক কিছুই ঠিকমত ঠাহব পায় না বাধা। মুন্নিদিদি তো ভালো। ইশকুলের পডা শেষ কবে বড পরীক্ষায খুব ভালো পাশ দিযেছে একটা। ক্যালেন্ডাবের ছবিটা খারাপ। রাধা সভ্য হতে চায়।

সভ্য হবাব কানুন সে জানে।

কালীজেঠুকে দেশে ফিরিয়ে নিযে যাবার জন্য তাঁব মেজছেলে সত্যদা এসে গেছেন। সঙ্গে থাকবেন। রাধাকেও যেতে হবে। এবং দেশে যাবার কথা মনে হলেই কলকাতাটা বড় বেশি চনমনিয়ে ওঠে বুকেব ভেতর। সে আরো বেশি করে কলকাতার মেয়ে হযে উঠতে চায়। দু-চার-দশ দিন আগে থেকেই ভেবেচিন্তে নানাভাবে ছক কষে নিতে হয়। কোন জামায় সাজবে কীভাবে? কোন্ কোন্ জিনিস এবাব সে সঙ্গে নিয়ে যাবে? হা-হাভাতে মুখ্যু গাঁয়ের মানুষগুলো দেখে নি কিছুই। জানেই না, কত ভেলকি জগৎময়।

বড় একটা রেশনব্যাগ ভবে কত কিছুই গুছিয়ে নিতে হলো তাকে। সাহেববাড়িতে এ-রকম কতশত জিনিসপত্তর আসে—শিশি বোতল কৌটো...অথবা শিশি নয় বোতল নয় কৌটোকাটা কিছুই নয়—নকশা-আঁটা এক-কেজি দু'কেজির বাদাম তেল সরষেব তেল সূর্যমুখী তেলেব বঙিন পাত্রগুলোর কী অদ্ভুত সব ডিজাইন। খালি হয়ে গেলে

কোনোটাই ফেলে দেয় না সে। জমিয়ে বাখে। গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে মায়ের ঘর ভরে ফেলেছে। এখন পড়শিদের বিলোয়। তার কদর বাড়ে।

চিনেমাটিব-তৈরি বড়সড় বাহারের একটা ফুলদানি। কানাটা একটু ভেঙে গেছে বলে একসঙ্গে দুটোই বাতিল করে ফেলে দিয়েছিলেন মা। রাধা তুলে রেখেছে যত্নে। এ-রকমই দাদাবাবু-দিদিমণিদের ফেলে-দেওয়া ডট কলম, পেন্সিল, প্লাস্টিকের স্কেল, ছবি-আঁকাব রঙেব বাকশো, ছবির বই, কমিকের বই আরো হরেক পড়ালেখার জিনিস। সব পালানভাইয়ের জন্য। দাদাবাবুর শার্টপ্যান্টগুলো অনেক বড় হয় পালানভাইয়ের গায়ে। তা হোক। তবু কিছু দামি দামি ফ্যালনা জামা প্যান্ট সে চেয়ে রাখে মায়ের কাছ থেকে। গাঁযের মধু মোদকের দর্জিব দোকানে দিয়ে ছেঁটেকেটে খাটো করে নেবে। না-হয় ঢলঢলই করবে একটু। এমন সব চেকনাইযেব জামাপ্যান্ট গাঁয়ের মানুষ সাতজন্মে দেখেছে নাকি কেউ কোনদিন?

ভাইকে সাহেব বানাতে চেয়ে নিজেব দুঃখ বাড়ে। সাহেববাড়িতে সে ঘরেব-মেয়ে ঠিকই, শহরের মেযে হযে উঠতে পাবে না সবটা। সাহেববাড়ির মেযে বুল্লিদিদিব মতো দোকানে গিয়ে ভুরু কামিযে আসতে পারবে না সে। চুল সাজাতে পারবে না। দিদিদের মতো নখ বড রাখতে চেযেছিল একসময। মা ধমকে দিয়েছেন। বাঁধতে হয়, খাবাব দাবারে হাত পড়বে। ওর জন্যে অসুখ ধরবে সকলের? দুঃখু তো আরো অনেক বড। গত তিন-চার বছবে মা ওকে ঘরে-পবাব ম্যাকসি আর ফ্রক-টেপজামাই কিনে দিযেছেন শুধু। অথচ সে সব জানে—ট্রাউজার লংশট চুড়িদার-কামিজ শারারা কুর্তাচুন্নি বুককো লুঙিকুর্তা ব্যাগি...

ঘরেব দিদিমণিদেব কিংবা শহরের রাস্তায় আরো কত বংবেবংযেব মেযেদের সবাইকে সে দেখে নিত্যিদিন।

কিংবা সে নিজেই জানত না, একদিন সে নিজেই হযে উঠতে পাবে এমন ক্যালেন্ডারেব ছবি।

দেশে যাওয়াব আগে অনেকটা আব্দাব করেই মায়ের কাছে দিদিমণিদের পুরনো একটা জামা চেযেছিল সে। মা নিজেই দিলেন। হরেক রঙে চক্রাবক্রা ধোতি-শালোয়াব। একই রঙের লম্বা কামিজ। মুন্নিদিদির জামা। অনেক পুরনো। কিন্তু চাইনিজ সিল্কের ঝকঝকে জামায় নিপাট ইস্তিবি ছিল। ছেঁড়াফাটা ছিল না কোথাও।

সাহেববাড়ির কুটুম দিদি-জামাইবাবুরা আমেবিকা থেকে এলেন সেবারে। হরেক জিনিসপত্তরেব সঙ্গে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের চেন এনেছিলেন গোটাকযেক। খাঁটি চাঁদির জেল্লাও হাব মানে। আলাদা করে পাথর বসানো গোল লকেট। টুকটুকে লাল বডসড একটা পাথরকে ঘিরে ফ্যাকাশে শাদা-শাদা গোল পাথর অনেকগুলো। পাথব চেনে না রাধা। চোখে দেখবে সাতজন্মে ভাবেও নি কোনোদিন। সবাই বলে, চুনি আব মুক্তো। দিদিমণিদের গলায় সে দেখেছে অনেকদিন। চোখ ঝলসে যায় রোশনাইয়ে। দু'চারটে মুক্তো খসে পডার পর বুল্লিদিদি যখন ফেলেই দিয়েছিল সবটা, সে চেয়ে নিয়েছে। নিজের টিনের বাকশোয় লুকিয়েই রেখেছিল যখের ধন। চুনি মুক্তোর লকেট গলায় ঝুলিয়ে আজ সে দেশে যাবে। দেখবে দশজনে।

দেশগাঁয়েব তাবৎ মানুষকে তাক লাগিয়ে দেবাব জন্যেই গোটা দুপুর ভরে একটু একটু করে তৈরি হলো বাধা। সাজল যতটা, সাজ নিয়ে মনে মনে ভাবল অনেক বেশি। সকালবেলা শ্যাম্পু ঘষল মাথায়। দুপুবের খাওয়াদাওয়ার পর সাহেববাড়ি যখন নিঝুম থাকে, বেশ খানিকটা সময় নিয়ে চুল বাঁধতে বসল পরিপাটি যত্নে। অনেকটাই পুজোয় বসার ভঙ্গিতে আপ্লুত ভক্তি।

শ্যাম্পুব পর পিঠ ভবে একবাশ কালো চুলেব ভাব ফ্‌বফুবে হাওয়ায উড়লে, শুধু তো মাথার চুল নয়, টিভির পর্দায় 'ফেমিলো' সাবানের বিজ্ঞাপনে সেই সুন্দবীব মতো সে নিজেই উড়ছে মনে হয়। হালকা-হালকা লাগে নিজেকে। দু'ভাগে আলাদা হযে যায় ঝাঁকড়া চুলেব গোছ। আধাআধি ভাগ বুকে টেনে এনে চিরুনিব আঁচড়ে-আঁচড়ে মুঠোব তলায চুলেব ডগায় জট ছাড়িয়ে ছাড়িযে পাট করে নেবাব পব বিনুনি বাঁধাব প্রক্রিযায় দুটো হাতেব আঙুলই বাঁশি বাজানোব ভঙ্গিতে খেলে যেতে থাকে বুকেব ওপব। চোখ মেলে দেখতে হয না কিছু। যেন কোন নিত্যি-অভ্যাসেব বংশীবাদক। আঙুলগুলো অনাযাস স্বভাবে খেলে যেতে থাকে সুবে-ছন্দে তালে-লযে। মনটা উদাস হয়ে ওঠে। চোখজোড়া দেযালেব দিকে কোনো অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিষ্পলক স্থিব। মগজটা স্থিব থাকে না। মাথার ভেতর কিলবিল করে তার ফেলে-আসা দেশগাঁযেব ছবি। নিতান্তই মূর্খ বালিকা—নিজেব অজান্তেই নিজেব নামেব আধাবে ডুবে গিযে আলাদা হযে যেতে থাকে ভেতবে-বাইরে। সত্যি-সত্যি কোথায কোন্ আকুল-কবা বংশীধ্বনি। হৃদয়ে-শ্রবণে স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে সে। সাতজন্মেব পুণ্যিতে বেন্দাবন ছেড়ে মথুবায পৌঁছতে পেবেছে যদি, আজ, নতুন অভিসারে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরাযাত্রা নয়—মথুবা থেকে বৃন্দাবন পাড়ি। ললিতাসখীরা বযেছে সেখানে। বলবে সে মথুবাব কথা। বৈকুণ্ঠ-বৃত্তান্ত।

কিন্তু বড়ই বেদনা। যমুনাপুলিন নেই।

মাথা ভেঙে গড়িযে নেমেছে এত যাব চুল, সেখানে গবিব-বড়লোক নেই, কেশসম্ভাবে অনেক ধনী বাধা। আকাশ জুড়ে বর্ষাব ঘনকৃষ্ণ কালো মেঘ যেমন, শ্যাম্পুব পব ঘাড়পিঠ ছাপিয়ে দীর্ঘায়ত কেশদাম যেভাবে ফুলে ফেঁপে চাবিযে আছে পেছনেব দিকে, কত বকমে ভেঙেচুবে নানান কৌশলে কত কিছুই কবা যায় তাকে নিয়ে। হরেক রকমেব ক্লিপ আব হবেক রঙেব ফিতেবও অভাব নেই। অভাব—নিজের চোখে নিজেকে বেখে নিজেবই রূপমুগ্ধতায় একটা আরশি।

নদীব জলে মুখ রেখে মস্ত আকাশও যেমন সম্পূর্ণ কবে দেখতে পায় নিজেকে, সাহেববাড়িব ঘবে-ঘরে ড্রেসিংটেবিলে আযনাব মাপ দিদিমণিদেব মাথায মাথায প্রায সমান। মাযেব ঘবে স্টিলেব আলমাবি আছে একটা, যার একদিকেব পাল্লায মেঝে থেকে আস্ত একজন মানুষেব মাথা ছাপিয়েও আবো অনেক উঁচু মোটা কাচেব আবশি। কোথাও একটু ছিটেফোঁটা দাগ নেই, বুদবুদ নেই, ঢেউ খেলানো আঁকাবাঁকা নেই। স্বচ্ছ সুনির্মল দীঘিব জলে সাঁতার কাটার সুখে নিজেকে নিয়ে অনেক খেলাই খেলা যায সেখানে। এ-যেন মুখোমুখি টুলে বসে টিভিব কাচে বা সিনেমাব পর্দায় বারবাব খুঁজে পেতে নিজেকেই দেখা, নিজেকেই চেনা।

কান্না পায় রাধার। এমন করে নিজেবই মূর্তি গড়ে নিজেকে চিনে নেবার জন্য

কোনো আরশি নেই তার। একটু আছে। নদীর তুলনায় ডোবা যেমন, পানাপুকুর-ডোবার চেয়েও ছোট কাঠের-ফ্রেমে-বাঁধানো ফোটোর আদলে একটা আয়না। পেছনের দিকে একটা স্ট্যান্ড ছিল কোনোকালে। ভেঙে গেছে। এখন দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখাই নিয়ম। দেয়ালে টাঙানো থাকলে, আরশিটা এত ছোট, দুটো কান একসঙ্গে দেখার ইচ্ছে হলে শুধু গলা অব্দি পাওয়া যায় নিজেকে। দুটো কাঁধ বা বুক আসে না। দেয়াল থেকে নামিয়ে এনে, তক্তপোশের বালিশকে থাপড়ে-থুপড়ে মোটাসোটা বানিয়ে, বালিশের গায়ে ঠেকনা দিয়ে নিজেকে খুঁজতে চাইলে পিছিয়ে বসতে হয় মাপ বুঝে। নাক মুখ চোখ কান থুতনি শুদ্ধু বুক পর্যন্ত পেতে হলে নিজেকেই সরে যেতে হয় দূরে।

এবং তখনই বুক ভাঙে কান্নায়। ভাঙতেই পাবে।

দুচ্ছাই, হচ্ছে না কিছু। সব ভুল। পিঠ ছাপিয়ে কোমর অব্দি যদি এক ঢাল চুল তার, শুধু-শুধু দুই বিনুনিতে সেটা খাটো বাখবে কেন? আরো অনেক বাহারি চুল বাঁধতে জানে সে। খোলামেলা উদোম চুলে যাবে। দেশগাঁয়ের মানুষ দেখবে সবাই, তার কালো চুলের ঢল।

দ্রুত হাতে আবার বেণীবন্ধন ভেঙে ফেলাব পালা। হাতে সময় নেই। ভয়ও থাকে ভেতবে ভেতরে। বাপকে নিয়ে কখন আবার ট্যাক্সি চেপে এসে পড়বে সতুদা। তাব আগেই তাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু সে-কেমন করে হবে? প্রায় সাত মাস, আট মাস ...হয়তো তাবও চেয়ে বেশি দিন বাদে দেশের-বাড়িতে যাচ্ছে সে! রেলগাড়িতে দশজনের সঙ্গে এতটা লম্বা রাস্তা। হুটপাট 'যেতে হবে' বললেই কি এভাবে যাওয়া যায় কখনও? এমন ভূতের চেহারায়? দেশগাঁয়ের পড়শিদের কাছে সে সাহেববাড়ির গপপোগাছা করেছে কত। সাহেববাড়ির ইজ্জতও তো আছে একটা। অবিশ্যি বাইরে থেকে হাঁক পাড়ে নি কেউ এখনও। পাড়বে এক্ষুনি। তাড়াতাড়ি-হাতে একটু একটু করে নিজেকে গড়ে তুলতে বারবার শুধু ভুলই বেড়ে যাচ্ছে। খুঁতখুঁতানি বাড়ে। অস্থির হয়ে ওঠে মেয়ে। তারও ঘরে পাখা আছে একটা। পাখাটা ঘুরছে মাথার ওপর। সে হাঁসফাসে ঘামায়।

পিঠের ওপর ছড়ানোই থাকে কালো চুলের ঝর্না। চিরুনির আঁচড়ে-আঁচড়ে তাকে নতুন করে পাটেপাটে সাজিয়ে, নানাভাবে ভেঙে, শাসনে বাঁধতে হয়। কিন্তু সবটাই এলোকেশ নয়। ডানে-বাঁয়ে ধরে ধরে ভাঁজের পর ভাঁজে বিন্যস্ত রাখতে হয় চূর্ণকুন্তল। ফিতে বাঁধাব কাজ কিছু নেই। অনেক ...অনেকগুলো ক্লিপ লাগে। শুধু ক্লিপেবই কারুকলা। চিরুনির পর প্রতিটি ভাঁজকে বাঁ-হাতের আঙুলে আলতো করে ধরে বেখে, প্রতিটি ক্লিপকে দাঁতে কামড়ে ফাঁক করে ডান হাতে অত্যন্ত যত্নে, অথচ দ্রুততায়, বসিয়ে যেতে হয় একের পর এক। এবং এভাবেই একরত্তি মেয়ের ছোটখাটো পুরো মুণ্ডুটাই কণ্টকিত হতে হতে কিছু একটা যা হয়ে দাঁড়াল, সব মিলিয়ে অভিলাষে পৌঁছনো গেল কিনা, বিশেষজ্ঞ বিউটিশিয়ানের অভিমত দুর্লভ হলেও, সে-মেয়ে নিজে যথেষ্ট খুশি। কেননা, এ-এক সুচারু নির্মাণ। অতিসূক্ষ্ম শিল্পকর্মে ঘাম ঝরেছে বিস্তর।

এবং ঘর্মাক্ত দেহে আবেক অশান্তি অতঃপর। মাথার পেছনে খোলা চুলের ঝুঁটি বাঁ-হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, তার যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রীর আধার বড় চকোলেটের

বাক্সোয় হরেক শিশি কৌটো টিউবের জঞ্জালে বেড়ালের মতো ডান হাতে খামচাতে থাকে। ঘন ঘন তাকায় মুন্নিদিদির জামাটার দিকে। হলুদেব ওপর লাল ফুল আর সবুজ পাতায় পাতায় রংবাহারি জেল্লা। লাল-হলুদ বা সবুজই তো ম্যাচিংয়ের একমাত্র রং হতে পারে জামাটার সঙ্গে। অথচ ওই তিনটে রঙেরই কোনো হেয়ার-ব্যান্ড নেই তার। কিন্তু ছিল। ছিল বলেই এতক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকার পব হঠাৎই খুঁজেপেতে না পেয়ে মগজের দিশেহারায় অস্থির হয়ে চিৎকার কবে কাঁদতে ইচ্ছে করছে এখন। তাহলে কী হবে? জামার সঙ্গে রং মিলিয়ে হেয়ার-ব্যান্ড চুলের ফিতে স্টিকার টিপ বা বিন্দি না হলে কী যে বিচ্ছিরি। ভায়োলেট রয়েছে তার সঞ্চয়ে, গাঢ় নীল আছে। অবেঞ্জ বাদামি গ্রে ...যা-চাই সেগুলো বাদ দিয়ে যা-চাই-না হাবিজাবি মাথামুণ্ডু সবই আছে ঠিকঠাক। এবং অগত্যা বেরংকেই মেনে নিতে হবে যেহেতু, ভায়োলেটকেই বেছে নিয়ে, ঘাড় গুঁজে, ঘাড়ের দিকে বেগুনি হেয়ারব্যান্ডের ভেতর চুলের মোটা গোছ চন্দ্রবোড়া সাপের পিঠ-বাঁকানোর মতো টেনে এনে সেট করে ফেলল চটপট।

নিঃশ্বাস ফেলাবও সময় নেই। যা-কিছু করার সবই এভাবে চটপট সেবে নিতে হবে। দ্রুত হাতে নিজেরই একটা ফ্রক তুলে নিয়ে সে গাল গলা মুখ চিবুক কপাল ঘষতে শুরু করল জোবে জোবে। কেননা, ঘাম। শুকনো কাপড়ে ঘষে ঘষে ছালচামড়ার জ্বালা ধরিয়ে দেবার পরও নিস্তাব নেই। দুচ্ছাই, এমন তাড়াহুড়োয় হয় নাকি এতকিছু? কত মন দিয়ে করতে হয় এসব।

বিদঘুটে ঘামই কাল হয়ে উঠল এরপর। কালঘাম। শুধু তো কালো মেয়ে বলেই নয়, গা-গতরের খাটাখাটুনিতে দিনভর রাতভর ঘাম ঝরাতে হয় যাদের, সাজগোজের হরেক রকম মশলাপাতি, যত দামি আর সুগন্ধিই হোক, ঘেমো গায়ের তেলতেলে চামড়ায় কোনো কিছুই ধরে না ঠিকমতো। আসলে নরম-নরম মাখন-মাখন ঘি-দুধের শরীর না হলেই এমন হয়। কাজের-মেয়ে আর ঘরের-মেয়েব ফারাকে ফর্সা মেয়ে আর কালো মেয়ের ফাবাক ঘটে যায়। পয়সার ঘবে কালো মেয়েও ফর্সা হয়ে যেতে পারে বিউটি-পার্লারে খরচাপাতি কবে। দুধে-আলতায় বং নিয়েও কেউ কদব পাবে না, যদি গতর খাটিয়ে রাত্তিরদিন খাটতে হয় তাকে। এমন সব কথা মনে এলে ভীষণ রাগ হয় বাধাব। ক্ষুব্ধ অভিমানে সে বাঁ-হাতে আরশিটা তুলে নেয় নাকের ডগায়। সোজাসুজি নিজের চোখে চোখ রেখে, বুঝি অন্য কারুর মুখ, মুগ্ধতায় ঠোঁটেব কাছে ঠোঁট এনে অনেকটাই চুমু খাওয়ার লোভে তাকিয়ে থাকে। নিজেকেই দেখে। যথেষ্ট ডাগর-ডাগর মনে হয় চোখ জোড়া। ডান হাতের আরশিটা এপাশে-ওপাশে ঘুরিয়ে নানাভাবে চাহনিগুলি পরখ করে—আড়চাউনি, চোখ-পিটপিট, আঁখিঠার, তেরচা-নজব ...এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সিনেমার আর্টিসদেব কায়দায় ছোট কবে কানকিও একটা। নিজেব সঙ্গে চুপি-চুপি এমন খেলায় মজাও লাগে বেশ। খুব একটা ফ্যালনা নয় তার নয়নমণি। নাকটা টিকলো না হোক, থ্যাবড়াও বলবে না কেউ। ঠোঁট দুটো বেশ পাতলা। কেন? তার থুতনি? চোখেব ভুরু? ডান গালেব ছোট টোল? সব মিলিয়ে কচিকাঁচা সুডোল মুখশ্রী? নিজের রান্না কি নিজের দাঁতে-জিভে চেনা যায় ভালো করে? অথচ আর-কেউ বিস্বাদে ভুরু কুঁচকোলে খাবাপ লাগে। আয়নায় চোখ রেখে, বুঝি আয়নার

মুখই বিভোর মশগুলে দেখছে তাকে, দু'জনই দু'জনের দিকে সম্মোহে অপলক। নয়ন মেলে নিঃশব্দে দু'জনই শুধোয় দু'জনকে—কালো মেয়েরই তো লাবণ্য বেশি গো! এবং বাঁ-হাতে আরশিটা স্থির থাকে। চোখের নাগাল ছেড়ে চোখজোড়া নড়ে না। ডান হাতটা চুপি-চুপি গড়িয়ে নেমে যেতে থাকে তলার দিকে। ক্রিম নয়, স্নো। বাহারি ছোট শিশিটুকু কোলের কাছে খোলা ছিল। আঙুলের ডগায় তুলে নিয়ে গাল গলা কপাল চিবুক থুতনিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে শাদা শাদা ফোঁটায় ফোঁটায় গোটা মুখ ভরে ফেলার পর যখন অদ্ভুত এক ভূতের চেহারায়, মজা লাগে। দারুণ মজা। কী ঠাণ্ডা আর আরাম! আঙুলে ঘষে ঘষে চামড়ায়-চামড়ায় মিশিয়ে নিতে নিতে চোখ বুজতে হয়, গাল ফোলাতে হয়, গলা উঁচিয়ে তুলতে হয়, হাঁ করতে হয় এবং তখন নিজেরই ভেংচিগুলো অন্য এক খেলা হয়ে ওঠে। খেলা কাচের সঙ্গে, ছায়ার সঙ্গে, নিজেরই ফোটোর সঙ্গে। ফেস-পাউডারের আলাদা কৌটো আছে তার। প্লাস্টিকের বাটি আছে, পাফ আছে। আলতো ছোঁয়ায় গালে থুতনিতে কপালে ঘাড়ে গলায় নরম তুলতুলে পাফের চামর বুলোতে-বুলোতে সোহাগে-সোহাগে, নিজের গালেই নিজের সস্নেহ দরদে-আদরে চোখ বুজে আসে। জেল্লা ফিরে যেতে থাকে কালো মেয়েব। ম্যাজিক, সবই ম্যাজিক! গালের এপাশে-ওপাশে যে-দু'চারটে বয়স-গোটা দু'আঙুলেব নখে টিপে ভাত বের করে দেবার পরও ফুলে ফুলে ছিল, সবই ঢাকা পডে যেতে থাকে। খুশিতে খুশিতে দোল খায় বাধা। বাঁ-হাতেব আবশিটা ঝটপট বালিশেব ঠেকনায় আবাব দাঁড করিযে নিযে, দু'টো হাতই যখন ফাঁকা, যেন শাওযারেব তলায় স্নান করছে সে, গলাশুদ্ধ থুতনিটা সারসগ্রীবায় উঁচিযে মুদিত চোখে গালে সাবা মুখে পাউডারের প্রলেপ বুলোতে সত্যি কী সুখ! সাহেববাড়িতে সুখের অন্ত নেই।

এবং কেউ জানে না, রুজ মাখার ছোট একটা শিশিও আছে তার। মুন্নিদিদির কাছ থেকেই চেযে আনা, ওদেব ফেলে-দেওযা একটা শিশি। শিশির ছিপিটা খুলে ফেলল ঝটকায়। হঠাৎই তক্তপোশেব ওপর পা তুলে কনুইয়েব ভর নিযে উপুড হয়ে বসে, বাঁ-হাতেব তেলোয় ঠুকে-ঠুকে যেটুকু বেরলো, ডান হাতের তর্জনীর ডগায় তুলে, আবশিতে চোখ বেখে, নাকেব দু'পাশে মাংসল গালের টোপলায় আলগোছে বুলিয়ে বুলিয়ে ছোট একটা বিন্দু থেকে আস্তে আস্তে স্নো-পাউডারে মাখামাখি চামড়ায় মিলিয়ে-মিশিয়ে দেওয়াই যে-নিয়ম, যথাবিহিত নিপুণ লেপনে গোলাপী আভার প্রস্ফুটনকে বুঝি এক অলৌকিক যাদুই মনে হচ্ছে তার। কিংবা জন্ম থেকেই শৈশবের পুতুল খেলাটা বাকি রয়ে গেছে যে-মেযের, এতকাল বাদে আজ তার পুতুল-সাজানোর খেলায় বড ভালো লেগে যাচ্ছে কাঠের-ফ্রেমে বাঁধানো আবশির কাচে বাহারি ডলপুতুলকেই। যে-পুতুল শুধু তারই বশ মানে। হাসে, শুধু তারই দিকে চেয়ে চেয়ে খুশিতে ভুরু কাঁপায়, খলবলায়।

স্নো-পাউডাব আর পেইন্টেব রং মাখানোর পব বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে অমন ডাগর-ডাগর সুন্দর চোখ জোড়া। ঠোঁট দুটো বড় ফ্যাকাসে আর হালকা।

শুধু তো পাউডারের লম্বা কৌটো বা স্নো ক্রিম রুজের শিশিই নয়, বড়সড় মাপের চিত্তির আঁকা সুন্দর একটা চকোলেটের বাকশো আছে তার। যখন যেখানে যা কিছু

পায়, কুড়িয়েবাড়িয়ে-পাওয়া দিদিমণিদেব উদ্বৃত্ত সবই মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে ওঠে—ময়শ্চারিং মেক-আপ লোশন, ক্লিনজিং মিল্ক, আই ব্রাও পেনসিল, আইশ্যাডো, নেলপলিশ, লিপস্টিক, লিপ-পেনসিল, কাজল মেহেন্দি বিন্দি... আনকোরা নতুন হয়তো নয়, ফেলে দেবার পরও শিশিটিউবের গায়ে লেপটে থাকে বেশ খানিকটা অথবা কখনও কখনও আধাআধি হবার আগেই লুকিয়ে-চুরিয়ে তুলে আনা অনেকগুলোই। কোন পাপ নেই। কী করেই যেন আপন খেয়ালে বুঝে ফেলেছে নিবক্ষর—রঙে রঙে বর্ণময় এ-বিশ্বে নিরন্তব ফাগের উৎসব। তিলে তিলে এভাবেই তিলোত্তমা হয়ে উঠতে হয় সবাইকে। সুন্দরী-অসুন্দরী নেই। পেখম থাকলেই ময়ূর।

অথবা বাহারি চালচিত্তিবে যেমন দুগ্‌গাঠাকুব আর মাটির মূর্তি থাকেন না, মা হয়ে ওঠেন সকলের, সব মানুষের মা—মানুষও তেমনি প্রতিমা হয়ে উঠতে পারে, যদি ডানে-বাঁযে দুটো চোখেব পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পটুয়াব ঢঙে আলতো করে সরু রেখায় বঙ খেলাতে জানে। মিশমিশে কালোয় সরু হয়ে পাখনায় ভাসবে দুটো ঢেউ-খেলানো ভুরু। ঠিক এমনটাই হয়। ঝলমল ঝলমল ডাকের সাজেও যখন জেল্লা খোলে না মা-দুগ্‌গার, মইয়ে উঠে চোখে-ভুরুতে কালো তুলির আঁচড় টানলেই প্রাণেব প্রতিষ্ঠা তাঁব।

দুচ্ছাই, মা-দুগগা! বিবক্ত বাধা। এটুকুন একটা ছোট ঘবে এতই হেলাফেলা, একটা টিউববাতি অব্দি নেই। একটাই মাত্র জানালা। ম্যাটম্যাটে একটা ষাট পাওয়াবেব বালব। আলোটা সে জ্বেলেই বেখেছিল। জানালা আর আলো দুটোই দূবে দূরে। জানালাব আলোয় ঘর ভরে না। দিনের বেলায় বিজলী বাতির তেজ নেই। বিছানায বসে এমন সব সাবধানী কাজ কি হয় কখনও? হ্যাঁচকা টানে আরশিটা টেনে নিযে সে জানালাব দিকে ছুটল। কাজলের ছোট ডিবেটা থাকে হাতের মুঠোয়। জানালায় পিঠ ফিরিযে দাঁডালে আযনায় নিজের মুখটা আরো বেশি কালো। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবশিকে অন্ধকাবে বাখলে সবাসরি বাইরেব আলোয় আলোয ভরে থাকে নিজেবই মুখ—কাচেব ছাযায খুঁজে পাওয়া যায় নিজেকে। মুন্নিদিদির ঘবে অজন্তা-না-কী-যেন ছাই... পাথবের মূর্তিব সেই ছবিব ঢঙে আরশিটা বাঁ-হাতে মুখোমুখি তুলে ধরে, ডান হাতেব বুড়ো আঙুলে চোখের তলাটা টেনে রাখতে হয়। চোখেব মণিটা বিদঘুটে হয়ে এলে হাতেব তেলোটা গাল ছুঁয়ে রেখে সযত্নে কাজল পবাতে হয় চোখের পাতায়। টানা চোখ আবো ডাগর হযে উঠতে থাকে এবং কাজলবেখা সম্পূর্ণ হয়ে এলে নিজেব সঙ্গেই শুভদৃষ্টিতে বুঝি অন্য কারুর মুখের ছবি। এ-বুঝি এভাবেই নাম-ধাম-কুল পবিচয সবই পাল্টে যেতে পারে একজনের। অন্যদিকে সত্যি হয়ে উঠতে থাকে আরেকজন। আরশিব সঙ্গে সখ্যতায মুগ্ধতাই শুধু। চেয়ে থেকে থেকে, শুধু তাকিয়ে থাকার নেশায নেশায... আবো, আরো অনেক বেশি করে বদলে ফেলা যায় নিজেকে, জেনেই, নতুন উৎসাহে তক্তপোশে ফিরে এসে চকোলেটের বাকশোয় এলোমেলো খামচানি। আধাআধি হোক কিংবা সিকি ভাগ, অবশিষ্ট যা আছে—এমন সব ভুরু-আঁকার পেনসিল খুঁজে খুঁজে যেটা পছন্দ হলো, হাতে নিয়ে, জানালাব আলোয় আরশিতে মুখ রেখে আবার নতুন করে আবো বেশি ভক্তি নিবেদন। রোজ সকালে স্নান সেরে ছাদে ঠাকুরঘবে পুজোয় বসেন মা।

তারও আগে ছাদের টব থেকে ফুল তুলে রাখে রাধা। বাজার থেকে আরো কিছু ফুল, ফুলের মালা, আম্রপল্লব, বেলপাতা কিনে আনতে হয়। বেশ খানিকটা চন্দন বেটে দিতে হয়। পেতলের গোপালঠাকুব হাতে তুলে নিয়ে দেশলাই কাঠির ফোঁটায় ফোঁটায় সোহাগী আদরে বিগ্রহ সাজাবেন মা। আয়নার কাচে যেন সেই গোপালঠাকুরই তার হাতে। রাধা নিজেকে সাজায়। বিয়ের-কনে না হলে এমন করে মেয়েদের কপালে চন্দনের আলপনা আঁকে না কেউ কখনও। চন্দনের চিত্তিবের চেয়ে আরো সূক্ষ্ম আরো জটিল আইব্রাও পেনসিল তার হাতে। কাককোকিলের ডানায় ভুরু কাঁপবে তার! আজ যেমন-তেমন, বছব দেড়-দুই বাদে আরো একটু বড় হলে বুল্লিদিদির মতো সেও ভুরু ছেটে নেবে, প্লাক করবে—এ-বকমই একটা মনোবাসনা ভাবনার লকারে গোপন রেখে এই মুহূর্তে সে তার শিল্পকলায় গোপালঠাকুর সাজায়। দুটো মুখই নাকের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি। এপাশের ডানহাত ওপাশের বাঁ-হাত হয়ে কাচটাকে ছুঁয়ে থাকে। এপাশের ডানদিকের ভ্রূরেখা ওপাশের বাঁদিকে উল্টে গিয়ে দীর্ঘায়ত হয়ে ওঠার পব এপাশের বাঁ-চোখও যদি ও-তরফে একইভাবে রূপময়—ডান-বাঁয়ের ফারাক থাকে না। সমান সমান মাপে এক জোড়া আঁখিপল্লব মা-দুগ্‌গার চোখের আদল পেয়ে যায়। বাধা প্রতিমা হয়ে ওঠে।

রক্তমাংস হারিয়ে মাটির-মূর্তি হয়ে উঠতে তখনও বাকি থেকে যায় অনেক। পিছিয়ে এসে চকোলেটের বাকশোয় আবাব খোঁজাখুজি। কাজলের ছোঁয়ায় চোখজোড়া যদি এমন চমকালো হয়ে ওঠে, ঠোঁট রাঙানোর লালও তো চাই একটু। কুড়নো যখের-ধন তার আছে গোটাকতক। কোনোটাই নতুন নয়, পুরোনোও নয। কিন্তু ম্যাড়মেড়ে শুকনোও নয় এমন কিছু। এবার ঘামছে সে। হঠাৎ-ই মনে পড়ে যায়, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভেতর থেকে যে-তাড়া থাকে, তারই তাড়নায় চকোলেটের বাকশোয় হাবিজাবির ভিড়ে হাতের কাছে যা পাওয়া গেল, পছন্দমতো একটা তুলে নিয়ে ছুটে এসে আবশি ধরে আবার দাঁড়াতে হয় জানালার আলোয়। প্রসাধনেব শেষ পর্বে কমলালেবুর কোয়া গোছের নিচের-ঠোঁটে আলতো করে স্টিক বুলিযে, যেমন নিয়ম, লজেন্স চুযে খাবার ভঙ্গিতে ওপরের-ঠোঁটের চাপে দুটো ঠোঁটেই রং চারিয়ে ছোটখাটো করে বরাবর স্টিকটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে ঘষে যতক্ষণ না মনপছন্দে মিলছে ওষ্ঠাধরের লাল, আয়নার চৌকো ফ্রেমে সে একটি মেয়েকে দেখতে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করাই এখানে নিয়ম। যদি কোনো ভুলটুল থেকে যায়? বেখাপ্পা যা-কিছু, সব এখনই শুধরে নিতে হবে। কাজলের টান বা টকটকে ঠোঁটের লাল—চড়া রঙেব বাহারে গোটা মুখশ্রী খোলতাই হয়ে উঠলে যে-ফাঁকটুকু তখনও থেকে যায়, সেখানে সোনালির ওপর সবুজ ঝলমলে, অনেকটাই ডিমেব ধাঁচে, একটা বিন্দি ভ্রূসঙ্গমে সেঁটে দেবাব পর, কী আশ্চয্যি, যথার্থই ত্রিনয়নী দেবীচিহ্নে ললাট ভরে ওঠে এবং চেনামুখের এমন আদল-বদলে অন্য এক অচেনাকে চিনে নিতে নিতে শুধু তাকিয়ে থাকারই নেশা বাড়ে। এ-তো আর নকল গোঁফদাড়ি এঁটে গুণ্ডাবদমাশ ব্যাটাছেলেদের ভোল পাল্টানো নয়। কত রকম দামি দামি রংবাহারি সাজে সুন্দরী হয়ে উঠতে হয় মেয়েদের। সাজতেও ভালো লাগে কত। সিনেমার

পর্দায়, টিভির বিজ্ঞাপনে রূপের এত হাট! সবই সে চেনে জানে। একটু একটু করে শিখেছে। এ-ও তো শেখা!

হঠাৎ নাড়া খেল। দবজায় ধাক্কা—'বাধু, অ্যাই অ্যাই বাধু, দরজা খোল্। মা ডাকছেন।'

বাইরে নন্দদার গলা। কী সব্বোনাশ। কালীজেঠুকে নিয়ে সতুদা এসে গেছে? এখন কী হবে? এখনও তার অনেক ...অনেক কাজ বাকি। এবং তড়িঘড়ি ব্যস্ততায় কী সে করবে—দরজা খুলবে অথবা গোছগাছ কবে চকোলেটেব-বাকশো ধামাচাপা দেবে অথবা অমন জেল্লামারা চাইনিজ-সিলকের শালোযার কামিজ তক্তপোশেই পড়ে আছে, পাট-ভাঙা হযনি এখনও ...কিছুই বুঝে উঠতে না পেবে যখন দিশেহারা, খিটকেল বুড়োটার চিৎকার-চেঁচামেচিতে দবজার দিকেই ছুটতে হয় তাকে।

খিল তোলাব পর পাল্লা দুটো একটু ফাঁক হতেই, এক ঝলক মিষ্টি সুবাসেব ধাক্কাই হযতো, যেভাবে মুখ নাক সিঁটকে উঠল বুড়ো, তাঁব হাঁ-করা মুখেব দিকে তাকিয়ে রাধা নিজেই ভ্যাবাচাকা।

কিছু একটা বলতে চেয়েছিল নন্দলাল। মেয়েটাকে হঠাৎ দেখে এবং আগাপাশতলায এক পলক চোখ বুলিযে কিছু না-বলাই ববং ভালো, মনে ভেবে সবে যাবার আগে নেহাতই ডিউটিমাফিক আওড়ে যেতে হয়—'কালীদার শরীল খাবাপ। ট্যাশকি চেপে এযেচেন। গাড়ি দাঁড়িযে রযেচে বাইরে। মা ডাকছেন্ তোকে। এখুনি...'

সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা খাবাব জন্যে যথেষ্ট এটুকুই। এই যযা! এ কী হলো? কোন্ দিক সামলাবে সে এখন? দিশেহারা রাধা ডানে-বাঁযে হদিশ হারায়। এত তাড়াতাড়ি? কী আশ্চয্যি, এবই মধ্যে বুড়ো বাপকে নিয়ে চলে এল সতুদা?

এবং তখনও, ওপাশে খাবাব-ঘবের দরজায় আড়াল হয়ে যাবার আগে নন্দলাল-—'আমি ফের এসে আর ডাকাডাকি করতে পারব না বাপু। যাবি ত চলে আয়। নয়তো মাকে যেয়ে বলে আয়, কি বলবি...'

অসহায় বাধা ডানা ঝাপটায় তার মরণবাঁচনে। এতদিন বাদে চাকবি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কালীজেঠু। পেন্নাম সারতে এসে মা-র সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, কান্নাকাটি চলবে কিছুক্ষণ—এরকমই একটা হিসেব ছিল তাব। কিন্তু ট্যাকশি? ট্যাকশি চেপে আসবেন কালীজেঠু? আর সেই ট্যাকশি দাঁড়িযে থাকবে সাহেববাড়িব দবজায়? এ-হয় কখনও? কিংবা সাহেববাড়ির নিয়মকানুন সবই অদ্ভুত। এত কাল গ্যাবেজ থেকে গাড়ি বেব কবে কালীজেঠুকেই হাপিত্যেশে বসে থাকতে হয়েছে বাইরে, রাস্তায়। সাজগোজ ফুরোয না দিদিমণিদেব। মুন্নিদিদির যদিও বা হলো, সবাই মিলে চিৎকার চেঁচামেচি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে গোটা বাড়ি মাথায় তুলেও বুল্লিদিদিকে টেনে বের কবা যায় না ঘব থেকে।

শুধু তার বেলাই কেন আলাদা নিযম? কান্না পাচ্ছে তার। গলগল ঘামছে শরীর। সে-আবেক বিপত্তি। কাঁদলে চলবে না। চোখের জলে লেবড়ে যেতে পারে চোখের কাজল। গড়িয়ে গড়িয়ে বিতিকিচ্ছিরি কুচ্ছিত হযে যাবে এত কষ্ট কবে পিতিমে সাজানো সাধের পেন্ট তার। কান্নাটা থাকবে বুকের ভেতব, চোখ ভিজবে না—এমন সব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানায় মাথামগজ ঠিক থাকে কারুব?

নতুন করে দবজায় খিল তুলে মতিচ্ছন্ন পাগলেব মতো সে তক্তপোশেব ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাজার টাকা দামেব রংবাহারি চাইনিজ-সিলকের শালোয়ার কামিজ! শাদা মখমলের নরম তুলতুলে একটা ওড়নাও সে পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। ক'টা মেয়ের ভাগ্যে জোটে এমন সব দামি জেল্লার সাজপোশাক? কত পরিপাটি করে ধীরে সুস্থে এগুলো তার পরার কথা ছিল আজ। কিন্তু সময় নেই। সে তো আর সাহেববাড়ির দিদিমণিদের কেউ নয়।

রাগ হলো তার। রাগের ঝালে গায়ের ফ্রকটা টেনে তুলতে, পিঠের দিকে সব কটা বোতাম খোলাই হয় নি বোধ হয়, ছাড়াৎ-ছাড়াৎ শব্দে খানিকটা ছিঁড়ে গেল। হুঁশ নেই। পুরনো টেপ-জামাটাই থেকে যায়। একটু-আধটু ছেঁড়াফাটা আছে। থাক। পাল্টাপাল্টিব সময় নেই। সুন্দর সুন্দব পোশাকি জামাকাপড় অনেকটাই সুখাদ্যেব মতো। ভালো জিনিস হাভাতেপনায় ঝটপট গিলে ফেলতে নেই। চেয়ে-চেয়ে দেখতে হয় খানিকক্ষণ। হাতে-গরম হলে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় গন্ধ থাকে। একটু একটু করে জিভে ঠেকিয়ে চাখতে হয়। বড় দুঃখে বড় বেদনায় হুটপাট কবে মুন্নিদিদির শালোয়ারটার পাট ভাঙল সে। পা দুটো গলিয়ে দিতে হয়। কোমর বাঁধার জন্য চারপাশেব কুঁচিতে যত্ন কবে পবিপাটি সাজিয়ে নেবার যে-নিয়ম, ভালোভাবে দেখে বুঝে সেসব আর কবা যাচ্ছে না কিছু। হাতেব মুঠোয় চেপে ধবে গালে গলায আদর বুলোতেও ভালো লাগে মোলাযেম যে-জামায়, সোহাগী ঢঙে তাকে আদবও করা যাবে না একটু? পুবনো জামায় ন্যাপথলিনেব একটা গন্ধ থাকে। বড ভালো লাগে তার। এসব নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে না এখন। রাজকন্যের ভঙ্গিতে সবই তুচ্ছ ভেবে, যেন তার আরো আছে... অনেক আছে—মনে ভেবে কামিজটা গায়ে গলিয়ে দেবাব পর, এমন মিহি আব ফুরফুবে সিলক, গোটা গায়েব চামড়ায চামডায যেখানেই ছোঁযা লাগে, সেখানেই পাখিব পালক বুলোলে যেমন হয, শিরশির শিরশির। চোখ বুজে আসে সুখে আর আবামে। রাজকন্যের সুখ। কিংবা চোখ খুললেই ধাঁধা। গোটা বুক জুড়ে শুধু হীরেব ঝলমল। পিঠের দিকে চেন যে-জামায, সামনের দিকে বংদাব সবুজ সুতোয় চুমকি-বসানো নকশাব কাজ। শুধু বাহার, বাহারি আলপনা।

এবং সে বদলে যায় পুবোপুবি। সত্যি-সত্যি রাজকন্যেব ঠাটবাটে রঙে বঙিন হয়ে নিজেকে পাল্টে ফেলার পব ভাবতেই পাবে না বাধা—এটা সত্যি। মনেই হয় না, এত এত দামি পোশাকআশাক পবে আছে সে অথবা পায়ের তলায় মাটি আছে তার। হালকা হাওয়ায় ভাসছে শরীর। নিজেরও ভার নেই। মাথা নুয়ে, ডানে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুবিয়ে বারবার দেখার ভঙ্গিতে সে নিজেকে খোঁজে। এক চিলতে ছোট আরশিটা কোনো কম্মেরই নয় এখন আব। দিদিমণিদের ঘবে ঘবে লম্বা-লম্বা আয়নায় ড্রেসিং টেবিল। কিংবা আজ তাব এমনই কপাল, যূথিমাসিও ঘবে নেই। দুপুরের কাজের পর মাযেব কাছে ছুটি নিযে গেছে মিছে কথা বলে—দেশেব বাড়িতে টাকা পাঠাবে, দেখা করবে কার সঙ্গে। ফিরবে বিকেল-বিকেলই। আসলে সব বাজে কথা। সব ঢপ। রাধা জানে, বাসে চেপে কোথায় বিষ্ণুপুব না বাজাবহাট। সেখানে বাপের ঘরে ছেলে থাকে। ছেলেকে দেখতে প্রায়ই যায়। ফেরেও ঠিকঠিক।

কিন্তু তাই বলে আজই যেতে হবে তাকে? বাধাব গায়েগতরে ফোঁসানি বাড়ে।

মাসি ঘরে থাকলে মাসির চোখেও সে দেখতে পেত নিজেকে। এর আগে অনেক বড় বড় বাড়িতে কাজ করেছে মাসি। দামি-দামি সাজগোজের বাহার দেখেছে অনেক। কিংবা দুটো হাত পেছনে নিয়ে কিছুতেই যখন পিঠের দিকে কামিজের চেনটা টেনে তুলতে পারছে না ঠিকমত, মাসির ওপর রাগ বাড়ে। চেনটা হয়তো ভেঙেই গেছে। একটা সেফটিপিন সেঁটে দেবার জন্যে অন্য কারুর দুটো হাত সে কোথায় পাবে এ-বাড়িতে? সোহাগী চোখ? সোহাগী হাত? তাকে সুন্দব করে সাজিয়ে দেবার জন।

চাপা অভিমান থেকে অসহায় ক্রোধ। গায়ের জ্বলুনিটা এবার সাহেববাড়িবই ওপব। হ্যাঁচকা টানে ওড়নাটা টেনে নেবাব পব, পাট ভেঙে, নতুন করে লম্বা ফিতেয ভাঁজ করতে কবতে চোখজোড়া দুঃখে বাগে ফেটে ফেটে পড়তে চায়। এ-তো আব ব্যাটাছেলেদেব গাযের চাদব নয যে পিঠ ঢেকে ডানে-বাঁযে দুদিক থেকে এসে গড়িয়ে নামবে সামনেব দিকে। মেয়েদেব ওড়না ঠিক তাব উল্টো। সামনের দিকে বুক ঢেকে পেছনের পিঠে কাঁধের দু-পাশে ঝুলবে। পিঠের চেনটা ভাঙা থাকলে অনেকটাই খোলামেলা উদোম থাকবে ঘাড়ের নিচে। ইস, কী বিচ্ছিবি! এত কবেও বেহাই নেই। একটা-না-একটা খুঁত থেকেই যাবে কোথাও। তবু ভাগ্যি ভালো, বিনুনি গড়েও খুলে ফেলেছিল সে। এখন এলোচুল। শ্যাম্পু-ফাঁপানো খোলা চুল ছড়িয়ে থাকলে কিছুটা ঢাকাচাপা থাকতেও পারে জামার ফাটলটা। একটা সেফটিপিন।

ছটফটানি বাড়ে। ট্যাকশি দাঁড়িযে আছে। মা রেগে যাচ্ছেন। এব পব হয়তো আর খিঁচুনিমারা বুড়ো নন্দদা নয়, মা নিজেই ছুটে আসতে পাবেন তেড়েফুঁড়ে। বাপের-নাম-ভুলনো ধমকধামক বকুনি আছে কপালে।

মাথাকাথা ঘুলিযে যাচ্ছে। ত্রস্ততা বাড়ে। কিংবা সে বুঝে ফেলে, সাহেববাড়িব ওপর খামোকা বাগ থাকা উচিত নয় তার। কামিজের এ-খুঁতটুকুব জন্যেই আজ সে ভাগ্যবতী। শুধু ভাঙা চেন নয়, ফুটোফাটা বা বিচ্ছিরি দাগফাগের আরো বড়সড় গলতি থাকতে পাবত জামায-কুর্তায। সামান্য দু-চারটে টাকা খরচ কবে চেনটা পাল্টে নিলেই হাজার টাকা দামের যে-শালোয়ারকামিজের সেট নতুনই থেকে যায, অনেক...অনেকবার গায়ে পবে পবে হেজেপচে গেছে বলেই হয়তো বাতিল ডিজাইন দিদিমণিরা আর পবতে চাইছে না কেউ। ওদের ডিজাইন পুরনো হয়ে গেলে খুব সহজেই বাধা একটা ডিজাইন পেযে যায। শুধু একটা বাড়তি সেফটিপিন লাগে।

সাজগোজেব পাট মোটামুটি চুকিয়ে নিয়ে ঘব ছেড়ে বেরবাব সময যখন, সর্বাঙ্গে শিথিল হয়ে এল বাধা। তবাসে বুক কাঁপে। সেই ভযে—দুপুর থেকেই একটু একটু করে সেটা দানা বেঁধে উঠছিল ভেতরে ভেতরে। ভয়ের দানা জমতে জমতে এখন, ঠিক এই মুহূর্তে, মায়ের মুখটা মনে পড়ছে। যেন ভাত-কাপড়েব মা নয় তার, বাঘের নাকেব-ডগা ছুঁয়ে হালুম ডিঙিয়ে যাবাব বিপত্তি। গলা শুকিয়ে আসছে। চোখেব পলক নড়ে না। এবং আপশোস—দেশে যাবার সময় ছোটখাটো এমন কাজ সে আগেও করেছে অনেক এবং কাজটা যে ভালো নয়, জেনেই, প্রতিবারই ভেবেছে মনে মনে—আর নয়, কক্ষনও না। এবারই শেষ। অথচ অপ্রতিরোধ্য টানে প্রতিবারই কী যে হয় মাথার ভেতরটায়? এবারও সেই একই বিপদের ঝুঁকি।

স্নানের পরই দুপুরবেলায় হাতের নখগুলো রং কবার সময় পায়ে আলতা পরে রেখেছিল সে। গোছগাছে সাজিয়ে বেখেছিল 'বিগ শপার' ঢাউস চটের থলেটা। সেই সঙ্গে হাতে রাখার ছোট বাহারি ব্যাগ। দুটোই বিপজ্জনক।

বাঁ-হাতের মুঠোয় ব্যাগটা থাকে। সেটা তেমন কিছু নয়। একটা কালো চশমা আছে তাব। এক্ষুনি চোখে আঁটবে না। মা বকবেন। কিংবা হীরে আর চুনি পাথরের লকেট-ঝোলানো চোখ-ঝলসানো হাবটা। বছর তিনেক আগে ওদের দিদি-জামাইবাবু এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। ক'টা দিনের জন্য এসে খোলামকুচির মতো পয়সা উড়িয়ে গেলেন দেদার। রাধা তখন ছোট, আরও অনেক ছোট। এ-বাড়িতে প্রায় নতুন। কারুর কোনো হিসেবের মধ্যে ছিল না সে। সবাব জন্য কত কী দামি-দামি জামাকাপড় গয়নাগাটি সাজগোজের জিনিসপত্তব। সব হিসেবের বাইবে থেকেও পুরোপুরি বঞ্চিত হতে হয়নি তাকে। আসলি চাঁদিব আদলে স্টেনলেস-স্টিলেব মিহি চেনটা কিছু না। লকেটটাই আসল। তিনটে না চাবটে পাথর খসে পড়ে গেছে বলে মাত্র ক'মাস আগে যে-হাবটা বুল্লিদিদিব হাত ফসকে তাব গলায় এসে গেছে, আপাতত সেটা হাতে-হাতে ব্যাগেই থাকবে তার। যদি ট্যাক্সিতেই যেতে হয়, নযতো রেলগাড়িতে, এক ফাঁকে গলায় পবে নেবে। সে জানে, আজ বাতে মস্ত এক হুলস্থুল পড়ে যাবে তার গাঁয়ের কুঁতি সাঁতবা সামন্তদের মাহিষ্য পাড়ায়। কিংবা তার ব্যাগে এখন আবো এক সব্বোনেশে কিছু, যাব জন্যে বুকেব টিপটিপ। তার টিনেব বাকশোয় এত কালের গোপন সঞ্চয় যে-বাবোটা একশো-টাকার-নোট, সেখান থেকে মাত্র দুটো নোট তুলে নিয়েছে ব্যাগে। দেশগাঁয়ে গেলে কিছু টাকাকড়ি তো বাখতেই হয হাতে। দু-হাতে দেদাব খবচাপাতিতে চোখ চমকাবে পড়শিদের। ইজ্জত বাড়বে শহুবে মেয়ের।

রাধা নিশ্চিত জানে, ওর হাতেব ছোট ব্যাগে নজর পড়বে না কারুর। ববং মা আবো কিছু টাকা দেবেন বাহাখবচ বাবদ।

কিন্তু ডান হাতে ভার বইতে হচ্ছে যে-পেটমোটা মস্ত ব্যাগটার? ঘবে পবার জন্য খবরের-কাগজেব-মোড়কে-বাঁধা কিছু জামাকাপড ওপরেব দিকে। সে-তো সবাই জানে। এসব সঙ্গে নিতেই হয় একটা মেযেকে। সাহেববাড়ির হেঁশেল থেকে হরেক ডিজাইনের শিশি বোতল জমিযে জমিয়ে সে যে দেশে নিয়ে যায়, সে-ও জানেন মা। কিন্তু আজ যেভাবে ভারি হয়ে উঠেছে ব্যাগটা, কিংবা ভার বয়ে বয়ে পা ফেলতে যেভাবে ডানদিকে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে শবীব, বাধা তাব প্রাণপণ শক্তিতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে খাডা রাখতে চায। ঠাণ্ডা মোজাযেক মেঝেয পা ফেলে হালকা চালেই নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা। কিন্তু হয না। ওজনটা সত্যি বড বেশি। সিল-করা আস্ত একটা সূর্যমুখী তেলের দু-কেজি বোতল একেবারে তলার দিকে। সূয্যিমুখী তেল কী? সূয্যিমুখী ফুলই সাতজন্মে দেখেছে নাকি গাঁযেব মানুষ কেউ? বাগানের শৌখিন ফুল থেকে যে এমন বাহাবি তেল হতে পারে, সেই-বা জানে ক'জন?

আরো একটা হালকা জিনিস। খুবই হালকা, ভারটুকু কিছুই নয়। কিন্তু বুকের টিপটিপে বাধা নিজেই অচল হয়ে আসে। দশাসই একটা বোঝা বয়ে বয়ে খাবার-ঘর ডিঙিয়ে ওপাশের বারান্দায পা ফেলে এগতে হাঁটু কাঁপে, পেটে খিঁচুনি, মাথায ঝিমঝিম।

এক্ষুনি যদি খোঁজতল্লাশ শুরু হয়ে যায় বুল্লিদিদির? কী হবে? কী করবে সে? যেন কিছুই জানে না সে—হাবাগোবা ভালোমানুষিতে ঠাণ্ডা রাখতে হবে নিজেকে। বোকাবোকা চোখেব চাউনিতে যদি ভয়ের চোখজোড়া ধরা পড়ে যায়? মায়ের নজর বড় কড়া। বুঝি থানা-পুলিশ নয়তো হাকিমেব এজলাসে গিয়ে পৌঁছতেই হবে তাকে। এগোয় ভয়ে ভয়ে। জিনিসটা বুল্লিদিদিবই। এমন গোটা কয়েক আছে দাদাবাবু-দিদিমণিদের ঘবে ঘরে। ফেলা-ছড়ানো থাকে। নষ্টও হয়ে যায কত! একটা ওয়াকম্যান। আজব যন্তব! ডাক্তাবদেব বুক-পরখের যন্ত্রেব মতো দুটো বোতাম দু'দিকেব কানে গুঁজে রাখলে হরেকরকম গান বাজে। একা-একা, শুধু নিজেকেই শুনতে হয়। পালানভাই হাতে পেলে কী যে কাণ্ড হবে গোটা গাঁযে! ইশকুলে যাবে, বন্ধুদেব দেখাবে শোনাবে। দিদি শহরে থাকে।

দোতলার লাউঞ্জে পৌঁছে যাচ্ছে সে। এমন বেচাল অবস্থায় সাহেব দেশের সেই দুঃখী মেয়েকেই মনে পড়ে যায তার। সিন্ডাবেলা। সৎমা ছিল একজন—ডাইনি। দুটো কুচুটে বোন ছিল—বড্ড হিংসুটে আব পাজি।

পায়ে পায়ে যথাস্থানে পৌঁছনোব আগে দেযালের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকিতে সে মাকেই দেখল প্রথম। মাযেব পাশে মুন্নিদিদি আব বুল্লিদিদি। কার্পেটের বাইবে মোজাযেক মেঝেয হাঁটু ভেঙে বসে কপালে-হাত কালীজেঠুর। বড় কাঙাল-কাঙাল।

রাধা থমকে দাঁড়াল। ভগবতী মায়ের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন করছে বুকেব ভেতরটা। কেউই হযতো বলবেন না কিছু। মা বড় ভালো। ভাতকাপড়েব-মা।

আসলে সে নিজেই খারাপ। খুবই খারাপ মেযে সে। চোখেব কাজল ভিজে যেতে পাবে,—স্বাভাবিক আশঙ্কায বুকেব পাথরে কান্নাকে আডাল বেখে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে থাকতে হয়। পাপকে পাপ জেনেও, সবই বুঝেশুনে, দেশে ফেবাব আগে এমন খারাপ হবাব ইচ্ছেটা কেন যে হয় ছাই! একবাব দু-বার নয়, বারবাব প্রতিবাব।

আনুষ্ঠানিক বিদাযপর্ব শেষ হযে গিয়েছিল একদিন আগেই। যাবতীয পাওনাগণ্ডাব সঙ্গে, রুগ্‌ন দেহে মালপত্র নিয়ে যেতে হবে বলে, হাওড়া স্টেশন অব্দি ট্যাকশিভাড়া বা বাধাব জন্য কিছু বাড়তি টাকা—সবই মিটিয়ে দিয়েছিলেন কিরণময়ী।

কিন্তু একটা ইমানদাবি থাকবেই কালীধনেব। রাধাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে যেহেতু, ট্যাকশি চেপে এসে মালিকের ঘর ছুঁযে ওভাবে চলে যেতে পাবে না অনুগৃহীতবা কেউ। ছেলেকে নিয়ে দোতলায় উঠে আসতে হয়েছে একবাব। শুধু তো চোখ নয, শবীরে মনে হাজাব ঝঞ্ঝাটে বড় মুষডে ছিল মানুষটা।

রাধাকে ছুটি দিয়েছেন নিজেই। ওদিকে যূথিকা আজই আবাব এক বেলাব ছুটি চেয়ে বসল। ঠিকে-ঝি ববির-মা কখন আসবে ঠিক নেই। যথেষ্ট বিরক্ত ছিলেন কিবণময়ী। আই. সি. এস. ই-ব পব বাবন আই. এস. সি. পড়ছে সেন্ট জেভিয়ার্সে। ফেবেনি এখনও। বাড়ির কর্তা অফিসে। এখন ভবদুপুরে দিবানিদ্রা ছেড়ে এদের জন্য ফালতু সময় নষ্ট করা, বিশেষত রাধু...নন্দলালকে একবার পাঠানোর পরও ঘব থেকে বেরচ্ছে না মেয়ে—এতদূর স্পর্ধা সইতে না পেরে এবার নিজেই এগবেন ভাবছেন যখন, ওপাশে বাধার শিথিল প্রবেশে ভেতরে ভেতবে যে-রাগ ছিল, বিস্ফোবণে ফেটে পড়ার মুহূর্তে

হঠাৎ কি হলো, ক্রোধের সঙ্গে ঘনঘোর কৌতুকের এমনই বিপরীত এবং জটিল প্রতিক্রিয়া, পেট-কাঁপানো হাসির গমক সামলে ধমকে উঠতেও পারছেন না ভালো করে। অবশ্যই ক্ষেপে গেলেন—'এই...এতক্ষণ ধরে এসব করছিলি তুই ঘরে বসে বসে? উঃ, কী বেআক্কেলে মেয়ে রে তুই? একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? ট্যাকশির ওয়েটিং চার্জ উঠছে, এরা বসে আছে তোর জন্যে। আর তুই...'

রাধা জানে, প্রথম ঝটকায় প্রবল গোলাগুলির ধাক্কায় ঝাঁঝরা হওয়াটা তার প্রাপ্য। মা কত বড়। মুখে-মুখে কথা বলতে নেই।

অথচ গোমড়ামুখো থাকাও আবেক ঝকমারি। তাকে দেখেই কলকল হাসি আর হাততালিতে এমন ফেটে পড়েছে মুন্নিদিদি আর বুল্লিদিদি, খুশিতে খুশিতে বুক ভরে উঠল রাধার। দিদিমণিদের বাহবাই তো সবচেযে বড় পাওনা তার। দিদিমণিরাই তো বোঝে, সবাব চেযে বেশি জানে, এমনধারা যাদু।

লাফাতে লাফাতে ছুটে এসেছে বুলবুলি। জড়িয়ে ধরেছে—'ওফ্ ফ্ফাইন। হোয়াট এ সপ্লেনডিড থিংগ ইউ হ্যাভ ডান। আআ ফ্যানটাসটিক...'

'ব্ল্যাক-ডায়মন্ড বার্নস...' ওদিক থেকে ছোট্ট করে মুনমুন।

'অ্যাণ্ড হোয়েন ইট বার্নস, ইট বিকামস রেড...'

'দো অ্যাবানডনড, উই হ্যাভ গট ওয়ান ইন আওয়ার কিচেন...'

ওদেব দুই বোনের লাফালাফি তোলপাড়ে ছোটখাটো একটা প্রলয়কাণ্ডই লিভিংরুমের বিশাল চত্বরে। কাৎবে কুৎরে উঠে দাঁড়িয়েছে কালীধন। ট্যাকশি দবজায় দাঁড় কবিয়ে রাখার মানে সে জানে। প্রতি মিনিটেরই একটা দরদাম আছে। রেলগাড়িও টাইমে-টাইমে।

কালীধনকে দেখেই বিষয়টা আঁচ করলেন কিরণময়ী। শাসনে-চিৎকাবে ধমকে উঠলেন মেয়েদের—'ধ্যাৎ চুপ। একদম কথা বলবি না তোবা। যা, যা ওদিকে সব...'

এবং গলার স্বরের একই চড়ায এগোলেন বাধার দিকে। তিতিবিবক্ত ললাটে দীর্ঘ ভ্রূকুটি—'গালেমুখে এসব কী তুই থাবড়েথুবড়ে মেখেছিস ছাইপাঁশ? আরে, এরও তো কতগুলো নিয়মকানুন আছে রে। হাতে নিয়ে শুধু কতগুলো মাখলেই হলো? এমন সঙ সেজে তুই এখন যাবি অ্যাদ্দুর? রাস্তাঘাটে লোকে বলবে কী? যাক গে, যা করেছিস, কব। ট্যাকশি দাঁড়িয়ে আছে। মিটার উঠছে। এগো তাড়াতাড়ি...'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাধা। কিংবা বাঁচে না। বুলবুলির লাগাম নেই। কালীধনকে ছেড়ে সতুকে গিয়েই ধবল হঠাৎ। বোগাপটকা বুড়োকে ছেড়ে নতুন মানুষকে—'কি যেন নাম তোমাদের ভিলেজের? কী নাম?'

গেঁয়ো চাষাড়ে চেহারার তেজী জোয়ান সত্যভূষণ জানে না সাহেবিকেতার শহুরে হালহালত। ট্যুরিস্টচোখে তাজমহল দেখছিল চুপচাপ। অতর্কিতে তারই দিকে ফুটফুটে মেয়েদের চোখ পড়তেই বেচারি কিছুটা ভ্যাবাচাকা—'আমাদের গাঁয়ের কথা বলছ? গাঁয়ের নাম? দাঁড়গাছি...'

'ইয়েস ইয়েস, দাঁড়গাছি। আই ন্যু দ্যাট...' বুলবুলি উদ্দাম উল্লাসে—'দি বিউটিকুইন অব দাঁড়গাছি ইজ নাউ ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড সি উইল কনটেস্ট ফর দ্য বিগার টাইটল...'

'মিস ক্যালকাটা...' হাসছে মুনমুন।

'নো, নো ডার্লিং...' গোটা ঘর জুড়ে টেবিল-টেনিস বলের মতো লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি বুলবুলির। দিদির গায়ের ওপর পড়ে, দিদিকেই ভেংচি কেটে...ফান, গ্রেট ফান—'সে মিস ইন্ডিয়া। দেন সি উইল ফ্লাই ডায়রেক্ট টু বোম্বে। ফিলম্‌স অ্যাডস অ্যান্ড মডেলিং...মানি মানি মানি মাস্ট বি ফানি ইন দ্য রিচ ম্যানস ওয়র্ল্ড, মানি মানি মানি অলওয়েস সানি ইন দ্য রিচ ম্যানস ওয়র্ল্ড...'

বুল্লিদিদির হট্টগোলে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছিল। ধুঁকতে ধুঁকতে কালীজেঠু এগচ্ছেন দরজার দিকে। সুযোগ বুঝে বাঁ-হাতের মুঠোয় ভ্যানিটি-ব্যাগ, ডান হাতে পেল্লাই বোঝার 'বিগ শপার' তুলে নিয়ে দ্রুত সরে পড়তে চেয়েছিল রাধা। নতুন করে মাছ রাঙার ছোঁ—'এত সব আবোলতাবোল কী নিয়ে যাচ্ছিস তুই? কী সব ভরেছিস ব্যাগে? বয়ে নিয়ে যেতে পারবি একা-একা?'

হাত বাড়ালেন কিরণময়ী। রাধা চোখ বুজে ফ্রিজ। ফ্রিজের ভেতর জল যেমন করে শক্ত ববফ হয়ে ওঠে, সে বুঝতে পারে, তার দেহের রক্ত তরল নেই আর। থকথক লাল দই হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হিম।

একেবারে ওপরের দিকে ঢাকনা-গোছের কাগজের মোড়ক। টিপলেই বোঝা যায়, জামাকাপড়। মোড়কের তলায় শিশিবোতলের ঠোকাঠুকি। নিতান্তই কৌতূহল, কিরণময়ী তুলে নিলেন একটা।

রাধা নেই। সত্যি নেই। মুদিত নেত্রে ঘোর অন্ধকার। ঠাকুর ঠাকুর...আজ আর রক্ষে নেই। যদি আরো একটু বড় করে হাত বাড়ান মা? আর একটা বোতল তুলে নিলেন হাতে? কিংবা আরেকটু নিচু হয়ে চোখ দুটো গুঁজে দিলেন ব্যাগের ভেতর? ফাঁকা পলিথিনের বোতল ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে ফাঁকা বাতাসেব টলটল বেলুন গোছের হালকা হলুদ তেলের বোতলটা। কিংবা হাত লেগে যেতে পারে কাগজের প্যাকেটে। এবার মরণ। মরণ রাধার। বুঝি কেঁদেই ফেলবে এরপর—শুধু আজ...আজকের দিনটা রক্ষে করো ঠাকুর...

'এগুলো নিয়ে তুই কি করিস বল তো।' বোতলটা হাতে নিয়ে ছোট করে হাসলেন কিরণময়ী—'কি কালী, তোমাদের গ্রামে এত এত শিশিবোতল দিয়ে কী হয়?'

'কী গ মা?'

'এই দেখো না, রাজ্যের যত খালি-বোতলফোতল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে রাধু। কী হয় এগুলো দিয়ে? খামোকা অ্যাদ্দুরে বয়ে নিয়ে যাওয়ারও তো একটা ধকল আছে।'

'সে-মা ছেলেমানুষ। কত কি করে ওরা। দেশের বাড়িতে গিয়ে বিলোয় একে ওকে তাকে। দশজনে নাম করে, সুখ্যাত হয়। দেশগাঁয়ে এত সব বাহাবি বোতল পাবে কোথায় লোকে? গরিব মানুষ...' কথা কইবার ইচ্ছে নেই। কইতে হয়। পর্দা সরিয়ে দরজার ওপাশে কালীধন দৃশ্যের বাইবে।

ব্যাগের ভেতর আবার মায়ের হাত। বুকের ওপর বাঘের নখের খাবলা রাধার। বোতলটা ব্যাগের ভেতর এলোমেলোভাবে গুঁজে দিলেন কিরণময়ী। কাঠ-কাঠ শুকনো

গলায় রাধা নিঃশ্বাস ফিরে পেল। অবিশ্বাস্য! আহ্ সাহেববাড়ি কত সুন্দর!

ব্যাগের চটেই তেলতেলে দুটো আঙুল ঘষে নিলেন কিরণময়ী—'যা, সাবধানে যাবি। ফিরবি কবে? আজ শনিবার। কাল রবিবাব থাকবি। সোমবার বিকেলে চলে আসবি। নইলে...'

'আসব গ মা, ঠিক ঠিক চলে আসব। সোমবার...সোমবার সকালে...' বেশি কথা বলাও বুঝি এখন কিছুটা ঝুঁকি। সীমান্ত-তল্লাশিতে পার পেয়ে গেলে চোরাইচালানের নিকৃষ্ট অপরাধী যেমন পরিত্রাণকেই ঈশ্বরের অপার করুণা মনে ভাবে, ঘাম দিয়ে জ্বর-ছাড়াব স্বস্তিতে রাধা সাজপোশাকের সবরকম বালাই ভুলে ঢাউস ব্যাগটা মাথায় তুলে এক লাফে, প্রায় ছুটতে ছুটতে, বেরিয়ে যেতে চাইল বাইরে।

নিষ্ক্রান্তিব আগে মা-ঠাকরুণের পায়ের ধুলো নিতে এগলো সত্যভূষণ।

'থাক বাপু, থাক...' কিরণময়ী হাত ছোঁয়ালেন মাথায়— 'এত এত বছর ধবে একেবারে ঘরের মানুষেব মতো হয়ে গিয়েছিল বে তোর বাবা। ছেড়ে দিতেও খাবাপ লাগছে। দেখিস, ওব চিকিচ্ছেটা যেন ভালো মতো হয়। খোঁজখবব দিস। কলকাতায় এলে দেখাসাক্ষাৎ করতে বলিস...'

সবিনয় মাথা নাড়ল সত্যভূষণ। জানে না, এঁদের ঘবে কেমন কবে কথা কইতে হয়।

'আব হ্যাঁ, ভালো কথা। রাধুর-মাকে বলবি, সোমবাবই যেন ওকে পাঠিয়ে দেয়। কারুব সঙ্গে পাঠানোব লোকজন যদি না পায়, তবে সুমতি যেন নিজেই এসে পৌঁছে দিয়ে যায় মেয়েকে...'

শিবোধার্য-ভঙ্গিতে ঘাড দুলিয়ে এগোল সত্যভূষণ। পরম স্বস্তি।

...ইত্যাদি সংলাপ কিছুই জানে না কালীধন। ভাঙা শরীবে ধুঁকতে ধুঁকতে রেলিং ধবে ধবে গড়িয়ে নামতে থাকে তলার দিকে। জীবনেব অনেক...অনেক বছব পব কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে। ধনী মানুষদেব কলকাতাকেই সে চিনে এসেছে এতকাল। ধনী মানুষের দুয়ার ডিঙিয়েই তার ঘবে ফিরে-যাওয়া। রুজি রোজগারের-মাটি এত বড় শহবে আপন-ঘর তাব ছিল না কোনোকালেই।

মজা, দারুণ মজা। সব্বোনেশে বোঝা বইছে বাধা, ফালতু মগজ বইবার দায় নেই তার। কোনটা তাব আসল ঘর, কোথায সত্যিকারেব দেশ, কে যে তার ঠিক-ঠিক মা...ইত্যাদি তালগোলের ব্যাপারস্যাপাবে মাথা ঘামানোয় তার ভারি বয়েই গেছে। বরং সে খুশি। বুকের ধুকপুকানি নিযে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে, সন্তর্পণে, বেবিয়ে আসতে পেরেছে বাইরে, সিঁড়ির গোড়ায়—যেখানে বড়সড় একটা কাঠেব র‍্যাকে থবে থবে সাজানো হাজার গণ্ডা জুতো সাহেববাড়ির। এক কোণে তার জন্যও একটা পুরনো ছ্যাড়ছ্যাড়ে চটি থেকে যায়। দ্রুত, অতি ব্যস্ততায় নিচু হয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়ে পায়ের জুতো হাতড়ায়।

জুতোর ভাঁড়ারে হাত পড়লেই বুকের ভাঁড়াবে কান্না জমে ওঠে। সেখানে দুঃখ অনেক বড়। এক জোড়া ভালো জুতো তার নেই। সিন্ডারেলার জুতো। যে-জুতোর মায়ায় রাজপুত্তুর বর পেয়ে গিয়েছিল সাহেব-দেশের দুঃখী মেয়ে। কোনো পাপ ছিল

না সে-মেয়ের। ফুলপরীব বর পেয়েছিল। কোনো বর পাবে না সে—রাধা জানে। পাপ করলে ঠাকুর রাগ করেন। তবু যে কেন এমনটা হয়ে যায় বারবার?

পাঁজিপুঁথির ঝঞ্ঝাট ছিল মায়ের তবফ থেকে। সতুদা মানেন নি। ববিবার সকালেই কী নাকি জরুরি কাজ আছে দেশেব বাড়িতে। বুড়ো বাপকে তাব আগেই ঘবে ফিবিয়ে নিয়ে যাবেন।

সুতরাং শনিবাবের বারবেলায় হাওড়া স্টেশনে লণ্ডভণ্ড গোছের তুমুল হট্টগোল ছিল। চারপাশ জুড়ে প্ল্যাটফর্মে-প্ল্যাটফর্মে লাখো-লাখো মানুষেব ভিড়— আপিশ-ফেবতা ডেইলি-প্যাসেঞ্জারবাবুদের সঙ্গে, হপ্তাশেষে শহর থেকে দেশেব বাড়িতে ফিবছেন যাঁরা, কিংবা নানান কাজেব হবেক মানুষ।

কর্ড-লাইনেব গাড়ি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছয়নি তখনও। শেষ মুহূর্তেও প্ল্যাটফর্মেব নম্বর বদলে যেতে পারে। ভেতরের দিকে যেতে চাইছে না কেউ। অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মকে একসঙ্গে নজবে বেখে প্রবেশ চত্বরেই যত জটলা। নানা দিকেব ভিন্ন ভিন্ন গাড়ির আসা-যাওযাব খবব চলছিল মাইকে। গাড়িব খবব না থাকলেই গান বাজছিল। শুনছে না কেউ। অথচ মাইকের দিকেই সকলের কান। কোনো ঘোষণার আগে অদ্ভুত একটা আওয়াজ হয়। গাড়ির খবব হলেই, যার যে-গাড়ি, সেই প্ল্যাটফর্মের দিকে বাকশোপ্যাঁটরা লটবহর টেনে চটজলদি ছুটতে হবে ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে বাচ্চাবুড়ো সবাইকে। সকলেব হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি ছুটোছুটিব সোরগোলে সতুদা যেখানে এনে দাঁড করালেন ওদেব, সেখানে কাছেপিঠে কোনো বেঞ্চি ছিল না। যদিও বা থাকে, এত এত মানুষেব হল্লায় ফাঁকা থাকার কথাও নয়। ওপাশে একটা থামেব চাবপাশ ঘিরে মস্ত মস্ত কাঠের বাকশো কতগুলো। ঠাঁই নেই। অনেক আগেই দখল নিয়ে ফেলেছে লোকজন। হাবিজাবি ছুটছাট সব মালপত্তরেব ওপর নজর রেখে বুড়ো কালীজেঠুকে নিয়ে বাধা হাঁপিযে উঠল। দুচ্ছাই, ভিড়ের মধ্যে ওদের একা ফেলে রেখে সতুদা যে হুট কবে কোথায ডুব দিলো। বিড়িসিগ্রেট টানতেই বোধহয়। বাধাব বাগ হলো। ছটফটানি বাড়ে।

ভিড় আর হট্টগোলে আব দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না কালীধন। শুধু তো প্রায়ান্ধ চোখজোড়াই নয়। গত চল্লিশ বছবের নগববাসে মেসবাড়ির একটা ঘবে লটবহবেব মাত্রাও কম জমে ওঠেনি খুব। বস্তাবন্দি হাঁড়িকুড়ি, ভাঙাচোবা টিনেব সুটকেশ, দড়িবাঁধা পাটিসাপটা গোছেব একটা বিছানা, ব্যাশনব্যাগ-ভর্তি সাতসতের জিনিসপত্তর সব নিয়েই শহরের পাট চুকিযে দেশে ফিবতে হচ্ছে তাকে। বাকশোপ্যাঁটরা-বিছানার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে মেঝেয়। ঘোলাটে চশমায় ছানির চোখে দৃষ্টি এগোয় না বেশিদূর। ঘাড় উঁচিয়ে নজর রাখতে হয মেযেটার ওপবও। এ-মেযে বড্ড খলবলায়।

'কী কবছিস ব্যা তুই? দাঁড়িযে রয়েছিস কেনে?'

'সতুদা কোথায গেলেন, বলো দিকিন। যদি গাড়িব খপর হযে যায এক্ষুনি?'

'যাবে আর কোথায়? আছে ইদিক-উদিক। এসে যাবে ঠিক সমে। সে-তোকে ভাবতে হবে নি...' পাশেই পুটলিবাঁধা বিছানাব গা ঘেঁষে দু-দুটো ঢাউশ ব্যাশনব্যাগেব

ভার। কাঁপা-কাঁপা হাতে ব্যাগ দুটোকে সরানোর চেষ্টায় কালীধন—'তুই আয়, আয় দেখি ইদিকে। বোস ইদিকটায়...'

রাধা ঝলকে উঠল—' ওটুকুন জায়গায় তুমিই বোসো না কেনে গ শান্তি করে। আমি আছি। এই ত দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমার কাছ ঘেঁষে...'

রাধা দাঁড়িয়ে থাকে। তার দাঁড়িয়ে থাকাই আসলে দুরন্ত ছুটোছুটি হয়ে ওঠে এক ধরনের। স্থির পায়ে ঘাড় উঁচিয়ে রেখে শাদা চোখের কালো মণিদুটো ফড়ফড়ে ছোট প্রজাপতির মতো যেভাবে ছুটছে এদিক-ওদিক, চোখের চঞ্চলতাই গোটা শরীরের হাড়মাস কাঁপিয়ে তার এক অশান্ত বিচরণ। হাজারগণ্ডা কত যে মানুষ এখন তার চারপাশে। সকলেই পড়িমরি দৌড়চ্ছে গাড়ির জন্য, নয়তো দাঁড়িয়ে পড়ছে জটলায়। ভিড়ের মানুষ ভিড়েই হারিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে ধরে রাখা যায় না চোখের পাতায়। বাবা-বাবা গোছের বুড়োধামড়া লোকগুলো সবাই কালীজেঠুর মতো। খিটখিটে বিচ্ছিরি। অল্পবয়সী তাজা জোয়ানমরদ ব্যাটাছেলেরা কেমন বদখত চাষাড়ে চোয়াড়েই বেশি। চেকনাইপ্যান্টশার্টে চুলের বাহারে দু-চারজন খুব ভালো। রাধা গোনে। গুনতে থাকে—এক দুই তিন...তারও চেয়ে বয়সে খানিকটা বড় কিংবা অনেকটাই বড়, যেসব ভদ্দরঘরের মেয়েরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বা বুকে বই আঁকড়ে ভিড় ঠেলে যাচ্ছে আসছে, একসঙ্গে দল বেঁধে কয়েকজন অথবা একা, বুকেপাছায়-মাংস-নেই রোগাপটকা নয়তো নরম নরম মাংসের বস্তা থলথল ধুমসি, ফর্সা বা কালো, লম্বা বেঁটে। বয়েজ কাট চুলের ফ্যাশনও সে দেখল একজনের। হরেক রঙের শালোয়ার কামিজ ওড়নায় প্রায় সকলেই। মাঝেমধ্যে শাড়িও দু-চারজনের। ইশকুল কলেজে পড়ে বোধ হয়। ছুটির পর ঘরে ফিরছে। কাউকেই খুব একটা সুন্দরী মনে হলো না তার। ওরা ঘামে কেন এত? ঘামলেই বোঝা যায় বাপের পয়সা নেই।

পয়সার গুমর জানে রাধা। সে-ই শুধু ভিড়ের মানুষ দেখে যাচ্ছে, তা নয়। জনতার চোখে সে নিজেও থেকে যায়। আশেপাশের মানুষজন—নানা বয়সের ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে সকলেই পাশ কেটে যেতে যেতে পলক ছুঁড়ে ছুঁড়ে যাচ্ছে তার দিকে। ছুঁড়বেই—সে জানে। হাজার-টাকা দামের এমন রংদার চাইনিজ-সিলকের শালোয়ার কামিজ হাটের ভিড়ে পাওয়া যায় কখনও? বুক জুড়ে সবুজ রেশমী সুতোর নকশায় চুমকির ঝলমল। অনেক টাকা দামের স্নো ক্রিম পাউডার রুজ কাজল আইল্যাশ বিন্দি বা মাথায় অনেক মেহনতের যত্নআত্তির চুল। তার বয়সী মেয়েরা এমন সাজগোজে একা-একা রাস্তায় চলে-ফেরে না কেউ। বাপ মায়ের সঙ্গে ছায়ায় ছায়ায় থাকে। এবং সাহেববাড়ির বাইরে এমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা তার নিজেরও খুব বেশি নয় বলেই হয়তো, আজ, বারোয়ারি হাটের হল্লায় ন্যাদা পটলা গদাই বা খেঁদি পেঁচিদের দেখে সে টগবগিয়ে উঠল।

ইস্। কী বেহায়া, কী গায়ে-পড়া ঝগড়ুটে মেয়েছেলে গ! রাধার রাগ হলো। খুবই কাছাকাছি দিদি-গোছের গোটা কয়েক কলেজে-পড়া মেয়ে ওরই দিকে তাকিয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে কী বলাবলি করছে ওরা! এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিংবা আশেপাশে আরো দু-চারজনের ভ্রূকুটিতে কেমন একটু বেখাপ্পা চাউনি দেখল রাধা।

গায়ের জ্বলুনিতে সহসা ঝনঝনিয়ে উঠল মাথাটা। বুঝি এক্ষুনি, যা থাকে কপালে যুৎসই একটা জবাব দিতে হবে সবাইকে। ধমক মেরে শালোয়ার কামিজের দিদিদের দিকে তাকিয়ে, কী মনে হলো, সে তার হাতের ছোট ব্যাগটা খুলে ফেলল ঝটাপট। সতুদা ফেরেনি এখনও। কালীজেঠু তো দেখতেই পায় না কিছু। একা-একা যা-খুশি সে করতে পারে এখন। কালো চশমাটা চোখে এঁটে নেবে কিনা, ভাবল একবার। কিন্তু তার আগেই কাগজের মোড়কে বাঁধা চোখ-চমকানো হারটা বের করে, মোড়কটা ছিঁড়েখুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গলায় পরে নিতে চাইল। হীরে-চুনির লকেটটা বুকের খোলামেলায় ঝুলিয়ে সরু স্টিলের চেনটা দু'দিক থেকে দু-হাতের আঙুলে ধরে টেনে নিতে হয় পেছনে। এলোচুলের তলায়, সাবেকি 'এস' নয়, কায়দার আংটা এঁটে নিতে সময় লাগে একটু এবং যেহেতু ঘাড়টা নিচু বাখতেই হয় এ-সময়, নিচু মাথায় আড়চোখে সে দেখে নিতে চাইল হিংসুটে মেয়েগুলোকে। থ মেরে গেছে। টকটকে পাকা করমচার রঙে লাল পাথর, তাকে ঘিরে এতগুলো হীরের চমকানি! এত বড় ইস্টিশনের লাখো লাখো মানুষের নজর লুটতে পাবে সে এখন।

হায় রে কপাল। চোখ-টাটানি মেয়েগুলোকে একবার দেখে নেবার সাধ ছিল বড়। হলো না। সবই বরাতদোষ।

কোথাকার কোন্ এক ডাউন ট্রেন এসে ভিড়েছে ইস্টিশনে। আরো একটা ঢুকছে ভেতরে। মাইকে বাংলায় হিন্দীতে ইংরেজিতে ঘোষণা চলছে। দারুণ ভিড়। গাড়ি চেপে এসেছেন যাঁরা কিংবা যাঁরা গাড়িতে উঠবেন, মুখোমুখি হুড়মুড়িতে পথ পাচ্ছেন না কেউই। বুকে বুকে ধাক্কা, ধস্তাধস্তি চিৎকার। এরই মধ্যে মোট বয়ে লাল জামার কুলি। পুরো চাপ এসে পড়ছে সামনের দিকে। শান্তভাবে গায়ে-গা-ঘেঁষে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে যাবা, আরো বেশি মানুষ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে ঘাড়ের ওপর। এবং রাধা তখনই সচকিত ত্রস্ততায়, শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে নয়, অসুস্থ কালীজেঠুকে আড়াল দিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। বুড়োকে দু-হাতে আগলে রেখে মালপত্তরগুলো চোখের নজরে সামলানোর দায়। রাগ হচ্ছে সতুদার ওপর। একটা আক্কেল নেই মানুষটার? বিড়ি-সিগ্রেট টানতে এতক্ষণ? কত আর লম্বা হয় একটা সিগ্রেট?

ভিড়ের চাপে এটুকুন মেয়ে রাধা যখন একেবারেই নাজেহাল, আঁতকে উঠল। তুলকালাম হল্লা-চিৎকারের মধ্যেই কোত্থেকে এসে জোয়ান-মরদ একটা ছেলে ওরই ওপর সরাসরি চোখ রেখে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। চেনা-চেনা মনে হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি চেনে না, জানে না যে-লোকটাকে, সে যদি একটা মেয়েকে একা বুঝে গায়ে পড়ে হ্যাংলামো শুরু করে, সতর্ক হতেই হয়। তাজা বয়সের জোয়ান ছেলে! কোনো বিশ্বাস আছে এদের? খুবই বদ হয় এমনধারা লোকগুলো। চোর-ছিনতাইয়ের পাট্টিও হতে পারে। মেয়েমানুষের গন্ধ পেলেই ওদের এ-রকম হাজারটা ফক্কড়ি বেড়ে যায় রাস্তাঘাটে। তার চেয়ে বড় তো বটেই। কত আর হবে বয়স? আঠার উনিশ? সাহেববাড়ির দাদাবাবুর চাইতে একটু কম বা বেশি। এক-কুড়ি পেরোয় নি নির্ঘাৎ। কিংবা সে নিজেই হয়তো ব্যাটাছেলেদের বয়সের আন্দাজ বোঝে না ঠিক-ঠিক। কিন্তু এই উঠতি বয়সটাকে

চেনে। নিজের মাপে মাপে ব্যাটাছেলেদের এই বয়সকে। রাস্তাঘাটে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়।

কিন্তু এ-রকম অবস্থায় কীভাবে কী করতে হয়, জানা নেই বলেই দিশেহারা রাধা তেরচা চোখে লোকটার ওপর নজর স্থির রাখে। ওপাশেও ঘন ঘন ভ্রূ-কাঁপানো বাঁকা চোখের চাউনির সরাসরি সংঘাতে, হালকা বাতাসে কাশফুলের কাঁপুনি উঠলে যেমন হয়, রাধার বুকের ঝমঝমে বিবিধ প্রতিক্রিয়া। মাত্র হাত খানেকের ফারাকে আছে আদেখলা লোকটা। কী সাহস? দাঁতে ঠোঁট চেপে, মাথার চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে শক্ত থাকার চেষ্টা সে-মেয়ের। ঘাড় সোজা রেখে আরো একটু গোছগাছে বুকের ওড়না ঠিক করে নিয়ে থোড়াকেয়ার ভঙ্গি। খুব যদি বাড়াবাড়ি করে, চিৎকার চেঁচামেচিতে তোলপাড় তুলে দেবে। চারপাশে গিজগিজ করছে মানুষ। মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে বজ্জাত। শখ করে মেয়েমানুষের গা চাটতে এলে এমনটাই হয়। এমনটাই হওয়া দরকার।

অবাক কাণ্ড। ফুটপাতে কেনা রদ্দিমাল একটা জিনসের প্যান্ট, বুক-খোলা লাল জামা, গলায় কোন্ ঠাকুরের লকেট-ঝোলানো চেন, মাথাভর্তি খরখরে ঝাঁকড়া চুলের বাহার। টানটান দুটো হাতের পাতায় দুটো হাঁটুর মালাইচাকি খাবলে ধরতেই পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে আসে অনেকটাই এবং লোকটার মুণ্ডু নিচু হয়ে একেবারে কালীজেঠুর ঘাড়ের ওপর—'কী? অ কাকা, আপনি এখেনে?'

নিজেকে নিয়ে নাজেহাল কালীধন বেহুঁশ বসে ছিল চুপচাপ। হঠাৎ নাড়া খেয়ে গলা উঁচিয়ে তাকাল। কপালে ডান হাতে চার আঙুলের ঝাঁপ তুলে আড়াল দিতে চাইল ঘোলাটে চশমাকে—'কে? কে তুমি? কী বলছ?

'আমি শিবু। বিষ্টু দেওয়ানের মেজ ছেলে।'

'বিষ্টু দেওয়ান? কে বিষ্টু? কোথায় ঘর?'

কাকের মতোই ঘন ঘন চোখের গুলতি দুটো পাক খাচ্ছে লোকটার। তেরচা চোখ রাধার দিকে। এবং রাধা ব্যাগ খুলে কালো চশমাটা পরে নিয়েছে চটপট। গুলতি যদি চোখেরই খেলা, বাড়তি সুবিধে তার—আবরু পেয়ে গেছে তার অক্ষিযুগল।

এবং সেই ছেলে খেলতে নেমে খেলার মজায় দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে খেলাটাকেই আরো একটু জমিয়ে তুলতে চাইল। বুড়োর দিকে মনোযোগ—'কানাই দেওয়ানকে চেনেন ত গ? খাড়ুয়ার কানাই দেওয়ান?'

'অঁ কানাই? খড়োর কানু?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জ্যাঠা...'

'অঁ...' গাঢ়তর কোনো উত্তাপ নেই কালীধনের। নিশ্চিতই বিরক্ত। অনেকক্ষণ এক-ঠায় বসে থাকায় পাছায়-হাঁটুতে টনটননিও বোধ হয়। বাঁ-হাতে বাকশোবিছানার ওপর ভর রেখে ডান হাতের তেলোয় মাজার ব্যথাবেদনা সামলে কাৎরে কুৎরে উঠে দাঁড়াতে চাইল। বিদেশবিভুঁইয়ে ঘরের ছেলেকে পেয়েও, বুঝি নিষ্প্রয়োজনের কেউ, বাড়তি কোনো আমল দেবারও দায় নেই। আলতো করে চোখ উঁচোল—'তা তুই এখেনে কোথায় এয়েছিস?'

'আমি ত কাজ করি গ কাকা। কলকাতায় নিত্যি আসতে হয়।'

'কাজ?' কালীধন, নিরুৎসুক ঔদাসীন্যে—'কী কাজ করিস তুই? কোথায়?

'উল্টোডাঙ্গার খালপারে এট্রা কারখানায় লেদের কাজ শিখছি এখনে। মাস পাঁচেক শুরু করেছি সবে। অ্যাপেনটিস্...'

অনাবশ্যক দৃকপাত ফুরোয়। ঘামে-গরমে তিতিবিরক্ত কালীধন তাঁর বাঁ-হাতের কব্জিটাকে প্রায় নাকের ডগায় তুলে এনে ড্যাবডেবে দুটো চশমার কাচে সময়ের কাঁটা গুনতে চাইল। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে লাউডস্পিকারে কত গাড়ির যাওয়া-আসার খবর। অথচ চারটে বেজে গেছে মনে হয়। পনের বা কুড়ির ঘরে কোথাও আছে মিনিটের কাঁটাটা। চারটে-আঠারই তো গাড়ির সময়। ঘাড় উঁচিয়ে আশেপাশে খুঁজল কাউকে। শুধু কালো-কালো মানুষের মাথা আর হল্লাচিৎকার। সতুও যে কোথায় গেল এ-সময়েই। এখনও ফিরছে না কেন? বড্ড বেয়াড়া আজকালকার ছেলেছোকরাগুলো।

এপাশে দুটো-দুটো-চারটে গুলতির খেলা, আসলে চোখের খেলা বড় মজার নেশা, ভয়ের খেলা। খেলাটা চলতে থাকে। কানামাছি-খেলায় চোখ বেঁধেছে রাধা। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে হবে কাউকে। ধরবে যাকে, চোর হবে সে। কানামাছির বাঁধনটাই অদ্ভুত। এত বড় ইস্টিশনের পাহাড়-উঁচু সেডের তলায় রোদ্দুর নেই ছিটেফোঁটা। সেডের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু আকাশ—বিকেলের রঙে আর টিউববাতির আলোয় আলোয় ছয়লাপ প্ল্যাটফর্মগুলো। রঙিন চশমায় কেমন চাঁদনি রাতের জ্যোৎস্নায় ঝাপসা হয়ে ওঠে চারদিক। চেনা যায় না কাছের মানুষজনকেও।

এবং অচেনা মানুষ সেই ছেলে মাংসপেশীতে খুব একটা সবল না হলেও তেজী জোয়ান বয়সের হাড়েপাঁজরায় কী যে ছাই গা-ছমছম সোহাগী ভয় ওদের? আরে ছ্যা, এই নাকি ব্যাটাছেলে? এটুকুন কলজের জোর? রাধা বুঝতে পারে, বুড়ো কালী জেঠুকে ছেড়ে এবার আরেক অস্বস্তিতে মরছে লোকটা। চোখ মেলে তাকানো যায় না যেদিকে, চোখ টানে সেদিকেই। এত কাছাকাছি, প্রায় নাগালের মধ্যে এমন রংদার পোশাকের জেল্লা আর রূপের রোশনি, চিত্তির-আঁকা জামায় হীরেমুক্তোর ঝলকানি, লাল পাথর—বুঝি খোয়াব দেখছে গেঁয়ো ভূত। এক জোড়া চোখের পিপাসায় এমন জ্যান্ত ফুলকন্যা দেখেছে নাকি কোনোকালে? এবং রাধা, নিজেকে ফুলকন্যা জেনেই,হ্যাংলার দিকে ভুরু-উঁচনো উপেক্ষায় গা-গতরে আরো বেশি ঢেউ কাঁপায়। একটু ডান কাত করে ঘাড় ফিরিয়ে থাকে সোজাসুজি। কালো চশমায় আরেক রংবাজি—চোখ টেরিয়ে আছে কোন্ দিকে, ঠাহরই পায় না বোকাহাবা।

টরে টরে ছিল রাধা। তীক্ষ্ণ নজর ছিল। বেড়ালের মতো। খড়ুয়ার কে কোন বিষ্টু দেওয়ান না কানাই দেওয়ান? কার ব্যাটা না ভাইপো। কী যেন বলল সব? আসলে কোনো মানেই নেই কথাগুলোর। খেড়ো দাঁড়গাছির লাগোয়া গাঁ। পাকা সড়ক থেকে মোরাম বাঁধা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে খোড়ো পেরিয়েই নিজের গাঁয়ে পৌঁছতে হয় তাকে। দেশছাড়া হয়ে মা-ভাইয়ের টানে বছরে বার দুই-তিন সে দেশগাঁয়ে আসে ঠিকই। সে-ও দু-চার পাঁচ দিন, বড় জোর হপ্তা খানেকের জন্য। আশেপাশের গাঁয়ে কে কোথায় থাকে, কারা বড় হয়ে উঠছে তার সঙ্গে, সে চেনে না কাউকেই। স্বজাতি পড়শিদের বাইরে নিজের গাঁয়ের মানুষদেরও জানে না ভালো করে। সুতরাং ইস্টিশনের

ভিড়ে হঠাৎ এসে গায়ে পড়ে হ্যাংলামো করছে যে-লোকটা, যতই গাঁয়ের ছেলে হোক, চেনাজানা কেউ তো নয়। সত্যি অচেনা।

বয়সে বড়, ঢ্যাঙামতো জোয়ানমরদ। তার যদি এমন দশা! বড়শিতে বিঁধলে, যত বড় ঘাইমারা আর লেজঝাপটানিই হোক, ছিপ ফেলে পালায় না কেউ। খেলতেই হয়। খেলার নিয়ম।

হাতের শৌখিন ছোট ব্যাগটা দাঁতে কামড়ে খানিকটা অকারণে হাত দুটো উঠে যায় ওপরের দিকে। হাত দুটো ওপরে উঠলেই হালকা ওড়না গলায় এসে দলা পাকিয়ে যেতে চায় কিংবা এভাবে দলা পাকানোকেই প্রশ্রয় দেয় রাধা। বুকটা উদোম থাকলে হীরেচুনির লকেট বা রংচিত্তিরের চুমকি আরো বেশি ধন্ধ দিতে পারে। দুটো হাত উঁচিয়ে তুললে কিছু একটা করতে হবে বলেই চুলের কাঁটাগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে হয়। হেয়ার-ব্যান্ডটা গুঁজে দিতে হয় আরো একটু। পিঠের শিরদাঁড়ায় টান লাগে। গা-গতরে টান পড়লেই চিতিয়ে ওঠে বুকটা। হাত দুটো মাথার ওপর দু-পাশে খেলে বেড়ায়। খেলানোর সুখ। কী একটা বিদঘুটে খেয়াল চাপল মাথায়! ঠোঁটের হাঁ নিয়ে ড্যালাড্যালা ল্যালঠা চোখে তাকিয়ে ছিল লোকটা। এক ঝটকায় কালো চশমাটা টেনে তুলে নিলো। চোরাগোপ্তা চাউনি থেকে আচমকা চোখে চোখ পড়ে যাবার ধাক্কায় টালমাটাল ঢ্যাঙা মরদ একেবারেই বেসামাল।

রাধার হাসি পেল। আহা রে, ঘাবড়ে গেছে বেচারি। হেরে গেল। ভ্রূকুটিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে দুয়ো দেবার ভঙ্গি মরদের বেহায়া আদিখ্যেতাকে।

গুটিগুটি সরে গিয়ে ওপাশে মানুষজনের ভিড়ে লোকটা ঢাকাচাপা খুঁজছে নিজের। সত্যি গেঁয়ো। একটা আস্ত গেঁয়ো ভূত। নাক মুখ চোখ কান ঢাকলেই কি নিজেকে আড়াল দেওয়া হলো? কালো চশমা নামিয়ে, বরং দূর থেকে শাদা চোখে আরো সোজাসুজি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রাধা। খুব একটা কেলো কুচ্ছিত নয় তেমন। একটু-আধটু ফর্সাই তো গায়ের রং! পালোয়ান না হোক, শরীরস্বাস্থ্যে তাকত আছে বেশ। কিন্তু হলে হবে কী? লোকটাকে একদম ভালো লাগছে না তার। বড্ড গেঁয়ো-গেঁয়ো। হালকা দাড়িগোফে কোনো ছাঁটকাট নেই। নাকটা থ্যাবড়া। ঠোঁট দুটো ভারি ভারি মাংসের ডেলা। বড্ড নোংরা। বিচ্ছিরি। বদখত জামাপ্যান্ট। ইস্তিরিফিস্তিরির বালাই নেই। ঘামছে। ঘেমো গায়ে সাতজন্মে কোনোদিন সাবান পড়েছে কিনা, ভগায় জানে। জীবনে শ্যাম্পু-ব্রিলক্রিমের নাম শোনে নি, এদিকে মাথা ভর্তি ধড়াচুড়ায় বাহারের ফিল্‌মি ছাঁট বাবুর! চাষাড়ে-চাষাড়ে চোয়াড়ে চেহারায় জামার বোতাম খুলে সিনা দেখাবি আর স্টিলের চেন গলায় ঝুলিয়ে হেককর মারবি—এতই যদি মরদ, ভয়ে পালাস কেন রে ইঁদুরের মতো? আসলে বোকা, হদ্দ বোকা। একেবারে গেঁয়ো চাষা।

বুঝি ওর ঘেমো গায়ের গন্ধ এসে নাকে লাগছে। এ-খেলার যা নিয়ম, কপট ভানে তাচ্ছিল্যের ঝাপট। হাঁদারামকে আরো একটু খেলিয়ে নিতে রাধা অন্য দিকে ঘাড় ফেরাল, যেখানে ইস্টিশনের বিশাল কোলাহলের চত্বরে কত কী দেখার থাকে। ডানেবাঁয়ে সামনে-পেছনে চারদিকে হরেক রঙের হরেক কথার কত যে ছবি আর লেখালেখি! ঝোলানো সাইনবোর্ড নয়তো আঠায় সেঁটে-দেওয়া পোস্টার। রাধা জানে,

এগুলো বিজ্ঞাপন। বাজারের ভালো-ভালো সব জিনিস কে কোথায় কেনাকাটা করবে, তার হদিশ। পড়ালেখা জানে না সে। কিন্তু ছবি চেনে। নতুন নতুন সিনেমার পোস্টার। বড় বড় বোর্ডে বড় বড় আর্টিসদের মুখ —অমিতাভ বচ্চন, জিতেন্দ্র, ধর্মেন্দ্র, শাহ্‌রুখ,, সলমন, আমির খান, হেমা, শ্রীদেবী, মাধুরী দীক্ষিত, জুহি চাওলা, প্রসেনজিৎ, দেবশ্রী, সৌমিত্র, অপর্ণা, তাপস পাল...অঙ্গে অঙ্গে ঢেউ ওঠে ঢেউ কাঁপে ঢেউ আছড়ায়। ছবিগুলো যাঁদের, সবাইকে চেনে রাধা। সকলের নাম জানে ধাম জানে চলনবলন হাঁটাচলা হাসিকান্না লাফঝাঁপ সব জানে আপন-মানুষকে জানার মতোই। কালো চশমাটা সে আরো একবার টেনে উপড়ে ফেলল চোখ থেকে। শাদা চোখেই দেখতে সুখ এবং চঞ্চল শিহরনে এপাশে ওপাশে চারপাশে আরো...আবো মুখ খোঁজে। আপনজনের চেনামুখ। একটু দূরেই ভিড়ের হল্লায় অচেনা মুখের মানুষটা জ্যান্ত। বড্ড-বোকা। রঙে রঙে পোস্টারে পোস্টারে চেনা মুখগুলি সবই ছবি। ভীষণ সুন্দর। কাছাকাছি একটা পোস্টারের দিকে তাকিয়ে থেকে রাধা অদ্ভুত একটা মজা আবিষ্কার করে ফেলল—যেদিকে দাঁড়াও, যেভাবে তাকাও, মনে হবে ছবির-মানুষও তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। ডানে-বাঁয়ে সরে গেলেও ছবির চোখ দেখবে তোমাকেই। মজা লাগে বেশ।

আবার রাগও হয়। ওপাশে ভ্যাবল গঙ্গারাম একটু তাকাতেও পারছে না সাহস করে? ছবির মানুষ সত্যি, না সত্যি-মানুষটা মিথ্যে? মিথ্যে-মানুষটা সত্যি হয়ে উঠলে রাধা নিজেই বুঝি কোনো এক ছবি হয়ে উঠতে পারে। কাঙালের চোখে যদি তাকেও এমন করে চাটতে চায় কেউ?

সুখের কলস ভরে ওঠে কানায়-কানায়। সাহেববাড়ির মেয়ে বলেই রাধা তার একরত্তি বয়সে সাহেববাড়ির বাইরেও আলাদা একটা জগৎ পেয়ে যায়, যে-জগতে জানতে হয় অনেক কিছু। শিখতে হয়, বুঝতে হয়। গেঁয়ো ভূতগুলো সেসবের নাগাল পাবে কোথায়?

কিন্তু খুশির বিভোরে ধাক্কা লাগে। আচমকাই হুড়মুড়ানি ঝাঁপিয়ে নামল ঘাড়ের ওপর। কোথায় ছিল সত্যভূষণ। ছুটে এসেই মালপত্তর নিয়ে টানাটানিতে হুটপাট হুটপাট—'চ' 'চ' গাড়ির খবর হয়ে গেছে। পাঁচ নম্বর, পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরম...'

এবং সেই ছেলে, বিষ্টু দেওয়ানের ব্যাটা এগিয়ে এল কাছে—'এ-গাড়িতে যাবে কী করে গ সত্‌দা? দেখছ নি কী ভিড়? মান্‌ষের মাথা মান্‌ষে খায়...'

সত্যভূষণ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স, কিছুটা রাশভারি মানুষ। হঠাৎ বিপাকে একজন গাঁয়ের ছেলেকে পেয়ে খুশি—'কে শিবে? তুই...তুই কোত্থেকে র‍্যা?'

'ঘরে ফিরছি গ। এখেন দিয়ে যেতে দেখলুম, কাকা বসে আছেন।'

'ভালো হল...,' সত্যভূষণ হাতে-হাতে জিনিসপত্তর তুলে নিতে ব্যস্ত—'আরে, এজন্যেই না গাঁয়ের মানুষ কাউকে খুঁজতে গিছলুম প্ল্যাটফরমে। খুঁজে খুঁজে আলা। পেলুম নি কারুক্কে। নে নে, এখনে ধর দিনি এট্টু। এট্টা সিট ত চাই বাবার জন্যি...'

'আমার জন্যি ভাবতে হবে নি তোদেরকে। এগো, এগো দিকিন তোরা...' ফালতু কথাবার্তার সময় নেই। কালীধন তার প্রায়ান্ধ চোখে সম্মুখবর্তী ঝাপসায় দুটো হাত শূন্যে কাঁপিয়ে, অনেকটাই পুকুরের গলা-জলে ডুব দেবার আগে পানাশ্যাওলা সরাবার

ভঙ্গি, নিজেই এগোবার উদ্যোগ নিয়েছে— 'হপ্তার গাড়ি। ভিড় ত হবেই র‍্যা একটু। সে-আর কী করা যাবে? ডানকুনি জনাইয়ের পব খানিকটা ফাঁকা হয়ে যাবে। সে-আর কদ্দুর? চ চ,' পা বাড়া। রেডিওটা দেখিস। ওটা ফেলে যাবি নি যেন। তুই...তুই এটা হাতে-হাতে বাখ দেখি মা...'

চার-ব্যাটারিব একটা ট্রানজিস্টার ছিল কালীজেঠুর। মেসবাড়ির ঘরে, অবসরে, একমাত্র আদরের ধন। বাধাব হাতে উঠে এল সেটা। কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না তার। ববং ভালো, খুব ভালো। যদিও তার পেটমোটা 'বিগ শপাব' মস্ত ব্যাগটা নিজেই কাঁধে তুলে নিযে ধন্য হয়েছে সেই লোকটা। বিষ্টু দেওয়ানের ব্যাটা। যদিও জানে না কার ব্যাগ!

মালপত্র সব হাতে-হাতে নিয়ে যখন পা বাড়িয়েছে সবাই, একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রাধা, পেছনের দিকে তাকিয়ে অসভ্যেব মতো হঠাৎ ফ্যাঁচ কবে উঠল সত্যভূষণ —'এ-ত এক ভালো জ্বালা হল র‍্যা তোকে নিযে। কী কতগুলো রঙচঙ মেখে এযেছিস, তাতে হল নি? মেমসায়েবি ফলাতে চোখে ফের ঠুলি এঁটেছিস কী বলে? কাকে দেখাচ্ছিস ব্যা তোর গগলস্? অ্যাঁ! খোল্, নামা। খুলে হাতে বাখ। আমরা মবছি শালা এই ভিড়ে এগবো কি করে, তাই নিয়ে...'

আচমকা দাঁত-ঝাড়ানিতে জ্বালা বাধাবও। গা-গতব পুড়িয়ে হঠাৎ জলবিচুটির জ্বালা। কী অসভ্য লোক বাবা! গলা ফুলিযে ভ্রুকুটিতে তাকাবে একবার—অবকাশ নেই। ওরা এগোতে শুরু কবেছে। দাঁত কিড়মিড় বাগেব জ্বলুনি নিয়েই তাকে পা ফেলতে হয়। ওই লোকটা! বিষ্টু দেওযান না কে, তাঁব ব্যাটা! কী যেন নাম? শিবে? শিবু? শিবে বলেই তো তখন ডাকল সতুদা? লোকটাব সামনে এমন বেইজ্জৎ হবাব দুর্গতি তাকে লজ্জা দেয না, দুঃখু দেয না, কাঁড়িকাঁড়ি রাগ দেয। এবং সেই তিরিক্ষি ঝাঁঝে তাকায় সতুদার দিকে। বয়সে অনেক বড়। প্রায ডবলেবও বেশি। কিন্তু হলে হবে কী। জ্ঞানগম্যি আছে কিছু? ইশকুলের পাশও নাকি দিয়েছে একটা-দুটো। এই নাকি পড়ালেখা গ? এ-কোথাকাব গাঁইয়া ভূত? গগলস বলে কালো চশমাকে? সানগেলাশেব নাম শুনেছে জীবনে? জানে এর দাম কত?

ভিড় ঠেলে কালীজেঠুকে নিয়ে এগোবার পথে যখন প্রতি মুহূর্তেই গায়ে গায়ে ধাক্কায় ঠেলাঠেলি-গুঁতোগুঁতিতে খেঁকুড়ে মানুষের জঙ্গলে কেউ কারুর জন্যে নয— ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে বাচ্চা-বুড়ো কাউকেই বেযাত কবছে না কেউ, বঙিন চশমায় বিপদই থেকে যায় খানিকটা। রাধা চশমাটা সত্যি-সত্যি খুলে ফেলল। বেয়াড়া জ্বালাপোড়ানি পাযে পাযে লেপটে থাকে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। কালীজেঠু বিদায় হলে সাহেববাড়িতে সে একা থেকে যাবে—এ-বকমই কথা আছে। সতুদা ঢুকে পড়তে চাইছে সেখানে। গাড়ি চালাতে শেখেনি, বড়সড় কিছু পাশ দেয়নি। আপিশের কাজ চায়। সাহেবকে ধরে লোকটা কলকাতায় চাকরি বাগায় কি করে, সেও দেখে নেবে। ফুটোর অভাব নেই চালুনিতে। দেশগাঁ থেকে ঘুরে গেলে তেমন দু-চারটে ফুটোফাটার কথা সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই পারে। সুবিধেমতো ঢেলে দেবে মাযেব কানে।

এক সঙ্গে সবাই যদি ঠাঁই পেতে চায় একই জায়গায়, মানুষগুলো কী কুচ্ছিত জানোয়ার বনে যায় গো!

রাধা দিশেহারা। পাহাড়-উঁচু বিশাল ছাদের তলায় রঙচঙে মস্ত লম্বা প্ল্যাটফর্মের দু-পাশে দুটো লোকাল গাড়ি, যেন দুটো বাক্সে পোকা মরে পড়ে আছে নিঝুম। কাতারে কাতারে মানুষ। বাছবিচার নেই, মায়াদয়া নেই, হল্লাচিৎকারে মানুষগুলো সকলেই পিঁপড়ে হয়ে গেছে। অগুনতি পিঁপড়ের ঝাঁক। বুঝি এরাই দল বেঁধে গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যাবে। যে যেখানে পারছে, ঢুকে পড়তে চাইছে। ধীরেসুস্থে আরামে বসে যাবার জন্যে সবারই আসন চাই একটা করে। সিট না পেলে পাখার তলায় দাঁড়াবার মতো একচিলতে জমির লড়াই। ভিড় উপচে পড়লে বিপজ্জনক ভাবে দরজায় ঝুলে ঝুলে যেতেও রাজি অনেকেই। এ-হেন প্রতিযোগিতায়, প্রতিটি দরজায় দরজায় মেয়েছেলে আর বাচ্চারা নাস্তানাবুদ। কান্নাকাটিও জুড়ে দিয়েছে কেউ কেউ। সঙ্গী ব্যাটাছেলেরা নাজেহাল। হাঁসফাসে বুকের তরাস। খিস্তিখাস্তা গালাগাল চিৎকার। বুঝি মারদাঙ্গাই লেগে যাবে একটা। রাধা জানে, ওর জন্যে আলাদা করে ভাববে না কেউ। দু'হাতে পোঁটলাপুটলি টিনের-বাকশো আর বগলে ছাতা নিয়ে কালীজেঠুর জন্যে একশা সতুদা। শার্টপ্যান্ট মাথার-চুল লণ্ডভণ্ড, জ্যাবজেবে ঘামে নাভিশ্বাস। রাধা কালীজেঠুর পাশে পাশে থাকে। ছোটখাটো কিশোরী শরীরটা ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা মানুষের চাপে হারিয়ে যাচ্ছে। আড়াল হয়ে যাচ্ছে। ছুটে এসে, প্রাণান্ত হয়ে ধরতে হচ্ছে কালীজেঠুকে, সতুদাকে। নাকেমুখে নিঃশ্বাসে হাঁপিয়ে উঠছে। ঘামছে। হাজার টাকা দামের সাজপোশাক সব ন্যাতপেতে হয়ে গেল। এত সাধের সাজগোজ! কান্না পাচ্ছে তার।

এবং ভয়। ভেতর থেকে গলার নলিটা চেপে ধরে থাকে কেউ। ইস্টিশনের প্ল্যাটফর্মে সব প্যাসেঞ্জারবাবুরাই যা করেন, অচেনা কুলি ভিড়ে হারিয়ে গেলেও সব মানুষের মাথা ছাপিয়ে ধাবমান মালপত্তরগুলোকে যেভাবে টরে টরে রাখতে হয়, কালীজেঠুর বেখাপ্পা বিছানার পাহাড়টা শূন্যে ছুটছিল যতক্ষণ, রাধা নজরে রেখেছিল। অথচ সেও কোথায় উধাও হয়ে যেতেই চারপাশের ভিড়ে রাধা মানুষটাকে খোঁজে। আশ্চয্যি! মুখটাই ভালো করে দেখা হয় নি মনে হয়। অথচ চেনা-নেই জানা-নেই লোকটার হাতে তার ব্যাগটা। যথাসর্বস্ব তার।

সান্ত্বনা থাকে। পাশাপাশি গাঁয়ের ছেলে। সতুদার চেনা। পালাবে কোথায়? আস্তে আস্তে অনেকটাই শান্ত নিঃশ্বাস খুঁজে পায় রাধা। জনতার চাপ। ভিড়ের গায়ে-গা লেপটে যখন চামড়া ছড়ে যাবার মতো অবস্থা, পেটের খিঁচুনি থেকে আবার একটা ভয় শরীরটাকে টানছে ভেতরের দিকে। সিঁধিয়ে যাচ্ছে হাত-পা। দুটো মাত্র চোখে পলক না ফেলে আগে-পিছে ডানে-বাঁয়ে সে সামলাবে কী করে লাখো-লাখো মানুষ? গলায় আঁটো-আঁটো হীরেচুনির হার। এক হাতে কালীজেঠুর ট্রানজিস্টার, আরেক হাতে ছোট ভ্যানিটি-ব্যাগ! ব্যাগের ভেতর দুটো কড়কড়ে একশো-টাকার নোট। দুটো হাতই বন্ধ যদি, গলাটা ফাঁকা? শক্ত হাতের একটা খাবলা পড়ে যেতে পারে যখন-তখন। যে-কোনো মুহূর্তে। তার বুক জুড়ে যদি চোখ-ধাঁধানো এতই জেল্লা, আসল-নকলের ফারাক বোঝে

নাকি কেউ? ভালোয়-মন্দয় মাখামাখি মানুষগুলোকেও সে যেমন চিনতে পারছে না চারপাশে।

আচমকা তখনই ভেলকি। গাড়ির ধার ঘেঁষে এগোতে এগোতে সামনের দিকে, একেবারে ইঞ্জিনের দুটো-কি-তিনটে কামরার পেছনে, যেখানে ভিড়টা অনেক হালকা হয়ে এসেছে, কোথায় ছিল সেই পরের-মোট-খামোকা-মাথায়-বইবার লোকটা, ঘামতে ঘামতে হাঁপাতে হাঁপাতে হালুম দিয়ে পড়ল সামনে—'অ্যাই, অ্যাই যো গ, তোমাদেরকেই খুঁজতে খুঁজতে আলা গ সত্‌দা। ইদিকে গাড়ির টাইম হয়ে গ্যাছে...'

'কেনে? জায়গাটায়গা পেলি কোথাও?'

গা-গতর কাঁপানো একরাশ টগবগানি নিয়ে সেই ছেলে, শিবু, কোনাকুনি চোখের চাউনিতে একবার দ্রুত পলক ঘুরিয়ে নিয়ে—'দুটো সিট হয়েছে গ ওনাদের জন্যি। শম্ভু বাদলা ওরা আগলে বসে রয়েছে...'

'কে শম্ভু?' ভ্রূ কুঁচকোয় সত্যভূষণ।

'এ-গাড়িতে নিত্যি আসা-যাওয়া গ আমাদের। কত বন্ধু! ঝাপানড্যাঙার বাদলা, রোয়ের শম্ভু...'

খুশি-অখুশির কোনো বিকার ছিল না সত্যভূষণের। বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল রাধা। সঙ্গে বৃদ্ধ কালীধন। ওরা কাছাকাছি এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে, কী যে হলো, মেয়েটার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল অকারণ—'বেশি বাড়াবাড়ি করবি নি, বুঝলি। একটা লিমিট আছে সব কিছুর। কেনে, পা চলছে নি? সাজগোজ করে বিবি সেজে অতই যদি ঢলানির শখ, নিজের ট্যাঁকের পয়সায় ফার্স্ট-কেলাশে গিয়ে উঠলেই পারতিস। কোথাকার কে র‍্যা তুই? তোর কত মুরদ, সব্বায় জানে। পানাডোবার নাল ফুল, বলে কিনা গাছের ডালে দোল খাব...'

তিরতিরানিতে কাঁপুনি খেল রাধা। ভিড়, ভিঁড়ের মানুষ, সম্মুখবর্তী গাড়ি বা গাড়ির সময় বা অগুনতি মানুষের উম্মাদ কোলাহলে কিছুই আর কিছু নয় তখন। নিজের অসহায় তুচ্ছতায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে সে এক জোড়া সজল চোখের চাউনিতে বোবা বনে যায়। টশটশ চোখের জল এবার সত্যি সত্যি গড়িয়ে নামছে নাকের দু'পাশে নবম গালে। ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে। এক্ষুনি ফিরে যাবে সে। ফিরে যেতে পারে সাহেববাড়িতে। রাস্তাফাস্তা চেনে, বাসের নম্বর জানে। কিংবা ছুটে যেতে পারে অন্য কামরায়। সে যাবে না ওই লোকটার সঙ্গে। না, কক্ষনও না। হুঁ, ভারি তো গাজ্জিয়ান! কেন? কী দোষ করেছে সে? কেন দশজনের সামনে এমন করে বলবে আকথা-কুকথা?

বৃদ্ধ কালীধন, ঠাসবুনন মানুষের জঙ্গল ভেদ করে এগনো যাঁর কাছে রীতিমত যুদ্ধই এক রকম, ঘোলাটে চশমার চাকতি ঊর্ধ্বে ঝুলিয়ে রেখে অসহায়। বিরক্তও বটে-—'কি র‍্যা? হল কী তোদের? এখনে কি কথা কইবার সময়? বাপ-মরা দুধের বাচ্চা একটা মেয়ে! ওকে এমনধারা বলছিস কেনে? কেনে, কী করছে ও?'

প্রলাপকথনের শ্রোতা নেই কেউ। দু-হাতের মুঠোয়-বগলে পোঁটলাপুঁটলি ব্যাগবাকশো ছাতা নিয়ে সর্বাঙ্গভারে সত্যভূষণ ঢুকে পড়েছে গাড়িতে। ভিড় ঠেলছে ভেতরে।

এবং শিবু, ভ্যাবল-গঙ্গারাম সেই উঠতি যুবক, চোখে-চোখ রাখতে পারে না যে-চোখে, বা হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে না যাকে কিংবা কথা-বলার নিয়ম নেই যার সঙ্গে, সেদিকেই মন রেখে বেকুব চোখজোড়া ভাসিয়ে রাখতে চায় অন্য দিকে। হাত বাড়িয়ে বুড়ো মানুষটাকে সে টানে। দূরে, অনেক দূরে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গাড়ির সিগনাল হয়ে যাচ্ছে।

পালিয়ে যায় নি রাধা। একরত্তি শরীরের মধ্যে সিঁধিয়ে গিয়ে, আরো বেশি ছোটখাটো হয়ে, কালীজেঠুর পাশে পাশে থাকে। রাগে-দুঃখে গাল ফুলিয়ে গোমড়া থাকারও উপায় নেই। এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে হয়।

গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, কামরার ভেতর সব সিট ভরে ওঠার পব, দাঁড়িয়ে থাকার জন্য যেখানে যতটুকু ঠাঁই ছিল, প্রতি ইঞ্চি জমি কেড়ে নিতে চাইছে মানুষ। দরজায় গায়ে-গা-লেপটানো ভিড় ঠেলে কালীধনের জন্য পথ তৈরির অছিলায়, শেষপর্যন্ত বৃদ্ধের প্রতি কর্তব্যপালনও একটা উপলক্ষই হয়তো, রাধার জন্যই পথ তৈরি হয়ে যেতে থাকে। সবাইকে ঠেলেঠুলে খিস্তিখাস্তা সয়ে ঘর্মাক্ত হাঁসফাসে বুক পেতে তাকে আগলে রাখতে চাইছে কেউ। ছোঁয়াছানির ছ্যাঁকাও লেগে যায় হঠাৎ-হঠাৎ। ঝলকানি ওঠে শিরায় শিরায়। তার জন্যে...শুধু তারই জন্যে যদি এত কষ্ট গ মানুষটার, অনেকটাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে বাধা। সেও আগলে রাখতে পারে বুকের লাল পাথরকে। মূল্যবান হীরকখণ্ডগুলি। অচেনা মানুষজনের এই জটলায়ই আছে চোর-ছিনতাইয়ের কালো কালো হাতগুলি—সে জানে।

কিংবা পাড়াগাঁয়ে কালকিষ্টি লোকদের ভিড়েই আরো এক অবাক কাণ্ড! ঘেমেনেয়ে জেরবার হয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল শিবু, দুঃসহ ভিড়ের চাপেও সেখানে দুটি আসন সংরক্ষিত ছিল। ওরা এসে দাঁড়াতেই শিবুরই বয়সী, আঠার-উনিশের দুটি যুবক তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে। সারাদিনের খাটাখাটনির পর প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের দীর্ঘ যাত্রায় আসনসারির শেষ প্রান্তে জানালার ধারে খোলামেলা এমন দুটো সিট ছেড়ে দেবার সুদুর্লভ ত্যাগস্বীকার, রাধা জানে, সে-শুধু বুড়োমানুষের জন্য দুঃখ কাতরতায় নয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এপাশে-ওপাশ বসে-থাকা মানুষজনদের সামলে, যেদিকে গাড়ির গতি, সেদিকেই মুখ রেখে একেবারে শেষ আসনে গিয়ে বসলেন কালীধন। গাড়ি চলতে শুরু করেছে সবে। খোলা জানালায় বাতাস অবাধ। তাঁরই গা ঘেঁষে রাধা দ্বিতীয় আসনে।

এবং অঢেল শান্তি রাধার। কামরার সব মানুষের সবগুলো চোখই তখন তার দিকে, স্পষ্টই বুঝে নিয়ে সে ওড়নার ভাঁজগুলো নামিয়ে দেয় বুকের তলানির দিকে, অনেক নিচে। বক্ষ-আবরণের শোভন সঙ্কোচে নয়। গলার দিক ফাঁকা হয়ে থাকলে সর্বাঙ্গভূষণের সব দেমাক ছাপিয়ে তার কণ্ঠমালায় জমাট-বাঁধা রক্তের পাথরকে ঘিরে যে-উজ্জ্বল হীরক খণ্ডগুলি—গ্রামগঞ্জের হা-ভাতে মানুষজনের পিচুটি-গলা চোখের মণিতে যা সত্যিসত্যি চুনি হয়ে ওঠে, সত্যি-সত্যি হাজার টাকা দামের হীরে... এবং অন্য কারুর চোখ ঝলসালে তার যায়-আসে না কিছু—এমনই এক নীরব উপেক্ষায় সে দৃকপাতহীন। ভয় নেই চোরছ্যাঁচড় পাত্তিকেও। এখন তার জন্য শুধু একজন নয়, তিন-তিনটে মরদ। সেই অহঙ্কারেই ভ্রূ তুলে সে তাকাল দেখভালের ঠিকেদার উটকো সেই লোকটার দিকে।

সত্যভূষণ কম কথার মানুষ। গোঁয়ার ধরনের মুখচোখ। উচ্চিংড়ে বা ফড়িং গোছের জাতমুখ্যু একটা বাচ্চা মেয়েকে কোনো পাত্তা সে না দিতেই পারে। শিবু বা ওর বন্ধুদের সঙ্গে হাতে-হাতে মালপত্তরগুলো ওপরের বাঙ্ক বা বাপের পায়ের তলায় সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে সে সরে যেতে চাইছে।

শিবু পালায় না। একা নয়, ওরা তিনজন। চাল বা ডালে কাঁকর যেমন, গাড়ি ভর্তি গা-ঘেঁষাঘেঁষি জটলায় ভুতো ভুতো হতচ্ছাড়া চেহারায়-বেশভুষোয় গায়ে-গা-লেপটে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খুবই কাছাকাছি, দুদিকের আসনসারির মধ্যবর্তী প্যাসেজে। ঘামে, ঘামতে থাকে।

শ্যাম্পু-চুলেব ঝাপট তুলে ঘাড় ফিরিয়ে থাকে রাধা। কোনো রকম আমল না-দেবার তাচ্ছিল্যে চোখ বাখে উল্টোদিকে খোলা জানালায়। সে জানে রিমোট কন্ট্রোলার। সে-এক আজব যন্তর। সাহেববাড়ির দোতলায় টিভি থেকে আট-দশ হাত দূরে নরম সোফায় গা এলিয়ে হাতের মুঠোয় সুইচ টিপে যেভাবে রঙিন পর্দায় ছবি ভাসিয়ে তুলতে পারেন মা, বন্ধ করতে জানেন, রাধাও জানে—সে-রকমই কোনো অদৃশ্য টানে তিন-তিনজন জোয়ানমবদ ব্যাটাছেলে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে নড়বে-চড়বে, হাসবে, ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকবে এবং সেই টান তাবই ফুসমন্তরে। তার ভ্রূভঙ্গির ঠমকে।

সে-মেয়ে জানত না, তার ঘবে-ফেরা এমন করে ঢেউ কাঁপাবে পড়শিদের ঘরদোবে।

গাড়ির গোলমাল ছিল বেশ। কোন্ এক দূরপাল্লার এক্সপ্রেস গাড়িকে সাইড দিতে হয়েছে চন্দনপুর ইস্টিশনে। তাছাড়াও কী-নাকি এক মালগাড়িব পেছনে পড়ে টিকির-টিকির গড়িয়ে গড়িয়ে এসে যখন বেলমুড়ি পৌঁছলো, তখন সন্ধে পেরিয়ে আঁধার নামতে শুরু কবেছে সবে। ইস্টিশনের চত্বরে হাজাবগণ্ডা দোকানপাটে ফিনকি দিয়ে আলো ছুটছে বিজলী বাতির। গমগম কবছে হাঁটাচলাব মানুষের আওয়াজ। বাসস্ট্যান্ডে ভিড় ছিল। বাসও ছিল। এপাশে ভাণ্ডাবহাটি ধনেখালি দশঘরা যাবে কেউ কেউ। ওপাশে মগরা চুঁচুড়া।

মালপত্তব আছে সঙ্গে। বাসে যাওয়া যাবে না অ্যাদ্দুর। কালীজেঠুর কষ্ট হবে। বাকশোপ্যাঁটরা বোঁচকাবুঁচকি হাবিজাবিশুদ্ধু কালীজেঠুব সঙ্গে একটা ভ্যানগাড়িতে রাধাকেও তুলে দিলেন সতুদা। অঢেল জায়গা ছিল। জোয়ানমরদ লোকটাব ঠাঁই হলো না। ইস্টিশনেই সাইকেল বাখা ছিল সতুদার। এগোতে শুরু করলেন ভ্যানের পিছু পিছু। রাধাবও ভালো লাগছিল খুব। আজ কতকাল বাদে তার দেশের-বাড়িতে আসা। দেশগাঁয়ের চেনা রাস্তায় দু-পাশের ঘরবাড়ি মাঠ ঝোপজঙ্গল, মায় উঁচু-উঁচু মস্ত গাছপালা...জম্মো থেকেই সে দেখে আসছে যাদের বা তাব জম্মেবও আগে থেকে একটু একটু করে ডালপালায় বেড়ে উঠেছে, বাডবাড়ন্ত পাহাড় হয়ে উঠেছে যারা, বুঝি সবই তার অনেক কালের আপন। ভ্যানগাড়ির পেছনের দিকে পা ঝুলিয়ে আপন পথে চলার আরেক মজা—নাক-বরাবর রাস্তাটা আসলে তাব ফেলে-আসা পথঘাট। পেছনের দিকে চোখ রেখেই সামনের দিকে এগনো। আঁধারে আঁধারে ডুবে যাচ্ছে যে-মাঠ, সেখানে রাস্তার দু-পাশে ধানের ক্ষেতের ওপর গড়ে উঠেছে কত সুন্দর সুন্দর নতুন সব দালানকোঠা। এক

রত্তি বয়সে দেশগাঁ ছেড়ে শহবে গিয়ে অনেকটাই বদলে গেছে সে। তার বদলে যাওয়ায় চোখের আড়ালে শহর হয়ে উঠছে তার দেশপাড়াগাঁ। কিছুকাল বাদে-বাদে যতবার সে আসে দেশে, অনেক কিছুই নতুন নতুন। কিন্তু হলে হবে কী? পযসার ফারাক বোঝে রাধা। টাকাকড়িরও জাতপাত থাকে। তার রং আলাদা। এখানে সাহেব নেই কেউ। সাহেববাড়ি নেই।

ইস্টিশন থেকে সোজা লম্বা সডক পেরিয়ে এসে ফিডার রোডের মোড। রাধা ভিরমি খেল। সেখানে আরো কত দোকানপাট হয়েছে আজকাল। নিত্যিনতুন বেড়েই চলেছে। সব দোকানেই বিজলী বাতি। মানুষজনেব গুলতানি। আলোয়-আলোয় লোকজনে হুল্লোড়েচিৎকাবে ছযলাপ। ডান দিকে কিছুটা এগোলে বিজলীবাতিব আলো-আঁধারি পাকা বাস্তা থেকে বাঁযে ঘুরলে পঞ্চায়েতেব নতুন সডক। মোরাম-বাঁধা লাল রাস্তার দু-পাশে মাঠ আর ঝোপজঙ্গল। সেটাই তার ঘরের পথ। গাঁয়ের ভেতর অব্দি ভ্যানগাড়ি, রিকশ, মেটাডর, এমন কি, লরি অব্দি তরতবিয়ে যায়।

রাখাল আষেব পাকা দোতলা বাড়ির সামনে ভ্যানগাড়িটা এসে থেমে যেতেই, কে কালীজেঠু? কেই-বা সতুদা? হুদোমার্কা ওই লোকটাই দেখবে তার বুড়ো বাপকে। জালে-ধরা মাছ মানুষের হাত ফসকে ফের ডোবাপুকুবেব ছোঁয়া পেযে গেলে যেমন হয়, এক লাফে ভ্যান থেকে নেমেই নিজের ব্যাগ-থলে হাতে তুলে নিয়ে, যতটা সম্ভব দ্রুত, রাধাব লম্বা ছুট।

অমাবস্যার পব প্রতিপদ কি দ্বিতীযাব চাঁদ ছিল আকাশে। বাত নামছে গাঢ় হয়ে। গাছে গাছে পাখিদেব কলবব থিতিযে এলেও আকাশেব সব আলো মুছে যায নি তখনও। চক্কোত্তিদের পুকুবেব ধার ঘেঁষে বাঁশঝাড়েব ভেতর দিয়ে সিঁথিকাটা মেঠো রাস্তা কোথায মিশে গেছে আলোছায়ার হেঁয়ালিতে। এ-পথেই কুঁতিপাডায় সামন্তপাড়ায় ঢুকতে হয়। শুনশান নিঝুম চাবপাশ। গবিবগুবেবো মানুষদের এদিকটায় বিজলীবাতি নেই। এদিক-ওদিক পড়শিদের ঘরদোরের কালো-কালো ছায়ায় একটা-দুটো লম্ফ বা লণ্ঠনেব আলো দূব থেকে। ঝোপঝাডে জোনাকির ঝিলমিল। বাঁশঝাড়ের পাতায় পাতায় বাতাসের ঝুমঝুমি বাজছিল। তেমন কিছু ভয় ছিল না রাধাব।

কিন্তু হঠাৎই এক আজব দৃশ্যে তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। গাছাগাছালির ডালপালায কোনো পাখির ডানা-ঝাপটানি নয়, খরিসচন্দববোড়াব ছোবল পডে নি কারুব গাযে। মানুষ! খামোকা মানুষেরই চিল্লানি।

ওপাশে শ্রীনাথ সামন্তর ঘর থেকে উঠোনে নেমেছিলেন বয়স্ক মেয়েছেলে কে একজন। মনুদির-মা বোধ হয। বাঁশঝাডেব দিকে চোখ পড়তেই কী-এক আতঙ্কে হাঁক পেড়ে চেঁচিযে উঠলেন এমন, চকিতে, এদিকে-ওদিকে স্বজনপড়শিদেব ঘরে ঘরে আর-সবাই ছিলেন যাঁবা, বউ-ঝিরা ছুটে ছুটে এসে হামলে পডল সবাই। ব্যাটাছেলেও দু-চারজন। সবারই চোখ বাঁশবনের দিকে। ভ্যাবাচাকা বাধা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে নিজেও হাঁ হয়ে তাকিযে থাকে। কী হলো? তাকে দেখে ওরা সবাই এমন করছে কেন? সকলেই স্বজাতিব ঘরে আপনজন তার।

সাড়া নেই শব্দ নেই হাঁক নেই চিল্লানি নেই। রাধার মজা লাগল। বড্ড বগড়।

ভয় পেয়েছে ওরা। পাবেই। এমন সাঁঝের বেলায় আলো-আঁধারির ছায়ায়-ছায়ায় ঝলমলানির ধড়াচুড়ায় যাত্রাপাড়ির ফিমেল যেমন, পায়ের তলায় শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে ঘুঙুরের বোল গোছের শব্দ তুলে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে কে যায় গো? কে যায়? জলাজংলা শাকচচ্চড়ির গাঁয়ে ভাবতে পারে নাকি ওরা কেউ, এমন রূপের কলস ভরে হুট্ করে কেউ এসে যেতে পারে ওদের ঘরে? এমন আঁধার রাতে? সাহেব দেশের দুঃখী মেয়ে সিন্ডারেলার ঘরে যেমন করে দেখা দিয়েছিলেন স্বর্গের ফুলপরী।

হাসতে হাসতে রাধাই হাঁক পাড়ল এপার থেকে— 'এমনধারা করছ কেনে গ তোমরা? কী দেখছ?'

'কে? কে গা তুমি?'

'আমি রাধা গ। রাধু...'

'রাধু? অ্যাঁ! সুমতির মেয়্নে লা তুই? আমাদের রাধু বটে? কবে এলি?' ওপার থেকে একসঙ্গে সবার প্রশ্ন। সকলের হাঁক।

'এই ত গ, কালীজেঠুর সনে এলুম এই মাত্তর। ঘরে ঢুকি নি এখনও...' গৌরবিনী রাধা 'বিগ শপার' ভারি ব্যাগ বইতে বইতে ক্লান্ত তখন। হাঁপাচ্ছে রীতিমত। নিজের হাঁটুতে ব্যাগটা হেলান দিয়ে রেখে সে একটু জিরোতে চাইল। ছোট ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে গাল গলা থুতনি কপালে আলতো করে একটু ছুঁয়ে নেবার সাধ। সেই দুপুরবেলার স্নো পাউডার চোখের-কাজল। ঘামে ঘামে কি হয়ে আছে, কে জানে? অথচ এখনই একটু টাচ বুলনোর সময়।

ওপারেও ঔৎসুক্য ছিল। ছুটে ছুটে আসছে ওরা।

এপারে-ওপারে ভয়, বিস্ময়, কৌতূহলের মধ্যবর্তী একটি বড় ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। সামন্তদের ঘর-উঠোন থেকে বাঁশবনের মাঝখানে ছোট একটা পানাডোবা ঘিরে আদ্যিকালেব ঝোপজঙ্গল, গোটা কয়েক পিটুলি গাছ। ওদের দিকে যেতে হলে ডোবাটাকে প্রায় অর্ধেক ঘুরে যেতে হবে রাধাকে। কিন্তু হাতে-হাতে লম্ফ নিয়ে যদি ওরাই ছুটে আসতে থাকে, ব্যাগটা তুলে নিয়ে রাধাকেও এগতে হয় সেদিকেই।

এবং মুখোমুখি হতেই—'ই-আমাদের রাধু নিকি লা? অ্যাঁ। ই-যে পরীর পারা পরমা সোন্দরী রাজকন্যে গ...'

'কী সোন্দর! কী সোন্দর তোকে লাগছে র‍্যা রাধু!'

গোটাকয়েক লম্ফ উঁচিয়ে উঠেছে হাতে-হাতে। নববধূ এসে দাঁড়ালে যেমন হয়, গনগনে আগুনের এত কাছে, প্রায় নাকের ডগায় উত্তাপ ছুঁয়ে নিজেরই চোখজোড়া বুজে আসে। অভিভূত রাধা দেহে বক্ষে শিহরনে মুদিত চোখের পাতায় স্বজনঘরের মেয়েদের আকুলিবিকুলি কলকলের উত্তেজনায় আবার নতুন করে নিজের শরীরটাকেই খুঁজে পায়।

মুগ্ধতার কোলাহলে রাধা চোখ টেরিয়ে হাসতেই পারে শুধু। তার এ-হেন অঙ্গসজ্জা তেমন আহা-মরি কিছু নয়, নিত্য অভ্যাসেরই পাখাপেখম—এমনি এক ভঙ্গিতে সে সামনের দিকে এগোয়। তার নিজের ঘরের দিকে। জেঠি খুড়ি বউদি ছাড়াও দিদি পিসি আরো সব কম-বয়সী মেয়েরাও থাকে পাশে পাশে। অষ্টা কুঁতির ঘরের লাগোয়া

চন্দরনাথ জ্যাঠার গোয়ালঘর আর খড়ের-পালুই—মাঝখানের ফাঁকটুকু ডিঙোলেই ছোট একটা এজমালি উঠোনে ঘরগেরস্তালির হরেক ছবি। পরতে পরতে আঁধার বাড়ছে যত, ঝাপসা থেকে আরো ঝাপসায় ছায়া-ছায়া হয়ে উঠছে ঘরদোর গাছপালা মানুষের মুখ। সদলে পাড়ায় প্রবেশের মুখে এপাশে-ওপাশে নজর ছিল রাধার। ওপাশের দাওয়ায় বসে বাঁশের আংটায় ঝোলানো খেপলা জাল বুনছিলেন শুক্লাদের ঘরের বুড়ো দাদু। হল্লা তুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছিল উঠোনের এক ধারে। কাঁখের-বাচ্চা নিয়ে কাদের ঘরের একজন বউ! দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না ঠিকমত। কিন্তু ঝিঁঝির ডাকের ঝিমোনো সাঁঝের বেলা হঠাৎ-ই নাড়া খেয়ে যায়। বাধার প্রবেশ যাত্রাপালার আসরে বাচ্চা বয়সের কোন্ এক শাহজাদির সাজ?

চারপাশ থেকে ছুটে ছুটে আসে আরো অনেকেই। নিজের ঘরের দোরে গিয়ে পৌঁছতেও পারে না বাধা। থমকে দাঁড়াতে হয়। কে বা কাবা সোহাগে সোহাগে হাত বুলোচ্ছে তার গায়ে পিঠে বুকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে তার জামা, তার শালোয়ার। দুটো-তিনটে লম্ফ হাতে-হাতে তুলে নিয়ে এসেছে কেউ কেউ। লকলকে শিখার লালচে আলোয় ফিনফিনে ওড়নার তলায় জোনাকির চকমকিতে ঝলকে ঝলকে উঠছে কাচের চুমকিগুলো। সর্বোপবি হীরে-চুনিব লকেট।

জামার তলার দিকে অনেকটাই হাতে ধবে তুলে নিয়েছে সুখনদার-বউ। আলোয় ফেলে আঙুল ঘষে ঘষে পরখ করেও যেখানে সুখ— 'কত ট্যাকা দাম র‍্যা রাধু? কি লরম-লরম তুলতুলে সিলিক...'

রাধা হাসে— 'দরদাম শুনে আব কী কববে গ বউদি? ভিরমি খাবে।'

'তা বল্ না কেনে র‍্যা একবারটি। শুনি...' বিন্তিদের ঘবের মেজকাকিমা মুখ বাড়ালেন— 'শ'রে থাকিস তোরা! কত কি খাস-পরিস! আমরা না-হয় চোখ মেলে দেখলুম এট্টু। শুনলুম...'

'সে-আর আমি কি করে বলব গ তোমাদেরকে? কেনাকাটা সব ত' ওখেনে মা নিজেই করেন। আমরা মেয়েরা শুধু নিজেদের গাড়ি চেপে নিউমার্কেটে যাই। বড় বড় সব সাহেবি দোকানে ঘুরে-ঘুরে যার-যেমন-পছন্দ বেছে বেছে নিই। কাপড়টা দেখেছ? ফরেন মাল গ, এক নম্ববি ফরেন মাল। চাইনিজ সিলিক...'

চোত-বোশেখের গাছের সবুজে ডালপালা ভরে জামরুলের মতো এপাশে-ওপাশে আলোয় আঁধারে বোবা-বোবা চোখগুলো এবং এভাবেই পরের চোখে নিজেকে চেনার যাদুদর্পণে কী এক অত্যদ্ভুত মায়াকুশল তৈরি হয়ে যায় তারই কথায় বাক্যে আবেগে, সে-মেয়ে নিজেই সন্ধান বোঝে না—এ-কোন্ কুহক? অথবা নিজেই জড়িয়ে যায় আজব ভোজবাজিতে। ঘাড় নিচু করে, বুকের কাছে থুতনি ঝুঁকিয়ে রাধা নিজেই নিজেকে মুগ্ধতায় দেখে নিতে চাইল আরো একবার— 'তা ধরো, শালোয়ার-কামিজ দুটো মিলিয়ে কাপড় আর দর্জির দোকানের খরচাপাতি সব নিয়ে নেই-নেই করেও... হ্যাঁ, এই ধরো, হাজার-বারোশো ত হবেই গ...'

'আঁ! বলিস কি লা, হাজার? এঁটুকুন এট্টা মেয়ের একজোড়া জামা পেন্টলুনের

দাম হাজার ট্যাকা? কী সব্বোনেশে কতা বল্ দিনি? ই-যে পাকা দালানকোঠার বাবুদের ঘরের বিয়ের বেরানসীকেও হার মানায় লা...'

'পেন্টলুন? পেন্টলুন কী গ? আমি কি ব্যাটাছেলে নিকি?' রাধা হাসে। হাসতে হাসতে ভেঙে ভেঙে পড়ে। তলার দিক থেকে জামার খানিকটা তুলে ধরল দু-হাতে। নিম্নাঙ্গের অঙ্গবাস মেলে ধরল হাসতে হাসতেই— 'পেন্টলুন নয় গ, শালোয়ার। আর জামাটা দেখছ? এটা কামিজ। এ-কি যেমন-তেমন কাটিং ভেবেছ? তোমাদের এ-পোড়া দেশেগাঁয়ে পাবে কোথায় এসব? হুঁ, এই যো শিফনের সুতোয চুমকির কাজ দেখছ, আরে বাবা...এই নকশার দামই ত পাঁচশো সাতশো...'

আঁধাবের রঙে বঙে চাবপাশ ঘিরে ড্যাবডেবে চোখগুলো নিঝুম ঠাণ্ডা হয়ে এলে সাঁঝের বাতে আবাব ঝিঁঝির ডাক ফিবে আসে। যে-দু-চারটে লম্ফ জ্বলছিল, আকাশ জোড়া বিরাট আঁধারে গোটা কয়েক পুঁটিমোবলার মতো। কিংবা আঁধারেব আলোয়-কালোয বিহ্বল মুখচোখগুলো, কলিডলের জলে মরামাছ যেমন, আলগা হয়ে ভাসতে থাকে। রাধাব উৎসাহ বাড়ে—'এ আর কী দেখছ গ? এমনধারা কত আছে শহরের মেয়েদের। পেন্টলুনেব কথা বলছ? কত হরেক ধরনের পেন্টলুন—বাগি পেন্টলুন, জিন্স কডবয় আরো কত কী! টাবাউজার জানো? শ্যালেক? লঙ শটস্ দেখেছ জন্মে? শারারা ঘারারা ঘাগরাচুন্নি কুর্তাচুন্নি ধোতি শালোয়াব'...

মূক মুখে নিঝুম চাউনিগুলি অবশ্যই পাগল ভাবতে পাবত মেয়েটাকে। কিন্তু ভাবে না। দুধের-বাচ্চা মুখ্যু মেয়ের মুখে খৈ ফুটছে ইংজিরির। কেউ বোঝে না তার ভাষা। মগজে গিয়ে টকাশ-টকাশ থাপপড় মারে শব্দগুলি, টিনেব চালে চোত-বোশেখেব শিলাবৃষ্টি যেমন।

সাঁতরাদের ঘরের বুড়ি ঠাকুরমা ঢুকে পড়েছিল ভিড়ের মধ্যে। কুঁজো পিঠে ঘাড় তুলে তোবড়ানো গালে থুতু ছিটোয়—'কী বলছিস র‍্যা? কী, কী কতা ওগুলান?'

'অঁ, কালে কালে কতই দেখলুম গ। এখনে কতা শোনো। লতুন লতুন সব কতা...'

সবাই ফিরে তাকিয়েছে।

হেঁটো-কাপড়ের উদোল গায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বুড়ো সনাতন সাঁতবা। তেল-চিটচিটে শুকনো গামছায় রোমশ বুক মুছতে মুছতে—'অবাক কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল। তা অমন মণ্ডা-মিঠাই আমাদের সইবে কেনে? মুখ্যুসুখ্যু গেঁয়ো মানুষ। এ-যে দেখচি বিবি এয়েচেন শ'র থিক্যে! তা-ভালো তা-ভালো। বিবির বাহার কত সাজপোশাকের!'

আচমকা খোঁচা লাগে। ঠাকুদ্দার বয়সী সেকেলে বুড়োর দাঁতে যত বিষই থাক, রাধা শহরের সাহেববাড়িতে যা পারে না কখনও, এখানে নিজের জায়গায় ঝাঁঝিয়ে উঠতে পাবে অনায়াসেই। জিভটা শানিয়েই ছিল। কিন্তু আক্কেল-গুডুম বিস্ময়েব হাটে পড়শি ঘরের বউ-ঝি আপন মানুষদেব কাছে অদ্বিতীয়ার অহঙ্কার যেখানে, সে হারাতে চায় না নিজের গুমর। বুড়ো সনাতন সাঁতরার ওপর রাগটা নেভে না। লাফঝাঁপে মাতিয়ে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাঁতরাবুড়ির ওপর- 'জেবনভরই আস্তাকুঁড়েয় পচে পচে মরলে গ ঠামা। কত কী দেখার আছে পিথিমিতে। দেখলে নি, বুঝলে নি কিছু। কত

বড় শ'র গ কলকাতা! হিল্লীদিল্লী যাচ্ছে কত কত লোকে। কত ভালো-ভালো সোন্দব সোন্দর সব জিনিসপত্তর নিয়ে আসছে। সেসব দেখলে চোখ টেরিয়ে যাবে গ তোমাদের। ভিরমি লাগবে মাথায়...'

'অঁ, সে-ভিরমি ত লাগছেই। দেখছি ত, সবই শুনছি ত্যাখন থিক্যে। ওই যো ব্যা, কতায় বলে না—চন্দ্রসুয্যি অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি...'

দূরে দূরে, অন্ধকারে চেনা যাচ্ছিল না মুখ। শুধু গলার স্বরে বোঝা যায়, রাধাবই আলাদা-হাঁড়ির আপন-জ্যাঠামশাই অনন্ত কুঁতি ঠোঁট বাঁকানো সুরে ছড়াটা আউড়েই, ছোবলানির পর খড়িস কি চিতির মতো, সবে যাচ্ছে ওপাশ থেকে।

এঁদো ডোবাব জলে গলগলিয়ে কাদা উঠতেই অন্য দিক থেকে ঘাই মাবল কুটনি মেয়েছেলে মনুর-মা—'অভাবে-অভাবে ম'ল বাপটা। পোড়াকপালী মা-টা ত এট্টা শাযাবেলাউজও দেখল নি জেবনে। এক-কাপড়ে ধেই-ধেই কবে গাঁযের দশজনেব দোবে দোরে মুড়ি ভেজে চিঁড়ে কুটে মবছে গ দিনভব। আব গিদেরি মেয়েটার ফুটনি দেখ গ! লাজ নেই সবম নেই মেযেছেল্যাব? এট্টা মানসম্মান নেই গুরুজন মান্যিজনদেব? সেই ত্যাখন থিক্যে কেমনধাবা নম্বা-চওড়া বাত ঝাড়তে লেগেছে খুড়োজ্যাঠা বড় বড় ব্যাটাছেল্যাদের সামনে! এ-কেমনধাবা কতা গা?'

নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছনোব আগেই পড়শিদের উঠোনে ধুন্ধুমাব খেযোখেয়ি বেঁধে গেল খামোকা। বাধা ঠকঠক কাঁপে। কিন্তু কববে কী সে? বাপজ্যাঠার বযসী ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা কতগুলো মানুষ। মুখ্যু, জাতমুখ্যু সব। কুয়োর ব্যাঙ!

বুড়োরাই মোড়ল-মাতব্বব কুঁতিপাড়ায় সামন্তিপাডায়। ওঁদেব হাঁকডাকে মেযেদেব অনেকেরই সবে পড়াব দিকে মন। ঘরের দিকে পা।

এবং রাধা বিশ্ব-আকাশ বুকে নিয়ে বড় অসহায়। ঘরে যাবার তাড়ায় ডান দিকে ঝুঁকে পেটমোটা ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে নিযেছিল হাতে। থেমে যেতে হলো। ওপাশেব ঘবদোবের ফাঁকফোকর ডিঙিয়ে, আঁধার ভেঙে ছুটতে ছুটতে আসছে তার মা। সঙ্গে পালানভাই।

সামনেই কেদাব কুঁতির ঘবের ওপাশে আরো একটা উঠোন পেবোলে রাধাব নিজের ঘব। সারা দিনেব খাটাখাটুনির শেষে মেটেঘবেব দাওয়ায় গড়িযে পড়েছিল সুমতিবালা। দাওযাব ধারে ঘবেব একমাত্র লণ্ঠনটুকু জ্বেলে ইশকুলের পডা তৈবি কবছিল পালান। আগে থেকে জানান ছিল না। পড়শিদের মুখে যখন শুনল, অ্যাদ্দিন বাদে মেয়ে এসেছে ঘবে, ধড়ফড়িয়ে লাফিযে উঠেছে। ডাক পেড়ে ছুটে এসেছে পডিমরি দৌড়ে।

বর্ষার ভরাট মেঘের ভাবে সুখে-খুশিতে ভরে ছিল মায়ের বুক। এপাশের উঠোনে মেয়েকে ঘিরে স্বজনপডশিদেব আলগা-আলগা জটলা দেখে বুকেব ভারও যেন হালকা হতে চায় অবিশ্রাম বর্ষণধারায়। বছরেব কোনো কোনো সময়ে কটা দিনের জন্য মেযেবা বাপের-ঘরে মায়ের কাছে এলে স্বজনস্বজাতের বউ-ঝিরা এভাবেই ঝাঁপিযে নামে চারপাশ থেকে। কিন্তু এমন সুখের ভাবনা মগজে ঝাপট মারতেই শুকিযে আসে কলজের ভেতরটা। মেয়ে তার পরেব-ঘরে গেলেও এ-তো সেই পরের-ঘর নয়। পবের-ঘব সুখের-ঘব। শহরেব ঘর আপন-ঘর নয়।

কিংবা বুকের খুশিটুকু সর্বাংশে ফুরিয়ে যায় না। মেয়েকে সে দেখতে পেল জগদ্ধাত্রী মায়ের সাজে। নয়ন মেলে দেখতে হয় হরেক চিত্তির-আঁকা এমন রঙের জৌলুস। দেশপাড়াগাঁয়ে মাহিষ্যপাড়ায় কবে কোন্‌কালে কোন্‌ মেয়ে এমন রূপের বাহার নিয়ে এসেছে, এটুকন বয়সে? মেয়েকে সে আগলে রাখতে চায় দু-হাত বাড়িয়ে—'চল না কেনে লা, একবারটি বামুনবাড়িতে যাই। সব্বায় দেখবেন তোকে। দেখেন নি কদ্দিন।'

'না, আমি যাব নি। কোথ্‌থাও যাব নি...' ক্ষতবিক্ষত রাগে রাধা এই প্রথম কান্নায় ভিজে উঠল। দিশেহারা ক্রোধের উম্মাদনায় কিছু একটা করতে হবে বলেই যেন গলা থেকে ওড়নাটা উপড়ে তুলে দু-হাতের মুঠোয় দলা পাকাতে পাকাতে ছোট একটা বলের আদলে কুণ্ডলী বানিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল মাটিতে, ধুলোয় নোংরায়—থুঃ ওয়াক থুথু।

দেশগাঁ জুড়ে সব মানুষেব কপালে থুতু আর ঝ্যাঁটা আর ঘেন্না। শত্তুর, শত্তুর সবাই। জ্ঞাতিঘরেই শত্তুর হয় বেশি।

এবং এক লাফে ছুটে গিয়ে দিদির দামি আর নরম তুলতুলে বস্ত্রখণ্ডটুকু তুলে আনে পালান। অসহায় আক্রোশে রাধার ফোঁপানি বাড়ে।

কী ঘটেছে বা কতটুকু, কিছুই জানে না সুমতিবালা। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত চোয়ালে সে তাকাল চারদিকে, মানুষগুলোর চোখে। শাবকরক্ষায় বাঘিনীর হিংস্রতা যেমন-—'কী গ, কী হল? বলছ কি তোমরা?'

'বলব? কী আর বলব গ রাধুর-মা! সেই ত্যাখন থিক্যে যা লাখ-লাখ ট্যাকার গপ্‌পো শোনাচ্ছে তোমার মেয়ে...' কুটকচালে-বুড়ি মনুর-মা ইচ্ছে করেই লম্ফটা তুলে ধরেছে নাকের ডগায়—'অঁ যাও, তাই যাও। শুধু বামনবাড়ি কেনে গ, মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘরে-ঘরে যেয়ে দেইখ্যে এসো দশজনাকে। রাজকন্যে মেয়ে গ তোমার...'

'সে-ত যাবই গ, একশোবার যাব। হাজারবার যাব। কেনে গ, চোখ টাটাচ্ছে নিকি গ তোমাদের?' নখে-দাঁতে কামড়ে ধরাই আত্মসংরক্ষণ যদি, সুমতিবালা রণক্ষেত্রে প্রস্তুত। কিংবা নজর লাগতে পারে দশজনের—আশঙ্কায়, সবাইকে সাক্ষী রেখে মেয়ের মাথায় ছোট করে থু... থু... থু... তিনবার থুতু ছিটিয়ে সন্তানদের নিয়ে এগোতে চাইল ঘরের দিকে। বড় গলায় চিৎকার যতটা, ভেতরে ভেতরে অসহায় যন্ত্রণা—'বাপ-মরা মেয়ে গ তোমাদের ঘরের। শাকচচ্চড়িও জুটছিল নি এখেনে। কলকাতায় যেয়ে বাবুদের ঘরে যা-হোক দুটো ভালোমন্দ খেয়েপরে বেঁচেবত্তে আছে। সে-ও সইছে নি গ? এটুকুন এট্টা বাচ্চা, সেও বিষ হল গ তোমাদের চোখে?'

'শোনো কতা। যার মুখে যত বিষ, তার জিভ তত চেরা...' থকথক আঁধারের খুপচি থেকে আবার ফণা তুলেছে সনাতন সাঁতরা। এবার অনেক বড় দাবড়ানি—'বিষের কতাই উঠল য্যাখন, শোনো গ, সব্বায় শোনো ভালো করে। এত বাড় ভালো নয় মেয়েছেল্যাদের। যত্ত সব অনাছেষ্টি নিয়ে ঢুকবে ঘরে, আর মুখ ফুইট্টে সেটা বললেই দোষ? কেনে, ধম্মো নেই দেশে? দশজনকে নিয়ে সমাজ...'

ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও ফিরে তাকিয়েছে সুমতিবালা। শ্বশুরভাসুর মান্যিজনদের সাড়া পেয়ে মাথার-কাপড়টুকু টেনে নিতে হয় আরো বড় করে। বাঁ-হাতের আঙুলে

মুখটা আড়াল দিয়ে বউ-ঝিদের দিকেই চোখ। খামতি থাকে না গলার চড়ায়—'কার বাড়া-ভাতে ছাই দিতে গেছে গ মেয়েটা আমার? এমনধারা করছেন কেনে আপনেরা? এটুকুন এট্টা মেয়ে! এই সেদিনও ওকে ন্যাংটো পাছায় দেখেছেন আপনেরা সব্বায়, সে-মেয়ে আপনেদের শত্তুর হল?'

'আহা আহা, ষাট ষাট। তোমার মেয়ে আমাদের শত্তুর হবে কেনে গ রাধুর-মা? আরে ছ্যা ছ্যা, কী যে বলো! বড় আদরের ধন আমাদের...' আরেক খেঁকুড়ে মোড়লবুড়ো মাধব কুঁতি নেমে পড়েছে মাঠে। হেঁড়ে গলায় খ্যাঁকখ্যাঁক হাসিটা ফাটা-ঢাকে কাঠি নাড়ার মতো—'আমরা ওর বরাত দেখছি গ। তোমাব কপালগুণ। শ'র থিক্যে গতর খাইটে পয়সা আনছে মেয়ে! বোসো না কেনে আব কটা দিন। হাড়েমাসে ফুল্যে কেঁপে গায়ে রস ঝরুক আরেট্টু, ডাগরডোগর হোক, দেখবে পয়সা। মেয়েছেল্যার শরীর বলে কত্তা...'

এরপর আর মাথাটাথা ঠিক থাকে না কারুর, যদি সে মেয়েছেলেই হয়, এবং মা। সম্পর্কে ভাসুরঠাকুব হলেও ঘোমটা খুলে যায় সুমতিবালার—'কেনে গ, মুখে লোলা ঝবচে গ আপনেদের? ভারি যে গাজ্জিয়ান হয়্যাচেন সতীনক্ষ্মীদেব! পেটে সুঁটকি মেবে মরলে বাচ্চাদেবকে দেখবেন গ আপনি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা, লাতির বযেসী এট্টা মেয়ে! তিনকাল খেকো বুড়োর এ-কেমনধারা ব্যাভার বল দিনি? শুনেচ গ, শুনেচ ত তোমরা দশজনে...'

শুনেছে সকলেই। কিন্তু শোনা বা না-শোনার ভাগাভাগিটা বাছাইয়েব মধ্যে চলে যায়। না-শোনার ভান যাদের, কথা বলছে না কেউ। দূরে-দূবে সরে থাকে। এবং যাবা শোনার মানুষ, বড় বেশি করে শোনার আধিক্যেই জোট বেঁধে ফেলে নিজেদের। যুদ্ধু... সত্যি-সত্যি যেন যুদ্ধই বেঁধে গেছে একটা। ঢালতলোয়ার নেই, লাঠিসোঁটা নেই — দাঁতজিভচোয়ালে বাদ্যি বাজানোরই এমন দাপট, চাবদিক থেকে শ্যালকুকুবের ঘেউ-ঘেউয়ে যা হয়, আঁধারে গা লেপটে কালো কালো মানুষগুলি...বুড়োবুড়ি ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে ঘরদোর কাঁপিয়ে শাপান্তি গাইছে কার? পুঁচকে মেয়েটার? না-কি ওর মাঁয়েব? মা বেচে খায় কলমি শাক, বেটির গায়ে পোশাকের জাঁক।

মস্ত একটা কালো মোষের আদলে আকাশভাঙা ঘুটঘুট্টি আঁধাবে যে-দুচাবটে লম্ফ হাতে-হাতে ঘুরছিল অথবা জ্বলছিল আশেপাশে ঘরের দাওয়ায়, গরিবগুব্বো মানুষেব চেয়ে ওগুলো আরো হতভাগা। এক ফুঁ-এর জান। তবু টিকে থাকে। উঠোনের এক ধারে, জটলা থেকে দূবে, এক কোণে আলাদা হয়ে যায় সুমতিবালা। সিঁধিয়ে থাকে চুপচাপ।

কী আশ্চয্যি। মেয়েটা নেই কাছেপিঠে। পালানও নেই। ভাইকে নিয়ে কখন কোথায় পালিয়ে গেছে দিদি!

চন্দ্র নেই, সুয্যি নেই। আকাশভরা অমাবস্যের আঁধার বুকে নিয়ে ঘরেব দিকে পা বাড়িয়েছিল সুমতিবালা। কিন্তু কখন যে লাঠি ঠুকে ঠুকে কাছে এসে পড়েছিল সাঁতরাদের ঘরের কুঁজো বুড়ি, হুঁশই ছিল না। ডাকছে পেছন থেকে—'বউ, অ বউ! যাচ্ছিস কুথাকে? পালাস কেনে, শোন্, আয় ইদিকপানে। কত্তা শোন্ এট্টা...'

বুঝি ধেনোপচাইয়ের গা-ঘুলনো গন্ধ ছিল কোথাও। নাকেমুখে আঁচল-চাপা ছিল সুমতিবালার। কিংবা তার নিজেকেই আড়াল দিতে চাওয়া, চোখের জল লুকোনোর সাধ অথবা ঘেন্না।

'অই মুখপোড়া মিনসেগুলার কতা শুনিস কেনে লা তুই? কাঁদিস কেনে?'

নাকমুখচাপা আঁচলটা এবার দু-হাতের পাতায় এসে গোটা মুখ ঢেকে ফেলতে চায়। কাঁদতেই চেয়েছিল সুমতিবালা। কিন্তু অবাক মানে। শ্বশুরভাসুর-গোছের জ্ঞাতিপড়শি মান্যিজনদের নাম মুখে আনতে নেই মেয়েছেলেদের। এক উঠোন মানুষের হাটে দাঁড়িয়ে, ঘোমটা খুলে, আজ সে গালমন্দ কত কিছুই করল ওনাদের সঙ্গে। পাপ? কিন্তু এ -কী গ? নিজেব পেটে ধরেছে যাকে, সেই তিন-ছেলেব-বাপ সনাতন সাঁতরাকে মুখপোড়া বলছে বুড়ি? এ-কেমনধারা মা?

মাংস-ঝোলা গালে একটা-কি-দুটো দাঁত এখনও আছে হয়তো। চার-কুড়ি বয়স পেরিয়ে যে-বুড়ির শিরদাঁড়া বেঁকে এসে ভেঙে পড়েছে মাটিতে, সেখানে ঘন আঁধাবে এখনও ফোকলা দাঁতেব হাসি থেকে যায়—'মাযেদেব মাইয়ের তলায় কলজের ভিত্‌বে মৌমাছিব চাক থাকে লা বউ। সেখেনে মধু জমে কেবমে কেরমে। মধু গড়ে যারা, ওবা ত হুলও ফোটায় ব্যা। সইতে হয়, মায়েদের সইতে হয় জ্বালা।'

আগড়ুম-বাগড়ুম প্রলাপ শোনার জন্য আর দাঁড়ায় না সুমতিবালা। পালায, সত্যি সত্যি পালিযে আসতে হয। গেল কোথায় বাধু? অ্যাদ্দিন বাদে ঘরে এল মেয়েটা, সে-ও সইছে না কারুর? এ-আরেক জ্বালা।

নিজেব ঘবেব দাওয়ায় এসে আমেরিকায় বিভোর ছিল রাধা। দেখাচ্ছিল আর-সব মেয়েদের।

শ্যালশুক্‌নির চিল্লানিতে যথেষ্টই রাগে ফুঁসছিল সে। যেহেতু জ্যান্ত মানুষ, ভীষণভাবেই জ্যান্ত—ভাগাড় থেকে পালিয়ে আসার পর আর রাগ থাকে নি। ব্যাপজ্যাঠাখুড়োদাদা মায়েদের নজর এড়িয়ে অল্প বয়সী মেয়েরা অনেকেই পায়ে পায়ে সঙ্গে এসেছে তার। কেদার কুঁতির ঘর ডিঙিয়ে এপারে এলে ছোট উঠোনটুকু যখন অনেকটাই ফাঁকা, রাধাকে পাওয়া যাচ্ছে নিবিবিলি একা, দু-চার পাঁচ বছর ফারাকের দিদি বউদি পিসিবা সবাই এসে ঘিরে ধবল তাকে। অনেক জানে রাধা। রাধা জগৎ চেনায়।

ঘরের দাওযায় টোপাকুলের আদলে লণ্ঠনের আগুনটুকু জ্বলছিল। স্বর্গমর্ত্য-জোড়া বিশ্ব-আঁধারে রাধার বুকে অগ্নিশিখায় চমকে চমকে উঠছিল লাল পাথরের চুনি, হীরের চকমকি। গোটা বুক জুড়ে অসংখ্য চুমকি রাতের আকাশে নক্ষত্রশোভায়।

ওপাশের উঠোনে হল্লাচিৎকারের সোরগোলে লক্ষ করেছিল অনেকেই। সাহস হয়নি কিছু বলাব। এদিকের উঠোনে বাধাকে কিছুটা আলগা পেয়ে সরাসরি হাত বাড়িয়ে লকেটটা ধরল ব্যাচা পাত্রর মেয়ে কমলা—'এটা কী র‍্যা রাধু? এ-সত্যি সতি৷ পাথর নিকি র‍্যা? অ্যাঁ! এটা তোর?'

'আমার নয় ত আর কার হবে? তোমার?'

'না না সে-নয়...' রাধার চেয়ে বছ্ব কয়েকের বড় কমলা গাঁয়ের ইশকুলে ক্লাশ নাইনে পড়ে। রাধার গলায় হাত রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল অবিশ্বাস্য রত্নসামগ্রী। ওত পেতে ছিল সবাই—'এ-যদি আসল জিনিস হয় ত এ-যে অনেক ট্যাকা দাম র‍্যা! হাজার হাজার ট্যাকা। কী পাথর র‍্যা এগুলো?'

'এমেরিকা গ, এমেরিকা...'

'আমেরিকা? কী বলছিস যা-তা! সে-ত একটা দেশেব নাম...' কমলা ভ্রূ-কুঁচকোল —'সে-ত ভূগোলের বইয়ে পড়েছি আমরা। পশ্চিম গোলার্ধের মস্ত বড দেশ। আমাদের যখন দিন, তখন বাত হয ওদের ওখেনে...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। নইলে আর বলছি কী?' বাধা ডগমগ। বেজায় খুশি। বিজ্ঞের ভঙ্গি—'রাতকে দিন কবতে পারে গ ওবা। দিনকে রাত বানায়। যাও নি ত কলকাতায়। গেলে দেখতে—হুলুস্থুলু কাণ্ড সব হচ্ছে সেখেনে...'

'যা মলো যা! তোকে কি বলছি, আব কী বলছিস তুই?'

'কেনে?'

'এমনধারা এট্টা সোন্দর হার গলায় ঝুইল্যে তুমি ঘুবে বেডাচ্চ গ...' খুবই শান্তভাবে এবং সংশয়ে সুখন সামন্তর কচি বউ—'এগুলো খাঁটি-খাঁটি পাথর ত গ?'

'কেনে, সন্দ হচ্ছে গ তোমাদেব?' রাধা ক্ষেপে গেল। টনটন বাগে এক লাফে দাওয়ার ওপর—'এত করে বলছি তোমাদের...ফরেন, এক নম্বরি ফরেন মাল। এই যো যা যা পরে আছি দেখছ, সব খাঁটি-খাঁটি ফরেন মাল। দিদি-জামাইবাবু এলেন সেবারে। সবার জন্যেই একটা-দুটো করে এনেছেন কিছু। হাজাব-হাজার ট্যাকার জিনিসপত্তর সব। সেসব সাতজন্মে দেখবে নি গ তোমরা কেউ। আমাকেও দিলেন এই...এই একটা। কত ভালোবাসেন আমাকে...'

হীরেমুক্তোচুনিপান্না—চেনা হলো না কোন্‌টা কোন্ পাথর? জানা গেল না, আসল-নকলের দর-কদর। ওপাশের আঁধার ডিঙিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে এমন হুডমুড়িয়ে হামলে পড়ল সুমতিবালা, জটলা বেঁধে ছিল যেসব মেয়েরা, প্যাকপ্যাক হাঁসেব দল তাড়া খেয়ে একসঙ্গে ছিটকে ছিটকে পড়ল দূরে—কালিঝুলিমাখা লণ্ঠনের লালচে আলো গিয়ে পৌঁছয় না যেখানে, উঠোনের কোণে কোণে, পড়শিদের ঘরের দাওযায়।

দিশেহারা বিভ্রমে চামুণ্ডা মা—'ফের...ফের তুই এখেনে এসে কেরামতি দেখাতে লেগেছিস র‍্যা পোড়ামুখী? আবাগি, লাজ নেই সরম নেই তোর? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন...'

বেহুঁশ আস্ফালনে ধাবেকাছে লাঠিঝাঁটা কিছুই খুঁজে না পেয়ে, লাফালাফিতে, দাওয়ার কোণে দাঁড়-করিয়ে-রাখা একটা পিঁড়ি হঠাৎ চোখে পড়তেই চকিতে তুলে নিয়ে যখন মেয়েকে সরোষ আক্রমণ, হতচকিত রাধা আত্মরক্ষায় ঝাঁপিযে নামল উঠোনে।

এবং অবোধ ক্রোধে শুধু ঘেন্না...ঘেন্নার বিষই উগরে উঠতে চায। সুমতিবালা, আলোআঁধারি দাওয়ায় যাত্রাপালার আসবে বুঝি কোনো উন্মাদিনী, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল উঠোনের দিকে তাকিয়ে—অন্ধকাবে স্পষ্ট দেখা যায় না যাদেব, অথচ যারা আছে,

ছায়া-ছায়া শরীরে তামাশা দেখার মানুষ— 'কেনে, কেনে তোরা এয়েছিস র‍্যা হারামজাদিরা? দূর হ, দূর হয়ে যা আমার দোর থিক্যে। কেনে লা? মুরদ নেই তোদের বাপ জ্যাঠাদের? অতই যদি চোয়াল বাজাবেন র‍্যা, যা না... বল্ না গে তেনাদেরকে —সাতনরী হার গইড়্যে দেবে তোদের সব্বায়কে। আমার ঘরে কেনে এয়েছিস চোখখাকি গুখাকি ঘরজ্বালানি আঁটকুড়্যার বেটিরা? আমার মেয়ে লষ্ট মেয়ে র‍্যা, বেবুশ্যা...'

তর্জনে গর্জনে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে যত দাপট, শেষ পর্যন্ত বর্ষণেই ফুরিয়ে যায় মেঘ। মাটি ভেজে না। জগৎসংসারেরও যায়-আসে না কিছু। শুধু নিজেকেই পুড়ে মরতে হয় দহনজ্বালায়। দেহে মনে দেউলে সুমতিবালা ভেঙে পড়ল নিজের ঘরের দাওয়ায়। এক-কাপড়ের আঁচলটুকুও খসে পড়ে গা থেকে। উদোল বুকে হুঁশ থাকে না। গোটা শরীরটাই গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। চিনচিনে একটা ব্যথা আছে পেটের ভেতর। পিত্তিবমির ধাঁচ। বুকে যন্ত্রণা। পালান জানে মায়ের ব্যামোগুলো। উঠোনের এক ধারে পাথর হয়ে ছিল ছেলেটা। ছুটে এল।

রাধা জানে না, এ-মায়ের নিয়ম। ঘুঁটেগোবরের গন্ধমাখা রাতকানা অন্ধকার বিচ্ছিরি লাগছে তার। অ্যাদ্দিন বাদে ঘরে ফিরল সে, তাকে নিয়ে কী যে কাকের চিল্লানি হিংসুটে লোকগুলোর? কিংবা সে সইতে পারছিল না নিজের মাকেই। ধড়াচূড়া ছেড়ে মুন্নিদিদির হাউসকোটটা পরে দাওয়ায় বসে একটু জিরোবে, ভাবছে যখন, মটকা মেরে কাৎরে পড়ল বুড়ি। তিতিবিরক্তিতে ঘরের দিকে পা বাড়াল একা। লণ্ঠনের ম্যাটমেটে লালচে আলোয় তার কিশোরী শরীরের চেয়ে দশগুণ বিশগুণ বিশাল ছায়াটা মেটেঘরের দাওয়া ছাড়িয়ে উঠোন ছাড়িয়ে ভুবনজোড়া আঁধারের আদল পেয়ে যায়।

এবং এভাবেই দীনদরিদ্রের জীর্ণকুটিরে সরাসরি ঢুকে পড়ল —কী যেন নামটা বলল বেশ? এমেরিকা? দূরে দাঁড়িয়ে দেখল সবাই। পড়শিদের ঘরের হাড়হাভাতে ল্যালঠা মেয়েরা—এমেরিকা কপাল ফেরায় মানুষের। এমেরিকা গ্রহবত্ন হীরেমুক্তোর নাম।

শুধু তো আমেরিকা নয়, হোমিওপ্যাথ ওষুধের ফোঁটায় ফোঁটায় অত বড় শহর কলকাতাও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে গোটা দেশের এখানে-ওখানে, মাটিতে। ভাগ্যিমানী যারা, সে-শুধু তারাই পেতে পারে কিঞ্চিৎ প্রসাদভোগ।

পরদিনই সূয্যি ওঠার পর রাত্তিরটা ভুলে গেল সুমিতবালা। রোজগেরে মেয়ে ঘরে ফিরেছে তার। শুধু তো ডাকের-সাজে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নয়। ঘরসংসারের দিকেও মেয়ের টান আছে বেশ। কত কি এনেছে সঙ্গে। বিদেশবিভুঁইয়ে কাজকাম করলে ঘরে ফেরার দিনে এমন অনেক কিছুই নিয়ে আসে ব্যাটাছেলেরা। কিন্তু এটুকুন মেয়ে যদি এখন থেকেই এত বোঝে সংসারের-বুঝ, খুশি হতেই হয়। ভুলতেই হয় জ্ঞাতিকুটুম পড়শিদের হ্যাংলাপনা।

সূয্যিমুখী তেলের বাহারি বোতল বা একটু-আধটু ছেঁড়াফাটা পুরনো হলেও গোটাতিনেক শাড়ি ব্লাউজ শায়া সুমতিবালার নিজস্ব প্রাপ্তি। এমনি করেই এর আগে ছোটমতো একটা গোল ঘড়ি নিয়ে এসেছিল মেয়ে। ভাঙা ঘরের কুলঙ্গিতে আজও

আছে। পালান দম দিত রোজ। খারাপ হয়ে যাবার পর আর সারানো যায়নি। একটা ট্র্যানজিস্টার। পালান গান শোনে। মশলা ফুরলে খামোকা বাজে-খরচের পয়সা গুনতে হয় দু-মাসে এক মাসে একবার।

কিন্তু আজ শিশু পালান ভাবতেই পারে না, এমন সব তাজ্জব-তাজ্জব জিনিসপত্তরও নাকি আছে পৃথিবীতে? নতুন ধরনের চুম্বকী লুডোতে যত চমকই থাক, ওয়াকম্যানের বাহাদুরি তার বিস্ময়ের চোখজোড়ায় পলক ফেলতে ভুলিয়ে দেয়। ইশকুলের পড়ার-বইয়ে পড়েছে সে—জলাতঙ্ক রোগের ইনজেকশান আবিষ্কার করেছিলেন লুই পাস্তুর, পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নামে আরেক সাহেব, 'গাছেরও যে প্রাণ আছে' প্রমাণ করেছিলেন বাঙালি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু ডাক্তারববাবুরা যেমন করে দু-কানে নল ঢুকিয়ে বুক পরীক্ষা করেন সকলের, সেভাবেই যে একা-একা এমন গান শোনা যায়, সে-গান আর কেউ শুনবে না, যার কান, শুধু সেই শুনতে পাবে — এমন বিস্ময়কব এক আবিষ্কারের নাম কেন যে তার বিজ্ঞানের বইয়ে থাকবে না, সেটাই অবাক করছে তাকে। দিদির দিকে সবিস্ময় কৃতজ্ঞতায় তাকিয়ে থাকে সে। এ-জিনিস যে তাকে শহর থেকে এনে দেয়, সেই দিদি প্রতিভাময়ী।

এবং সেই দিদির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি হুলুস্থুল বেঁধে গেল সকালবেলা। একবার হাতে পেয়ে যাবাব পব পালান ছাড়বে না তার নতুন বিস্ময়। বুঝিয়ে-শুনিয়ে ভাইকে শান্ত করতে রাধাব হিমসিম —'এ-ত তোরই জন্যে রে। তুই-ই রাখবি। একবারটি, শুধু একবারটি বামুনবাড়ি ঘুরে আসব। যাব আর আসব। সে-আর কতক্ষণ?'

পালান নাছোড়। দিদিই যদি ঘুরে-ঘুরে মশলা ফুরিয়ে দেয, সে আর পাবে কী? ইশকুলে নিযে যাবে সে। তাক লাগিয়ে দেবে সবাইকে। মাস্টারমশাইরাও দেখেন নি এমন জিনিস। কড়কড়ে দশটা-টাকার নোট ঘুষ দিতে হলো রাধাকে। ব্যাটারির দাম। কত কত প্যাসেঞ্জারবাবুরা নিত্যি যাচ্ছেন কলকাতায়। বললেই এনে দেবেন যে-কেউ। মগরা-চুঁচুড়ায়ও তো যাচ্ছেন-আসছেন অনেকেই। চাই-কি বেলমুড়ি ইস্টিশনের বড় বড় দোকানেও পাওয়া যেতে পারে। দেশগাঁয়ে কী না পাওয়া যাচ্ছে আজকাল!

মেটেঘরের গুমটির ভেতর ঘামেগরমে কাল রাতে ঘুম হয়নি ছিটেফোঁটা। আকাশবাতাসে নিড়নি দিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতেই খুপরি ছেড়ে বেরবার তাড়ায় হাঁসমুর্গি পায়রার মতোই ডানা-ঝাপটানি শুরু হয়ে যায় রাধার এবং ওয়াকম্যান যন্ত্রটা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে একটা আপসে পৌঁছনোর পর সে ছুটল তার পেখম মেলে। ছোটি ছোট শাদা বেলফুল বা শিউলির নকশা-ছড়ানো বাহারের আকাশী রঙের একটা কাফতানই সকালের জন্য বেছে নিয়েছে সে। আকাশ-পরীর মতো ডানা মেলে উড়ে যাবার ভঙ্গিতে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঢেউ খেলিয়ে দোল খেতে খেতে তার ছুট। সামন্তদের শরিকি পুকুরের ধার ঘেঁষে মন্দিরবাকুলের পাশে শীতল আষের তিনতলা পাকা দালান, নন্দ বাখুণ্ডীর হাসকিং মেশিনের কল, প্রাইমারি ইশকুলের পেছন দিয়ে ঝোপজঙ্গল ডিঙিয়ে যাবার পথে পুকুরঘাটে বাসন মাজতে কাপড় কাচতে বা নাইতে এসেছিল যে-মেয়েছেলেরা কিংবা পঞ্চায়েতের রাস্তায় পথ-চলতি হরেক মানুষ, দেখল সবাই। দেশগাঁয়েও একেবারে তাক লেগে যাবার মতো এ-আর তেমন কিছু নয় আজকাল।

লেখাপড়ার চল আছে যাদের ঘরে, তাদের মেয়েরা, এমন কি সোমত্ত বয়সেরও অনেক মেয়ে এসব ম্যাকসিফ্যাকসি গায়ে চাপিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় বাড়ির ভেতর। বাইরেও আসে কেউ কেউ। রাধার খারাপ লাগে, তার কানে বা মাথার চুলে আটকানো গান-শোনার যন্ত্রটাও নজর কাড়ছে না কারুর? প্লাস্টিকের হেয়ার-ব্যান্ডই ভাবছে হয়তো। কিংবা তার জামাটা? এ-জামার রকমসকম আলাদা, আলাদা ছাঁটকাট। সাতজন্মে গাঁয়ের মানুষরা দেখে নি কেউ কোনোদিন। দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে ছুটলে বগলের তলায় অনেকটাই বাড়তি কাপড় লতপত লতপত ওড়ে নিশানের মতো। আঁধার রাতে বাদুড় যেমন।

এবং রাতকানা নিশাচর বাদুড়ই যদি সে, শিখে ফেলেছে রাধা, আঁধারে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় কখন গিয়ে চোখ বুজে ঝুলে পড়তে হয়, যেখানে তার নিজের আখের। অথবা যদি ভোরের বাতাসে ফুরফুরে রঙিন প্রজাপতি, খুঁজে নিতে পারে মধুভাণ্ড তাব।

লাফাতে লাফাতে এক সময় সে বামুনবাড়ি পৌঁছে গেল। অনেক দিন পর আসা। প্রথমই কাঁড়িকাঁড়ি পেন্নামের পালা। অথচ যাঁদের জন্য পেন্নাম, সাতসকালে সকলেই সংসাবের নানা কাজে ব্যস্ত বলেই পা-গুলোও পাওয়া যায় না ঠিকমত।

সদর ডিঙিয়ে উঠোনের দিকে এগোতেই ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরে মস্ত নিমগাছ আমগাছ খড়ের-পালুইয়েব ওপাশে গোয়ালের বাইরে দুধ দুইতে বসার আয়োজন চলছে বামুনবাড়ির মেজজেঠু আর বড়-জ্যাঠাইমার। দুধের বালতি আর তেলের বাটি তখনও চারপেয়েদের লাথির নাগাল থেকে অনেক দূরে। ডাবায় মাথা গুঁজে ভারিক্কি পণ্ডিতী চালে পোয়াল চিবচ্ছে গাইগরুটা। উদোল গায়ে হাঁটু ভেঙে বসে মায়ের বাঁট থেকে বাছুরের মুখ কেড়ে নেবার লড়াইয়ে মেজজেঠু নাজেহাল। দাঁতমুখ খিঁচে গোটা শরীর বাঁকিয়ে বাছুরের ফাঁস টানছে বাড়ির ছোকরা চাকরটা। কাছাকাছি আছেন বড়জেঠি। ছেলেবেলা থেকেই মায়ের চেয়েও বয়সে বড় এই বড়জেঠিকে বড্ড ভয় রাধার।

দূর থেকে ওঁদের দেখল রাধা। পলক ঘুরিয়ে নিতে যেটুকু সময়।

মস্ত দালানবাড়ির গা ঘেঁষে রাধা উঠোনে ঢুকল। রবিবার। আপিশ ছুটি। কিন্তু সকাল-সকাল কোথায় যাবেন বলে সাইকেল টেনে নিচে নেমেছেন বড়জেঠু। হাত বাড়িয়ে ছুটে যেতেই রাধা আহত হলো।

'দাঁড়া, দাঁড়া র‍্যা বাপু। ওসব হবে, পরে হবে। এখন একদম সময় নেই...'

কী যে ছাই এত কাজকাজ বড় ঘবের বড় বড় মানুষদের। তড়িঘড়ি সাইকেল গড়িয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। এত কাল বাদে দেখা। একটা পেন্নাম নেবারও ফুরসত নেই গ?

কিছু যায়-আসে না রাধার। বামুনবাড়ি তার আপনঘর। সাহেববাড়ির মতোই। জন্মো থেকেই দেখে আসছে, বাপ মরে যাবার পর ওদের ভাইবোনদের নিয়ে বামুনবাড়িব খুঁটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে বেখেছে মা। নাগাড়ে-কিষেনদের মতো বাঁধা-কাজ বা নিত্যি-খোরাকির জন নয়। সকাল-সন্ধেয় গাঁয়ের ঘরে-ঘরে নানাদিকে কাজের ফিকিরে মাকে ঘুরতেই হয় রোজ। কিন্তু ঘোষালবাড়িতে, হেঁশেলের বাইরে, যদি ভারি কাজ থাকে কোনোদিন—ধানসেদ্ধ মুড়িভাজা চিড়েকোটা বা বিছানাপাটির চাদর ধোয়াধুয়ি, নতুন

উনুনপাতা, হরেক কাজে রাধুর-মাকে চাই-ই বামুনবাড়িতে। অঘ্রাণ-পৌষ মাসে ধানতোলার দিনে অষ্টপ্রহব কাজের চাপ। সুমতিবালা থাকবেই সেখানে। অথবা ছেলেমেয়ে নিয়ে টিকে থাকতে চাইলে নানান শলাপবামর্শে মাথার ওপর কাউকে তো চাই-ই একজন বিধবা মেয়েছেলের। মায়ের কাছে বামুনবাড়িই শেষ কথা গোটা গাঁয়ে।

শহরে সাহেববাড়িতে মেযের ভাত, গাঁয়ের বামুনবাড়িতে মায়েব বরাত। শহর আর গ্রামের দূরত্বে, সাহেববাড়ি-বামুনবাড়ির ফারাকে ওদের মায়ে-ঝিয়েও অনেকটা তফাত ঘটে যেতে থাকে। মাঝেমধ্যে গাঁয়ে এলে মায়ের ভুবন দেখতে চলে আসে বাধা। অথবা বলা ভালো, দেশের বাড়িতে নিজেব হাঁসফাসে বামুনবাড়িতেই তাব কিছুটা খোলামেলা নিঃশ্বাস। গাঁযে বামুনবাড়ি তো একটাই নয়। বামুনবাড়ি মানে সবাই পয়সাওলা-ঘরও নয়। তেমন পয়সাওলা-ঘর না হলে এখন আর কোথাও সে তেমন করে খেলাতেও পারে না নিজেকে। অভাবী ঘবেব মানুষগুলো বিচ্ছিরি। সবাই তাব মায়ের মতো। বড্ড খাই-খাই, শুধু আদিখ্যেতা।

কিন্তু শহরেব পয়সা আব গাঁয়ের পয়সায অনেক...অনেক ফারাক।

বাচ্চা বয়সেব রাধা ফাবাকটা বোঝে। মায়ের কাছে শুনেছে সে, অনেক কাল আগে নাকি এমন ভরভরাট সুখের ঘর ছিল না বামুনবাড়িব। কোন্ এক সময় সীতানাথ ঘোষাল না কে ছিলেন; মস্ত তান্ত্রিক জ্যোতিষী আর কববেজ বলে চাবপাশের দশটা গাঁয়ে নামডাক ছিল খুব। বিষয়সম্পত্তিও করেছিলেন কিছু। এখন তাঁব নাতিপুতির দিনে বসতবাটি জমিজিরেত সব কুমড়োর ফালির মতো ভাগ হতে হতে যার ভাগ্যে যেটুকু জুটেছে, ওতে দিনগুজবান চলে না কারুর। পুরনো বামুনবাড়ি গাঁয়েব ভেতরের দিকে--জয়চণ্ডীতলায়। সেখানে লোকনাথ ঘোষাল ছিলেন একজন গণ্যিমান্যি মানুষ। ইশকুল-কলেজের পাশ দিয়ে, সেই স্বদেশী যুগে, শহরে গিয়ে বড় ইশকুলেব হেডমাস্টার অব্দি হয়েছিলেন একসময। গোবা সৈন্যদের জেলের-ভাত খেয়েছেন গান্ধী মহারাজেব চেলা হয়ে। ইশকুলেব ছাত্রদেব জন্য পড়াব-বই লিখে পয়সাও কামিয়েছেন বিস্তর। সাত-শরিকের পুরনো ভদ্রাসনে যখন আর-সবাই মেটেঘবের ভেতরেই গুঁতোগুঁতি করে মরছিল, বুড়ো বাপ লোকনাথ ঘোষাল বেঁচে থাকতেই, বাপেবই পযসায় তাঁব ছেলেরা বাপঠাকুদ্দাব ভিটে ছেড়ে মন্দিরবাকুল পাড়ায় নতুন জমি কিনে দোতলা পাকা বাড়ি হাঁকিয়েছে পেল্লাই। সবই শহরেব কায়দায়। স্যানিটারি পাযখানা, টিউবওয়েল-বসানো বাথরুম, ঘরে-ঘরে বিজলি বাতি, পাখা, চকচকে ঝকঝকে খাটআলমাবি টেবিলচেয়ার আসবাবপত্তর। ভেতরের দিকে লম্বা উঠোন। ধানেব-মরাই খড়ের-পালুই গোয়ালঘব, আলাদা ঠাকুরদালান। মোটামুটি ভালো জমিজমা। সম্বৎসর চাষেব-চালেব ভাত। শুধু আলুর চাষেই বছর-বছর অঢেল পয়সা। ভাগের পুকুব আছে গোটা দুয়েক। বাড়ির লাগোয়া নিজেদেব পুকুর একটা। এতেই কি শেষ আছে? উপযুক্ত চাব ছেলে। তাঁদেব বউছেলেমেয়ে নিয়ে ধনপতি সদাগবেব সুখে ভরাট সংসার। বড়ভাই প্রমথ ঘোষাল নিত্যি রেলগাড়ি ঠেঙিয়ে চাকরি করতে যান কলকাতায় কোন্ আপিশে। মেজভাই সুমথ ঘোষাল চাষ-আবাদের দেখভাল ছাড়াও গাঁয়ের মস্ত মাতব্বর। পঞ্চায়েতের মেম্বাব। পাট্টিব

লিডর। সুরথ ঘোষাল একটু আত্মভোলা আলাদা মানুষ। বাপের মতোই ইশকুলের মাস্টারমশাই। পুইনানের দিকে কোন্ এক গাঁয়ে সাইকেলে নয়তো বাসে চেপে যেতে হয় রোজ। বেলমুড়ি ইস্টিশনের নতুন গঞ্জ এলাকায় সারখোলের দোকান দিয়েছেন ছোটছেলে মন্মথ ঘোষাল। জমাটি কারবার।

কিন্তু হলে হবে কী? বামুনবাড়ির জ্যাঠাকাকারা ইশকুল-কলেজের পাশ দিলেও দেশগাঁয়ে ইংরিজির চল নেই তেমন। ইংরিজি ইশকুলে পড়ে না ছেলেমেয়েরা। সাহেববাড়ির মায়ের সঙ্গেও পাড়াগাঁয়ের মায়েদের ফারাক অনেক। গেঁয়ো-গেঁয়ো ভূতো-ভূতো পুরুষমানুষগুলোও যেন কেমন-কেমন! লুঙি পরে উদোল গায়ে, বড়জোর একটা গেঞ্জি নয়তো জামা গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াবে রাস্তাঘাটে। বাথরুম চেনে না।

সদর দরজায় মেয়েটাকে এতদিন বাদে ঢুকতে দেখেও কোনো রকম আমল না দিয়ে প্রমথ ঘোষাল যেভাবে সাইকেল্ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, ক্ষুব্ধ অভিমানে রাধা ঠোঁট উল্টেছিল ঠিকই। সে-আর কতক্ষণ? হাঁসের মতো গা-ঝাড়া দিয়ে এসব বাবুয়ানির চাল সে সাফ করে নিতে পারে নিজেই। তার ভারি বয়েই গেল। মাথায় আঁটা ছিল যে-গান-শোনাব যন্ত্রটা, খুলে, হাতের মুঠোয় নিয়ে বামুনবাড়ির ভেতরের দিকে তার ছুট।

মস্ত উঠোনের পুব দিকে, পাকা দালান থেকে দূরে খড়ের-ছাউনি-মেটেঘর, যে-ঘরকে এ-বাড়িতে ঢেঁকিঘর বলেই জানে সবাই, তার রোয়াকে শাদা থান কাপড়ে জবুথবু বসে থাকতে দেখল বুড়ি-ঠাকুরমাকে। কবে নাকি কোন এককালে ঢেঁকিফেঁকি কী-একটা ছিল ওঘরে। ঢেঁকিটা এখনও আছে। হেলে পড়ে আছে একদিকে। ঘুণ ধরেছে কাঠে। আরো হাজারটা হাবিজাবিতে ঘরটা গুদোমঘর হয়ে ওঠার পর এখন ছুঁচো ইঁদুর উই চামচিকের বাসা। বুড়ো আর বাতিল ঢেঁকির মতোই তিনকালখেকো বুড়ি রোজ ভোরবেলা ঢেঁকিঘরের দাওয়ায় উঠে ঠায় বসে থাকবে সকালবেলার এক প্রহর দেড় প্রহর অব্দি। নাতি-নাতনীতে ভরাট সংসারের ছুটোছুটি দেখবে ছানিগলা চোখে। ঢেঁকিছাঁটা চাল নাকি খেতে ভালো ছিল খুব। অসুখবিসুখ হতো না কারুর। লোকে বলে। রাধা শুনেছে।

ধানকলে-ছাঁটা-চালের ধবধবে শাদা ভাতের রঙে থান-কাপড়ের পুঁটলিতে এমন থেবড়ে বসে ছিল বুড়ি, কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দুর্লভ শ্রীচরণ খুঁজে পায় না রাধা।

'কে? কে লা তুই?'

'কাল এয়েছি গ। তুমি ভালো আছো ত?'

'অ নক্ষ্মী? নক্ষ্মী নিকি?'

লক্ষ্মীদি—বুড়ির বড়-ছেলের ঘরের প্রথম নাতনী। বিয়ে হয়েছে কোথায় কোন্ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার গাঁয়ে। রাধা চেঁচাল—'আমি রাধু গ ঠাম্মা, রাধু। অনাদি কুঁত্তির মেয়ে গ...'

'অঁ...' কাঁপতে কাঁপতে ঝুলো-ঝুলো মাংসের প্যাকাটি গোছের হাত বাড়াল বুড়ি। নাতনীকে আশীর্বাদ—'সুখে থাক দিদি, সুখে শান্তিতে ঘরসংসার কর। ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে শাঁখা-সিঁদুরে বেঁচেবত্তে থাক বাছা...'

আ মলো যা! চোখেও দেখে না বুড়ি। কানেও শোনে না। পিছিয়ে এসেছে রাধা। তার নিজেরও বিপদ—বামুনবাড়ির বিধবা! হাজারগণ্ডা শুচিবাই। সাতসকালেই কী-জানি-কী হয় ছোঁয়াছানিতে।

গলিত চোখের দৃষ্টি হাত বাড়িয়েও নাগাল পায় না কারুর। আশীর্বাদ ফিরে যায়। প্রসারিত জীর্ণ হাত খোঁজে কাউকে। খিনখিনে গলার স্বর—'আ ল মেয়ে, গেলি কোথা? বলি, ছেলেপুলেরা কোথা তোর? খেতে দিয়েছিস কিছু? বল্ তোর মাকে। শ্বউরশাউডি তেনারা ভালো আছেন ত র‍্যা? আমার নাতজামাই? কী যেন নাম...'

মরণ! রাধা এক লাফে দাওয়া ছেড়ে নিচে। শান্ত ঝিমনো সকালে চোখ-ধাঁধানো ঝলমলে রোদের ঝালর। মস্ত লম্বা উঠোন জুড়ে দানা খুঁজছে, মাটি ঠোকরাচ্ছে গোটা কয়েক কাক শালিক। দুটো-তিনটে পায়রা এসে বসেছে ওপাশে। গাছে গাছে অদৃশ্যে হরেক পাখির ডাক। ভোরবেলার কাকের চিল্লানি থামে নি তখনও। ঘর থেকে ঘরে, বারান্দায় দরদালানে উঠোনে চড়ুইদের দুরন্ত ছুটোছুটি। অন্যদিকে পাকা দালানের বারান্দায় আচার-ফাচারের বয়ম। কুলোয় ভরে থালায় ভরে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে কিছু। উঠোনের তারে দুটো মাত্র ভেজা-শাড়ি ঝুলছে এক পাশে। দূরে পেয়ারা গাছের ধার ঘেঁষে একটা চকচকে মোটরবাইক। মানুষজন দেখা যাচ্ছে না কাউকেই। এত বিশাল ছড়ানো-ছিটনো বাড়িতে কে কোথায় সংসারের নলি কাটছে কার কোন্ চরকায়, হদিশ নেই। রাধা নিজেই দুরন্ত চড়ুই হয়ে যায়। ছুটে গিয়ে ওদের হেঁশেলে উঠল। ধোঁয়া, বড় বেশি ধোঁয়া ওদের বান্নাবান্নায়।

'কী গ, কবে এলে? এসো এসো, বোসো এখেনটায়...' রান্নাঘরের লম্বা বারান্দায় কাঁচা তরিতরকারি সবজি চারপাশে গুছিয়ে নিয়ে আনাজ কুটছিল ন্যাড়াদার বউ। এ-বাড়ির নতুন-বউ। রাধাকে দেখে খুশি।

খলবলিয়ে উঠেছে রাধা নিজেও। ঠিক যেখানে যেভাবে চেয়েছিল, নিজেকে যথাস্থানে যথাযথ স্থাপন করতে পেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত এবার। এক কাপ চা। জিভটাকরা গলা অব্দি শুকিয়ে কাঠ-কাঠ হয়ে আছে সেই ভোরবেলা থেকে। কিন্তু এত বড় পয়সাওলা বাড়ির কী অদ্ভুত লোকজন! সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা অব্দি খায় না সবাই। রাধা জানে, এ-বাড়িতে ব্যাটাছেলেদের কারুর কারুর নেশা থাকলেও মেয়েদের সে-পাট নেই। কিন্তু নতুন-বউ? প্রত্যাশায় তাকাল রাধা। নতুন-বউ শহরের মেয়ে!

ঘুঁটে কয়লার আঁচ পড়েছে রান্নাঘরে। পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠছে ঘরের ভেতর। খোলা দরজা-জানালায় জমাট হয়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে। বিদঘুটে গন্ধ।

নতুন বউ—শম্পা যার নাম, রাধার চেয়ে বয়সে বড়। নিশ্চিতই বউদি। কিন্তু কত আর বড় হবে? বছর চার-পাঁচ? ন্যাড়াদার বিয়ে হলো এই তো সেদিন। বোধ হয় বছরও ঘোরে নি পুরোপুরি। বিয়েতে এসেছিল রাধা। তখন থেকেই আলাপে-আলাপে সই পেতে ফেলেছিল দুজন। সে-তো শহরের মেয়ে বলেই। হাওড়া শিবপুরে দানেশ শেখ লেনে বাপের বাড়ি। গরিব ঘরের খুব একটা ফেলনা মেয়েও নয়। বিয়েতে চল্লিশ ভরি সোনা দিয়েছে বাপ। ত্রিশ হাজার টাকা নগদ। মাত্র ষোল বছর বয়সে শহর ফুরিয়ে

গেল বটে, দেশগাঁয়ে চালান হয়ে এসে নতুন বাড়িতে তার আদর বেড়েছে অনেক। বামুনবাড়িতে বড়জেঠুর ঘরে প্রথম ছেলের বউ! এত এত শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদকে নিয়ে ধুমধামের সংসারে কদর কত এটুকুন মেয়ের?

এবং আজও, রাধাকে পেয়ে শম্পা বঁটি থেকে হাত তুলে মাথার কাপড় পিছিয়ে নিলো আবো একটু। হালকা হাসির প্রলেপে—'কী গ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো...'

একটা পিঁড়ি ছিল হাতের নাগালেই। ভ্রূক্ষেপ ছিল না রাধার। পায়ের দিকে কাফতানকে চারদিকে চারিয়ে নিয়ে হাঁটু ভেঙে ঝপ করে বসে পড়ল মাটিতেই। দু-পায়ের গোড়ালিতে পাছা ঠেকিয়ে বসেই তড়বড়িয়ে—'এক কাপ চা খাওয়াবে না?'

'চা?'

'হ্যাঁ গ, এক কাপ চা জুটল নি সক্কাল থেকে। দাঁতজিভ এমন টকে আছে...'

নতুন-বউ বড ঠাণ্ডা মেয়ে। মিষ্টি হাসিটুকু—'চা না হলে বুঝি চলে না তোমার?'

'হ্যাঁ গ, এমন বিচ্ছিরি অভ্যেস হয়ে গেছে...' নাকমুখের খিঁচুনিতে, রাধা, বুঝি কোনো অসম্ভব বিস্বাদে—'দেশের বাড়িতে আসতে কার না মন চায, বল। আর এলেও ত এই এক জ্বালা। এক কাপ চা পাব নি। সক্কালবেলা ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খেলেই আমার পেটের ভেতর হুড়মুড়ি শুরু হয়ে যায়। সে-ও আরেক মরণ। জলের ঘটি নিয়ে মগ নিয়ে ছোটো কোথায় বনবাদাড়ে। বল দিকিন, এখন আর চলে এসব? একটা আব্রু থাকবে নি মেয়েছেলেদের?'

নতুন আলু। নিজেদের চাষ। বঁটির উল্টোদিকে ঘষে ঘষে নরম খোলা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল নতুন-বউ। ফিক করে হেসে ফেলল—'হ্যাঁ, সেই ত দেখছি তোমাদের এখানে। সবাই তাই করে। উঃ ম্মাগো, কী বিচ্ছিরি...'

'তা তোমার কী? তোমাদের ত পাকা পায়খানা...'

'সে-এঁদের স্যানিটরি আছে, তাই রক্ষে। নইলে কী যে হতো আমার।' হাসছে নতুন-বউ—'সে-যাই বলো, আমি পারতুম না তোমাদের মতো...'

'সে-কি আমিও পারি নিকি?' ধোঁয়া। বড় বেশি ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে রান্নাঘর থেকে। অস্থির রাধা খোলা-দবজার পাশ থেকে সরে এল নতুন-বউয়ের আরো বেশি কাছে— 'কলকাতায় আমাদের ওখেনে আবার একই বাড়িতে ওপর-নিচে চারটে বাথরুম। একতলায় তিনতলায় একটা করে। দোতলায় দুটো। সে-বাথরুম কী গ! প্যান বল, কমোড বল, দামি-দামি পাথর-বসানো দেয়ালে সে-কি পায়খানা বাথরুম গ, কী বলব? শাওয়ার জানো ত? টিলিফোন শাওয়ার?'

'টেলিফোন?' থমকে গেল নতুন-বউ! বঁটিতে আঙুল ছুঁয়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে—'কাকে কী বলছ গ? আমিও কি বাঙাল নিকি? টেলিফোন চিনি না আমি? চানের ঘবে টেলিফোন? সে-আবার কী?'

'হ্যাঁ গ, নইলে আর বলছি কি...' উচ্ছ্বাসে বড বেশি চড়ায় উঠে গিয়েছিল রাধার গলার স্বর। হঠাৎ থেমে যেতে হয়।

'কে গ বউমা? কার সনে কতা বলচ? কে এয়েচে?' রান্নাঘরের ভেতর থেকে

মেজগিন্নির হাঁক।

'রাধু! রাধু গ। সুমতিবৌদির মেয়ে...' দু-হাতের আঙুল বঁটিতে সচল রেখে নতুন-বউ রাধার দিকে তাকাল হালকাভাবে।

'কাল এসেছি গ মেজজেঠি। কাল সন্ধেয়...' রাধা ছুটে এসে ঘর-বাইরের মাঝামাঝি দরজায় এসে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু ভীষণ ধোঁয়া। দত্যিদানোর মুণ্ডু নিয়ে ধোঁয়াব কুণ্ডলী। ধোঁযাব গন্ধ। দম বন্ধ হযে আসে। সে চেঁচাল—'তা তুমি জেঠি এই ধোঁয়ার মধ্যি ঘরের ভেতর বসে বসে কী করছ? আছো কী করে?'

'দেখচিস না কী করচি! ন্যাকা নিকি...' ঘরের ভেতর থেকে খিঁচিযে উঠলেন মেজগিন্নি। হাঁসফাসে ক্লান্ত স্বব—'এ-ত নিত্যিকার যজ্ঞিবাড়ি ব্যা। আমাব মরণ। এমন ধারা গতর পুইড়ো মরব না ত গিলবে কী এতগুলো লোক?'

চোখজোড়া কিচকিচ কবছিল। দু-হাতেব তেলোয় মুখ নাক বন্ধ কবে ঘরের ভেতর একবার উঁকি দিতে চেষ্টা কবল বাধা। ধোঁয়ায় ধোঁযায় ঠিকমত দেখাও যাচ্ছিল না মেজজেঠিকে। হাঁ-কবা পেল্লাই পাতা-উনুন। ঘুঁটে পুড়ছে তলা থেকে। কযলার রং ধরে নি তখনও। পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে জমাট ধোঁয়ার ঘূর্ণি। চারিয়ে যাচ্ছে ঘরময়। উনুনেব লাগোয়া ওপাশেব জানালা গলিয়েই ওদের বেরিয়ে যাবার কথা। যাচ্ছেও তাই। তবু বদ্ধঘরের এপাশেব দরজায়ও ওদের বেরুবার টান ছিল। বিটকেল গন্ধ। অথচ এ-পাশেব জানালা আর দরজা থেকে কিছুটা দূরে, বারান্দার পশ্চিম দিকে যেখানে দেয়াল ঘেঁষে বসেছে নতুন-বউ, সেদিকে ধোঁয়াটা যাচ্ছে না খুব বেশি। বাধা পালিযে এল— 'ওরে বাপস, তোমরা কী গ? বান্না করবে ত রোজ বোজ এমনধাবা জ্বলে পুড়ে মরছ কেনে বল দিকিন...। গ্যাস করো নি এখনও? গ্যাস ত দেশপাড়াগাঁয়েও পাওয়া যায়।'

'সে-আব বলে কী হবে?' ছোট করে নতুন-বউর দীর্ঘশ্বাস। বঁটিতে দু-হাতের আঙুল আর চোখ রেখে গলার স্বব খাদে—'এ-বাড়িতে তো ভয়েই মরছে সবাই...'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'গ্যাসের উনুনে নাকি আগুন লেগে যেতে পাবে। পুডে মরে যেতে পাবে সবাই।'

'সে কি গ? পুড়ে মরবে কেনে? সে-আবার কী কথা?' রাধা ভ্রূ কুঁচকোল—-'সকাল-সন্ধেয় আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করছি কত। কই, কিছু ত হয় না। গ্যাস লিক করলে নাক-পোড়ানি এমন একটা বাস ছাড়বে গ, সববায় টেব পেযে যাবে...?'

'সে-আর কাকে বলছ? শিবপুরে বাপের-বাড়িতে সেই ছেলেবেলা থেকে গ্যাসে বাঁধতে দেখে আসছি মাকে। সে-আর আমি জানি নে?'

'তাহলে এখেনেও বল না কেনে ওঁদেরকে। ন্যাড়াদাকে বল?'

'হুঁ, তাহলেই হয়েছে আর কি। বাপ-কাকাদের কথায় সংসার চলে গ এখানে। তোমার দাদার কথা শুনছে কে?' কোথাও একটা ঠাণ্ডা বিষাদ ছিল নতুন-বউয়ের গলার-স্বরে। এতবড় সংসারের এক বেলার আনাজ কুটতে শুধু আলুতেই পাহাড় গডে উঠছে একটা কাঁসার গামলায়। বঁটিতে মন রেখেই নতুন-বউ—'ছ-লিটারের দু-দুটো প্রেশার-কুকার আছে এ-বাড়িতে। একটা আমার বিয়ের সময় দিয়েছিল। আরেকটা বোধ

হয় ওঁরাই কিনেছিলেন কখনও। দুটোই, যেমন-যেমন নতুন কেনা হয়েছিল, বাকশোবন্দি তেমনি পড়ে আছে আলমারির ওপর...'

'কেনে গ?' রাধা সকৌতুকে—'কুকারেও আগুন লাগে নিকি?'

'না, সে-নয়। কী-নাকি একটা গন্ধ লাগে কুকারে রান্নাবান্না করলে। খেতে চায় না কেউ।'

'মাথা খারাপ গ। তোমার শ্বশুরের ঘরের সব্বায়ের মাথা খারাপ...' রাধা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে দোল খেলো। একটা কাক তারস্বরে ডেকেই যাচ্ছে রান্নাঘরের পাশে পেয়ারা গাছেব ডালে। রাধার ঢেউ-গড়ানো হাসির টুকরোগুলো পাখির সঙ্গে পাল্লায় সকালের নিঝুম ভাঙে—'এত কাঁড়িকাঁড়ি ট্যাকায় করবে কি গ তোমরা? চাষের ধান, চাষের আলু পেঁয়াজ, মনাকাকার এত বড় কারবার, সেজজেঠুর মাস্টারি, বড়জেঠু ন্যাড়াদা...বাপব্যাটা দু-জনের মাসমাইনের চাকরি...পয়সা কামাবে ব্যাটাছেলেরা আর তোমরা মেয়েছেলেরা ঘুঁটেকয়লায় জ্বলে পুড়ে পচে মরবে গ? গ্যাস আনবে নি? কুকার কিনে ঘরে তুলে রাখবে? পয়সা আছে, ইলেকটিক আছে। সে-ও ত ইলেকটিক উনুন দেখ নি গ! হট-পেলেট হিটার ক্যাসারল গিজার গেরাইন্ডাব মিকশার...'

গোল-গোল চোখের চাউনিতে শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে নতুন-বউ।

কিংবা ওই ড্যালাড্যালা চোখের চাউনির দিকে তাকিয়ে রাধা আরো উচ্ছল—'হাঁ করে দেখছ কি গ? টি ভি আছে ত তোমাদের। এ-ত সব টিভির অ্যাডভারটাইজে দেখায়, দেখ নি?'

সবটাই আরো বেশি জটিল হয়ে ওঠে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা গেঁথে যেতে পারত ধারালো নতুন বটিতে। বিদ্ধ হলো না। কারণ শাঁখাপলার সঙ্গে ফর্সা সুডোল দু-হাতে ব্রোঞ্জের ভেজাল ছাড়াই চারগাছা-পাঁচগাছা করে ঝকঝকে সোনার যে-চুড়ি আর বালা-বাউটির শিঞ্জিনী বাজছিল অথবা সর্বদা-ঘবে পরার জন্য লকেট-ঝোলানো দু-ভরি সোনার যে-হাব ঘোমটা-টানা আঁচলে আড়াল হয়ে আছে অথবা দুটো কানের দুল বা পাথর-বসানো নাকছাবি—কিছুই আমল পাচ্ছে না সুমতিবৌদির মেয়ে রাধুর চোখে?

অথবা ঠিক-ঠিকই নজরে এসেছিল রাধার। অনেক দেখে অনেক খুঁজে অনেক বাছাইয়ের পর ঘরে তুলতে হয় যাকে, বড়-ঘরের কচিকাঁচা বউদের গায়ের রং দুধে আলতায় ফর্সাই হয় এ-রকম। পাকা ধানের রঙে মাখন-মাখন চামড়ায় সোনা ঝলকায় শ্বশুরসোয়ামির ভাগ্যিতে। বুঝি সিঁদেল নেই, ডাকাত নেই, চোরছ্যাঁচড় বদমাশ নেই দেশে। গেরস্থ ঘরের মরাইয়ের মতো ঘরের-বউও ঘরের লক্ষ্মীই যদি, শুধু আদর...সোহাগী আদরে আদরে পুষতে হয় তাকে। ধানের রং, খড়ের রং, সোনার রং, আদুরে-বউয়ের গায়ের রং—সব রঙের মাখামাখিতে অঙ্গে অঙ্গে এতই সুখের ঢল যাঁদের, সেদিকে তাকিয়ে, নতুন-বউয়ের বোকা-বোকা চোখের চাহনির দিকে নজর রেখে কী-এক অদ্ভুত খ্যাপামি চাপল মাথায়, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রাধা। কাঁচা আনাজের ঝুড়ি আর গোলগাল ঢাউশ একটা কুমড়োর ফাঁকে সে তার একা-একা গান-শোনার যন্ত্রটা শুরুতেই রেখে দিয়েছিল। ভেবেচিন্তে লুকিয়ে রাখে নি। শাদামাটা রাখতে গিয়েই যেটা আড়াল

হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে হাতে তুলে নিয়ে, কী মনে হলো, সে এগোল নতুন-বউয়ের দিকে।

'ও কিং ও কী? কী করছ তুমি?' 'বঁটি রয়েছে যে...'

'আঃ, দাঁড়াও না। দেখ না কি করি...বঁটি ত কী হয়েছে? তোমাকে মেরে ফেলব নিকি?' রাধা হাসে। নতুন-বউয়ের মাথার-কাপড় টেনে ফেলে দিয়েছে এক ঝটকায়। তড়িঘড়ি দুটো হিয়ার ফোন ঢুকিয়ে দিয়েছে কানে।

এ-কী উৎপাত? এ-আবার হঠাৎ কী শুরু করল রাধু? নতুন-বউ বিরক্ত হতেও পারে না ঠিকমত। কিংবা কারুর ওপর বিরক্ত হতে হয়তো শেখেই নি কখনও। ওদিকে রান্নাঘরের দবজায় পাল্লা বন্ধ করার আওয়াজ। থপথপ পায়ের শব্দ। দিশেহারা ঘরের-বউ মাথায় ঘোমটা টেনে নিতে চায়। দোলের দিনে রং খেলাব ভঙ্গিতেই হুড়োহুড়ি দুজনের—'দেখো দেখি, কী করছ! এই কুটনো কটা কেটে দিতে হবে। নইলে বান্না হবে কী করে? ওই... ওই দেখো মেজোমা বেরিয়ে এসেছেন...'

'ধ্যাৎ, ছাড় ত। বেরিয়ে এসেছেন ত কী হয়েছে?'

এবং তখনই বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মেজগিন্নি ঘনিষ্ঠ বাস্তব। ভারি শরীব। হতকুচ্ছিত এলেবেলে একটা শাড়ি। ঢলঢলে ব্লাউজ। নাকেমুখে ধোঁযা গিলে গিলে লণ্ডভণ্ড আরো। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে তাকালেন ভেংচি মেরে—'সেই ত্যাখন থিক্যে কী ঘুসঘুস ঘুসঘুস কবছিস ব্যা তোবা? অ্যাই রাধু, কী কবছিস?'

বাধু নয, নতুন-বউ সত্যি বিপাকে। খুড়ি-শাশুড়ির সামনে উদোম মাথায় থাকার বেয়াদপি সামলে যখন সে চটজলদি ঘোমটা টেনে নিতে আকুল, আটকে গেল হাত। কানের ফুটোয় কী দুটো নল বসিয়ে রাধু কী একটা ছোটমতো যন্ত্র ধরে আছে সামনে-–মাতৃপ্রতিম শাশুড়ির সম্মান অথবা রাধুর মজাদাব খেলনায মেতে ওঠাব দোটানা। কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। কানে কানে ফিসফিস কথা কইবাব মতো শুধু তারই কানে গান? হেমন্তকুমাব—'কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো। রূপকথা নয় সে নয...'

খুবই চেনাজানা গান। সকলেই জানে। এর আগে সে নিজেও শুনেছে অনেক... অনেকবার। কিন্তু এ-মুহূর্তে গানের চেয়েও তার অপার বিস্ময়--যন্ত্রটাকে এখন আব ছাড়তে মন চাইছে না। ভেতবে ভেতরে উচ্ছল লাফালাফি। অথচ সামনেই মাতৃশাসন।

হয়তো সম্মুখবর্তী শাশুড়ির সঙ্কট বুঝে ফেলেছিল রাধা। গায়ে পড়ে বুকের-কাপড় টেনেটুনে কীভাবে কী সাজিযে দিলো, ঘোমটাব কাপড় মাথা ঢেকে ডান দিকে ঘুবে এসে ফিরে এল বুকে। একারণেই নতুন-বউযের ভঙ্গিটা বড় বেশি সলজ্জ হয়ে ওঠে এবং অন্তর্গত রক্তপ্রবাহে বইতে থাকে—'আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানেব বাসে বাসে সবাব নিমন্ত্রণ, সেখানে বাবোমাসে তেব পাবন...'

একটা কাত-করা বঁটি ছিল পাশেই। সেটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে সুচতুব রাধা জাঁকিয়ে বসল কাফতান সামলে। কারুর শাশুড়ি যদি ভয়াবহ হয়, সে তাব জেঠিকে সামলায়—'যাও দেখি জেঠি তোমাব কাজে। কিছু ভাবতে হবে নি গ। তোমাদের কুটনো কেটে দিচ্ছি আমরা দুজনায় মিলে'

'অঁ, তা'লেই হয়েছে আর কী। একটা আনাজ কুটতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। বলি রান্নাটা আর হবে কখন...' হাঁটুতে ডান হাতের ভর রেখে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে হেঁশেল ছেড়ে নেমে যাচ্ছেন মেজগিন্নি। বাঁ-হাতে ধরে থাকা নাক-মুখের আঁচলটা ফেলে দিয়েও ভারি চেহারার শরীরটা ঘামে গরমে হাঁপাচ্ছে তখনও। রাধা তাকিয়ে থাকে। দাসীবাঁদিদের মতোই ছেঁড়াফাটা হতচ্ছাড়া শাড়িব্লাউজে খেটে মরছে বাড়ির গিন্নি? স্নো পাউডার সাবান-ফাবানেব গন্ধ মাখে নি জীবনে একদিনও। মেচেতা-পড়া ফর্সা গালে ফুলে ফুলে আছে মাংসের ড্যালা। গোটা শরীরের বোঝার ওপর, যেন বাড়তি শাকের আঁটি—আলুথালু চুলের হাতখোঁপা। ছোট্ জামাকামার বালাই নেই কোনোকালে; ছিরিছাঁদ নেই কোথাও। চাষের-চালের-ভাত আর ঘি দুধে মুটোতে মুটোতে বুক আর পাছার ভারে মেদেব বোঝা বয়ে তিনটে মাত্র সিঁড়ি ভাঙতে কত কষ্ট গো মানুষটার? নামতে নামতেই গলার ঝাঁঝানি— 'যা পারিস নে, কেনে তুই আসিস লো এসব করতে? শুধু শুধু কাজ বাড়াবি আব-সবার। যা যা,' ঘরে যা। সে-আমি দেখব খন আবেট্টু বাদে এসে...'

মুখ টিপে হাসে নতুন-বউ। ছুটি। এরপর ছুটি হয়ে যাচ্ছে তার। অথবা অত্যাশ্চর্য এক সঙ্গীতপ্রবাহ্ তার রক্তে বক্তে শিরায় শিরায়। সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত হয়ে নিজের মধ্যেই একান্ত নিবিড়ে কেমন কবে শ্রবণে গ্রহণ করতে হয় কথা আর সুরতাললয়— আনুষঙ্গিক অনুশীলন না থাক, এ-যেন নিজের মধ্যেই গুনগুনিয়ে গান গেযে ওঠার মতোই কোনো পুলকিত শিহরন, সে বুঁদ হযে যায়। এমন অদ্ভুত সুন্দর একটা জিনিস নেড়েচেড়ে দেখা হয়ে উঠছে না এখনও। পরিমাণমতো যতগুলো আলু কেটে দেবার কথা ছিল, ফুরিযে এসেছে। নতুন কবে বঁটিতে হাত দেবার সাধ থাকে না। মেজশাশুড়িকে বেশ খানিকটা দূবে সরে যেতে দেখেই বঁটিটা কাত করে রেখে হঠাৎ সে পিঠটানে সোজা হয়ে বসল—'চলো গো, উঠি...'

'উঠবে? সে কি? সবই যে পড়ে রইল তোমার।'

'সে-থাক। সেজকাকা খববের-কাগজ নিয়ে এক্ষুনি এসে বড় ঘবের বারান্দায় বসবেন। আমার হাতেব চা ছাড়া আর কারুবটা মুখে রোচেই না ওনাব। তা তুমিও তো চা খাবে বলেছিলে গো...'

চা? বাধার টাকরায় গলায় চ্যাটচেটে শুকনো জিভটা ঠনঠনিয়ে বাজে। কেউ কিছু না বললেও নিজেবই ইচ্ছেয পাঁচতরকাবির জন্য গোটা কয়েক বেগুন কেটে ফেলেছিল সে। থেমে গেল।

উঠে দাঁড়িয়েছে নতুন-বউ। দুটো হাত উঠে এসেছে কানেব কাছে—'কী করে খুলব গ এটা? খুলে দাও।'

'ও-থাক না তোমার কাছে। তুমি শোনো...'

'শুনব?' খুশিতে খুশিতে উদ্বেল নতুন-বউ— 'কী সুন্দব জিনিস গ এটা। তোমার দাদাকে দেখাব একটু। কী নাম গ যন্তরটার? কত দাম? কোথায় পাওয়া যায়?'

'হবে হবে। সে-হবে খন পরে। অ্যাদ্দিন বাদে এলুম। এক্ষুনি ত পালিয়ে যাচ্ছি না। আছি গ, থাকব দু-দিন...'

সোনাব-ববন হাতে গলায কানে সত্যি-সত্যি খাঁটি সোনাব ঝলকানিতে মা-লক্ষ্মী

চমকায় মিষ্টি বউয়ের মুখেচোখে হাসিতে হাসিতে। খুশির ডুগডুগি রাধারও হৃদয় মন বুক ভরে তোলে। ভালো চমকানি খেয়েছে বউ। লাল-শাদায় ডুরে-কাটা শাড়িতে গলা বুক মাথা ঢেকে রান্নাঘরের বারান্দা পেরিয়ে ঝমঝমিয়ে চলে যাচ্ছে নতুন-বউ। লাল ব্লাউজ। আলতা-মাখা পায়ে হাজাকাটা নেই। মাটিতে লক্ষ্মী-পায়ের ছাপ পড়ে না শুকনো মাটিতে। কচি আনাজপাতির মতোই ঠাণ্ডা নরম বউ শ্বশুর-শাশুড়িদের নাকের ডগায় বুকে পিঠে মাথায় কাপড় জড়িয়ে উঠোন ডিঙোবে ভয়ে ভয়ে সিঁধিয়ে থেকে শিথিল চরণে। নতুন এক খেলনা পেয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাবে সোয়ামিকে। ন্যাড়াদা শুনবে রাধার নাম। ডাকবে রাধাকে। এমন আজব বস্তু শুধু তো রাধাই নিয়ে আসতে পারে এ-পোড়া জলকাদা ঘুঁটেগোবরের দেশে। সোনাদানায় ভোলে যে-বউ, ভুলছে নতুন খুশিতে। এ-খুশি রাধারই আমদানি।

হঠাৎ-ই নজরে পড়ল, ওপাশের উঠোন ডিঙিয়ে পেঁপে গাছ সজনে গাছের ছায়ায় মাটিতে ছায়া টেনে টেনে এগিয়ে আসছেন মেজজেঠি। হাতে কাঁসার বাটি—'আ ল রাধু, তোর মা ত এসে গেছে বাা। কাজে লেগে গেছে উদিকপানে। তা তুই চলে এয়েচিস সাতসকালে। পেটে দানাপানি নেই। মুখপুড়ি তুই আগে বলবি ত সে-কতা। নে খা দু-গাল খেয়ে নে...'

যথারীতি আনাজ কুটে যাচ্ছিল রাধা। অনেকটাই নিজের খুশিমতো। বঁটি কাত করে রেখে, পলকে, দাওয়া থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে। বামুনবাড়ির এই আদর এমন সোহাগ, সে জানে, শহর থেকে মাঝেমধ্যে এলেই পাওয়া যায়। শ্বশুরের ঘর থেকে বাপের ভিটেয় এলে মেয়েদের যে-ভাগ্যি। অনেকটাই সে-রকম। সে ছুটে গেল--'মুড়ি গ জেঠি? নাড়ুমোয়া কই তোমাদের? আচার ফাচার?'

রাধা সেয়ানা মেয়ে, জানে পিসি-মাসি খুড়ি-জেঠি মায়েদের মনের হদিশ। তাঁদের নিজেদের হাতের আম-তেঁতুলের হরেক আচার চাটনির মাহাত্ম্য গাইলে খুশিতে খুশিতে ডগমগিয়ে মজে যায় সবাই। কিন্তু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মেজজেঠি—'নে নে, ঢং করিস নে বেশি। বাটিটা ধর্। দেখ্ দিকিন কত বেলা গড়িয়ে গেল। চালতা গাছের ডগা তুলসীতলা ছুঁয়ে ফেলেছে। আর ওদিকে কত কাজ পড়ে আছে আমার। ভাতের হাঁড়িটাও চাপাতে পারলুম নি এখনও...'

মজা, দারুণ মজা। মজাটা এক লহমায় জব্বর জমে যায়। হাতে এক জামবাটি মুড়ি। প্রথম গরাস গালে ফেলতেই জিভ টাকরা দাঁত ঠোঁট তোলপাড় করে মুখের লালায় কী এক অপার স্বাদ, রাধা সহসা মশগুল— 'আমতেল? আমতেল গ জেঠি? আঃ, কত কাল খাইনি বল ত। ফানাটাসটিক...'

হাঁটুতে হাতের ভর রেখে আরেক হাতে মাজা ধরে রাতের শরীরে রান্নাঘরের সিঁড়ি ভাঙছিলেন মেজজেঠি। খ্যাঁক করে উঠলেন— 'কী ল? কী বলচিস?'

'ইংজিরি গ, ইংজিরি। সে তুমি বুঝবে নি...' ঘন সবুজ ডাঁশা দুটো কাঁচালঙ্কা ছিল। বুঝি এইমাত্র গাছ থেকে ছিঁড়ে বাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দাঁতে ফেলে অর্ধেকটা কেটে নিতেই যখন দাউদাউ আগুনের জ্বালায় কামড়ে ধরেছে জিভ আর গালের মাংস, রাধা ঝোলটানা শোসানিতে মাতোয়ারা— 'কী দ্দারুণ মুড়ি গ তোমাদের।

জবাব নেই। শহরের বাবুরা কোথায় পাবে এ-জিনিস? ইউরিয়ায় ভাজা কী কতগুলো ছাইপাঁশ বিকোয় ওখেনে। বিচ্ছিরি তেতো-তেতো...'

ককিয়ে-কাকিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে পড়েছেন মেজগিন্নি। ফিরে তাকালেন — 'এ-ত তোর মায়ের হাতেরই ভাজা র‍্যা। সুখ্যাত গাইবি ত যা না, মায়ের কাছে গে বল্ না কেনে। ও-ত উঠ্নেই রয়েচে...'

দুই গালে মুড়মুড় মুড়ি চিবোতে চিবোতে রাধা পালায়। ছড়ানো-ছিটনো ঘরবাড়ি, লম্বা উঠোন, মস্ত আকাশ আর গাছপালায় আলোয়-বাতাসে অনেক বড় জায়গা নিয়ে এদের বসবাস। হাত-পা খেলিয়ে ছুটে বেড়াবার দেদার ফূর্তি। পায়ের গোড়ালি ছাপিয়ে শিউলি-ছড়ানো আকাশী কাফতান। হাতে মুড়ির বাটি। হাঁটুর কাছে জামাটা একটু তুলে ধরে এগোবার উপায় নেই। ছুটতে গেলে পায়ে পায়ে জড়িয়ে হুমড়ি খাবার ভয়। টিভির পর্দায় মঞ্চ সাজিয়ে বড় বড 'আট্রিস' নাচিয়েরা যেমন করে শরীর ভাঙে, ঘাগরা ওড়ায়, ভেসে বেড়ায়—বামুনবাড়ির উঠোনে সে সত্যি-সত্যি কোন্ এক ফুলপরী হয়ে যায়। আজ তাব ইজ্জত অনেক।

পাকা দালানের দোতলায় হয়তো এখনও পড়ালেখা করছে ছেলেমেয়েরা। গাঁয়ের মাস্টারমশাইদের কোচিংয়েও যেতে পারে কেউ কেউ। বড়জেঠুর ঘরেব সরস্বতীদি তার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। মেজজেঠুর মেয়ে বাণী তার সমান বয়সী। মাঝের গাঁয়ের বড় ইশকুল পড়ে সবাই। রাধা ওদের দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু উঠোন ডিঙোন গেল না খুশির টানে। আটকে পড়তে হয়।

আজই বামুনবাড়িতে কাজের বায়না ছিল সুমতিবালার। ডাঁই-করা সেদ্ধ ধান রোদে শুকোতে দিতে হবে। লম্বা লাঠির ডগায় চৌকোমতো কাঠের তক্তা একটা—অনেকটাই সাহেববাড়ির ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারের সবচেয়ে বড় নজলটার মতো, যেটা ঠেলে ঠেলে ধানগুলো অনেক বড় করে চারিয়ে দিতে হয় মাটিতে। মায়ের হাতে ক্লিনার দেখল মেয়ে। মেয়ের হাতে মুড়ির-বাটি দেখেই থমকে গেল মায়ের হাত। গাঁয়ে এসে দশজনের আদর সোহাগ পাচ্ছে মেয়ে। বুক ভরে প্রসন্নতা।

বরং মেয়ে আমতেল আর ঝাললঙ্কায় সুস্বাদু কুড়মুড়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে, সুখে, মায়েব চোখজোড়া এড়িয়ে যেতে চায়।

ওপাশ আমগাছের ছায়ায় সবুজ লুঙি হাঁটুর ওপর তুলে, কালো-কালো রোমশ উদোল বুকে পৈতে ঝুলিয়ে গাইবাছুর স্নান করানোর মতোই তাগড়াই মোটরবাইকটা বের করেছেন মনাকাকা। পাশেই একটা বড় বালতি ভরে জল। ভেজা ন্যাকড়ায় সাবধানে ঝকঝকে ইস্পাতের গা-মোছা। কত যত্নআত্তির আদর। রাধার সেদিকেই নজর। হর্ষদাকে মনে পড়ছে তাব। কলকাতায় কোথায় কোন্ রাস্তার ধাবে ঝুপড়ি বেঁধে থাকে রোগা টিঙটিঙে বুড়ো লোকটা। মরে গেলে বেঁচে যেত যে-মানুষটা, তিন বালতি চার বালতি জল টেনে সাহেববাড়ির গাড়ি ধুয়েমুছে দিয়ে যায় রোজ ভোরবেলা।

'কি গ ছোটকা, ট্যাকাপয়সা খরচা কবে এমন বাহারের একটা গাড়ি কিনেছ, একজন কিলিনার রাখতে পারো নি?'

'কিলিনার?' ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মন্মথ— 'সেটা কী?'

‘কিলিনার গ, কিলিনার...’ উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝাললঙ্কার মুড়ি চিবোতে চিবোতে রাধা খলখলিয়ে হাসে— ‘গাড়ি-ধোয়ার লোক গ। মুনিশ-ঘরামির জন খাটে না তোমাদেব ? সে-রকম। রোজ এসে তোমার গাড়ি ধুয়েমুছে সাফসুফ করে দিয়ে যাবে...’

‘গাড়ি ধুয়ে দিয়ে যাবার জন্যে লোক ? ও-তোদের শহরে চলে। ওসব পয়সার গরম পাড়াগাঁয়ে চলে না। কেনে ? হাত-পা নেই আমার ? না-কী তাকত নেই গতরে ?’

‘হুঁ...’ শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ঠমক মেবে তাকাল রাধু— ‘তোমাদের অবিশ্যি সবই দু-চাকার। তোমার বাইক, ন্যাড়াদার ইস্কুটার। এ-আর কতটুকু তেল খায় ? গেরেজের বালাই নেই। ড্যারাইভারের মাইনে লাগে না। চোত-বোশেখের গবমে মাথার চাঁদি ফাটবে রোদ্দুরে, বাদলা দিনে ভিজে হাপুইসুটি হবে সবার মতন। বিচ্ছিরি...’

‘আরে ব্ব্যস...’ কথায় কথায় খুবই সাধারণভাবে মেয়েটার সঙ্গে তামাশা করে যাচ্ছিল মন্মথ। নিজের মোটরবাইকের সেবায় মনোযোগ ভেঙে আমল দেয় নি খুব। এবাব নড়েচড়ে উঠল— ‘অ্যাঁ? খুব যে র‍্যালা দিচ্ছিস ব্যা।’

‘কি রে রাধু ? কবে এলি ?’ অন্য দিকে পুরনো পাকা দালানের বারান্দায় মাদুর ছড়িয়ে খববের-কাগজ নিয়ে বসার আয়োজন সুরথ ঘোষালের। এরপর চা আসবে। হাতে সিগারেট পুড়বে। ইশকুলের বাচ্চাদের পরীক্ষা-পাশের পড়া যেমন, মাস্টারমশাইর কাগজ-পড়া চলবে এক ঘণ্টা দেড়ঘণ্টা। চোখ টেবিয়ে একবাব তাকালেন রাধার দিকে-– ‘তোর গায়ে ওটা কী চাপিয়েছিস রে ? কী জামা ওটা ?’

‘কাফতান গ কাকু। কাফতান। এ-তোমাদের এখেনে পাবে নি।’

অদূরেই ছিল সুমতিবালা। হাঁক পাড়লেন সুরথ ঘোষাল— কী গ বউদি, মেয়ে যে তোমার একেবারে মেমসাহেব হয়ে উঠল গ...’

সুমতিবালা ওপাশ থেকে—‘সে কি আমি বানিযেছি গ ? তোমাদের দশজনের আশীব্বাদে...’

‘হ্যাঁ, আমাদের দশজনেব আশীববাদে বেশ কাপ্তান হযে উঠেছে গ তোমাব মেয়ে...’ শুকনো কাপড়ে গাড়ির ঝকঝকে ইস্পাত মুছছিল মন্মথ। হৈচৈয়ে মেতে উঠল—‘ভাগ্যি খুলে যাচ্ছে গ তোমার। কোন্ গাড়ি কত তেল খায়, সে-অব্দি বুঝে ফেলেছে। আর কী ? গাড়িটাড়ি আছে, এবারে এমন কেউ একজনকে ত নিয়ে এলেই হয় গ...’

‘আব বল নি গ ঠাকুপো। ই-মেয়েটাকে নিযে আমার হয়েছে এক জ্বালা...’ হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছে সুমতিবালা— ‘বাবুদেব বাড়ি থিক্যে হীরের হার পেয়েছে গ মেয়ে। আর তাই নিয়ে কাল সেঁঝের বেলা মেয়েটা এসে সবে উঠুনে এসে দাঁড়িয়েছে কি শ্যালশুকনির মতন সব্বায় মিলে কী হেনেস্তাটাই না করলে গ। হিংসে গ, হিংসে। হিংসেয় হিংসেয় পেটের গ্যাস জ্বলচে-পুড়চে গ মিনসে-মাগীগুলাব...’

‘হীরে ? হীরে কী বলছ ?’ মন্মথ আঁতকে উঠল।

‘হ্যাঁ গ, ফরেন মাল। এক নম্বরি ফরেন মাল...’ ডালপালা-ছড়ানো কাফতানে ঢেউ খেলিয়ে রাধা উচ্ছল— ‘শুধু কি পয়সায় হয় গ। তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কোথায়

পাবে এমনধারা সব জিনিস? আজ ত রব্বার। টিভিতে বাংলা-বই আছে। হারটা পরে আসব খন সন্ধেবেলা। দেখবে সব্বায়...'

'ধ্যাৎ...' প্রবল গর্জনে ধমকে উঠল মন্মথ— 'খুব যে লম্বা-লম্বা কথা শিখে এয়েছিস র‍্যা। ফরেন মাল দেখাচ্ছিস। হীরের নেকলেস দিয়েছে তোকে, আর তুই সেটা তোর ভাঙা মেটেঘরের মাচায় বালিশের তলায় গুঁজে রেখে এয়েছিস? অ্যাঁ, ঢপ দেবার আর জায়গা পাসনি? যা যা, ফোট্...'

বাধা ফ্যাকাসে হঠাৎ। সে পালাতে চায়। বিস্তীর্ণ জমিও ছিল সটকে পড়ার। কিন্তু চা? চায়ের পরান তার। বুকের আইঢাই। বড়দালানের দোতলায় কোণের দিকে নতুন বউয়ের ঘর। যখন সেদিকেই মন, পা বাড়িয়েছিল রাধা। শুনতে পেল, দরদালানের ভেতর তুমুল হৈচৈয়ের আওয়াজ। বামুনবাড়ির ছেলেমেয়েবা, ইশকুলের পড়া করছিল যারা, সকলেই বেরিয়ে এসেছে। সবাব সামনে ন্যাডাদা। নকশা-আঁকা বাটিকের লুঙি, উদোল গা। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরেব তেল-চুকচুক সুখের শরীরে নেয়াপাতি ভুঁড়ি চাগিয়ে উঠছে সবে। এত বড জোয়ান বয়সের মানুষটাও কেমন খোকা-খোকা। ওয়াকম্যান যন্ত্রটা কানে ছিল না, হাতের পাতায়— 'কি র‍্যা রাধু, কী হল? এ-যে বন্ধ হয়ে গেল। ফের চলবে কি করে?'

রাধা হাসে। মুড়ির বাটিটা, হাতের কাছে পেল যাকে, বুঁচুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছুটে এল কাছে। তাকে ঘিরে ফেলেছে তার চেয়ে ছোটয়-বড়য় বা সমান বযেসের সব ছেলেমেয়েরা। নয়া প্রযুক্তির কৃৎকৌশল সে জানে। জানেন না, কলেজের পাশ দেওয়া কলকাতার চাকুরে ন্যাড়াদা।

এবং নতুন করে ক্যাসেট পাল্টাল রাধা। পাশে দাঁড়িয়ে কপালে-ভাঁজ-তোলা চুলচেরা নজরে ন্যাড়াদা কায়দাকানুন লক্ষ করলেন সব এবং নতুন করে গান বেজে উঠতেই সোৎসাহ উল্লাসে কাড়াকাড়ি পডে গেল। ক্যাসেট বা ব্যাটারির জটিল অংশটুকু নিজের হাতে রেখে ন্যাড়াদাই একে একে সরস্বতীদি শমুদা বাণী বুঁচু তো বটেই, মনাকাকার বাচ্চা মেয়ে অঞ্জু পর্যন্ত সকলেরই কানে কানে একা-একা-শোনার গানের প্রসাদ বিলোতে থাকেন— 'এ-একটা খাসা, জব্বর জিনিস তুই দেখালি র‍্যা রাধু। এ-কী কলকাতায না থাকলে হয়? এমনধারা খুচরোখাচরা কত কী যে নিত্যি বেরুচ্ছে দুনিয়ায়...'

মুড়ির-বাটি হাতে নিয়ে গালে চিবতে-চিবতে রাধা অদূরেই তেরচা মেরে তাকিয়ে থাকে। আস্ত একটা কলকাতা শহর গায়ে লেপটে আছে তার। তার হক আছে এভাবে ভ্রূ উঁচনোর।

'কি র‍্যা ন্যাড়া, তোদের আবার কী হল?' মন্মথ তাঁর গাড়ির ধোয়ামোছা আপাতত স্থগিত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—'এ-ও কি রাধু নিকি? রাধুর মণিমানিক্য হীবে?'

'তোমাকে আর ভাবতে হবে নি গ কাকু..' সরস্বতী উথলে উঠেছে— 'তোমার ত মাছ-ধরাব নেশা আছে গ। ট্র্যানজিস্টারে গান বাজিয়ে পুকুরধারে আব বসে থাকতে হবে নি ঘন্টার পর ঘন্টা । এবার এটি কানে এঁটে বসে থাকবে। কেউ টেরটি পাবে নি তুমি ছিপ ফেলেছ...'

'কেনে র‍্যা, আমি কি চুরি করে ছিপ ফেলি নিকি কারুর পুকুরে? বলে কয়ে

বসি। তেমন হলে নগদা পয়সায় টিকিটও কাটি...' লুঙির খুঁটে ভেজা হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এসেছে মন্মথ— 'দেখি, দেখি কী ওটা । কী তোদের গান, শুনি একবারটি...'

সারখোলের কারবারের বাইরে মাঝেমধ্যে ভরদুপুরে কোথাও গিয়ে ছিপ-ফেলা নয়তো শীতেব মরশুমে ভিন গাঁযে ছুটোছুটি করে রাতভব যাত্রা-দেখা—এর বাইবে কোনো শখ আহ্লাদকে অযথা পয়সা নষ্ট বলেই যার বিবেচনা, তার কানে নতুন যন্ত্রটা গুঁজে দেবার পর ভ্রূ কুঁচকে সে শুনল কিছুক্ষণ। বড়জোর মিনিট খানেক। দুটো কানে সুড়সুড়িই বোধ হয়, চটজলদি খুলে ফেলে, ফিবিয়ে দিয়ে কানের ফুটোয হাতের আঙুল গুঁজে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তাচ্ছিল্যে—' 'ভ্‌ভুউউস, কানে কানে ফুসমন্তরেব মতো এ-আবাব কী গান শোনা ? মাইকে গমগমিযে গান বাজাবে, তবে না গান ? ঘবে টিভি আছে, রেডিও আছে। তা নয়, একা-একা শুনবি কী ব্যা ? এ- হল গে শ'বেব বাবুদের গ্যাঁড়াকল। আপিশে ফাঁকি মারবে আর বউবাচ্চা নিয়ে একা-একা ফেলাটে থাকবে। মাটি কামড়ে বোজগাবপাতি ত কবতে হয না আমাদেব মতো। ফোকটিযা পযসায যত ফুটুনি ব্যাটাদের...'

বাধার রাগ হলো। দাঁতখিঁচুনিতে তাকায় আড়চোখে। প্রায বাপেব বয়সী ঢ্যাঙা একটা মানুষ। বলাও যায় না কিছু। গাঁয়ে বসে সারখোল বেচে। শহরের কী জানে ? দেখেছে কতটুকু ? এজন্যেই হামবড়ামার্কা এই লোকগুলোকে একদম দেখতে পারে না সে। কথা শুনলেই হাড়পিত্তি জ্বলে।

ওই...ওই আবেক বুড়ো ! সিদ্ধিদাতা গণেশঠাকুর।

বড়দালানেব বারান্দায় খবরেব-কাগজে মুখ ঢেকে ছিলেন সুরথ ঘোষাল। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে ছেলেমেয়েদের এ-রকম হট্টগোল যেহেতু রোজকার প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা, আড়চোখে শুধুমাত্র তাকিয়েছিলেন বাবকয়েক। খুব বেশি কৌতূহল ছিল না।

বাধার ফোঁসানি বাড়ে। সান্ত্বনাও থাকে— অসংলগ্ন কথা আর উচ্ছ্বাসে যে মেলা বসে গিয়েছিল বামুনবাড়ির উঠোনে, সেটা সচল থাকে ছোটদের হল্লায়। একপাশে দাঁড়িয়ে উদাসী বাধা বাটি থেকে মুঠোয় তুলে আমতেল-মাখা মুড়ি গালে ভরে চিবুতে থাকে। কটকটে ঝাললঙ্কায় কামড়।

এবং অবাক মানে— বড়জেঠিকে হঠাৎ উঠোনে ঢুকতে দেখে। একটু আগেও মেজজেঠুকে গোয়ালে দুধ দুইতে দেখে এসেছে সে। বড়জেঠি সেখানে ছিলেন। নাগাড়ে-কিষেণকে দিয়ে গোয়াল সাফ করিয়ে, গাইবাছুরদের চরানিতে পাঠানোব সমস্ত তদারকি সেরে এরই মধ্যে কখন যে পুকুরঘাটে গিয়ে গুচ্ছের কাপড়চোপড় কাচাকাচি শেষ করে স্নানও সেবে এসেছেন, অবাক কাণ্ড, বড়সড় একটা প্লাস্টিকের গামলায ডাঁই-করা নিংড়নো-পাকানো ভেজা-কাপড় নিযে উঠোনে ফিরে এলেন। ডান দিকের কাঁখ সামলাতে টানটান বাঁদিক।

যার যা কাজ। বড়দেব কাজেকম্মে কেউ তাকায় না কারুর দিকে। কিন্তু বাধা তাকিযে ছিল। যখন তারই হাতেব খেলনা নিয়ে মেতে উঠেছে ছোটয-বড়য় প্রায় গোটা বামুনবাড়ি, তখন কেন যে ছাই সে তার চোখেব বিস্ময়ে বড়জেঠির দিকে হাঁ

হয়ে তাকিয়ে থাকে— নিজেও হিশেব বোঝে না। কঁড়িকাঁড়ি সোনাদানা ঘরের সিন্দুকে তুলে রেখে এই বয়সেও দিনভর রাতভর খেটে মরবেন গ সংসারের বড়গিন্নি? চেহারাটাও বানিয়েছেন ঠিক দাসীবাঁদির মতো। কারুর হাতের কাজই নাকি পছন্দ হয় না। সব একা করবেন। বড্ড শুচিবাই। এমন সব খিটকেল হাড়কেপ্পন গেঁয়ো বুড়িগুলোকে একদম ভালো লাগে না রাধার। বুড়িই বা ভাবছে কেন? সাহেববাড়ির মাকে মনে পড়ছে তার। কে বড়, কে ছোট? মায়েদের বয়সের ফারাক বোঝে না সে। কিন্তু চিত্তির-বিচিত্তির দুধশাদা চিনেমাটির দামি বাসন আর কাঁসা-পেতলের দামি তৈজসের ফারাকে নকশাকাটা চিনেমাটির রংবাহারি মাঁ আর কাঁসা-পেতলের তামাটে মায়ের যে-তফাত ঘটে যায়, সেখানে হাউসকোটের সিরামিক-মা অনেক মনোহর।

হাউসকোট না হোক, ঠিক যেন একটা পাশবালিশের খোল— শস্তা ম্যাকসিতে গা ঢেকে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী। রাধার গায়ে হাত রেখে দেখতে চাইছিল নতুন ধরনের জামার কাটছাঁট। এমন হতকুচ্ছিত মায়ের মেয়ের এমন চাঁদপানা মুখ? কিংবা যে-দিদির দিকে ভ্রূকুটিতে তাকাতে পারে রাধা, তার ঠোঁটে হালকা হাসির আস্তরণ-–‘ এমনধাবা সুন্দব সুন্দর জামা র‍্যা তোর রাধু? কলকাতায় যে-বাড়িতে থাকিস, সেখেনে এত দামি-দামি ড্রেস দেয় তোদেরকে?’

‘দেবে নি কেনে?’ ভ্রূ কুঁচকোল রাধা—‘ সে দেখ নি ত দিদিমণিদেরকে। দেখলে মাথা ঘুরে যেত। তোমারই বয়সী মুন্নিদিদি। বুল্লিদিদি আমার মতো। কিন্তু হলে হবে কী? কত বড় বড় ইংজিরি ইশকুলে উঁচু উঁচু কেলাশে পড়ে। কত বই গ ওদের দু-বোনের। সব ইংজিরি। খুব শক্ত। সকাল-সন্ধেয় হপ্তা ভরে তিনটে চারটে মাস্টার। সব্বায় হিমসিম খায়...’

‘যা মলো যা...’ সরস্বতী হেসে ফেলল— ‘সে-ওদের কথা শুনতে চাইছে কে? আমি বলছি, তোর কথা। তুই ত কাজ করিস ওদের বাড়ি। তোর মতো কাজের মেয়েদেবকেও এত যত্নআত্তি, এমনধারা আদর?’

রাধা ছিটকে গেল। আসলে একটা রাগ পলকে পা থেকে মাথায় রক্তে রক্তে লকলকিয়ে উঠে ফণা তুলল মাথায়, যেখানে তার খুদে-খুদে দুটো চোখ জ্বলছে আগুনে...

হতভম্ব সরস্বতী—‘কি র‍্যা, কী হল তোর? কী এমন বললুম তোকে?’

‘কাজের-মেয়ে? কাজের-মেয়ে বলছ কাকে?’ আসলে জলঢোঁড়া-মিটুলি। ফণাটা ঠিকমত ফোঁসায় না যখন, কান্নায় ভাঙে গলার স্বর—‘সাহেববাড়িতে তোমবা গেছ গ কোনোদিন? মা গেছে, পালান গেছে। থেকেছে এক-বেলা এক রাত্তির দু-রাত্তির। শুধোও না, শুধোও না ওদেরকে...’

উঠোন -ভর্তি মানুষ। সকলেই হতবাক। কী শুধোবে, কাকে শুধোবে, কেনই বা শুধোবে? আদ্যন্ত মাথামুণ্ডু বুঝলই না কেউ। এতদিন বাদে এসেছে মেয়েটা। বড্ড গোলমেলে। খামোকা অশান্তি। অসহায় সরস্বতী, বড় ঠাণ্ডা মেয়েটা, ঘাবড়ে গেল।

‘আ ল, কী হল? বলি, হল কী তোদের? এই ত দেখলুম ভাইবোনেরা সব্বায় মিলে হুল্লোড় করছিলি উঠুনে। ফের রাগারাগি কেনে? রাধু, বলি অ রাধু, নাক ফুইল্যে রয়েছিস কেনে র‍্যা? নে, বাটিটা ধরে আছিস। মুড়ি কটা খেয়ে নে...’ পুকুরঘাটে নিংড়নো

কাচা-শাড়িগুলি পাক খেয়ে খেয়ে কচি লাউয়ের সাইজে গামলা ভরে ছিল। পাক খুলে, আরো একবার সজোরে ঝেড়ে নিয়ে এক দিকের প্রান্ত ধরে রেখে, বাকিটা গোল্লা পাকিয়ে মাথার উঁচুতে উঠোনের টানটান তারে ছুঁড়ে দিয়েছেন বড়বউ। তারে এসে বসেছিল দুটো কাক। উড়ে গেল। তারে ঝোলানো শাড়ির দুটো দিক দুদিকে টেনে টেনে পাট করে দিতে দিতে সস্নেহে দেখছিলেন বাপ-মরা আবাগি মেয়েটার গাল-ফোলানো রাগ বা অভিমান। হাসিও পায়, আবাব মায়ের শাসনকেও ধরে রাখতে হয়। চোখ পাকিয়ে ধমকে নিজের মেয়েকেই—'কী বলেছিস তুই ওকে? এটুকুন একটা মেয়ে পেটের টানে থাকে কোথায় বিদেশবিভুঁইয়ে কোন্ মুলুকে। দুদিনের জন্যে এয়েচে ঘরে...'

'না না, মা... আমি কী বলেছি ওকে? কিছু বলি নি। জিগ্‌গেস করো...' দু-হাত নেড়ে, চঞ্চলতায় সরস্বতী কৈফিয়তের সুরে— 'আমি শুধু ওর জামাটার কথা বলছিলুম...'

'জামাটার কথা বলছিলি, আব তাইতেই ও গোসা করে গাল ফুলিয়ে রইল?' ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন বডবউ— 'না র‍্যা রাধু, মিছিমিছি বাগ কবিস নে। যা, তুই কোথাও একটু শান্তি করে বোস্ ত মা। মুড়িটুকু খেয়ে নে...'

বামনুবাড়ির খোদ বড়গিন্নির প্রশ্রয় বা ভালোবাসায় অভিভূত সুমতিবালা ওপাশ থেকে লাফঝাঁপে ছুটে এল কাজ ফেলে—'হ্যাঁ গ দিদি, আমিও ত সে-কতাই বলি গ ওকে। এয়েচিস দু-দিনের তরে, তা বাছা, থাক না কেনে এট্টু সুস্থিব হয়ে। শুয়ে বসে জিরো এট্টু ঘরে। তা এমনধারা ঠ্যাটা মেয়ে গ আমার। এত জেদ। মায়ের মন ওরা বুঝবে নি গ দিদি। কতা কইলেও শুনবে নি। তক্‌কো করবে।'

'তা তুমি ফের কোন্ সুধাবাক্যি শোনাতে এলে বল দিনি...' ঘোষালগিন্নি ভ্রু কুঁচকে তাকালেন বাঁদিকে। আরো একটা কাচা-শাড়ি আকাশের তারে ছুঁড়ে পাট করে, এক কোণে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে—'মা হয়েচ বলে মাথা কিনে নিয়েচ নিকি? যাও দেখি তুমি। তুমি তোমার কাজে যাও। রাধু আমাদের ঘরের মেয়ে নয়? জম্মো থিক্যে দেখে আসচি ওকে...'

অদূরেই ছিল রাধা। কটকটে বাগ ছিল। সুতরাং বড়জেঠির সোহাগী ঢঙে তার মন ওঠে নি। সেই জ্বলুনিতে হাতে ধরে-থাকা ভারি আর মস্ত বড় কাঁসার জামবাটিটা সে ছুঁড়ে মারতে পারত মাটিতে। সাহস হয় নি। বাটিতে অনেকটাই মুড়ি ছিল তখনও। চিবোতে চিবোতে মাড়ির-দাঁত আর চোয়ালে ব্যথা ধরে গেলেও জিভের শোসানিতে লোভ ছিল। কিন্তু সে তার সাধের আমতেল মাখা মুড়ির-বাটি থেকে মুঠোয় তুলে তুলে, অবশিষ্ট যা ছিল, একটু একটু কবে কাছে-দূরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে শুরু করল। পাখিরা নেমে এল নিচে। হরেক পাখি—কাক পায়রা শালিক চড়ুই। উঠোন ভরে মাটিতে ঠোঁট ঠুকরে ঠুকরে দানা তুলতে থাকে ওরা। বামুনবাড়ির উঠোনে বামুনবাড়িরই লোকজন কে কোথায় কী দেখছে, কী ভাবছে—কারুর প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না রেখেই পুষ্যিদের অভয় দিয়ে সে ওদের লাফঝাঁপের দিকে তাকিয়ে থাকে। দানা ছড়ায়। এ-ও খেলা। মজার খেলা। এ-খেলা শহরে নেই। গাঁয়েই।

উঠোনের সোরগোল কমে এসেছে। যে যার মতো নিজেদের কাজে ফিরে যাচ্ছে

সকলেই। তার মতো একটা মেয়েকে নিয়ে বেশিক্ষণ বাহানা গাইবার সময় নেই কারুর। কিংবা উঠোনের এক কোণে ঠা ঠা রোদ্দুরে গতর খাটিয়ে গলগল ঘেমে নেয়ে যে কাজ করে যাচ্ছে তারই গর্ভধারিণী মা—বামুনবাড়িরই কাজ, সেদিকেও নজর নেই কারুর। বিদে ঠেলে ঠেলে অথবা হামা দিয়ে দিয়ে হাতে-হাতে নিকনোর ভঙ্গিতে পাটি বা মাদুরের ধাঁচে সেদ্ধ-ধান অনেক বড় করে ছড়িয়ে দিলেও, কি জানি কেন, চৌকো হয় না পাটি বা মাদুরের মতো। গোলগাল হয়। নয়তো মস্ত একটা ডিমের আদল পেয়ে যায় ধানের মাদুর। মেহনত অনেক। ল্যাগবেগে শুঁটকো শরীরে উবু হয়ে মাটিতে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া নিজের মাকেই বড় কাঙাল-কাঙাল লাগে। শায়া নেই, ব্লাউজ নেই। হতকুচ্ছিত নোংরা এক-কাপড়ে ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ের ঘরে ঘরে। বড্ড বিচ্ছিরি। ভিখিরি-ভিখিরি।

রাধা সতর্ক হলো। মায়েব দিকেই এগোচ্ছেন বড়জেঠি—'তোমার মেয়েটা যে দেখতে দেখতে ডাকাবুকো সেয়ানা হয়ে উঠেচে গ রাধুব-মা। চোখে দেখচ নি? বলি, কানা নিকি?'

'আমিও ত সেই কতাটাই ভেবে-ভেবে মরি গ দিদি। নিদ নেই রাত্তিরবেলা...' বয়সকালেও মজা-বুকে মায়েরা একইভাবে মা থেকে যায়। মাথায়-মাথায় বড় হয়েও পেটের বাচ্চারা মায়ের বুকে কামড়ায়। সে-বড্ড যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় কাতরায় সুমতিবালা-—'অ্যাদ্দিন না-হয় বড়পুকুরতলার সতুর-বাপ ছিলেন গ সেখেনে। মাথার ওপর গাজ্জিয়ানের পারা একজনা। তা উনিও শ'বেব কাজকম্মো ছেড়ে জম্মেব মতন চলে এলেন গ দেশের বাড়িতে...'

এখন অনেক পাখি বাধাকে ঘিরে। বাটিটাও ফুরিয়ে এসেছে। একটু একটু করে সে তার চাবদিকে দানা ছড়াতে থাকে। শাদা-শাদা প্রতিটি মুড়ির দানা মাটিতে পডার আগেই ছুঁচলো ঠোঁটে তুলে নিচ্ছে কেউ না কেউ। কালো-কালো কাকগুলো শয়তান। এগোতেই দিচ্ছে না কাউকে। কাক তাড়িয়ে সে চড়ুইকে ভালোবাসতে চায়।

'আমি বলি কি রাধুর মা, তুমি শ'রের বাবুদেরকে খপর পাঠিয়ে দাও—ও আর যাবে নি সেখেনে...'

'আপনি বলচেন? বলচেন গ দিদি?' বাঁশঝাড়ে ঝিরঝির বাতাস লাগলে যেমন হয়, সর্ব অঙ্গে থরথর কাঁপুনি সুমতিবালার।

এবং সেই কাঁপুনি রাধাব শরীরে ঝড়।

'হ্যাঁ গ, বলচি। তাই বলচি...' পাশাপাশি চারটে শাড়ি দুটো ধুতি তারে ঝুলিয়ে দেবার পর থিয়েটারের পর্দা তৈরি হয়ে গিয়েছিল উঠোনের এক ধারে। ভেজা-কাপড় ওজনে ভারি। বাতাস পেয়েও উড়তে পাবছে না ভালো করে। এবং তখনও শায়া ব্লাউজ, ছেলেমেয়েদের জামা-প্যান্ট-ম্যাকসি-ফ্রক আরো কিছু ছিল গামলায়। একটা শায়াকে দু'হাতে ঝেড়ে নিয়ে, আরো খাটোমতো একটা দড়ি টাঙানো ছিল উঠোনের কোণের দিকে, সেদিকেই এগোতে এগোতে বড়বউ—'দেখচ ত সক্কাল থিক্যে খেটে-খেটে মরচি রাত্তির অব্দি। বযেসও ত বাড়চে র‍্যা বাপু। আর পারি নে। তা যদ্দিন না ওর একটা বে-থা হচ্চে কিছু, থাকবে আমার কাছে। পোস্তকলাইয়ে খাবে দুটো

ডালভাত। জ্যামাকাপড় যা লাগে, বছরের হিশেবমতো সব্বায় যা পায়, পাবে...'

দুঃখে তাপে শোকে জীবনভর মরণ সয়ে সয়ে আচমকা এতটা সুখের ধকল সইবার মতো কলজের জোর ছিল না সুমতিবালার। দয়াধম্মও কী নিদ্দয় গ। কী বলবে, কী শুধোবে সে ভাগ্যিমানী বড়-মানুষেব দোরে? মায়ের বুক, সদাই দুখ। গাঁয়ের আর দশটা গেরস্তঘরে গতর রেখে যেভাবে ইহকালের পেট চলে যাচ্ছে মা আর ছেলের, যদি মেয়েটারও একটা হিল্লে হয়ে যায়? উঠতি বয়স। না-হয় দুটো শুকনো শাকচচ্চড়িতেই থাকবে চোখে চোখে। এবং সেই কৃতজ্ঞতায়, বুকের আছড়ানিতে আকুল হলো সে— 'আগের জন্মে রাধু নিচ্চয় আপনাব নিজের পেটেব মেয়ে ছেল গ দিদি। তা নইলে এমনধাবা কতা? ছোট মুখে কী আর সুখ্যাত গাইব গ আপনেদেব? গরিব-দুঃখীব জন্যে এমন কবে বুক কাঁদে যাঁব...'

এত বড় একটা জামবাটি। নিজে খেতে খেতে অথবা পাখিদেব দানা ছড়াতে ছড়াতে সব মুড়িই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উঠোন ভরে পাখিরা ছিল। পাখিগুলোব প্রত্যাশা ছিল। রাধা হঠাৎ ছুটল। পাখিবা ভয় পেল। ডানা ঝাপটানিতে ওদের উড়ে যাবার পতপত পতপত শব্দ এবং উঠোনে মানুষজন যাঁবা ছিলেন, সকলেই হতবাক। এক দৌড়ে ভারি কাঁসার বাটিটা বড-দালানের বারান্দায় ঝপ করে শব্দ তুলে রেখেই তাব ছুট। বাটিটা আছড়ে ফেলা বা ঝনঝনিয়ে তোলার তাচ্ছিল্যে বা মেয়েটার এভাবে ছুটে যাবার আতিশয্যেই এমন একটা অশোভন দৌরাত্ম্য ছিল, নাড়া খেলেন সুরথ ঘোষাল। খবরের-কাগজ থেকে চোখ ঘুরিয়ে হকচকিয়ে তাকালেন— 'কি র‍্যা, কী হল তোর? বাটিটার ওপব বাগ কেনে র‍্যা? ওটা কী দোষ করল?'

অন্যদিকে মন্মথ ঘোষাল, নিজেব মোটববাইকের যত্নআত্তিসেবায় মেয়েদের কথায় বার্তায় এতক্ষণ কানই ছিল না যাঁর, চমকে তাকালেন— 'কী ব্যাপার? কী গ বৌদি, ওকে কী বললে তোমরা? হুড়মুড় করে পালাল কেনে?'

এসব প্রিয়জনবাক্য শোনে না রাধা। পালায়, সত্যি পালায়। বামুনবাড়িব নতুন দালানে তাব জন্য চা তৈরি হয়েছে নতুন-বউয়েব ঘরে। এক কাপ চায়ের জন্যে সকাল থেকেই পানসে মেবে আছে মুখটা। এক বাটি মুড়ি চিবনোর পর আরো বিচ্ছিবি। অথচ এক কাপ গরম চা তার জন্যে পড়েই রইল। হয়তো এবই মধ্যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা টাল। মরুক গে ছাই। বামুনবাড়িতে আর নয়। নাহ, কিছুতেই না। সদর দরজা ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে তার লম্বা ছুট। সে ফিডার বোডের মোড়ে শুরকি-ঢালা লাল মোবামের পথ যেখানে পৌঁছে ফুরিয়ে গেছে, পাকা সড়কে বাসস্টপের ধারে ধম্মোদাস পাত্রের দোকানে যাবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা ভেতরে বাঁশের মাচায় বসে একা একা চা খায় না কোনো ভদ্দরঘরের মেয়ে। ভারি আবদার রে। কেন খাবে না? যাদের ঘরে চায়ের পাট নেই, তেষ্টা পেলে কী করবে তারা? তাছাড়া এ-তো আর কারুর কাছে ভিখ-মাগা পয়সা নয়। তার নিজের পয়সা, তার গতর-পোড়ানি রোজগারের টাকা। হকের টাকা।

বাকশো খুলে টাকা নেবে বলেই সে ঘরের দিকে ফিবছিল। ভাইকে সঙ্গে নেবে।

গুয়েময়রার দোকানে মাখা-সন্দেশ খাবে পালান।

বড়পুকুরতলার ধার ঘেঁষে সিঁথি-কাটা মেঠো রাস্তায় জোর কদমেই ছুটছিল রাধা। হাঁটা নয়, অনেকটাই দৌড়। রংবাহারি নকশায় হালকা মিহি সিনথেটিক কাপড়ের কাফতান ঢলঢলে বাগি জামার আদলেই বুকের ওপর লেপটে থেকে পেছনের দিকে উড়ছিল বাতাসে।

থমকে দাঁড়াল। তাকায় চারপাশে। শহরের সাহেববাড়ি ছেড়ে মাঝেমাঝে গাঁয়ে এলে এভাবে মাঠে-মাঠে ছুটতেও বড় ভালো লাগে তার। মস্ত আকাশমাঠ গাছপালা ডোবাপুকুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এমন করে বনেবাদাড়ে ছুটে বেড়ানোর শখই তাকে কৈলা বাছুরের দুবন্তপনায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায। কিন্তু আজ ভেতরে ভেতরে একটা প্রবল রাগে দুটো পায়ের গোড়ালিতে হাঁটুতে কিছুতেই জোর পাচ্ছে না তেমন। বামুনবাড়ি থেকে এতটা পথ ছুটে আসার পবও বড়জেঠির ওপর রাগটা তার থেকেই যায় যথারীতি। এখানে, এই এঁদো গাঁয়ে থেকে পচে পচে মরবে কেন সে? মাসের শেষে অত টাকা মাইনে দেবার মুরদ আছে কারুর? সাহেববাড়িতে কত রকমারি সব খাবারদাবার রোজ রোজ। নিত্যি নতুন তাক-লাগানো সব জিনিসপত্তর। ফুটফুটে দিদিমণিদের গা ঘেঁষে থাকারও কত সুখ। কত কি জানা যায়। কত কি শেখার আছে। রঙিন টিভিতে বসে সন্ধে কাটে, খুশি হলেই যখন-তখন ভি. সি. আর.। সাহেববাড়ির পয়সায় সোনার ঝিলিক, বামুনবাড়ির পয়সার রং বড্ড তামাটে।

এবং গোটা গাঁয়ে ঢেউ খেলিয়ে নিজের ভাঙাচোরা মেটেঘরের দিকে এগোবার দ্রুততায় সে হাঁপিয়েই উঠেছিল কিছুটা। সামন্তিপাড়ায় ঢোকার মুখে বাঁশতলার ছায়ায় ছায়ায় নির্জনে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সেই লোকটা? লোক নয়, সেই ছেলে? না, না—ছেলেও নয় ঠিক-ঠিক। তার চেয়ে বয়সে বড়, সাহেববাড়ির দাদাবাবুদের মতোই নতুন গোঁফ-গজানো মানুষটা সামন্তিদের ডোবাটার ধারে একটা পিটুলি গাছের ছায়ায় একা চুপচাপ। কালই হাওড়া ইস্টিশনে মানুষটাকে প্রথম দেখেছে সে। হাঁদারামকে নিয়ে রেলগাড়িতে মজাও হয়েছে অনেক। খাড়ুয়ার গাঁয়ে বাস? কী দেওয়ান যেন ওর বাপের নাম? মনে পড়ছে না। ওর নিজেব নামটা? শিবু? সে-নামটা মনে আছে। শিবু বলেই তো ওকে ডেকেছিলেন সতুদা? কিন্তু মানুষটা এখানে কেন এমন ভরদুপুরবেলায়?

ছলাৎ করে উঠল বুকটা। নবযৌবনের আস্বাদে তার কিশোরী শরীর রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় হাড়গোড় কাঁপিয়ে ঝনঝনিয়ে উঠল এমন, অথবা ভেতরে ভেতরে নিজেরই গা-গতরের নিয়মবিধি অদ্ভুতভাবে বদলে যাবার পর, জীবনে এই প্রথম, অণুতে অণুতে মেয়েমানুষের শরীরটাকে সে সঙ্গোপনে অনুভব করে ভয় পেল অথবা ঝিরঝিরে বাঁশপাতার কাঁপুনির মতোই তিরতির একটা শিহরন। আকাশ মাটি ঘরদোর গাছপালা ঝলসে চারপাশে রোদের ঝালর। হরেক পাখির ডাকে নিঝুম ভাঙছে দুপুর। কেউ কোথাও নেই। দূরে সামন্তিদের বাড়ির উঠোনে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। ওপাশে চালতাতলায় গুলতি খেলছে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে। বাঁশঝাড়ের ওপাশ দিয়ে ছাতা-মাথায় মন্দিরবাকুলের দিকে যাচ্ছে বুড়োমতো কে একজন। ছাতায় ঢাকা মাথা। হয়তো কুঁতিপাড়ার সামন্তিপাড়ার নয়তো এখানে সাঁতরাদের ঘর আছে যে-দু চারটে, তাঁদেরই

কেউ। গাঁয়ের এই বুড়োগুলোই যত ব্যাদড়া। খালি-খালি ফ্যাকড়া বাঁধায়। ও-ছাই খিটকেল বুড়োহাবড়াগুলো মরেও না ছাই।

শুনশান ভরদুপুরে না-চাইতেই অদ্ভুত একটা মজার খেলা পেয়ে গেল রাধা। গোপন খেলায় মজা যেমন, চারপাশে নজর রেখে চোরের মতো বুকের ভয়ও আগলে রাখতে হয়। পুকুরে ছিপ ফেললে ফাৎনাটা যেমন জলের ওপর উঁচিয়ে থেকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপে, ফস্টিনস্টির আজব তামাশায় কাঁপুনিটা থাকে। কিন্তু মাছটা কেমন বা সেটা কত জবরদস্ত, জানে না রাধা। খুব কম করে হলেও পাঁচ-ছয় বছরের বয়সে বড় দামালদস্যি একটা ঢ্যাঙা মরদ তার ফাৎনা হয়ে যায় এবং মাছ-ধরার যেমন নিয়ম—চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকতে হয়—কখন নড়েচড়ে, কীভাবে নড়ে? যতটা হাবাগোবা মনে হয়েছিল কাল রাতে রেলগাড়িতে, আজ আর ক্যাবলা মনে হচ্ছে না সে-রকম। শরীরস্বাস্থ্য খারাপ নয় খুব। গায়েব রং কালো হলেও হালকা দোহারা চেহারায় বেশ তাজা-তাজা। বোঝা যায়, নিজের পয়সায় করেকম্মে খায়। একটাই কি প্যান্ট নাকি ওর? তাই তো মনে হচ্ছে। আহা রে, যতটা পারেন, ফোতোবাবু আজ জেল্লা মেরেছেন খুব। নীলচে প্যান্টের ওপর টকটকে লাল গেঞ্জি। বুকের ওপব শাদায়-কালোয় বড় বড় ইংরেজি হরফে কী সব লেখা! মাঝখানে কী যেন একটা ছবি! চোখে চোখ পড়ে যাবার পর কী যে করবে, পালাবে কোথায়—ভাবতে ভাবতেই ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে পাট করছে বারবার। দেখেও না-দেখার ভান করে ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে রয়েছে অন্যদিকে। রাধা এসব ফিচলেমির মানে বোঝে। আটকে গেছে পিটুলি গাছের তলায়, গাছের সঙ্গে দড়িতে-বাঁধা গাইবাছুর যেমন। পেটেব নাড়িভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসিও পাচ্ছে রাধার। এক-কুড়ি বয়স ছুঁয়েছে-কি-ছোঁয়-নি জোয়ান মরদ! দেখো তাব হাল।

নিজের খুশিমতো ঘুড়ি ওড়ানোর সুতোটা বুঝি নিজেব হাতে পেয়েই গেছে রাধা। মুখচোরা লাজুক-লাজুক টাইপ দিয়ে ফালতু ভড়ং দেখানোর এমন কিছু দায় পড়েনি তার। শহরের মেয়ে সে। গেঁয়োভূতকে অন্তত এটুকু বুঝিয়ে দেবার তাগিদেই ঘাড় উঁচিয়ে বুক চিতিয়ে সে এগোল পায়ে পায়ে। ঝলসানো রোদের সুয্যি বাঁশঝাড়ের ডগায়। নকশা-আঁকা কাঁথার আদলেই মাটিতে পাতার ছায়ায় ছায়ায় রোদের চিত্তির। হালকা বাতাসে বাঁশপাতার ঝমঝম মাথাব ওপর। পায়ের তলায় শুকনো ঝরা-পাতা মাড়িয়ে পা-ফেলার ধ্বনি অনেকটাই ঘুঙুরের বোল। অথবা, নেহাতই অকারণ, পায়ের চটিতে খামোকা চটাং-চটাং আওয়াজ। ডানদিকে কে কোথায় আছে—কোনো রকম আমল না দিয়ে এগনোর ভঙ্গি নিয়েও আড়চোখে নজব রাখতে হয়—ফাৎনা কাঁপছে কিনা? কাঁপলেও সে-কী ঢেউয়ের কাঁপন? না-কী ডুবে যেতে চাইছে জলের তলায়? বেচারিব হাল দেখে বাধার অবস্থা আরো কাহিল। পেট কাঁপে ঠোঁট কাঁপে থরথর থবথর। ওপাশে ক্যাবলাকান্ত বোকা বোকা মুখেব হাঁ তুলে ছুঁচলো আড়চোখে বিঁধতে চাইছে এমন, বুঝি শুধু চোখের চাউনিতেই এমন করে গা চাটা যায় মেয়েমানুষেব! বাধাও যেন তাব সর্বাঙ্গের চামড়ায় সত্যি-সত্যি সুড়সুড়ি পেল। যখন খুবই কাছাকাছি, আদেখলাকে ডান দিকে রেখে ডিঙিয়ে যাচ্ছে সে, কী মনে হলো, ভুরু তুলে তেবচা মেরে তাকাতেই...কী বোকা! কী বোকা রে! আসলে হাঁদা, আস্ত হাঁদাবাম...

চকিতেই কী যে হলো, একেবারেই আচমকা কোমর থেকে গোটা পিঠটা খাড়াখাড়ি ভেঙে, দু-হাতের পাতায় মুখচোখ ঢেকে হাসতে হাসতে লুটোপুটিতে এমনভাবে গড়িয়ে পড়ল রাধা, সে-এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড মেয়ের। চারপাশের গাছগাছালির ফাঁকফোকর থেকে হরেক ডাকের নিঝুম ছাপিয়ে তার খলখল খলখল।

এবং অদূরে দাঁড়িয়ে সেই যুবক অতর্কিতে নাড়া খেয়ে পুরোপুরি ভোকাট্টা। হয়তো তার হিসেবে মেলে নি। ভয় নেই, ডর নেই, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে এমন বেআক্কেলে হুজ্জুতি বাঁধিয়ে দিতে পারে মেয়েছেলে কেউ? কিংবা গোটা ব্যাপারটাই একটা ধাঁধা। হঠাৎ-ই বেকুব বনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পিটুলি গাছের আড়ালে। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পায়ে পায়ে উত্তরমুখো হাঁটা তার। একেবারে উল্টোদিকে। ভাগ্যিস এখনও দেখে ফেলে নি কেউ। কিংবা মেয়েটা যা করছে, এক্ষুনি একটা হল্লা বেধে যেতে পারে। সে-আরেক ফ্যাসাদ। ভরদুপুরে বেপাড়ায় এসে মেয়েছেলের ফক্কিবিতে ফেঁসে গেলে দেশগাঁয়ের বাড়িতে তার কী হাল হতে পারে, সে জানে।

এবং এদিকে দু-হাতে মুখ চেপে হাসতে হাসতে মাটিতেই বসে পড়েছিল রাধা। তাজা বয়সের এমন একটা মানুষের মরণদশা দেখে বসে থাকে না সে। লম্বা ছুট তার। দুয়ো দুয়ো! বাবুর খুনসুটির শখ আছে খুব, লক্কাবাবু খেলতে জানে না। জানবে কী করে? মেয়েছেলে নিয়ে মশকরায় পয়সা লাগে। আছে পয়সা?

কৌতূহল থাকে। থেকেই যায়। ছুটতে ছুটতে পাড়ায় ঢুকে অষ্টা কুঁতির ঘরের আড়ালে, নিজেকে লুকিয়ে, যেন শৈশবের লুকোচুরি খেলা—গোটা শরীরটা ঢাকা থাকে মেটেঘরের আড়ালে, দেয়ালে নাক ঠেসে রাধা পিটপিট করে তাকায় পেছনের দিকে। দুচ্ছাই। এত সব উঁকিঝুঁকির দরকারই নেই কিছু। ফিরে যাচ্ছে মরদ। বাঁশবন পেরিয়ে সামন্তিদের পুকুরের ধার ঘেঁষে চলে যাচ্ছে দূরে। হাসিটা থেকেই যায় মুখেচোখে। আরো বেশি হাসি। মেয়েমানুষের মন বোঝে না তো খেলতে আসে কেন উজবুক?

'কি র‍্যা? কী কচ্চিস র‍্যা ওখেনে রাধু?'

রাধা ভয় পেল। ঘর থেকে বেরিয়ে কুলোয় করে কিছু খুদকুঁড়ো কি চাল নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন বিধবা পারুলপিসি। থমকে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন কাছে। গলা বাড়িয়ে ভাগ বসাতে চাইলেন রাধার কৌতুকে—'কী দেখচিস র‍্যা তুই? হাসচিস কেনে পাগলের মতন?'

ধরা পড়ার কিছু নেই। পারুলপিসি নিজেই দেখেছেন, বাঁশঝাড়ের ফাঁকায় কোথাও কিছু নেই। কেউ নেই। দূরে কে একটা লোক চলে যাচ্ছে পায়ে পায়ে হেঁটে। সে তো যেতেই পারে। দুপুরবেলায় গাঁয়ের রাস্তায় লোকে হাঁটবে না?

খুশির খলবল ফুরোয় একসময়। হাসিটুকুও আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। কেন না হাসিটা তো সত্যি ছিল না তেমন কিছু। টেনে টেনে একা-একা কত আর মজা করা যায়? বরং সে অবাক হলো—চাষির ঘরে চাষের চাল কুলোয় নিয়ে কী অত বাছাবাছি পারুলপিসির? কুলোটা বুকের কাছে নিয়ে আঙুলে-আঙুলে চিমটি কেটে ফেলে ফেলে দিচ্ছেন ধানের খোসা, চালের পোকা, আবোলতাবোল আর যা আছে—সব। চার-আঙুলের বুরুশ টেনে ওপরে-নিচে ভাগ করছেন বাছাইয়ের চাল আর মেশাল চালে।

কুলোয় চোখ রেখেই হঠাৎ আপন মনে—'এমনধারা হাসতে নেই র‍্যা মেয়েমানুষের...'

'বাঃ রে, হাসি পাচ্ছে ত হাসব নি? সে-কী কথা?'

'অ, বিষের সনে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর। শ'রের ভাত খেয়ে কতা ত শিখেচিস বিস্তর। বাহারের সাজপোশাকে ঝিলিক মেরে নেচেকুঁদে রঙ্গরসে যে টিটিক্কার ফেলে দিয়েচিস গাঁয়ে, দশ কানে দশ কথা চলচে। কচি খুকিটি ত আর নোস র‍্যা বাপু। বলি, বুঝিস নে কিছু? ঢ্যামনা নিকি র‍্যা তুই?'

কুলোপানা চক্করে সত্যি-সত্যি বিষ ছিল রাধার। তার অঙ্গে অঙ্গে আস্ত কলকাতা। কিন্তু বলবে কাকে? বলা-কওয়ায় তার ভারি বয়েই গেছে। একইভাবে ছুটে যাচ্ছিল সে। পালাচ্ছিল। থমকে গেল।

'তোর হাতে ওটা কী র‍্যা রাধু?'

ভুলেই ছিল রাধা, তার হাতের মুঠোয় সেই আজব যন্তরটা। হারায় নি। ভুলে গিয়েও হাতের মুঠোয় আগলে আছে। উথলে উঠল—'ওয়াকম্যান গ, ওয়াকম্যান। সে-তোমরা বুঝবে নি...'

বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই। সে ওয়াকম্যান বোঝাবে কাকে? পারুলপিসিকে এড়াতে পারলে বরং তার ব্যাটারির খরচ বাঁচে। পালায় রাধা। ছুটে পালায়।

কিন্তু চা? শুকনো গলায় একটা চায়ের তেষ্টা আঠা-আঠা হয়ে লেপটে আছে সেই সকাল থেকে। ভাইকে নিয়ে সে দোকানে চা খেতে যাবে। মোরাম-বাঁধা লাল ডবকির রাস্তা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, পাকা সড়কের ধারে মস্ত শিরীস গাছের তলায় চারটে বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের ছাউনি বেঁধে দোকান দিয়েছে বুড়ো ধম্মোদাস পাত্তর। বাঁশের মাচায় বসে দিনভর গাঁয়ের যত ছেলেছোকরাদের ভিড়। ট্র্যানজিস্টারে হিন্দি-বাংলা গান বাজে সারাক্ষণ।

কিন্তু...

খটকা লাগে। কেমন একটু মুষড়ে পড়তেই হয়। ভাবতেই হয়। আজ রবিবার। চায়ের দোকানে ব্যাটাছেলেদের ভিড। সেখানেও তো থেকে যেতে পারে মানুষটা? আসলে কী বোকা রে। হদ্দ বোকা একটা লোক। আহাম্মক।

কিন্তু চা? ঘুম থেকে উঠে সক্কালবেলায় এক কাপ চা পাবে না লোকে? এ-কেমন ধারা কথা গ? কেমনতরো দেশ?

অনেকটা পাখির স্বভাবেই গাঁয়ের ঘরে-ঘরে ঘুরে কয়েক পালি মুড়িচিঁড়ে চেয়েচিন্তে এনেছে সুমতিবালা। গাছের শুকনো ডাল, শুকনো পাতা কুড়িয়েছে বনেবাদাড়ে। দুটো নারকেল দিয়েছে মিত্তিরদের বাড়ির ছোট শরিকের ঘরের বউ। আরো একটা নারকেল, কেজি তিনেক গুড় কিনতে হয়েছে দোকান থেকে। এত এত বছর ধরে মেয়েকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছেন শহরের মা-ঠাকরুণ। এত এত টাকা বেতন জুগিয়ে গেছেন মাসে মাসে। তাঁদের জন্যে কী আর করতে পারে চালচুলো-নেই মুখ্যুসুখ্যু একজন বিধবা মেয়েমানুষ? দুটো-চারটে নাড়ুমোয়া। এর আগেও পাঠানো হয়েছিল একবার। খুশি হয়েছিলেন ওঁনারা। শহরে ফিরে যাবার সময় এবারও রাধা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

উঠোনের কোণে একটা পাতা-উনুন থাকেই দেশগাঁয়ের গেরস্তঘরে। ধান সেদ্ধ হয় বড়-মানুষদের সংসারে। ধান নেই যাদের, রান্নাঘরের ফুটুনিও তাদের খুব একটা থাকে না তেমন। বাইরেই যা-হোক দুটো চাল ফুটিয়ে রান্নাবান্না। তাছাড়া এতগুলো গুড় জ্বাল দেবার জন্যে বড়সড় মাপের যে-ভারি কড়াইটা বামুনবাড়ি থেকে চেয়ে এনেছে সুমতিবালা, তার জন্যেও তো পাকাপোক্ত উনুন চাই একটা। কড়াই বা গামলা বা নারকেল-কুড়ানির মতো সে উনুন ধার চাইতে যাবে কার দোরে? নিজের ঘরের কাজ কি পরের ঘরে হয়? নাকি ওতে কাজকম্মের বিহিত থাকে কিছু?

এপাশে-ওপাশে নিঝুম কাঁপানো কাকের ডাকে দুপুর জ্বলছিল আগুনে আগুনে। গনগনে দুপুরের রোদে বোঝা যায় না সত্যি-সত্যি আগুন বা আগুনের রং। আগুন তখনই ভয়ঙ্কর। চেনা যায় না যাকে, লকলকে শিখা কোত্থেকে কখন বেরিয়ে এসে ছোবল মারবে কোথায়? রোদে রোদে জ্বলেপুড়ে শুকনো ডালপালায় উনুন সাজিয়ে গুড়ের কড়াই চাপিয়েছিল সুমতিবালা। কড়াইয়ের এতগুলো গুড় গলে গলে মাখো মাখো হয়ে ফুটে উঠতে সময় লাগে। উনুনের মুখে বসে থেকে, উনুনের গর্তে নিরন্তর গাছের শুকনো পাতা যোগান দিয়ে যেতে হয় আগুনকে। পাক দিয়ে দিয়ে বেহ্মদত্যির আদলে শুধু ধোঁয়া। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে, নাকমুখ পোড়ে, শরীর দগ্ধায়। ঢেকে রাখতে হয় গুড়ের কড়াইটা। ধুলোবালি পড়তে পারে, ধোঁয়ার গন্ধ লেগে যাবে গুড়ে। বাবুমানুষদের জিভের লালস বড় শৌখিন।

উনুনে আগুনের যোগান দিতে দিতে যেটুকু সময়, বেকার ফেলে রাখা যায় না দুটো হাত। নারকেল-কুরনির কাঠটা পায়ের পাতায় চেপে নিয়ে আধাআধি-ভাঙা নারকেল-মালা দু'হাতে খাবলে ধরে কুরিয়ে যেতে হয় পাছা থেকে মাথা অব্দি ঝুঁকে ঝুঁকে, এক ধরনের তালে-তালে ছন্দলয়ের সমতায়। বুঝি গোটা শরীরটাই লাগে নারকেল-কুরনিতে। ভালো মানুষদের মুখে শখের পবমান্ন কিছু তুলে দেবার যে-সুখ, দেহের রসে-রক্তে-ঘামে সে বড় কষ্টের পাঁচালি।

সুখের ঘরে রান্না শিখেছে রাধা। ঘুঁটে-কয়লার ঝঞ্ঝাট নেই, ধোঁয়া নেই, হাতের কাছে জল, আলোয়-আলোয় হরেক যন্তরপাতি আর বাসনপত্তরের ঝলমলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিটে শেষ হয়ে যায় স্বাদে-গন্ধে-রঙে নিত্যিনতুন সাতব্যঞ্জনের কত যে রান্না —সেই স্বপ্নের সত্যি বা এই মুহূর্তের চোখের বাস্তবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কাঠফাটা রোদ্দুরের হলকা আর কাঠের আগুনের বিভীষিকায় নিজেরই চোখ ঝলসে যেতে থাকে তার। মায়ের কাছাকাছিই থেকে যায় সে। শুধু যোগানদার হিসেবে নয়, বিশেষজ্ঞের ভূমিকায়। সাহেববাড়ি মূলত বাঙাল। বাঙালদের রান্নাবান্না পিঠে-পায়েস, নাড়ু-মোয়া সব কিছু তৈরির আলাদা নিয়ম। মা আর মেয়ের যৌথ উদ্যোগেই তৈরি হয়ে উঠতে থাকে উপঢৌকন উপচার। শ্রম আর ঘাম আর আবেগ সুমতিবালার, নজরদারি রাধার একার।

এদিকে-ওদিকে ঘরদোর থেকে উঁকিঝুঁকি জ্ঞাতিপড়শিদের। তারা মোচ্ছব দেখে ওদের মা আর মেয়ের। এত বড় কড়াইয়ে গুড়ের পাক? এত এত মুড়ি-নারকেল? নাড়ুমোয়া? পায়ে পায়ে এগিয়েও আসে কেউ কেউ। প্রশ্ন শুধোয়।

'সাহেববাড়ি গ। সব সাহেববাড়ির জন্যে। খাবেন বাবুরা...' রাধা হাঁকে—'চিনেমাটির বাটিতে দুধ নিয়ে যেমন করনফেলেক্স ভিজিয়ে খেতে হয়, মুড়ির মোয়া দুধে ফেলে চামচে চামচে খাবেন তেনারা। টফি-চকলেট-বাবলগামের মতন নারকেলের মোযা দাঁতে দাঁতে চিববেন দাদাবাবু-দিদিমণিরা...'

'শোনো কতা...' পাছায় ঠমক মেরে ঠারে ঠোরে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যায় স্বজাতিব লোকেরা অনেকেই—'হচ্ছে নাড়ুমোযার কতা, কত ইংজিরি বুকনি ছুটল গ মেয়ের মুখে? শুনলে গ? শিখলে কিছু? এ-সব পয়সার দেমাক। মেয়ে শ'রে থাকে বলে পয়সার জেল্লা।'

কোনো কথা বলে না সুমতিবালা। কারুর দিকে নজর নেই। হালদাবদের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা নারকেল-কুরনির বঁটিটাই বড্ড নড়বড়ে। গোলমতো কবাতের দাঁতে ধাবও নেই তেমন। কুরনিতে ধকল বড় বেশি। একটা নারকেলমালা ফুরতে-না-ফুরতেই টানটান শিবদাঁড়ার তলার দিকটায খিঁচুনি, গোটা শবীবটাই দোল খেতে খেতে হাঁটুতে মাজায ব্যথা, একটানা বসে থেকে থেকে বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলে ঝিঁঝি ধরে যায়। আঙুলটা বেঁকেই গেছে ফাঁক হয়ে। সেটাকে টেনেটুনে লম্বা করে পা ছড়িয়ে সামাল দিতে না পেরে, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কান মুলে, পায়ের ঝাড়াঝাড়ি সেবে আবাব বসে পড়তে হয়। দু'দণ্ড জিরনোর ফুরসত নেই। আজ বাদে কালই যদি চলে যায় মেয়ে, সব কাজ আজই তাকে তুলে নিতে হবে বেলায় বেলায়। সন্ধেবেলা মেয়ে আবার টিভি দেখতে যাবে বামুনবাড়ি। কী নাকি বাংলা 'বই' থাকে ববিবার দিন? ভালো 'বই'। ওদের সবই ভালো।

হাঁপায় সুমতিবালা। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘন নিঃশ্বাস টেনে বুকের ধড়ফড়ে আড়চোখে তাকায় মেয়েব দিকে। বোদ্দুর থেকে সরে গিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠে বসেছে রাধা।

উনুন আগুন গুড়ের-কড়াই ঘরের ছায়ায়-ছায়ায় ছিল যতক্ষণ, যা হোক একটা শান্তি ছিল। তেজী সূয্যি পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ছে যত, ঘরের ছায়াটা খাটো হতে হতে সিঁধিয়ে যাচ্ছে ঘরের গায়ে গায়ে। তিরিক্ষি রোদ্দুরে ভরে যাচ্ছে উঠোন, উঠোনেব উনুন, সুমতিবালার গা-গতর। বোদে আর ছায়ায়, মা আর মেয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানে উঠোনের মাটিতে ঘরের ছায়াটা যেভাবে ঘরেব শরীরেই মিশে যেতে থাকে, উনুনের আগুন আর রোদের পোড়ানিতে মাকে ফেলে বেখে ঘরের দাওয়ায বসে বসে রাধা যেন সবটুকু ঘরের ছায়া টেনে নিচ্ছে তার নিজের কোঁচড়ে, তার একার জন্যে। মাঝখানের শূন্যতায়, ভীষণভাবে জ্যান্ত দু'জনের চোখের পাতায়, সাহেববাড়ির দেবালয়—যাদের ভোগের নৈবেদ্য তৈরি হতে থাকে সুমতিবালার প্রাণান্ত শ্রমে-ঘর্মে-দহনে।

'ত্যাখন এমন কি খারাপ কতাটা বলেচেন লো বামুনবাড়ির বড়বউ?'

রাধা নাড়া খেল—'কোন্ কথা?'

'খাওয়াপরা দেবেন বলচেন। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবি র‍্যা তুই। দেশগাঁয়ে থাকবি দশজনের চোখে চোখে...' একটা নারকেল-মালাকে কুরে-কুরে সবটুকু আদায় করে নেবার পবও শাদা-শাদা যেটুকু গায়ে-গাযে লেপটে থাকে, সেগুলোও চেঁছেপুছে নেবাব ঝোঁকে মেহনত বাড়ে। গা-গতরের ঝাঁকুনি অনেক বেশি। কিংবা তার মগজের ঘিলুই এভাবে

কুরে-কুরে খাচ্ছে কেউ। কুরনিতে মনপ্রাণ ঢেলে, মাথা না তুলে, কথা বলতে বলতে সুমতিবালার গলার আওয়াজও কাটা-কাটা ভাঙা-ভাঙা মন্থর হয়ে আসে। গোঙানির মতো —'কোথায় কোন বিদেশবিভুঁয়ে পড়ে আছিস র‍্যা তুই? বিয়ের যুগ্যি বয়েস বাড়চে। দশজনে দশ কতা কয়...'

'হুঁ, ওই তোমার এক কথা। দশজন আর দশজন। দশজনে কথা কইবে ত খাওয়াপরা দেবে কেউ? শুধুমুধু কুচুটেপনার বুড়োবুড়ি কতগুলো...' ফোঁসফোঁসানিতে উঠে দাঁড়াল রাধা। দেশগাঁয়ে মায়ের কাছে যেন সে প্রাপ্তবয়সেরই কেউ। ঝামটা মারল—'না, আমি এখেনে থাকব নি...'

চমকে তাকাল সুমতিবালা। সেয়ানা মেয়ের মুখোমুখি চোখ রেখে কথা বলতেও অসহায়ত্বের যন্ত্রণাই অন্যভাবে হাড়মাস পুড়িয়ে কান্না হয়ে উঠতে চায়—'জেবনভর তুই ওখেনেই থাকবি র‍্যা মুখপুড়ি? ঘরসংসার করবি নি? গরিব বলে কি এট্টা সাধআহ্লাদও থাকবে নি র‍্যা মেয়েমানুষের?'

'সাধআহ্লাদ কি এখেনে এই ছুঁচোইঁদুরের গত্তে গ তোমার? যাও নি শ'রের সাহেববাড়িতে? দেখো নি কোথায় আছি? কেমনধারা সুখের বাহার...' ঘরের দিকেই যাচ্ছিল রাধা। দরজা ডিঙিয়ে আঁধার ঘরের খুপরিতে ঢোকার মুখে, কী মনে হলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার খিঁচুনি—'হুঁ, মেয়েছেলের হিম্মতেই ত মাসে মাসে তিনশো ট্যাকা নগদা আসচে গ তোমাব হাতে...'

হঠাৎই সচকিত দিশেহারা সুমতিবালা। ওদের মায়ের-ঝিয়ের কথা-চালাচালির চেঁচামেচিতে যেভাবে চারপাশের ঘরদোর থেকে বেরিয়ে আসছে পড়শিরা এবং শুনছে সবই, শুনে ফেলছে, চকিতে তেড়েফুঁড়ে দাওয়ায় উঠে এসে মুখ চেপে ধরল মেয়ের —'আ ল মুখপুড়ি চুপ কর চুপ কর...'

এবং ধাক্কায় ধাক্কায় মেয়েকে নিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। এমন একটা ধিঙি মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে মাথাফাতা আর ঠিক থাকে না এই পড়তি বয়সে। শস্তা আমকাঠের একটা ভাঙা দরজা এমনিতেই নড়বড়ে। দ্রুত গিয়ে ভেতর থেকে খিল তুলে নাকে মুখে বুকে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে—'আ ল লক্ষ্মীছাড়ি, কী করলি? কী করলি র‍্যা তুই?'

'কেনে? কী করেছি?'

'এমনধারা হাঁক পেড়ে দশজনকে জানিয়ে দিলি র‍্যা, মাসে মাসে তিনশো ট্যাকা মাইনে পাস তুই? সেই ট্যাকা এখেনে ঘরে আসে আমার কাছে?'

'সে-বলেছি ত কী হয়েছে? চুরি করি নিকি?'

'এখনে যে চোখ টাটাবে র‍্যা সব্বায়ের? তোদের জ্ঞাতিগুষ্টি ঘাটের-মড়া শুখাকি লোকগুলো যে নজর দেবে সারাক্ষণ, তার কী হবে?' ছেঁড়ানোংরা শাড়ির আঁচল টেনে গালগলা নাক মুখ ঘষে ঘষে চামড়া ছিঁড়ে নিতে চায় সুমতিবালা। ভেতর-বাইরে তাপে-উত্তাপে বেহুঁশ। খাটো হয়ে আসে গলার স্বর। ফ্যাসফেসে আতঙ্কের ধ্বনি—'সাতসকালে দুটো চাল ফুইট্যে দিই। তাই খেয়ে ইশকুলে চলে যায় ছেলেটা। আমিও পরের দোরে ঘুরে ঘুরে মরি দিনভর। পলকা কাঠের এট্টা দরজা। সে-ত থেকেও নেই। গরিব মানুষের

ঘরে এতগুলো ট্যাকা র‍্যা মা? সে-ও আরেক জ্বালা। কলজেটায় টিপটিপ নিয়ে থাকি। নীদ নেই, সোয়াস্তি নেই...'

'ট্যাকাগুলো কোথায় তোমার?'

'আছে র‍্যা মা, সব আছে। ওই, ওই ওখেনটায় এট্টা মেটেহাঁড়িতে...'

সংসারের হাজারগণ্ডা টুকিটাকি জিনিসপত্তরে ঠাসা বাঁশের মাচার তলায় যেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ, সেখানে ছুঁচো ইঁদুরের বাস। পলকে চোখ ফিরিয়ে আঁতকে উঠল রাধা-–'সে-কী গ? কাগজের নোট। উইয়ে কেটে ত শেষ করে দিয়েছে সব...'

'না র‍্যা, না। অতগুলান ট্যাকা উই আরশলায় কাটবে গরিবের ঘরে? ভগবান আছেন ত র‍্যা..' ঝপ করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে সুমতিবালা। হামা দেবার ভঙ্গিতেই চারপেয়ে হয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছে মাচার তলায়। ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি, টিনের-বাকশো, সাহেববাড়ি থেকে যা-কিছু সে এনেছে এতকাল—বাহারের শিশি বোতল, বাতিল খেলনাপাতি, স্টিলের বাটি গ্লাস, কাচের জিনিস টেনে টেনে বের করতে হয অনেক কিছুই। টানাটানির আওয়াজ হয।

'কালীজেঠু পিতিমাসে ট্যাকাগুলো এনে দিতেন তোমার হাতে। খরচাপাতি করেও এত এত বছরে সে-ত অনেক ট্যাকা গ...' আর বালিকা নেই রাধা। কিশোরী নয়। হঠাৎ সেয়ানা। নিজের রোজগারের টাকায় হিশেবের বুঝ চায় সে।

'অঁ...' অনেক বেশি কষ্ট মাচার তলায় পিঠ ঢুকিয়ে এভাবে চতুষ্পদ হযে থাকার। আঁধারের তলা থেকে কাতর স্বর সুমতিবালার। বেড়ালের খামচানি, ধাতব ধ্বনি— 'আমার পেটের জন্যি তোর এট্টা পয়সাও আমি নিই নি র‍্যা মা। পালানের ইশকুলের বই খাতা, ওর কোচিনের মাস্টরের বেতন ছাড়া বাদবাকি সব রেখে দিয়েছি। সব তোর...তোর জন্যি। বুক ভরে সাধ মিটায়ে বিয়ে দেব তোর...'

'আঃ, বলবে ত কত? কত ট্যাকা?'

'সে-আমি বলব কেমন করে? মুখ্যু মেয়েমানুষ। অত ট্যাকা আমি গুনতে জানি নাকি?'

'চার হাজার সাতশো ষাট...'

রাধা ফিরে তাকাল। রবিবার ইশকুলে ছুটির দিন বলেই দুপুরবেলা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল পালান। ঘুমোলে বেহুঁশ কাদা-কাদা হয়ে পড়ে ছেলেটা। কিন্তু দিবানিদ্রা বড়ই ভঙ্গুর। মাচার তলায় বাসনকোশনের টানাটানিতে বিবিধ ধ্বনি অথবা মা আর দিদির হুড়োহুড়ি কথায়বার্তায় ঘুম কেটে যাবার পরও ঘুমের আলসেমিতে মটকা মেরে পড়ে থেকে উৎকর্ণই ছিল চুপচাপ। চোখের পিটপিটে দেখছিল, শুনছিল সব। কিংবা সে এতই অবান্তর—নিতান্তই শিশু, ঘরের ভেতর তার জড় অস্তিত্বের দিকে নজরই ছিল না কারুর। এবং যখন গণিতশাস্ত্র এল, বড় ইশকুলের ছয় ক্লাশের ছাত্র, অবশ্যই কচিকাঁচা শাদামাটা অবোধ বালক, শাদা কাগজে একটা কলম সচল হয়ে ওঠার মতোই চকিতে মূল্যবান হয়ে উঠল ভাঙা ঘরের আলো-আঁধারিতে।

'তুই জানিস রে ভাই? গুনেছিস? একশো ট্যাকার নোট চিনিস র‍্যা তুই?' রাধা উদ্বেল।

'চিনব নি কেনে? লম্বা লম্বা হয়। বড় ট্যাকা.ত...' ডান হাতের তেলো উল্টো করে ঠোঁটের লালা মুছতে মুছতে কোমর ঘেঁষড়ে মাচা ছেড়ে নামতে থাকে পালান। পুরনো বাঁশের কঞ্চি মড়মড় শব্দ তুলে ককিয়ে ওঠে। ঠোঁটের লালা যদিও-বা মোছা হলো, গালে লেপটে থাকে। রাধা তাকাতে পারে না ভাইয়ের দিকে। বিচ্ছিরি।

নিচু চোখে তাকাল মাটির দিকে। সেখানে মাচার তলায় একজন চতুষ্পদ মানুষের পাছা উঁচিয়ে আছে বাইরের দিকে। অনেকটাই ডাবায় মুখ লুকনো শাদা গাভীর আদল। যখের ধন খুঁজে খুঁজে, খুঁজে পেয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে আসছে সুমতিবালা।

এবং তখনই বাইরে কাদের হাঁক—'অ রাধুর-মা, করছ কি গ ঘরের ভিতরে? তোমার উনুন ত নিভেই গেল গ। বলি, তোমার নারকোল পাখিতে ঠোকরাবে?'

হাড়পাঁজরায় কাঁপুনি তুলে ঝলকে উঠল মা-মেয়ে দুজনই এবং তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসার তাড়ায় বাঁশের মাচায় কঞ্চির খোঁচাও লাগল মাথায়। রক্ত ঝরল কিনা অথবা ব্যথাযন্ত্রণা যেটুকু লাগল তার ওজন কতটুকু—আমল দেবার সময় নেই সুমতিবালার। হুঁশ নেই। ঘরের ভেতর মেটেহাঁড়িতে ন্যাকড়ায়-বাঁধা পিপীলিকা-সঞ্চয়। ঘরের বাইরে সাহেববাড়ির ভোগ—অনেক টাকা দামের গুড় আর নারকেল উদোম ফেলে রেখে এসেছে খোলামেলা বারোভূতের উঠোনে। কী সব্বোনাশ। মনে হতেই ঝাঁ ঝাঁ ধরে যায় মগজটায় এবং দিশেহারা বিভ্রমে, আপাতত সন্তানদের জিম্মায় রেখে দেওয়া যেতে পারে পরম সম্পদ, চকিত সিদ্ধান্তের পর এক ঝটকায় দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এসেই, বাইরে কোনো ছবি।

উনুন নেভে নি। বড়মানুষের ঘরের কয়লার উনুন নয় যে, গনগনে আঁচ ফেলে রেখেই কোথাও উঠে যেতে পারে রাঁধুনি। গাছের-পাতা নিরন্তর গুঁজে যাওয়াই যেখানে নিয়ম, আগুনকে বহাল রাখতে উনুনের সামনে পিঁড়ি টেনে বসে গেছে কুঁজো বুড়ি- —অষ্টা কুঁতির মা। ঢাকনাটা খুলে ফেলা হয়েছে কড়াইয়ের। গুড় ফুটছে। গাঁজলা-ওঠা শাদা-শাদা ফেনা জমে উঠেছে চারপাশ ঘিরে। নারকেল-মালার লম্বা একটা হাতা পাশেই ছিল। উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে হাতা দিয়ে চারপাশ কেঁচে কেঁচে ফেনাগুলো তুলে তুলে ফেলে দিচ্ছে জয়রাম সাঁতরার বউ সুরবালা। কুরনি বঁটির তলায় থালায় ভরে ভাতের মতোই কুরনো নারকেল বা পাশেই না-কুরনো ভাঙা নারকেলমালাগুলো হাঁ হয়ে ছিল আকাশের দিকে। পাখিটাখি পড়ে নি কিছু। কার গুড়, কার নারকেল, কাদের মহোৎসব? কিছুই জানে না কেউ। এত সব দুর্লভ সামগ্রী খোলা পড়ে রয়েছে উঠোনে? নষ্ট হচ্ছে! অথচ বেওয়ারিশও নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে স্বজন-স্বজাতিরাই চারপাশ ঘিরে কৌতূহলে উনুনের পাহারাদার হয়ে যায়।

অভিভূত সুমতিবালা। ঘরের দাওয়া থেকে লাফিয়ে নামল উঠোনে—'এই বুড়ো হাড়েও আর বসে থাকতে পারলেন নি গ? বসে গেচেন?'

'তা তোরা কাজকাম ফেলে উঠে যাবি? এত্তা আক্কেল নেই গা তোদের...' উনুনে পাতা ঠেলতে ঠেলতে কালো-কালো ধোঁয়ার দাপটে মুখেচোখে খিঁচিয়ে ছিল কুঁজোবুড়ি। ঝাঁঝিয়ে উঠল—'অই...অই যো র‍্যা, কতায় বলে না—আধ গাগরি জল, করে ছলছল। তা তোদের হল গে সেই দশা। ঘবে দুটো পয়সা আসচে বলে কি ফ্যালা-ছড়ানোর

বাবুমানুষ হয়ে গেলি নিকি র‍্যা তোরা? মা-নক্ষ্মী দিলেন হাতে করে, আর তুই আবাগি হেলাফেলা করবি ব্যা এমনধারা?'

হাসে সুমতিবালা। বুড়ি শাশুড়িদের এমনতরো দাঁত-ঝাড়ানি সইতেই হয় ঘরের বউদের। তাছাড়া কথাটা তো মিথ্যেও নয়। অনেক মেহনতে যোগাড়যন্তর-করা মালমশলা সে বেহুঁশের মতো ফেলে রেখে গিয়েছিল উদোম উঠোনে। জ্ঞাতিঘরের বুড়ি শাশুড়ির দুটো কথা সে শুনতেই পারে। হাজার মরণে সোহাগের ভালোমন্দ কে আব কয় আজকাল?

বেতো মাজায় বাঁ-হাত চেপে, ডান হাতে গাছের-ডালের লাঠি তুলে নিয়ে হাড়গোড ভেঙে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল বুড়ি। লাট খেতে খেতে পড়েই যাচ্ছিল। সুমতিবালাই উঠে গিযে ধরল দু-হাতে। বুড়ির দাঁত নেই অনেকগুলো। মজে-যাওযা মাড়ি আব শুকনো জিভেব সঙ্গে খড়িপড়া গালের নরম চামড়া তুবড়ে গিযে হুঁকোমুখো মুখটা, পাকা আমকাঁঠাল পচেগলে হেজে গেলে যেমন হয়, এমন ল্যাতপেতে আর শুকনো জিভ টেনে টেনে বা চোয়াল চুষতে চুষতে কী যে বলে বুড়ি, শোনাব অভ্যাস আছে যাদের, পড়শিরাও বোঝে না ঠিকঠিক। সুমতিবালা শোনে—'পবেব দব্য হবণ করলে পাপ। তাই বলে, তুই বউ, পরের দব্য ঘরে এনে এমনধাবা লষ্ট কববি ব্যা?'

'পরের দব্য বলচ কেনে গ ঠাক্‌মা?' এদিক থেকে খামোকা হুল ফোটাতেই ফোড়ন কাটল প্রহ্লাদ সাঁতরা—'পবেব ঘবেব কাজ ত পবের ঘরে বসেই কবে দিযে আসতে হয গ। তাই ত দেখে আসচি চেবকাল। কোন্ গেবস্তবাড়ি তোমাদেরকে এত এত ট্যাকাব জিনিসপত্তর ঘবে বয়ে আনতে দেবে গ? শুনি...'

'অঁ, পরের চাল পরের কলা, বর্ত কবেন চন্দরকলা...' নাকের নথ-নাড়ার ভঙ্গিতেই ঘাড বাঁকিয়ে চোখেব ঠাবে পাছা দুলিযে ঘবের দিকে ফিবে যেতে থাকে মনুব-মা। জিভ ঝলসায়—'বযসকালে দেখলুম গ কত কী? আবো দেখব কত।'

উনুনেব খিদেয পাতা গুঁজতে গুঁজতে কটমটিয়ে তাকাল সুমতিবালা। কড়াইযে গুড ফুটছে। সেই পোড়ানিতে অঙ্গ জ্বলছে তার। কিংবা গুড়ের সঙ্গে মাখামাখিতে সে নিজেই হয়তো গুড়েব ঢিপি হয়ে গেছে। পিঁপড়েরা ছুটে ছুটে এসেছে পিলপিল পিলপিল। নিজেব কাজে দাঁত চেপে চুপচাপই থাকতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পিঁপড়েবা কুটুসকুটুস কামড়ায গা ভরে। গা ঝাড়া দিযে হাতে-পায়ে নড়ে উঠতেই হয। উঠোনে মানুষজনের ভিড়ে দুটো চোখ প্রহ্লাদ কুঁতিকেই খোঁজে—'কেনে গ, আমার ঘবে আমি কি করচি তাতে তোমাদেব কি চোখ টাটাচ্ছে নি কি গ ঠাকুপো?'

'চোখ আব টাটাবে কী গ? ট্যাবা বনে গেচে সব্বায।'

উঠোনের মানুষ ফিরে তাকিয়েছে সকলেই। প্রহ্লাদ কুঁতি নয়, দাঁত মুখের ভ্যাংচানি নিয়ে ঘর ছেড়ে তেড়েফুঁড়ে বেরিযে এসেছে অনন্ত কুঁতিব বউ বা সোনাব-মা—জ্ঞাতি সম্পর্কে সুমতিবালার বড ভাসুরের ঘরের জা—'আাই সিদিনও নাক দিয়ে দুধ গলত গ মেয়ের। এখনে সেই মেয়ে শ'রে যেয়েঁ বিবি হয়্যা এয়েচে গ। বলি, গামছারও ত সাধ যায় ধোপাবাড়ি যেতে। তা পাটে পাটে ইস্তিবি হয়্যা এয়েচে য্যাখন, তাই দিয়ে কে পাছা মুছবে গ আর? নিকি ফেট্টি বাঁধবে মাথায়? পাগড়ি গ, পাগড়ি...'

চারপাশে হাসির হুল্লোড়ে, উনুনের সামনে বসে বাঁ-পায়ের হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে, গালে হাত রেখে ঝিম মেরে গেছে সুমতিবালা। ডান হাতে গাছের শুকনো পাতা খাইয়ে যাচ্ছে উনুনের আগুনকে, গাই-বাছুরকে জাব দেবার মতোই। গাইবলদের সেবায় মানুষ তো পায়ও অনেক কিছু। আগুন কি দেয়? শেষ-পোড়ানির চিতা? সাহেববাড়ির নাড়ুমোয়া? সে-ও তো মরণ।

'এক বরষায় কটা নাঙলে এমনধারা মোচ্ছবের ট্যাকা কামাতি পারবে র‍্যা জোয়ানমরদ এট্টা কিষেন?'

মাথা তোলে না সুমতিবালা। চোখ মেলে দেখতে হয় না। গলার স্বরেই চিনতে পারে রাখোর-বাপ সুবল কুঁতিকে। কিংবা চিনে নিতে পারে বুড়ো সনাতন সাঁতরার তেতো বিষের জিভটাকে—'নাঙলের কতা বলচ গ? সে-ত আষাঢ়-শারবন-বছরে দুটো মাস মাত্তর। শ'রে যাও। সেখেনে পয়সা-কামানি বারোমাস। মেয়েছেলে বলে কতা...'

ওদের হাসির খিলখিল সুমতিবালার পাঁজরায় থরথর থরথর কাঁপে।

'অঁ, এ-শালা আমি শুনে আসছি ছোট্টবেলা থিক্যে...মাটি বেটি মিথ্যে কথা, এই তিন নিয়ে কলকাত্তা...' সনাতন সাঁতরা তার চড়া গলায়, বিজ্ঞ ভঙ্গিতে—'এমনধারা সোমত্ত বয়সের এট্টা মেয়ে কলকাতা শ'রে যেয়ে একা-একা পয়সা কামায়। পয়সা কী গ? হীরেমুক্তোর যা ভেলকি দেখলুম কাল? চাট্টেখানি কতা? তিন মরদের রোজগার একা এট্টা ডবকা ছুঁড়ির?'

'আরে ছ্যা ছ্যা, কী বলচ গ তোমরা সব্বায়? জিভের ট্যাশকো নেই বলে কি যা-নয়-তাই বলে যাবে গ ঘরের মেয়েছেলেদেরকে নিয়ে?'

চমকে তাকাল সুমতিবালা। বড্ড অভাবী মানুষ বিকাশ ঠাকুরপো—বিকাশ সাঁতরা। বয়স পড়ে যাবার পর রোগাপটকা লোকটা হেঁপো শরীরে আর খাটাখাটনিও করতে পারে না সে-রকম। ভিড়ের মধ্যে থেকে, কী খেয়াল হলো, শান্তভাবে ঘাড় উঁচলো মোড়লমাতব্বরদের দিকে—'এ-তোমাদের কেমনধারা ধম্মো গ সনাতনদা? অ্যাই, অ্যাই পেলহাদ, ওর মা-টা যে এখেনে বসে রয়েচে র‍্যা। আবাগি বেধবা বউটাকে হুল ফুইট্টে কী সব আকতাকুকতা বলে যাচ্চিস র‍্যা তোরা সব্বায়?'

তিরিক্ষি রোদ্দুরে জ্বলেপুড়ে সুমতিবালা এই প্রথম গাছতলার ছায়া পেয়ে কান্নায় ভিজল। কড়াইয়ের গুড় ফুটতে ফুটতে কতটা পাক হলো, ঢাকনা খুলে দেখার দায় নেই। উনুনের আগুনে পাতার যোগান বন্ধ। ঠায় বসে থেকে দুটো হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে ঝিম। এবং তখনও আকাশ ভেঙে মাথার ওপর শিলাবৃষ্টি তাব।

এসব ন্যাকামোফ্যাকামোতে খুব একটা মন ভেজে না প্রহ্লাদ কুঁতির। শাদাসিধে সহজ কথার মানুষ। উদোল বুকে ছেঁড়াফাটা গামছা ঘষে ঘষে ফুঁসছিল উঠোনের ভিড়ে তেড়ে উঠল— 'কার কতা বলচ গ বিকাশদা? ঠুলি এঁটে আছো নিকি গ চোখে? দেখচ নি? দু-রাত্তিবের জন্যি এয়েচে ঘরে, রকমসকম দেখেচ মেয়ের? সাজপোশাকের জেল্লায়, কতাবাত্রায় ডবকা ছুঁড়ি যে গতর নাচিয়ে পাগলা করে দিচ্চে গ গাঁয়ের মানুষদেরকে। কে বলবে কুঁতিপাড়ার মেয়ে? যাত্রাপালার পারুলবালা গ। ছিনেমার হিরুইন...'

'অ্যাই... সেইটে হল গে কতা...' এবার অনন্ত কুঁড়ি। চাষাডে চেহারায় ভারভারিক্কি একটা লোক—'তুই ফের কী দয়াধম্মো দেখাতে এলি র‍্যা বিকু? ঘরের-মেয়ে ঘরের-মেয়ে করচিস? ঘরেব-মেযে বলেই ত দেখতে হবে র‍্যা, শ'রে গিয়ে কাঁড়িকাঁড়ি পয়সা কামাচ্চে মেয়েছেলে। কী এমন কাজকম্মো? লাজ নেই সরম নেই, বেলাল্লাপনা শিখচে কত্ত...'

'সে-তোমাদের কিছু জানতে হয় ত যাও না কেনে গ। কালীদাকে গিয়ে শুধোও না কেনে সব্বায়...' আরো বেশি নরম হয়ে এল বিকাশ সাঁতরা। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে, শুনছে কি শুনছে না কেউ, অনেকটাই আপন মনে—'বড় ভালো মানুষ ছিল গ ওদের বাপ। অনাদি মরে গেল। বাপমরা মেয়েটাকে কালীদাই ত নিয়ে গেলেন শ'বে। এত বড় যে কলকাতা শ'র, সেখানে খোদ সাহেববাবুদের গাড়ি চালাতেন কালীদা। এ-তোমাদের বাসের কি লরির ষণ্ডাগুণ্ডা মদোমাতাল ড্যাবাইভার নয় গ। লাখো লাখো ট্যাকা দামের চকচকে ঝকঝকে সব গাডি। গদির আসনে বসে হাজার হাজার মাইল লম্বা ছুট। এত বড় এট্টা চাকরি। গাঁয়েব এমনধারা একজন মান্যিজন কি কিছুই না বুঝেশুনে এট্টা খারাপ জায়গায় নিয়ে যাবেন গ ঘরের মেয়েকে?'

প্রসঙ্গ কালীধন বেরা। মানুষটা জ্যান্ত এবং মানুষটা স্বজাতি। শহর ছেড়ে এসে দেশগাঁযে পাকাপাকি ফিরেছেন এতকাল বাদে। বুড়োর কাছে সাহেববাবুদের গপপোগাছা শোনে গাঁয়ের দশজনে। এখন সেই সাহেব-পাঁচালি অনাদিকুঁতির বেটি রাধু গাইবে? ওটুকুন পুঁচকে একটা মেয়ে?

'তুই কি বলতে চাস বল দিনি?' সরাসরি তাস ফেলল সনাতন সাঁতরা। সাফসুফ জানতে চায়—'কী বলচিস?'

বেমক্কা প্রশ্নেব ধাক্কায় বিকাশ সাঁতরা আচমকা দিশেহারা। সত্যি-সত্যি কী বলতে চায় সে? যুদ্ধ করতে চায় নি। পালিয়ে বাঁচতেই অভ্যস্ত যেহেতু, নিজেব কাছেই গোছগাছে কথাগুলোর কোনো আদল ছিল না। সামলায় নিজেকে—'ওদেব বাপ অনাদি আমার ন্যাংটো পোঁদের বন্ধু ছিল গ...'

'সে আমার ভাই ছিল। এক মায়ের পেটের সোদর ভাই...' দাবড়ায় অনন্ত কুঁতি।

'সে-ত জানি। সব্বায় জানে।' বিকাশ সাঁতরা আরো খাটো গলায়, আরো সমঝোতায় —'তাই ত বলচি গ। অনাদির বেধবা বউটা শাকচচ্চড়িতে শুঁটকি পেটে যা হোক চালিযে যাচ্চে। ইশকুলেও পাঠাচ্চে ছেলেটাকে। মেয়েটা যদি শ'রে যেয়ে দাসীবিত্তি করেও দুটো পয়সা কামায়, তা ওতেও দোষ ধববে গ এমনধারা?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অনন্ত কুঁতি। কিংবা জ্বলে উঠতে পারত উঠোনের তাবৎ নারীপুরুষ। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কথা, এমন হট্টগোল, উঠোন-ভরা এক পাল মানুষের সামনে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

এদিকে শাপশাপান্তির হাট বসিয়ে হাড়েমাসে জ্বলছিল যাবা, কেউই বুঝতে পারে নি, কাজ ফেলে উঠে যাচ্ছে গিদদের মেয়েছেলেটা। পা দিয়ে মাডালে, কামড়ায় না, এমন সাপ নেই। বিষের তেজ থাক বা না-ই থাক, ঢোঁড়া-মিটুলিও দাঁত ঝাড়তে চায়।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, কানের গোড়ায় এত যে কেচ্ছা, এত গঞ্জনা দশজনের, কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই মেয়েমানুষটার?

খুবই স্বাভাবিক, এতটা স্পর্ধা বা এমন বেয়াদপি সইতে পারল না গুরুজন মান্যিজন মোড়লমাতব্বররা। সালিসির দায়ে বিকাশ সাঁতরাই ক্রোধের লক্ষ্য হয়ে ওঠে— 'দেশে এখনও ধম্মো আছে র‍্যা বিকু। সমাজ আছে। এত বাড় ভালো নয় মেয়েমানুষের। এমনধারা ব্যাভার...'

তেরচা ভ্রূকুটিগুলো নানাভাবেই খেলছিল উঠোন ভরে। বিবিধ শোরগোলে বিকাশ সাঁতরাও ফতুর এবার। পিছোতে হয়ই তাকে। পিছোতে বাধ্য যখন।

এমন ধম্মো-সমাজের মাথায় ঝাঁটা। গাড়ির জোয়াল কাঁধে বয়ে মোষবলদ খানা খন্দে গর্তে হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়লে যেমন হয়, ওদের চার পায়ে চাগা করে তুলতে চারদিক থেকে শুধু খোঁচায়ই সবাই, অমন গাজ্জিয়ানগিরির মুখে নুড়ো জ্বেলে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুমতিবালা। কোনো রা ছিল না মুখে। গা-গতর ভরে রাগ ছিল, দুঃখু ছিল। দুঃখুফুখ্যু নিয়ে হাহুতাশের ফোঁপানি ছিল না। ছলছল চোখের জল দাঁতকপাটিতে আটকে রেখে, নিঃশব্দে, নারকেল-কুরানি বা কুরনো-নারকেলের থালা, আরো সব সাজসরঞ্জাম বাসনকোশন একে একে তুলে নিয়ে যেতে থাকে ঘরের দাওয়ায়। যেন এজমালি উঠোনের যে-দিকটায় তার নিজের হাতে গড়া উনুন, সেটুকুও তার ভাগের মাটি নয়। ঘাটের-মড়া বুড়ো মিনসেগুলোকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে শ্বশুরভাতারের জমি। পালিয়ে যাচ্ছে সে।

'জ্ঞাতিকুটুমপড়শি ছেড়ে মাগী শহর চিনেছে বড়। সে-ও ত ছেলের রোজগার নয় র‍্যা, গতরখাকি মেয়ের রোজগার।'

'আরে ট্যাকার রস কদিনের র‍্যা তোর? কথায় বলে—'থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়। ভাগাড়ের শ্যালশকুনিতে খাবে র‍্যা তোকে সব্বোনেশী। কেউ ছোঁবে নি, কেউ ছোঁবে নি তুই মরলে...'

কাছাকাছি গিয়ে কোনোদিন ভাগাড় দেখে নি সুমতিবালা। বিধবা হয়ে নরক দেখছে অনেক। এসব শ্যালশকুনির চিল্লানিতে নতুন করে তার কী-ই বা এসে-যায়? একটি একটি করে নাড়ুমোয়া পাকানোর সব সরঞ্জাম দাওয়ায় তুলে নিয়ে সে পালিয়ে যায় না। দখল রেখে দেয় শ্বশুরভাতারের ভিটের উঠোনে। কড়াইটা উনুনে চাপানোই থাকে যথারীতি। গুড়টা আঠা-আঠা হয়ে পাকটা পুরো জমে গিয়েছিল বলেই হয়তো উনুনের আগুনে পাতা যোগানোর জন্যেই আর বসে থাকতে হয় না। কিন্তু কড়াইটা থেকে যায়। এত বড় গরম লোহার কড়াই? প্রায় আধাআধির বেশি জ্বাল-দেওয়া গুড়ের লেই। মিত্তিরদের বাড়ি থেকে চেয়ে-আনা কাঁসার থালার ঢাকনাটাও খুব একটা কম ভারি নয়। তবু একা হাতেই নামাতে পারত সে। কিংবা ডেকে নেওয়া যেত কাউকে। কাছাকাছিই ছিল সুরবালা পার্বতী। ময়না অঞ্জলি খুকু টেপি ওরাও ছিল। ওরা কাউকে একঘরে করতে শেখে নি এখনও। নয়তো রাধুকেই ডাকা যেত। ঘরের ভেতর কী করছে ভাইবোনে? মায়ের দুঃখু যন্তনা যদি ওরাও বুঝত একটু? কাউকেই ডাকে নি সুমতিবালা। কড়াইটা যেভাবে ছিল, রইল সেভাবেই। গুড়টা জুড়োতে দেওয়া অবিশ্যি

তার নিজেরই তাগিদ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা তেজালো জেদ হাড়মাস দগ্ধে মারছে যখন, বিষের জ্বলুনিতে উঠোনের ধারে কড়াইয়েব অবস্থানটা আলাদা একটা মূল্য পেয়ে যায়। নিজের জমিতে খুঁটি পুঁতে রাখার মতোই একটা কিছু। কড়াইটা ঢাকাচাপা হয়েই থাকবে উনুনে। মুরদ থাকে, বলুক কেউ কিছু। না-বলে ছুঁয়ে দেখুক একবারটি ! এখন সে নিজের ঘরের দাওয়ায় ময়রার দোকান সাজাবে। দশজনেব নাকের ডগায় সবাইকে দেখিয়ে, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে যতটুকু আয়োজন,তার চেয়ে কাজের বহব ছড়াবে বেশি। পেট ফাটিয়ে হিংসেয় জ্বলুক মরুক গুখাকি মড়াখাকি আঁটকুড়ের শয়তানরা। দেখুক সবাই— ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। ঘুঁটেগোবরের গাদায় নিত্যিবাস নিয়ে এমন পুণ্যি ক-জনের হয় গো দেশগাঁযে? শহরেব সাহেববাড়ি ভগবানেব ঘর।

ঘরের দবজা বন্ধ ছিল ভেতব থেকে। ভাঙা পাল্লা ঠেলতেও ভয়। পালান এসে দবজা খুলে দেবার পব ঘবে ঢুকেই কটকটে রাগে ছেলেমেয়ের ওপব ঝাঁপিযে পড়াই যখন স্বাভাবিক ছিল, সুমতিবালা থমকে গেল। আরো এক দমকা ভয়ে বুকটা ছলকে উঠতেই, পেছনেব দিকে পাল্লা বন্ধ কবে দরজায় পিঠ ঠেসে দাঁড়িয়ে পড়ল কাঠ-কাঠ ঝিম। কী সব্বোনাশ। কেউ যেন টেব না পায। টুঁ শব্দটি না হয।

পুব আব দক্ষিণমুখো দেযালে জানালাগোছের ফোকর দুটোই যা-হোক দুটো নাকেব-ফুটো ঘরটুকুব। একটু নিঃশ্বাস। সেখানে বাতাস নেই রোদ নেই আলো নেই। সাঁঝের পিদিম জ্বালানোব মতো আঁধাবও নয় পুবোপুরি। মাচার তলায যেখানে আবো বেশি অন্ধকাব, সেখানেই মেঝেতে পা ছড়িযে বসে সাবধানে টাকা গুনে যাচ্ছে ওরা ভাই আব দিদি। মেটেহাঁড়ির ভেতর ন্যাকড়ায় ভাঁজের পর ভাঁজ দিযে লুকিয়ে রাখা কাগজেব নোট, নোটের বান্ডিল। সবই প্রায় একশো টাকার।

মুখ ফুটে দুটো বাক্যি বলাবও সাহস পায় না সুমতিবালা। টানটান সোজা হযে দাঁড়িয়ে আঁচল টেনে ঘাম মুছতে থাকে গালেব মুখেব গলাব কপালেব। হাঁপায়। হাঁপাতে থাকে বুক টেনে উথালপাথাল নিঃশ্বাসে। গোল-গোল ভয়ার্ত চোখজোড়া অপলক সন্তানদের দিকে। দিনদুপুবে গেরস্তের ঘরে ভয়। ডাকাতের ভয নয়, স্বজাতির তরাস। উঠোনভর্তি এতগুলো লোকেব সামনে যা-নয-তাই হেনস্তা হবাব পর এখন যদি বিকাশ ঠাকুরপোই উঠে আসেন ঘবে? জ্ঞাতিঘরের বুড়ি শাশুড়ি অষ্টা কুঁতির মা নয়তো সুববালা পার্বতী যে-কেউ চলে আসতে পাবে। কেউ বা জানবে কেন? ভালোমানুষ তো কী হলো? সিঁদেল চোব ঠেকাবে কেউ? মেটেঘরেই সিঁদেলের ভয়।

'কি ব্যা, হল? হল তোদেব?' শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে অনেকটাই নিচু হযে, ফ্যাসফেসে গলার স্বরকে কণ্ঠাব নলিতেই আটকে বেখে মুখ বাড়াল সুমতিবালা—'শিগগিব, শিগগিবি কব। দেখচিস ত বাইবে কি হুজ্জতি চলচে শুকনি বুড়োগুলোব?

'হয়ে গেছে গ মা। আর এট্টু...' পালান, বাচ্চা ছেলে, টাকা গোনায় বড শখ। গুনতেও শিখেছে ঠিকঠিক। দোকানপাটের কারবারী নয। ঘরে বসে এক সঙ্গে এত টাকা হাতড়ে দেখার বরাতজোর গাঁয়ের ছেলে ক-জনেরই বা আছে? অথবা যে-হাভাতে বংশে ওব জন্ম, সেখানে কে কবে দেখেছে এত টাকা? সেও জানে, কুড়ানি মায়েব ঘরে হাজার হাজার টাকার দীর্ঘ গণিত এক মস্ত পরাক্রম। গোনাগুনতিতে সে খুবই

হুঁশিয়ার। জিভের থুতুতে ডান হাতের আঙুল ভিজিয়ে, বাঁ-হাতে টাকার বান্ডিল গড়ে গড়ে সে তুলে দিচ্ছে দিদির হাতে। দিদি গুছিয়ে রাখছে মেঝেতে ছড়ানো ন্যাকড়ায়। আঁধার ঘরের মেঝেয় হাজার টাকা ওদের পুতুলখেলা হয়ে যায়। কিন্তু পুতুল তো নয়। টাকাগুলো বাস্তব। টাকাগুলো সত্যি। টাকাগুলো হকের রোজগার।

খুশিতে খুশিতে ভরপুর রাধা এই মুহূর্তে ঘামছে না, হাঁপাচ্ছে না। তার তাজা শরীরে এখন কোনো ক্লান্তি নেই। এত এত টাকার ঘাঁটাঘাঁটিতে বরং তার এত এত বছরের প্রতিমুহূর্তের শ্রমকেই অলীক বলে মনে হচ্ছে কিছু। এটুকুন বয়সেই যদি এমন কাঁড়িকাঁড়ি টাকা তার নিজের টাকা হয়ে উঠতে পারে, তবে সাহেববাড়ির স্বপ্নে সাহেববাড়ির সেবায়েত কিশোরী তরুণী ভাবতেই পারে, শহরের রোশনাই গায়ে মেখে নিত্যিকার বেঁচে থাকার সুখে এ-টাকা বুঝি সবটাই ফাও। কিন্তু টাকা তো! অনেক টাকা। কাগজের নোট। টাকার ঘবে টাকা বাঁচে। গরিবের ঘরে টাকাবও মরণ।

দুটো-তিনটে নেংটি ইঁদুর ছুটোছুটি করছিল এপাশ ওপাশ। বড্ড জ্বালাচ্ছে তখন থেকে। খুদে খুদে আরশোলার বাচ্চা আর আরশোলার লাদিতে ভরে ছিল হাঁড়িটা। বাইরের উঠোনে তুলকালাম হল্লা চলছিল যখন, চুপি-চুপি একবার বেরিয়ে গিয়ে সাফসুতবো করে এনেছিল পালান। বিটকেল গন্ধটা এখনও আছে। হাঁড়িটা উল্টো করে আরো একবার ঝাঁকালো রাধা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চারটে আঙুল পেতে বুলিয়ে বুলিয়ে পরখ কবল। অসম্ভব বিরক্তির ঝাঁঝে—'কী অদ্ভুত সব কাণ্ড বল দিকিন তোমাদের? এর ভিত্রে ট্যাকাকড়ি রাখে কেউ? কাগজেব নোট?'

'কী করব র‍্যা মা?'

'দুটো-চারটে নেপথলিন দিয়ে রাখতে পাবো নি?'

'কী সেটা?'

'শাদামতো বড়ি। সে-থাকলে উই আরশলা কাছে ঘেঁষবে নি। এমনধারা বাস...' রাধু তাকাল পালানের দিকে—'আজ একটা প্যাকেট নিয়ে আসবি ত ভাই। আমি পয়সা দেব খন। পাওয়া যাবে ত এখানে? তোদের গাঁয়ে?

'গাঁয়ের বাজারে সব পাওয়া যায় র‍্যা। সব পাবি। নলিন দালালের দোকানে...' এক হাজার করে গুনে গুনে চারটে গোছ দিদির হাতে তুলে দেবার পর বাদবাকি আর যে-কটা একশো-টাকার নোট হাতে থাকে, জিভের ডগায় আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাঁ-হাত ডান হাতের আঙুলে আঙুলে চালাচালিতে পলকেই গুনে ফেলল পালান— সাতশো। হাতের পাতায় একটা পঞ্চাশ-টাকা আর একটা দশ-টাকার নোট আলগা হয়ে ঝুলতে থাকে। দিদির হাতে তুলে দিয়ে বুঝি এবার সে খালাস— 'কি র‍্যা, বলেছিলুম নি ত্যাখন তোকে, চাব হাজার সাতশো ষাট...'

'সে-ত হল...' ভাঙা দরজায় খিল তুলে সুমতিবালা হামলে এসে পড়লে ওদের মধ্যে। মেয়েকে সরিয়ে নোটেব বান্ডিলশুদ্ধ মেঝেতে পেতে-বাখা ছেঁড়া শাড়ির ফালিটুকু তড়িঘড়ি টেনে নিয়েছে নিজের হাতে। আঁটোআঁটো করে বাঁধতে হবে, যেমনটি ছিল আগে এবং সব বাঁধনেও রেহাই নেই যার, গোটা শরীরে ঝড় বইতে থাকে উথালপাথাল। বুঝি চোর ঢুকে যেতে পারে এক্ষুনি। ডাকাত পডতে পারে।

মাচার ধারে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে ভ্রূ বাঁকিয়ে ঘরের ফুটো ছাদের দিকে উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে থেকে কী ভাবছিল পালান। চার অঙ্কের এত বড় একটা হিসেবে, মনে মনে যোগ বিয়োগের কাটাকুটিতে, মাত্র ক্লাশ সিক্সের বাচ্চা শিশু, বারবার খেই হারিয়ে ফেলে। দশাসই পাকা পোনা ঘাই মারছে যদি, ধরে থাকতেই হয় নড়বড়ে ছিপের সুতো। ষাটের সঙ্গে চল্লিশ যোগ হলে একশো? সাতশো আটশো হয়ে গেল। আরো দুশো চাই—হাজার। মনে মনে হিসেবটা আউড়ে নিতে হয় আরো একবার। পরখ করে নিতে হয়। কি মনে হলো, বলেই ফেলল হুট করে—'আর মাত্তর দুশো চল্লিশ ট্যাকা র‍্যা দিদি। পুরো পাঁচ হাজার হয়ে যাবে।'

'পাঁচ হাজার?' বেমক্কা দুটো শব্দ, শব্দের ঝঙ্কার আঁধার ঘবেব গুমোটে ঝলসে উঠতেই ওরা মা আর মেয়ে ফ্যালফ্যাল চোখ মেলে তাকাল দুজন—'কী বলচিস র‍্যা তুই? পাঁচ হাজার? অ্যাঁ, সত্যি বলচিস?'

'সেই ত হবে গ...' মাচার ধারে বইখাতার ডাঁই। একলাফে বিছানায উঠে গিযে খাতা পেনসিলেব জন্য উদ্যোগী হলো পালান। কাগজে লিখে ভালো করে পবখ কববে বিয়োগের অঙ্কটা। চার-সংখ্যার এত বড একটা গণিত মুখে মুখে মনে মনে কষতে গেলে ভুল তো হয়ে যেতেই পারে। শিশুও জানে, টাকার হিসেবে পাঁচ-হাজার অতি বিশাল এক পাহাড়চূড়া।

বুনো জঙ্গলে ধুতবো ফুল গোছের আবো দু-জোড়া চোখ ঘরের আঁধারে উদ্‌গ্রীব ছিল স্তম্ভিত নির্বাক। ঘরটা এত ছোট, দৈন্যদশায় এত বেশি তুচ্ছ আর ফালতু আর ধ্যাবড়ানো— রোগশয্যায় শুয়ে এক চিলতে জানালায় মস্ত আকাশ দেখলে যেমন হয়, হাঁসমুর্গির খাঁচার আদলে কুঁড়েঘরের ধ্বনিতরঙ্গে 'পাঁচ হাজার' শব্দের দীর্ঘ এবং লম্বিত উচ্চারণ নিরক্ষব চোখের পাতায স্পষ্ট করে কোনো অবয়ব পায় না। অথবা কোনো গোলাপ-কাঁটার খোঁচাই আচমকা, বিদ্ধ হয়ে রক্তপাতে গাঢ়তব কোনো স্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে যেতেই পাবে সুমতিবালা। শ্বশুরভাতারের ভিটেয় হুডমুড়িয়ে ভেঙে পডছে আদ্দিকালের ঘরটা। মাথার ওপর চালের খড পাল্টানো হয়নি আজ কত কত বছর? ইঁদুরে-ইঁদুবে গর্ত খুঁড়ে খাক করে দিলো তলাকার মাটি। ঘূণ ধরে কমজোরি হয়ে পড়েছে কাঠের খুঁটি, বাঁশের ঠেকনা। দরজার মাথায় মাটি খসে-খসে পড়ে ভেঙে পড়ছে তালগুঁড়িব ভারটুকু। ঘরটা সে নতুন করে ছাইতে পারে এবাব। কিংবা জুলজুল চোখে তাকায় ছেলের দিকে। ইশকুলে পডালেখা করছে পালান। ফি-বছর ভালোভাবে পাশ দিয়ে দিয়ে বড় হয়ে উঠছে। আরো বড় হয়ে উঠতে পারে দিদির রোজগারে। অথবা যার রোজগার বা যার গতব-পোড়ানির টাকা... তাকাল কন্যার দিকে— যদি আরো কটা বছর শহরেব বাবুদেব বাড়ি থেকে যায রাধু, তিল তিল সঞ্চযে গড়ে-ওঠা এ-টাকা আরো বাড়বে। অনেক...অনেক টাকা হয়ে উঠবে। সেদিন সাধ মিটিয়ে মেয়েকে সত্যি-সত্যি রাধারাণী সাজিয়ে তুলে দেবে পরের ঘরে। জীবনভব অনেক দুঃখু সয়েছে আবাগি। গাঁয়ের মানুষ দেখবে দশজনে— দাসীবাঁদি নয়, শাঁখা-সিঁদুরে রাজরাণী সেজে মেয়ে তার শ্বশুববাড়ি যায়...

কিংবা চার হাজার সাতশো ষাট...সংখ্যামালায় যে-মাদকতা ঢাকাচাপা ছিল এতক্ষণ,

মাত্র দুশো চল্লিশ টাকা... আর মাত্র একটা মাসের মাইনের চেয়েও কম টাকা যোগ হলে যে-হিসেবটা আকাশ ছুঁয়ে যায়, তার রোমাঞ্চে রাধা ওর হাতেপায়ে হাড়ে পাঁজরায় রক্তশিরায় ঢেউ কাঁপিয়ে, এই প্রথম, কোন্ এক অমোঘ উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে চাঙা হয়ে উঠল—সেও পারে। পড়ালেখা জানে না সে, সইসাবুদ শেখে নি। কোনো ধাপ্পাবাজি ফেরেববাজিও নয়। কাউকে কোনো ঢপ না দিয়েই সাতজম্মের মুখ্যু মেয়ে এমন কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা তুলে ফেলেছে ঘরে? দু-হাতে দুটো বালা নয়তো বাউটির বড় শখ তার। দু-কানে দুটো দুল। সরু চেনে বাহারের একটা হার। সোনায়-সোনায় সবটা না হোক, রুপোয় গড়ে সোনার জলে রং করে নিলেও তো অনেক। ভাবাই যায না, সে আজ ভাবতে পারছে এমন সুখের কথা এবং ভাবনার মধ্যেই শরীর ভরে তিরতিরিয়ে শিরশিরিয়ে উঠছে একটা অনাস্বাদনেব থর্থর্ কাঁপুনি। টাকাগুলো নিয়ে যখন ন্যাকড়ায় পুঁটলি বাঁধছে মা, ডগমগ চোখের হাসিতে সে তাকিয়ে থাকে। নিদেন একটা ক্যাসেট-টেপরেকর্ডার তার নিজের জন্যে। তাব একার। যেন স্বপ্ন ভেঙে ঘুম থেকে জেগে ওঠা, মা-র দিকে তাকাল বাধা। আলতো স্বরে—'টাকা ত আরো বাড়বে গ মা। এখোনে এই মেটেহাঁড়িতেই বাখবে গ তুমি?'

'করবটা কী? বল্ না কেনে? ছিল নি ত ছিল নি। শাকচচ্চড়িতে চলছে যেমনধারা, চলত এক রকম। এখনে অ্যাই...অ্যাই এ-ত বড মবণ হল র‍্যা আমার...' নোটের বান্ডিল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল সুমতিবালা— 'বাপের জম্মে কোনো কালে ত ভাবি নি র‍্যা বাপু, ঘরে বসে বসে এমনধারা মরণ আগলে থাকতে হবে সারাক্ষণ...'

ভ্রূকুঞ্চনে হদিশ পায় না রাধা, পরিত্রাণ?

'সুমথ ঠাকুরপোকে চুপি-চুপি বললুম সিদিন। না না, ঘবের ট্যাকার কতা বলি নি কারুক্কে। শুধলুম, রাধু ত ট্যাকা পাঠায গ ফি-মাসে। এতগুলান ট্যাকা ঘরে আলগা থাকে। বড্ড ভয় লাগে...'

'বামুনবাড়ির মেজজেঠু গ মা? কী বললেন?

'সে-ওবা কী বলে, গুষ্টির পিণ্ডি, বুঝি নিকি ছাই। কী বলে, নতুন বেঙ্ক হয়েচে আমাদের গাঁয়ে। সব ট্যাকা বেঙ্কে রেখে দাও...'

'বেঙ্ক?' চমকে তাকাল বাধু—'গরিব মানুষ বেঙ্কে ট্যাকা বাখতে পারে গ? পডালেখা জানি নে...'

'সে-ও তোব মেজজেঠুই বেবস্থা করে দেবেন বলেচেন। সে-ওরা পাববে নি কেনে? পাট্টির লিডর না কী বলে যেন? তাই। পঞ্চাইতেব মাতব্বর। আব-দশটা গাঁয়ে কত সুখ্যাত র‍্যা ওনার। লোকে মান্যি করে কত।'

বাঁশের মাচায় খাতা ফেলে মেঝেতে দাঁড়িয়ে আঁক কষছিল পালান। মুখে-মুখে তাব যে-হিশেব ছিল, কাগজে কলমেও তার ভুল নেই কোনো। ডগমগিয়ে উঠল সে —'ইস্টিশনেব ধারে ব্যাঙ্কের কত বড আপিশ হয়েছে র‍্যা দিদি। বাইরে বন্দুক নিয়ে পুলিশের মতন এট্টা লোক বসে থাকে। আমি দেখেচি...'

শিশুর প্রলাপ আমল পায না কোথাও। বরং রাধা অনেক সাবালিকা—'সেই ত

ভালো গ মা। সাহেববাড়ির এমনধারা কত লাখ লাখ ট্যাকা বেঙ্কে থাকে। জেঠুকে বল না কেনে গ আরেকবারটি! আজই চল...'

'কি জানি বাপু...' সুমতিবালা টাকার পুঁটলি বেঁধে, বুকের কাছে তুলে এনে, শক্ত গেরো বাঁধতে গিয়ে দাঁতমুখের খিঁচুনিতে কেমন অবশ হয়ে আসে—'পেস্তাবটা আমার ভালো লাগচে নি র‍্যা বাপু!'

'কেনে?'

'বেঙ্কের থানে কোথায় থাকবে এতগুলান ট্যাকা? টেপসই মানবে কি মানবে নি শেষকালে...'

'হুঁ, তোমাব যেমন কথা...' বাধা ঝাঁকিযে উঠল—'তাই বলে তুমি এগুলো এখানে মেটেহাঁড়িতে বেখে দেবে গ? কাগজেব নোট?'

টাকার বান্ডিল বুকে চেপে সুমতিবালা আঁধার ঘরেব শূন্যতায় পাথর হয়ে যায়। টাকার নোট, হাজাব টাকার পরম সম্পদ বুকে নিয়ে, বুকে গেঁথে রেখে হাঁ হযে তাকিয়ে থাকে জানালা নামের খোঁদলটাব দিকে। বিকেলের পড়ন্ত বোদের যেটুকু তেবচা আভাস, তারই ছায়ায়-ছায়ায় সে কালো-কালো দেখে সন্তানদের মুখ। বুকের তলানি থেকে, বুঝি ভয়েরই টান, ফ্যাঁসফেসিযে ওঠে গলাব স্বব— 'ভয় করে ব্যা আমাব...'

'ধ্যাৎ, সবটাতেই ত খালি-খালি ভয তোমার। কিসেব ভয?'

'গাঁয়ের সব মানুষেব কাছে জানাজানি হয়ে গেলে...'

'সে-হয় ত হবে। তাতে কি হলো? চুরি করেছি নিকি কারুব ঘরে?' রাধা খিঁচিয়ে উঠল—'শ'রের সাহেববাডিতে থাকি আমি। আমাব মাসমাইনের বেতন। সে-সবাই জানে।'

তবু ভয়। ঠিকমত বোঝাতেও পাবে না সুমতিবালা, কেন তাব বুকের টিপটিপ। শেষ বিকেলের আলোয় মস্ত আকাশ জুড়ে পাটে বসেছেন সুয্যিঠাকুব। তাঁর কুণ্ঠিত আলোর রেশ ভিক্ষান্নের মতোই যেটুকু এসে ঢুকতে পারে অভাগীর জীর্ণ কুটিবে, সেখানে আঁধাব ঘোচে না। আঁধারের ভয। জানাজানি হযে যাওয়াব বিপদ—হাজার হাজাব টাকাই যদি থাকবে হতভাগীব ঘবে, তবে সে-আব গরিব কেন? গবিবই যদি না রইল, কুঁতিপাড়া সামন্তিপাড়া চাষিপাডা ভাগাড হযে যায়।

বিকেলের রং বদলে গিয়ে সাঁঝের আঁধার গড়িয়ে নামছে সবে। দুপুবের বোদ-ঝলসানো ঘববাড়ি ডোবাপুকুব গাছপালা মাঠঘাট আঁধাব-গড়ানো সাঁঝে কখন যে ফিকে হতে হতে আঁধার রাতের কালোয় চাদরমুড়ি দিয়ে চোখের পাতায় লোপাট হয়ে যায়, বিচ্ছিরি লাগে বাধার। দুপুবের নিঝুম আর রাতেব নিশুতিতে ফারাক অনেক। দিনেব আলোয় চোখদুটো খুলে রাখা যায় তবু, রাতের আঁধারে অন্ধ। হরেক বঙের হবেক চিত্তিবেব পাখিবা ঝিমিয়ে এলে একঘেয়ে ঝিঁঝির-ডাক ব্যাঙের ডাকে মশার উৎপাত বাড়। এত বড একটা আকাশ ঝাঁপিয়ে আঁধার নেমে এলে হাত-পা-চোখ-কান নিয়ে নুলো সেজে কানা-কালা-বোবা হয়ে থাকতে পারে কোনো মানুষ? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেই মন চায়। বেরুতে হবেও তাকে। আজ রবিবার। সন্ধেবেলা ভালো বাংলা 'বই' আছে টিভিতে।

এমন কি, টিভির টানেও বামুনবাড়ি যাওয়ার কোনো মন ছিল না তার। আজ সকালেই বড়জেঠির মুখের বাক্যিগুলো শুনেছে সে। দেশপাড়াগাঁয়ের আঁস্তাকুড়েয় তাকে বেঁধে রাখার প্যাঁচ কষছে বুড়ি। বশ করেছে মাকে। এখন মা-ই বা শুনবে কেন এসব ফুসমন্তরের কথা? ভারি তো বড়মানুষের ঘর। সাহেববাড়ির মায়ের টানও কি কম নাকি? অসম্ভব এবং প্রায় অবিশ্বাস্য, অথচ অতি বাস্তব পাঁচ হাজার টাকার নোটের তোড়ায় বদলে যেতে পারে সব। রাধা যেন তার হাতে পায়ে বুকের-পাটায় বিশল্যকরণীর যাদু পেয়ে বয়স ছাপিয়ে অনেক বড় আরো লম্বা হয়ে যেতে থাকে কুড়ানি মায়ের সঙ্গে সমান পাল্লায়। কিংবা মায়ের চেয়েও অনেক বেশি চতুর, অনেক এলেমদার। এমন অনেক কিছুই পারে সে এখন। দুনিয়া কিনতে পাবে। এবং গাঁয়ে বসে বামুনবাড়িকে তোযাক্কা না করলেই বা কী? কটা দিনই বা সে থাকে দেশগাঁয়ে?

মিত্তিববাডি কি হালদারদের বাড়ির কথা ভাবল সে। নানান কাজেকম্মে গতর ঢালতে হয় যেখানেই, বড়মানুষের-ঘর সবই তার আপন ঘর নিজের দেশগাঁয়ে। টিভি আছে যাঁদের, এমন যে-কোনো সংসারের অন্তঃপুরে ঢালাও মাদুর সতরঞ্চি বা পাটির এক কোণে, নয়তো মেঝেতেই এক ধারে সে ঠাঁই করে নিতে পারে নিজেব মতো করে। সেভাবেই তৈবি হচ্ছিল সে। নিশ্চিতই এখন দেশগাঁয়ের কারুর ঘরে যাওয়ার আগে একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন থেকে যায় তার। বুল্লিদিদির বাদামি রঙেব চুড়িদারটা বাছাই কবে রেখেছিল আজকের সন্ধের জন্যে। শাদা উড়নিটাই থাকবে, কাল যেটা ছিল। বছর খানেক আগে স্নো-পাউডারের যে-শিশিকৌটোগুলো রেখে গিয়েছিল, সেভাবেই পড়ে আছে ঘরে। দেশের বাড়িতে এলে কোনো রকমে চলে যায় কটা দিন।

কিন্তু সবটাই বদলে গেল হঠাৎ। রাগ নেই। গোঁসা নেই। অভিমান যেটুকু থাকে, মায়ের কথায় সেটুকুও ভাঙতে হলো। বামুনবাড়ির মেজজেঠুর সঙ্গে আজই কথা বলতে চাইলেন মা। ব্যাঙ্কের কথা। কাঁচা ঘরের মেটেহাঁড়িতে এতগুলো টাকা যতই ঢেকেচেপে রাখা হোক, ভাঙা দরজায় জং-ধরা নড়বড়ে ঝোলানো তালায় একটা লাথি মারলেই লোহালক্কড় ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথায়! যদি গন্ধ পায় কেউ, মেটেঘরে সিঁদ কাটতেও মেহনত লাগবে না খুব। গতরপোড়ানি টাকা তার। তার নিজের টাকা! রাধা আকুল হয়ে উঠল।

এবং ব্যাঙ্ক? ব্যাঙ্কের কাগজপত্তরে কোথায় কীভাবে টাকা জমা রাখতে হয়, কিচ্ছুই জানা নেই। কিন্তু শব্দটা সে শুনেছে সাহেববাড়িতে। সোনাদানা টাকাপয়সা অঢেল...অঢেল থাকে যাদের, ব্যাঙ্কের ঘরেই নাকি তাদের ইজ্জৎ। সাহেববাড়িতে দেখেছে সে, সরু সরু লম্বামতো রঙিন কাগজের ছোট ছোট বই। সে-ই কাগজে সাহেব সই করে ছিঁড়ে দিলেই নাকি হাজাব হাজার লাখ লাখ টাকা। অবাক কাণ্ড। সাহেববাড়ির নিয়মে অত বড় গণ্যিমান্যি মানুষ সাহেবের মতো সেও নাকি এমন সব ভোজবাজি পেয়ে যেতে পারে জগৎসংসারের! অবোধ কিশোরী অঙ্গে অঙ্গে শিহরনে কাঁপে। কিংবা মনে হয়, সাহেবদেশের দুঃখী মেয়ে সিন্ডারেলার ঘরে ফুলপরীর মতো আজ সেই ব্যাঙ্কই যদি তাব ছুঁচোইঁদুরউইআরশোলার পচা ঘরে এমন করে এসে যায়,...ভাবতেই পারে না সে, ভাবতে গেলেই ঝিমঝিমানিতে কাঁটা দিয়ে ওঠে গা-গতর। হাত-পা কেমন

অবশ হয়ে আসে। বামুনবাড়ির ওপর রাগ ভুলে যায়। বেরুতে হবে বলেই যত্নআত্তির সাজগোজের পর সোহাগী নেকলেসটা বের করল বাকশো খুলে। উড়নির খুঁটে আলতো করে আদর করে জমাট রক্তের পাথর আর মুক্তোগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হয় একবার। দু-হাতের কনুই উঁচিয়ে ঘাড়ে পেছনের দিকে আংটাটা এঁটে দেবার পর সুডোল ভরাট গলায় যে-লকেটটা ঝুলতে থাকে, লোভ হলো নিজেকে দেখে নেবার। হাতে তুলে দেখতে হয় আদ্দিকালের ভাঙা যে-আরশিটা ঘরে আছে, সেটা। সামনের কাচে শ্যাওলা জমেছে, পেছনের দিকে পারদ চটে গিয়ে কাঠ বেরিয়ে পড়েছে এমন, বড্ড বিচ্ছিরি। বড় আরশি বা চটকদার আরশি থাকলেই বা কী হতো? খুপরিব ঘরে আলো নেই। নিজেকে চেনার উপায় নেই। আলোআঁধাবির ছায়ায় বুকের ওপর হাত বুলিয়ে, স্পর্শে, অনুভব করতে হয় ঘাড়গলাবুকের টানটান মোলায়েম চামড়ায় পবম বতনকে। কণ্ঠা চাগিয়ে নেই, তিলআঁচিল নেই কোথাও। শুধু লকেটটা ভাসছে। আমেবিকা। গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটবে যখন, আমেবিকা গলায় দুলবে তার। ভিবমি খাবে গোটা বামুনবাড়ি।

অন্য দিকে সুমতিবালার আবেক বিষমপাত। নাড়ুমোয়া বানানোব যোগাড়যন্তব সব কিছু ঘবেব দাওয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এমন, গোছগাছে ঠিকঠাক সামলে ওঠাও এক মস্ত দিগদারি। এবই মধ্যে বেঁধে গেল টাকার হুজ্জুতি। যার টাকা, সেই মেয়ে ঘরে থাকতে থাকতেই যদি কিছু একটা বিহিত কবে ফেলা যায়! শুধু তো মেয়ের সাধ মেটাতেই নয়, যেহেতু সেটা তার নিজেরই তাগিদ, সুমতিবালা হদিশ পায না ডানে-বাঁয়ে। মেয়েকে নিয়ে সে যাবে বামুনবাড়ি। ভগবান যদি করেন, যদি একটু মুখ তুলে তাকান ও-বাড়ির মেজঠাকুরপো। উইয়ে কাটবে না, আরশোলায় চাটবে না, চোর ডাকাতে ছোঁবে না তাব টাকা।

পশ্চিম মাঠের শেষে লাল আবিব ছড়ানো সূর্যাস্তেব বং নিভেছে তখন। দিন নেই, রাতও নয়—ঝিমিয়ে-পড়া ঘোলাটে আলোয় গাছগাছালির ডালে ডালে পাতাব আড়ালে চারদিক থেকে শয়ে শয়ে কত ধরনের কত যে পাখিব ডাকাডাকি। শান্ত সন্ধেবেলায় সারাদিনেব কাজকম্মো থেকে ঘরে ফিবছে গেরস্তরা! চরানির গাইবাছুর ফিরিয়ে এনে জাব দেবার সময এখন। ঘরে ঘরে সন্ধেবাতি দেবার সময়। কাছে দূবে দু-চারটে শাঁখের ফুঁ। লম্ফলণ্ঠন জ্বলতে শুরু কবেছে কুঁতিপাড়ায় সামন্তিপাড়ায়। সম্পন্ন গেরস্তদের দালানকোঠায়, এমন কি, মেটেঘরেও বিজলীবাতি। চাষিপাডার এদিকটায়, বাস্তায় বিজলী বাতি নেই। সাঁঝেব আঁধার ঘন হয়ে নামছে যত, পবতে পরতে সব রং মুছে যাচ্ছে মাটিতে। আকাশ আর মাটি লেপটে যাচ্ছে কালোয় কালোয়।

রং-বেরঙের ফাগ ছডিয়ে রাস্তায় নামল বাধা। পিছু পিছু সুমতিবালা। ব্যাঙ্কের আপিশের কাগুজে জেল্লা আর মেটেহাঁড়ির যে-ফারাক—বাদামি বঙের শালোয়ার কামিজ, শাদা ওড়না, গলায় চুনিমুক্তোর বাহার ছডিয়ে মেয়ে এগোয় আগে আগে এবং তার অনুগমনে শায়া নেই ব্লাউজ নেই, ছেঁড়াফাটা কালকুষ্টি এক-কাপড়ে গা জডিয়ে মায়ের বুকেও আক্ষেপ থাকে না। দেমাকই চমকায় এক রকম। কচিকাঁচা বয়সের শখ আছে সাধ আছে আহ্লাদ আছে। সাধ মেটানোর রংবাহারি জামাকাপড়ই যদি থাকবে বাকশোয, সাজবে না কেন মেয়ে?

গাঁয়ের পথে চোখে পড়ল যাদের, চোখ টেরিয়ে দেখল সবাই। আড়ালে-আবডালে যাই হোক, মুখোমুখি বলল না কেউ কিছু। আলেকালে কত কী হচ্ছে দেশগাঁয়ে। দেখতেও হচ্ছে। রাধার জন্য আলাদা করে কিছু বরাদ্দ থাকার কথাও নয় তেমন—হায় রে আমড়া, তার আঁটি আর চামড়া! পেটে নেই ভাত, ঠোঁটে আলতা?

আশ্চয্যি! বামুনবাড়ির ঘাটে আছড়ে পরার পর ঢেউ নিজেই ভাঙল, ধস নামল না ডাঙায়। সন্ধেবাতির পর বিজলীবাতি জ্বলছিল ওদের ঘরে বারান্দায় দরদালানে। বুড়ি মাকে নিয়ে সব ভাইদের মিলমিশের এত বড় সংসারে বউ-ঝি কাচ্চাবাচ্চাদের সোরগোলে সকাল সন্ধেয় ভরে থাকে ঘরদোর। কিন্তু ভরসন্ধেয় লম্বা উঠোনটা ফাঁকা-ফাঁকা। থালায় ভরে কিছু একটা নিয়ে নিঝুম বারান্দাব সিঁড়ি ভেঙে ভাবি শরীরে উঠোনের মাটিতে নামছিলেন বড়বউ। রান্নাঘরের দিকে যাবার পথে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন একবার। বললেন না কিছু।

'বড় বেপদে পড়ে দুটো পবামশ্যের জন্যি তোমাদের দোরে এলুম গ দিদি। এই সেঁঝের বেলায় ...' আগ বাড়িয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে, তড়িঘড়ি লাফিয়ে এল সুমতিবালা-—'মেজঠাকুপো আছেন গ ঘরে?'

'আর আদিখ্যেতা করো নি বাপু...' নথ নেই নাকে। কিন্তু নথ-নাড়ার এমন ঝামটা থেকেই যায় বডঘরের গিন্নিবান্নিদের—'মেয়ের রসে তুমিও যে লতার পাঁচ পা দেখতে শুরু করলে গ। মেয়েকে সঙের বিবি সাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ সাতরাজ্যি। নিজের ত টেনাও জোটে না...'

সুমতিবালা হঠাৎ-ই বেকুব। এবং সইতেও হয়। যার অন্নে ভাতের গরাস, তাঁরই বাক্যিতে বুকের তরাস। কুণ্ঠিত গলার স্বর খাটো হয়ে আসে —'মেজকত্তার সনে দুটো কতা ছেল গ...'

'তা তুমিও কি শ'র থিক্যে ছুটিতে নতুন এলে নিকি? এ-বাড়িতে কোন্ ব্যাটাছেলেটা ভরসন্ধেয ঘরে থাকে শুনি? সংসারের কোন্ কাজটায় থাকে গ তোমাদের মেজবাবু? অই পাট্টি-পাট্টি করেই ত গেল। পঞ্চাইত না গুষ্টির পিণ্ডি। দশজনেব দাঁত-ঝাড়ানি খেয়ে মরবে ত, যাও না দেখ গে, ঘরের বউটা কেমনধারা জ্বলেপুড়ে মরছে দাঁতের যন্তনায়। বলি, হুঁশ আছে কারুর? আজ ড্যাক্তাবের কাছে চুঁচড়োয় নিয়ে যাবে কতা ছিল। দেখছ আক্কেলখানা? এখন অব্দি ফিরল নি ঘরে...'

সুমথ ঘোষাল বাড়ি নেই? বেশ খানিকটা দমে গিয়ে অসহায় সুমতিবালা ঠাহর পায় না, ওদের ঘরের অশান্তি তো তাকে কেন এমনধারা দাঁত-ঝাড়ানি বড়বউর? তাকাল ডান দিকে। মা-জেঠি-খুড়িদের কচকচি খিটিমিটিতে কিছুমাত্র তোয়াক্কা না রেখে ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল রাধা। মাকেও ছুটতে হয়।

টিভির 'বই' হবে বলে সাজ-সাজ পড়ে গিয়েছিল দরদালানে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল না কেউ। ইশকুলের-পড়া করছিল দোতলায়। রাধাকে দেখেই উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল সরস্বতী— 'কী র‍্যা রাধু, খুব যে সেজেছিস বা! যাবি কোথায়?'

'যাব আর কোথায়? এই এলুম গ তোমাদের এখেনে। বই দেখব।' রাধা ওর বুকের ওডনা নামিয়ে দিলো অনেকটাই।

দরদালানের কোণের দিকে ছোট টেবিলে শাদা-কালো টিভির শোভা। দুটো মাদুর পেতে রাখা হয়েছে মেঝেয়। দেয়ালের ধার ঘেঁষে বছর ভরেই থাকে যে-তক্তপোশটা, যার তলায় চাষের-আলুপেঁয়াজের ডাঁই, সেখানে আধশোয়া হয়ে গা এলিয়ে একটা কাঁসারবাটি হাতে নিয়ে কচি শশা চিবচ্ছিল প্রমথ ঘোষালের ঘরের বড় ছেলে ন্যাড়া। কলকাতায় কোন্ আপিশে চাকরি করে। আজ রবিবার বলেই রেলগাড়ির ধকল নেই।
মরদ ছেলে বিয়ের পর ঘরকুনো হয়ে পড়েছে এমন, গাঁয়ের আর-দশটা কাজকম্মো কি কোনো হৈচৈয়ের মধ্যে নেই। কিংবা টিভিতে সপ্তাহান্তিক বাংলা সিনেমার টান। নতুন বউ শম্পা যা পারে বা পারে না, টিভি পারে। বশ করে রেখেছে ঘরের ছেলেকে। রাধাকে দেখেই নড়েচড়ে উঠল— 'কে? রাধু নিকি র‍্যা? অ্যাঁ! এ-করেছিস কী র‍্যা তুই?'

রাধা হাসে। ভেতরে ভেতরে অঙ্গ নাচে তার।

'অ কাকি, মেয়ে যে তোমার ফিলিমস্টার হয়ে উঠেছে গ। মিনিস্টার কোন্ ছার। দাও, ওকে বোম্বাই পাঠিয়ে দাও...'

'আর বকিস নে বাপু, থাম্...' এক-বুক চাপা নিঃশ্বাস আগলে রেখে সুমতিবালা ঝাঁপিয়ে এসে বসল মেঝেয়। দম ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, পিঠের আঁচল টেনে মুখ ঘষতে ঘষতে—'অ্যাই...অ্যাই মেয়ে হয়েচে আমার এক জ্বালা। ঘরে বসিয়ে চোখে-চোখে রাখি ত দুটো শাকচচ্চড়িও জুটবে নি পেটে। শ'রে পাইঠ্যে আরেক মরণ। দশমুখে দশকতা...'

'আরে ধ্যাৎ, মারো গুলি কে কোথায় কী বলল। সে-ওরা বলবেই। কি দিয়ে ওদের মুখ আটকাবে গ তুমি...' হৈচৈ তুলে ন্যাড়াও উঠে বসেছে তক্তপোশে। বাটিতে নুন ছুঁয়ে কচি শশায় কামড়। দাঁতে ফেলে কচকচ কচকচ চিবতে চিবতে —'বি.এ. বি.কম. পাশ দিয়ে গাঁয়ের তাজা বয়সের ছেলেগুলো ফ্যালফ্যাল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকার। আর এটুকুন বয়সে তোমার মেয়ে যা করছে গ কাকি, জবাব নেই জবাব নেই...'

প্রসন্নতায় ভরে উঠতেই পারে মায়ের বুক। হয়তো-বা নিশ্চিত আশ্বাস কোথাও। ওপাশে দেয়ালে পিঠ ঠেসে বসে পড়েছিল সুমতিবালা। লাফিয়ে উঠে এল ন্যাড়ার কাছাকাছি। আবার হাঁটু ভেঙে পাছা উঁচিয়ে বসল মাটিতে, যেখানে নাক আর থুতনি তক্তপোশের কানা ছুঁয়ে থাকে, যেখানে সন্তানের বয়সী ন্যাড়া উদোল গায়ে লুঙ্গি পরে শশা চিবতে চিবতে হাঁটু নাচাচ্ছে পদ্মাসনে বসে, এবং যখন, নিতান্তই অকারণ, দুজনের ঘনিষ্ঠতায় দৃশ্যটা কৃপাময় মহাজনের পাদভূমিতে দীনজন খাতকের মতোই হয়ে ওঠে। আকুল সুমতিবালা— 'হ্যাঁরে ন্যাড়া, তোর মেজকাকার কাছে এয়েছিলুম র‍্যা। তা উনি ত ঘরে নেই। তুই বলবি র‍্যা। এত এত পাশ দিয়ে শ'রে চাকরি করিস। বড় বংশের ছেলে। কত কি জানিস তোরা...'

'আঃ, কী হয়েছে বলবে ত। যা বলবে বল চটপট। বল, বলে ফেলো। বই শুরু হয়ে যাবে এক্ষুনি...'

রাধা সরে গিয়েছিল কিছুটা দূরে নতুন-বউ শম্পা আর সরস্বতীর দিকে। সুমতিবালা

মেয়ের দিকে তাকাল। লুকনো গুপ্তধনের সংবাদ এমন করে উদোম করে দেওয়া যায় কিনা, এমন কি বড় বংশের ছেলে ন্যাড়ার কাছেও, ভাবল সে। কলজের জোরটা বড় খাটো। কিন্তু মুখের বাক্যি এমন করে বেফাঁস খসে পড়লে পাশ কাটিয়ে যাবার কায়দা-নিয়ম জানা নেই বলেই, ঘিয়ে-দুধে-মানুষ বড়-ঘরের ছেলের নাগালে থেকে আরো বেশি অসহায়ত্বে কিছু-একটা বলতেই হবে যেহেতু, বিড়বিড় তুলল ফ্যাসফেসে ভাঙা গলায়—'সে-তোর কাছে আর লুকব নি র‍্যা কিছু। রাধু ত মাসে-মাসে ট্যাকা পাঠায় শ'র থিক্যে। সতুর-বাপ পিতি মাসে এসে লোট দিয়ে যেতেন আমার হাতে। সে-ট্যাকা জমতে জমতে এখনে অনেক হয়ে গেছে র‍্যা...'

'কত ?

'সে-হবে...' সুমতিবালা ভাবে। হাঁপে নিঃশ্বাসে তখনও ভয় কাঁপে—' সে-হবে র‍্যা, অনেক ট্যাকা...'

'আঃ, অনেক অনেক করচ। বলবে ত কত ? পাঁচশো সাতশো হাজার...' কামড়ানো শসায় আলতো করে নুন ছুঁয়ে নেয় ন্যাড়া।

'হ্যাঁ হ্যাঁ সেই হবে। সাত...সাতশো। না না, আরো বেশি। অ্যাই ধর, হাজার...'

'ধ্বুস, হাজার ট্যাকা কি একটা ট্যাকা হল নিকি গ আজকালকার বাজারে ? আমি ভাবলুম কী-না-জানি কী। হবে বুঝি পাঁচ হাজার সাত হাজার দশ হাজার...'

আঁতকে উঠল সুমতিবালা। ভয়ে বা বিস্ময়ে মাথা তুলে তাকায় ন্যাড়ার দিকে। পাঁচ হাজার। পাঁচহাজার বলল কেন ছেলেটা ? কোথাও কিছু লুকনোর যো নেই গ গরিব মানুষের ? পড়ালেখার মানুষ ওরা।

কিন্তু ন্যাড়া জানে না তার প্রতিভার কদর। হাঁকল সে—'হ্যাঁ র‍্যা রাধু, আয় শোন এদিকে। কলকাতায় চাকরি করিস। কী ট্যাকা পাঠাস র‍্যা তুই? সব নিজে খাস ?'

'কেনে, কেনে গ ন্যাড়াদা ?' আজই প্রথম নিজের পেশীগুলোকে নতুন করে চিনেছে রাধা। জেনেছে আত্মশক্তি। টগবগিয়ে ছুটে এল কাছে—'মাকে ট্যাকা পাঠাই নে আমি ? এই বলছে বুঝি তোমার কাছে ?'

'না, সে-কথা নয়। সে-ত তুই অনেক দিন আছিস র‍্যা কলকাতায় ?'

'হ্যাঁ, এই ধরো প্রায় চার বছর।'

'কত ট্যাকা মাইনে পাস তুই ?'

'একশো পঁচিশ ট্যাকায় ঢুকেছিলুম সেই ছোট্টবেলায়। এখন বাড়তে, এই ধরো, বছর দেড়েক হল তিনশো...'

'তিনশো ? বলিস কী র‍্যা? এটুকুন মেয়ে। তিনশো ট্যাকা কামাচ্ছিস মাসে ?' স্টেনলেস স্টিলের ছোট বাটিটা শব্দ করে পাশে রেখে অথবা শশার যে-টুকরোটুকু মুখে পুরে দাঁতে কামড়েছিল ন্যাড়া, সামাল দিতে গিয়ে বুঝি গলায় আটকে যায়--'শুনেছি ত বহুৎ পয়সাওলা বাবুদের বাড়ি আছিস তুই। ভালো খাচ্ছিস-দাচ্ছিস। খাইখরচা নেই, স্নোপাউডার তেলসাবান জামাজুতো কিছুই ত কিনতে হয় না তোকে। মাস গেলে নগদা তিনশো টাকা হাতে...'

'হাতে কী গ? কালীজেঠু এসে সব ট্যাকাই ত মা-র হাতে দিয়েছেন অ্যাদ্দিন। সে-ট্যাকা আমি চোখে দেখেছি নিকি কোনোদিন?'

খুবই স্বাভাবিক, ন্যাড়া এবার রাধা থেকে সুমতিবালার দিকে—'কি গ কাকি, এত এত ট্যাকা পাঠাচ্ছে মেয়ে। তুমিও ত বছর ভরে খেটে খেটে মরছ বুড়ো হাড়ে। তা এই চার বছরে মাত্তর হাজার ট্যাকা জমল গ তোমার?'

'হাজার ট্যাকা? হাজার ট্যাকা কী গ ন্যাড়াদা? এক হাজার বলছ?' রাধা অবাক—'এই ত এক্ষুনি গোনাগুনতি করে দেখে এলুম গ, মেটেহাঁড়িতে রাখা আছে পাঁচ হাজার ট্যাকার মতন...'

'পাঁচ হাজার? অ্যাঁ?' অতর্কিত ছ্যাঁকায় ন্যাড়ার আওয়াজটা দীঘির শান্ত জলে বড়সড় রুইকাৎলার ঘাই মারার মতো এমনই প্রবল, টিভির মাদুরে গা-ঘেঁষাঘেষি বসে গিয়েছিল যারা, সকলেই ফিরে তাকাল। এবং তড়িতাহত ন্যাড়া উঠে দাঁড়িয়েছে তক্তপোশ ছেড়ে—'কতটুকুন বয়েস হবে গ রাধুর? হ্যাঁ গ কাকি? তের চোদ্দ? এরই মধ্যে পাঁচ হাজার ট্যাকা জমিয়ে তুলেছ গ তোমরা? এর পরও ত আরো বছর কয়েক বাবুদের বাড়িতে কাজ করবে গ। যেমনটা করছে। তোমাদের চাষিপাড়ার এ-ত দারুণ একটা ব্যাপার। কপাল খুললে কী না হয় মানুষের? সেরেফ কপাল...'

কী বেআক্কেলে মেয়ে যা-হোক। বুদ্ধির ঢেঁকি। হাটের ভিড়ে এভাবেই যদি হাঁড়িটা ভেঙে যায় আচমকা, মাথায় হাত সুমতিবালার। চোখ তুলে তাকাতেও ভয়।

'এতগুলো ট্যাকা। বল দেখি, কী সব্বোনেশে কথা! ট্যাকাগুলো রেখেছ কোথায় তোমরা?' ন্যাড়া রাধার দিকে তাকাল—'মেটেহাঁড়ি? কী...কী যেন তুই বললি ব্যা তখন?'

'সে-আর বল নি। ঘরের ভেতর মাচার তলায় ছুঁচো ইঁদুর উই আরশলা...' শান্ত ভাবে বলল রাধা। জানে না—কী করছে, কী বলছে সে। মেঝেতে হাঁটু-ভেঙে-বসা মাকেই শনাক্ত করতে চায় হীন অপরাধে।

এবং সুমতিবালা, শামুক যেমন, আস্তে আস্তে নিজের খোলের খোঁদলেই সিঁধিয়ে যেতে থাকে অবোধ সঙ্কটে। কী বলবে সে? শেখে নি জগৎসংসার।

'ন্‌নাহ্‌ বলার কিছু নেই। অদ্ভুত, সত্যি অদ্ভুত। গাঁয়ে একটা পঞ্চায়েত একটা ইশকুল একটা পোস্টাপিশ একটা হেলথ-সেন্টার একটা ব্যাঙ্ক কী গ? পাড়ায় পাড়ায় দশটা পঞ্চায়েত বসালেও কারুর সাধ্যি নেই তোমাদের রক্ষে করে...' ন্যাড়ার ঝাঝাল গলার-স্বর বুঝি কোনো যন্ত্রণারই ধ্বনি। হঠাৎ-ই ঝুঁকে তাকাল সে, হাঁটুর কাছে মুখ—থুবড়ে-পড়ে-থাকা মাতৃসমার দিকে—'ট্যাকা কি তোমার হাঁড়িতে ডিম পাড়বে নিকি গ কাকি? তোমাদের দরকার না থাকে, দাও...আমায় দিয়ে দাও। আমার দরকার আছে। বড্ড দরকার ট্যাকার...'

'কী ব্যা, চিল্লাচ্ছিস কেনে এমনধারা? কী হয়েছে তোদের? থাম না বাপু...' দাঁত ব্যথায় গাল ফুলে আছে মেজবউর। কী একটা ট্যাবলেট গিলে দেয়ালে পিঠ ঠেসে ঝিম মেরে বসে ছিলেন মেঝের এক ধারে। কথা বলতেও কষ্ট। তবু আঁচল শুদ্ধু গালে হাত রেখে ঝামটে উঠলেন—'হ্যাঁ র‍্যা রাধু, কী তুই নতুন নতুন বাহানা নিয়ে আসছিস বল্‌ দিনি সকাল-সন্ধেয়। এ-ও ত এক জ্বালা হল দেখছি...'

পাশাপাশি তিনটে ঘর-জোড়া লম্বা দরদালানের মাঝখানে যে টিউববাতিটা জ্বলছিল, তার তেজ বড় কম। একেবারে কোণের দিকে যেখানে আলো গিয়ে পৌঁছয় না, খুপচিতে টিভিটা চলছিল। টিভির নীলচে আলো-আঁধারিতে চোখ বেখে বসে ছিল যারা, ছোটবউ বন্দনা নতুন-বউ শম্পা বা ঘবের মেয়ে সরস্বতী সোরগোলে নাড়া খেয়ে উঠে এসেছে সকলেই। এবং ন্যাড়া, প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অথবা নিতান্তই তামাশা—আলগা হাসিতে যেটা আড়াল থেকে যায়, তাকাল কোণেব দিকে—'কাকে কী বলছ গ মেজমা? সমঝে কথা বলো। চাও ত শুনে শুনে নগদা পাঁচ হাজার ট্যাকা ওরা এক্ষুনি ঘর থেকে বের করে দিতে পারে তোমাকে। তুমি পারবে কাউকে দিতে?'

'পাঁআআচ হাজার?' কটকটে ঝাললঙ্কার জিভে সমবেত শিসধ্বনি ছাতা-পডা দেয়ালে ঠোক্কব খেয়ে অথবা টেলিভিশনের সচলতায় বিজ্ঞাপনের অলৌকিক যুবকযুবতীদের হুল্লোড় ছাপিযে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতেই, সরস্বতী খলখল হাসিতে জড়িয়ে ধরল বাধাকে-–'পাঁচ... পাঁচ হাজাব ট্যাকা তোর আছে র্যা রাধু? হুঁ, সে-ত থাকবেই। তোর গলায এমনধাবা সুন্দব দামি লকেট! কী পাথব র্যা এটা? টকটকে লাল। শাদা-শাদা এগুলো কী? মুক্তো না পুঁতি? এমনধারা বাহারের শালোয়াব কুর্তা?'

দরদালানের মাঝামাঝি আলোটা যত দূরেই থাক, বলা বাহুল্য, রাধার সর্বাঙ্গ ঝলমল ছিল। ঝলকে ঝলকে উঠছিল চুনি পাথরের লাল। পাটভাঙা সিলকের শালোয়ার কুর্তা। জেল্লাই আলাদা। বামুনবাডির পড়ালেখা-জানা মানুষগুলোর নাকের ডগায় আজ তাব ইজ্জত অনেক।

'নাও, বোঝো ঠ্যালা। হ্যাপা সামলাও এবার...' বুকে জবরদস্ত থাপপড়ে মশা মাবে ন্যাড়া। তাকায় মেয়েদের দিকে—'মুডি ভাজতে চিড়ে কুটতে কি আব-দশটা ঘরের কাজে ডাকবে গ সামন্তিপাড়ার কাকিকে? ধম্মে সইবে তোমাদের?'

এমন কি, ঢোঁড়া বা মিটুলি সাপকে নিরন্তর খোঁচালে, ফণা তুলতে পারুক ছাই না-ই পারুক, সেও ঝাপট মারতে চায়। ফুঁসে উঠল সুমতিবালা। ফোঁসানিতে ক্রোধ নেই। ঢোঁড়াব মতোই নির্বিষ ছোবলানি। কান্নার সুরে, আকুলতায়—'এমনধারা বলচিস কেনে র্যা ন্যাড়া? সি-ট্যাকাব কতাটাই ত বলতে এয়েছিলুম র্যা তোদের দোরে। এট্টা বুদ্দি পরামশ্যো দে না কেনে। তোরা দেখবি না ত দেখবে কে বল্ দিনি গাঁযে গরিব মানুষদেরকে?'

'অ্যাই...অ্যাই তোমাদেব এক বুলি— গরিব-মানুষ গরিব-মানুষ। আরে বাপ্, পাঁচ হাজার ট্যাকার কড়কড়ে তাজা নোট ঘবে পচিয়ে নষ্ট করে যারা, তাদেরকেও গরিবমানুষ বলবে গ?' ঠোঁট ভাঙা হাসি থেকে হঠাৎ গুমরে উঠে, দু-হাতের পাঞ্জা তুলে শরীব ঝাঁকিয়ে, ন্যাড়া সুমতিবালার দিকে—'বলি, ব্যাঙ্ক বোঝো? ব্যাঙ্ক? সুদ জানো? ইনটাবেস্ট?'

'সে-আর আমি কী করে জানব র্যা বাবা? মুখ্যু মেয়েমানুষ...'

'তা'লে আর আমার কাছে এয়েছ কেনে। যাও যেখেনে খুশি...' বিষণ্ণ গাম্ভীব আদলে সুমতিবালার এক জোড়া টলটল চোখের পাতায় জীবনের কোনো দুর্লক্ষণ খুঁজে পায় না ন্যাড়া। ঘড়িব কাঁটায় বয়ে যাচ্ছে সময়। বাংলা সিনেমা শুরু হবে এক্ষুনি।

কিংবা রাধা ভারিক্কি চালে বুঝে নিতে চাইল তার নিজের হিসেব—'পড়ালেখা জানিনে গ। বেঙ্কে টেপসইয়ের ট্যাকা নেবে গ ন্যাড়াদা?'

'ধ্যাৎ তোদের আর কী বলব? বলার কিছু নেই। যা ভাগ, ফোট্...' লুঙির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে ন্যাড়া কিছুটা শান্ত এবার। ধপাস করে তক্তপোশে বসে পড়ে টিভিমুখো হবার আগে রাধার দিকে তাকাল একবার—'লেখাপড়া জানিস নে ত কী হয়েছে? সাত জন্মের মুখ্যু কিষেনদেরকেও ত দেখছি দু-চার হাজার করে ব্যাঙ্কে ট্যাকা রাখছে আজকাল। সে-যা করবি, কর গে যা। মর...'

বাজারে 'গঙ্গা' নামে নতুন সাবান এসেছে একটা। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী কোথায় কোন্ হিমালয় গভীরে গঙ্গোত্রী থেকে উৎসারিত খরস্রোতা মন্দাকিনী। টিভির পর্দায় পুণ্যার্থীদের পূর্ণ অবগাহন ঘাটে ঘাটে। অসহ্য দাঁতের ব্যথায় বাঁ-হাতে গাল চেপে ড্যালাড্যালা চোখের চাউনিতে সেদিকেই তাকিয়ে থেকে, বুঁদ হয়ে গিয়ে, ভাবতেই পারেন মেজবউ—ঘরের উঠোন ডিঙিয়ে গাঁয়ের বাইরে রেলগাড়ি চেপে কালেভদ্রেও কোথাও যাবার সুযোগ হয় না যার, তাঁকে যেতে হবে না কাশীধাম বা ত্রিবেণীসঙ্গমে। সর্বপাপহরা গঙ্গোদকে তৈরি যে-সাবান, এক সাবানে সুদূর গ্রামবধূ প্রতিদিনই সেরে নিতে পারেন তাঁর গঙ্গাস্নান। কলুষমোচনপ্রচারে হিন্দী চলচ্চিত্রের নায়ক এবং এককালীন ক্রিকেট অধিনায়ক।

'মাইক্রোসিস্টেম কী ব্যা রাধু? জানিস?'

সরস্বতীর ডাকে বিচলিত রাধা। টিভির পর্দায় সেই চেনা শাশুড়ি আর পুত্রবধূ। সেকেলে বুড়িকে ধবধবে করে কাপড়-কাচার নতুন সিসটেম চেনাচ্ছে শিক্ষিতা অত্যাধুনিকা ছেলের-বউ। ওদের হিন্দী-বাংলা প্রতিটি সংলাপ মুখস্থ তার। খলবলিয়ে উঠল—'এ-ত কাপড়-কাচার গুঁড়ো সাবান গ। এ-দিয়ে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে কত কাচাকাচি হয় রোজ রোজ। উঃ, কী যে ভালো। কী বলব তোমাদেরকে। দাম কত বেশি। এমনধারা দামি জিনিস তোমরা এখেনে পাবে কোথায় পাড়াগাঁয়ে? পয়সা থাকলেই হলো? ভালো ভালো জিনিসের কদর বুঝবে কেউ?'

'আ মলো যা...' ডেটারজেন্ট পাউডার ফুরিয়ে গিয়ে যখন সাহেবি দুনিয়ার লাফঝাঁপ আর গানে- হল্লায় নতুন বিজ্ঞাপনের শুরু, ঠোঁট বঁকাল ছোটবউ বন্দনা—'সরস্বতী তোকে কি জিগগেস করল, আর তুই কী লেকচার ঝাড়তে লেগেচিস র‍্যা? অ্যাঁ! বলি, মাইকরো না ফাইকরো কী বলল, সেটা কী? শ'রে থাকিস। এত কিছু জানিস। জানিস ত বল না কেনে।'

'জানব নি কেনে গ? বলল রাধা। এবং বলেই থতমত। টিভির বিজ্ঞাপনেই শব্দটা সে শুনেছে অনেক, অনেকবার। জানে না কিছুই। কিন্তু বামুনবাড়ির ভাগ্যিমানী মেয়েরা জানতে চাইছে। কিছু একটা জানতেই হবে তাকে। সে শহরের মেয়ে। সাহেববাড়ির ইজ্জত। চট করে ঝলসে উঠল মগজটা। এভাবে ঝলসে-ওঠা মানেই চটজলদি বুদ্ধি খেলে-যাওয়া। বুদ্ধি করে বললে, সে দেখেছে, হাবিজাবি সব কথারই একটা মানে দাঁড়িয়ে যায়। কলকলিয়ে উঠল—'মাইকরো সিস্টেম? সে-ত মাইক গ। মাইক দেখো নি? সেই যে গ, মিটিংয়ে মিছিলে বক্তিমে হয়। পুজোর দিনে পেন্ডালে বাজে...'

'যা বাব্বা! হচ্ছে গুঁড়ো সাবানের কথা। এর মধ্যি মাইকের গানফান বক্তিমে এল কোত্থেকে র‍্যা?' খলখল হাসছে শম্পা বন্দনা সরস্বতী—'বলচিস কী তুই?'

'হ্যাঁ গ, ঠিকই বলচি। একজনায় কথা বলবে কি গান গাইবে ত চাদ্দিকে চারিয়ে যাবে এমনধারা, একশো দুশো কী গ, ঠিক যেন হাজারে হাজাবে মানুষে চিল্লাচ্ছে মনে হবে...'

'সে-ত হলো...' হাসছে মেয়েরা। এবং কৌতূহলে—'কিন্তু সাবান? গুঁড়ো সাবানের কী হলো? সেটা বলবি ত।'

'সেই ত বলছি। এ-সাবানও ত তেমনিধাবা...' রাধাও অবাধ— 'একটা বড় বালতি নাও। এক বালতি জলে গুলে দাও এক চামচ কি দু-চামচ সাবান। ব্যস, আর দেখতে হবে নি। বিজবিজ ফেনায ফেনায় বালতিটা ভবে উঠবে এমন, ঠিক যেন এক বালতি সাবান...'

'অ্যাই...অ্যাই আয ত এদিকে। আয় এদিকে, কাছে আয...' চোখ টেরিয়ে ললাটের ধার ঘেঁষে ভ্রূকুটি তুলেই ছিল ন্যাড়া। হঠাৎ গর্জে উঠল। ভারি গলাব স্বর—'আর একটা কথা বলবি ত এমন থাপপড় মারব তোর গালে, হাড়গোড ভেঙে গুঁড়ো করে দেব...'

সহসা বদলে গেল টিভির আসর। ন্যাড়াব ক্রোধের মাত্রায যে দাপট ছিল, তাব ভাষায চমকে ফিবে তাকিয়েছে মেয়েরা।

এবং আবো বেশি গর্জনে ন্যাড়া বেসামাল—'এখন না-হয় চাকবি করছি। অ্যাদ্দিন কী কবেছি ব্যা? পাক্কা দু-দুটো বছব রেলগাড়ি ঠেঙিয়ে কলকাতায় গিযে কলেজে পড়েছি। বি. এসসি পাশ কবেছি। সে-কি তোর কাছে এখন মাইক্রোসিস্টেম শিখব বলে? অ্যাঁ? বুজরুকিব আর জাযগা পাস নি? কটা দিন শহবে থেকেই দেশগাঁয়ের সব্বাইকে গাঁইযা ভূত ভেবেছিস? অ্যাঁ? কেউ কিছু জানে না? তুই একাই চালাক?'

টিভির পর্দায বিজ্ঞাপনপর্ব চলছিল তখনও। অনেকটাই মাঠের জনসভায় নেতাদের বক্তৃতাব মতো। ভিড সাজিযে দেওয়াই জনগণেব দায। শোনার দায় নেই।

আক্রান্ত রাধা প্রথম ধাক্কায কিছুটা ভড়কে গেলেও তেবচা চোখে তাকিয়ে থাকে। টানটান একটা রাগ আস্তে আস্তে চাগিয়ে উঠতে চাইছে ভেতর থেকে। বদলে যেতে থাকে মুখের-চোখেব পুরো আদলটাই। সে সইবে কেন গাঁযের বামুনবাড়ির পযসাব গবম? ধান চাল আলুব টাকা আব শহরের ইংরেজির টাকা এক হলো?

কিংবা সুমতিবালা, মহাজনেব গদির ধার ঘেঁষে নাক বা চোখ ছুঁয়ে মাথা-বিকনো খাতক যেমন, হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে ছিল তক্তপোশেব পাশে ন্যাড়ার পায়ের কাছে কপালে হাত রেখে, মাথা নুয়ে, নিঝুম। যন্ত্রণায় সোজা হয়ে বসল। ফ্যালফ্যাল চোখের চাউনিতে অবোলা গাভীর আদলটাই থেকে যায়—'কী হল র‍্যা ন্যাড়া? মুখপুড়ি মেয়েটাকে নিয়ে আমার হল গে এই এক জ্বালা। কী বলল ব্যা তোদেরকে? এমনধারা বলচিস কেনে ওকে?'

'মেয়ে তোমার জব্বর সেয়ানা হয়ে উঠেছে গ কাকি। মাইক চিনে গেছে। মানুষদেরকে ঢপ দিয়ে কথা বলতে শিখে ফেলেছে বিস্তর। পাট্টিতে নাম লিখিয়ে দাও। আর দেখতে হবে নি। এক লম্বরি লিডার বনে যাবে...'

'অঁ, বড্ড বেশি রস বেড়েছে মেয়েটার। ফড়ফড়ানির আর শেষ নেই...'

সকলেই ফিরে তাকিয়েছে।

'ছোট-বড়র একটা ফারাক নেই গা? কোন্ নবাবের বিটি র‍্যা তুই? কড়ে-আঙুলের বয়স নয়। যা-নয়-তাই বলে কত কি শিখিয়ে যাচ্চে আমাদেরকে...' দাঁতের ব্যথায় অসহ্য যন্ত্রণা। হয়তো রাধা ততোধিক বাড়তি উৎপাত। পাশের আলোআঁধারি থেকে খিঁচিয়ে উঠেছে মেজবউ—'লাজ নেই শরম নেই র‍্যা তোর? নিকি মাথা খেয়েচিস ওসবের? শ'র শ'র কচ্চিস, বাহাবি সব জামা পরে গয়নাগাটির ঝিলিক দিয়ে ঢং খেলিয়ে বেড়াচ্চিস। কবিস ত সেই ঝি-গিবি...'

ঝলকে উঠল রাধা। টাঁশ-লাগা গোছের স্তব্ধতায় পাথর হয়ে গিয়ে দিশেহারা চোখে তাকিয়ে রইল ঘনিষ্ঠ মানুষগুলোর দিকে। চেনা মুখগুলোও কেমন ঝাপসা হয়ে ওঠে চোখের পাতায়।

কিংবা যাঁরা আপন মানুষ তার, বামুনবাড়ির বউ-ঝিরা, টিভির জলসা অকস্মাৎ এলোমেলো হয়ে যেতেই তাকিয়েছে ডানদিকে। সবস্বতী বেশ ঝাঁঝাল গলায়—"ওকে এমনধারা বলছ কেনে গ মেজমা। দুদিনেব জন্যে এযেছে বেচারি। দাদাও যে কী ছাই...'

'থাম্ ত, থাম তুই। তোকে আর বেশি ঝোল টানতে হবে নি। বই দেখবি ত দ্যাখ বসে বসে। নয়তো চলে যা। দূর হ...' এমন কি, মর্মান্তিক দাঁতের ব্যথা ভুলেছে মেজবউ। প্রবল ক্রোধ—'কী বলেচি? এমন অনেয্য কিছু বলা হয় নি ওকে। শ'বে কাদের বাড়িতে দাসীবিত্তি করে। সেই ত বাসনমাজা কাপড়কাচা রান্নাবান্না ফাইফরমাশ খাটার কাজ র‍্যা বাপু। তা তাকে বাড়ির ঝি বলব না ত কী বলব? বিবি বলব? অঁ! নরম বিবির খড়ম-পা, হাঁটতে বিবির নড়ে না গা...'

মায়ের বয়সী মেজকাকিমা! অবশ তাকিয়ে থেকে রাধা কাঠ-কাঠ শক্ত হয়ে উঠল।

গোয়ালের গাইগরুব ঝিমুনিতে হাত-পা সিঁধিয়ে এক কোণে গুটিসুটি ঝিম মেরেই ছিল সুমতিবালা, কোথায় কী যে হলো, সুলুকসন্ধান কিছুই খুঁজে না পেয়ে লাফিয়ে উঠে হঠাৎ দিশেহাবা—ছলবল মেয়ের হাঁড়ি-হয়ে-ওঠা শুকনো ব্যাজাব মুখ কিংবা ন্যাড়া বা মেজবউয়ের বাগ! কোত্থেকে কী ঘটে যায়—দুনিয়ার কথাবার্তা সবই জটিল যেহেতু, অবোধ আক্রোশে হামলে পড়ল মেয়ের ওপরই—'আ ল আবাগি, মরণ নেই র‍্যা তোর? কী বলচিস তুই ওঁদেরকে। যাঁদেরটা খাচ্চিস পরচিস, তাঁদেরই ঘরে এসে দাঁত ঝাড়চিস র‍্যা এমনধারা? পাযে ধব মুখপুড়ি, মেজমার কাছে ক্ষ্যামা চেয়ে নে...'

কাঁপল না রাধা। কালো মেঘ জমছে বুকের ভেতর। কালো মেঘে জল হয। ঝিরঝিরে বাঁশপাতার আদলে কাঁপছে ঠোঁটজোড়া। থুতনিটা ভারি হয়ে উঠছে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে টানটান শক্ত রাখার চেষ্টাতেও দু-চোখ ভেঙে অঝোব জলের ধাবা ফেটে পড়তে চাইছে যখন, ঘাড়ের ওপর চাপ বাড়ে।

'দ্যাখো দিনি কী ঠ্যাটা মেয়ে! দাঁড়িয়ে রয়েচে দ্যাখো। কানেই নিচ্চে নি কারুর কতা...' সন্তানের ওপর রাগ নয়, দুঃখুও নয়। অসহায় যন্ত্রণা সুমতিবালার। ফ্যাসফেসে গলায় চিৎকার—"আ ল পোড়ারমুখি, কী বলচি তোকে? এখনে ত ওঁরা ছিনেমা দেখবে

র‍্যা সব্বায়। এখেনে দাঁড়িয়ে থাকবি? নিকি ঘরে যাবি? চ', ঘরে চ'...'

'ওকে কেউ ঘরে ফিরে যেতে বলে নি রাধুর-মা। কতাটা তুমি ঘুরিয়ে নিচ্চ কেনে এমনধারা? বসুক না, সবার সনে বসে বই দেখতে চায়, দেখুক নি কেনে...' বড়ঘরের গিন্নিবান্নিদের দেমাকি চাল যেমন হয়, গালে হাত রেখে তেরচা চোখের ভ্রূকুটিতে তাকাল মেজবউ—'মেয়েছেলেদের এত বাড় ভালো নয় গ। এক্কেবারে কচি খুকিও নয় তোমার মেয়ে। ধিঙি হয়ে উঠেছে যেমনধারা, গাঁয়ে ত আরো দশটা মানুষ আছে গ! দশ কানে দশটা কতা উঠবেই...'

'ধ্যাত্তেরি...' টিভির নিবিষ্টতা থেকে নাড়া খেয়ে চড়া গলায় খেঁকিয়ে উঠল ন্যাড়া—'দেখছ বই শুরু হয়ে যাচ্ছে। আর অমনি আরম্ভ হয়ে গেল তোমাদের! কিছুর মধ্যে কিছু নেই, খালি ক্যাঁচাল। কথা বলতে হয়, যাও, বাইরে যাও। বাইরে গিয়ে যত খুশি গলা বাজিয়ে ঝগড়া করো। এখানে কথা বলবে না কেউ। চ্চুপ, একদম চুপ...'

টিভির জলসাঘরে একমাত্র পুরুষমানুষ ন্যাড়ার হুঙ্কারে নড়েচড়ে বসেছে মেয়েরা। নিজের মনেই আরো কী-সব বকতে বকতে থেমে গেছে মেজবউ। সত্যি সত্যি মুখে কুলুপ এঁটে চকিতে সকলের সব মনোযোগ টিভির দৃশ্যে গেঁথে যাবার পর, লো-ভোল্টেজের গোলমালে টিউবলাইটের যে-আলোটুকু দূর থেকে গায়ে এসে পড়ছিল, ওতে তার পাটভাঙা চকচকে শালোয়ারকামিজের বর্ণাঢ্য জৌলুস বা গলার লাল চুনি বা শাদা মুক্তোর ইজ্জত এভাবে ফুৎকারে মিথ্যে হয়ে যাবে, ভাবনার মধ্যে ছিল না বলেই রাধা হঠাৎ-ই যেন পুকুর-সেঁচে-তোলা খিয়ো জালে রুই কাৎলার বদলে পুঁটি ট্যাংরাও নয়। শ্যাওলা কাদার জঞ্জালে বাতিল হয়ে গেল। বিচ্ছিরি কান্না পাচ্ছে তার। মেঝেতে মাদুর পেতে বসে-থাকা বামুনবাড়ির বউ-ঝিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে তার। টিভি দেখবে বলে ওত পেতে আছে! শিখবে কিছু? দুনিয়াভর নিত্যি নতুন কত কী তৈরি হচ্ছে! কত কি দেখার আছে, বোঝার আছে শেখার আছে—জানে কিছু উদো-উদো বোকাহাবারা?

অদ্যকার বাংলা-ছবির উদ্যোক্তা যাঁরা, তাঁদের বিজ্ঞাপনপর্বের শেষভাগে কমোড-সাফের যাদুমন্ত্র কোন এক অ্যাসিডের প্রচার চলছিল। শহুরে বিলাসীপ্রাসাদে ধবধবে শাদা পাথর-খোদাই বাথরুমের দিকে হালুম-মারা চোখে তাকিয়ে থেকে কী দেখছে, কী বুঝছে গাঁয়ের পয়সাওলা ঘরের বউ-ঝিরা? ওদের দুর্বোধ্যতার দিকে নজর রেখে রাধার নিজেরও দুটো চোখ পলক ফেলতে ভুলে যায়। হাতে গলায় কানে ভরি আষ্টেক সোনা ঝুলিয়ে নিলেই হলো? এমন হাউসকোট-পরা দুধে-আলতার মেমসাহেব ওরা জ্যান্ত দেখেছে কোনোকালে? রাধা যাঁর পায়ে পায়ে হাঁটে। প্যান আর কমোডের ফারাক জানে এরা কেউ? ন্যাপকিন বোঝে? জল-টানার ফ্লাশ চেনে? এসব অ্যাসিড ঢেলেই ব্রাশ করে কবে সাহেববাড়ির টয়লেট সে দুধের রঙে সাজায় প্রতিদিন।

চুপ! অবশেষে আসল বাংলা-ছবি ছায়া ফেলল পর্দায়। যে-যার মতো সকলেই নড়েচড়ে ঘাড় উঁচিয়ে বসে স্থিরচিত্রে জমাট বেঁধে যায়। জগৎসংসার ভুলে ছবির মায়ায় মনপ্রাণ সমর্পিত হবার মুহূর্তে মেয়েদের সঙ্গে, এমন কি, ন্যাড়াও তক্তপোশে পদ্মাসনে নিবিষ্ট এবার। কে রাধা? কেন রাধু? কারুর কোনো দৃকপাত থাকে না ডানে-বাঁয়ে।

অথচ ক্ষুব্ধ অভিমানে তখনও মেঝেতে বসল না রাধা। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। হাড়মাস পুড়িয়ে একটা নাছোড় রাগ চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকে ভেতরে ভেতরে। দূরের ম্যাটমেটে বিজলী আলো যেটুকু এসে পড়েছে পেছন থেকে, এত বড দরদালানের কোণের দিকে আঁধার ঘোচে না পুরোপুরি। বরং সামনের দিকে টিভির এত কাছাকাছি নীলচে আলোয় ঝলসানো মুখগুলো। চাঁদনি রাতে বর্ষায়-ধোয়া কলাগাছের পাতাগুলো যেমন। মাথার ওপর কড়িকাঠে পাখাটা ঘুরছিল। গা-সওয়া বাতাসের শিরশির। কাঁপছে না কেউ। রা নেই কারুর মুখে, কারুর চোখে পলক নেই। এমন কি, মশার কামড়েও চড়থাপ্পড় চুলকানি থাকে না কারুর গায়ে। বোবা চোখগুলোর দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে ভাবতেই পাবে রাধা—আকাশমাঠেব সুদূর ছাপিয়ে কত কত কিলোমিটার দূরে ঠিক এখনই, এদের সঙ্গে একই সঙ্গে একই 'বই'য়েব দিকে চোখের পাতা স্থির রেখে একই ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে আছে আরো কতগুলো মানুষ! অবিশ্যি সেখানকার লাউঞ্জ আর এখানকার দরদালানে ফারাক অনেক। সেখানে রঙিন টিভির হাজার রং, এখানে শুধুই শাদা-কালো। সেখানে লাউঞ্জে দক্ষিণ-খোলা জানালায় অঢেল বাতাস। সিলিংয়ে চারদিকে চার কোণে চার-চারটে ফ্যান। মাঝখানে হাজার হাজার টাকা দামের হরেক চিত্তির-করা কাচের ঝালর। বিস্কিট রঙের ঘষামাজা দেয়ালে দেয়ালে বাহারি দেযালবাতি। সোফায় গা এলিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেখানে বসেছেন মা, পায়েব তলায় অনেকটা জায়গা জুড়ে নকশা-আঁকা দামি কার্পেট। এখানে মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছে সবাই। শুধু ন্যাড়াদা, ব্যাটাছেলে বলেই হয়তো, একটু উঁচুতে তক্তপোশে একা। উদোল বুকে, ছোটমতো নেয়াপাতি ভুঁড়ির ওপর মোটাসোটা একগোছ পৈতে ঝুলিয়ে, হাঁটুর ওপর লুঙি তুলে যেভাবে বসে আছে লোকটা, কী বিচ্ছিরি! মানুষের মুণ্ডু নিয়ে ঠিক যেন গণেশঠাকুর! নাক মুখ চোখের মুণ্ডুটাও কি বোকা-বোকা! সবার সামনে এমন কবে কখনও বসবেন দাদাবাবু? পা ভেঙে বসে মুড়ি চিবোবেন? ধ্যাৎ, সে-হয় কখনও? সাহেবসুবোরা মেয়েছেলেরও বাড়। কিছুতেই গায়ের জামা খুলবে না, চেয়াব সোফা ছাড়া বসবে না, লুঙিধুতি ছোঁবেও না। দিনে চারবেলা থালাভর্তি ভাত-গেলা ঘি-দুধেব মানুষ আর চিলিচিকেন কাবাব তন্দুরি চাপ কেকপেস্ট্রিপুডিং আইসক্রিমের মানুষ এক হলো? হয় কখনও?

পায়ের পাতায় আচমকা কিসের খামচানিতে চমকে উঠল রাধা। হাত-পা ছুঁড়ে লাফালাফি চেঁচামেচিতে সবাইকে কাঁপিয়ে তোলাই স্বাভাবিক ছিল হয়তো। কিন্তু সে জানে, এটা তার নিজেব ঘর নয়, সাহেববাড়িও না। কুচুটে বুড়ি মেজকাকিমা বাড়ির-ঝি বলেছে তাকে। রাগ বা যন্ত্রণা—দম চেপে দুটোই সইতে হয়। কোমর ভেঙে নিচু হয়ে তলাব দিকে হাত বাড়াতেই ডান দিকের কাঁধ ভেঙে গড়িয়ে পড়ল সিল্কেব ওড়না। 'বই' শুরু হয়ে গেছে বাঁদিকে। সবাসবি হাত বাড়াল সরস্বতী। চোখজোড়া নড়ে না এদিক-ওদিক। টিভির পর্দায়ই ওত পেতে থাকে। কোনো কথা থাকে না। বাঁ-হাতটা উঠে আসে ওপরের দিকে। রাধাব হাত ধরে টান। ভঙ্গিটা এমন—বোস্ না, বোস্। ভালো বই...

রাধা নখে নখে পায়ের পাতা চুলকোয়। রক্ত ঝরল কিনা বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

বোধ হয় তেমন কিছু নয়। ছিঁটেফোঁটা সামান্য একটু হলেও নাকি বিপদ। ইঞ্জেকশন নিতে হয়! একটা ইঁদুর। এমন হাজারগণ্ডা নেংটি ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে গণেশঠাকুরের ঘরে। বিতিকিচ্ছিরি এমন একটা গুদোম ঘরে বসে টিভি দেখার সাধ থাকে কারুর? বিচ্ছিরি সব গন্ধ! নিচু হয়ে পায়ের পাতা খামচাতে খামচাতে চোখে পড়ল, তক্তপোশের তলায় ঘরে-খাবার জন্য চাষের আলু ছড়ানো। ওদের ঘরে-ঘরে খাটবিছানার তলায় শুধু তো আলুই নয়, পেঁয়াজও আছে ডাঁই করা। লম্বা দরদালানের ওপাশে টকটকে লাল রঙের দামি একটা ফ্রিজ, এপাশে টিভির ধার ঘেঁষে সারখোলের বস্তা কতগুলো। কবে যে চুনকাম হয়েছিল কোনকালে, ছাতা-পড়া নোনাধরা দেয়ালে ঠাকুরদেবতার ছবি নিয়ে কত যে ক্যালেন্ডার পাখার বাতাসে দোল খাচ্ছে, উড়ছে, ফটফট আওয়াজ করছে। এর মধ্যে বসে ভালো করে টিভির কথা শোনা যায় কিছু? কাঁড়িকাঁড়ি পয়সা নাকি লোকগুলোর? মাথামুণ্ডু নেই। একটু যদি ছিরিছাঁদ থাকত ঘরসংসারের!

মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাধা। এবং তখনও ডান পায়ের তলানি দিয়ে বাঁ-পায়ের পাতা রগড়ে যেতে হয়। ইঁদুরটা দাঁত ফোটায় নি। রক্তও বেরোয়নি নির্ঘাৎ। ছুটে পালাবার সময় ধারাল নখের আঁচড় লেগেছে।

বাঁ-দিকে সেন্সর সার্টিফিকেটের পর বড় বড় হরফে ঝলকে উঠেছে ছবির নাম। দেশপাড়াগাঁ নিয়ে গপপো। পল্লীকথা। সেই মাঠঘাট পুকুর দীঘিজলা গাছপালা গাইবাছুর আকাশমাটি মেটেঘরের গাঁয়ে সিঁথিকাটা মেঠো রাস্তায় দু-হাত আকাশে রেখে একতারার বোল তুলে দূর থেকে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছেন বাউল বাবাঠাকুর। ছোট থেকে বড় হতে হতে যত কাছে এগিয়ে আসছেন, স্পষ্ট হয়ে উঠছে মুখচোখ। দরাজ গলার গানে গানে সুরে সুরে কথায় ভরে উঠছে দরদালানের চারপাশ। নাম! হরেক নামের হরফগুলি তলা থেকে উঠে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে ওপরের দিকে। হরফ চেনে না রাধা। গান শোনে, ছবি দেখে। রঙিন টিভি নয়। আকাশের নীল বা গাছগাছালির সবুজ বা সাধুবাবার পাগড়ি আলখাল্লার গেরুয়া সবই কালো এদের ঘরে।

রাধা বোঝে না, কী করবে সে এখন? শহরের সাহেবি কেতায় বিজ্ঞাপন চলার সময় যে-কদর ছিল তার, দেশগাঁয়ের গপপো নিয়ে 'বই' শুরু হতেই বাহবা পাবার আর কিছুই থাকে না। চাঁদনি রাতের আলোয-ছায়ায় ঝোপঝাড়ে ফণিমনসার মতো উন্মুখ মানুষগুলো নড়ছে না কেউ। কাঁপছে না। ফিরেও তাকাচ্ছে না। এবং বাতিল হয়ে যাবার উপেক্ষায় তার জ্বলুনিপোড়ানি বাড়ে। নীলচে কাচে যখন গড়িয়ে যাচ্ছে দেশগাঁয়ের ছবি, তার চোখের ডগায় লেপটে থাকে সত্যি-সত্যি জ্যান্ত গেঁয়োভূত কতগুলো। এবং বিদঘুটে হাঁ-করা নিশ্চল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই সে এখন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—সাহেববাড়ির দোতলায় সোফায় বসে রাজরাণীর মতো পায়ের ওপর পা তুলে একই 'বই' দেখছেন মা-ঠাকরুণ। দাদাবাবু-দিদিমণিরা কেউ থাকবে না কাছে। হিন্দী বইয়ের গাঁও বা দেহাতি মানুষজন হলে অন্য কথা। সেখানে ঢাকুসঢুকুস মারদাঙ্গা, ভালো ভালো নাচগান থাকে। গ্রামফ্রাম নিয়ে এমন সব বাংলা-'বই' হলে ওদের ভালো লাগে না একদম। উঠে চলে যায়!

সবই নাকি ফ্যাচফ্যাচ কাঁদুনি আর ন্যাকামো। পাড়ির কথা আর আদিখ্যেতা। কিন্তু

মা ঠিক উল্টো। গালে পান ফেলে দামি জর্দার গন্ধ ছড়িয়ে সবটাই দেখবেন। পায়েব কাছে মেঝের কার্পেটে হাঁটু ভেঙে বসে থাকবে রাধা। তার দর বেড়ে যায়। কদব বাড়ে। কবে গাঁয়েব ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছেন মা! সব ভুলে গেছেন। এটা কী, ওটা কী— প্রশ্ন শুধোলে জবাব দেবে রাধা। গাঁয়েব মেয়ে রাধা সাহেববাড়িতে বইপুঁথি হয়ে যায়।

অথচ নিজের দেশগাঁয়ে কতগুলো আকাট মানুষের কাছে এভাবে খাবিজ হয়ে গিয়ে বাগ হলো তাব। কান্না পায়।

ঝকমাবি থেকে কখন যে উঠে চলে গেছে সুমতিবালা, ঠাহরই পায় নি কেউ। মুখপুড়ি ঠ্যাটা মেয়েটাকে নিয়ে তাব বিপদ—এ-মেয়ে পযসা কামায়। বশ মানে না কারুব। এমনধাবা ঠাটবাট আব আকথাকুকথাব দাঁত-খিঁচুনি সইবে কেন বড়ঘরের বউ ঝি ছেলেছোকরারা? এদিকে বেহায়া মেয়েটাকে টেনে নিয়ে বেবিয়ে আসতেও পাবে না ওঁদেব নাকেব ডগায। হাজাব হোক, বামুনবাড়ি মান্যিজনের ঘব। অসহায় কাতবানিতে তাকে ছুটে যেতেই হয়েছে লম্বা উঠোন ডিঙিয়ে রান্নাঘরেব দোবে বড হাকিমেব এজলাসে, বড়গিন্নির কাছে—'ক্ষ্যামাঘেন্না কবে নাও না কেনে গ দিদি তোমরা সব্বায। বাপ-মবা মেয়ে। শ'বে পযসার-ঘরে মানুষ। আমানি জুটচে নি মা-ভাইয়ের। লঙ্কাফোড়নেব বাসে নাক জ্বলচে পড়শিদের। এ-কি আমাবও কম জ্বালা গ? কাকে দেখি, কাকে বাখি বল দিনি এখনে...'

জ্বলুনি রাধাবও থেকে যায। হাড়মাসপোড়ানিতে সে জ্বলছে যখন, নজরে পডল —ন্যাডাদা কাছাকাছি আছেন বলেই হযতো খুড়িশাশুডিদের সামনে আলো-আঁধাবির এক কোণে যেভাবে ঘোমটায ঘাপটি মেবে ছিল নতুন-বউ, পলকে মাথার কাপড সরিয়ে এক ফাঁকে ঠোঁটে আঙুল চেপে হাসল আলতো করে। হাতেব পাতায় বকের ঠোঁট নাচিয়ে কাছে ডাকার মুদ্রায় বসতে বলাব ইঙ্গিত।

বসল না বাধা। ইচ্ছেও নেই। ইচ্ছে না-থাকাব গোযার্তুমিতে দাঁতে ঠোঁট চাপল শক্ত করে। এত বেশি শক্ত কামড, বাগ বা অভিমান—নিজের কাছেই দুর্বোধ্য সব কিছু। কাঠ-কাঠ গোটা শরীবটাই ভেতব থেকে পাথব হযে গিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁতেব আংটায়, বিষফোঁড়ার মুখ পাকলে যেমন হয়, টনটনিয়ে উঠছে। এমতাবস্থায যা হয বা হওযা স্বাভাবিক, ড্যালাড্যালা আক্রোশের চোখজোড়া পলক ফেলতে চায় না। শত্রুব খোঁজে। কালো-কালো বেহুঁশ মুণ্ডুগুলোব দিকে তাকিযে থেকে সে সইতে পাবছে না উদোভুতো লোক ওই ন্যাড়াদা আর কুচুটিপনা বুড়ি মেজকাকিমাকে। ওবা সাহেববাড়িব ঝি বলেছে তাকে? কেন? শহবে চাকরি কবতে যায় না দেশগাঁয়ের ব্যাটাছেলেরা? ন্যাড়াদা নিজে যায় না? মাসমাইনের বেতন পায না? মেয়েরা গেলেই দোষ? বাসন মাজে না ওদের ঘরেব সোহাগী মেয়েরা? কাপড কাচে না? বান্নাঘবেব খুন্তি নাড়ে না? পবের ঘরেব কাজ আর ফাইফরমাসের কাজ করলেই দাসীবাঁদি হযে যায বুঝি কেউ? ওরা সাহেববাড়ি দেখেছে কখনও? জানে সাহেববাড়ির আদর?

কান্না পায়। তেডেফুঁড়ে চিৎকারে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। যা-থাকে বরাতে, গলা চড়িযে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দেবার সাধ। কিন্তু সাহস হয না। নাকের ডগায়

রবিবারের বাংলা-'বই' গপগোয় গপগোয় জমে উঠছে টিভির কাচে। সে-আরেক যন্ত্রণা। বড় বড় আর্টিসরা সবাই তার চেনা। যে-'বই' তার দেখা-'বই' নয়, নাগালের মধ্যে পেয়ে আজও যদি দেখা না হয়, আপশোসে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে কটা দিন। এবং সেই জ্বলুনিতে অস্থির হয়ে হাঁটু লেপটে মেঝেতে বসে পড়তেও পারছে না এক্ষুনি। কেন বসবে? গা ভরে সোনাদানায় সতীসাধ্বী সোহাগিনী কারা সব রয়েছে এখানে? তাতে আমার কী? আমার ভারি বয়েই গেছে।

হঠাৎ কী হলো, অনেকটাই ক্ষিধের পেটে ভাতের থালা ফেলে উঠে যাবার মতো, ক্ষুব্ধ অভিমানে গোটা শরীরে মোচড় খেলো রাধা। ডান পাশেই খোলা দরজা। ছিটকে বেরিয়ে পড়ল।

টিভির জলসায় একটা কাঁপুনি উঠল ঠিকই। এক পলক ফিরেও তাকিয়েছিল কেউ কেউ। কিন্তু পিছুডাকে শুধলো না কেউ কিছু। বুক ভাঙে, চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে, ঠোঁট কাঁপে থরথর থরথর। ঝটকা মেরে বেরিয়ে বাইরে আসার পর নিজেরই দীর্ঘ ভূতুড়ে ছায়াটা বারান্দা জুড়ে আছড়ানি খেয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল ডান দিকে? নিজের চেয়ে তিনগুণ চারগুণ ঢ্যাঙা সেই ছায়া চকিতেই একটা শাঁকচুন্নির আদল পেয়ে যায়। বাঁদিকে পাকা-দালানের শেষপ্রান্তে বারান্দাটা যেখানে ফুরিয়ে গেছে, একতলার ছাদ ছুঁয়ে সারস পাখির গলার আদলে একটা হ্যাঙারে যে-ম্যাটমেটে বালবটা ঝুলছিল, আকাশভাঙা থকথক আঁধারে-আঁধারে সেটা লণ্ঠন বা পিদিমের মতোই খামোকা হয়ে আছে। এপাশে-ওপাশে লম্বা বারান্দা, বারান্দার তলায় ছোটখাটো একটা মাঠের আকারে মস্ত উঠোন জুড়ে খাঁ-খাঁ করছে গা-ছমছম ঝিঁঝিঁর-ডাক। বিজলী বাতির জেল্লায়ও সেখানে আঁধার ঘোচে না সবটুকু। গাঁয়ের মোড়লমাতব্বর কাকাজ্যাঠারা কে কোথায় ঘরের বাইরে। ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ায় আলোটা জ্বলছে। বোধহয় ঘেমেনেয়ে হেঁশেল সামলাচ্ছে বড়জেঠি। শুনশান রাতের নিঝুমে বারান্দাব সিঁড়িতে চার পা ছড়িয়ে এখনও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঘেয়ো কুকুরটা। কাছে দূরে গাছপালা ঘরদোরের কালো-কালো ছায়ায় আরো একটি ছায়া তৈরি করে নিজেরই ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে পায়ের তলায় চটিজোড়া গলিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে একা, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে-থাকা নিজের ছায়াকে মাটিতে আছড়ে ফেলে অসহায় তাকায় এদিক ওদিক। নিজেবই ছায়ায় যদি শাঁকচুন্নির ভয়, আলোটা শত্তুর। আলোর নাগাল ছিঁড়ে আঁধারে ডুবে যেতে পারলেই ছায়াটা থাকে না। কিন্তু আকাশমাটিতে মিলমিশ ঘুটঘুট্টি আঁধারের পাহাড় ডিঙিয়ে যদি তাকে ঘবে ফিরতে হয় একা? টর্চ নেই লণ্ঠন নেই— ভাবতেই পারে না সে, রাতের নিঝুমে মেঠো রাস্তার ঝোপঝাড় বনবাদাড় কেটে সে এগোবে পায়ে পায়ে? আঁধার রাতের কালোয় শালোয়ারকুর্তার ঝলমল বা গলায় চুনি-পাথর বা মুক্তোর জেল্লা সবই বিলকুল মিথ্যে হয়ে গেছে।

আলোই যদি শত্তুর, ভূতপেত্নীর আঁধারে আরো বেশি ভয়।

মা-টাও যে কোথায় গেল এই সময়? একটা বুদ্ধিসুদ্ধি নেই বুড়ির? কিংবা খটকা লাগে। হয়তো ভেবেই নিয়েছে, টিভি দেখবে মেয়ে! অনেক বাত অব্দি থাকবে বামুনবাড়িতে। টিভির কথা মনে হতেই বুকের পাথারে হাহুতাশের দাপাদাপি বেড়ে যায়

আরো। একছুটে সে বামুনবাড়ির আঙিনা ডিঙিয়ে পালিয়ে যেতে চাইল। পাকা দালানের কোণে মাত্র ষাট কিলোওয়াটের যে-আলোটুকু টিমটিমে মোমবাতি হয়ে ঝুলে আছে, ওপাশে সদর দরজার পথ দেখালেও বড় বড় দুটো ধানের-মরাই খড়ের-পালুই গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায় জায়গাটা এত ঘিঞ্জি, সবই আড়াল হয়ে থাকে এবং ছুটে পালানোর তড়িৎগতিতে বেমক্কা হোঁচট খেয়ে টলে পড়তেও পারত হয়তো। সামলে যায়। এমন তরতাজা টিভির 'বই' ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে? দুঃখে ক্ষোভে কান্নায় গা-গতরে আগাপাশতলায় যন্ত্রণা। টিভি যার প্রাণ, টিভি যার নয়নমণি, টিভি যার চোখের কাজল এবং চোখে কাজল টেনে নিতে হাতের আরশি যেমন, কিংবা আরশির কাচে ছায়া ফেললে চুনিমুক্তোর লকেটে তার গলার হার যেভাবে চোখ ধাঁধায় বা ঠোঁটের লিপিস্টিক কমলালেবুর কোয়ায় রঙিন হয়ে ওঠে—আস্ত একটা টিভি যেন সেই মায়াদর্পণ। সব সত্যি হয়ে ওঠে। সবাই সুন্দর। মাছের কাছে জল যেমন, পাখির যেমন ডানা—রাধার কাছে সেই টিভি আহার-নিদ্রা-নিঃশ্বাস, নিত্যি দিনের সুখ-দুঃখ তার, তার আরাম। যে-টিভিতে হরেক ধরনের পুরুষমানুষ দেখেছে সে, রূপ-ঝরানো কচিকাঁচা সুন্দরীও দেখেছে কত! রোজ দেখে, রোজ চেনে—সেই টিভি ছেড়ে বা টিভির আসর থেকে নিজেকে তুলে এনে বেরিয়ে আসার টানাপোড়েনে রাতের আঁধারে বুকের আঁধারে চোখের ঝাপসায় কান্নায় কান্নায় হয়তো আপশোসটাই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। জেদটাও থেকে যায়। সদর দরজায় পৌঁছে দাঁতকপাটি ক্রোধের দাপটে পেল্লাই ভারি পাল্লা দুটো টেনে বাইরে ঝাঁপিয়ে নামতেই আচমকা ধাক্কায় হাড়-পাঁজরায় সমস্ত রসরক্ত জমাট বেঁধে বরফ হয়ে উঠল। হাঁটু কাঁপে, পেটের নাড়িভুঁড়িতে টান দিয়ে একটা খিঁচুনি। চোখ জোড়া অন্ধ। বুঝি মরণ এবার। মিশমিশে ঘন কালো আঁধার! শুধুই আঁধার। আকাশমাটির ফারাক নেই। গাছপালা ঘরদোর খানাখন্দ পুকুরডাঙা সব লোপাট। গাঁয়ের মেয়ে সে নয়। এমন ঘুরঘুট্টি আঁধার রাতে একা একা ঘরে ফেরার অভ্যেস তার নেই। শহরের মেয়ে বলেই হয়তো সাপের ভয় পায়ে পায়ে। রাতের বেলায় সাপ বলতে নেই। লতা। আস্তিকমুনি আস্তিকমুনি আস্তিকমুনি...মনে মনে তিনবার আস্তিকমুনির নাম জপতে জপতে সাবধানে পা ফেলে এগোতে এগোতে প্রতিটি পা-ফেলায় থমকে দাঁড়ানোর দ্বিধা। ঝিঁঝির ডাকের নিশুতি জুড়ে আঁধার-ঘেরা ঘুরঘুট্টিতে ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা গাছগুলি দত্যিদানোর আদল পেয়ে গেলে বুকের খাঁচায়, গলার নলিতে খামচি মেরে ধরে থাকে গা-ছমছম ভয়ের দলা। গুঁড়ি মেরে আছে কেউ কোথাও। লাফিয়ে উঠতে পারে এপাশ-ওপাশ থেকে এবং এভাবেই যখন চারপাশ থেকে ভয়ের শাঁকচুন্নি খাবলে ধরে থাকে বুকের পাঁজরা। চলতে হয় রাস্তার ঠিক মাঝখানে সাবধানে পা ফেলে। ডানে বাঁয়ে ঝোপেঝাড়ে ঘাসেদুব্বোয় পা পড়লেই ভয়। ফোঁস করে ছুবলে দিতে পারে জ্যান্ত কিছু? শিউরে ওঠে বুকের ভেতরটা। গায়ের ওপর লাফিয়ে উঠতে পারে ব্যাঙ? গাইবাছুরের গোবর থেকে মানুষের গুপেচ্ছাব কত কী থাকে গাঁয়ের রাস্তায়? ঘিনঘিন করে গা। অথচ এবড়োখেবড়ো সিঁথিকাটা সরু মেঠো পথটুকুও দেখা যাচ্ছে না চোখে। পায়ের চটিজোড়া হড়কে হড়কে যাচ্ছে পা থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয়। সন্তর্পণে পা-ফেলার ঝোঁকে পাখির ডানার মতো হাত দুটো উঠে যায় ওপরের দিকে। খেলতে থাকে ডানে বাঁয়ে।

হাতে পায়ে, গোটা শরীরের হালকা ভারে সে যেন অতি সহজেই কিছু একটা হয়ে যায় ঘুড়ির মতো। হাঁটছে না। জানে না, কোথায় ফেলছে পা। উড়ছে বাতাসে। গোঁত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াব ঝুঁকি।

বুকের হাড়গোড় ভেঙে কান্নাটা খোলাখুলি চিৎকারে উগরে উঠতে চাইছে এবার। চোয়াল দুটো ভারি হয়ে উঠছে যন্ত্রণায়, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। আঠার মতো চ্যাটচেটে চ্যাটচেটে হয়ে আসছে চোখের পাতা। এ-কী সব্বোনেশে শাস্তি গ মানুষের? ঝোপজঙ্গলের জোনাকি বা আকাশ ভরা তারার চুমকি বা কাছে-দূরে লম্ফলণ্ঠনের আলো আঁধার-রাতের যতই গয়নাগাটি হোক, ভরাট অমাবস্যাই হয়তো আজ! কোনো দিনক্ষণতিথির হিসেব জানে না সে। কৃষ্ণা-চতুর্দশী বা শুক্লা প্রতিপদের ফারাক বোঝে না। অমাবস্যা চেনে না। দিন আর রাত্তির বোঝে। আলো আর আঁধার চোখে দেখতে পায়। জানে—অমাবস্যে-পুন্নিমে মুখ্যুদের জন্যেও তৈরি হয়। চোখ মেলে তাকালে যেখানে আলোয় আলোয় ভরে থাকে জগৎসংসার, সুয্যি ডোবে না অথবা সুয্যি ডুবলেও আঁধার নামে না যে-সাহেববাড়িতে, কিংবা ঘরে-ঘরে সিঁড়িবারান্দায়, ঘরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় কখন যে আঁধার নামে, কখন রাত্তিরের শুরু—হদিশ পাবাব আগেই যেখানে ফিনকি দিয়ে আলো ছোটে সাহেবদেশের কলকাতায়—আজ, এই মুহূর্তে পা টিপে টিপে আঁধার ডিঙনোর সতর্কতায় বারবার সেই সাহেববাড়ি বা সাহেবি শহরকেই মনে পড়ে যাচ্ছে তার। কী কুক্ষণে, কেন যে সে এসেছিল দেশগাঁয়ে?

ঝোপজঙ্গলের রাস্তাটুকু অনেকটাই ডিঙিয়ে এসে সে রতন আযের মেটেবাড়ির গা ঘেঁষে ফাঁকা জায়গায় থমকে দাঁড়াল। জনমনিষ্যি নেই কোথাও। একটানা ঝিঁঝির ডাক ছাড়া সাড়াশব্দ নেই কারুর। সুয্যি ডোবার পর কিছুটা সন্ধে গড়ালে এমনিতেই গাঁয়ের চারপাশ ঠাণ্ডা নিঝুম হয়ে আসে। ভেতরের দিকে পাড়ায় পাড়ায় লোকজন চলে না খুব বেশি। আজ রবিবার। গেরস্তদের ঘরে ঘরে টিভির জলসা। যাদের ঘরে বিজলী বাতি নেই, টিভি নেই, ফাঁকফোকব খুঁজে তারাও ঢুকে পড়েছে, যাদের আছে, তাদের ঘরে-ঘবে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সে, বড় একা, বুকের তরাসে মরে। ঘুরঘুট্টি আঁধারে ঘাপটি-মারা গাছপালায় পাতায় পাতায় বাতাসের শব্দ, গায়ে ফুবফুরে সিলকের জামায় ফডফড়ানি। নিজের দেশে নিজের গাঁয়ে কেন গ এমনধারা মরণ তাব? কিংবা ভরসা থাকে— ঘুঁটেকুড়ুনির দুঃখী মেয়েরা এমনি করেই আঁধার রাতের বনে বনে হারিয়ে গেলে সগ্‌গের ফুলপরী ওপব থেকে দেখেন সবই। ভগবান রক্ষা করেন। আকুল চোখজোড়া তুলে ঘাড় উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকাল রাধা। তারায় তারায় ঝলমল এমন বিশাল আকাশ সে দেখেনি অনেক...অনেক কাল।

আঁধার বাতের দুঃখী মেয়ে হঠাৎ যে এভাবে থমকে দাঁড়িয়েছে, নিশ্চিতই তার একটা হেতু ছিল। খুব কাছেই গেরস্ত ঘরের জানালায় বিজলী বাতির রোশনাই এবং ভেতর থেকে এক ধরনের সুরেলা গলাব স্বর। এমন করে কথা বলে না কোনো মানুষ। টিভির গলাব আওয়াজ। শান্ত রাতের প্রহরে ঝিঁঝির-ডাকের সঙ্গেই যার মিলমিশ।

কাঁধের উড়নি টেনে ঘষে ঘষে গাল-গলা-ঘাড়-গর্দান মুছে নিতে নিতে হাঁপায় রাধা। হাড়কলজেয় মগজে নতুন করে উথালপাথাল। কিন্তু রতন আযের বাড়ি বলে

যে-বাড়িটাকে সে চেনে, সে-বাড়ির লোকজন আদৌ তাকে চেনে কিনা, জানা নেই তার। কিংবা মেয়ে বলে, এই গাঁয়েরই মেয়ে বলে, নিজের দেশগাঁয়ের যে-কোনো বাড়িতেই হুট করে ঢুকে পড়তে পারে সে। বাধা নেই কিছুর। গাঁয়ের ঘরবাড়িতে বুড়ো নন্দদার মতো সদর আগলে বসে থাকে না কেউ। কলিং বেল নেই। আপন-পরের বাছবিচার কম। এ-রকমই কোনো ভরসা নিয়ে, অন্ধকারে, মাছির মতো বেড়ালের মতো চোরের মতো ঘুরঘুর ঘুরঘুর করে বাড়ির ভেতর ঢোকার পথটুকু সে খোঁজে পায়ে পায়ে। শুনশান নিশুতিতে ঝিঁঝির-ডাক যেমন থমথমানিই বাড়িয়ে তোলে, আঁধাররাতেও এক ধরনের আলো থেকেই যায়। এত মিহি আর হালকা তার আস্তরণ, অভ্যাস না থাকলে শাদামাটা চোখের পাতায় তার জন্যে নজরই তৈরি হয় না কারুর। বাধার সে-অভ্যাস নেই। তাকে আঁধার খামচাতে হয়। কিংবা আষদের মেটেঘরের চৌকো-চৌকো দুটো জানালা গলিয়ে যেটুকু বিজলী বাতি এসে বাইরে রাস্তার ওপর বড় বড় হিজলগাছ আর বুনো জঙ্গল ঝোপঝাড়ে উপচে পড়েছে, লম্বা ফোকাসের একটা রেশ পড়েছে চারপাশে। স্পষ্ট করে দেখা না যাক, আবছা ছায়ায় ছায়ায় অনেকটাই আন্দাজ চলে। রাস্তার লাগোয়া ঘরের দেয়ালে কী সব লিখে রেখে গেছে পার্টির লোকেরা। যাত্রাপালা সিনেমার ছাপানো কাগজ সাঁটা আছে দু-চারটে। মিশমিশে কালো আঁধারকে খুবলে খুবলে, দেয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে নিঃসাড় চোখ রেখে এগোতে এগোতে মেটেঘরের শেষে, হঠাৎ-ই এক ফালি সুড়ঙ্গের মতো কিছু একটা আন্দাজ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। পা বাড়াতে দ্বিধা। দাঁতে দাঁত চেপে সাহসে ভর করে এগোতেও হয় খানিকটা। বড়সড় একটা উঠোনই ভেতরের দিকে। বামুনবাড়ির মতোই হাড়কেপ্পন একটা টিমটিমে বিজলী আলো জ্বলছে কোথাও। আলোর যত তেজ, উঠোনটা তার চেয়ে অনেক বড়। আলো-আঁধারির একপাশে তুলসীমঞ্চে বুক-পোড়া পলতেয় পিদিমটুকু নেভেনি তখনও। আকাশমাটিতে মাখামাখি আঁধারের সমুদ্দুরে পিদিম আর বিজলীবাতির যেখানে কোনো ফারাক থাকে না, সেই আজব দেশে ভূতের ভয় বা মানুষের ভয়ের জাত আলাদা কিনা, বিহ্বলতায় সে-মেয়ে হদিশ হারায়। ডান দিকে মেটেঘরটা থাকে। বাঁদিকে কী একটা আছে পাঁচিল গোছের। মাঝখানে ভেতরে ঢোকার সরু পথটুকু চেনাজানা নয়। বুকের টিপটিপে এক-পা এক-পা করে সন্তর্পণে শব্দ বাঁচিয়ে এগোতে এগোতে, যখন পায়ের পাতার শিরশির থেকে মাথার চুল অব্দি ঝিমঝিমানিতে শিরায় শিরায় কোষে কোষে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আসছে শরীর, দু-কদম পা বাড়িয়েই ফিরে যেতে মন চায়। অথচ ফিরে যাওয়ার কথা মনে হলেই এগোনোর ইচ্ছেটাই বহাল থেকে যায়। কেন? কেন ফিরে যাবে? চুরিচামারি তো করতে আসেনি সে। কিসের অত ভয়? লোভ! ঘরে দশজনে মিলে টিভি দেখছে, না-হয় সবার পাশে এক চিলতে ঠাঁই চাইছে সে। ওতে তো বাড়তি পয়সা খরচা হচ্ছে না বাপু! তোদের টিভিরও জাত যাবে না।

আঁধারে ডুবে থেকে, যেন ডুব-সাঁতারে হাত-পা খেলিয়ে ভেসে যাওয়ার মতোই, উঠোনের এক ধারে এসে মেটেঘরের খুঁটি ধরে থমকে দাঁড়াল চুপচাপ। প্রথম পলকে কেউ কোথাও নেই বলেই মনে হয়েছিল যখন, খুবই কাছাকাছি ডান দিকের বারান্দা

থেকে কে একজন বুড়ো গোছের লোক বাজখাই গলায়— 'কে? কে র‍্যা ওখেনে? কী চাই?'

নিশুতির থমথমে গলার স্বরটা এমনই খেঁকুড়ে, এক ঝটকায় সাহেববাড়ির বাঘাকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু বাঘা তো তার আপনজন, তার পুষ্যি। গোটা শরীরে কেঁপে উঠে রাধা, প্রথম ধাক্কায় কী করবে ভেবে না পেয়ে অথবা দেশগাঁয়ের বাড়িতে বাপঠাকুদ্দার বয়সী এমন ডাকাবুকো মানুষের মোকাবিলায় তার ফ্যাঁসফেঁসে আর্তস্বর আদৌ গিয়ে পৌঁছবে কিনা কোথাও, কিছুই বুঝতে না পেরে যখন শামুকের মতো সিঁধিয়ে গেছে নিজেরই মধ্যে, অবাক কাণ্ড, হৈহল্লা চিৎকারে চোখের পলকে কী যে এক হট্টগোল বাঁধিয়ে তুলল বুড়ো, এঘর-ওঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাচ্চা-বুড়ো ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে নানান মাপের কয়েকজন। আরো একটা বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে বারান্দায়। ছুটে পালাতে চাইল রাধা। পালানোর পথ নেই। হঠাৎ-ই একটা তেজি টর্চের আলো এসে পড়ল গায়ের ওপর। বুঝি সাপের নিয়মে এভাবেই আটকে ফেলা যায় কাউকে। রাধা অবশ বনে যায়। বাহারি শালোয়ার-কামিজের জেল্লা বা চুনিমুক্তোর জৌলুস ঝলসে উঠতেই, সে বুড়োধাড়ি কতগুলো নচ্ছার মানুষের কাঙাল-কাঙাল হ্যাংলা চোখের নাগালে পড়ে নিজেই নিজের ঝলকানিতে ভয় পেল। এ-আরেক সব্বোনাশ।

'কে র‍্যা তুই? সাজপোশাকে ত দেখি রঙের পিচকিরি ছুইট্টেচিস খুব! বলি, রাতদুপুরে কারুক্কে জানান না দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিস কেনে?'

কী বলবে রাধা? জনে জনে দিকে দিকে তাকায় আকুল চোখে। ম্যাটমেটে আলোয় ছায়ায় ওদের মুখগুলোও চেনা যাচ্ছে না ভাল করে, যেখানে আঁধারই ঢেকে রাখে সব।

'আরে! এ-ত সেই মেয়েটা গ! সামন্তিপাড়ায় ঘর...' অন্ধকার বারান্দা থেকে নেমে এসেছে তাজা জোয়ান গোছের একজন ছেলে—'কলকাতা শ'রে কী-নাকি কাজ করে। ভাল কামায়। দু-দিনের জন্যে গাঁয়ে এয়েচে ত নাম কিনেচে খুউউব। ভিরমি খাইয়ে দিচ্চে সব্বায়কে...'

'অঁ, বুয়েচি বুয়েচি। আমাদের অনাদির মেয়েটা ত?' উঠোনের ওধারে ছিল মাঝবয়সী আরেকজন বিটকেল বুড়ো। তারই হাতে টর্চ। এবার সরাসরি—'ছেনালি দেখচ নি মেয়ের? বেগমবিবির সঙ সেইজ্যে বেটি এয়েচেন পরের দোবে মশকরা করতে। অ্যাই...অ্যাই হারামজাদি, মতলবটা কী তোর? কেনে এয়েচিস এখেনে?'

'টিভি দেখব।'

'কী? কী দেখবি?'

'টিভি।'

অ হরি! ধ্বুস! ভর সন্ধেয় ঘরের উঠোনে জমে-ওঠা এমন একটা নাটুকে ঘটনা শেষ পর্যন্ত এ-রকম একটা ফালতু রঙ্গরসে ফতুর হয়ে যাবে, হিসেবের মধ্যে ছিল না বলেই, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল যাবা, অনেকেই ঘরের দিকে ছুটতে শুরু করল বিবিধ বিষাদ বচনে। কেননা বাংলা-'বই' ফুরিয়ে যাচ্ছে। যার প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান

়খন। যার প্রতিটি সংলাপ বা প্রতিটি দৃশ্যে লেপটে থাকতে না পারলেই হারাবার হয়।

'আ মরণ! টিভি দেখবি ত রেতের বেলা ঘরে ঘরে এমনধারা ঘুরঘুর কচ্চিস কনে র‍্যা তুই? তা যা না, ঘরে যা। দ্যাখ গে যা। সে-ত বইয়ের আদ্দেকটা হয়েও গেল র‍্যা...'

বাধা অবাক হল। ঘোমটায় আড়াল একজন বয়স্কা বউ এগিয়ে এসেছে কাছে।

কিন্তু অন্য দিকে মাঝবয়সী সেই খিটকেল বুড়ো—'যাবে? কোথায় যাবে? কোত্থেকে ক এসে আঁধার রাত্তিরে গুটিসুটি মেরে ঢুকে পড়ল উঠনে, আর ওকে তুমি ঘরে চলে নিয়ে যাবে গ? কার পেটে কী আছে, জানো তুমি? শ'র চিনে গেছে ওটুকুন মেয়ে? ওদেরকে বিশ্বেস আছে? কী না পারে ওরা? সব পাবে...'

'অঁ, সেইটে হল গে কত্তা। কাজ কী ব্যা বাপু উটকো ঝামেলায়। তাইড়ো দাও, তাইড়ো দাও...' ঘরের বাবান্দায় খাটো তক্তপোশে গা ছেড়ে অন্ধকাবে ঘাপটি মেবে হল যে-বুড়ো মানুষটা, বোধ হয় সংসারেব বডকর্তা, জিরোচ্ছিল কি জাবর কাটছিল াইবলদের সুখে, মুখ খিঁচলো রাগী হুলো বেড়ালের মতো—'এ-মেয়ে টিভি দেখবে কী গ? আটকুড়্যাব বিটি নিজেই ত জ্যান্ত ছিনেমা দেইখ্যে বেড়াচ্চে গাঁয়েব দশজনাকে। ঋষির ঘরেব মেয়ে, বাড় দেখো না কত! কালে কালে কী যে সব হচ্চে গাঁযে। কলি ।, ঘোর কলি। শাস্তর নাকে রসকলি...'

হাড়গোড় গুঁড়িয়ে বুকেব ভেতব একটা বাগ জমে জমে উঠছিল রাধার। াকেমুখেচোখে বিষের জ্বলুনিটা ঠিকমতো উগরে তুলতে পারছিল না বলেই যন্ত্রণা আরো বেশি। হাড়মাস জ্বলছে পুড়ছে। এবং পিছু ফিবে পালানোর কথাই ভাবছে যখন, কী আশ্চয্যি, শুধু একজন...ঘোমটা-টানা বউরাণীমা এসে ওকে ধরলেন সোহাগে। হাত বাড়িয়ে থুতনিটা তুলে নিলেন চাব আঙুলের ডগায—'আহা গ, বড্ড সাধ করে এয়েচে । এট্টু টিভি দেখবে বলে। তা এযেচে য্যাখন, দেখুক নি কেনে! একদিন বৈ ত নয়। ভরসন্ধেয় কুকুবেড়ালদেবকেও তাডাতে নেই গেরস্তবাড়ি থিক্যে...'

'অঁ, অই...অই শালা এক যন্তর এসে ঢুকেচে ঘরের ভিত্রে। দু-দণ্ড এট্টু যে শান্তি করে বসবে জিরোবে কেউ, সে-আর হতে দিচ্চে নি কারুক্কে। জনে-জনে এসে সিঁধবে সব্বায়? কেনে ব্যা? এ-কি ছিনেমাতলা নিকি? নাকি গেরস্তবাডি?'

নির্বিষ ছোবলানি বুড়োর। এবং অচিরেই সেটা বুঝে ফেলার পর বাধার ধাঁধা লাগে। ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বউরাণীমা? মাথায় ঘোমটা টেনে শ্বশুব-ভাসুরেব নাকের ডগায় ওঁদের মুখের বাক্যি অগ্রাহ্যি করে? এমন ভাগ্যিমানী সোহাগী বউও নাকি আছে এ দেশগাঁয়ে? এবং তাঁর পাশে পাশে থেকেও নতুন করে কোনো ভরসা পায না রাধা। যেটুকু সাধ ছিল, উবে গেছে। নিজের গাঁয়ে পরের ঘবে অচেনা পা-ফেলার দুরুদুরু বুকের কাঁপুনিতে উঠোন ডিঙিয়ে সিঁডি ভেঙে বারান্দায় উঠে ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে এগোতে এগোতে...মাটি, সবই মাটির...গোবরজলে নিত্যি নিকনো তকতকে মাটিব উঠোন, মাটির সিঁড়ি, মাটির বারান্দা, মাটির দেয়ালে লেপটে থাকা কী এক সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে এগোনোর পায়ে পায়ে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তার চেনা জগতের অচেনা

মানুষগুলো আরো ঘুলিয়ে যেতে থাকে অবোধ মগজে। একই গাঁয়ের মেয়ে হয়ে, এমন কি এখানেও, ঘরের-মেয়ে হয়ে উঠতে না-পারার কাতরতায় পালিয়ে বাঁচতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু বউরাণীমার সোহাগ ছিঁড়ে সরে যাওয়ার ইচ্ছে হল না বলেই আস্তে আস্তে এক সময় সে টিভির ঘরের দবজায় এসে চৌকাঠে হুমড়ি খেলো, যেখানে সে পৌঁছতেই চেয়েছিল।

বড্ড ছোট ঘর। ঘরটা যদি বড়ও হয়, মাঝখানে বেড়া বেঁধে আটচালাকে আধা-আধি করে নেবাব পব একদিকে একটা পুরনো দিনের পালঙ্ক আর চাবদিকে বাকশো-প্যাঁটবাব হাবিজাবি-ঠাসা মেঝেতে যেটুকু ফাঁকা জাযগা, সেখানে ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেব গাদাগাদি মানুষজন এত বেশি, যতটুকু ঘর, তার চেয়ে অনেকটাই ছোট হয়ে গেছে। খড়ের চালার তলায় সাঙা বেঁধে মাথায-মাথায়ও খাটো হযে এসেছে এমন, কাঠেব কড়িতে টেবিলফ্যান গোছের ছোটখাটো একটা পাখা ঘুরছে ঠিকই, এতগুলো মানুষেব হাঁসফাসে ঘরের গুমোট ঘোচে না। অথচ হুঁশ নেই কারুর। বাধার প্রথম প্রবেশে এক ঝলক ফিরে তাকিযেছিল কেউ কেউ। কোনো আমল না দিয়েই আবার সবাই সামনের দিকে হামলে পড়েছে। ডুবে গেছে। পেছন থেকে শুধু ওদের ঘাড়পিঠমুণ্ডুগুলো দেখতে পাচ্ছে বাধা। ঠাকুরদালানে নিত্যি-পুজোয় নয়তো পাব্বনের দিনে এমনটা হয। বিগ্রহের সামনে বসে ভক্তরা আকুল। ঘরেব একেবারে কোণেব দিকে ক্ষুদে টিভিব পর্দাটা এত ছোট, আট্টিসদেব মুখচোখ ছবি সবই ছোট হয়ে যায়। রঙিন নয়। শাদায-কালোয় প্রমাণ সাইজেব বড টিভিও নয় বামুনবাড়ির মতো। রাধা জানে, এগুলোকে 'পোর্টেবল' বলে। সাহেববাড়িতে এমনি একটা আলাদা ছোট টিভি আছে তিনতলায দাদাবাবুর ঘরে।

বাঁদিকে পালঙ্কের বিছানায লজঝর এক বুড়িকে মাঝখানে নিয়ে বসে ছিলেন মাসি-পিসি ধাঁচের কযেকজন মেয়েছেলে। বাধা দবজাব পাল্লায় পিঠ ঠেসে দাঁড়াতেই যেটুকু শব্দ হলো, কাঁপল ঘবের নিঝুম—'কে ব্যা? কে এল?'

'রাধু গ।' বোধ হয় কানেও খাটো বুড়ি। বউরাণীমার চডা গলা—'সেই বাধুব-মা আছে নি আমাদের। সামন্তিপাড়াব বউ? সেই রাধু।'

'কেনে এযেচে? কী চায়?'

'টিভি দেখবে।'

'অ্যাঁ।' হযতো চোখেও দেখে না বুড়ি। ঘাড ফিরিয়ে তাকাল একবার। কিছু হদিশ পেল কিনা, বোঝা গেল না ঠিকঠিক।

তাবপরই সব চুপ। গাছেব পাতা ঝরে পড়লেও যেখানে বাতাস কেঁপে ওঠে, সেই নিশুতিতে ঘরের ভেতর কোনো বাক্যি নেই, সাড়া নেই। আচমকা একটি টিকটিকি ডেকে উঠলেও বোধ হয় বাতাস ভারি হয়ে উঠতে পারে এখন। গাযে গা লেপটে থেকে একসঙ্গে এতগুলো মানুষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে মেপে মেপে, হিশেব বুঝে। ঘরেব কোণে নীলচে পর্দায় পৃথিবীটা ছোট হয়ে এসে পেখম মেলেছে অনেক বড় করে। কত বড় বড় আট্টিস সবাই! সত্যি, সব সত্যি। এমনটা হয়, হতেই পারে। জমিদাব বাড়ির সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গরিব ঘরের ছেলের ভালোবাসাবাসি! কোত্থেকে কোন্

যাদুমায়ায় এমন মন-ভোলানো পাগল-করা গান শিখেছে সেই ছেলে! শুধু গানে গানেই সব দুঃখ ঘুচে যেতে পারে মানুষের। দুনিয়া কিনে ফেলা যায়।

সেই গান! মেটেঘরের নিশুতি ভেঙে ভরাট দরাজ গলাব সুরে সুরে কথায় বাণীতে যখন পাক খাচ্ছে দোল খাচ্ছে ভরে তুলেছে হৃদয়মনপ্রাণ, ঘরের সবগুলো মানুষ টানটান পিঠে ঘাড উঁচিয়ে সর্বভক্তি সমর্পণে লালসার চোখগুলো শূন্যে ঝুলিযে রাখে।

ঘরের চৌকাঠে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে বাধাও উদ্বেল হতে চায। হেমন্ত কুমার। হিন্দী হোক বাংলা হোক, এমন পুরুষালি সুবেলা গলাব স্ববে তাব উঠতি বযসেব মেয়েলি শরীরটা শিহবনে ভালো-লাগায় আকুলিবিকুলিতে ঝনঝনিয়ে কাঁপে। চোখ বুজে আসে। এমন সব গান শুনলেই মনে হয়, বুঝি সাহেববাড়িব বাথরুমে শাওয়াবেব তলায় স্নান করছে সে। মাথাব চুল ভিজিযে, গলা ভিজিযে হাতপা বুক পেট সব ভাসিয়ে ঠাণ্ডা জলেব ঢল নামছে তলা অব্দি। শরীব জুড়োয়। কিন্তু এখন, গানে গানে ভিজেও আজ এখানে স্যাঁতসেতে গন্ধওলা মেটেঘরের গুমোটে স্বস্তি নেই তার। পর্দায় গান গাইছে যে আট্টিস, তাকে সে চেনে। গানের গলা তার নয়। বাধুকে বাদ দিযেই যদি বাধুর -মা হযে উঠতে পাবে কেউ, সেখানে রাধা তার সর্বাঙ্গ ঝলমলে নিজে এসে দাঁড়ালে ঠাঁই পাবে না কোথাও? এতগুলো জোয়ানমবদ মানুষের চোখ সবই শুধু টিভির কাচে? পেছনের দিকে কানা?

বাধার বাগ হলো। সত্যি ঠাঁই নেই। পালঙ্কেব বিছানায মাসিপিসিজেঠি ঠাকুমাদেব পাশে গিযে বসতে পাবে না সে। মেঝেতে সতবঞ্জি মাদুর কী যেন পাতা আছে, আদৌ কিছু আছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। ওপাশে মেযেদেব সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষিতে বসতে চাইলে, ব্যাটাছেলেদের টপকে যেতে হয়। দবজাব একপাশে দাঁডিযে থাকাব একটু যা ঠাঁই পেল, সেখানে বসাব ইচ্ছে তাব নিজেবই ছিল না। মাটিব ওপব লেপটে বসলে ধুলোয ধুলোয় বিতিকিচ্ছিবি হযে যেতে পাবে দামি শালোযার-কামিজ। এত কিছু বিভ্রাটে টিভিব 'বই' দেখাব আরাম নেই। দেখছিলও না সে। নিজেবই গাঁযেব মানুষদের দেখছিল। মানুষেব ঘরসংসাব। এবা কি সবাই এই একই বাডির লোকজন? একই সংসারের? এত বড় বাড়িতে সকালে-বিকেলে একই হাঁডিতে রান্না চডে কি না সকলের, না-কী আলাদা আলাদা হিস্যায় থেকে একই টিভিতে 'বই' দেখে সবাই, কিছুই জানা নেই। লুঙি পবে উদোল গাযে জোয়ানমরদ ব্যাটাছেলে কযেকজন। বডজোব একটা গেঞ্জি দু-চারজনেব। বামুনবাড়ির বউ-ঝিদেব মতোই ছিরিছাঁদ-নেই টেনা-কাপড়ের মেযেছেলেরা। ঢলঢলে বেঢপ ম্যাকসি পবেছে অল্পবযসী মেয়েরা কেউ কেউ। কেমন বোকা-বোকা গেঁয়ো-গেঁযো। এপাশে পালঙ্কের বিছানায় সেই যে ল্যাছড়ানো বুডি থেবডে বসে হাঁ কবে তাকিয়ে রয়েছে টিভিব দিকে— চোখে কানা কানে কালা, শাযাব্লাউজেবও বালাই নেই গাযে। এক-কাপড়ে জড়ানো মেদেব বস্তা শবীবটা নিয়েই বড্ড নাজেহাল। শাঁকচুন্নির আদলে ছুঁচলো মুখটা উঁচিয়ে বেখে কী দেখছে কী শুনছে? বুকের কাপড়টুকুও যে ঠিক নেই, ডানদিকেব ঝুলো মাই বেবিয়ে পড়েছে সবটাই, হুঁশই নেই কিছুর? বুডিফুড়ি হলেই কি এমনটা হয়? ঘবভর্তি এতগুলো মানুষের সামনে একটু লজ্জাশবম আবব্রু থাকবে না গ মেয়েমানুষের? সবাই তার ঘুঁটেকুডুনি মায়ের মতো?

মগজের ঘোর কাটে না রাধার। তাকায় ইতিউতি। যা সে শুনেছে এতকাল অথবা যা সে দেখছে চোখ মেলে, হিসেবে মিলছে না বলেই মাথামুণ্ড থই পায় না কিছুর। রতন আষদের নাকি অবস্থা ভালো? জোতজমি আছে। নিজেদের হাললাঙল, নিজেদের চাষ। শরিকি হোক, ষোল-আনা হোক, পুকুরও আছে। গোয়ালঘরে দু-চারটে গাই-বাছুরও তো থাকবে তাহলে! তাই যদি হবে, ধানচাষ আর আলুর পয়সায় মেটেঘর পাকা-দালান হয় না কেন এদের? আবার মেটেঘরেও বিজলী বাতি জ্বলে? টিভি?

ঘরের ভেতর অন্য ঘর। গাঁয়ের ঘরে আরেক দেশগাঁ। টিভির 'বই'-এ এখন দুঃখু চলছে। বিয়েটা হবে কি হবে না? হিরোইনের বাপটা বড্ড হারামি।

টিভির দুঃখু বড্ড ছোঁয়াচে। বশ মেনে অবশ হয়ে আছে ঘরভর্তি এতগুলো জ্যান্ত মানুষ!

রাধার হুঁশ নেই। টিভি তুচ্ছ হয়ে গেছে। আজ আর দুঃখুফুখ্যু ছোঁয় না তাকে। পরের ঘরে সবার ভিড়ে বড আলগা-আলগা লাগছিল নিজেকে। এভাবে আলাদা হয়ে থাকাব অস্বস্তি যতটুকু, সুবিধেও অনেক। কারুর চোখের নাগালে সে নেই। সবাইকে সে দেখছে, যেমন করে তাব খুশি। সুখের ঢল নামছে গা-গতর্ ভেঙে। মগজেব ভাঁজে ভাঁজে সুখের ভোমরা হামা দিয়ে বেড়ায। দেশগাঁয়ে সেই বা ক্যালনা কী এমন। ভেতরে ভেতরে, মগজের কোষে কোষে বতন আষ এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকে। বাপঠাকুদ্দার ভিটেয় যে পড়ো-ঘবটুকু আছে তাদের, সেটা হেলে পড়ছে ঘুণধরা খুঁটির ভাঙনে। দু-তিন সন খড় ছাওয়া হয় নি বলে ফুটো হয়ে বর্ষাব জল পড়ে। ভাসিয়ে দেয় বিছানাপাটি মাটির-মেঝে। চাঁদনি রাতের আলো ঢোকে ঘরের ভেতর। মা, হারকেপ্পন বুড়ি, ঘব না সামলে ভাঙা-ঘবের মাচার তলায় মাটির হাঁড়িতে পাঁচ হাজার টাকার তাজা নোট জমিয়ে তুলেছে নগদা। এবং সে-কথা মনে হতেই শরীব ভবে রোমাঞ্চ তার। এ-তো আজেবাজে মিথ্যে কথা নয়। সত্যি, সব সত্যি। সাহেববাডিব রোজগার থেকে আরো কিছু টাকা যদি কামিয়ে আনতে পারে সে, যদি খড় ছেয়ে খুঁটি পাল্টে মাটি ফেলে ঘবটা পাকাপোক্ত করে গড়ে তুলতে পারে, ইলিকটিরিকের লাইট কেন যাবে না তার ঘরে? পড়ালেখা করে যারা, বিজলীবাতি শুধু তাদেরই জন্যে? পালানও তো ইশকুলে পড়ে।-ঘরে টিভির জন্যেও তো ইলিকটিরিক চাই। পালান ভাইয়ের জন্য প্রথমই এ-রকম ছোটমতো একটা টিভি কিনবে সে। কত কী জানা যায়, কত কিছু শেখার আছে টিভিতে! ক্রিকেট খেলা বলো, সিনেমা বলো, কত কী জানে সাহেববাড়ির দাদাবাবু দিদিমণিরা! পালানভাইও জেনে ফেলবে সব। চোখ টাটাবে পড়শিদের। বম্ মেরে যাবে গাঁয়ের তাবৎ মানুষ। দশজনের চোখ-টাটানিতেই তো ইজ্জত বাড়ে মানুষেব। সুখ।

কেত্তনের আসরে ভক্তরা যেমন, ঘর ভরে বাচ্চাবুড়ো জোয়ানমদ্দা ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে এক বগ্‌গা চোখ রেখে বুঁদ হয়ে ছিল। নড়াচড়া সাড়াশব্দ ছিল না কারুর। ববং বাইরের ঝিঁঝির-ডাক ব্যাঙের-ডাক ঝিরঝিরে বাতাসের শব্দ নিশুতির নিঝুমকে নিয়ে ঢুকে পড়ছিল ঘরের ভেতর। রাধা, যেন কিছুটা মনের জোরেই বশীকরণ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেশগাঁয়েরই ছবি দেখছিল।

বুঝি অন্য কোনো দেশ। তার অচেনা।

মাথার ওপর দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে কালো-কালো রবারেব নলগুলো কী? মেটেঘর তো সে আবো দেখেছে গাঁয়ে। বিজলী বাতি বা টিভিওলা মেটেঘব সে কোথায় দেখেছে বা আদৌ দেখেছে কি না মনে কবতে পারছে না ঠিক। এবং যখন ঠাণ্ডা ঘব কাঁপিয়ে আবাব ফেটে পড়ল গান, প্রিয় শিল্পী তার —হেমন্তকুমাব, বদ্ধঘরেব দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত উদাত্ত কণ্ঠের মাতাল উৎসবে তার শ্রুতি নেই, চোখ নেই। কিংবা চোখের দৃষ্টিটাই থেকে যায় শুধু। খুঁজে বেড়ায় ববাবের পাইপগুলো কেন? কী হয এগুলো দিযে? এবং খুঁজতে খুঁজতেই এক সময় সেই মেযে তাব নিজেব মতো কবে তালাশও পেযে যায একটা। অবিশ্যি যা সে বুঝেছে সেটাই সত্যি কি না, নিজেব কাছে সিদ্ধান্ত নেই। শুধোবাব জন নেই। কোথাও কেউ মাস্টারমশাই নেই তাব। অথচ পৃথিবীর হবেক জিনিস এভাবেই সে দেখতে দেখতে চিনে এসেছে এত কাল। বুঝে এসেছে। এবং এ-রকম আলগা-আলগা চেনাজানাই তার নিজেব সত্যি হয়ে উঠেছে এক সময। দেশগাঁয়ের মেঠো বাড়িতে কী ছাই দুটো-একটা ববাবের নল! সে-আব কতটুকু ভজকট ব্যাপার হতে পাবে? টিমটিমে যে-বাল্‌বটা ঝুলছে, পাইপ থেকে বেবিয়ে প্যাঁচালো দুটো তাব সেদিকেই গেছে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এবং ইলিকটিরিক লাইনের একটা নতুন কায়দা খুঁজে পাওয়া, বুঝি কোনো নতুন আবিষ্কারের মতোই একটা কিছু, দুটো চোখের চাউনি আরো ছুঁচলো হয়ে সবটাই বুঝে নিতে চায়। ওপাশে টিভিব দিকে কিংবা সাঙার তলায় কাঠের কড়ি বেয়ে একইভাবে পাইপটা পাখা ছুঁযেছে। রবারেব নল বেযেই বিজলী বাতিব তার যায নাকি গ এদের ঘরে? কেন? মাটির ঘব বলে?

ধাঁধা লাগে। মগজেব ভেতব শিরায় শিবায শুটিশুটি শুঁযোপোকা হাঁটে। মাথায পোকা ঘুরলে যা হয—ব্যামোটা শুধু মাথায় থাকে না, গোটা শরীরে চাবিযে গিযে ঝিম ধবিয়ে দেয়। ঘরের সবাই যখন টিভির মায়ায বুঁদ হয়ে আছে, এক জোড়া চোখ তাব বিজলী বাতির রকমফেব দেখে। বিজলী বাতি সুয্যির আলো নয়। ইলিকটিরিকেব জন্যে নগদা কড়ি ফেলতে হয়। দেশে দেশে শহরে-গাঁয়ে সবার ঘরে দেযালে-হামা-দেওয়া আলো জ্বালানোর নিয়মও আলাদা। বামুনবাড়িতে দেয়ালে-দেয়ালে উইচারা গোছেব লম্বা সিধে রুল টেনে টেনে বিজলী বাতির তাব গেঁথে নেবার কায়দা দেখেছে সে। সাহেববাড়ি আবো তাজ্জব। কোত্থেকে যে দেয়াল ফুঁড়ে সুন্দর সুন্দর বাহারেব সব দেযালবাতি টিউবলাইট পাখা বেবিয়ে এসেছে, আলোয় আলোয় ঘরবারান্দাসিঁড়ি ছযলাপ। টিভি ফ্রিজ গিজার কলিং-বেলের সুইচবোর্ড! কোথাও কিছু তারকার নেই! ঘরে ঘবে রঙেব বাহাব। রং-বাহারি আলোর ফিনকি। সুখেব মজলিশে ছায়া পড়ে না মানুষেব।

ঘোর কাটে না মগজের। পযসার ঘরেও গরিবগুরবো থাকবে গ এমনধারা? তবে কেন এত গুমর, দেশগাঁয়ে এমন মাতব্বরি রতন আষদের?

কালো-কালো রবাবের নল! উইচাবার দেয়াল! দেয়াল ফুঁড়ে আলো

রঙিন টিভি! শাদা-কালোয় বড় টিভি! ছোটমতো 'পোর্টেবেল'

চার-চাকার মোটরগাড়ি! দু-চাকার মোটববাইক! বিনি-তেলের সাইকেল

শহরেই থাকে কেউ। নিত্যি ডেইলি প্যাসেঞ্জারিতে শহরে গিয়ে চাকরি কারুর। জন্মে শহরে না গিয়ে শুধু গাঁয়ের চাষবাসেই কারুর মরণ

চিলিচিকেন ফ্রায়েড রাইসে মুখ মরে গেল কারুব ! কেউ দুধে-ভাতে থাকে। কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সায় সেই পোস্ত আর কলাইর ডালের পরমান্ন অনেকের। বড়জোর পুকুরেব মাছ গরুব-দুধ।

বাধাব বুক ভরে অঢেল নিঃশ্বাস। বাতাস অঢেল। নিশ্চিতই ভাবতে পারে— এক কুড়ি বয়স ছুঁতে এখনও যার অনেক বছর বাকি, সেই মেয়ে শুধু মেয়ে হয়ে, ঘুঁটে কুড়ুনি মায়ের মেয়ে হয়েও দেশপাড়াগাঁয়ে, এমন কি, অনেক কেষ্টবিষ্টু মোড়লমুরুব্বিদের বিষনজরে পড়ে গেছে সে। আসলে চোখ-টাটানি। কতগুলো গেঁয়োভূতের অকথাকুথায় গা-পোড়ানি জ্বালা। বাধা নিজে পোড়ে না। যারা পোড়ায়, তারা নিজেরাই দগ্ধায়।

গায়ে-গতরে মোচড় দিয়ে সামনেব দিকে তাকাল সে। ছাতা-পড়া কমজোরি বালবেব ম্যাটমেটে আলোয় বা টিভিব নীলচে আভায় লোকগুলোব ঝিম-মারা গা-ঘেঁষাঘেঁষিতে রাঙচিত্তির বা ফণিমনসা ঝোপের আদল। ঘাড় গুঁজে টিভি গিলছে সবাই। এক পাশে আলাদা হয়ে গিয়ে বাধা তার নিজের অবস্থান বুঝে নিতে শুরু করল। এখানে এদেব সঙ্গে বসে সে টিভি দেখবে কী? নিত্যিদিন আস্ত একটা টিভির ভেতরই সে থাকে সেখানেই আহাবনিদ্রা হরেক কাজ চটজলদি চটপট চটপট। রতন আষও তার চেয়ে এমন বেশি কিছু শাহানশা নয়!

সিনেমা হলের ইণ্টারভেল যেমন, ঘরভর্তি মানুষগুলোরও হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে চাগিয়ে-ওঠা। হৈহল্লায় মোচড় খেলো সবাই। উঠে দাঁড়িয়েছে অনেকেই। ঘাড়গর্দানায় ঘাম মুছছে। অনেকক্ষণ হালুম মেরে পড়ে থাকায় পিঠে হাঁটুতে পাছায় হাড়গোড়ে টনটন ব্যথা ধবে যাওয়ার টাটানিতে বুঝি একটু হাত-পা খেলিয়ে আড়মোড়া ভেঙে নেবার হিড়িক। ছায়াছবির শেষাংশ সংবাদের পর। অন্তত এটুকু সময়, ঘরের এক পাশে টিভির মায়া বন্ধ হয়ে যেতেই অন্য দিকে বাধাই যেন বিকল্প হয়ে উঠল বিনোদন বা বিস্ময়ের। নিদেন বেলাইনের গরমিলে ভিন্ন কিছু।

জোয়ানমদ্দা ছেলেগুলো পাশ কাটিয়ে যায়। নয়তো দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। ওদেব তেরচা চোখের ভাষা বোঝে বাধা। পাত্তা না দেবাব অছিলায় আবডালে ভ্রূ কাঁপাতেও জানে।

ধানের উঠোনে ঝাঁপিয়ে-নামা পায়রাব-ঝাঁক যেমন, মেয়েরা আছড়ে পড়ল গায়ে গলাব লকেট লাল পাথব সত্যি-সত্যি চুনি হয়ে ওঠে। শাদা দানা খাঁটি-খাঁটি মুক্তো আমেবিকা বোঝে না ওরা। রাধাও বোঝাতে পারে না, আমেরিকা সোনার চেয়েও দামি কত কথা কত জেরা-জিজ্ঞেস। রাধার প্রাণ জেরবাব। শালোয়ারকামিজের রংদার সিলকের তলায় মেয়েলি শবীরটা মেয়েদের খাবলানিতেই অস্থির হয়ে ওঠে। কী অদ্ভুত! কী বিদঘুটে কাণ্ড গ? হড়হড়ে সিলকের তলায়, পিঠে, ছোট-জামা আছে কি নেই, না কী এখনও টেপ-জামা? ওরা আলতো কবে টেনে টেনে দেখতে চায়— কিলিকিলি কিলিকিলিতে রাধা সর্বাঙ্গে ছটফটে কাঁপে। হাসতে পারে না। কেননা, গতর ভরে জ্বলতে হয় যন্ত্রণায় রাগে। সরে যেতেও মন চায় না। ওদের মুগ্ধতার টান। ভালোয়-মন্দয়

সোহাগে বিরক্তিতে শেষপর্যন্ত রাগই টিকে থাকে। এ-কী অসভ্যতা? হাতড়াতে হাতড়াতে প্যান্টিটাও খুঁজে পেয়ে গেছে একজন—'অ্যাঁ! তুই ঢুকে পড়েচিস র্যা ঠামার ঘরে? বুড়ির আবার এমনধারা ছোঁয়াছানির বাই...'

রাধা ঘাবড়ে গেল। সে জানে, দেশগাঁয়ের ঘরে অপবিত্তির হয়ে ঢোকার ঝকমারি। আত্মরক্ষায় প্রাণের আকুতি—'না না, সে-নয়-গ...'

গলার স্বর আটকে যায়। আপদবালাই মিটে যাবার পরও সে জানে না এখনও, সে শুদ্ধ কিনা। অথচ রেহাই পেয়ে যায়। আচমকা সত্যির হদিশ পেয়ে গেছে অল্প বয়সী বউ একজন—'এ-আবার কী গ? কেমনধারা ব্যাপার? ব্যাটাছেলে নিকি গ তুমি? পেন্টলুন পরো? নিকি ফুটবল খেলবে?'

'জাঙিয়া গ, জাঙিয়া। ইজের...'

ওদের হাসি-তামাশার মশকরা এমন কিছু মাবাত্মক ছিল না। তবু নাজেহাল রাধা গায়ের ওপর ঢলে-পড়া আদিখ্যেতাব ভিড় দু-হাতে সরিয়ে দিতে চায়। চুলোয় যাক তার টিভি-দেখা। মাথায় থাক ভালো-'বই'। এখন মানে-মানে পালাতে পাবলেই প্রাণে বাঁচে সে।

তিন-পুরুষের শিলনোড়া ক্ষযে ক্ষয়ে রোগাপ্যাংলা হয়ে গেলেও ভাবি পাথর যেমন পাথর হয়েই থাকে, কতগুলো খটমটে বুড়োবুড়ি থাকবেই দেশগাঁয়ের সংসারে। কুঁদুলি-ক্যাঁচালের ঘরে কে ডাইনি ছিল একজন। গলা বাড়াল—'হা র্যা পোড়াকপাল আমার! বাহারের সাজ দিয়ে টিকেয়-আগুনের পারা কার তরে জ্বলতে লেগেচিস ব্যা মুখপুড়ি? বলি, কার হুঁকোকলকেয় পুড়ে মরবি র্যা তুই?'

কী ভাষায এ-কোন্ কথা? কিছুই মানে বোঝে না রাধা। তাকায় এপাশ-ওপাশ। খোঁজে বউরাণীমাকে। ওকে টিভির ঘরে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়েছেন কোথায়! ভালোমানুষ কেউ নেই কাছেপিঠে? ভালোমানুষ থাকে না কোথাও।

'কচিকাঁচা ডাগর বয়সের নেশা ল তোদের। ময়ূবের নেত্য দেখে সাধ জাগে চিতে! ছাতারে পাখি! তা উযারও নাচনের মন লাগে। সব্বায়ের সব কি হয লা? নিকি সয়?'

রাধা শোনে অথবা শোনে না।

'কাকের ডিম শাদাই হয় র্যা আবাগি। নেয়ম। ডিম ফুটলে ফের সেই কাক...'

চৌকাঠ ডিঙিযে রাধা লাফ দিয়েছে ঘরের বাইবে। ব্যাটাছেলেরা দেখল সবাই। মেয়েবা পিছুটানে ধরে রাখতেও চাইল কেউ কেউ। পেছন থেকে ভাঙা কাঁসর বাজানোব ধাঁচে এক পাল মানুষের যত বেশি হাসির তাড়া, তার অঙ্গে অঙ্গে রাগের ফোঁসানি তার চেয়ে অনেক বেশি চড়ায় থরথরিয়ে কাঁপে। মাথার রগগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। ঘরের বাইবে বারান্দার তলায় উঠোন জুড়ে যেটুকু বিজলী বাতি ওদেব, সেখানে আলোর চেয়ে আঁধারই কামড়ে ধরে থাকে বেশি। সে-মেয়ে পরিত্রাণ চায। বাইরেব বারান্দায় তক্তপোশে শুযেবসে জিবোচ্ছিল যে-বুড়ো লোকটা, চৌকিদারি হাঁক পাড়ল—'কে র্যা? কে যায়?'

আমল দেয় না রাধা। ফিরে তাকাবার কারণই নেই কিছু। ছুটে ছুটে উঠোনেব

শেষে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়তেই এক ঝটকায়, ষণ্ডাগুণ্ডা বদমাশগুলো ঠিক যেমন করে লুটে নেয় সোমত্তা মেয়েমানুষদের, বিকট দত্যিদানোর আদলে একটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার লোপাট করে নিলো তাকে। সে বেমালুম আড়াল হয়ে গেল। নিজের কাছে নিজেই বেপাত্তা। লম্বা সুতোয় যে-মেঠো রাস্তাটা আছে বলেই জানা ছিল তার, সেটা নেই। অথচ চোখজোড়া এখনও মিথ্যে নয়। খুঁজে পায়— চুমকি সাজানো আকাশে লাখো-লাখো অগুনতি তারা জুলুজুলু করে ঠায় তাকিয়ে রয়েছে মাটির দিকে। আলোর ঢেউ-খেলানো জোনাকিরা দোল খাচ্ছে ঝোপেঝাড়ে। ঝিঁঝির-ডাক ব্যাঙের-ডাকের সত্যিটাই চিনিয়ে দেয়—কালাও সে নয়। এখনও দেখতে পায়, শুনতে পায়। কিন্তু মানুষ নেই। কাছেপিঠে আলো নেই। মানুষের আওয়াজ নেই। কালোয় কালোয় আঁধার-ভুবনে হারিয়ে-যাওয়া ছায়া-ছায়া ঘরবাড়ি গাছপালার জঙ্গলে গাঁয়ের নিশুতিতে তার নিজেরই হারিয়ে-যাওয়া তাকে হাহুতাশে অনাথ করে তোলে।

ঘুরঘুট্টি আঁধার পথে একা-একা বাড়ি ফেরার পথে ভয়ের দলাটা গলা অব্দি উঠে এসে খাবলে ধরে থাকে কণ্ঠনালীটা। জন্মের মাটি তার নিজেব মাটি নয়? হাঁক পাড়লে কেউ আসবে না আপনজন তার? আসবে যারা, গালমন্দ চিল্লানিতে লাথিই মারবে শুধু? কেন? কার কী ক্ষতি করেছে সে? কার বাড়া-ভাতে ছাই ফেলতে গেছে? নিজের রোজগারপাতিতেও দোষ?

সুতরাং বুকের পাথবে কান্নাটা থাকে। থেকেই যায়। কিন্তু হাজারগণ্ডা ফোঁপানি নিয়েও তো রেহাই নেই। ঘরে ফিরতে হবে বলেই পা ফেলতে হয় যাকে, পা-ফেলার রাস্তাটা চোখে দেখা যাচ্ছে না বলেই যাকে হাবুডুবু খেতে হয় আঁধারে-আঁধারে, সে তার বাঁ-দিকে মেঠো রাস্তাব বাঁক থেকে দূরে সরে আসে। ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে কাঁচা-রাস্তাটাই যদিও তার ঘরে-ফেরার সহজ পথ, সে যাবে না ওদিকে। বরং মন্দিরবাকুলের ওপাশ দিয়ে অনেক বেশি ঘুরপথেই এগোবে পায়ে পায়ে। পঞ্চায়েতের মোরাম-বাঁধা চওড়া রাস্তাটা সেই ফিডার রোডের মোড থেকে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেক দূর। গাঁয়ের একমাত্র রাস্তা, যেখান দিয়ে বস্তা-বস্তা ধান নিয়ে, খড়ের-বোঝা নিয়ে লবি ঢোকে লবি বেরোয় গাঁ থেকে, ট্রাক্টর অব্দি ছোটে দিনভর। সাইকেল- মোটববাইক তো আছেই। পায়ে-হাঁটা দু-চারজনের চলাফেরাও থাকে অনেক রাত অব্দি। সেখানেই রাস্তাব দু-পাশে গাঁয়ের পয়সাওলা লোকদেব পাকা দালানকোঠা, গুটিকয়েক দোকানপাট। শালকাঠেব লাইটপোস্টে আঁধাব-ঘোচে-না এমন আলোআঁধারি বাতে একা মেয়ে সে! ওদিকের পথেই তো সে যাবে। গরিবগুববো হাভাতে মানুষদের পাড়াগুলো যে কী। ঘুঁটেগোবর জলাজংলায় পচা-পচা বিচ্ছিরি।

ঘব! বাপঠাকুদ্দার ভিটে? রাত হয়েছে অনেক। ঘরের কথা মনে এলেও ছুটে ছুটে যেতে ভরসা হয় না। লম্বা লম্বা পা ফেলতেও শুকিয়ে আসে গা-গতব। কিংবা ঘরের ভাবনাই তাকে দেহভারের আলসেমিতে অবশ করে তোলে। কোথায় যাচ্ছে সে? অথবা যেখানে গিয়ে পৌঁছবে বলে এত যে ছুটে-চলার তাড়া, সেই আঁস্তাকুড়ে ঘরটার কথা মনে হতেই গোটা শরীরের হাড়মাস রসপিত্তিরক্ত দলা পাকিয়ে সিঁধিয়ে আসে বুকের খাঁচায়। বাপঠাকুদ্দারা কে কোথায় কবে ছিলেন বা আদৌ কেউ ছিলেন কিনা

কোনোকালে, কিছুই জানে না সে। পুরো এক শতক জমিও হয়তো নয়। গাঁয়ের সামন্তিপাড়ায় তার জন্মের আগে থেকেই যে-জমিটুকু বরাদ্দ হয়ে আছে মা-ভাই আর তার জন্যে, সেখানে একটাই মাত্র ঘর! পাখির বাসারও অধম সেটা, কোনো ঘরই নয় আসলে। সাহেববাড়ির বাঘার ঘরেও এর চেয়ে অনেক বেশি আলোবাতাস। বামুনবাড়ির গোয়ালও এর চেয়ে অনেক বড়। কালেভদ্রে গাঁয়ে এলে কোনো রাতেই ভালো ঘুম হয় না তার। অসহ্য গুমোট।

মোরাম-রাস্তার নিশানায় এগোতে এগোতে মাথা তুলে মস্ত আকাশ জুড়ে অগুনতি তারা দেখল সে। কালো চাদরমুড়ি তার গাঁ। অথৈ আঁধার-পাথরে ছলাৎ-ছলাৎ করতে থাকে হাড়পাঁজরা। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাঁপায়। নিঃশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পায়। লম্বা আকাশের যেকোনো একটা তারার মতো ছোট, কিংবা বিশাল পৃথিবীতে এক রত্তি একটা জোনাকির আদলে তুচ্ছ, এক ফোঁটা ক্ষুদে একটা ঘর আছে তার। ওই ঘরটুকুই সত্যি। ভিখিরির ক্ষুদকুঁড়া ওই ঘরটুকুও যদি না থাকে, কুটো-থালা এই দেশগাঁও যে কিছুই থাকে না তাহলে! অথচ এখানেও মা আছেন একজন। একটা ভাই।

রাত হয়েছে অনেক। 'বাংলা সংবাদের' পর ঘরে-ঘরে টিভির বাংলা-বইও ফুরিয়ে এসেছে বোধ হয়। গা-ছমছম নিঝুম ডিঙিয়ে আঁদাড়পাঁদাড় সেই ঘরে এসে পৌঁছল রাধা। আকাশ থেকে খসে-পড়া কোনো নক্ষত্র নয়। বরং আঁধারের মাটিতে উল্টেপড়া জোনাকি পোকার মতোই ঘরের দাওয়ায় লম্ফটা জ্বলছিল। মেঝেতে কোমর ভেঙে বসে ইশকুলের-পড়া করছিল পালান। দিদিকে দেখেই লাফিয়ে উঠল—'কোথায় গিছলি র‍্যা তুই দিদি? মা তোকে খুঁজে খুঁজে আলা...'

সাড়া নেই রাধার। উঠোন থেকে দাওয়ায় উঠে এল—'মা কোথায়?

আলোআঁধারির ছায়ায় রাজকন্যের বসনভূষণে কেমন পরমাসুন্দরী তার দিদি! মুগ্ধ চোখ ঝলসায় পালানের। অকারণেই ভয়ার্ত গলা—'বামুনবাড়ি থিক্যে রাগ করে পাইল্যে এয়েচিস তুই? ঘরে ফিরিস নি দেখে মা ফের বেরুল তোকে খুঁজতে...'

দাঁতে দাঁত চাপল রাধা। যে-আঁধার পেরিয়ে তার ঘরে-ফেরা, এবার সেই কালনিশুতি আরো বেশি ভয়াল হয়ে ওঠে। কোথায় গেল বুড়ি? এত বড় গাঁয়ের ঘরে-ঘরে এই রাত্তিরে কোথায় খুঁজবে তাকে? রতন আষের বাড়ি? মাথায় আসবে কখনও? পড়ালেখার চল নেই যে-ঘরে, হাঁড়ি ফাটে যার নাম করলে—তার ঘরে যাবে মেয়ে?

এজমালি উঠোন ঘিরে পড়শিদের ঘরদোরে সাড়াশব্দ নেই কারুর। এপাশে পয়সার গন্ধ বুঝে দল বেঁধে আলাদা হয়ে গেছে সবাই। বিপদেআপদেও ডাকখোঁজ করবে না কেউ? অন্ধকারের ছায়ায়-ছায়ায় স্বজনস্বজাতির কালো-কালো ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে রাধা অসাড় হয়ে এল। বড় বড় গাছের তলায় মাটির টিপি গড়ে ডেয়ো পিঁপড়েদের কামড়াকামড়ি মারামারি বা গায়ে-গা-লেপটানো ঘরগেরস্থালি যেমন, এখন নিজের নিজের গর্তে সিঁধিয়ে সবাই চুপচাপ। কিন্তু সে জানে, আড়াল-আবডাল থেকে কেউ কেউ তার দিকে ওত পেতে আছে নির্ঘাৎ। পয়সার-ঘরে অমঙ্গল দেখলেই বড় আহ্লাদ লোকগুলোর।

'আমি যাব র‍্যা দিদি?'

'তুই যাবি? কোথায়?'

'মাকে খুঁজে নিয়ে আসব।'

'এই এত রাত্তিবে ফেব যাবি তুই?' থেমে গেল রাধা। টিকটিকির মুখে পড়ে আরশোলার ফড়ফড়ানি যেমন করে মিইয়ে আসে, একই ভাবে আস্তে আস্তে গলাব স্বর খাটো হয়ে এল। আনমনা চোখজোড়া পলক না ফেলে অনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে স্থির হয়ে যায়। হদিশ থাকে না নিজের কাছেই, যখন লম্ফর লালচে আলোর বাইরে জগৎসংসারের কালোয় কালোয় চোখের দৃষ্টি এগোয় না বেশি দূর। অন্ধ দুটো চোখ...

'যাব র‍্যা দিদি? যাব আর আসব। বামুনবাড়ি যাব পেরথম। সেখেনে না পেলে মিত্তিরবাড়ি হালদারবাড়ি, কালীজেঠুব ঘর...'

'না না, কোথাও যাবি নি তুই। মা...সে-এসে যাবে খন। তুই পড়...' মাথায় প্রায় সমান সমান ভাইকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে রাধা। সে হঠাৎ সাবালিকা, হঠাৎ-ই গার্জিয়ান। বাইরের করাল কালোয় উদাস দৃষ্টি রেখে, কী মনে হলো, বিড়বিড় বিড়বিড়—'ভালো করে পড়লেখা কব দিকিন তুই। আমার গতব পুড়িয়ে সব দেব ব্যা তোকে। তোর পড়ালেখার খরচাপাতি সব...'

গলার স্বর খাদে ছিল অনেকটাই। একেবারে তলানিতে ফিসফিস ফিসফিস। তবু প্রতিধ্বনি কাঁপে। পড়শিদের ঘরে কোথায় একটা ট্র্যানজিস্টারে গান বাজছিল। ঝিঁঝির ডাকের চেয়ে উচ্চকিত কিছু নয়। পায়ের কাছে এক ফোঁটা একটা লম্ফব লতপতে শিখা বাঁদিকে হেলে পড়ে বাঁশের ডগায় ঝাণ্ডার মতো উড়ছে বাতাসে। পতপত পতপত। ছটফট করছে এপাশ ওপাশ। গা-ঘেঁষাঘেঁষি এবড়োখেবড়ো মাটির দেয়ালে ওদের ভাইবোনের ছায়াদুটো দুলছিল। কিন্তু ওরা নিজেবা কাঁপছিল না। ওটুকুন আগুনের শিষ! পলক না ফেলে তাকিয়ে ছিল বাধা। ভয়ে কাঁপুনিতে বুকের মধ্যে তোলপাড় ছিল। চারপাশের গাছপালার দাপটে হাওয়ার তোড বাড়ছে কমছে। টিকে থাকার জন্য লড়তে লড়তে যদি ওটুকুও নিভে যায়? ওদের ভাইবোনের ছায়াদুটো কাঁপবে না। সবটাই লোপাট হয়ে যাবে আঁধারে আঁধারে।

যেন জগৎজোড়া আঁধার-সমুদ্দুরেই ডুব-সাঁতারে তলিয়ে আছে সে। যেখানে চোখ মেললেও পৃথিবী নেই। আকাশে নক্ষত্র খোঁজে রাধা। দুনিরীক্ষ্যে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উদাস গলার স্বর—'তুই সাহেব দেখেছিস ব্যা ভাই?'

'সাহেব?' পালান দিদির দিকে তাকাল। আজব ধাঁধায়—'ধ্যাৎ, সাহেব দেখব কী? গাঁয়ে আসেন নিকি ওঁরা কেউ?'

'কেনে?' রাধা ক্ষেপে গেল—'সেই সেবাবে দাদাবাবুর পৈতেব সমে আমাদের ওখেনে যাস নি তোরা? সাহেবকে দেখিস নি তুই? দাদাবাবু-দিদিমণিবা কেমন ইংজিরি ঝাড়ে, শুনিস নি? দেখিস নি তখন?'

'ব্বারে, ইংরেজি জানে ত কী হল? সে-ত আমিও পড়ি র‍্যা। দেখাব? দেখবি আমার ইংরেজি বই?'

'কী বলছিস? পাগল নিকি র‍্যা তুই?' ঝড় নয়, আচমকাই বড় দামাল হয়ে উঠল বাতাস। লম্ফটার একরত্তি শিষটুকু এক দিকে হেলে গিয়ে, যুদ্ধু করতে করতে, যখন আর টিকিয়ে রাখতেও পারছে না নিজেকে—অন্ধকার, ঘনঘোর আঁধার নিশায় পুরোপুরি মিশে যাবার আগে রাধা তার গায়ের খাঁজেখুঁজে চামড়ায় চামড়ায় লেপটে-যাওয়া সিলকের চুড়িদার দু-হাতে থাপড়েথুপড়ে নিজেই বেসামাল। নিঃশ্বাসের হাঁসফাসে—'যা-নয়-তাই আবোলতাবোল কী-সব বলে যাচ্ছিস র‍্যা তুই? ইংজিরি বই দেখাবি কী। সে-আমি বুঝি নিকি? তাই বলে তোর পড়া আর দাদাবাবু-দিদিমণিদের পড়া এক হল র‍্যা? ওদের পড়ালেখায় কত ট্যাকা লাগে, জানিস? কত বড়-বড় গাড়িবাড়ি সব চাই। গাঁয়েব ছেলেরা সাহেব হতে পাবে কখনও?'

হাঁ হয়ে তাকিয়ে ছিল পালান। ভেড়া বনেই থাকে। সাহসও নেই মুখ ফুটে কিছু বলাব। দিদিই তো ভাতকাপড়। দিদিই গাজ্জিয়ান। এবং যখন দেখল, বন্ধ-দরজার ছিটকিনি খুলতে দরজার মাথায় হাত তুলেছে দিদি, সে উথলে উঠল—'সাহেবরা ত আমাদেব দেশেও ছিল র‍্যা দিদি। সে-ত অনেক কাল আগে। ওরাই ত ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিয়েছিল। আরো কত ভালো-ভালো লোকদেরকে মেরে ফেলেছিল ব্যা আমাদেব দেশের...'

'এম্‌মা সে-কী? কি বলছিস যা-তা? সাহেবরা ফাঁসি দেবে কেনে? চাকবি দেয...'

পালান জবাব জানে না এবপর। বাচ্চা ছেলে সে! তাছাড়া তার ইতিহাস-ভূগোলেব বইগুলোও, ঠিক তারই মতো এমন সরু-সরু আর পুঁচকে, সব কথা লেখাও থাকে না ওতে। এই ব্রহ্মান্ডজোড়া মস্ত আঁধাবে ওদেব এক ফোঁটা লম্ফটুকুও যেমন ফালতু, একেবারেই খামোকা। হঠাৎ ঝপ কবে মেঝের ওপর হাঁটু উঁচিয়ে বসে পড়ে ছোট ছোট দুটো হাত বাড়িয়ে, বুক পেতে বাতাস আগলে সে এখনও লম্ফটুকু বাঁচিয়ে বাখতে চায়। মা ফেবেন নি এখনও।

দুটো পায়ের গোড়ালি সামান্য উঁচিয়ে টানটান শিরদাঁড়ায় ডান হাত তুলে দরজার মাথায় ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছিল বাধা। দাঁতে দাঁত চেপে ছিল। আগুনে-আগুনে পুড়ছিল গা-গতর। দরজা খুলে সোজা পায়ে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুঞ্চনে পিছু ফিরে তাকাল। কুৎসিত খ্যাঁকানি—'গাঁয়ের মুখ্যু কুচুটে বুড়োবুড়িগুলোর মতন তুইও এমনধারা বলবি র‍্যা ভাই? এই...এই তোর পড়ালেখা র‍্যা? এমনধাবা কথা সব শেখায় তোদেব ইশকুলে? যাঁদেরটা খাচ্ছিস-পচ্ছিস, তাঁদেরকেই বলবি খুনে-ড্যাকাত? মানুষ মারে ওবা? জানিস, সাহেববাড়িব সব্বায কত ভালো! শুধু খাওয়া-পরা কি র‍্যা? এটা-ওটা আবো দশ রকমের কত কি পাচ্ছিস, বল্ দিনি...'

লম্ফটা নিভে গেল। আকাশ-মাটির সব রং মুছে যেতেই ঘবে-বাইরে একাকার ঘুটঘুট্টি আঁধারে যখন আর আলাদা করে কেউ নেই, কিছু নেই, মেটে-দেয়ালের খাঁজে হাতড়ে হাতড়ে একটা দেশলাই খুঁজে যেতে থাকে পালান। ছিল একটা। গোটা কয়েক কাঠিও ছিল। এখনও থাকবে নিশ্চযই, যেটা এভাবেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেতে হবে। নয়তো মেঝে থেকে লম্ফটা খুঁজে-পাওয়া যায়। অনেক সহজ। ওপাশে বড়জেঠুদেব ঘরে আলোটা জ্বলছে এখনও। পলতেটা একটু ছুঁয়ে আনতে হবে। এমন আঁধার-বাতে ভয় পাবে দিদি। অভ্যেস নেই।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। কানে-কানে গান-শোনার যন্ত্রটা তোর জন্যেই এনেছিলুম র‍্যা। সে-আর কী হবে? সাহেববাড়ির বাসে তোদের সব্বায়েরই যদি এমনধারা নাক-সিটকনি, থাক তবে। সে-আমি ফিরিয়ে নিয়েই যাব...'

কাকে বলছে সে এত কথা? অন্ধকারে কোথায় পালান? পালান নামে আদৌ কেউ কাছেপিঠে আছে-কি নেই ভ্রূক্ষেপশূন্য রাধা নিজের মনেই বকতে বকতে রাগে দুঃখে তাপে দমকা বাতাসের চেয়েও অনেক বেশি ঝোড়ো ঝাপটায় ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। প্রথম ধাক্কায় ছুঁচোইঁদুর আরশোলা বা অনেক কালের পুরনো তেল চিটচিটে কাঁথা বালিশ নয়তো সাতরাজ্যি ঘুরে কুড়নো-জোটানো হাজাবগণ্ডা হাবিজাবি জঞ্জালের বোঁটকা গন্ধ বাস্তব অথবা বিভ্রম, যাচাইয়ের আগেই অনভ্যাসেব নাকে মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে ওঠে, সত্যিটাই মিথ্যে—এই তার ঘব? ঘবটা সত্যি। এবং অন্ধকার? অন্ধকার কত ভয়ঙ্কর হতে পারে? ইঁদুরের-গর্ত গোছের একটা খোঁদলের ভেতর জমাট-বাঁধা কালো ঘুবঘুট্টিতে নিজেরই চোখজোড়া অন্ধ হয়ে এলে গোটা শবীর ভেঙে একটা কান্না ঝাঁপিয়ে নামে। বুকের ভেতর সে আর কালো মেঘ নয়, অঝোর বর্ষণ।

ঘবে একটাব বেশি দুটো লম্ফ নেই। বাইরের দাওয়ায় ভাইয়ের পড়ালেখার আলো দপ কবে নিভে যাবাব পর অমাবস্যার যে-মস্ত আকাশটা ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে, বুঝি সেই আঁধারের জন্যেই কাঙালপনা ছিল তার। টিনের কৌটোকাটায় মুখ এঁটে পবম ধন কিছু লুকিয়ে রাখার মতো সে নিজেকে আড়াল রাখতে পারে এই আঁধারে। নিজের মতো করে একা-একা কাঁদতেও পারে কিছুক্ষণ। নিজের গাঁয়ে আপন ভুবনে স্বজনস্বজাতির ঘরে বুঝি তার চোখেব জলও বিশ্বাস করবে না কেউ? কিন্তু ঘরে-ঘরে কোথাও গিয়ে মিছে কথা সে বলে নি কিছুই। সেই ছোটবেলা থেকে যা সে দেখেছে এতকাল, চিনেছে বুঝেছে যতটুকু—তাব দেখা তার চেনা তার জ্ঞানগম্যির কথাগুলোতে এমন কি দোষ, কিছু বলতে-কইতে গেলেই খ্যাঁকখ্যাঁক করবে সবাই? গালমন্দ দুড়দাড় করে তাড়িয়ে দেবে ঘব থেকে? কেন? মুখ্যু বলে কি কিছুই শেখার থাকতে পারে না মানুষের?

চুলোয় যাক শালোয়ার-কামিজের ঠাটবাট ইস্তিরি, গলায় ঝোলানো আমেরিকা, রং-করা মুখের জেল্লা। মেঝেতে দাঁড়িয়ে থেকেই খাড়াখাড়ি উপুড় হয়ে পড়ল ঘরের একমাত্র শয্যায়। পা থেকে কোমর অব্দি বাইরেই থেকে যায়। কোমর থেকে সমকোণে বেঁকে বুকপেট, দুটো হাত আর মুণ্ডুটা কালকিষ্টি নোংরা কাঁথায় লেপটে গিয়ে ছারপোকা আর গন্ধিপোকার বিতিকিচ্ছিরি গন্ধে মাখামাখি। হঠাৎ আছড়ানিতে বাঁশের মাচা কড়কড়িয়ে উঠল চারপাশ থেকে। হুঁশ নেই রাধার। বুক উজাড় করে এবার তার হু-হু কান্না। আঁধার ঘরের কান্নায় কুটনো কাটাব মতো নিজেকে বঁটিতে ফেলে নিজেকেই কুটতে কুটতে গা-পোড়ানি জ্বালায় গোঙায় সে-মেয়ে—দেশগাঁয়ে থাকলেই কুঁতিপাড়ার সামন্তিপাড়ার ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে সে। পয়সায় খাটো। জাতে ছোট। কিন্তু

শুধু তো একটা শালোয়ার-কামিজই নয়। মেয়েদের হাউসকোট জানে রাধা। নাইটি চেনে। ম্যাকসি তার নিজেবই আছে। মিডিস্কার্ট জানে, স্কার্ট ব্লাউজ জানে। চুড়িদার

কামিজ ধোতি-শালোয়ার ব্যাগিশার্ট ব্যাগিপ্যান্ট শ্ল্যাকস্ পেডাল-পুশার শারারা ঘাগরা কুর্তাচুন্নি মেখলা বুকো সব চেনে

নাইলন কটন লিনেন টেরিলিন রেয়ন শিফন পলিয়েস্টার স্ট্রেচলন কর্ডুরয় স্টোন-ওয়াশজিনস দূর থেকে দেখে বা আঙুলে ছুঁয়েই বলে দিতে পারে

ফেস-পাউডার বডি-পাউডারের তফাত জানে সে! ময়শচারিং লোশন জানে। অ্যাসট্রিনজেন্ট আইশ্যাডো আইলাইনার লিপপেনসিল লিপস্টিক ল্যাকার শ্যাম্পু থেকে কাজল মেহেদি বিন্দি সবই তার চেনাজানা হাতের-পাঁচ

টিভি ভি. সি. আর. টেপরেকর্ডার টু-ইন-ওয়ান ওয়াকম্যান

অষ্টপ্রহর তার গ্যাসের উনুন আর ফ্রিজ তো থাকবেই। হটপ্লেট হিটার মিক্সার গ্রাইন্ডার ক্যাসারোল অ্যাকুয়াগার্ড গিজার সব কিছুতেই তার হাত

কর্নফ্লেক্স কাস্টার্ড চিজ পনির ফিসফ্রাই এগ-মটন-চিকেন রোল চিলিফিস চেনে রাধা

চিকেন-বিরিয়ানি চাউচাউ ফ্রায়েড-রাইস রাঁধতে জানে একার হাতে

টেলিফোনে 'হেলো' বলতে শিখেছে সে। এক দুই তিন চার... গুনে গুনে চাকতি ঘুরিয়ে লাইন পেতেও জানে। গ্যাস-উনুনের সিলিন্ডার পাল্টানো তারই কাজ। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার জলভাত

গোয়ালের হাবাগোবা বোকা গাই-বাছুরকে পোয়াল দেওয়া নয়। ডোবারম্যান বাঘাকে যত্নআত্তি প্রতিদিন

খড়ের চালে লাউ-কুমড়ো বা বাঁশের মাচায় ঝিঙে, শশা নয়। তিনতলার ছাদে টবে টবে গোলাপ, ডালিয়া, জিনিয়া, সূর্যমুখীদের লালন-পালন নিত্যিসেবা

গাভাসকারকে চেনে রাধা। কপিল, আজাহারউদ্দিন, ইমরান, শচীন তেন্ডলকার, চিমা, বিকাশ, কৃশানু, মহিদুল, আকিল আনসারি— ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান জানে

দাদাবাবু দিদিমণিদের ঘরে ঘরে আলমারির কাচে জানালার শার্সিতে দেয়ালে দেয়ালে সাহেব-মেমসাহেবদের কত যে রংদার স্টিকার। ছবি দেখলেই আন্দাজ করতে পারে কে কোনটা— ভিভ রিচার্ডস, বোথাম, বরিস বেকার, মনিকা সেলেস, পেলে, মারাদোনা, গুলিত

হিন্দি 'বই' বাংলা 'বই'য়ের নামীদামি আক্টিসরা সবাই তার চোখের মণিতে বুকের পাঁজরায় মাথার ঘিলুতে ভেসে বেড়ায় সারাক্ষণ। তাকে পাগল করে রাখে

লতা মুঙ্গেশকার, মহম্মদ রফি তার আহারনিদ্রা। হেমন্তকুমার, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে, অনুরাধা পাড়োয়াল, কুমার শানু কানের ঝিঁঝিঁ। যখন গান বাজে না, তখনও সুর বাজে মগজের কুঠরিতে। দাদাবাবু-দিদিমণিদের ঘরে ঝমঝমাঝম সাহেবি গান, বিলিতি বাজনা। নামধাম জানে না রাধা। দিনভর রাতভর চিৎকারে-চিৎকারে আওয়াজে সাহেববাড়ির ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, ছাদ, দেয়াল জানালা দরজা কাঁপে থরথর থরথর। বোঝা বা না-বোঝার কিছু নেই। না-বোঝার সুখ— শুনশান ফাঁকা মাথার খুলি ঠুকরে ঠুকরে কতগুলো পায়রা ডানা ঝাপটায় ঝটাপট ঝটাপট।

আজ বাদে কাল শহরে ফিরে গেলেই সুখের ভুবন পেয়ে যাবে যে-মেয়ে, সে

কেন কাঁদে তার নিজের ঘরে একা? ঘুরঘুট্টি আঁধার রাতের পাপ। শহরে অমাবস্যা নেই। চাঁদনি রাতের আকাশও কেউ দেখেনি কোনোদিন। তবু পূর্ণিমা। শুধুই পূর্ণিমা।

কিংবা নিরক্ষর জানে না অক্ষবমালা।

'শিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বোঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।'

শতাধিক বর্ষ পূর্ববতী ঋষিবাক্যে যদি মাথা কুটে মরতেই হয় রাধাকে, মনীষী বচনে এ-ও তো সত্য—'সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়।'

রাধা তাই তো চেয়েছিল। দেশদুনিয়ার রং বদলে যাচ্ছে দ্রুত। নতুন দিনের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের বার্তা নিয়ে সে এসেছিল স্বজন-স্বজাতিদের দোরে। বেচারিব মরণ সেখানেও।

বালাই ষাট। মরণ কেন হতে যাবে এটুকুন বাচ্চা মেয়েব? জাল ছিঁড়ে ফসকে যেতে পাবলেই জলের মাছ যেমন করে পেযে যায় সন্তরণেব অথৈ পাথার, কলকাতায় ফিরে এসেই হাত-পা-খেলানো নিঃশ্বাসের উদ্যান পেযে যায রাধা। সাহেববাড়ির ভাতে রস অনেক বেশি। খাটাখাটুনি যা আছে, মেয়ে হয়ে জন্মালে, সে-তো করতেই হয় সংসারের জন্যে।

সাহেববাড়িতে সারাদিন উৎসব আজ। জোড তোডজোড সকাল থেকেই। ক্রিকেট। একদিনের খেলা।

শুধু তো আজই নয। শীতেব মরশুম শুরু হতে না হতেই মাসখানেক হলো, দিন নেই রাত নেই, সারাক্ষণ শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট—ক্রিকেটের গপ্পো, ক্রিকেটেব হল্লা, ক্রিকেটেব বড়দিন, ক্রিকেটের পৌষপার্বণ। রাত্তিরে খাবার-টেবিল ছেড়ে উঠতেই চান না কেউ। দাদাবাবু-দিদিমণিদেব হল্লা-চিৎকারের মধ্যে বাশভাবি মানুষ সাহেব নিজেও থাকেন। মা তাঁব সংসাব ভুলে যান। এমন তালগোলেব কাড়ানাকাড়ায় সবার সঙ্গে থেকে, বুঝে বা না-বুঝেই জ্যান্ত ব্যাট বল বা মাঠ থেকে দূরবর্তী অবস্থান সত্ত্বেও শুধু ঘবে বসে খেলা দেখতে দেখতে রাধা লাখো-লাখো খেলা-দেখিয়ে খেলুড়েদের একজন হয়ে ওঠে। সুখের অন্ত নেই। এমন খেলাব যুদ্ধ ফি-বছর শীতেব মরশুমে।

সাহেবদের দেশ থেকে খোদ সাহেবরাই এসেছেন এবারেব শীতে। এঁদের কথাই বলেছিল পালান? গাঁয়েব ইশকুলে পড়ে কতটুকু আব জানবে এটুকুন একটা ছেলে? ভুল জানে। মুন্নিদিদি বলেছে—এঁদের সঙ্গেই নাকি পলাশী না কোথাকাব কোন্ মাঠে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল আমাদেব। টিভিব মাঠে আজ পলাশীর বদলায ক্রিকেটের যুদ্ধ।

মনে মনে যতই আইঢাই থাক, সাবাটা দুপুর ঘবে বসে বসে যুদ্ধ দেখার অবকাশ নেই রাধার। ঘরে যুদ্ধ ঢুকলে, যুদ্ধটা তাকে একাই লড়ে যেতে হয়।

ইশকুল কলেজে আজ আর যাবে না কেউ। মা নডবেন না খেলার-মাঠ ছেড়ে। যূথিমাসির সঙ্গে সাবাক্ষণ রান্নাঘরে থাকতে হবে রাধাকে। এর ওপর তার নিত্যিকাব

কাজকম্মো—ঘরে-ঘরে বিছানা-তোলা, ঘরদোরেব ঝাড়পোছ-মোছামুছি, বাসি-কাপড় কাচাকাচি, বাঘার যত্নআত্তি সবই থেকে যায় যথারীতি। অথচ সকালবেলা এমনিতেই কাজের চাপ এত বেশি, একটু দম নেবারও ফুরসত থাকে না কারুর। ঠিকে-ঝি ববির-মা থালাবাসন মেজে, আব-সব কাজ সেরে চলে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে বোঝাই-বোঝাই হাটবাজাব এনে বান্নাঘরের মেঝেয় ফেললেন নন্দদা। কিন্তু কি দিয়ে কী হবে, কেমন কেমন হবে—বলে দেবাব কেউ নেই। বেড-টি জলখাবারের পর যূথিমাসি নাজেহাল। আজ আবাব টিভির-মাঠের লাঞ্চ-আওযাবেই সকলেব খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু তাব আগে সাহেবকে আপিশে পাঠাতে হবে। সেখানেও হাজার বায়নাক্কা।

দেখতে দেখতে বেলা চড়ে গেল। দশটা বেজে গেছে কখন! খেলাও শুরু হযে গেছে। অবাক কাণ্ড! সকাল নটা সাড়ে-নটায ঘব ছেড়ে বেরিযে পড়ার কথা যাঁর, সেই সাহেব নিয়মমাফিক সব কাজ সেরে, স্নানের পবও পাযজামা-পাঞ্জাবিতে বসে গেলেন টিভির সামনে। টসে জিতেও ব্যাট নিয়েছে আজাহারউদ্দিন? পলাশীর যুদ্ধের বদলা নেবার ঝুঁকিতে এ-রকম জটিল একটা সিদ্ধান্ত গোটা দেশ জুড়ে তাবৎ মানুষজনকেই আটকে দিয়েছে চুম্বকিতে।

একই ভাবে আটকে গেছে যূথিকা। সাহেবেব জন্য বান্নাবান্নাব নিযম আলাদা। সব কিছু খান না। মশলাপাতি থাকবে না। অথচ সুস্বাদু হতে হবে। মা নিজে দাঁড়িযে থেকে সে-রান্নায তদারকি করেন প্রতিদিন। আজ সময় দিতে পাবেন নি। একবাব ঘুরে গেছেন মাত্র। বাসমতী চালেব ভাত থেকে ভাজাভুজি তবিতবকাবি হযে মাছমাংস পর্যন্ত সাহেব যা খাবেন, যেটুকু খাবেন সবই হাতে-হাতে গবম হতে হবে। সব শেষে একটু চাটনি, একটু টক দই। কিন্তু ভোর থেকে যাঁব জন্য এত পরিশ্রম, তিনি নিজেই যদি খিদেতেষ্টা মনে না রাখেন, বাদবাকি হাতে-গবম সবই যে জুড়িযে টাল হয়ে যেতে পাবে—সেটা দেখছে কে? শুধু একজনেরটা গরম বাখার হাপিত্যেশে বসে থাকলে আর সকলেব বান্নাবান্নাই বা হবে কখন? কী করবে রাঁধুনি?

দুজন জুনিযার এসে বসে আছেন নিচেব আপিশঘরে। সাহেবের সঙ্গে যাবেন।

বৈজনাথ এসে গ্যাবেজ থেকে গাড়ি বের করে হাতে-হাতে শুধু খৈনি ডলে যাচ্ছে রাস্তায়। গাড়ি যে চালায, সে নিজে তো চলে না। সাহেব চলতে চাইলেই গাড়ির চাকা ঘুববে। ড্রাইভার—গাড়ির পঞ্চম চক্র।

শুধু একজন, শুধু সাহেবেব জন্যই ব্রেকডাউন গাড়ির মতো থেবড়ে বসে গেছে এত বড় সাহেববাড়ি। অভাজনবা জানে বা জানেই না—শুধু তো সাহেববাড়িই নয়, তামাম ভারতবর্ষ জুড়েই এখন এক অত্যদ্ভুত অলস নিশ্চল দ্বিপ্রহর। সুদূর বোম্বাই মহানগরীর ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামের অন্তর্বর্তী সীমানাই এই মুহূর্তে সমগ্র ভাবতবাষ্ট্রেব বাজধানী।

শ্রমদিবস বোঝে না বাধা। তার বিনষ্টিরও হিসেব জানা নেই। মালিক মহাজনবা সকলেই যদি টিভির-মাঠে, সংসার-রক্ষায় সচল থাকতেই হয় অধস্তনদেব। সকাল থেকে দিশেহারা মেয়ে দৌড়ঝাঁপে কখনও রান্নাঘরে, কখনও নিচের একতলায়, আবার লাফিয়ে উঠে তিনতলার ছাদে কাচা-কাপড় শুকতে দিয়ে ফুলের টবে জল—যেখানেই থাকুক,

যতদূরে...উর্ধ্বে বা অধস্তলে, মাঠের চিৎকার তার কানে বিঁধতে থাকে। টিভির চিৎকার ছাপিয়েও দাদাবাবু-দিদিমণিদের লাফালাফি হাততালি তুমুল হট্টগোল। এত বড় বাড়ির দোতলায়, টিভির ঘরে, মাত্র জনাপাঁচেক মানুষের মাতামাতিতে মাঝে মাঝে উত্তেজনায় এমন করে থরথরিয়ে উঠছে গোটা বাড়িটাই—নির্ঘাৎ চার মারল কেউ কিংবা ছক্কাই হয়তো, বুঝি বোম্বাইয়ে ছক্কা হাঁকলে বলটা কলকাতায় এসেও পড়তে পারে কোথাও! ছাদে প্রথম দফা কাপড় শুকতে দিতে এসে রাধা কাছে-দূরে এখানে-ওখানে খাঁচা-বন্দী পাখির চেঁচামেচি যেমন, আশেপাশের সব বাড়ি থেকে ঠিকঠিক সময় মিলিয়ে একই সঙ্গে শুধু পাঁচজন-সাতজন নয়, সব মিলিয়ে অসংখ্য নারীপুরুষের তুলকালাম উচ্ছ্বাসের আওয়াজ এমনভাবে বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে শুনল, তার কানের ঝাঁঝায় চোখের ঝাপসায় ঝলসে ওঠে ভরদুপুরের রোদ্দুর। যতদূর চোখ যায়, চারদিকের বড় বড় দোতলা তিনতলা পাঁচতলা সাততলা...নানান মাপের বসতবাড়ি ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে ছাদে অ্যান্টেনার পর অ্যান্টেনা...গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি রুপোলি ঝিলমিল অ্যান্টেনার জঙ্গলে গাইগরুর তলায় বাছুর যেমন—দক্ষিণমুখো আন্টেনার সঙ্গে পুবমুখো বুস্টার। এপাশ-ওপাশ তাকালে অন্তত তিনটে উল্টো-ছাতা ডিস-অ্যান্টেনা। গোটা লেকটাউনই বুঝি কোনো সাহেবদের দেশ! ছাদের রোদ্দুরে অ্যান্টেনায় বসে দোল খায় দিশি কাক। কা-কা চেঁচায় বিচ্ছিরি। নিচে ঘরের ছায়ায় সবুজ ঘাসে শাদা বকের আদলে ভিনদেশি খেলোয়াড়রা। খেলা! এখন শুধু খেলা আর খেলা আর খেলা ঘরে ঘরে। রাধাব তাজ্জব লাগে। জগৎ-ভোলানো যে-খেলায় হোমরাচোমরা সাহেবরাও কাজকম্মো ভুলে আপিশ ছেড়ে নেশায় ডুবে যেতে পারেন, সে-তো শুধুই খেলা থাকে না। অনেক বড় কিছু। বেশ বড়সড় কোনো ব্যাপার। মস্ত কাজ।

কিন্তু কাজ ভোলেন না নিশীথরঞ্জন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈহল্লায় মিশে গিয়ে হঠাৎ-ই যেন কীভাবে আস্তে আস্তে জমে গেছেন। টসে জিতে ব্যাট নেবার সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র ভুল করে নি আজহারউদ্দিন। পিচ বোঝে ছেলেটা। সয়েল টেস্টিং বা মাঠের ই. সি. জি. জানে নাকি ছোকরা? দারুণ পেটাচ্ছে মনোজ আব সিধু। শুরুর আঠার ওভারেই যদি ছেষট্টি, প্রায় চার ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে রানরেট। কেউই অবিশ্যি চার-টার পাচ্ছে না তেমন। তা হোক। শর্ট-রানে দু-জনই দুরন্ত মূষিক। অভিজ্ঞ চার্টার্ড জানেন, এভাবেই খেলতে হয়। বড় মাপের বিল-পেমেণ্ট বা চলতি খরচপত্তরগুলো কিছু না। নানান রঙেব ছোট ছোট ভাউচার পেমেণ্টেই যত কারিকুরি। বিজনেস-কনসার্নে সুপাব প্রফিট।

আকর্ষণ যত তীব্রই হোক, নিশীথরঞ্জনকে উঠে দাঁড়াতেই হয় একসময় এবং যা নিয়ম,—প্রাকৃতিক বিধানে হিমালয় পর্বতেব আড়মোড়া ভাঙা যেমন, সাহেব এভাবে আচমকা মোচড় খেলে গোটা সাহেববাড়িতেই মৃদু ভূকম্পন সূচিত হতে বাধ্য। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাঠ ছেড়ে উঠে এসে কিরণময়ীকে দাঁড়াতেই হয় খাবার-টেবিলের পাশে।

টিলেঢালা স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই খাচ্ছিলেন নিশীথরঞ্জন। অদূরেই সন্ত্রস্ত যূথিকা। কাছাকাছিই ছিল রাধা। যথাস্থানে।

কিছুটা টেনশনেই ছিলেন কিরণময়ী। বড়সড় খেলাটেলা থাকলেই এমন হয়।

সন্তানদের পরীক্ষা-পাশের উদ্বেগের মতোই হীরের-টুকরো প্লেয়াররা খেলবে মাঠে, জয়ের প্রার্থনা বুকে নিয়ে সারাটা দিন ঘরে-ঘরে দাবড়ে মরবেন ভারতমাতারা! কঠিন রক্তচাপ।

ওদিকে প্রলয় বিভীষিকা। সব ছাপিয়ে বাবনের চিৎকার। কিছু একটা হলো বোধ হয়!

'দুচ্ছাই, এ-চলে না... না, এবাব এই ডাইনিং-রুমেও আলাদা একটা টিভি রাখা দবকাব। না না, কালার্ডটালার্ড কিছু নয়। এই বাবনের ঘরে যেমন আছে। পোর্টেবল। নযতো ফুল-সাইজ ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইটই হোক একটা...'

রাশভারি নিশীথরঞ্জন খাচ্ছিলেন। মাথা না তুলেই এপাশ-ওপাশের প্লেট-বাটি থেকে ছুঁই-ছুঁই তুলে নেবার ভঙ্গিতেই ললাটে ভ্রূকুটি ছিল। সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় নিজেকে পর্দার আড়ালে ঢেকে মনে মনে ঝলকে উঠল বাধা। খাবাব ঘরেও টিভি? রান্নাঘরেব পাশে? ভালো, খুব ভালো, দারুণ মজা।

টেবিলের ওপাশে একটা চেযাবে বসলেন কিবণময়ী। কিঞ্চিদধিক কুণ্ঠিত গলাব স্ববে—'শুধু তো আজকেব দিনই নয়, এ-তো বছব ভরে প্রায় রোজই খেলা। সিনেমা-সিবিয়াল ভালো ভালো কত কি থাকে। সবই তো আর আমাব নিজেব জন্যে নয়। এই ইন্ডিযার ইনিংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছেলেমেযেগুলোকে তোলা যাবে নাকি ওখান থেকে? কখন চান কববে, কখন খাবেদাবে...'

বুক-ছোঁযা টেবিলে, ধবধবে চিনেমাটির প্লেটে সুগন্ধি চালের ভাতে আর মুগেব ডালে কিছুমাত্র অরুচি থাকাব কথা নয়। ছিলও না হয়তো। কিন্তু অকস্মাৎ বিষম বিপদপাত। অভুক্ত অন্ন প্রায় সবটাই ফেলে বেখে উঠে দাঁড়িযেছেন নিশীথরঞ্জন।

বিচলিত কিরণময়ী—'এ-কি, তুমি উঠে পড়লে যে?'

'সময় নেই।'

'মানে? তাই বলে না খেয়ে অফিসে যাবে তুমি?'

'মাছের-ঝোলে নুন না থাকলে সে-তো মুখে তোলা যায না অখাদ্যগুলো।'

'নুন নেই? সে-কি? মাছেব-বাটিতে তো তুমি হাতই দাও নি এখনও...' কিবণময়ী বোঝেন না বহস্য। ক্রোধটা মাটিতে পড়েই স্প্রিং কবে যায বিচ্ছিরিভাবে। লম্বা হাঁক—'যূথিকা...'

দবজাব ধাব ঘেঁযেই ছিল যূথিকা। কাঁধেব আঁচল সামলে সামনে এসে দাঁড়াল। শক্ত পাথব।

'কী ভেবেছ? পেযেছ কী তোমবা? মাছ বেঁধেছ, এগুলো খাবে কে? বছবকা। দিনে একটা খেলাটেলা থাকবে, সেটুকুও সইছে না তোমাদেব? একটা দিন কাছে ছিলাম না বলে যা-খুশি-তাই কবে যাবে?'

নুন হয নি মাছেব ঝোলে? এ-হয না। হতেই পাবে না। যাঁদেব নুন খেযে নিজেদের বেঁচে-থাকা, তাঁদেব নুন না-খাওযানোর পবিণাম কি মাবাত্মক, জানে যূথিকা।

'হ্যাঁ রে রাধু, হাঁ কবে দেখছিস কী ওখানে দাঁড়িযে? সাহেব যে না খেযে অফিসে বেবিযে যাচ্ছেন, দাঁড়িযে দাঁড়িযে মজা দেখছিস তোবা? ইযার্কি?' অসম্মানেব ক্রোধ।

মর্যাদার খর্বদারি। অশান্ত কিরণময়ী—'সকাল থেকে এতক্ষণ করছিলি কী তোরা? বল্, বল্ শিগগিরই...'

রাধা জবুথবু। রান্নাবান্না তার ডিউটিতে নেই। অথবা দাসীবাঁদিদের সামনে এমন ঘটনা সাহেববাড়িতে এত খোলাখুলি এর আগে কোনোকালে ঘটে নি বলেই হয়তো বোঝে না সাহেবলীলা।

মাছের ঝোলে নুন পড়েছে কি পড়ে নি, হাতের নাগালে ঝোলের বাটিই বলবে সে-কথা—মনে হতেই এবং যেহেতু স্বামীর পরিত্যক্ত আহারে ভোজ্যগ্রহণ সতীসাধ্বীর ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, কিরণময়ী বাটিটা বাঁ-হাতে তুলে নিয়ে ডান হাতের তেলোয় এক ফোঁটা ঝোল ফেলে জিভ ছুঁয়ে টেনে নিলেন আলতো করে এবং বিস্মিত—'এ কী! নুন হয় নি কী? সবই তো ঠিক আছে।'

ওপাশেব বেসিনে হাতমুখ ধুযে তোযালেয হাতমুখ মুছছিলেন নিশীথরঞ্জন। ঘুরে দাঁড়ালেন—'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। কেউ তো বলে নি এনিথিং ড্ং...'

'তাহলে তুমি খাবে না কেন?'

'বলছি তো, সময় নেই।'

কিরণময়ী এবার মবিয়া—'তুমি বসে বসে খেলা দেখে সময় নষ্ট করবে, সেটাও আমার দোষ?'

'খেলা-খেলা কবে সময় নষ্ট তো শুধু আমারই হচ্ছে না। অনেকেরই হয়...' হাতেব তোয়ালেটা খামোকা টেনে এনে পেছনের দিকে কোথায় ছুঁড়ে ফেললেন, কোথায় পড়ল, ফিরে তাকাবাব কোনো তাগিদ ছিল না গৃহস্বামীর। ভাবি গলায উড়ো-উড়ো কিছু কথা বাতাসে ভাসল—'তোমার ঘরসংসার যেভাবে চলে, আমার অফিস সেভাবে চলে না। সব কিছু সইবার মতো মানুষ সেখানে খুব বেশি নেই...'

এক ঝটকায় ঘাড় উঁচিয়ে সোজাসুজি তাকিয়েছেন কিরণময়ী। অগ্নিময় হয়ে উঠতে পারত দৃশ্যটা। কিন্তু হলো না।

ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘবে এসে ঢুকল বুলবুলি। মর্মান্তিক দুঃসংবাদ-—'মনোজ প্রভাকর ইজ আউট মমামি। বোল্ড জার্ভিস কট গ্যাটিং...'

এ-রকম একটি ভয়াবহ বিপর্যয়-সংবাদেও সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠতে পারছেন না কিরণময়ী। ক্রোধকেও আড়াল রাখতে হয দাঁতে দাঁত চেপে, যন্ত্রণায়। আগ্নেয় দৃষ্টিটাই টিকে থাকে শুধু।

আবো অসহ্য, মেয়েকে পেয়ে নিজেব আড়াল খুঁজে পেয়ে গেছে মানুষটা? নিচু হয়ে হাসতে হাসতেই আদবে টেনে নিয়েছে কন্যাকে— 'ডোণ্ট ওয়রি, ইউ হ্যাভ নাইন উইকেটস...অলমোস্ট দ্য হোল টিম স্টিল ইন ইয়োব হ্যান্ড...'

'হাউ ব্যাড হাউ ব্যাড...' যথার্থই এক দুর্ভাবনায় ফোলা-ফোলা গালে আর গোল-গোল চোখের চাউনিতে মরণছায়া বুলবুলির—'বানরেট ইজ অলসো কামিং ডাউন বাপি। ধ্যাৎ ভাল্লাগে না...'

'সো হোয়াট?' বাৎসল্যের প্রচ্ছন্ন আবেগ। মৃদু বাঁ-হাতে কন্যার পিঠ চাপড়ে দিলেন

নিশীথরঞ্জন—'ইন ক্রিকেট, এভরি মোমেন্ট ইজ প্রেশাস। ইচ অ্যান্ড এভরি বল ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ কেয়ারফুলি। গো অ্যান্ড এনজয় ইট...'

'শ্‌শ্‌শিট...'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পরও ঘরে আরো একজন ছিলেন। মহিমময়ী অস্তিত্বেরই কেউ একজন। ডানে-বাঁয়ে কোনো দিকে ফিরে না তাকিয়ে ভ্রূক্ষেপহীন উপেক্ষায় বেরিয়ে যাওয়ার নৈঃশব্দ্যে যে-দাপট ছিল নিশীথরঞ্জনের, একটা ঝোড়ো-বাতাস তৈরি হয়ে যেতেই পারে তার তীব্রতায় এবং ঝড়ের ঝাপটায় যা নিয়ম—কিছুটা ভাঙচুর সে রেখে যায় প্রস্থানের শূন্যতায়।

টেবিলে, স্বামীর অর্ধভুক্ত ভাতের-থালায় ভনভন দুটো মাছি এসে বসল। দেখলেন কিরণময়ী। তাকিয়ে রইলেন। দাঁত-চাপা ক্রোধে, এমন কি, হাতের গোটাকয়েক আঙুল নেড়েও নিজের কাছে নিজের থাকা না-থাকার পরখ চাইলেন না। কি মনে হলো, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন ঝপ করে। মোলায়েম মেঝেয় চেয়ার-টানার মৃদু আওয়াজটুকু দু-হাতের শিঞ্জিনীর চেয়েও অনেক বড়। টেবিলে দু-হাতের কনুই রেখে, ডান হাতের তেলোয় গাল পেতে পাখার তলায় নিঝুম বসে রইলেন কিছুক্ষণ। টেলিভিশনের দূরান্ত থেকে একটা অলুক্ষুণে চাপা আওয়াজ ছেলেমেয়েদের। কেঁপে উঠতেও পারছেন না ঠিকমত। সামনেই সুগন্ধি ভাতের-থালায় একসঙ্গে অনেকগুলো মাছি। ভিড় বেড়েই উঠছে ওদের! ওঁদের কি আছে? ঘরে রাগ ফলিয়ে কোথাও কোনো বড় হোটেলে গিয়ে খুশিমতো লাঞ্চটা সেরে নিতেই পারেন কোনো এক সময়ে। কিন্তু প্রথম দিকের ব্যাটিং-অর্ডারে উইকেটের পতন বড় সাংঘাতিক।

ঘরের প্রান্ত ছুঁয়ে দরজার ওপারে ঝিম-মারা দুটো প্রাণী—রাধা আর যূথিকা। প্রয়োজন ছিল বা ছিল না, জানা নেই। মাথা হেঁট রেখে পর্দার আড়াল ছেড়ে সরে গেল দূরে। বিষয়টা নিমক সংক্রান্ত নয়। আর যদি হয়ও, সেটা ওঁদের নিজেদের।

কিন্তু খেলা থাকে। টিভির খাঁচায় খেলার-মাঠ, ঘরের খাঁচায় খেলা-দেখিয়েরা। সারাদিন ধরে টিভির ভেতরে-বাইরে টগবগ টগবগ হুলুস্থুল সকলের। দেশগাঁয়ের পয়সাওলা লোকের বাড়িতে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনের পালা দিলে যেমন হয়, রাধার কাছে সাহেববাড়ির ক্রিকেট-আসর অনেকটা সে-রকমই। ধূপধুনো ফুলের মালায় বিগ্রহ সাজিয়ে, রেকাবিতে বাতাসার নৈবেদ্য রেখে শ্রীখোলকরতালে নামগান চলবে দিনভর রাতভর, ঘরসংসার ভুলে ভক্তরা মজে যাবেন। ফারাক একটাই—চোখ বুজে মুখ বুজে গানের তালে-তালে দোল খাবেন ভক্তরা। আর এখানে টিভির দিকে দৃষ্টিকে অপলক রেখেই হল্লায়-হল্লায় ক্রিকেটের লাফালাফি।

শেষদুপুরে হৈহল্লা বাড়তে বাড়তে যখন আর কেউই হাতে পায়ে গোটা শরীরে ধরে রাখতে পারছে না উত্তেজনার প্রবল চাপ, বোঝাই যাচ্ছে না—কে মা? কারা সন্তান? কে ছেলে, কারা মেয়ে? খেলাটা বোঝে কে বেশি, কে বোঝে না...বাড়ির মধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটতে থাকলে, আলাদা হয়ে চুপচাপ থাকতে পারে না রাধা।

ভাতঘুমের জাড় ভেঙে সেও এসে লেপটে বসে পড়েছিল মায়ের পায়ের কাছে, মেঝেতে কার্পেটের ধার ঘেঁষে।

অধৈর্য কিরণময়ী। বেয়াল্লিশ ওভার শেষ। সাত-সাতটা উইকেট পড়ে যাবার পর জিততে হলে বাকি আট ওভারে মাত্র তিনটে উইকেট হাতে নিয়ে ইংল্যান্ডকে তেষট্টি রান তুলতে হবে এখনও। সিরিজে ওয়ান-ওয়ান টাই হয়ে থাকার শেষে জিতটা যদি এখনও ভারতেরই হাতের মুঠোয়, কী যে ছাই হতচ্ছাড়া ক্রিস লিউইস! মারাত্মক বল করেছে এতক্ষণ! লেজের দিকে ব্যাট নিয়ে মাঠে নেমে পিটিয়েও যাবে এমন ধুমধাড়াক্কা? ছিটেফোঁটা চান্সও দেবে না?

এল. বি. ডব্লু-র কল ছিল। হলো না। বেশি উদারতা ফলাচ্ছে দিশি আম্পায়ার।

'আআআ...উ...ট...'

মাত্র চারজন মানুষের একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠা এবং সিলিংভেদী তুমুল অট্টরোল টিভির ভেতরকার গ্যালারির লাখো মানুষের চিৎকারের সঙ্গে মিশে দেয়ালে-দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে এমন এক তুলকালাম বীভৎস কাণ্ড, রাধার মজা লাগে। দারুণ ব্যাপার। হাউসকোটের মাকে নিয়ে ম্যাকসিতে-ম্যাকসিতে দিদিমণিদের সঙ্গে রাধা—চারজনই মেয়ে। একমাত্র ব্যাটাছেলে, পায়জামা আর স্যান্ডো-গেঞ্জির মোটাসোটা দাদাবাবু সকলের সঙ্গেই আআআউট বলে চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ-খুশিতে পাশেই বোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঠে মারল এমন এক গাঁট্টা—ব্যাপারটা আদপেই ঠাট্টা নয়, যন্ত্রণায় কাতরে উঠে, রেগে, এক ঝটকায় দূরে সরে গিয়ে মুন্নিদিদির সে-কি খিঁচুনি...ইংরিজির পিচকিরি। কী আশ্চয্যি! শুনছেই না কেউ। আমল দেবার দায়ও নেই কারুর।

রাধার ধাঁধা লাগে। সত্যি, অবাক কাণ্ড! টিভির ভেতর লাখো মানুষের আকাশ-ফাটানো চিৎকার বা ঘরের ভেতর জ্যান্ত মানুষদের লাফালাফি-হুল্লোড ম্যাজিকের মতোই এক নিমেষে এমন মিইয়ে গেল, শোকময় সে-দৃশ্যে ফ্যাকাসে মুখগুলোর দিকে তাকানো যায় না। এমন কি, মুন্নিদিদিও পিটুনি ভুলেছে। কাঁদো-কাঁদো। রাধা হদিশ বোঝে না।

এবং যারা বোঝে, ঘটনাটা তাদের কাছে মর্মান্তিক।

ছোট করে বলটা ঠুকেই তড়িঘড়ি রানের নেশায় বেরিয়ে এসেছিল লিউইস। গালি থেকে এক ঝটকায় বলটা ধরেই ফিরতি চালে নিখুঁত নিশানায় স্টাম্প উপড়ে দিয়েছিল অনিল কুম্বলে। আঃহ...কোনো রকমে এক সুতোর জন্য পৌঁছে গেল সাল্‌সবেরি...

ইস্‌। এ-জন্যে, ঠিক এ-রকমই একটা অঘটনের ধাক্কায় কার্ডিয়াক গোলমালে মরে যেতেও পারে কোনো মানুষ। কিরণময়ী কপাল চাপড়ে মরছেন। টেনশনে আরো একটা পান মুখের গহ্বরে।

বুলবুলির আপশোস—খেলা শুরুর আগে বারান্দায় একটি মাত্র শালিক দেখেছিল সে। অনেক... অনেকক্ষণ ধরে বহুৎ খোঁজাখুঁজি করেও সেকেন্ড বার্ড দেখতে পায় নি। এরকমই একটা কিছু যে হবে আজ, জানাই ছিল।

খেলে না কেউ। রাধাও খেলে না। সবাই খেলা দেখে। কিংবা ঘরে বসে খেলা-দেখাটাই একটা খেলা হয়ে ওঠে সকলের। একজোড়া তাজা চোখ থাকার মস্ত সুবিধে—রাধাও দেখতে পেয়ে যায় টিভির খেলায় খেলুড়েদের অথবা টিভির বাইরে খেলা-

দেখার-খেলায় খেলা-দেখিয়েদের জ্যান্ত খেলা। জিততে জিততে হেরে যাচ্ছে কেউ কিংবা হারতে হারতেও জিতে গেল ভোজবাজিতে! নয়তো গুয়া-হারাই হেরে গেল বা দাবড়েদুবড়ে জিতে গেল—খেলা নয়, রাধা খেলা-দেখার চেনা-মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এর আগে এই শহরেই কোথায় যেন অনেক উঁচু-উঁচু জলের ফোঁয়াবার মুখে রঙিন পিংপং বলের লাফালাফি দেখেছিল সে! খেলা দেখার দিনে ঘরের মানুষদেব মুখগুলোও একই রকম—এই এক্ষুনি খুশিতে ফেটে পড়ছে তো পরক্ষণেই চুপসে যাচ্ছে ফাটা বেলুনের মতো। ছুটিব দিনেব অবসবে ভি. সি. আর.-এ হাজারটা 'বই-দেখা' যেমন আছে, খেলার দিনে দেশবিদেশের হবেক বকম খেলায খেলায উত্তেজনায গাগতব সেঁকতে সেঁকতে বছর ভবেই দিনভর বাতভর শুধু খেলা আর খেলা আর মজা আর হৈহুল্লোড়ের ফূর্তি সাহেববাড়িতে।

এবং সব খেলাবই নিয়ম আছে আলাদা-আলাদা। লাফালাফিবও নিযম থাকে। নিয়ম না মানলেই গোলমাল। খেলার একেবাবে শেষদিকে সকলের সামনে যা ঘটল সেদিন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, রাধাব মরণ!

দুপুবের ঢল নামলেই বাঘা আব বাঁধা থাকতে চায না একতলায। ওকে বোজই ছেড়ে বাখতে হয এ-সময়—বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটের পব। সেদিনও চেঁচাচ্ছিল বড। ঘববাড়ি তোলপাড়। কিন্তু যখন আর চব্বিশ বলে বত্রিশ রান...খেলাটাকে একাই প্রায টেনে তুলে এনেছে ক্রিশ লিউইস, হাতে তিনটে উইকেট এখনও মজুত। এ-বকম একটা টেনশনের মুহূর্তে কোনো বাড়তি জ্বালাতন কারুবই সইবাব কথা নয। ববং ওকে ছেড়ে দেওযাই ভালো। বাবান্দায গিযে হাঁক পেড়ে নন্দলালকে সে-রকমই ফরমাশ করল বাবন এবং গলায় বকলস নিযে লাফাতে লাফাতে দোতলায উঠে এল ঘবেব পুষি। কারুর কোনো ক্ষতি করল না। কোনো আওযাজ ছিল না। তবে বড্ড দামাল। এব-ওর গা ঘেঁষে ফসফস গন্ধ-শোঁকা ছুটোছুটি ছটফট ছটফট।

ক্ষুব্ধ কিবণময়ী—'উঃ, এই উৎপাতটাকে আবাব নিযে এলি কেন এখানে? দুচ্ছাই, ভালোভাবে শান্তি করে একটু খেলাটাও দেখতে দিবি না তোরা?'

'অ্যান্ড অল...অল ফব দাদা...' বুলবুলি মুনমুন অস্থির। সরাসবি অগ্রজকেই— 'হোযাই হ্যাভ ইউ ব্রট ইট হিয়াব ইফ ইউ আব টু এনজয দ্য গেম?'

'টাইগাব? টাইগাব ইজ স্টাববিং আ আ...হাইলি পেস সেটাব...' জন্তুটা লাফিযে উঠেছে বুকের ওপর। পশুশক্তির প্রবল আহ্লাদে পেছনে পিঠ ঠেসে বাবন চিৎ হযে পড়েছে সোফায। নখেব আঁচড লাগতে পারে গাযে বা গেঞ্জিটা ছিঁড়ে যেতে পাবে আঁচড়ে। হাসতে হাসতে ওর সামনের দিকেব দুটো পা দু-হাতে খাবলে ধবে দাঁড কবিয়ে দেবার পব যখন টাইগাবও চতুষ্পদ নয আব—মেঝেব ওপব দু-পাযেব ভব বেখে সবল পেশীব টানটান দীর্ঘ শিবদাঁড়ায সামনের দুটো পা প্রভুব বুকে তুলে দিযে মেতেছে অন্য এক ক্রীড়ায। ওর লালা-ঝবা লম্বা জিভ প্রায ছুঁযে ছিল বাবনেব মাথা। এতটা সোহাগ পেয়ে, খুবই স্বাভাবিক, বাজখাঁই গলায় গোটা দুয়েক ঘেউ-ঘেউও কবে ফেলেছিল জানোয়ারটা। সে-শুধু স্রেফ জানোয়াব বলেই। তিরস্কার কিরণময়ীর, সবোষ চিৎকার বোনদের। এবং তখনও টাইগাবকে জাপটে ধবে গাঁক-গাঁক আওয়াজে গমকে

গমকে উদ্দাম সে-যুবক--'আওয়ার টাইগার ইজ পয়া। পয়া, ইউ নো? মিন্স্ লাকি...'

এবং তখন কপিলদেবের হাত থেকে দেশপ্রেমিক বলগুলো বারবার আগ্নেয় তেজে ঝাপটে গিয়ে পড়ছে জিব্রলটারের ওপারে। শেষ ওভারেব দিকে পৌঁছে যাচ্ছে খেলা--মাত্র সাতটা বল, এখনও তের রান চাই ওদের। চারপাশ থেকে সাঁড়াশিব্যূহে ওত পেতে রয়েছে আজাহারবাহিনী। প্রবল উত্তেজনায় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মুনমুন। দু-হাতের মুঠো মুখে চেপে মেঝেতে নিলডাউন হয়ে বসে পড়েছে বুলবুলি। একটু এদিক-ওদিক হলে কেঁদেই ফেলবে। অসম্ভব রক্তচাপ। ঘামে-ঘামে ভিজে রুদ্ধশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত কিরণময়ী ঝাপটে উঠলেন ছেলের ওপব--'আঃ, কী হচ্ছে? একটা সিরিয়াসনেস নেই তোব? ছাড, ছাড় না ওকে...'

এবং পলকপাতে ফিরে তাকিয়ে--'এই রাধু, ধর না ওকে। কোথাও একটু নিয়ে যা। খেলা তো এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। কী যে করছে আমাব বুকেব ভেতবটা! উহ্...'

কর্তব্যপালনে উঠতেই হয় রাধাকে। ছুটে গিয়ে ধরতেই হয় বাঘার গলার বকলস। কিন্তু এমন তেজী আর তাগডাই একটা জন্তু, ধবে বাখা যায় নাকি ওভাবে? কিংবা বাঘাব কাছেও হয়তো খেলাই ছিল সেটা। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ঠিকমতো ধরা না দেবার দুষ্টুমিতে নাছোড় দস্যিটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ কবে ছুটে যাচ্ছিল টিভির দিকেই। কী সব্বোনাশ। ধমকেধামকে ওকে সামলাতে গিয়ে রাধা একটা হল্লা তুলল ঠিকই, কিন্তু পলকে ওব গলাব বকলসটা আবার পাকড়েও ফেলল বাঁ-হাতে। দামাল শক্তির প্রবল দাপট। বাঘা দ্বিতীয়বার দাদাবাবুর গায়ে লাফিয়ে উঠতেই রাধা নিজেই টাল রাখতে না পেবে, কিংবা নিচু হয়ে দজ্জালকে আগলাতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে খাটো হয়ে গিয়েছিল এমন, ম্যাকসির তলানিটা লুটিয়ে পডল মেঝেতে নিজেরই পায়ের তলায় এবং তাড়াতাড়ি হুটোপুটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে নিজেরই পাযেব চাপে বারবাব জামায় টান। এক লহমায় বাঘাকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল দাদাবাবুবই সিঙ্গল সোফাব ওপর। ছিঃ ছিঃ, কি বিচ্ছিরি কাণ্ড গ।

বাঁচালেন ক্রিস লিউইস। সাহেবদেশের কালোরাই সাহেববাড়িব কালোকে বাঁচায়। ক্রিস লিউইস আউট।

লাখো মানুষেব চিৎকারে টিভির কাচটা চৌচিব না হোক, হাততালি দাপাদাপি হৈহট্টগোলে সাহেববাড়ির তোলপাড়ে যখন সবাই মেয়েছেলে, ঘরেব একমাত্র পুরুষমানুষ দাদাবাবুব কোনো নজবই ছিল না টিভি বা খেলার দিকে। এত কাছাকাছি হল্লায মেতে ছিলেন মা অথবা দিদিমণিরা লক্ষই করলেন না কেউ--কী যে হয়ে গেল আচমকা। ইচ্ছে করেই কি হলো সেটা? না-কী এমনি-এমনি হঠাৎ-ই ঘটে গেল! হিসেবটা বোঝাব আগেই বাঘাকে টেনে টেনে রাধা আস্তে আস্তে মাথা নুয়ে, নিজের মধ্যেই নিজেব মতো করে অঙ্কটা বুঝে নিতে চেয়ে ঘর ছেড়ে পালালো। তাব ছোট মগজে সবটাই হেঁয়ালি থেকে যায়। দাদাবাবুর কোলেব ওপর ঢলে পড়ছিল সে যখন, গায়েব ওপর এমন বিচ্ছিরি ঢলানি থেকে রেহাই দিতেই দু-হাত বাড়িয়ে কী যে করল মানুষটা, রাধা অদ্ভুত একটা ছ্যাঁকা খেলো। এ-রকম ছ্যাঁকায় ঘা হয় না চামড়ায়। জ্বলুনিপোড়ানিও থাকে

না। কী যে হয়, গতর ভরে শিরশিরানিটা চিনে নেবার আগেই দম বন্ধ হয়ে আটকে আসে গলার নলিটা। বুকে তরাস। আসলে সবটাই ভয়।

মাত্র হাত তিনেক দূরেই ছিলেন মা। শুনবে কেউ কোনো কথা? বাজারের-কেনা ম্যাকসি জামাটার ঝুল বড্ড বড়। পা জড়িয়ে গিয়েছিল। সেটা কোনো ওজর হলো? নিজের আবরু, নিজের লজ্জা! নিজের বুঝ বুঝবে না মেয়েছেলে?

মূর্খ নিতান্তই। ভারতবর্ষ চেনে না যুবতী। জানে না—জয়, স্বদেশের জয়।

কিংবা সে-এক দুর্দৈব তার। সাহেবদের পতনে যদি সাহেববাড়িতেই উৎসব, তাকেই ভুলতে হবে সাহেবিয়ানার চটক। স্বদেশী থাকতে হবে। বাঙালি।

সাহেবের কাজ ছিল। বৈজুদা গাড়ি নিয়ে আসতে পারে নি বিকেলের দিকে। ট্যাকশি ডেকে নন্দদাকে নিয়ে মা মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলেন একাই। কেনাকাটার বিশদ বিবরণ রাধার জানার কথা নয়। জানেও না।

সন্ধেবেলা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল যূথিমাসির সঙ্গে যোগানদারিতে। চমকে উঠল। ঘরে ফিরে নিজের শাড়িটা বদলে নেবার পর্যন্ত ফুরসত হয় নি মা-র। একেবারে সরাসরি রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন শিরদাঁড়া-উঁচনো শক্ত ঘাড়ে—'নে ধর...'

হরেক জিনিসপত্তরে ঠাসা পলিথিনের বাহারি একটা ব্যাগ ছিল মা-র হাতে। সবটাই ধাঁধা। আনাজপাতির কাঁচাবাজার নয়। মাছমাংস কেউ আনে না এমন ছাপছোপ-মারা ফিনফিনে পাতলা পলিব্যাগে। জামাকাপড় কিনলেই এ-রকম সব সুন্দর ব্যাগ দেয় দোকান থেকে। তাই যদি হবে, রাধা নিজেই অবাক, বলা-নেই-কওয়া-নেই, পুজোপার্বন কিছু নেই, হঠাৎ এত সোহাগ পাবেই বা কেন সে?

পটলের-দোর্মা হচ্ছিল উনুনে। ঘি গরমমশলা পোস্তবাদামকিশমিশের মাখামাখিতে ভঁ-ভঁ মিষ্টি সুবাস ছিল ঘরে। রাত্তিরে লুচি হবে। যূথিমাসির পাশে দাঁড়িয়ে তারই আয়োজনে ব্যস্ত ছিল রাধা। ডান হাতের তেলোয় আঙুলে ময়দায়-ময়দায় যেটুকু ভরে উঠেছিল, অতর্কিত ডাকে তড়িঘড়ি কোনো হদিশ না পেয়ে নিজের ম্যাকসিতেই হাত ঘষতে ঘষতে ছুটে এল।

'এখন থেকে ওই ম্যাকসিফ্যাকসি আর নয়। ছাড় ওসব। কী বিচ্ছিরিভাবে ঘুরে বেড়াস তুই? সকালে-বিকেলে দুধ আনতে যাস। হরদম দোকানপাটে যেতে হয়। দেখতেও তো খারাপ লাগে। অনেকদিন ধরেই বলব-বলব ভাবছি। বলে আর কী হবে? আমারই সময় হচ্ছিল না কিনে আনার...'

রাধা, অনুগতপ্রাণ, হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে। হেঁয়ালি বোঝে না।

'কী হলো? নে ধর বাপু, আমার কাজ আছে মেলা।'

হাত বাড়াতেই হয় রাধাকে। বিহ্বল কুণ্ঠিত হাত।

'ছোটজামাগুলো দেখে নিস ভালো করে। চৌত্রিশ সাইজেই তো হবে তোর? ছোটবড় হয় তো বলবি।'

সোহাগেরও তো মাপজোক থাকে একটা? জষ্ঠি মাসের খরায় আকাশ ঝাঁপিয়ে এক-মেঘ জল যদি এমন করে এসেই যায় আচমকা, অভিভূত মেয়ে ব্যাগটা হাতে

নিয়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থেকে ভিজতেই চায় নতুন জলের সোহাগী আদরে। মা চলে যাচ্ছেন এবং ফিরে যাবাব তাড়ায় মুখের বাক্যিগুলো আরো বেশি ঘোর লাগায়— 'ওসব শালোয়ার কামিজফামিজও ছাড় দেখি এবাব। সবাইকেই তো মানায় না সব কিছু। গ্রামের মেয়ে তুই। এখানে আছিস আমার কাছে। ভয়ডর তো আমার ঘরেও আছে। আমাকেই তো দেখতে হবে সেটা...'

হেঁয়ালির ভাষা! ধাঁধালিব ভালোবাসা! মা ঘব ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর ব্যাগটাকে দুহাতে ফাঁক করে ভেতবের দিকে চোখ ফেলে ব্রাউন-পেপারের মোড়কে একটা বড প্যাকেট দেখল রাধা। খবরের-কাগজে মোড়া ছোট-মাঝারি আরো দুটো। কৌতূহল বাড়ে। বিস্ময় আরো বেশি। সুখ যতটা, ঝিমঝিমানি ততোধিক। ছোটখাটো এতটুকু মগজে এত সব ঝুটঝঞ্ঝাট সইতে না পেরে সামনেব খোলা দরজায মা-ব চলে-যাওয়ার শূন্যতার দিকেই সে তাকিয়ে বইল কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে থিতু হয়ে এসে পিছু ফিরল পায়ে পায়ে —'কী গ মাসি, কী হল? কেনে এমনধারা?'

'আ মলো যা, সে-আমি কী বলব? যিনি দিয়েছেন, যিনি দেবাব মালিক, তাঁকে যেয়ে জিগ্‌গেস কব...' উনুনের কান মুচড়ে আঁচ খাটো করে নিজেই এগিয়ে এসেছিল যূথিকা। স্টিলের খুন্তির উল্টো দিকটা পেছনে ব্লাউজের তলায় ঢুকিয়ে ঘেমো গায়ের পিঠ চুলকোতে চুলকোতে আবামে, মুখেচোখে সুখেব বিকারে—'সে-আব এমন কি একটা কতা? শখের মার্কেটিংযে গিছলেন। আর-দশটা কেনাকাটায় মনে ধরল তোর কতা। তা ঘবেব-মেয়ে তুই...'

কাউকে কিছু দেবারও একটা নিয়ম থাকে। বেনিয়মে আহ্লাদের উটকো পাওনাগণ্ডায় যে-বাড়তি ফুর্তি, হাত দুটো ধুযে নেবাবও তব সইছিল না রাধার। রান্নাবান্নার জন্য তৈরি লম্বা সিমেন্টেব টেবিলেব কোণেব দিকে যেটুকু শুকনো ছিল, ব্যাগটা রেখেই লাফঝাঁপে ছুটে গেল বেসিনের দিকে। দুটো হাত ধুয়ে নিয়ে পরনের ম্যাকসিতেই মুছতে মুছতে, মোছা হলো কি হলো-না, না-কী ভেজা-হাতই বয়ে গেল, খেযালে না বেখেই হামলে পড়ল প্যাকেটটাব ওপর। খাবলেখুবলে দড়ি ছিঁড়ে ব্রাউন-পেপারের বড় মোড়কটাই সে খুলল প্রথম। মোড়কেব ভেতর কাচেব স্বচ্ছতায পলিথিনের খামে একটি নয়, পর পর তিনটি খামে তিন তিনটে শাড়ি! চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। অথচ হাতের মুঠোয় সত্যি। প্রতিটি শাড়িকেই সে খুলে খুলে, আঙুলে-আঙুলে জমিন পবখ করে দেখল ভবাট চোখের আকুলতায়। সিল্ক নয়, সিনথেটিক নয়—সুতি। তাঁত নয, প্রিন্টের মিহি কাপড়। শাদা রঙের নকশা-কাটা লাল, লাল-সবুজের ডুরে, কোটা ধবনেব নীল-নীল রংবাহাবি আবো একটা। তিনটে শাড়িই তাব? তাঁব একার?

কলস ভরে উপচে পড়ছে খুশিব জল, বাড়বাড়ন্ত যুবতীব মন। আঁকুপাকুতে অন্য প্যাকেটগুলোও খুলে দেখতে হয। কালো আব খয়েবি রঙের দুটো শায়া। শাড়ির ওপর ফেলে-ফেলে তিনটে ব্লাউজকে পবখ কবে তাবিফ কবতেই হয মা-ঠাকরুণেব চশমার চোখ। বংমিলান্তিতে গডবড় নেই কোথাও। এবং খুশিতে খুশিতে—'হ্যাঁ গ মাসি, এমনধাবা বাহারের শাড়ি গ আমাব জন্যে?'

'হ্যাঁ, এই ভালো। ধেই-ধেই কবে যা বেড়ে উঠেছিস তুই...' ঘামাচি চুলকনোর

খোঁচাখুঁচিতে এবার বোধ হয় পিঠের জ্বালা। স্টিলের খুন্তি ফেলে, ডান হাত তুলে, কনুই ভেঙে পিঠে যথাস্থানের নাগাল পেতে দাঁতেমুখে দুঃসহ খিঁচুনি যূথিকার। গলার স্বরেও জ্বালাপোড়ানির ঝাঁঝ—'কাল থেকে যে নিত্যি শাড়িবেলাউজই পবতে হবে ল তোকে। গেল, তোর এত সাধের মেমসাহেবি সব গেল।'

রাধা অবাক চোখে তাকাল—'এমনধারা বলছ কেন গ মাসি? মেমসাহেবির কী করেছি আমি?'

'শোনো কতা! সে-আমি বলতে যাব কেন লো? আমি বলাব কে? তোর সোহাগী মা-ঠাকরুণ কি বলে গেলেন? তা'লে শুনলি কী তুই? কালা নিকি?' বান্নার দিকে বাঁক ঘুরছে যূথিকা—'নে, এবাব মব। ওসব ম্যাকসিফ্যাকসিও আব চলবে না এখন থেকে। এ-জম্মে আর নয়।'

'কেনে? চলবে নি কেনে? দিদিমণিবা যে পবে...' বাধা, আরো এক নতুন বিস্ময়ে-—'এস্কাট বেলাউজ পবে, জিনসের পেন্টলুন, বুকে আঁটো-আঁটো গেঞ্জি...মুন্নিদিদি ত আমার চাইতেও বয়েসে বড় গ মাসি...'

'সে-ত ওবা ছেলেদেব মতন ঘাড়েব চুলও ছেঁটে ফেলে দেয়। পাববি তুই?' সেদ্ধ-ডিম ভেজানো ছিল ছোট একটা গামলায। শ্ল্যাবেব সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্তহাতে খোসা ভাঙতে ভাঙতে যূথিকা কিছুটা আপন মনেই—'বাস্তা ত একটাই থাকে রে সবাব জন্যি। কেউ গাড়ি চাপে, কেউ হেঁটে যায়। কেউ আবাব হোঁচট খেযেও মরে। তাই বলে সবারটা সমান হল?'

রান্নাঘরের চারপাশ জুড়ে টিউববাতিব আলোয়-আলোয় দামি-দামি বকমাবি যন্ত্রপাতি-তৈজসে চোখ-ধাঁধানো ঝলসানি বা মাসিব হাতেব নিত্যি-চেনা অন্নব্যঞ্জনেব মিষ্টি সুবাস--কোনোটাই আর নতুন মাদকতা নয় কিছু। এমন কি, নতুনের গন্ধমাখা শাড়িশাযাব্লাউজের উপহার হাতে ধরেও নাকের ডগায় তুলে গন্ধ শুঁকতে ভুলে যায় রাধা। ঘোলাটে সবটাই। আরো একটা ছোট প্যাকেট ছিল। প্যাকেটটা খুলে নিযে, কোথাও কোনো নিশানা না বেখে নিষ্পলক চোখের পাতায় স্থবিব হয়ে যায। হাত গড়িয়ে পড়ে যায না নবম তুলতুলে পলিখাম। আলাদা অর্থ হারায। বমণীশোভায় বুক চিতিয়ে সোজা হযে দাঁড়াবাব বয়সটা যদি এসেই গেল সুখের পরানে, বড-হয়ে-ওঠাব সাধ নিযে আবো কটা দিন ছোট হয়ে থাকার ইচ্ছেগুলো. ছোটয-বডয ঘুলিযে গিয়ে, ফ্যাকাসে হযে ওঠে।

এর পব সর্ববাপিনী মায়ের ইচ্ছাই নির্দিষ্ট হযে গেল পবদিন থেকে। নিযমিতভাবে শাড়িই পরবে বাধা।

গায়েগতরে সেয়ানা হয়ে ওঠার সত্যিটা যদি এমন কবে কেড়ে নেয জীবনেব রঙে বড়-হযে-ওঠার সমস্ত বাসনাকামনা, মাতৃশাসনেব খবর দাঁরিতে বাধা ভুলতে পাবে না তাব ইচ্ছেগুলোও। বাড়বাড়ন্ত শবীরেব মাপে বড়-হযে-ওঠাব নিয়মবিধির সঙ্গে জড়িযে যায় তাব গ্রাম তাব শহর। ক্ষোভে. দুঃখে, বেদনায় সাহেববাড়ির শায়াশাড়িব্লাউজ মেনে নিলেও মোহময় রংবাহারি পোশাকি জেল্লা নাকচ করে দেয় না সে। দিদিমণিদেব ছেঁড়াফাটা পুরনো বাতিল অথবা যা তাব নিজেবই সম্পদ—হরেক বঙেব হবেক নকশাব

শালোয়ারকামিজ ম্যাকসিহাউসকোটনাইটির যাবতীয় সংগ্রহ সে লুকিয়ে রেখেছে টিনের বাকশোয়। ছোট বাকশোটা ভরে ওঠার পর সযত্নে পাট করে রেখেছে তক্তপোশে তোশকের তলায়। যেগুলো ছোট হয়ে গেছে, ফেলে দেবে না। দেশগাঁয়ে গিয়ে বিলোবে অল্পবয়েসী মেয়েদের। তার নাম হবে খুব। মাপজোকে যেগুলো তার মানান সই, নিজের জন্যেই রাখবে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আরো সংগ্রহ করবে। সাহেববাড়িতে শাড়ি জড়িয়ে ভেজা-বেড়াল হয়ে থাকবে ঠিকই, দেশের বাড়িতে যাবে যখন, সাজগোজের ভেলকি নিয়ে যাবে। সেখানে স্বাধীন বোজগেরে মেয়ে সে। সর্ব অঙ্গে শহর।

কিংবা সে-ভেলকি তাব নিজেব কাছে নিজেবই চমক। ইতিপূর্বে শাড়ি সে কখনওই পবে নি, তা নয়। সে-ছিল দু-চার দিনের শখের খেলা। শখেই মিটে গেছে। এবং আজ যখন সেই শখই নিযতিনির্বন্ধ হয়ে উঠল, বাধা নাড়া খেলো নিজের খোলসবদলে। নিজেবই মেয়েলি শরীরটাকে সে ভেতর থেকে খোঁজে নি কখনও। নতুন সাজে সেজে উঠে, রাত্রিশেষে, বুঝি এক প্রহবেই পাল্টে গেল সে। বুকেব শক্ত আঁটুনিতে ছোটজামা আব ব্লাউজে অসুবিধা ছিল না কিছু। তলাব দিকে শাযাও ঘাগরা বা ম্যাকসিস্কার্টের মতো। গিঁটে বোতামে হুকে সবই এঁটে থাকে গাযেব সঙ্গে। কিন্তু শাড়িটা গায়েব ওপব আলগা আলগা একটা খোসা হয়ে উঠল। মেয়েমানুষের গায়ের খোসা। অনেকটাই লতপত লতপত শীতেব চাদরের মতো। সেখানেই ভয। যদি খুলে যায়? ফ্রক পরলে হাঁটু অব্দি উদোম। শাড়িতে গা ঢাকলেই পায়ের নখ গোড়ালি ছাপিয়ে লজ্জা? গা ভরে এমন নতুন লজ্জা নিয়ে এত বড় লম্বা একটা শাডি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চলা কি সোজা কথা? এক দিকের একটা কোণ ডান দিকের পেটের কাছে শায়াব মধ্যে গুঁজে পুরো কাপড়টা পাছা ঘুবিয়ে তলা থেকে টেনে বুক ঢেকে তুলতে হয় বাঁদিকের কাঁধে। নাভির গোড়ায় ঢলঢলে যে-অংশটা বাডতি হয়ে ঝুলতে থাকে, হাতের আঙুলে-আঙুলে কুঁচি করে নিয়ে পেটে গুঁজে দিলে অবিশ্যি অনেকটাই খাটো হয়ে আসে। গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়ে টানটান থাকে গা-গতর। তখন বাকি অংশের সবটুকুই তলা থেকে পেট আর বুকেব ঢাকনা হয়ে উঠে এসে বাঁদিকে কাঁধের আঁচল হয়ে যায়। একপেশে ওড়নার মতো। খুব একটা দামি কিছু তো নয়। ঘরে-পরার জন্যে সাধারণ আটপৌরে। বড্ড ভারি-ভারি। জবুথবু লাগে নিজেকে। হাত-পা খেলিয়ে চলাব আরামটাই চলে যায়। কিংবা ভেতবে-ভেতবে নিজেই পাল্টে যায় সে। অনেক ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা মনে হচ্ছে নিজেকে। পিঠের শিরদাঁড়াটা টান-টান সোজা হয়ে গেছে। তিনতলার ছাদ থেকে নিজেরই বাড়ির একতলাব দিকে চোখ ফেলে তাকালে যেমন হয়, ঘাড়থুতনি নিচু কবে নিজেরই শরীরটাকে হরেক খাঁজেখুঁজে নতুন করে দেখল সে। নিজেকে নতুন করে চেনায় তখনই লজ্জা। আব ছোট খুকি সেজে না-থাকা বা হঠাৎ-ই অনেক বড় হয়ে ওঠার শরমভবম। ছোটজামার তলায় ব্লাউজটা ফুরিয়ে যাওয়ার পর নাভিশুদ্ধু চারপাশে পেট পিঠ উদোম। অস্বস্তি লাগে। এত দিনের ম্যাকসি বা শালোয়ারকামিজে তো ছিল না এমন! শাড়িব্লাউজেই বা এমন কি বেশি আবরুর ছিরি? সর্ব অঙ্গে ঢাকাচাপা রেখে হঠাৎ মাঝখানে, ঠিক-ঠিক কাতুকুতুর জায়গায়, ফাঁকা ন্যাংটো চামড়া! কিংবা ভালোই লাগে। বাতাস লাগলেও

কিলিকিলিতে কেঁপে উঠতে পারে শবীব। কিলিকিলির কথা মনে হলেই গাইবাছুরের মতো তিরতির তিরতির করে ওঠে মানুষেরও গা-গতর।

শাদায়-কালোয় নকশা-কাটা টকটকে লাল একটা শাড়ি! লাল রঙেরই ব্লাউজ। খয়েরি রঙের শায়াটাই সে পরেছে আজ। কালো মেয়েব গা ঢেকে একসঙ্গে এত লাল? কেমন লাগছে তাকে দেখতে? ইশকুলকলেজে পড়ুয়া দিদিমণিবা একই বাড়িতে বয়স ভাঁড়িয়ে ছোটই থেকে যাবে আরো অনেক...মনেক কাল। শুধু তাকেই বড় হয়ে উঠতে হবে? মায়ের মতো হাউসকোট পরতে চায নি সে। নাইটি পরে ঘুমনোরও সাধ ছিল না। দিদিমণিদের মতো বাগি শার্টপ্যান্ট লং-শর্টস জিন্‌স্ কর্ডুবয কিছুই চায় নি। কিন্তু হাড়মাসে ভরাট সুঠাম তাজা শবীবটায একটা মোহ আছে তার। সেই মোহে বা না-চাইতেই পেয়ে-যাওয়া হঠাৎ-শাড়িতে তাব বড় হয়ে ওঠা, তাব যুবতী হযে ওঠা, তাব রমণী হযে ওঠাব দিনে ঠিকমত আদলও বোঝে না খুশি বা অখুশিব, সুখদুঃখেব। ডান দিকে বাঁদিকে ঘাড ঘুরিয়ে খুঁটিযে খুঁটিয়ে ভাঁজভূজ নানাভাবে পবখ কবে করে বারবাব দেখে নিতে চায় প্রথম-শাড়িব নিজেকে। নিচু হযে পাযেব আঙুলে শাড়ির পাড় চেপে, আরো টেনেটুনে, পা ঢাকাব চেষ্টা। শাড়িব ঢলকে মাঝামাঝি দুটো হাঁটুতে চেপে বেখে, পিঠ ভেঙে নিজেকে প্রায সমকোণে এনে সামনের দিকেব কুঁচিকে আঙুলেব কাঁচিতে কাঁচিতে আবো নিখুঁত কবে হাঁটু থেকে পা অব্দি পাট করে নিতে দুটো হাতেব পাতা বুলিয়ে পবম আদব। নতুন-কেনা সুতিব শাড়ি। ভাজা-পাঁপডেব মতো শক্ত কাপডে যেমন খুশি ভাঁজ ফেলা যায এখন।

প্রথম বঙিন শাড়ি! নিজেকে বড় দেখতে ইচ্ছে কবল তাব। কিন্তু দেখবে কোথায়? পানাডোবাও নয, এক বালতি জলের আদলে একবত্তি ছোট একটু আবশি তার। একটু বাদে দিদিমণিদের ঘবে তো তাকে যেতেই হবে বিছানাপাটি তুলতে। তাব আগেই সে নিজেকে দেখতে চাইল পবেব চোখে।

বান্নাঘরে নিজেব কাজেই হিমশিমে ছিল যূথিকা। আডচোখে তাকাল একবাব—'বাঃ, এ-ত খাসা ফুল ফুটেছে বে তোর। বলি, সাজগোজই সাব, পালকিব আশা ভার...'

দিনেব প্রথম কাজ, দুধ আনতে যেতে হবে তাকে। ঝকঝকে স্টিলেব ক্যানটা হাতে তুলে নিযে তৈরি হযে উঠেছিল বাধা। ফিরে তাকাল—'কি বললে গ মাসি। কী বলছ?'

'না, কিছু না...' খামোকাই ঝাঁঝিযে উঠল যূথিকা—'বলছি, আমাব কপাল। সাজগোজেই ত এক পহব বেলা গডিয়ে দিলি। দুধ আনতে যাচ্ছিস? বলি, ফিরবি কখন?'

'সে-লাইন পডবে কত বড, কতক্ষণ লাগবে, সে-আমি বলব কি কবে?'

'সে-ত তুই এখন গিযে সাতরাজ্যির গপ্‌পোগাছা করবি মেয়েদের সঙ্গে...' দিনের শুরুতেই হাঁপিয়ে উঠেছে যূথিকা। কিংবা ঘডির-কাঁটাব সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এমনই হয রোজ—'একদম কথা বলবি না কারুর সঙ্গে। তাডাতাড়ি আসবি বাপু। কী-নাকি কলেজেব পবীক্ষাটরিক্ষা আছে মুনমুনের। বাপের সঙ্গে এক গাড়িতে বেরুবে।'

সাতসকালে এমন প্রায়ই গোঙায় মাসি। রাধাকে শুনতে হয়। সব কাজ ঠিক

সময়ে তোলাও হয়ে যায় ঠিকঠিক। মাসির বিলাপকে ভোরবেলায় নিরর্থক পাখির-ডাক ভেবে, কোনো আমল না দিয়ে, ঘর ছেড়ে বেরুল সে। বান্নাঘর ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে জানালায় উঁকি দিয়েই আঁতকে উঠল। লাউঞ্জের দেয়ালঘড়িতে ছোট কাঁটা ছয় ডিঙিয়ে বড়-কাঁটা পৌঁছে গেছে আটের কাছাকাছি। ইস! সত্যি একটু বেশিই বেলা গড়িয়ে গেল। বেলা চড়লে, ছটা সাড়ে-ছটা নাগাদই মিল্কবুথে লাইনটা বড্ড লম্বা হয়ে যায়।

সাহেববাড়ির ঘুমের আড ভাঙে নি তখনও। দাদাবাবু-দিদিমণিরা ঘরের দরজা খোলে নি কেউ। পুবদিকের বারান্দায় সকালের তেরচা রোদ্দুর। ভেতর দিকে ঘরবারান্দাব ছায়ায়-ছায়ায় হালকা আলোর বং। বাইরে কাকের-ডাক, চড়ুইয়ের কিচিবমিচির। অনেক আগেই ঘুম ভেঙে উঠেছেন মা। মুখেচোখে আলসেমি কাটেনি এখনও। মুখেচোখে জল দিয়ে দাঁত মেজে বাসি-নাইটি ছেড়ে শাদা বুঁটিদাব গাঢ় মেরুণ রঙের হাউসকোটে রান্নাঘরেব দিকে যেতে যেতে, কী আশ্চর্যি, চোখ টেরিয়ে তাকালেন একবারটি। শুধোলেন না কিছু? কাল রাত্তিরে শাযাব্লাউজশুদ্ধ যে-কাপড় নিজেই দিয়েছেন নিজেব হাতে ধরে, সেই শাড়ির বাহারে ঘরের-মেয়েকে কেমন লাগছে দেখতে, চোখ মেলে দেখবেন না এক পলক? পাশ কেটে যেতে যেতে গোমড়া মুখে পাত্তা না-দেবার ভঙ্গিটা এমন, যেন শুধু আজ নয়, অনেক দিন অনেক বছর ধরে এ-বাড়িতে শাড়িই পরে আসছে বাধা।

অভিমানও বাজে খরচ। সময় নষ্ট। সাহেববাড়ি সচল রাখতে আসলে সচল থাকতে হয় নিজেকেই। গোটা বাড়ি কাঁপিয়ে জোরদাব ভটভট্টির আওয়াজ চলছে তখন। একতলায় পাম্প ছেড়েছেন নন্দদা। সিঁড়ি ভেঙে নামার ধাপে ধাপে আওয়াজটা বড় হতে থাকে। একতলায় নেমে আসাব পব নন্দদাই ঘাড় উঁচিয়ে কপাল কুঁচকে তাকালেন প্রথম-–'কে? রাধু নাকি রে?'

'কেনে গ? তুমি কি নতুন দেখছ নিকি আমাকে?'

'কালও তো দেখলাম বে তোকে, এট্টুকুন ছিলি। পাশবালিশের খোলেব মতন কী গায়ে চাপিযে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! আজ কত্ত বড় হয়ে গেছিস রে তুই?'

'এখন থেকে শাডিই পরতে হবে গ আমাকে। মা বলেছেন।'

'তা ভালো তা ভালো...' ওপাশে পাম্প ছেড়ে দিয়ে এসে সদর দরজার খাটিয়ায় বসে বাঁ-হাতেব পাতায় খৈনি ডলছিল নন্দলাল। ডান হাতেব চাপড় বাঁ-হাতের তেলোয়-–'সেই যে বলে না? ধনীব বেটি ধনে মানায, নিধধনেব বেটিকে গতবে মানায। বুঝলি না? পেটের টানে দেশগাঁ ছেড়ে, মা-ভাইদেব ছেড়ে একা-একা আছিস অ্যাদ্দুব। তা একটু সাবধানে থাকাই ভালো।'

যা বাব্বা! শাড়ি পবেছে একটা! তার আবার সাবধান-অসাবধানের কী হলো? কিংবা নন্দদা মানুষটাই অদ্ভুত। বুড়ো মানুষ। কখন কী যে বলেন ছাই, বোঝাও মুশকিল। এক ঝটকায় রাস্তায় এসে নামল রাধা। আজ সে নতুন মেয়ে, নতুন মানুষ।

কিন্তু তার প্রতিদিনের রাস্তাটা নতুন ছিল না। দু-ধাবে বড় বড প্রাসাদবাড়ি বা ধনী পাড়ার সাজানো পথঘাটেব গাছপালা দোকানপাট সবই তার নিত্যদিনেব চেনা। এমন কি, পথচলতি মানুষজনেব অনেককে সে ভালো করেই চেনে, নয়তো চোখের

চেনায জানে। নরম রোদ্দুর, ঝিবঝিবে বাতাস, দু-চারটে পাখির-ডাকে সকালবেলার শহরটাকে দেখলেই তার কইমাগুরেব কথা মনে পড়ে যায়। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না কেউ। সব দিকেই সকলের ছুটোছুটি, কাজের তাড়া। গোটা দুপুব ছুটতে হবে বলে তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে সবাই এবং সকলের সব ছোটায যারা ঘরে থাকে, ঘরেব মেয়েরাও বসে নেই কেউ। সেই বেদম ছুটে-চলায রাধা আজ পায়ে-পায়ে বারবাব আটকে আটকে যায়। শায়ায়-শাড়িতে বড্ড ভারি-ভাবি হযে উঠছে তলার দিকটা। খুলে-খুলে যেতে চাইছে নাভিব তলায কুঁচির গোছ। অথচ শাড়িব ইজ্জতেই সে যেন বুক চিতিয়ে চলার একটা ভঙ্গি পেয়ে গেছে হঠাৎ। ডান হাতে দুধের-ক্যান, বুকের দিকে টেনে-তোলা শাড়ির আড়ালেই বাঁ-হাতে বাববার পেটের কুঁচি পবখ কবে দেখার অস্বস্তি সামলে সে তার ইজ্জতের ভঙ্গিটাকে জিইয়ে রাখতে চায় এবং নিজেকে বদলে ফেললে বদলে-যাওয়া মানুষ যেমন করে এপাশে-ওপাশে আড়চোখে তাকিয়ে চিনে নিতে চায় নিজের বদলটাকে, পথচলতি কোনো পুরুষমানুষকে তেমন কবে নয়, সংখ্যাল্প মেয়েদের নজবগুলোকেই সে খোঁজে বারবার। কেজি ইশকুলেব মাযেবা বইখাতার-ব্যাগ জলেব-বোতল আর বাচ্চাকে নিয়ে ছুটছে হনহন, অথবা সকালের ইশকুল কলেজে পড়তে যায় যেসব দিদিমণিরা কিংবা যাবা বাবুদেব-বাড়ির কাজেব-মেয়ে, রাধাবই মতো, দুধ আনতে যাচ্ছে সরকারি ডিপোতে নয়তো দোকানপাটে যাচ্ছে ফাইফরমাশে, যাদের সে চেনে বা চেনে না—সপাসপ দৌড়ঝাঁপে সকলেই ছুটছে এমন, ডানে বাঁয়ে তাকাবাব ফুরসতই নেই কারুর। লঘু পাযে যাঁরা, তাঁদেরও হুঁশ নেই। কৃষ্ণচূড়ার বঙে টকটকে লাল শাড়িটা তেমন কিছুই নয আসলে। শাড়ির ভেতর রাধা নেই, রাধার মধ্যেও শাড়ি নেই? সাবা গাযে রঙের এমন জেল্লা ছড়িযেও প্রথম শাড়িতে কারুব নজর কাড়তে পারে না কোনো মেয়ে? চাপা অভিমানটা জিয়নো থাকতেই পারে বুকের ভেতর। দাঁতে দাঁত চেপে, গাল ফুলিয়ে, চোখ ভিজিয়ে লাভ নেই। সময় নেই থমকে দাঁড়াবার। তাকে ছুটতে হয। আসলে তাব নিজেব কোনো বয়স নেই। নিজেব মধ্যে বেড়ে ওঠার কোনো কদর নেই। গোয়ালেব মালিক যেমন কবে আচমকাই বুঝে যায় একদিন—সাবখোলে জাব দিয়ে বড় করে তোলা বাছুর কবে কখন দুধেল হয়ে ওঠার বয়স পেযে গেছে। গাইগরুর বয়স তার দুধের মাপে।

চমকে উঠল। ওপাশের ফুটপাতে, বেশ কিছুটা দূরেই এখনও, মর্নিং-ওযাক থেকে ফিরছেন সাহেব। প্রতিদিন ভোববেলা নিয়মিত দাড়ি-কামানোর অভ্যাসে সাফসুফ ফর্সাই থাকে দুটো গাল। অথচ ভালোমতো পাক ধরেছে চুলে। দুদিকে দুটো জুলপিই ধবধবে শাদা। বাপের-বযসী মানুষটাকে ঠিক এখন, বোজই ভোরবেলা, অন্যভাবে দেখে রাধা। শাদা হাফপ্যান্ট, শাদা বাগি গেঞ্জি, শাদা মোজা, শাদা কেডস। রোজকাব মতো আরো দুজন সাহেবমানুষ তাঁর পাশে। তিনজনেরই হাতেব শেকলে নেকড়ে গোছের আলাদা আলাদা জাতের তিনটে কুকুব।

রাধা পালাতে চাইল। শাড়িব-রাধাকে চিনবেন না সাহেব। কিন্তু বাঘা চিনে ফেলবে। আপন মানুষদের গন্ধ জানে ডোবারম্যান। সে-আরেক বিপদ। শেকলেব টান ছিঁড়ে যদি ছুটে আসতে চায়? ওকে টেনে ধবে বাখতে পারবেন না সাহেব। নিজের পুষ্যিব

তর্জনেগর্জনে বেয়াড়াপনায় যদি রাস্তার ভিড়ে ইজ্জত যায় অমন একজন মান্যিজনের? রাধাকে দেখে চমকায় মানুষ? সাহেবকেই ভয় রাধার। ছোটে, ছুটে পালায়। রাস্তার ভিড়েই আড়াল ঢাকে নিজের।

সাহেব ডিঙিয়ে এসে রাধা নিজের মতো করে নিজেদের ভিড়ে ঠাঁই পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অঞ্জলিদি মণিদি শোভা শিখা জবা তখনও লাইনে ছিল। অনেক আগে এসে দুধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে মহুয়া আর রত্নাদি। রাধা এসে দাঁড়াল হোঁৎকামতো মোটাসোটা বুড়ো দাদুর পেছনে। খিটকেল বুড়োকে দেখলেই কেমন হাসি পায় রাধার। দুধের লাইনে সবাই চেনে লোকটাকে। সবাই দেখে। হাসিঠাট্টামশকরায় পেছনে আওয়াজও দেয় ছেলেরা। খিস্তিখাস্তার হুল্লোড় বেঁধে যায় প্রায়ই। সবই তামাশা। অঢেল পয়সা নাকি আছে লোকটার। শ্যামবাজারে না কোথায় মনোহারী দোকানের ব্যবসা হাঁকিয়ে লেকটাউনে তিনতলা মস্ত বাড়ি। ঝি-চাকর রাখবে না, সাহেবি কুকুর পুষবে না, জানালাদরজায় পর্দা টাঙাবে না, গাড়ি কিনবে না, এমন কি খরচার ভয়ে রিকশ অব্দি চড়বে না বুড়ো। ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করবে রোজ। মামলা করবে। অথচ দুধ খাবে। পায়েস খাবে। হেঁটো ধুতি পরে, ঢলঢলে ফতুয়া গায়ে চাপিয়ে নিজেই এসে দাঁড়াবে দুধের লাইনে। এখানেও খামোকা ঝগড়া করবে এর-ওর সঙ্গে। এবং আজ যখন সেই বুড়োই ঘুরে দাঁড়িয়ে কুতকুতে পিচুটি-গলা চোখে অসভ্যের মতো পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাপাশতলা চেটে চেটে দেখল রাধাকে, রাধাও বুঝল, ছানিগলা বুড়োর চোখে আজ সে নিত্যিদিনের চেনা মেয়েটা নয়, নতুন শাড়ির অচেনা রাধা এবং রাধাও বুকের কাপড়টা ডান হাতের আঙুলে অনাবশ্যক নেড়েচেড়ে, পিঠের আঁচল ডান কাঁধ ঘুরিয়ে টেনে এনে নিজের পেখম খুলে রাখতে চাইল। শুধু খ্যাকখ্যাক বুড়োই বা কেন, লাইনে বা লাইনের বাইরে জোয়ানমরদ যারা, ভদ্দরলোক বা চাষাড়েচোয়াড়ে, অনেকেই নানান অছিলায় চোরাগোপ্তা তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক থেকে। সেখানেও খুশির বা অখুশির কিছু নেই। রাধা জানে, সেটা শাড়ির-রাধা নয়। সেজেগুজে থাকলে এমন নজরানা রাস্তাঘাটে একটু-আধটু পেয়েই থাকে মেয়েরা।

লাইন এগোয়। শূন্যভাণ্ড নিয়ে রাধাকেও এগোতে হয়।

লাইন ফুরোয়। দুধের পাত্র ভরে নিয়ে ঘরে ফেরার পথে সখীদের জটলার দিকে আর এগোয় না সে। মণিদি বিধবা মেয়েছেলে। ঠিক-ঠিক বয়স ধরতে পারে না রাধা। এমন কিছু বয়স্কাও নয়। বিয়ে হয়েছিল রত্নাদির। বরটা খারাপ। সোয়ামির ঘর ছেড়ে এসে খেটে মরছে পরের ঘরে। অঞ্জলিদির বিয়ের কথা ভাববে, এমন লোকই নাকি কেউ নেই কোথাও। শাড়িই তো পরবে ওরা। বয়সে অনেক বড়। শোভা জবা শিখা নন্দা পার্বতী মানু ম্যাকসিতেই গা ঢেকে আছে এখনও। কণা পারুল আবিরা বয়সে ছোট। এখনও ফ্রক পরে। কিন্তু ছোট-বড়র ফারাক থাকে না দুধের ডিপোয় সুখদুঃখের গপপোগাছায়। অল্পবিস্তর পয়সাওলা বাবুদের বাড়িতেই সকলের কাজ। যার যে-বাড়িতে কাজ, সেখানে পয়সার ঘরে কে কী বলল, কোথায় কী ঘটল—কথায় কথায় সাতকাহন তার। টিভি-সিরিয়াল শনি-রবিবারের 'বই' দেখার খোশগপপো করার, সারা দিনের খাটাখাটুনিতে, এই তো এটুকু সময়। ঠমক মেরে চলে যেতে চাইলেও লোভ তো

থেকেই যায় একটু। ভেতরে ভেতরে গোঁসাও থাকে। ইচ্ছা আর অনিচ্ছার মেশামেশিতে রাগটা অভিমান হয়ে ওঠে। অভিমানের প্রত্যাশা থাকে—নিশ্চয়ই ডাকবে ওরা কেউ।

শোভাই ছুটে এসে হাত ধরে টানল ওকে—'কি রে, পালাচ্ছিস যে বড়...'

'আঃ ছাড়। বাড়িতে কাজ আছে। মুন্নিদিদির কলেজের পরীক্ষা আজ।'

'কাজ দেখাচ্ছিস কাকে লো? আমরাও কি বসে খাই নিকি?' শোভা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠল—'জানিস, মণিদি আর আসবে না কাল থেকে।'

অ্যাঁঃ! ঝলকে উঠল রাধা। এগোল ত্রস্ততায়—'এ-কী শুনছি গ? সত্যি? তুমি কোথায় যাবে গ মণিদি?'

'সে-আমাদের যাওয়া আর থাকা...' বুকের পাঁজরা ভেঙে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উগরে-ওঠা মণিদীপার কণ্ঠধ্বনি—'কথা হয়েছে দমদম পার্কের একটা বাড়িতে...'

'সে-ত অনেক দূর।'

'দূর? সে-আর কী করা যাবে? পেটটা তো চালাতে হবে।'

'কেনে? যাবে কেনে? এখেনকার বাড়িতে ত ভালোই ছিলে তুমি। টিভি আছে ওদের। ভি. সি. আর. আছে। বাসনমাজা কাপড়-কাচা ঘরদোর ঝাড় দেবার জন্যে লোক আছে আলাদা। ছোট্ট সংসার...'

'বাইরে থেকে সে-ত সবই ভালো দেখায় অমন। তোরাও কি খাবাপ আছিস নাকি কেউ?' ঠোঁট ভেঙে আলতো করে হাসল মণিদীপা—'মাগনা তো খাওয়ায় না রে কেউ। খেটে খাব, মেয়েমানুষের শরীর বলে কি সেটাও করতে পারব না? এ-ঘর ও-ঘর করে মরি। একজনকে মা ডাকি তো আরেকজনকে বৌদি ডাকতে হয়। আসলে কেউই তো কিছু না। শেষে সবারই চক্ষুশূল...'

সকলেই তাকিয়ে থাকে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। মণিদীপার শব্দগুলোও যেন কাউকে শোনানোর জন্য নয়। মুখে বলে, গলার নলি গড়িয়ে ভেতরের দিকেই চলে যায়—'তিরিশ পেরলো তো ভাবলাম, বুঝি বেঁচে গেলাম। ধ্যাৎ, হয় নাকি সেসব? থাক বাপু, বড়লোকদের পাড়ায় কাঁচা পয়সার ঘরে আর নয়...'

'এম্‌মা, তুমি সাধ করে বুড়ি হতে চাইছ গা মণিদি?' দীপ্তি, ডাগর বয়সে এখনও ব্লাউজ-মিনিস্কার্ট পরে, খলবলিয়ে উঠল।

'ধ্যাৎ, কি বলছি, সে-তুই বুঝবি না। যাক আর কটা দিন। বুঝবি বুঝবি...' পিঠ থেকে এক গোছ চুল বুকের ওপর টেনে এনেছে মণিদীপা। ঘন অমাবস্যার রঙে রুপোলি ঝিলিক নেই ছিটেফোঁটা। চার-আঙুলের চিরুনি টেনে অযত্নের কেশে জট ছাড়াতে ছাড়াতে—'বয়স বাড়লে পালাবি কোথায়? বয়স নিয়ে এর বাড়ি ওর বাড়ি কাজ করে বেড়াবি...মাথার ওপর ছাদ থাক ছাই না-ই থাক, খিল-তোলা একটা ঘর তো চাই মেয়েমানুষের। কে দেবে রে তোদের? সাবধান রে, খুব সাবধান। আবার সবাই-ই তো তেমন খারাপ লোক নয়। বুঝেশুনে সাবধানে থাকবি একটু...'

এই...এই দেখো! ফের...ফের সেই সাবধান আর সাবধান? শাড়ি পরলেই বড়রা সবাই সাবধান-সাবধান করে কেন এমন? রাধা মোচড় খেলো।

ঘরে ফিরে যাওয়ার তাগিদ ছিল সকলেরই। আসলে দুঃখী-দুঃখী চেহারায় এতদিনের

চেনা মণিদিকে নিয়ে অস্বস্তিই দোহাই হয়ে যায় সরে পড়ার। কিছুই তো করার নেই কারুর। মণিদিকে ভালোবাসত ওরা সবাই। নাকমুখচোখের গড়নে এমন একটা মায়া-মাখানো মুখশ্রী, মনেই হয় না মাসের শেষে মাইনে গোনেন হাত পেতে। বামুনঘরের বিধবা মেয়ে। ইশকুলের পড়ায় অনেকগুলো পাশও নাকি দিয়েছিলেন অনেক উঁচু ক্লাশ অব্দি। এত যে কষ্ট, ব্যথায়-ভরা দুটো চোখ কাঁদে না কখনও। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল রাধা। আলগোছে একটা ফন্দি ঠোককর মারল মাথায়। যূথিমাসি যদি চলে যায় কোনোদিন? কুছ পরোয়া নেই। মাকে বলে সে ডেকে আনবে মণিদিকে। কে ভালো? যূথিমাসি না মণিদি? অনেক বড় বড় বাড়িতে রান্না করেছে মণিদি। সাহেববাড়ির হেঁশেলের যন্তরপাতি সব চেনে। কিন্তু খটকা লাগে। কী-সব আবোলতাবোল ভেবে যাচ্ছে সে? সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সুন্দব সুন্দর কথায় যদি ভুলেই যান মা? মাকে ভুলিয়ে সাহেববাড়িতে যদি নিজেব জায়গাটা পাকা করে ফেলে মেয়েছেলেটা? ধ্বুস, মরুক গে ছাই। এমন ছিটিয়াল একটা মেয়েছেলের জন্যে কাউকে কিছু বলতে ভারি বয়েই গেছে তার।

আসলে শাড়ির-রাধা ভুলেই গিয়েছিল, আজকেব ক্রোধটা তার সেভাবে মণিদির ওপব নয়। ওসব দুঃখুফুখ্যু করে তার বাড়ন্ত বয়সের সাজ, ভালো চোখ মন্দ চোখ যাই হোক, চোখেই দেখল না কেউ! বললই না কেউ কিছু?

কিন্তু সাহেববাড়ির চায়ের টেবিলে মাতন উঠল জব্বর। মুনমুন তো প্রথম দর্শনেই লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে—'ওফ্ নন্নাইস! কী ভালো, কী সুন্দর লাগছে রে রাধু তোকে দেখতে! কে বলবে আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট তুই? কত বড় হয়ে গেছিস একদিনেই।'

বুলবুলি আরো বেশি উচ্ছলতায়—'নাউ দ্য ব্ল্যাক প্রিনসেস উইল সার্ভ আস ব্রেকফাস্ট লাইক দ্য এয়ারহস্টেজ ফ্লাইং ওভার দ্য স্কাই...'

হেসে উঠল ওবা তিন ভাইবোন। লম্বা খাবার-টেবিলেব ওপাশে খবরের-কাগজে মুখ আড়াল করে ছিলেন নিশীথরঞ্জন। কাগজটা একটু সরিয়ে চশমার ফাঁকে শুধু তাকালেন একবার। হাতে-পায়ে, শরীবের গাঁটে-গাঁটে ঝনঝনিয়ে ওঠাব জন্যে এটুকুই যথেষ্ট ছিল রাধাব।

পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য পট কাত কবে চা ঢালছিলেন কিরণময়ী। ভ্রূ তুলে দেখলেন এক পলক—'হুঁ, এখন থেকে শাড়িই পববে ও। কেন? এই তো বেশ সুন্দব দেখাচ্ছে। ভালো মানিয়েছে। কি যে বিচ্ছিরি কতগুলো ম্যাকসিফ্যাকসি পরে ঘুবে বেড়ায়...'

দুধেব ক্যান নিয়ে সরে যেতেই পারত রাধা। বিস্কিট রঙের বাহারি হাউসকোট মা-ব গায়ে। তাব নিজের রং লাল। মায়েব দিকে তাকানোয়, হঠাৎ, অন্য দিকে চোখ পড়তেই এক ঝলকে কেঁপে উঠল ছ্যাঁকায়।

'তুমি কি আমাদেরও শাড়ি পরতে বলবে নাকি মা?' মুনমুন ভ্রূ কুঁচকে হাসে।

"হাউ হরিবল...' লাফিয়ে উঠেছে বুলবুলি—'উড ইউ রিয়েলি ডু দ্যাট? শশ্শিট। আই ওন্ট আই ওন্ট অ্যাকসেপ্ট ইট। ওফ্ নেভার...'

'শাড়ি পরলেই তো দুটো হাঁটু ঠোকাঠুকি করবে ভেতরে। হাউ অকওয়ার্ড...' মুনমুন।

হেসে উঠেছেন সকলেই। ওদের তুলকালামে বাধা ছুটে পালায়। লক্ষই করেনি কেউ—এক লহমার পলকপাতে দাদাবাবুর ভ্রূ-কাঁপানো চোখজোড়ায় ছুঁচলো চাহনিটা এত ন্যাতান্যাতা বরফ-ঠাণ্ডা আর আলাদা-আলাদা মনে হলো কেন এমন? তেরচা করে স্থিরপলকে তাকিয়ে ছিলেন এমন, এক ঝলকেই একটা কাঁপুনি তিরতিরিয়ে উঠেছিল সর্ব অঙ্গে তার। ছিঃ ছিঃ কী পাপ, কী পাপ গ! লজ্জায় আর ধিক্কারে থুতু ছিটতে ইচ্ছে করছে নিজের গায়েই। এমন পয়সাওলা বড়ঘরের কলেজের-পাশ-দেওয়া ছেলে দাদাবাবু! হাত বাড়িয়ে চাইলে কী না পেতে পাবেন এই দুনিয়ায়? তাকে নিয়ে, তার সম্বন্ধে এমন একটা আকথাকুকথা সে ভাবল? ভাবতে পারল? এত...এতটা খাবাপ মেয়ে হয়ে গেছে সে? ছিঃ ছিঃ, কোনোদিন নবকেও ঠাঁই হবে না তাব।

অসহ্য জ্বলুনি। ওঁদের চোখেব নাগাল ছেড়ে বাইরে এসেও হাড়মাস পোড়ানিব শেষ নেই। ঝলসে ঝলসে যাচ্ছে গা-গতর। হাঁপাতে হাঁপাতে পিঠের আঁচল টেনে নাকমুখ গালগলা মুছতে মুছতে নিজের সঙ্গেই নিজের যুদ্ধু। এমনটাই বা হবে কেন? হয়তো মনেরই ভুল। চোখের ধাঁধা। অথবা তাব নিজেরই কুনজর। নইলে আজই তাব হঠাৎ মনে হলো কেন, গাট্টাগোট্টা শরীরস্বাস্থ্যে কেমন জবরদস্ত একজন পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছেন দাদাবাবু? ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছে যাঁকে, একসঙ্গে চারজনে মিলে খেলেছেও কতদিন! আজই কেন তাঁব দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে এমন করে অঙ্গ কাঁপল তার?

পাপ! বাধা মরমে মরে যায়। ভালো থাকতে চাইলেও এমন করে পাপ ঢোকে কেন গ মানুষের শরীরে? আবেক মরণ।

সত্যি, অবাক কাণ্ড! প্রথম শাড়িব গৌববে বা বঞ্চনায় নিজে ঢ্যাঙা হয়ে গিয়ে জগৎসংসারের অনেককেই বেশ বডসড লম্বা দেখতে শুরু করল রাধা। নিদারুণ চক্ষুরোগ।

মাত্র আড়াই মাসেব যে-চতুষ্পদ এ-বাড়িতে এসেছিল একদিন, ওকে কোলেপিঠে যত্নআত্তিতে বড় করে তোলাব পব, ওর বাড়বাড়ন্ত যে এমন একটা খুনে হায়না বা নেকড়ে হয়ে ওঠা, নিত্যি-দেখাব অভ্যাসে নজরই পড়েনি এতকাল। অনেক উঁচু আব লম্বা লম্বা চারটে পা গোটা শরীবটাকেই উঁচিয়ে বেখেছে এমন, মাপে মাপে মাথা থেকে পাছা অব্দি পিঠের শিরদাঁড়াও দীর্ঘতর—ডাকাবুকো চেহারায় বাঘা আর কুকুব থাকে না। ওকে কুকুর বললে কী যে ভীষণ ক্ষেপে যায় বুল্লিদিদি! ওকে ডগ বলতে হয়। বাঘা ডগ হয়ে যায়। ছিটেফোঁটা মেদ নেই। ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা থাকা ধাতেই সয় না বুনো জানোয়ারটার। টাইমে-টাইমে খাওযা, টাইমে-টাইমে শেকলে বাঁধা-থাকা, টাইমমাফিক ছাড়া-থাকা। বেটাইম হলো তো কিছুতে, কিংবা নতুন-মুখ দেখল কাউকে, আব বক্ষে নেই। গোটা বাড়ি মাথায় তুলে চেঁচাবে এমন, ওকে তোয়াজ না দিয়ে তিষ্ঠোবে ঘরে, সাধ্যি কার? নাকের ডগায় থেঁতলানো ছুঁচলো মুখটায় এমন হিংস্র আর ভয়ঙ্কব দুটো চোখ, নন্দদা সামলাতে পারে না সব সময়। যেখানে যত কাজেই থাকুক, রাধাকে নেমে আসতেই হবে নিচে। পেটবুকেব চার কোণে সবল চাবটে রাং। আদরে হাত

বুলোয় রাধা। পোড়ামাটিব রঙে ঘন লোম, পায়ে তলার দিকে হলদেপানা ছোপ। এমন পরিপাটি মোলায়েম লোমের বাহার, উঠোনে-শুকতে-দেওয়া ধানের মাদুরে হাত বুললে যেমন, পুষ্যির গায়ে আদর মাখতেও একই আরাম তার। এমন একটা তেজী জানোয়ারের লেজ কেন কেটে ফেলা হয় কিংবা কানের লতি দুটো কান ঢেকে ঝুলে থাকে কলাপাতার মতো, হদিশ জানে না সে। গোলামির বকলস গলায় এঁটে বাঘা হারামিপনা করে নি কোনোদিন।

সাহেববাড়ির পাহারায় হুকুমবরদার জ্যান্ত নেকড়ে। মাসমাইনের বালাই নেই। খাইখরচায় মস্ত পেট।

হিংসে নেই রাধার। বরং অগাধ ভালোবাসা। সপ্তাহে অন্তত একদিন ওকে ধুয়েমুছে সাফসুফ করে দেবার নিয়ম। সেদিন একতলায় আউটহাউসের কলতলায় বাঘাকে স্নান করাতে এনে নিজের কাছে নিজেরই অজ্ঞাত পরিচয়ে রাধা চমকে উঠল। মানুষের বাচ্চাকে স্নান করাতে নিয়ে এসে গায়ে জল ঢাললে ন্যাংটো খোকা যেমন করে খলবলিয়ে খুশিতে খুশিতে মাতন লাগায় হাত-পা ছুঁড়ে, ভয়ঙ্কর বাঘা জলের হাঁকপাকে সেই শিশুই থেকে যায়। কিংবা দামাল ভয়ঙ্কর। ধমকে-ধমকে চড়চাপড়ে সামলে রেখে ওর মসৃণ রোমশ গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে যখন পিছলে পিছলে যাচ্ছে রাধার হাত অথবা ওর মাথায়-মাথায় নিজেকে রাখতে চেয়ে হাঁটু ভেঙে বসে শায়ায় শাড়িতে ভিজে ভিজে সে নিজেও একশা, বাঘা খুশির নাচনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। পেছনের দুটো পা মাটিতে রেখে সামনের দুটো পা রাধার কাঁধের ওপর। ব্লাউজটা ছিঁড়ে যেতে পারে ধারাল নখের আঁচড়ে, কেটেকুটে যেতে পারে গায়ের চামড়া। হাঁ-হাঁ-করা জিভে দাঁতে কামড়ে ধরেছে বুকের কাপড়। বেহুঁশ টানাটানিতে ছিঁড়ে যেতে পারে, খসে পড়তে পারে বুকের আঁচল। এভাবেই প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি যখন ঝাঁপিয়ে নামে সর্বাঙ্গে তার, পশুশক্তির চাপ আক্রমণ নয়, আক্রান্তও নয় সে। প্রশ্রয় বা প্রতিরোধ—দুর্বোধ্য নিজের কাছেই। কপট ক্রোধে দামালকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেও, দাঁতে দাঁত চেপে দেহের সমস্ত তাকত নিয়ে, নিভৃতে, নিজেরই কোষে কোষে সংকুচিত হতে হতে সে যেন ভিন্নতর এক পরাক্রমকেই চিনে নিতে পারে গোপন লজ্জায়।

আগোছাল থেকে বুকের আঁচল টেনে নিয়ে হাপুসহুপুস ঘন নিঃশ্বাসে হাঁপায় রাধা। সত্যি-সত্যি আঁচড় লেগেছে ডান দিকে, বুকের নরমে। জ্বালা-জ্বালা করছে একটু। ভাগ্যিস, আঁটোসাটো ছোটজামা ছিল। রক্ত পায় নি বিষাক্ত নখ। হাঁপাতে হাঁপাতে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বাঘার গালে একটা সপাট থাপপড়—'কী অসভ্য! কী অসভ্য রে তুই?'

গায়ের ওপর হামলে-পড়া জবরদস্তের সঙ্গে খেলা যায় এমন খেলা ভরদুপুরেই, অনেক খোলাখুলি।

অভিমানী পুষ্যি, দামাল দস্যিটা হাঁটুর কাছে এসে ঘাড় উঁচিয়ে চেঁচাচ্ছিল তারস্বরে। লালা-ঝরা লম্বা জিভের হাঁসফাসে আদর চাইছিল। ঘাড়েপিঠে সোজা থেকে, হাঁটুর কাছে শায়াশাড়ি মুঠোয় চেপে অনেকটাই তুলে নিয়ে, যতটা সম্ভব পায়ের জোরে একটা লাথিই মারল জন্তুটার পেটে—'যা হতভাগা, য্‌যা। দূর হ। পাজি নচ্ছার। ডগ না হাতি। তুই একটা কুকুর রে। তুই কুত্তা।'

রাস্তায় নেমে রাধা সেদিন আচমকা আঁতকে উঠল। ঘরের-মেয়ে সে। সে জানে, ঘরের-মেয়েদের কীভাবে গা বাঁচিয়ে আলগা থাকতে হয়।

অঘ্রাণ ফুরিয়ে পৌষমাস। জাঁকিয়ে শীত নেমেছে শহরে। ঘড়ির কাঁটায় আর বেলা গড়ায় না। সুয্যি থাকতে থাকতেই কখন যে ছায়ায় ছায়ায় আবছা হয়ে আসে দিনের আলো। বিকেল থাকে না। ঘরে-বাইরে অবেলার বিজলী বাতি। ধোঁয়া আর কুয়াশার রাস্তায় স্ট্রিটলাইটের আলোগুলো নেহাত-ই খামোকা।

দিদিমণিদের জন্য সওদায় পাঠিয়েছিলেন মা। যে-জিনিস মেয়েদেরই জন্য, নন্দদা বা অন্য কাউকে পাঠানো যায় না। ওরা ব্যাটাছেলে। দিদিমণিরা নিজেরা রাস্তায় নামবে কেন, ঘরে এতগুলো দাসীবাঁদি থাকতে? ছিঃ! রাধাই তো যেতে পারে শুধু। রাধাই যায় ফিমাসে।

কাছে-দূরে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ঘন ধোঁয়াশায়। রাস্তা আর ফুটপাতের ফারাকও মুছে আছে যেখানে, পার্কিংয়ের গাড়ি বা স্কুটার বা মোটরবাইক, হাজারটা রিকশ সাইকেল সব সামলে প্রতি মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ারও ভয়। ছোট একটা চাদরে পিঠবুক ঢেকে রাধা পথচলতি মানুষজন বা প্রতিদিনের চেনা প্রাসাদ অট্টালিকা ডানেবাঁয়ে রেখে সহজ নিয়মেই এগুচ্ছিল পায়ে পায়ে।

ভাবতেই পারে নি, এমন একটা ঘটনা ঘটবে। ঘটে যেতে পারে কখনও!

রাস্তার মোড়ে কপিল ঘোষের চায়ের দোকানের পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে হঠাৎ-ই চোখে পড়ল এবং বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠতেই তড়িঘড়ি কী করবে, এক লহমায় হদিশ না পেয়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে, দূরে দাঁড়িয়ে বুকের কাঁপুনিতে যখন নিজের কাছে নিজের চোখজোড়াই মস্ত ধাঁধা, পিছু ফিরে আরো একবার পরখ করে নেবার ইচ্ছে হলো—কে লোকটা? না-কী তার নিজেরই দেখার ভুল? সে কী করে সম্ভব? কোত্থেকে এল? কেন আসবে এখানে?

খোলামেলা রাস্তায় মাথায় ঘোমটা টানতে পারে না অনূঢ়া মেয়ে। গায়ের চাদরটা পিঠ থেকে তুলে নিতে পারে অনেকটাই এবং মাথার অর্ধেক পর্যন্ত টেনে নিয়ে দুদিক থেকে চাদরটাকে নাক অব্দি ঢেকে নিলো এমন করে, যখন শুধুমাত্র দুটো চোখই খোলামেলা থেকে যায়। এভাবে নাকমুখকান বা পুরো চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেলে রাধা আর রাধা থাকে না। যে-কোনো একটি মেয়ে হয়ে যায় এবং নিজেকে আড়াল রেখে এবার সে পিছু ফিরে ভালো করে দেখে নিতে পারে মানুষটাকে।

ধনী মানুষদের পাড়ায় ফুটপাতের ধার ঘেঁষে টালির-ছাদ আর দর্মার বেড়ায় গরিবগুরবোদের চায়ের দোকান। ভেতরে-বাইরে লম্বা-লম্বা বেঞ্চি। ভাবি কুয়াশায় কাছাকাছি থেকেও চেনা-মানুষদেরই যেখানে চেনা যাচ্ছে না ভালো করে, কোনো ভুল থাকে না রাধার শনাক্তকরণে। পোকার উৎপাতে নিমপাতার ডাল গায়ে জড়িয়ে যে-তেজী বালবটা ঝুলছিল দোকানের বাইরে খোলামেলায়, ঠিক তার তলায় একটা বেঞ্চিতে আর-সব খদ্দেরদের থেকে আলাদা হয়ে, একা, পায়ের ওপর পা তুলে লোকটা চায়ের-গ্লাশ হাতে নিয়ে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। নিমডালের আলো-আঁধারি ছিটেছায়া দুলছিল গায়েমুখে।

এরই মধ্যে আরো কত ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে. মানুষটা? শাহজাদার ছাঁদে গাল ভরে বাহারের গোঁফদাড়ি। মাথায় একরাশ চুলের বোঝা। ঘাড়ের কাছে ঢেউ-খেলানো চটকদারি ফিলমি ছাঁট। প্যান্টশার্টে তেমন কিছু জেল্লা না থাক, ছাপছোপের চেকনাই রয়েছে খুব। ছিল গেঁয়ো ভূত। কদিনেই ঠাটবাটে শহরের স্টাইল মারতে শিখে গেছে জব্বর। ষণ্ডাগুণ্ডামার্কা তাগড়াই চেহারায় দাদাবাবুর বয়সী জোয়ানমরদ সেই লোকটা এখানে কেন?

অন্ধকারে গা লেপটে থেকে রাধা আড়চোখে ফিরে ফিরে তাকায়। বারবার ঘুরেফিরে নিজের চোখকেই পরখ করে নেবার চেষ্টা এবং যখন আর সংশয় থাকে না, গোটা শরীরে মোচড় দিয়ে সে ছুটে পালায়। দেশগাঁয়ের মানুষকে শহরের রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেলে কার না ভালো লাগে? কিন্তু এই লোকটা তার শনি, তার রাহু, তার শত্রু গেরো। খাড়ুযার সেই শিবু। বিষ্টু দেওয়ান না কে যেন আছে এক বুড়ো? তার ব্যাটা। ছুটতে ছুটতে দিশেহারা রাধা শীতের সন্ধ্যায়, ঠাণ্ডায়, মগজের ঝিমঝিমানিতে অস্থির হয়ে ওঠে। এর মধ্যে যে-দু-একবার দেশের বাড়িতে গেছে সে, কী করে-করেই যেন গন্ধ পেয়ে গেছে লোকটা! রেলগাড়িতে দেখা হয়েছে তো কেউ নিয়েছে পিছে। জ্যাঠতুতো দাদা সোনাদা, জ্ঞাতিঘরের রাখোকাকা বিমলেদাদের দোস্ত বলে একেবারে ঘরের উঠোন অব্দি চলে এসেছে দিনদুপুরে। পাছায় ঠমক মেরে সরে গেছে রাধা, চোখ টেরিয়েছে। পাত্তা দেয়নি খুব বেশি। কিন্তু কী সাহস গ লোকটার? একেবারে লেকটাউন অব্দি ছুটে এসেছে? যদি কথা বলতে চায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে? পাড়ার লোক সবাই দেখবে। যদি সাহেববাড়িতে জানাজানি হয়ে যায়? ছুটতে ছুটতে পিঠের আঁচল টেনে ঘাড়গলায় ঘাম মোছে রাধা। নাকে-মুখে-গালে-কপালে আঁচলশুদ্ধ হাত বুলোয় হাঁপায়। হিসেব বোঝে না, একজনের বুকের পাটা থাকবে তো বুকের ধড়ফড়ে মরবে কেন আরেকজন? একজন হাত বাড়ায়, পালায় কেন অন্য কেউ?

বড় কোম্পানির যে-জিনিস চেয়েছিলেন দিদিমণিরা, বড় স্টেশনারি দোকানে পাওয়া গেল না বলে আরো কিছুদূর অব্দি এগতে হয় রাধাকে। ডাক্তারখানা অব্দি।

ফেরার পথ আরো দুর্গম। অন্য একটা রাস্তা অবিশ্যি আছে ওদিকে। সেটা অনেক...অনেক ঘুরপথ। যাওয়া-আসাও নেই খুব বেশি। শীতের কুয়াশায় রাস্তায় লোকজন খুব কম। আলোও নেই ভালোমতো। বেশি দেরি হয়ে গেলে মা বকবেন। সব কাজ সেরে টিভিতে বসে পড়তে হবে সন্ধে সাতটার আগেই। আজ আর ছাড়ানছুড়ান নেই। সেকেন্ড চ্যানেলে দারুণ সিরিয়াল।

রাধা বুক বাঁধল শক্ত করে। একটা লোক বসে আছে তো কী হয়েছে? ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত তো নয়। আসলে ভেড়ুয়া। বেশি কিছু করে তো তাকাবেই না সে। না-চেনার ভান করে চোখ ঠারিয়ে চলে যাবে। বদলা নেবে গাঁয়ে গিয়ে। সাতকাণ্ড করে দশজনকে বলবে এমন, টেঁশুইমেঁশুই বেরুবে ছোঁড়ার।

কিংবা কিছুই বলবে না। কড়া-মাড়ের শাড়ি জলে-জলে বৃষ্টিতে ভিজে এলে যেমন ন্যাতানাতা, রাধা নিজের মধ্যেই নিজে ঠাণ্ডা শীতল হয়ে আসতে থাকে। কলকাতায় কোথায় যেন কাজ করে লোকটা। কলকাতায়ই ডেরা। নানান কাজে সে তো আসতেই

পারে কোথাও। এমন কি, লেকটাউনেই। খুঁজছে কাউকে! কনকনে ঠাণ্ডায় কারুব বাড়ি খুঁজে বের করা কি সোজা কথা নাকি এমন ধনীমানুষদেব পাড়ায়? ঘুবে ঘুবে হনি হয়ে শেষে হয়তো বসেই পড়েছে। জিরচ্ছে চায়েব দোকানে। চা খাচ্ছে। সিগাবেট। যা করছে, মরুক গে ছাই। আমার ভারি বয়েই গেল।

ফিবতি পথে নিজেকে আড়াল দেবার নিয়মে একই ভাবে গুছিয়েও নিতে হয় কিছুটা। গায়ে-জড়ানো চাদবটা মাথায় তুলে দিলে ঘোমটাব মতোই হয়ে যায়। ডান হাতে নাক পর্যন্ত ঢেকে শুধু চোখজোড়া ভাসিয়ে বাখলে, শাড়ি আব চাদবে বোরখার আদল পেয়ে যায় গোটা শবীব। কিন্তু ঘন কুয়াশায় গা ঢেকে উল্টোদিকের ফুটপাত ধবে দূরে দূবে পালিয়ে যাওয়া নয়, একই দিকে থেকে একই ফুটপাতের সমান্তরালে চায়ের দোকানেব পাশ ঘেঁষেই যেতে চাইল সে। কাবাডি খেলার নিয়মে ধরা দেবার জন্যে, দম থাকবে যতক্ষণ, পরেব চৌহদ্দিতে ঢুকে অনেক দূর পর্যন্ত নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েই ধরা না-পড়াব কাযদা খুঁজে আবাব ফিরে আসা। সেটাও তবে খেলার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকির।

যতই এগোয় রাধা, খেলায়-খেলায় বুকেব ঢিপঢিপ বাড়ে। এখনও একই ঠায় বসে আছে মানুষটা? চা ফুরিয়েছে। বেঞ্চিতে বসে পায়েব ওপব পা তুলে ওদিকে তাকিয়ে রাস্তার দিকে। হাতে সিগারেট। হবেক মানুষেব চলাফেরায় কী দেখছে? খুঁজছে কাকে? ট্রানজিস্টাবে নয়তো টেপবেকর্ডাবে খ্যানখ্যান আওয়াজে হিন্দি-ফিল্মের গান বাজছিল কপিল ঘোষের দোকানে। ভেতবের দিকে বসে গুলতানি অনেকগুলো মানুষের। চারপাশের নিঝুমে বিদঘুটে হল্লা। রাধা যতই কাছাকাছি পৌঁছে যেতে থাকে, বুকের আইঢাই বাড়ে। ধরা দিতে সাধ যায়। বিদেশবিভুঁইয়ে এত এত বছর আছে সে, দেশগাঁয়ের চেনা-মানুষ কাউকে কোনোকালে দেখেনি রাস্তায়। যদিও বা দেখা হলো একজনের সঙ্গে, কী অদ্ভুত বুকেব ঝলকানি, সারা গায়ে শাড়িমুড়ি চাদবমুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে একেবারে নাগালেব মধ্যে এসেও যায় এক সময় এবং চাদব-ঘোমটাব এক চিলতে ফাঁকে চোখ টেরিয়ে দেখতেও পায়, দূব থেকে ওর দিকে তাক করে চোখ মেলে বসেছে লোকটা, রাস্তার রকে বসে আব দশজন জোয়ানমরদ যেমন কবে মেয়েমানুষ শোঁকে, সেই রকম এবং যখন কপিল ঘোষেব দোকানেব সামনে এক ফালি সরকারি বাস্টপ একটা ভাঙাচোরা নড়বড়ে সাঁকো হয়ে ওঠে, দু-চার গজ ডিঙোতে অনেক...অনেক দীর্ঘ পথ। আস্তে আস্তে সাবধানী পায়ে পায়ে গা ছুঁয়ে লোকটাকে পেরিয়েও যাচ্ছে সে। কী আশ্চর্য! রাধা যে রাধাই, একই গাঁয়েব মেয়ে—হাঁদারাম টেরটি পেল না! কী বোকা! কী হাঁদাবোকা রে!

দম চাপা ছিল পেটেব খিঁচুনিতে। ভয়েব সাঁকো ডিঙিয়ে এসে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাঁপ ছেড়ে বুকের তোলপাড়ে পিছু ফিরে তাকাবাব সাধ যদিও, সাহস হয় না বাড়তি খোচাখুঁচিব। অথচ যেটুকু মজা আব চোখেব টান, থেকে যায় সবটাই। পিছনেই ... দুটো পা, এগোতে হয় সামনেব দিকে। কুয়াশায় ঢাকা শীতেব রাত্রিটাই ... খাবাপিব নিঝুম। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নিজের বাধা না মেনেই পিছু ফিরে তাকাল একবার। এখনও রাস্তাব দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে মানুষটা? বড্ড বিচ্ছিরি লাগছে লোকটাকে।

এমন করে ধোঁকা দিতে। হাজার হোক, একই গাঁয়ের মানুষ। পালায় রাধা। পালিয়ে বাঁচে।

বাড়ি ফিরতেই ধমকে উঠলেন কিরণময়ী—'ঘর ছেড়ে একবার বেরুতে পারলে ফেরার কথা আর মনেই থাকে না তোদের? কখন গেছিস! আর এই তোর ফের হলো? কোথায় ছিলি? কী করছিলি?'

'আগুন গ মা। আ আগুন...'

'আগুন? সে কি? কোথায় আগুন?'

'ওই যো গ, বড় রাস্তায়...' ইচ্ছে করেই হাঁপাতে হয় একটু। মুখেচোখে ভয় টানতে হয়—'খোলার ঘরে চায়ের দোকানটা আছে রাস্তার মোড়ে, সেখেনে উল্টোদিকের ফুটে ছাইরাঙা ফ্যালেটবাড়ির তিনতলায় না চারতলায়...'

'কী বলছিস? মিত্তিরবাবুদের ফ্ল্যাটে?' কিরণময়ী ত্বরিত চঞ্চলতায়—'তুই যা বলছিস সে-তো সুকুমারবাবুদের ফ্ল্যাটবাড়িটাই মনে হচ্ছে সেটা...'

মিছেকথার হাজার ফ্যাচাং। এগোচ্ছিলেন কিরণময়ী। দিশেহারা রাধা প্রমাদ গোনে মা যদি এক্ষুনি নন্দদাকে পাঠান কোথাও? যদি টেলিফোন করেন? এবার সে নিজেই আগুন নেভাতে তৎপর—'না গ মা, কারুর কিছু হয় নি গ। সে আগুনফাগুন কখন নিভে গেছে...'

হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে রাধা। মায়ের চোখে তার মিথ্যেটা কী ভীষণ সত্যি হয়ে উঠেছে? সে নিজেই আকুলিবিকুলিতে মরে।

'গ্যাস-সিলিন্ডার থেকে এমন সব হয় রে মাঝে মাঝে। ইলেকট্রিসিটির শর্ট-সার্কিট থেকেও হয়...' মুখেচোখে আতঙ্কছায়ায় কিরণময়ী হঠাৎ-ই ভারি গলায়—'সাবধান রে বাপু। এত যে বলি তোদের, সে-কী এমনি এমনি? দেখলি তো? নিজের চোখেই দেখে এলি। তোদের নিয়ে আমারও কি ভাবনা কম?'

বড় ঘরের মানুষদের যা হয়। ছেলেমেয়েদের মিছেকথাগুলো বড় সহজে বিশ্বাস করে ফেলেন মায়েরা। রাধাও তার কিঞ্চিৎ প্রসাদ পেয়ে যায় এবং ধমকধামক থেকে খালাস পেয়েও স্বস্তি নেই। আস্তে আস্তে সরে আসে নিজের নিভৃতে। নিজের মধ্যে নিজের সত্যিটা আরো বেশি কামড়ে ধরে থাকে হাড়েপাঁজরায়। এত বড় শহরে ঘুরেফিরে লেকটাউনেই কেন এল লোকটা? এমনি-এমনি? সে-হয় কখনও? রোজই আসবে নাকি? এর পর দিনদুপুরেই যদি দেখা হয়ে যায় কোনোদিন? কি বলবে? কি করবে সে? নিজেও জানত না, কবে কখন ভয়কে গোপন রাখার বয়স পেয়ে গেছে সে?

কদিন বাদে বুলবুলির জন্মদিন হয়ে গেল খুবই ঘটা করে। যেহেতু দিদিমণিদের জামার মাপেই এতদিন শরীরের মাপ ছিল তার, শাড়িতে এসে সেটাও হারিয়ে গেছে রাধার। সেদিন উৎসবের শেষে নিজের মধ্যেই মোটামুটি একটা হিসেব পেয়ে যায় সে। বুল্লিদিদির চেয়ে দেড়-দু বছরের বড়ই যদি হয় সে, ষোল বছর বয়স পেরিয়ে গেছে তার। মাসের হিসেবে মাথা ঘামায় না কেউ।

ফি-বছরই এমন কেক কেটে লোকজনে খানাপিনায় হল্লায় জন্মদিন দাদাবাবু-দিদিমণিদের। নিত্যি-নিত্যি উৎসবেও সুখ নেই সাহেববাড়িতে।

তিন-তিনটে পাশ দিয়ে দাদাবাবু কোন্ এক বড় কলেজের পরীক্ষায় দু-দুবার ফেল করার পর অশান্তি সংসারে। মায়ের গোমড়ামুখ। সাহেব চুপচাপ। কী-একটা পাশ দিলেই নাকি দাদাবাবুও তার বাপের মতো আরো একজন সাহেব হয়ে উঠবেন। তার জন্যে সকাল-সন্ধ্যায় দামি দামি কোটপ্যান্টে চকচকে ঝকঝকে মাস্টারমশাইদের নিত্যি আসা-যাওয়া। কাঁড়িকাঁড়ি টাকার যোগান। পড়ালেখার ব্যাপার অতশত বোঝে না রাধা। এত বড় ভাগ্যিমানী সংসারের অসুখে তারও কেমন ভয়-ভয় করে। বড় দুঃখু হয়। যাঁদের এত পয়সাকড়ি, মা-লক্ষ্মী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন সব কিছু, তাঁরা কেন হাহুতাশে মরবেন এমনধারা?

কিংবা দাদাবাবু? রাধা ঠিক বুঝতে পারে না, কেন এমন করে বদলে যাচ্ছে মানুষটা? মুখ ফুটে বলতে না-পারা একটা দোনোমনো দানা বাঁধতে থাকে বুকের ভেতর। সেই ছোটবেলা থেকে, যখন সে সাহেববাড়িতে এসেছিল প্রথম, বছর পাঁচেকের বড় দাদাবাবু দূরে-দূরেই রাখতেন ওকে। বড় বেশি ঝি-ঝি করতেন। কিন্তু বড় হবার পর চোখ জোড়া অদ্ভুতভাবে বদলে যেতে থাকে মানুষটার। বাড়ন্ত বয়সের মেয়েরা যে-চোখ চিনে নিতে পারে। খাবার-টেবিলে বা ঘরের হাজারটা হুল্লোড়ে একাকার মিশে থাকলেও রাধার খটকা বাড়ে। সে তো ঘরের-মেয়ে! এতকাল ধরে সে আছে এ-বাড়িতে! তাহলে কেন পরের চোখে এভাবে তাকাবে লোকটা?

কলজের ভেতর ঢিপঢিপ ভয় নিয়ে তরাসে কাঁপে রাধা।

তাগড়াই জোয়ান-মরদ চেহারা। তেজি বয়সের মেদে মেদে ভারি মোটাসোটা। কান ঢেকে বাবরি চুল। নাকের তলায় মোটা গোঁফ। কানের লতি ছাপিয়ে মোটা জুলপি গোঁফ ছুঁয়েছে প্রায়। বাইরে বেরুলে সাজপোশাকের হরেক জেল্লা। ঘরে থাকলে উদোল গায়ে বা স্যান্ডো-গেঞ্জির ওপর মেয়েদের মতো সোনার চেন গলায়। ছেলের শরীরস্বাস্থ্য আর পরীক্ষা-পাশের মানত করে কোন্ সাধুবাবার মাদুলি পরিয়েছেন মা। কিন্তু ছেলের নিজের ঘরে ঠাকুরদেবতা নেই। তিনতলায় ছাদের মস্ত একটা লম্বা ঘরে একা একজন জোয়ান বয়সের ব্যাটাছেলে। মাস্টারমশাইরা কেউ না থাকলে ক্যাসেট-টেপরেকর্ডারে গান চলবে সারাক্ষণ—হিন্দী সিনেমা বা ইংরেজি। ব্রেক-ড্যান্স না কি-যেন ছাই বলে, সেই নাচের বাজনা। দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে-রাখা কত যে রঙিন ছবি—ক্রিকেট খেলোয়াড় ফিলিমস্টার মারকুটে সব লোকজন। রাধা চেনে না সবাইকে। আলমারির কাচে, স্টিলের আলমারির গায়ে, দরজায় জানালায় শার্সির পাল্লায় হাজারগণ্ডা স্টিকার। ছাপার হরফে লেখাগুলি পড়তে জানে না রাধা। ঘুরেফিরে ছবিগুলিও দেখা হয়ে ওঠে না সব। দাদাবাবুর ঘরে ঢুকলেই কী যে একটা ছমছম ভয়? তার নতুন ব্যামো।

অথচ আর সব ঘরের মতো সেখানেও কাজ থাকে তার—বিছানা-তোলা ঘরঝাড়া ঘরমোছা গোছগাছ। যখন কেউ থাকে না, একা ঘরে, চা-জলখাবারও নিয়ে যেতে হয়। হাসিঠাট্টায় আজকাল বড় বেশি কথা বলে লোকটা! কখনও কখনও হাতও পড়ে গালে পিঠে মাথায়। এ-হাত তো তার চেনা। ছোট্টবেলায় খেলায় খেলায় এ-হাতে

দুমদাম সোহাগের মারও খেয়েছে কতবার। না-কী সে নিজেই আসে? নিষ্পাপের কাছে, নিজের টানে। চুপিসারে তার নিজের মধ্যেও এক ধরনের দুর্বোধ্য শুনশান তৈরি হতে শুরু করেছে আজকাল। মূঢ় কিশোরী তার হিতাহিত জানে না।

দোতলার ছাদে সিঁড়ির ধার ঘেঁষে পাশাপাশি দুটো ঘর। বেশ বড় বড়। আসবাবপত্রে ঠাসা বড্ড অগোছাল একটা ঘর। পাশের ঘরটা পড়াশুনোর জন্যে। কেউ-না-কেউ মাস্টারমশাই রোজই আসেন সন্ধেবেলা। মন্দের-ভালো তবু সেখানে ছিরিছাঁদ থাকে একটা। আর পড়ার-ঘরে লোকটা থাকে কতক্ষণ? যত হুজ্জুতি এই শোবার ঘরে। রাজ্যের যত হাবিজাবি সব এনে ঢোকাবে একটা ঘরে। কিছুই গুছিয়ে রাখবে না। নড়াচড়াই মুশকিল। এদিকে-ওদিকে ঠোককর। ঘরের গোছগাছ করতে এসে রাধার মরণ। ওসব ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারটিনার সব বাজে। কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢেলে কেনাই হয় শুধু। মাইনে-করা দাসীবাঁদিদের ঘরে রেখে পুষলে ওসব যন্ত্রপাতির মানেই থাকে না কিছু। মানুষের গা-গতর আর মেশিন, দুই-ই যদি পয়সায় কেনা, দুটো এক হলো? নাকি ওতে মন ভরে কারুর?

বিছানাতোলা বা ঘরের গোছগাছের কাজ সাতসকালেই তুলে রেখেছিল সে। রোজকার নিয়মে একটু বেলায়-বেলায় জলের বালতি আর ঘর-মোছার ন্যাতা—পুরনো ছেঁড়া একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে ছাদের ঘরে উঠে এসে যা দেখল, থমকে দাঁড়াল। হয়তো কলেজটলেজ নেই আজ। দাদাবাবু তাঁর নিজের ঘরে ঘুমচ্ছেন অসময়ে। সে-তো ঘুমতেই পারেন। ঘরটা যখন তাঁরই। তাঁর একার ঘর। কিন্তু তাই বলে ঘরের দরজা হাট খোলা রেখে উদোল গায়ে শুধু একটা জাঙিয়ায় পাছা ঢেকে ভরদুপুরবেলা এমন বিচ্ছিরিভাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ঘুমবে একটা ঢ্যাঙা লোক? ফিরে যেতেও পারবে না রাধা। ঘড়ির কাঁটায় যা ওদের অফুরন্ত অসময়, প্রতিটি সেকেন্ডের চুলচেরা হিসেবে সকাল দশটা থেকে সাড়ে-দশটায় এ-ঘরেই তার কাজ। ঘুমন্ত মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ-ই কী ভেবে, নিষ্পলক চোখের পাতায় নাড়া খেয়ে জলের বালতিটা সে তড়িঘড়ি মেঝেতে রাখল সাবধানে। শক্ত মেঝের সঙ্গে জলভরা প্লাস্টিকের বালতি সহজেই বনিবনা করে নেয়। কোমর ভেঙে নিচু হয়ে স্টিলের হাতলটা এমন আলগোছে বালতির গায়ে শুইয়ে দিতে হয়, যেন টুং শব্দটুকুও বেজে না ওঠে।

ফেনায়-ফেনায় ভরে-ওঠা গুঁড়ো সাবানের জলে হতকুচ্ছিত তোয়ালেটাকে ডুবিয়ে নিংড়ে নিতেও একই সতর্কতা। কাচের মতো মসৃণ মোজায়েক মেঝেয় ভেজা জলন্যাকড়া টানার কোনো আওয়াজ থাকে না। উবু হয়ে বসে সে ভাবল একবার—ডিভানের দিকে পিঠ রেখে ওপাশের দেয়াল থেকে কাজ শুরু করবে। পিছুবে ডিভানের দিকে। অথবা রোজকার নিয়মে ডিভানের দিকেই মুখ থাকবে তার? ঘুমন্ত মানুষ চোখ মেলে দেখে না কিছু। কিন্তু জেগে ওঠে যদি?

রোজকার নিয়মটাই থাকে। ডিভানের দিকেই বালতিটা এগিয়ে নিয়ে আসতে হয় তাকে। ব্যাঙের ঢঙে হাঁটু ভেঙে বসে, মাথা নুয়ে মেঝের দিকেই চোখ রেখে, দাঁতে ঠোঁট চেপে জলন্যাকড়া টেনে টেনে পিছুতে হয় পায়ে পায়ে। চোখ তুলে তাকাতেও যেখানে কী এক অবোধ বাধা, গঁ-গঁ নাক-ডাকার একটা আওয়াজ, বর্ষার দিনে দেশগাঁয়ে

ব্যাঙের ডাকের মতোই হয়তো সেটা, ভরদুপুরের নিঝুমে একমাত্র ধ্বনিটুকু টিকে থাকে। মাথার ওপর ফুলস্পিড পাখার বাতাসে যেটুকু শব্দ, তার কোনো শ্রুতি নেই। নাক-ডাকার ধ্বনিটুকুই পুরোপুরি একজন মানুষ এই নির্জনতায়। এবং সেই মানুষটার সঙ্গেই রাধা এখন নিঝুম ঘরে একা? ঘাড় গুঁজে উবু হয়ে, মেঝের সঙ্গে প্রায় লেপটে থেকেই নিকোতে নিকোতে চোখজোড়া ঘুরেফিরে যেখানে গিয়ে পৌঁছয় বারবার, সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লোকটা। ঘুমচ্ছে নাক ডেকে। সুখের মেদে জোয়ান বয়সের ভারি শরীর। থলথল উদোল বুকে গাঢ় ঘন লোম। সরু সোনার চেনটা সুডোল গলার সঙ্গে সেঁটে গিয়ে ঝুলে রয়েছে ডান দিকে। সেসঙ্গে মাথাটাও হেলে পড়েছে বালিশের এক পাশে। হাঁ হয়ে আছে ঠোঁট দুটো। চোখজোড়া বুজে থাকলেও ফাঁক হয়ে আছে, কড়ির পেটটা চেরা থাকে যেমন। কাছে গিয়ে উঁকি দিলে চোখের ডিমদুটোও দেখা যাবে হয়তো। মনে হতেই পারে, বুঝি জেগেই আছে আসলে। চোখ পিটপিট করে দেখছে সবই। দেখছে রাধাকে।

কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারে না রাধা। কেমন বাধো-বাধো। ঘরদোর কাঁপিয়ে হঠাৎ-ই ঘুমের মধ্যে লোকটা ঘঁ-ঘঁ শব্দ তুলে ঘাই মারল এত জোরে, শান্ত পুকুরের জলে বড় মাছের ঘাই-মারার মতোই দাবড়ানি—ডান দিকের আড় ভাঙতে রাধার দিকেই মুখ করে হঠাৎ পাশবালিশশুদ্ধু মুচড়ে উঠে বাঁদিকে ঘুরল দুমদাম প্রলয় পৌরুষে। মরণ পাশবালিশটার। বাঁ-হাতে জাপটে ধরে বুকেপেটে লেপটে পাশবালিশের ওপর বিশাল ভারি দামনাটা উঠে আসার পর এক চিলতে জাঙিয়াটুকুও আড়াল হয়ে যায়। মরণ রাধারও।

হাঁটু ভেঙে জলন্যাকড়া টানতে টানতে কনুই আর কাঁধে ব্যথায়-যন্ত্রণায় এক সময় চতুষ্পদই হয়ে ওঠে রাধা। পায়ের পাতা, হাঁটু আর বাঁ-হাতের তেলোয় দেহের ভর রেখে শুধু ডান হাতে নিজেকে ঘিরে জলের রেখায় অর্ধবৃত্ত টেনে টেনে পিছতে থাকে ঘরমোছার নিয়মে। মাথা তোলে না। ভরদুপুরের গা-ছমছম নিঝুম বড় সাংঘাতিক। বাইরে কারুর পায়ের শব্দ ছলকে উঠতে পারে এক্ষুনি। যে-কেউ ঢুকে পড়তে পারে ঘরে। দিনের ঘুম গাঢ় হয় না কারুর। বড় পাতলা। ঠুকঠাক বাড়তি কোনো শব্দ হলেই জেগে উঠতে পারে মানুষটা! হাতের কাজ ফেলে পালাতেও পারে না সে। কাজের মধ্যে থাকলে মেনে নিতেই হয়, এমনটা হয়। হতেই পারে—কোনো দোষ নেই ব্যাটাছেলেদের। নিজের ঘরে এভাবে কেউ খোলামেলা উদোম থাকতেই পারে পুরুষমানুষ হলে। ছোটবেলা থেকে দাদা বলে জেনে এসেছে যাঁকে, অথচ নিখাদ দাদা বলে ডাকা যায় নি কোনোদিন—বাবু জুড়ে ছিল বলেই দাদা আর নির্ভেজাল দাদা থাকছে না শেষ পর্যন্ত। বয়সে-বয়সে বাবুই হয়ে যাচ্ছে।

এবং রাধা ঘুমে-বেহুঁশ সেই মানুষকে ঠাকুরঘরের নিঝুম বিগ্রহ মনে ভেবেই তার কাজ শেষ করে যেতে থাকে। দূচ্ছাই, নড়াচড়াই করা যায় না যেখানে, ঠাসাঠাসি এমন একটা ঘরে কাজও ফুরয় না চটজলদি। পাখার তলায় ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা সিঙ্গল বিছানা। এপাশের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা সোফা। বসবে কার সাধ্যি? এলোমেলো কত যে ক্যাসেট, সিনেমার রঙিন পত্রিকা, খেলার কাগজ, ছাড়া-জামা ছাড়া-প্যান্ট গেঞ্জি

জাঙিয়া পায়জামা প্যান্ট শার্ট সবই যেমন-তেমন ছড়ানো-ছিটানো। ঘরের একপাশে লম্বা দেয়ালের প্রায় সবটা জুড়ে অলপার্পাস কেবিনেট না কী-ছাই বলে ওদের, খোপে-খোপে-ভাগ ঢাউশ একটা আলমারি। সেখানেই পোর্টেবল টিভি, বড়সড় টু-ইন-ওয়ান, শয়ে শয়ে কত যে ক্যাসেট, লোকটার নিজেরই বোধ হয় হিসেব জানা নেই। আলমারির পাশে ছেলের জন্যে আলাদা একটা ওয়ারড্রোব গড়ে দিয়েছেন মা। দেয়ালে-দেয়ালে কত যে খেলোয়াড় আর সিনেমার আর্টিসদের তেলতেলে চকচকে রংদার সব ছবি। জ্যান্ত চোখে সবাই যেন তাকিয়ে আছেন। এ-ঘরে কাজে এলে, কেউ না থাকলে, রাধাও তাকিয়ে থাকার মুগ্ধতায় আশ মিটিয়ে দেখে বড় বড় মানুষদের। জানালায় দরজায় দেয়ালে আলমারির-কাচে যেখানে-সেখানে হরেক স্টিকার। ওপাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলে চোখে পড়ে না, ডিভানের কাছে দাঁড়ালে স্পষ্ট দেখা যায়, ঘর মুছতে ঘর গোছাতে এসে রোজই দেখে রাধা—স্টিলের আলমারির ওদিককার গায়ে সেঁটে রাখা বড় একটা ছবি। চোখ মেলে তাকানোও যায় না ছাই। পাছায় আর বুকে ব্যান্ডেজ গোছের যা-একটু ঢাকাচাপা। ডান হাতে সোনালি চুল হাওয়ায় খেলিয়ে, বাঁ হাত কোমরে রেখে, বেঁকে, পিঠটা পেছনে হেলিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় উদোম ন্যাংটো ঢ্যাঙা একটা মেয়েছেলে। কিংবা গায়ের চামড়ায় কামড়ে-ধরে-থাকা আঁটোসাটো সাঁতারের জামায় যে-মেয়েটা সেলোটেপে সেঁটে আছে ওপাশের দেয়ালে, ঘরে ঢুকলেই তো সেটা চোখে পড়ে সকলের। কলাগাছের থোর যেমন, পাছা থেকে তকতকে দুটো ঠ্যাং গড়িয়ে নেমেছে নিচের দিকে। ছিঃ ছিঃ, কী অসভ্য গ! একজন ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে চোখ তুলে তাকায় কি করে একটা মেয়ে? ছবির মেয়েরা এ-দেশী নয় কেউ। মেমসাহেব বলেই বোধ হয় বলেন না কেউ কিছু। দোতলায় মুন্নিদিদি বুল্লিদিদির ঘরেও তো এমন রঙচঙে ছবি আর স্টিকার আছে অনেক। এমন বিচ্ছিরি আর নোংরা নয় কোনোটাই। নানান কায়দায় হরেক ঢঙে রকমারি চাউনিতে শুধু অমিতাভ বচ্চনই আছে গোটা পাঁচ-সাত। এ-রকম পুরনো দুটো ছবির রং চটে গেছে বলে ফেলে দিয়েছিল বুল্লিদিদি। কুড়িয়ে নিয়ে রাধা দিয়ে এসেছে পালানভাইকে। মেটেঘরের গায়ে পেরেক ঠুকে টাঙিয়ে রেখেছে পালান।

ফুলস্পিড পাখার বাতাসে মোজায়েক মেঝেয় সাবানজলের ছাপ শুকিয়ে যায় নিমেষে। জলন্যাকড়ায় নিকোতে নিকোতে পিছুতে পিছুতে, পিছনোটাই যেখানে এগনো, ঘরমোছা শেষ করে প্রায় দরজার গোড়ায় পৌঁছে যায় রাধা। ওপাশ থেকে হঠাৎ মোচড় খেলো লোকটা। নাকেমুখে নিঃশ্বাস টেনে কী অদ্ভুত একটা বু-বু শব্দ, ঝোল-টানার আওয়াজ গলায়। ঝলকে উঠল রাধা। তাকাল আড়চোখে। চিৎপাত শুয়ে দু-হাতের তেলোয় এলোপাথাড়ি বারদুয়েক নাকমুখথুতনি রগড়ে নিয়েই ঘুমের ঝোঁকে পাশবালিশটা ঠ্যাংয়ের তলায় টেনে, দু-হাতে জাপটে ধরে উল্টো হয়ে ডান দিকে পাশ ফিরল আবার। রাধা পেছন থেকে দাপাদাপি দেখে নেংটি-পরা তেজী জোয়ান আস্ত একটা মানুষের।

তবু ভালো, পিছুতে পিছুতে এবার সে পিঠের চামড়ায় পেলমেট থেকে গড়িয়ে-নামা ভারি পর্দা ছুঁয়ে ফেলার স্পর্শ পেয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চাপে। চোয়ালথুতনি শক্ত হয়ে ওঠে। জলের বালতিটা দু-হাতে তুলে পিছিয়ে নেয় আলতো করে। যেন

কোনো শব্দ না হয়। দুপুরবেলার পাতলা ঘুম ভেঙে গেলে লোকটার কিছু না। বিছানায় বসে লম্বা লম্বা হাই তুলবে হালুমহালুম। এ-আর নতুন কি ওঁদের নিয়মে? বারমুডা না কী একটা ঢলঢলে হাফপ্যান্ট চালু হয়েছে নতুন, সেই পরে মা-বোনদের সামনে ঘুরে বেড়াতে পারে যে-জোয়ান ছেলে, হাফ পেন্টলুন পরে খোকা সেজে রোজই যদি মর্নিং-ওয়াকে যেতে পারেন সাহেব নিজেই কিংবা একই বারমুডা বা মিনিস্কার্ট পরে হাঁটাচলায় যদি বাধা না থাকে ধিঙি বয়সের মেয়ে বুল্লিদিদির, এত সাধনার শেষে এখন শুধু রাধারই চোখের দোষ?

ভয় হয়। হাতের কাজ যখন শেষই হয়ে এসেছে রাধার, এখন, ঠিক এই মুহূর্তেই লোকটা জেগে যায় যদি? কেন জানি মনে হয়, লোকটা জেগে উঠলেই দেয়ালে টাঙানো মেয়েমানুষগুলো ফোটো থেকে বেরিয়ে এসে রক্তমাংসে জ্যান্ত হয়ে দাঁড়াবে ঘরের ভেতর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো রাধা। মাথা নুয়ে ঘর নিকনোর শেষ কয়েকটা পোঁচ। তিরতির তিরতির করে কাঁপে শরীর। একা একজন ব্যাটাছেলের ঘর? ছাপানো ছবির মেয়েছেলেরা রক্তমাংসে ফিরে এলে, ঘুমভাঙা-চোখে মানুষটার কাছে, সে একটা জ্যান্ত মেয়ে, ছবি হয়ে উঠবে এরপর।

সাহেব বাড়ির দরজায় চৌকাঠ নেই। ভারি পর্দাটা পিঠের ওপর চামর বুলিয়ে একটু একটু করে উঠে এসে ঘাড়মাথা ডিঙিয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়ল থিয়েটার ফুরিয়ে যাবার শেষ যবনিকায়। বুঝি কণ্ঠনালীতে অনেকক্ষণ দম চেপে ছিল সে। সিঁড়িবারান্দায় ফিরে এসে বুক ভরে অনেকটাই নিঃশ্বাস ফিরে পেল।

ছোট্ট বুকের খাঁচায় নিঃশ্বাসও কি সাহেববাড়ির নিয়মে ব্যাঙ্কের টাকার মতো? যখন-যেমন-খুশি অঢেল খরচা করা যায়? কৃপণের ধন দম চেপে রাখতেই হয় রাধার মতো মেয়েদের। বয়সটাই এক জ্বালা।

ঘরে-কাচা টেনায় গা জড়িয়ে সুমতিবালা এসে পড়ল একদিন। ইশকুলের ভূগোলের বইয়ের মানচিত্রে দেখা-যায়-কি-যায়-না ছোট্ট এককোঁটা বিন্দুমতো কলকাতা শহরটা যে এমন একটা তাজ্জব কান্ড, ছোট ছোট দুটো ডাগর চোখে তার সবটা একসঙ্গে ধরে রাখতে পারে না পালান। এর আগেও সে মায়ের হাত ধরে দিদির কাছে এসেছিল দু-একবার। বয়সে আরো অনেক ছোট ছিল। শৈশবের চোখে বিস্ময় যতটা, ভয় ততোধিক। ভয় বাঘাকে। ভয় নক্ষত্রলোকের। এখানে থাকে তার দিদি? দিদি সুলতানা রাজিয়া। দিদি ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।

এবং তরাসে কাঁপে রাধা। নক্ষত্রলোক থেকে স্খলিত হবার ভয়।

ভগবতী মায়ের চরণে গড় হয়ে পেন্নাম রেখে আকুল সুমতিবালা—'এট্টা পেস্তাব এয়েচে গ মা। রাধুর জন্যি...'

'হ্যাঁ, সে-তো আসবেই। মেয়ে তো আর কচি খুকি হয়ে থাকছে না তোমার...' পানের বাটা পাশে নিয়েই বসেছিলেন কিরণময়ী। ডান দিকের গালে একটা পান গুঁজে গালের টোবলায় ভাঙা উচ্চারণে—'কিন্তু রাধুকে নিয়ে যাবে গো তুমি? তা ওকে ছেড়ে এদিকে আমার চলবে কি করে?'

'হ্যাঁ গ মা, সে-কত্তাই ত শুধোই গাঁয়ের দশজনাকে। এমনধারা ভাগ্যি নিয়ে গরিবের ঘরে জম্মায় কটা মেয়ে?' মা-ঠাকরুণের পায়ের কাছে বসে করজোড় সুমতিবালার- -'সে-আপনারা না বললে-কইলে ত কিছু হবারটি নয়। যদি অনুমতি করেন...'

'হু, তা তোমার ছেলে কী করে?'

'ই ত কলকাত্তা শ'রেই কোথা কোন কারখ্যানায় মিস্তিরি গ মা। শরীলস্বাস্থ্য ভালো। আমাদেরই লাগোয়া গাঁয়ে ঘর। জোতজমি চাষবাস কিছু নেই। বাপভাইরা যে যার মতন থাকে। পরের দোরে জনমুনিশ খাটে...'

'সে আমি আর কি বলব, বলো। যা ভালো মনে হয়, করো...' উর্ধ্বে, সিলিংয়ের দিকে মাথা তুলে মুখে দু-চিমটি সুগন্ধি জর্দা ফেলে, দু-হাতে কৌটোটা বন্ধ করতে তলার দিকে চোখ নামালেন কিরণময়ী। ভরাট গালে—'মেয়ে বলে কথা। সে-ত আর চিরকাল ধরে রাখা যায় না ঘরে। ছেড়ে দিতেই হয়...'

বাইরে উৎকর্ণ ছিল রাধা। চমকে উঠল। মানুষটাকে মনে পড়ে। মারকুটে চেহারায় জবরদস্ত একজন মরদ। চায় কী লোকটা? কেউ একজন এমন পাগলপারা সব কাণ্ড করে যাচ্ছে তার জন্যে? শুধু তারই জন্যে?

এবং তার মগজের ভেতর নিড়নি চলে সারাক্ষণ। বাড়ন্ত বয়সের শরীরটা কিছু কথা বলতে চাইছে ভেতরে ভেতরে। কী সে কথা, মন কী চায়, নিজের বুঝ নিজেও বোঝে না পুরোপুরি। জমিজিরেত নিয়ে যতই মামলা করো, মাথা ফাটাও—বর্ষার মেঘ এলে লাঙল তো চাইবেই ফসলের মাটি।

মা-ভাইকে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দিতে দিন দুয়েকের ছুটি পেল রাধা। মেটেঘরের খুপচিতে চুলোচুলির ঝগড়া বেঁধে যায় খিটকেল বুড়ি দিশি মায়ের সঙ্গে—বিয়ে সে করবে না এখন। সাহেববাড়ি ছাড়বে না।

'সাহেববাড়ি কি চেরটা কাল তোকে ভাত দেবে র‍্যা মুখপুড়ি? নিজের বুঝ বুঝবি নি তুই?'

'একটা ব্যাটাছেলের সঙ্গে জুড়ে দিলেই বুঝি অন্ন জুটবে গ তোমার মেয়ের?'

'মরবি ল আবাগি, মরবি তুই। তোর ওই সাহেববাড়িতেই মরণ হবে তোর। মরবি ত নি, নিজের চিতেয় জ্বলেপুড়ে-নাথিঝাঁটা খেয়ে ফিরবি ঘরে। কেচ্ছায় কেচ্ছায় দশকানে দশকথায় দগ্ধে দগ্ধে মরবি...' গলা চিরে চিৎকার সুমতিবালার। নিজেরই পেটের মেয়ের নামে শাপান্তি গেয়ে ঘরের খুঁটিতে পাগলের মতো মাথা কুটতে হয়। সে-তার নিজেরও মরণ।

ঘটকালি যাদের, জ্ঞাতিঘরের সোনাদা বাখোকাকা—শিবু দেওয়ানের সাঙাতরা এল ওঝাগুণিন হয়ে—'যা ভাবচিস তা নয় র‍্যা রাধু। কত ভালো এট্টা ছেলে। রোজগারপাতি ভালো...'

'রোজগারপাতি ভালো ত যাও না কেনে, বেলতলায় গিয়ে ইয়ারদস্তিরা সব্বায়

মিলে ফিস্টি করে খাও গে, যাও। ফূর্তি করো। আমার জন্যি কাঁদতে লেগেছ কেনে?'

বিষ নামে না মেয়ের গা-গতর থেকে। ভবভরাট যুবতীর দেহে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি অব্দি বংবাহারি গা-ঢাকা জামায় রাধা ঘরের দাওয়া ছেড়ে নেমে আসছে যখন, পেছন থেকে পাছায় ঢেউ কাঁপে। ওঝাগুণিনরা জ্ঞাতিপড়শি হলেও বয়সে নবীন যুবা। ঘরের মেয়েও বুঝি দূর-অস্ত্ কেউ। চোখ কচলায় বিষে।

'শ'রের মেয়ে র‍্যা তুই রাধু। বুঝছিস নি কেনে? বে-থাব পব শ'রেই থাকবি র‍্যা তোরা। এমনধারাই ত কতা...'

'শ'রে থাকবে ত গ্যাসেব উনুন আছে গ তোমাদের শিবঠাকুরের? ফিরিজ জানে?'

উঠোনে নেমে দু-হাতের দুটো মুঠো দু-পাশে কোমরে ঠেকিয়ে কনুই-ভাঙা ত্রিভুজে দুটো হাতই পরীব ডানাব আদল পেযে গেলে ঘাড়-বাঁকানো তেরচা চাউনিতে হাউসকোটের গোটা শরীরটাই ঢেউয়ের কাঁপুনি তোলে এমন, নয়নাভিরাম সেই দৃশ্যে মূঢ়বাক যুবকবৃন্দ। বুঝি কোনো সিনেমাব 'বই' দেখছে জ্যান্ত। ঘাগরার গোল চাকতিতে এক্ষুনি শুরু হযে যেতে পারে কোনো নাচ।

'গ্যাস থাকবে নি ত ঘুঁটে কয়লাব ধোঁয়া গিলে ঘেমেনেয়ে চোখ পুড়িয়ে মরব গ আমি? নিকি উনুনে শুকনো পাতা ঠেসে ঠেসে ভাত ফোটাব তোমাদেব ইয়ারের জন্যি? আমার ভাবি বযেই গেছে...'

মেয়ের রকমসকম পড়শিরা দেখল সবই। শুনল কথা। অবাক মানল, শাপন্তি হলো। গলগলিয়ে কাদা উঠল অনেক। সত্যি-সত্যি ওঝাগুণিনের কথাই ভাবল কেউ কেউ। মাথাটাথা ঠিক নেই গ মেয়েব। এমনধাবা মাথাব ব্যামোয পাগল হয়ে যায মানুষ। মেয়েছেলেরা ডাইনি বনে যায়। দেশেব দশজনের অমঙ্গল হয়। গাঁয়েবই ত মেয়ে! বিধবা মা-টা করবেটা কি একা? সে-ত গাঁয়ের দশজনাকেই দেখতে হবে। ড্যাক্তরবাবুর ঠাঁই নিযে চলো। নয়তো ভালো গুণিন ডাকো। নইলে তাড়াও গ তাড়াও। দূর করে দাও গুখাকি মাগীটাকে। শ'বের কাক শ'রে যেযে মরুক।

ঘবেব আঁধারে বুকটা পাথর হযে এলে গোঙায সুমতিবালা। কপাল চাপড়ায, কাঁদে, মরে, মাথা কুটে চাঙ ভাঙে মাটির দেযালে—জেবনে কারুর কোনো ক্ষেতি কবিনি গ কোনোকালে। তবে কেনে এমনধারা শাস্তি গ ভগমান?

ওঝাগুণিন বা ডাক্তারবদ্যি নয়। বামুনবাড়িব নতুন-বউ একদিন আড়ালে পেয়ে বলল সরাসরি—'এমন পাগলপানা কবছ কেন গ তুমি? ছেলে নিজে যেচে এসে বলছে! দেনাপাওনা নেই, নগদ নেই। তোমাব মাযেব কথাটাও ত ভাববে গ একবারটি।'

চোখ টেরিয়ে তাকাল রাধা—'কেলেকাত্তিককে দেখেছ গ তুমি?'

অ্যাঁ! নতুন-বউয়েব হালুমনয়ন—'এ-কী বলছ? কী অসভ্য-অসভ্য কথা?'

'সে-ত শ'রে লেকটাউন অব্দি গিয়ে ছিপ ফেলেছিল গ...' খলখলিয়ে হাসে রাধা—'হ্যাঁ গ, নইলে আর বলছি কী? এ-টুকুন ত খ্যাংড়াকাঠি ছিপ তোর। পুঁটিমাছও

চারা শুঁকে দেখে না। তাই নিয়ে তুই রুইকাতলায় টোপ ফেলতে গেছিস র‍্যা অ্যাদ্দুর? টান পড়বে ত গা-গতর নিয়ে পিছলে পড়বি যে পুকুরের কাদায়...'

'কথায় তো আর পারব না তোমার সঙ্গে...' হাল ছাড়ল নতুন-বউ—'আমরা শুধু জানি, খুব বেশিদিন বাপের ভাত রোচে না মেয়েদের। পরের ঘরে যেতেই হয় এক সময়...'

'বাপের বাড়ির ভাত কটা দিন আর খেলুম গ আমি?' নতুন-বউয়ের মুখ বেজার দেখে রাধা আপন মনেই হাসে—'পরের-ঘরই ত করছি গ সেই ছোট্টবেলা থেকে। বেধবা হবার ভয় নেই। আর যেখানে সে-ভয়, সেখেনে রাত্তিরবেলা ঘরের ভিতরে সিঁধিয়ে দিয়ে খিল এঁটে দেবে কে একজন! ভোরবেলা দরজা খুলে দিয়ে বলবে— যাও, শাঁখাসিদুঁরে সেজে সংসার খুঁটে খাও। কেনে গ, আমি কি সব্বায়েরই দাসী নিকি? মাসমাইনের বেতন দেবে সেবাদাসীর?'

'না গ, থাক। তোমার সঙ্গে আর কথা বলা যাবে না...' এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সরে পড়তেই চাইল নতুন-বউ—'এসব কথা তুমি শিখলে কোথায়? মানে কী?'

চলেই যাচ্ছিল নতুন-বউ। হাত ধরে টানল রাধা—'তোমার বাপের ট্যাকা ছিল গ। সোনায় দানায় ট্যাকার জোরে বড়ঘরের শ্বশুরের ভিটে কিনে দিতে পেরেছেন তোমাকে। আমার মায়ের ট্যাকাও নেই, জাতধম্মের এজ্জতও নেই। আমারটা ত আমাকেই দেখতে হবে গ।'

ফিরে দাঁড়াল নতুন-বউ হাসতে হাসতে—'একটা কথা বলবে?'

'কী কথা?'

'হাতের সোনা ছুঁয়ে বলো, সত্যি বলবে।'

'বলোই না কী কথা?'

'শ'রে মন লেগেছে বুঝি কোথাও? গাঁয়ে এসে লম্বা লম্বা বাত্?'

পাকা ধানের খেতে বেমক্কা শুয়োর ঢুকে পড়লে যেমন, তিরতিরিয়ে কেঁপে উঠল রাধা। শহরের সত্যি বলে যা সে জানে, আদৌ সেটা সত্যি কিনা, জানা নেই। অথচ দেশমাটির মিথ্যেটা হামলে পড়েছে ঘাড়ের ওপর। হিজিবিজি সত্যি আর ধোঁয়াটে মিথ্যের ঘোরপ্যাঁচে দেহেরক্তেমগজেঘিলুতে সুলুকসন্ধান কিছুই খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা মেয়ে পালায় বামুনবাড়ি ছেড়ে। ঘাম জমে জামার তলায়। নাকেমুখে হাঁপের নিঃশ্বাস। ভরদুপুরের মেঠোপথে ধুলোয় লুটোপুটি নিজেরই ছায়ার সঙ্গে সমান পাল্লায় ছুটতে ছুটতে বিশাল আকাশ বিস্তীর্ণ মাঠের চরাচরে ছায়াতল খোঁজে। তার নিজের ভুবন নেই।

যূথিমাসি চলে যাচ্ছে সাহেববাড়ি ছেড়ে। মাকে জবাব দেওয়া হয়ে গেছে।

আকাশ থাকলেই যে চাঁদ উঠবে রাতের বেলা কিংবা চাঁদ উঠলেই জোছনা ঝরবে মাটিতে, সেভাবে তো চলে না জগতের নিয়ম। বর্ষার কালো মেঘ অনেক বেশি সত্যি। বাজারে কি সিঁদুর বাড়ন্ত? না-কী কপাল নেই রাধার? অথচ দুটো মেলে না এক জায়গায়? যূথিমাসির সিঁথিতে পিদিমশিখায় সিঁদুর জ্বলল তো শাখাসিঁদুরের মানুষ রইল না পাশে। হুট করে কোত্থেকে একটা বাচ্চা এসে গেল। দুধের-বাচ্চা মামাবাড়িতে বুড়ি

দিদিমার কোলে শুকনো মাই কামড়ে কামড়ে ঘা বানায়। শেষবয়সের এমন উৎপাতে বুড়িও নাজেহাল। অবোধ শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মায়ের জন্য কেঁদে-কেঁদে মরে। পরের-ঘরে পরমান্ন রেঁধে মায়ের বুকে দুধ শুকিয়ে খরায় খরায় হাহাকারে ফাটে। মাঝখানে থেকে যায় কেউ একজন। লোকটা শয়তান। আরেক ফোরটুয়েন্টি। ডাহা ফেরেববাজ। এমনটাই নাকি হয় সংসারে। নিয়ম।

ভয় পায় রাধা—'ঘরে গিয়ে কী করবে গ মাসি? পেট চলবে কেমন করে?'

কোনো হাহুতাশ ছিল না যূথিকার। শক্ত চোয়ালেই কথা বলার অভ্যাস—'সে-চলবে যা-হোক করে। মরে ত আর যাব না। আমি মরলে ত সব গেল। বাচ্চাটা...'

'ছেলে ত তোমার একার নয়।'

'একার নয়তো সে-আবার দোকার হল কবে থেকে? আরেকজন ত মেয়েমানুষের মজা লুটেই পগার পার...'

ঝলকে উঠল রাধা। কী বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি সব কথা!

কোনো জড়তা নেই যূথিকার—'সে-ও ত আরেক বিপদ। গায়েগতরে খেটেও কেউ একা থাকতে পারবে না মেয়েমানুষ হলে? বাপের রক্তে আরেকটা বদমাশ জন্মাবে বলে তাকে পেটে ধরতে হবে? মাই দিতে হবে, কোলেপিঠে করে বড় করে তুলতে হবে। গলা টিপে মেরে ফেলা ত যাবে না। তা'লে আবার জেলহাজত...'

'এসব তুমি কী বলছ গ মাসি?'

'কি এমন ভুল বলছি? ঠিকই বলছি। ব্যাটাছেলেরা সাচ্চা পুরুষমানুষ না হলে মরণ রে মেয়েমানুষের। মেয়েমানুষ কি শুধু হাড়পোড়ানি শরীলটাই? না-কী বউয়ের পেটে বাচ্চা ঠাসতে পারলেই যুৎসই পুরুষমানুষ হয়? দ্যাখ, লটারিতে কোন্ মরদ জোটে তোর কপালে...' সারা দিনের কাজের শেষে অনেক রাতে ক্লান্তি অবসাদে নিজেদের জন্য বিছানা পেতেছিল দুজনই। ঘুম ছিল না। জলে নেমে সাঁতারের ভঙ্গিতে টানটান দু-হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে নেতিয়েই পড়ল যূথিকা—'বাড়িগাড়িওলা মস্ত মস্ত বাবুমানুষদের ঘরে রাঁধুনির কাজ করছি আজ কত বছর ধরে। মা-ঠাকরুণ বউদি-দিদিমণি মেমবিবিদেরও কত দেখলুম। ট্যাকার নোটে চোখ মুছলেই কি বদন ফর্সা হয় রে কারুর? হারামির ট্যাকায় পাপ আরো বেশি...'

ঘরের বাতিটা নেভানো ছিল। কলকাতার মানুষ জানেই না কেউ, আকাশে চাঁদনি রাত এখন। ওদের আঁধার ঘরের জানালায় তেরচা ছাঁচে জোছনা এসে পড়েছে দেয়ালের ধার ঘেঁষে ওপাশটায়। বিদঘুটে সব কথাবার্তায় যখন সবই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথায়মগজে, রাধা আরো বেশি নিঝুম হয়ে আসে—'হ্যাঁ গ মাসি, তোমার আমার কপালে যে-লোকগুলো জোটে, কেনে গ এমনধারা হয় সব্বায়?'

'তুই আমি যে মায়ের-জাত রে! শুনিস নি? বলে সবাই...' দাঁতকপাটি ভেঙে চোয়াল-গুঁড়নো একটা হাই উঠল যূথিকার। হাই টেনেই আলসেমির ঝোঁকে—'ঠাকুরদেবতা বানালেই ত বেশি সুবিধে রে ওদের। হাড়মাসরক্ত থাকে না মাটির মূর্ত্তি কি পাথরের পিতিমেয়। পুজোও চলবে। ফের বাদ্যি বাজিয়ে মিছিল করে জলে ফেলে দিয়ে এলেও দোষ নেই।'

হেঁয়ালির ভাষা রাধা বোঝে না সবটুকু এবং না-বোঝার জগাখিচুড়িতে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে. মাসি নিজেই একটা জ্যান্ত ধাঁধা। জলাজংলায় তেলাকুচো লতার মতোই কাছে পেয়েছে যাকে, মাসিকে, জড়িয়ে থাকতে চেয়েছিল সে। মাসি বড় কাছের মানুষ ছিল তার। বড় আপনজন।

সেই মাসি সত্যি-সত্যি একদিন চলে গেল। সাহেববাড়ির রাঁধুনি বিদায় হলে রাধার বুকেব কলজে ফাঁকা হয়ে যায়, এমন অঘটন ঘটেনি কোনোকালে। বরং এই বোধ হয় প্রথম এবং একমাত্র ঘটনা— এ-বাড়ি থেকে কাজের লোক তাড়ানোয় কোনো কলকাঠি নড়ে নি রাধার হাতে।

•

কিংবা তাব কলকাঠির আর কোনো ধারই নেই তেমন। সোজা শিবদাঁড়ার মোমবাতি জ্বলতে জ্বলতে ফুরতে ফুরতে নিজেকে ঘিরে গলিত মোমের পাহাড় গড়ে তুলে তুলে শেষ পলতের ধিকিধিকিতে যেমন কবে নিঃশেষে মিশে যেতে থাকে মাটিতে, দপ কবে নিভেই যায় এক সময়। এভাবেই নিত্যিদিনের অভ্যাসে বাড়বাড়ন্ত সাহেববাড়ির কাজেকম্মে নিজেকে লেপটে রেখে রাধা বড় হতে থাকে গায়েগতরে, ফুরিয়ে যেতে থাকে ভেতরে ভেতরে। রঙের জেল্লা, আলোব বোশনাই, ঘ্রাণের সুবাস সবই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে থাকে। আদরে আদরে বাঘার নখের আঁচড় লেগেছিল ব্লাউজের তলায়. পেটের ডান দিকে উদোম চামড়ায়। ঘরের পুষ্যি বলেই ছোট কবে শুধু একটু ইঞ্জেকশনের সূচ ফুটেছিল হাতে। বড় কিছু না হোক, আঁচড়ের দাগ শুকলো না গা থেকে। আড়ালে-আবডালে লুকোচুরির ছোবলানিও বেড়ে যাচ্ছে গায়ের ওপর। এমন ঢাকা-চাপা লুকোছাপা গায়ে লেপটে গেলে কি করবে একটা মেয়ে? তখন আর-সব ঘরের-মানুষ চেনা-মানুষ সবাইকেই ভয়।

সাহেববাড়িই যদি ভয়ের বাসা. সে পালাবে কোথায় মেয়েমানুষের এই শবীরটা নিয়ে? দেশগাঁয়ে ঘর আছে একটা। ঘর নাকি সেটা?

ইংরেজি-অনার্সে পাশ কবে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হলো মুনমুন। কদিন বাদেই ওর জন্মদিন। অনেক রাত অব্দি জাঁকজমকে আলোয় আলোয় গানবাজনায় তুমুল হৈচৈচিৎকারে ভরে বইল সাহেববাড়ি। হবেক সাজগোজেব চকমকি ছুটিয়ে হরেক মাপের হরেক বয়সের যুবকযুবতী। অন্যরাও ছিলেন কেউ কেউ। বহুবকার দিনে রাধাও সেজেছিল খুব। রূপের হাটে সেও ছিল।

যেহেতু তার নিজেব কোনো বয়স নেই. অন্যদের বয়সেই তার বড় হয়ে ওঠা। উৎসবশেষে গভীব রাতে আলাদা নির্জনে, একা. হাতের আঙুলে কড় গুনে গুনে প্রতি সেন্টিমিটাবে সে তাব বয়সের মাপ খোঁজে নিজের। যা বলে সবাই, তাই যদি সত্যি হয়—মুন্নিদিদির চেয়ে দেড়-দু বছরেব ছোটই যদি হয় সে, এক-কুড়ি বয়স ছুঁতে তার আর মাত্র দুটো বছব বাকি?

রাধা পূর্ণ অষ্টাদশী।

এবং সেই

বর্ষণদিন, নিষাদরাত্রি

সব শেষে সেই দিন এল। লাখ টাকার খাঁচায় জ্বলেপুড়ে মরল রাধা। জানে না অবোধ যুবতী—তাসের খেলায় গোলাম খেলবে সে? না-কী সাহেব?

সেই কবেকার ফাল্গুন-চৈত্তির মাসের খরা চলছে একটানা। বোশেখ-জষ্ঠি ফুরিয়ে আষাঢ় মাস এল, গরমে গরমে ভ্যাপসা ঘামে জ্বলছে পুড়ছে মানুষ। হাঁপাচ্ছে গোটা দেশ। এমন কি, সাহেববাড়িতেও ফুলস্পিড পাখা আর এয়ারকুলারেও স্বস্তি ছিল না কারুর।

হঠাৎ-ই একদিন ভোববেলা তুলকালাম লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চারদিকে। রাতভর জলে-জলে ভিজেছে আস্ত বাড়িটা। ভেতরের দিকেও জলের ঝাপটায় সিঁড়িবারান্দা তো বটেই, এমন কি ঘরগুলোতেও অনাসৃষ্টির শেষ নেই। রাতদুপুরে ঘুম ভাঙে নি কারুর। ঘেমো গরমে ঘরের জানালাগুলো খোলাই ছিল। জলের ছাঁটে মেঝে ভেসেছে। টেবিলচেয়ার আলমারি—জানালার আশেপাশে যা ছিল, আরো কিছু আসবাবপত্তর ভিজে ভিজে একশা। ঝকঝকে মোজায়েক মেঝে এমন পিচ্ছল, পা ফেলা যাচ্ছে না কোথাও। সুতরাং সাতসকালেই মায়ের মেজাজ তিরিক্ষি। শুধু তো সাহেববাড়ি বা লেকটাউন নয়, জলে-জলে গোটা শহরটাই বেহাল হয়ে গেছে। বাঘাকে পার্কে নিয়ে যাওয়া হয় নি সকালে। রাধা জলে ভিজে-ভিজে দুধ আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে। দুধের-গাড়ি আসে নি। মেথর আসে নি, ঠিকে-ঝি ববির-মা আসে নি, খবরের-কাগজ আসে নি। বাজারে পাঠানো যাচ্ছে না বুড়ো মানুষ নন্দদাকে, গাড়ির ড্রাইভার বৈজুদা এসে পৌঁছন নি তখনও। বেলায়-বেলায় ভাঙা ছাতা আরো ভেঙে ভিজে হাপুইসুটি হয়ে যখন এলেন, শুয়েবসেই কাটল সারাদিন। গাড়ি বেরুল না গ্যারেজ থেকে।

আপিশের কাজে সাহেব দিল্লী গেছেন কদিন আগে। বাড়িতে গার্জিয়ান নেই। দাদাবাবু দিদিমণিরা আজ আর কলেজে যাবে না কেউ। বাদলা দিনের হঠাৎ-মজায় এমন হুটোপুটি হৈহুল্লোড় তিন ভাইবোনের, মা আর সামলাতে পারছেন না ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা ছেলেমেয়েদের। বেলা প্রায় আটটা সাড়ে-আটটা বেজে গেল, নোংরা ঘরদোরের বিহিত হলো না কিছু। কাউকে বাজারে পাঠাতে না পারলে রান্নাঘর সচল রাখা মুশকিল। অন্য দিকে, একতলায় চেঁচাচ্ছে বাঘা। স্নানে যেতে পারছেন না নিজে। বাসি-কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ না হয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে পুজোয় বসতে পারছেন না। পুজো না দিয়ে শুধু চা খেয়ে থাকা যায় কতক্ষণ? জলখাবারের ব্যবস্থা তো সকলের জন্যই দরকার। অস্থিরতা বাড়ে, ক্রোধ বাড়ে। নাজেহাল গৃহকর্ত্রী। মুখঝামটা খিটখিটানিতে সাবা বাড়ি তোলপাড়।

দশভুজা মা যুদ্ধে নামলে আরো গোটাকয়েক বাড়তি হাত তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। কিংবা বর্ষায় যেমন ছাতা, মায়ের জন্য রাধা। শেষপর্যন্ত রাধাই থেকে যায়। ঘরের বাইরে জল ঝরছে। ঝরেই যাচ্ছে রাত্তির থেকে। ক্ষান্তি নেই নিমেষের। মেঘে মেঘে

ভারি হয়ে আছে আকাশ। মেঘের রঙে দিনের রঙও বদলে গিয়ে ঘোলাটে ঘোলাটে। স্পষ্ট করে ছায়া পড়ে না মানুষের। এমন দুর্যোগের দিনে দুটো হাত দুটো পায়ের সচলতায় একাই সংসারের ঝড় সামলায় রাধা।

দুধের-গাড়ি সময়মতো এল না বলে শুধু একটা নড়বড়ে ছাতার ভরসায় দু-দুবার গোটা শরীরে ভিজে এল রাস্তায়।

জলঝড়ে বাঘাকে নিয়ে মর্নিং-ওয়াকে যায় নি কেউ। চিৎকারে-গর্জনে গোটা বাড়ি মাথায় তুলেছে দস্যিটা। শেষপর্যন্ত দেখার দায় তো রাধারই। একই নুনে মানুষ।

রাতের এঁটো বাসন গাদা হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরে। ঠিকে-ঝি ববির-মা আসে নি। রাধা ছাড়া ছোঁবে কে? নতুন রাঁধুনি গোপালের-মা'র হাজার বাহানা।

জলখাবার চাই দাদাবাবু-দিদিমণিদের। চাওমিনের ফরমাস। সে-ও তো রাধারই দায়।

বৃষ্টি বৃষ্টি! বাদলা দিনের অলস সকালে ভি.সি.আর.-এ নতুন 'বই' দেখতে শুরু করলেন দাদাবাবু-দিদিমণিরা। দাঁতকপাটি অভিমানে, বুকের ভারে সাহেববাড়ির ঘরে-ঘরে রং পাল্টায় রাধা। সারারাত জলে-ভেজা জানালার কার্পেট-পর্দা পেলমেটের ভারি পর্দা সবই খুলে নিয়ে নতুন সাজে রাঙিয়ে দেবার শ্রম।

আকাশ-ভাঙা জল না-হয় এক রকম। মেনে নিতেই হয়। কিন্তু মায়ের চোখের জল একদম সইতে পারে না মেয়ে। বাথরুমে শাওয়াবের তলায় যখন মায়ের প্রশান্ত অবগাহন, আস্ত একটা আকাশ একা-একা মাথায় বইল সে। ছাদে, শখের বাগানে ছোটবড় হরেক টবে হরেক ধরনের ফুলগাছের চারা। জলঝড়েব তুমুল ঝাপটায় ভেঙে থেঁতলে যাচ্ছে সব। হর্টিকালচার জানে না রাধা। মাটি চেনে, গাছ বোঝে মাটিরই কন্যা।

দুপুরে খিঁচুড়ি খেতে চাইলেন দাদাবাবু-দিদিমণিরা। বাঙালদের রান্না ভুনি-খিচুড়ি মা নিজেই বাঁধলেন। পাশে খেঁকুড়ে বুড়ি গোপালের-মা। একতলার কলতলায় অঝোর বৃষ্টি বলেই রাধা তখন দোতলাব বাথরুমে। গত রাতের বাসি জামা কাপড় ডাঁই করা ছিল সকাল থেকেই। দুপুবের স্নানের পর সকলের সব ছাড়া-কাপড়ে আরো বেশি পাহাড় জমল। এত সব ধোয়াধুয়ি কাচাকাচি? সে-তো রাধারই কাজ।

এরই মধ্যে পুষ্যি বাঘার জন্য আলাদা রান্না, ওকে খাওয়ানো। সে-ও তো শুধু রাধাই জানে।

ওঁদের অবসর ফুরোয়। সকলের স্নানাহার শেষ। কিন্তু তখনও দুপুর থাকে। দুপুরের ঝিমুনিতে সাহেববাড়ি শুনশান ঠাণ্ডা হয়ে এলে যখন ঘরে-ঘরে ঘুমচ্ছে সবাই, কোথাও কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই, এবং যখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে বাইরের আকাশ--এক সময় এক থালা খিচুড়ি গেলার পর যখন ঘুমের কুঁড়েমিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, তখনও অনেক কাজই বাকি থেকে যায় তার। সিঁড়িবারান্দা সবই নোংরা হয়ে আছে। এমন একটা রাজার-প্রাসাদ আর-দশটা হতচ্ছাড়া বাড়ির মতো আদাড়পাঁদাড় বিতিকিচ্ছিরি পড়ে থাকবে কেন? এ-তার নিজেরই কেমন লাগে।

নতুন করে শুরু হয়ে যায় সাফাইয়ের কাজ। জলের বালতি পাশে নিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে যায় ভেজা-পাথরের মেঝেয়। কুমড়োফালির আদলে নিজেরই ডানে-বাঁয়ে জলন্যাকড়ার প্রলেপ টেনে টেনে, নিকোতে নিকোতে, এক কোণ থেকে শুরু করে

পিছোতে হয় হামা দিয়ে দিয়ে। বিঘে-কাঠার হিসেব জানে না কোনোকালেই। দেশগাঁয়ের শতকও বোঝে না। সাহেবি ফ্লোর-স্পেস আরো এক অলীক ধাঁধা। অথচ ভাতঘুমের ঠাণ্ডা দুপুরে এভাবে শুধু হামাগুড়িতেই পিছোতে পিছোতে কত কার্পেট আয়তনেব তেপান্তর পাড়ি দিয়ে কখন কোথায় কোন্ অবেলায় ঠিক-ঠিক ফুরবে তার কাজ, নিজের কাছেই হিসেব জানা নেই। এ-তো আর হুকুমদাবির কাজ নয় কারুব। সাহেববাড়িকে সাফসুফ তকতকে রাখা তার নিজেরই তাগিদ। সাহেববাড়িকে বড় ভালোবাসে সে।

সাহেববাড়িতেও তাব জন্য ভালোবাসা অগাধ অঢেল। নির্বোধ যুবতী বকমফের বোঝে না মানুষের আদর সোহাগের।

বিকেলের দিকে ফর্সা হয়ে উঠেছিল আকাশ। গোটা দিন ঘববন্দী জলবন্দী হয়ে থাকার পর দাদাবাবু-দিদিমণিবা বায়না ধরলেন—আজ আর বান্নাবান্না হবে হবে না রাত্তিরে। সিনেমা হলে গিয়ে 'বই' দেখা হয় নি অনেকদিন। 'বই' দেখে সেখানেই কোনো বড় হোটেলে বা রেস্তরাঁয় সাড়ম্বর ডিনাব।

কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না মা। সাহেব বাড়ি নেই। সারাদিন গাড়ি বেরোয নি গ্যারেজ থেকে। বিকেলের দিকে ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। ফিরতে ফিবতে বাত তো হবেই। বৃষ্টিবাদলার দিন। সঙ্গে বযস্থা মেয়েরা। শুধুমাত্র ছেলেব হাতে স্টিয়াবিং ছেড়ে দেবাব ঝুঁকিতে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না কিছুতেই। শেষমেশ দোহাই পাড়লেন--'আমরা সবাই চলে যাব? তাহলে বাধা?'

সেটাও কোনো ওজব নয নাছোড় সন্তানদের কাছে। শেষ পর্যন্ত স্থিব হলো, বাধাও সঙ্গে যাবে। এমন সোমত্ত বযসেব মেয়ে। এত বড বাড়িতে রাত্তিরবেলা একা থাকবে কেন?

রাধা হঠাৎ চনমনে। এবপর সারাদিনেব ব্যথাযন্ত্রণা রাগদুঃখঅভিমান সবই ভুলে যেতে পারে সে। পুজোব সময বছরকাব দিনে অষ্টমী কি নবমীর বাত্তিববেলা সবার সঙ্গে গাডি চেপে ঠাকুর দেখতে যাওয়া ছাডা সাহেববাডির গাড়িতে যে-মেযে চডতে পায না কোনোকালে, আজ সে একসঙ্গে 'বই' দেখতে যাবে? সাহেবপাড়াব সাহেবি হোটেলে খানাপিনা? এমন ভাগ্যি যদি আজ বাদলাদিন বলেই হলো, আকাশেব জলঝড বোজই হয় না কেন তাহলে?

সাজল রাধা। যখন ঘরে-ঘবে সাজছে সবাই, রাধাকেও তার নিজেব ঘবে নিজেব মতো কবে তৈবি হয়ে নিতে হয। কালো মেয়েকেও সে তার নিজেব আবশিতে সাজিযে তুলতে জানে। সমান বয়সী দিদিমণিদেব শালোয়ার চুড়িদার বা ঢিলেঢালা বাগি পোশাক না-হয় না-ই বা হলো, বাহাবেব রঙিন শাড়িতে সে মাযেব পাশে সত্যি সত্যি মাযেব মেয়ে হয়ে যায়।

ছুটল রাধা। গোটা কলকাতা শহরটাই ভেজা-ভেজা ন্যাতান্যাতা। এখানে-ওখানে থইথই জল। মোডে মোডে ট্র্যাফিক জ্যাম। আলোয়-আলোয় দোকানপাট মস্ত মস্ত দালান প্রাসাদ সবই জাহাজের মতো। রাস্তায় ফুটপাতে ছাতা-মাথায় মানুষগুলোর কী দুর্দশা? বুঝি গোটা শহরটাই দাদাবাবুর খাসতালুক। পাকা ড্রাইভারের কাযদায় এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুবে, সবাইকে নিয়ে হৈচৈ আর তুমুল হল্লায় দুরন্তগতি পাখির ডানায় খালবিলের শহর

ডিঙিয়ে যেখানে এসে পৌঁছল, স্বপ্নে পৌঁছে যায়. রাধা। অথবা স্বর্গে।

সুখসাগরে ডুবল রাধা। নাইট শো-এর হাউসফুল-ঝোলানো সিনেমা হলে টিভির বিজ্ঞাপনে হারিয়ে গিয়ে দুনিয়ার রং দেখে সে। আলো দেখে সব জ্যান্ত,. সবাই জ্যান্ত। চোখ-ধাঁধানো রঙের ফিনকিতে গণ্যিমান্যিদের গায়ের মিষ্টি সুবাস, আলাদা আলাদা সেন্ট বা আতরের মিলঝুলে ঝাঁঝাল ঘ্রাণ, আঁকা চোখ, আঁকা ভুরু, ঠোঁটের লাল, গালের গোলাপ—হরেক রঙের বাহারে হরেক সুবাসে যেন এক ফুলের বাগানে আছে সে এখন। কত দিক থেকে কত ভাবে একের পর এক কাচের দরজা ঠেলে, লাউঞ্জ পেরিয়ে, শাদা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গিয়ে বসতে হয় গদির চেয়ারে। বসে পিঠ এলিয়ে দিলেই ঘুম পেয়ে যায় ঠাণ্ডায় আরামে।

রাধা উন্মুখ। সব আলো নিভে গেলে, অন্ধকার পুষ্পোদ্যানে, সাহেবদুনিয়া হঠাৎ-ই লোপাট। মাঠঘাট আকাশ নদী গাছপালা মেটেঘরে কোন্ এক দেশপাড়াগাঁয়ের ছবি। তারই মতো এক দেহাতি মেয়ের দুঃখকথা—'এক থি লেড়কি।'

কাঁদল রাধা। কানে তালা-ধরিয়ে-দেওয়া বোমাবন্দুক মারপিটের হুল্লোড়বাজিতেও গাঁয়ের দুঃখী মেয়ে নাচেগানে সবার মন মাতিয়ে কেমন করে ডাকাত দলের মস্ত সর্দারকে বর পেয়ে গেল? দেশজোড়া অনাথকাঙাল গরিবগুরবোদের কত কাছের-মানুষ আপন-মানুষ একজন দস্যিডাকাত?

কথাই ছিল—রাতের ডিনার। যেভাবে উড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে লাখ টাকার গাড়ি, উদ্দাম ঝড়ে সাহেবদুনিয়ার অদ্ভুত রাত দেখল রাধা। তীব্রগতি বিশ্বলোক। রাত গভীর বলেই হয়তো রাস্তায় পায়ে-হাঁটা মানুষজন কম। দু-পাশে আলো আর আলো আর গাড়ি। অগুনতি গাড়ির বেসামাল ছুট। হেডলাইটগুলো মারকুটে দস্যিদের হাতে টাঙিসড়কি। নিজেদেরও দুর্ধর্ষ ছুট ছিল। চড়া আলোর বর্শাফলক ছুটছিল। নাকেমুখেচোখেচুলে কাঁধের আঁচলে ঝোড়ো বাতাসের পাগলা ঝাপট। নাকেমুখে নিঃশ্বাস টানতেও অস্থির হাঁকপাক। মজা, নিজেদের মতো করে নিজেদের গাড়িতে ছোটায় দারুণ মজা।

রাধা দলছুট। ছুটতে ছুটতে গাড়িটা এসে থামল যেখানে, রাধা তার ভূগোল জানে না। পর পর অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল বলেই সবার শেষে জায়গাটা অন্ধকার, কিছুটা আলাদা। অথচ একটু দূরেই আলোয় আলোয় সাজানো একটা বাড়ি। ফটক আগলে চোকাচাপকানে উর্দিপরা ঢ্যাঙামতো দারোয়ান। রাধা বুঝতে পারে, মস্ত কোনো নামীদামি সাহেবি হোটেল এটা। জানা ছিল না, যে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পাশে বসিয়ে 'বই' দেখা যায়, এমন ইজ্জতদার হোটেলে নিয়ে যাওয়া যায় না তাকে। গাড়ি থেকে একে একে নেমে গেলেন সকলেই। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সে। এত রাত্তিরে বেপাড়ার রাস্তায় লাখ-টাকার খাঁচায় আটকে পড়ছে। বাইরে থেকে লক করে দেবার পর সাহেবপাড়ার নির্জনে রাধা, নিশ্চিতই কয়েদি নয়, গৃহপোষ্য বাঘা নয়, খাঁচাবন্দী পাখি হয়ে যায়। ওঁদের ধীর পায়ে চলে-যাওয়ার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার একজোড়া বোবা চোখ অন্ধকারে স্ফটিক হয়ে উঠতে পারে না। হাসপাতালের রোগশয্যায় ঘরের মানুষকে শুইয়ে রেখে প্রিয়জনরা ঘরে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যে যেমন হয়, রাধা দুহাতে আঁচল টেনে নাকমুখগালথুতনি ঢেকে শুধু তার চোখজোড়া ভাসিয়ে রাখে—ভারি হয়ে

ওঠা যে-চোখে পলক পড়ে না, জল পড়ে না, ফোঁপানি কাঁপে না, দাঁতকপাটিতে কান্না জমতে চায়। ক্ষুব্ধ অভিমানের কান্নায় কোনো আওয়াজ থাকে না।

শুনশান সাহেবলোক। রাতদুপুরে জনমনিষ্যি নেই কেউ কোথাও। গোটা শরীরে শাড়ি জড়িয়ে নিজেকে জবুথবু পুঁটলি বানিয়ে গাড়ির এক কোণে গুটিসুটি সিঁধিয়ে ছিল সে। দুটো চোখ আর কান বেড়ালের মতো সতর্ক ছিল। এমন বড়সড় ভয়ের খপ্পরে আটকে গেলে বুঝি এমনটাই হয়। মাথা থেকে পায়ের নখ অব্দি কলকলিয়ে ঠাণ্ডা বরফেব ঢল। কেন্নোর মতো গুটিয়ে আসছে হাত-পা। নিঃশ্বাসের ফঁসফঁসানি। পেটের খিঁচুনিতে ক্ষিধেও পাচ্ছে খুব। কান্না পাচ্ছে।

হঠাৎ-ই নাড়া খেলো। ছাযা-ছায়া দুটো লোক বোলতার মতো ভনভন ঘুরছে চারপাশে। খিস্তি? বাইরে থেকে হিন্দী-বাংলায় মেশামেশি খোলাখুলি কী কুচ্ছিত কী নোংরা সব মুখখিস্তি একজন মেয়েছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে?

চমকে ফিরে তাকাল। কী সবেবানাশ! এপাশে জানালাব কাচে মুখে রেখে, কাচে চুমু খেয়ে ফিকফিক হাসছে বাহাবি ছাঁটেব দাড়িগোঁফচুলের ষণ্ডাগুণ্ডামার্কা বিচ্ছিরি একটা লোক। আলো-আঁধারিতে মুখটা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে। কী আশ্চয্যি? লোকটাকে সে চেনে? গোঁফদাড়ির ছাঁটকাটে কেষ্টঠাকুরের চিত্তিরে বাহারি চুলে আস্ত মুণ্ডুটাই যেন ছোবলশুদ্ধ একটা নারকেলমালায অবিকল এক। একই রকম? লোকটা এত খাবাপ? এমন ওঁছা? ইতর লোকটা জানল কি করে রাধা এমন রাতদুপুরে এসে যাবে এখানে? এমন মকায় একা পেযে যাওয়া যাবে ওকে? খোলামেলা রাস্তায় এমনটা হয়? হতে পারে কখনও? কাচের গায়ে নাকঠোঁট লেপটানো ডাকাতদস্যির মুখটা রাধাকে ছুঁয়ে ফেলেছে মনে হতেই পড়িমরি দ্রুত ওপাশে সবে যাবার পর ওদিকেব কাচেও টোকা পড়ছে আরেকজনের। বোগাপটকা হতচ্ছাড়া আরেকটা বজ্জাত। এবং দুদিক থেকে খ্যাকখ্যাক ভুতুড়ে হাসিগুলো একতরফা হয়ে উঠল যখন, কাচঢাকা থেকেও, শেয়ালশকুনির খুবলানিতে বাধা তার গায়েব মাংস ছিঁড়ে নেবার যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। সাহেবপাড়া কী ভয়ঙ্কর? এখানে ভাগাড়ে, মেয়েমানুষকে জ্যান্ত থাকতে হয়?

গাড়ির খোলা দরজায আচমকাই ফুবফুরে ঠাণ্ডা বাতাস। রাধা শিউরে উঠল। খানদানি বড় হোটেলের মনোলোভা সুখাদ্যের ম-ম গন্ধ নাকের নিঃশ্বাস ভবে তুলল এমন লুব্ধতায, এক ঝলকে গাড়ির ভেতরকাব অন্ধকারে আশ্চয্যি এক লোভের তরাস। জিভে-টাকরায় লালা জমে ওঠার আগেই হাড়পাঁজরার খিঁচুনিতে এটুকুন একফালি একটা জায়গাব পিছতে পিছতে পিঠ ঠেসে গিয়ে যখন আর পিছনোরও ঠাঁই নেই, দরজা খুলে বাইরে থেকেই বেশ বড়সড় খাবারের প্যাকেটটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিচু মাথায় ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে ঢুকে পড়তে চাইছে কেউ? রাধার নতুন বিপদ। বাইবের দুশমন, চেনা বা অচেনা, ঠিকঠাক জানা যায় নি এখনও। নিত্যি-চেনা ঘরের-মানুষ মাঝদুপুরে একা এই ফাঁকায়? কী না হতে পারে, যদি চায়? মুখে আঁচল চেপে ড্যালাড্যালা চোখের চাউনিতে, অস্থির গুমোটে গরমে ঘেমেনেয়ে, আত্মরক্ষায় অথবা প্রতিরোধে আকুল হলো সে —'আমার ভয় করছে গ দাদাবাবু...'

'কেন? কী হয়েছে?'

'এই এখেনে দাঁড়িয়ে ছিল দুটো লোক। কেমন-কেমন দেখতে!'

গাড়ির পেছনের সিটে রাধার দিকেই ডান পা তুলে দিয়েছিল লোকটা। পিঠ বাঁকিয়ে মাথাও গলিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি। কি মনে হলো, পিছিয়ে গেল। বাইরে, রাস্তায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল এদিক-ওদিক—'কে? কার কথা বলছিস? কোথায়?'

কারুর থাকার বা না-থাকারও বুঝি কোনো ফারাক নেই আর। রাধা হাঁপায়। যা-হোক, কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচা। অন্তত একজনকে, চেনামুখের দামালকে সে রুখে দিতে পেরেছে সহজেই। আঁচল টেনে গালগলানাকমুখের ঘাম মুছতে মুছতে বুকের আইঢাইয়ে খাঁচার ভেতর যদি ডানা ঝাপটে মরে যেতেই হয়, মরেও রেহাই নেই। সত্যি আব মিথ্যের গোলকধাঁধায়, চেনামুখ আর অচেনা মানুষের ভোজবাজিতে এমনই ঘোরপ্যাঁচে ঘুলিয়ে যায় সবটা, সত্যি-সত্যি সত্যিগুলো মিথ্যে হয়ে যেতে থাকে। মিথ্যেটাই সত্যি?

এবং সে আবার একা হয়ে যেতেই সাহেবপাড়ার নিঝুম কাঁপিয়ে ঠোঁটদাঁতের ভেতর আঙুল গুঁজে কী কর্কশ আর কুচ্ছিত একটা প্যাক তোলার আওয়াজ। সঙ্গে বমি-ওগরানোর ধাঁচে ফূর্তিফার্তার বিচ্ছিরি একটা হাসি।

পিঠ বাঁকিয়ে কোলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে কান চাপল বাধা।

গাড়িব ভেতর গুমোট গরমে খানদানি সাহেবি-খানার ভরভরাট গন্ধ। লোভ-চুকচুক ছুঁচো আর ইঁদুর দুটো কোথায় ছিল। ফেব উঠে এল অন্ধকার গর্ত থেকে। আচমকাই ওদেব একজন গাড়ির একমাত্র আধাআধি-খোলা জানালায় হামলে পড়ে হাত বাড়াল ভেতরের দিকে। টাকা চায়। নোট।

টাকা নেই রাধাব। যদি টাকা দিলেই রেহাই পাওয়া যেত!

লোকদুটো বাজারের-মেয়েমানুষ বলল ওকে। বেশ্যা বলল।

দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুজে রাধা সইল চাবুক। আগুন? গাড়ির ভেতর অন্ধকারে হঠাৎ একটা লালচে ঝলকায় মাথা তুলে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে। একমাত্র খোলা জানালায় বুকের ভর রেখে বাহারি-ছাঁট গোঁফদাড়ির যে-লোকটা হাসছিল তখন থেকে, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে একটা দেশলাই জ্বেলেছে এবং নিজেরই মুখাগ্নি করার ভঙ্গিতে দু-হাতের আঁজলায় আগুনটুকু তুলে ধরার ফাঁকে, যদিও হাতের ঢাকনায় আড়াল হয়েই থাকে নাকঠোঁটথুতনি, পলকপাতেই ঝলকে উঠল রাধা। তিরতিবিয়ে উঠল গোটা শরীর। লাল-লাল ফ্যাকাসে আলোর হলকায় মনে হলো তাব, কোনো ভুল নেই সে-মনে-হওয়ায়—এ-সেই লোকটাই তো! সেই লোকটা? তাই বা কি করে হবে? এক ঝটকায় হাজারগণ্ডা তালগোলের সব ধকল বইতে পারে না ছোট্ট মগজ। ছটফটানি বাড়ে। দেশগাঁ থেকে এসে এই ক-বছরেই একটা লোক এমন ডাকসাইটে মস্তান হয়ে উঠেছে এত বড় শহরে এসে? সাহেবপাড়া চিনে ফেলেছে? দেশে ফিরে গিয়ে সাহেবি-কেত্তন গায়?

বাইরে খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি লোকদুটোর।

মবণবাঁচন বাধার। হাতটা এগিয়ে আসছে? চিলচিৎকারে ফেটে পড়তে পারে সে এখন। তাবস্বরে কাঁদতে পারে। আকুল হয়ে ক্ষমা চাইতে পারে, লোকটা যদি সত্যি-

সত্যি তার চেনা-মানুষ স্বজন কেউ হয়। মিছে কথার ছলাকলায় ভোলাতে পারে, যদি তাকে লুটে নিতেই চায়। চাই কি, এক রাত্তিরের বেশ্যাও হয়ে যেতে পাবে, যদি প্রাণে বাঁচতে হয়!

এবং আগুনটা থেকেই যায়। তলার দিকে আঙুলের চিমটিতে ছোট করে কাঠিটা উঁচিয়ে রেখেছে লোচ্চা বজ্জাতটা। সতর্ক চোখের পাতায় নিশানা স্থির রেখে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে রাধা। পিদিমের বুক-পোড়া পলতের মতো জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তে বড় আস্তে আস্তে নখের দিকে তলিয়ে নামছে আগুন। যদি হাত ফসকে পড়েই যায় হঠাৎ? কী সব্বোনাশ! প্লাস্টিক-মোড়া গাড়ির সিটগুলো। জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়েই মাবে যদি? তার সিনথেটিক কাপড়েব শাড়ি? শয়তানকে বিশ্বাস নেই। লক-করা গাডিব দবজা খুলে যদি বেরুনো না যায়, লম্পটকে লম্পট জেনেই নিজেকে সঁপে দিয়ে যদি প্রাণে বাঁচার উপায় না থাকে, কাঠিটা আচমকা নিভে যেতেই, অন্ধকারে, দিশেহারা রাধা আব কিছু ভাবতে-না-পাবার ঘর্মাক্ত রুদ্ধশ্বাসে গোটা শবীবটাকে ভয়ের দলায় গুটিযে নিয়ে, শাড়িব আঁচল আরো শক্ত কবে নাকেমুখে ধরে থেকে, দম চেপে, আস্তে আস্তে কোমর ঘেষড়ে তলিয়ে যেতে থাকে। দুটো সিটের মাঝখানে এক চিলতে সরু ফাঁকটুকুতে মাথা গুঁজে বসে থেকেও যদি আড়াল দেওযা যায় নিজেকে। পাটভাঙা রংবাহারি শাড়িব্লাউজ উচ্ছন্নে যাক। আগে বাঁচা এবং বাঁচার জন্যেই গোবস্থান। কোনো রকমে নিজেকে ঠেসেঠুসে সে শুযেই পড়ল, যেখানে সাহেব বা দাদাবাবু-দিদিমণি বা ভগবতী মায়ের শ্রীচরণধূলি। শয়তানের হাতে অঢেল আগুন। দেশলাইব বাকশোয অনেক কাঠি; অনেক বারুদ।

সুড়ঙ্গের ভেতর শুযে থেকেই হুলোবেড়ালের ফ্যাঁচফ্যাচানি ওদের হাসি, ওদেব বগড় মুখখিস্তি সবই শুনতে পেল। আবার একটা আগুনের হলকা গাডিব ভেতব? নতুন করে শয়তানের ছোবল। লালচে আলোটা চারিয়ে যেতেই বুঝতে পারা যায় শয়তানের হাত অনেকটাই ঢুকে পড়েছে ভেতবের দিকে। আগুনের শিখা দেখতে পাচ্ছে না সে। কিংবা তাকেও খুঁজে পাচ্ছে না কালকেউটের বিষের জিভ।

ভয়ের দলায় সিঁধিয়ে গিয়ে হৃৎকম্পের তোলপাড়ে মরে যেতে থাকে রাধা। অন্ধকাব গর্তের ভেতর পাশ ফেরাব ঠাঁই নেই যেখানে, যন্ত্রণায় ভ্যাবলা চোখে মরণ দেখল সে। বাঁচার ইচ্ছেটাই ডানা ঝাপটে মরে। কাঁদে গোঙায়, সারা গায়ে আগুন নিয়ে পাগলের মতো লুটোপুটি খায়। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে লাখ-টাকার গাড়ি। দাউদাউ আগুনে দগ্ধে মরছে সে। তার শাড়িশায়াব্লাউজ ছোটজামা কুঁকড়ে কুঁকড়ে পাক খেয়ে খেয়ে ফুরিয়ে গেল। সে ন্যাংটো। উদোম ন্যাংটো। তার হাত পুড়ছে পা পুড়ছে চোখ পুড়ছে মাথার-চুল পুড়ছে বুক পুড়ছে স্তন পুড়ছে পেট পুড়ছে জরায়ু পুড়ছে পাছা পুড়ছে যোনি পুড়ছে জংঘা পুড়ছে যৌবন পুড়ছে বয়স পুড়ছে সাধ পুড়ছে—যেখানে যেখানে সে যতটুকু মেয়েমানুষ, জ্বলেপুড়েদগ্ধে মাংসপিণ্ডে দলা পাকিয়ে আলাদাভাবে আর মেয়েমানুষ থাকছে না। হাড়গোড়কঙ্কালে সবার সঙ্গে সমান মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

এভাবেই কতক্ষণ? হিসেবেব বুঝ নেই।

এবং এভাবেই সাহেবপাড়ার বিষদাঁতে, নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরে যেতে যেতে যখন মরণটাই সত্যি ছিল, তাজ্জব কান্ড, সাহেবরাই বাঁচাল তাকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে এলেন মা। এমন অদ্ভুতভাবে গাড়ির খোদলে ওকে শুয়ে থাকতে দেখে, সাহেবপাড়ার রাতদুপুরে কাশফুলের ঢঙে দোল খেতে খেতে খলখল খলখল হাসিতে হাসিতে ভেঙে পড়লেন দিদিমণিরা। দাদাবাবুর দাঁতখিঁচুনি। আকুল হলেন মা।

রাধার মুখে রা নেই। ভরসা নেই অভয়াকেও। সজল চোখের পাতায় ভয়ের ঝাপসায় ভুতুড়ে জানালায় খোঁজে লোকদুটোকে। সাহেববাড়ির বাঘার মতোই দুটো কুত্তা। কেউ অনধিকারে সাহেবপাড়ায় ঢুকে পড়লে কামড়ে ধরতে চায়। বাঘাই বা কেন? ডোবারম্যান নয়। মানুষই নয় আসলে। এঁদো ডোবার কাদামাখা নোড়িকুত্তা। ওদের একজনকে সে চেনে বলেই মনে হয়েছিল। অথবা চেনে না। ওরা ছিল। সত্যি ছিল। কিংবা ছিল না। সবটাই ভুল। মনের ভুল। ভূতের ভয় যেমন হয়। সত্যিমিথ্যে ঘুলিয়ে যেতে তাকে ছোট্ট মগজে।

গাড়ির ভেতর সুখাদ্যের ঘ্রাণ ছিল। পাগল-করা স্বাদেগন্ধেও কোনো বাসনা থাকে না। সবই বিস্বাদ। মাঝরাত্তিরের নিঝুম রাস্তায় গোটা শহর জুড়ে যখন দু-পাশের লাইটপোস্টের আলোগুলো জ্বলছিল দগদগে পোড়া ঘায়ের মতো, তেড়েফুঁড়ে ছুটছিল গাড়ি। দুরন্ত ছুটে উড়ে যেতে যেতে তোলপাড় বাতাসের ঝাপটায় বিপর্যস্ত রাধা সামনের দিকে হালুম-মেরে-ছুটে-আসা কালো পিচের রাস্তায় চোখ রেখে দুটো সজল চোখের মেঘভাবে স্তব্ধ পাথর। পেছন থেকে মানুষটার কালো-কালো মুণ্ডুটাই দেখা যাচ্ছে শুধু, যার হাতে স্টিয়ারিং। মা-র পাশে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকাও যায় না বেশিক্ষণ। শুধু মরণই দেখে রাধা। ঝড়ের তেজে এমন বেপরোয়া মরিয়া ছুট, কলকব্জা একটু বেচাল হলেই সহেববাড়ির সবগুলো আদুরে মুণ্ডুই রক্তাক্ত হয়ে উঠতে পারে এখন। মরণ থেকে উঠে এসে সবাইকে ফিরে পেয়ে বুকের টিপটিপে কাকের-ঘরে-কোকিলের-ডিম নিজেকেই সে বুঝে নিতে চায় স্পষ্ট করে।

গাধার-ডাকের-খেলায় দিনে দিনে ইশকাপনের-বিবি হয়ে উঠছে সে। দরদাম অনেক বেশি। আদর নেই ছিটেফোঁটা।

সাহেববাড়ির অনেক কিছুর মতো এ-খেলাও সে জানে। বোনদের সঙ্গে দাদাবাবুই তাকে শিখিয়েছিলেন একদিন।

নিশীথরঞ্জনের প্রত্যাবর্তন এবং একটি আনন্দসংবাদ

দিল্লী থেকে ফিরেছেন নিশীথরঞ্জন। নিজস্ব বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত তাঁর যা কিছু উদ্বেগ, সেটা ললাটের বলিরেখায় বারোমাসের স্থায়িত্ব পেয়ে আছে। সংগত কারণেই পারিবারিক বা সন্তানাদি বিষয়ে তাঁর মনোযোগ এত অধিক পরিমাণেই গৌণ, আপাত চোখে মনে হতেই পারে, এ-সংসারে গৃহকর্তা নামক শিরোমণি অস্তিত্বটি মূলত কোনও মধ্যযুগীয় সম্রাটের মতো। সদাগম্ভীর স্বল্পবাক বিচরণ এবং সর্বত্রই তীক্ষ্ণ নজব। রাজ্যপাট চলছে যথাবিহিত এবং সবই তাঁর মর্জিমাফিক। কোথা কিছু অঘটন বা খামতি ঘটলে, বলা বাহুল্য, কৈফিয়ত চাইবেন। সেক্ষেত্রে কিরণময়ীকেই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। শুধু তো সংসার নয়, যে-মানুষ সকলেব জন্য শ্রমে নিষ্ঠায় এই সুবিশাল সম্পদ গড়েছেন, অতি সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে এমন একজন মহিমময় কৃতী পুরুষ বা দীর্ঘদেহী স্বামীর যথাযোগ্য পরিচর্যাই তাঁর প্রতি মুহূর্তের সতর্কতা। পলকে পলকে বুঝে নিতে হয়, কখন কী তাঁর চাহিদা। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে এই আত্মনিবেদনেই ধন্য নারী। যিনি এত কিছু গড়েছেন, দিয়েছেন, দিতে পারেন—জানেন না, স্বামীর কাছে আলাদাভাবে নতুন কী চাইতে হয় এবং কীভাবে?

শোবার আগে প্রতিদিন স্বামীব শিয়রে কিছুক্ষণ বসতেই হয় তাঁকে। সাংসারিক ইতিবৃত্তের রিপোর্টিং অথবা তাঁর নিজেরই নতুন কোনোও ভাবনাচিন্তার পরামর্শ গ্রহণ।

রাজধানী থেকে প্রত্যাবর্তনে এবার স্ত্রীর জন্য নতুন এক উপঢৌকন এনেছেন নিশীথরঞ্জন। পার্থিব কোনো সম্পদ নয়। বলা যায়, অপার্থিব সুখেব আশ্বাস।

'কিন্তু তোমাদের তো বলাও যায় না সব কথা...' ঘরের ডিভানে শরীর ঢেলে কিছুটা আলসেমিতেই বিশ্রাম উপভোগ কবছিলেন নিশীথরঞ্জন—'সব শুনবে অ্যান্ড ইউ উইল স্টার্ট ড্রিমিং। আরে, এত সহজেই কি হয় নাকি সব কিছু? এ-যাস্ট একটা প্রোপোজাল। প্রস্তাবটা কারুর কাছে রাখাও হয়নি ঠিকঠিক...'

'দুচ্ছাই, বলো না কি বলবে..' পাশেই একটা মোড়ায় বসে রাত্রির আহারশেষে পান চিবোচ্ছিলেন কিবণময়ী। সুবভিত জর্দার ঘ্রাণ। বড় খুশি। স্বামীর তরফ থেকে কোনো প্রস্তাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনার এমন ঘটনা খুবই বিরল।

শান্ত ভ্রূকুটিতে বাঁদিকে তাকালেন নিশীথরঞ্জন।

কিরণময়ীও ফিরে তাকিয়েছেন—'ঠিক আছে। ও থাক। ও ওর কাজ করুক।'

রাধা ঘরে ছিল। রাত্তিরের খাওয়াদাওযার পর বাত দশটায় মা হঠাৎ বিছানার নতুন চাদর, বালিশ, পাশবালিশের ঢাকনা, বেডকভার সব বের কবে দিলেন। অনেক বড় ঘব। ঘরের মাঝখানে পাখার তলায় হাতখানেকেব ব্যবধান রেখে পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল বেডের খাট। বালিশে ঢাকনা পরাতে থাকে সে। শয্যা সাজায় সাহেব আর মায়ের।

আস্তে আস্তে ধীরলয়ে বলছিলেন নিশীথরঞ্জন—প্রাথমিক কথাবার্তা রাজধানীতেই সেরে এসেছেন। সেটা একেবারেই প্রাইমারি স্টেজের ভাবনাচিন্তা মাত্র। শেষপর্যন্ত কোনো কিছু হয়ে উঠবে কিনা, সবই নির্ভর করছে মিঃ এস. পি. সেন কী সিদ্ধান্ত নেবেন

বা আদৌ কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা, তার ওপর। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন পুরনো আই.এ.এস.। স্বাধীনতার পর ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডার হিসেবে কলকাতাতেই ছিলেন অনেক বছর। হোম ডিপার্টমেন্টে সেক্রেটারি পর্যন্ত উঠেছিলেন। কর্মযোগ্যতার ভিত্তিতেই দিল্লি ডেকে নিয়ে যায়। অবসরপ্রাপ্তির পর দিল্লিরই স্থায়ী বাসিন্দা। সুন্দর বাড়ি করেছেন চিত্তরঞ্জন পার্কে। তুখোড় সব ছেলেমেয়ে। তাঁরই ছোট ছেলে, ভেরি স্মার্ট এনার্জেটিক হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান। কত আর বয়স হবে? পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ! নামটাও খুব সুন্দর: অভিনব সেন। জে.এন. উ.-র ইকনমিকসের এম.এ.। ভাল ক্রিকেটও নাকি খেলত এক সময়। কলেজ ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্ট করেছে। এই তো, এক বছরও হয়নি পুরোপুরি। ফরেন সার্ভিসে জয়েন করে এখন বেলগ্রেডে আছে। দিল্লিবেসড বিজনেসম্যান মিঃ পাশোয়ানেরই একটা দবকারে মিঃ সেনেব সঙ্গে আলাপ হলো। দিল্লিফিল্লিতে যা হয়, বাঙালি নস্টালজিয়া, মিঃ সেন ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন একদিন। মিসেস সেন বলছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের কথা। বড় ছেলে কোন মালটিন্যাশনাল ফার্মের হাই এগজিকিউটিভ। অবাঙালি একটি মেয়েকে বিয়ে করে বরোদায় থাকে । একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন কোন এক কর্নেলের ছেলের সঙ্গে। দিল্লিতেই ডিফেন্স কলোনিতে আছে। ছোট ছেলেটির কথাই বলছিলেন ওঁরা। বিয়ে দিতে চান...'

কিরণময়ী নড়েচড়ে উঠলেন—'তুমি বললে ওদের কিছু?'

'ওভাবে সরাসরিই কী বলা যায় প্রথমেই...' উদাসী হাত বাড়িয়ে সিগারেটেব প্যাকেটটা ধরলেন নিশীথবঞ্জন— 'ভাবছিলাম মুনমুনের কথা। ওর এম. এ. পরীক্ষা তো আব বছবখানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে...'

'অ্যাদ্দিন কি অপেক্ষা করবেন ওঁরা?' চোখের মুদ্রায় স্বপ্নের-মা আচম্বিতেই শঙ্কিত।

'সে-আমি কি করে বলব? সেভাবে তো কোনও কথাই হয়নি এখনও। বলতে পারো, এ-অনেকটা যাস্ট ওয়ান-সাইডেড ডিজায়ার...' একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশীথরঞ্জন কিছুটা অনাসক্ত ভঙ্গিতেই—'আসছে মাসেই হয়তো আমাকে দিল্লি যেতে হতে পাবে একবার। মিসেস সেন তো নেমন্তন্ন করেই রেখেছেন। তখন না হয় আস্তে আস্তে...'

'কিন্তু তুমি যা বলছ...' বুঝি স্বপ্নেরও বাজাবদর থাকে। কিংবা স্বপ্নই বিত্তবাসনা। কিরণময়ী স্বপ্নের বিভ্রমে—'সে তো খুব হোমরাচোমরা ফ্যামিলি ওঁদের! ওঁরা কি রাজি হবেন আমাদের সঙ্গে কাজ করতে?'

'হ্যাঁ, অ্যাপারেন্টলি তাই তো মনে হবে কারুর। ওঁদের ছেলেমেয়েরা এখন আব বাঙালি নেই কেউ। মিসেস সেন এবার তাই কলকাতার বাঙালি মেয়ে চাইছেন। স্মার্ট, কনভেন্ট এডুকেশন, এজ বিটুয়িন টুয়েন্টি টু টুয়েন্টি-ফাইভ। অবকোর্স ফেয়ারলুকিং অ্যান্ড হেলদি...'

'আমাদের মেয়েও কি ফ্যালনা নাকি?' কিরণময়ী, শিরদাঁড়ায় নিজেকে টানটান রেখে—'বাঙালি তো বটেই। একেবারে গোড়া থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে পড়ে সাহেবি দস্তুরও কি কারুর চেয়ে কম শিখেছে কিছু?

সিগারেট খারাপ। বিশেষত অধিক রাতে ধূমপান গর্হিত কর্ম। টেলিভিশন বলছে, কাগজপত্রে প্রায়ই নানা কথা লেখা হচ্ছে। ডাক্তারেব বারণ। যথাসাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা

করেও ম্রিয়মাণ কিরণময়ী। নিজেও জর্দা ছাড়তে পারছেন না বলে স্বামীর অনিয়ম মেনে নিতে যেটুকু বাধ্য, আজ এই মুহূর্তে হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখেও বিচলিত নন খুব। ভাবনার স্তর আরো গভীরে—'মিঃ সেন বলছ? বামুন নয় তো ওরা। বদ্যি?'

'হোয়াট ননসেন্স।' ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন নিশীথরঞ্জন—'আজকাল আবার ওসব ভাবে নাকি কেউ?'

'না না, সে-নয়। আমারও ওসব আজেবাজে সেকেলেপনা কিছু নেই...' চকিতে সচকিত কিরণময়ী। ললাটে দীর্ঘ কুঞ্চন— 'ভাবছি মেয়েটার কথা। ঘরের প্রথম মেয়ে! দিল্লি বোম্বে ব্যাঙ্গালোর হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু কোথায় কী সব প্যাবিস লন্ডন বিলেতফিলেত বলছ? মন কি চায় অ্যাদ্দুর...'

'বোগাস...' আড়মোড়া ভাঙলেন নিশীথরঞ্জন। দিনান্তে নিদ্রায় প্রথম সংযত দেহভঙ্গ- —'এসব পিউরিটান ব্যাকডেটেড ন্যাকামো নিয়ে মেয়েব জন্য সুপাত্র খুঁজবে তুমি? তাহলে তো এখনই বন্ধ করে দিতে হয় এসব। কেন, সুমি আর আশিস থাকে না আমেরিকায়? জানো, কত ভাল আছে? চিঠিতে বারবার যেতে বলছে আমাদেব। যাওয়া হচ্ছে না। তাই...'

'যাব তো, নিশ্চয়ই যাব। এত বড় সুযোগ কেউ ছাড়ে?' কিরণময়ী সহসা উচ্ছ্বাসে ভরপুর—'হোক, ওদের পরীক্ষাটরীক্ষাগুলো হয়ে যাক। আর যদি ঠাকুর কবেন, মুনমুনের বিয়ে না হোক, পাকাপাকি একটা কথাও যদি হয়ে যায় এর মধ্যে। যাব। ঘবসংসার ফেলে হুটপাট কি যাওয়া যায় অ্যাদ্দুব? বললেই হল? আমি না যাই, বাবনকে তো পাঠাবই পাঠাব...'

'কেন? ওকে পাঠিয়ে কী হবে?'

নাড়া খেলেন কিবণময়ী। অজান্তেই কখন বিচ্ছিরিভাবে ঘুবপাকে জড়িয়ে গেল শুভবাসনার ভাবনাচিন্তাগুলি। তবু যেহেতু মা, মাকে স্বপ্ন আঁকড়ে থাকতেই হয়। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—'যাবে দিদি-জামাইবাবুর কাছে। হোক জ্যাঠাতুতো দিদি, ওদেব জন্যেও তো কম কবা হয নি কিছু। মায় ওদের বিয়েটা অব্দি। এখন ছেলেটা যাবে। পয়সাকড়ি খরচাপাতি না হয় আমরাই দেব। তারপরও যদি ওরা কিছু না করে তোমার ছেলেব জন্যে সে-আব কী বলব? কী আর বলা যায ওতে? দুনিয়াটাই এই...'

'বেশ তো, যাবে। কিন্তু করবে কী সেখানে গিয়ে? এখানে তো বাপেব পয়সায় বেশ ফুর্তি মেরে বেড়াচ্ছে। খেটে খেতে শিখেছে কিছু? শিখতে দিচ্ছ তুমি?' তীক্ষ্ণ নিশীথরঞ্জন— 'কাউকে কিছু রিকোয়েস্ট করতে হলেও তো কিছু একটা থাকতে হয়। অন্যেরা কী করবে? সব কিছু চাইলেই তো হয় না সবার কাছে। চাওয়াবও একটা লজিক থাকে...'

দুঃসহ দুঃখভাব। বিলম্বিত, স্খলিত নিঃশ্বাসে মোচড় খেয়ে কিবণময়ী উঠে দাঁড়ালেন মোড়া থেকে। চোখে চোখ রাখলেন নিশীথরঞ্জন, যে দৃষ্টিকে উপেক্ষা কবে সরে যাওয়া যায না। শুনতেই হয়—'বাপের একটা ফার্ম আছে বলে নিজেকেও চার্টার্ড ভাবছিস তুই? সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বি.কম.-এ অনার্স বাখতে পারে না যে-ছেলে, বাড়িতে এমন বাঘা-বাঘা প্রফেসররা নাকি সবাই টিউটর। হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম? হাউ

ইজ দ্য পারফর্মেন্স? ও-ছেলে চার্টার্ড হবে? হয় কখনও! সবটাই তো আর মায়ের আঁচল নয়। প্রিলিমিনারিটাও উৎরোতে পারল না দু-দুবারে। অথচ পাশটাশ করে বেরুতে পারলে এক্ষুনি হাজার দশ-বারো টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া আমার পক্ষে এমন হাতিঘোড়া কিছু শক্ত কাজ নয়...'

বুক ভেঙে ভারি নিঃশ্বাসের ক্লান্ত উদ্গীরণ কিরণময়ীর। টানটান দেহে, শ্রবণে, নিজের দহনে দগ্ধ হতে হতে বাঁকাভাবে ঠোঁটের ধারটা কামড়াতে থাকেন নিঃশব্দে। নিষ্পলক দুটো চোখ নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য খোঁজে আশ্রয়ের। তিরস্কারের ভাষা জ্ঞাতিকুটুম বা অন্য কারুর নয়। কিংবা জাঁদরেল পুরুষমানুষ বোধ হয় এভাবেই কাঁদেন ভেতরে ভেতরে। মেয়েমানুষের শরীরে কান্নাটা কান্নাই। এক সময় ছেলেকে কানপুর আই.আই.টি. কি ব্যাঙ্গালোর পাঠিয়ে ইলেকট্রনিক বা কম্পিউটার সায়েন্সে ব্রিলিয়ান্ট বানাবেন বলে কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশীর বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে মানতও ছিল। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কল্পতরু স্পর্শ করে ছেলের কল্যাণে আম-খাওয়া ছেড়েছেন। এবং এত করেও, ঘরে ডজন-ডজন মাস্টার আর প্রফেসব পুষেও কিছুই হলো না তেমন। ছেলের সায়েন্স হলো না। মেয়ের জন্যে ফবেন সার্ভিসের ছেলে আসে। নিজেব ছেলের ফরেন যাওয়াব সুযোগ হয় না। ভাগ্য অনেক কিছুই দেয় মানুষকে। সব কিছু দেয় না।

বুকের ধুনুচিতে ঘন নিঃশ্বাস। পিছু ফিরতেই হুঁশ হলো, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল। দেযালে ইলেকট্রনিক ঘড়ির কাঁটায় সময়ের নিঃশব্দ বিচরণ। শরীরের গাঁটে গাঁটে ঘনায়মান ঘুমের আবেশ ফিরে যাচ্ছে দুর্ভাবনায় উদ্বেগে। ভ্রূকুটি কিরণময়ীর—'কি রে এখনও হলো না তোর? কী করছিস তখন থেকে?'

সাহেবের বিছানায় চাদর বদলে, দুটো বালিশ দুটো পাশবালিশে ওয়াড় ভরার পর পাট-করা বেডকভার পায়ের কাছে রেখে সাহেবের খাটে মশারি টাঙানোর কাজও শেষ করে ফেলেছিল রাধা। গুঁজে দেবার অছিলায় বিছানার চারপাশে ঘুরে ঘুরে উৎকর্ণ ছিল। মায়ের সঙ্গে সাহেবের কী যে কথাবার্তা, মাথামুণ্ডু সবটা বোঝেও নি ঠিকঠিক। শুধু বুঝেছে, মুন্নিদিদির বিয়ে! তাথৈ তাথৈ খুশির বাদ্যি তার বুকে। কী যে একটা এলাহি কাণ্ড হবে, ভাবতেই পারছে না। লাখ টাকার বাজি পুড়বে। দাদাবাবুর পৈতেব সময় যা হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি লোকজন। অনেক বড় ক্যাটারার। দারুণ খাওয়াদাওয়া। সারাদিন ধরে গান বাজবে মাইকে। মিউজিক পার্টি আসবে। ওর নিজেরও তো লাভ। সবার সঙ্গে মা ওকেও তো দেবেন কিছু। সোনাদানা না হোক, নিদেন ভালো একটা শাড়ি। একটা সিল্কই চাইবে সে।

মেঝের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন নিশীথরঞ্জন। অলস দেহে এগোলেন পায়ে পায়ে। সস্নেহ হাত রাধার কাঁধে—'এখনও কী করছিস তুই? রাত হয়েছে। যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।'

নড়ে না রাধা। নড়তে পারে না। এখনও তার অনেক কাজ বাকি। মায়ের বিছানা?

কিরণময়ী বললেন—'ঠিক আছে, সাহেবেরটা হয়ে গেছে তো? যা তুই। আমারটা আমি নিজেই করে নিতে পারব।'

রাধা দ্বিধায় নিশ্চল।

'এই দ্যাখো, দাঁড়িয়ে রইল মেয়ে! বলছি তো, যা। যা তুই...'

অগত্যা পা ফেলতেই হয়। দু'হাতে আঁচল টেনে মুখ চেপে, মাথা নুয়ে, সবিনয় প্রস্থানপথে ঘরের মাঝামাঝি থেকে দরজার দূরত্বটা দীর্ঘতর হয়ে উঠতে থাকে। দরজায় ভারি পর্দা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে বা ঘর ছেড়ে বেরুবার সময় পেছনের দিকে পাল্লা দুটো বন্ধ করে যাওয়াই নিয়ম। সেই ছোটবেলায় শেখানো হয়েছিল তাকে। অন্যথা হয়নি কোনোদিন। কিন্তু আজ দরজাটা টেনে দেবার আগেই শোনা গেল মা'র গলার স্বর।

'এই...এই মেয়েটাও হয়েছে আমাব এক জ্বালা...' কিরণময়ীব দীর্ঘায়ত চাপা কণ্ঠধ্বনি—'সেই কবে এটুকুন বয়সে এসেছিল আমার কাছে। এই আট-দশ বছরে এখনই ফুলেফেঁপে যা হয়ে উঠেছে মেয়ে, এ-বাপু দেখলে তো আমাবই ভয় করে। আর তো ঘরে রাখা যায় না ওকে। আর রাখবই বা কেন? ওরও তো সাধআহ্লাদ আছে। ঘবসংসার করবে...'

ভাগ্যিস ভারি পর্দায় আড়াল হয়ে আছে দবজা। কাঠের পাল্লার ইঞ্চি দুয়েক ফাঁকটুকুতে উৎকর্ণ থাকতেই ভয়। সর্বাঙ্গেব ঝিমঝিমানিতে কান পেতে থাকে রাধা। কিছুটা মরিয়া। সবটুকু শোনার লোভ।

সাহেব বলছেন—'এসব কী তোমাদের আবোলতাবোল, এ-ও কি আমাকে দেখতে হবে নাকি? সে-যা করতে হয়, করো। চিঠি লেখো ওর মাকে। খোঁজ নাও, শোনো —কী ভাবছে ওরা।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো। ঠিক আছে, কালই আমি চিঠি লিখে দেব। আসুক ওব মা। কথাবার্তা বলে যা-হোক একটা কিছু করুক তাহলে।'

'কালীধনকেও লিখতে পার। কালীধনই তো এনেছিল ওকে। একই গ্রামেব লোক...' গলার স্বরেই বোঝা যায়, মশারির ভেতর ঢুকে পড়েছেন সাহেব। শুয়ে পডছেন— 'বড্ড ভালো ড্রাইভার ছিল কালী। এত পারফেক্ট স্টিয়ারিং কন্ট্রোল! রিফ্লেকশনটাও খুব ভালো। মানুষটাও ভেরি অনেস্ট ইনটেলিজেন্ট অ্যান্ড ফেথফুল। সে-আর কী করা যাবে? নেহাত-ই চোখটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এখন গ্রামে ফিরে গিয়ে কেমন আছে কে জানে..'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রুদ্ধশ্বাসে এক সুতো এক সুতো করে কাঠের পাল্লা টেনে আলতো করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে সময় লাগে। যেন এতটুকুন শব্দ না হয়। খুট করে সামান্য একটু আওয়াজ হলেই, কী সব্বোনাশ। অনেক আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে সে। ছুঁচো নেই, ইঁদুর নেই, বেড়াল নেই। এতক্ষণ বাদে দরজায় শব্দ হবে কেন? খোদ সাহেবের ঘরে আড়িপাতা?

এবং অতি সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পেরে বুক ভরে প্রাণের নিঃশ্বাস।

ডালপালা সহসা উত্তাল
বীজ থেকে রক্তমাংসে
সব পাপড়ি খুলে খুলে যায়

এবং চকিতেই সে অন্য এক রাধা। সহসা দুরন্তগতি। সর্ব অঙ্গ জুড়ে কাশফুলের দুলুনি। টিভি-সিনেমাব পর্দায় যেমন সব চোখ-ধাঁধানো ঘরবাড়ি থাকে, তেমনি এক প্রাসাদপুরীতে কী আশ্চর্য ঠাণ্ডা গা-ছমছম রাত্তির। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সবাই। তিনতলায় দাদাবাবুর ঘর থেকেই ক্যাসেটে গান বাজানোর আওয়াজ আসছিল অনেক দূর থেকে। অদ্ভুত সেই শীতলতায় কয়েক পা এগোলেই চারপাশের ঘর দিয়ে ঘেরা মায়াময় গোল চত্বর—মস্ত লিভিংরুম অথবা লাউঞ্জ। সিলিংয়ের ঠিক মাঝখানে ঝলমলে আলোর লম্বা ঝালর এখন কানা। ওর খোপে খোপে অনেকগুলো বাল্ব। একই সুইচে সবগুলো জ্বেলে দিলেও কাচঢাকা বলেই হয়তো, কখনওই চড়া আলো হয় না খুব বেশি। ছায়া-ছায়া রহস্যে ঘেরা গোল চত্বরে দেয়ালে দেয়ালে ফুলের পাপড়ি ছড়ানো কনসিলড ওয়ারিংয়ের ওয়াল ল্যাম্পগুলো সবই নেভানো ছিল। দেয়ালের সঙ্গে লেপটে থাকা হালকা নীল বাতিটা জ্বলছিল। সেটা জ্বলে সারা রাত। ঝালবেব চার কোণে সিলিং থেকে নেমে-আসা চারটে পাখা। পাখার তলায় মেঝের বেশ খানিকটা জুড়ে নকশা-আঁকা বাহারি কার্পেটের ওপর সেন্টার-টেবিল ঘিরে সুন্দর করে সাজানো দশাসই ভারি আর রঙিন সোফাকোচ, দেয়াল ঘেঁষে ছোট টেবিলে টেলিফোন, অন্যদিকের দেয়াল লেপটে রঙিন টিভি, ভি.সি.আর.-কেবিন, ওপাশে বড বড় পেতলের টবে রবার গাছের চারা, মানিপ্লান্টের লতা, ক্যাকটাস, রঙিন বই আর হরেক ধরনের পুতুল দিয়ে সাজানো ছোটমতো আলমারি, অ্যাকুরিয়াম সবই তার আপন। আপন-ভুবনের নিঝুমে তার পায়ে চটি নেই, নূপুর নেই, উদোল পায়ের আওয়াজ থাকে না সুশীতল মোজায়েক মেঝেয। দেখছে না কেউ। কেউ আসবে না। এখন ঘুম। ঘুমের রাতে সর্ব অঙ্গে কোষে কোষে নৃত্য নিয়ে পায়ে পায়ে কুরঙ্গীগতি বাধা লিভিংরুমের আঙিনা ডিঙোয়। ওপাশে ওদের দু'বোনের পাশাপাশি ঘর। আগে সবাই যখন ছোট ছিল, একই ঘরে দুটো সিঙ্গল বেডে ঘুমোতেন দিদিমণিরা। বড় হয়ে কলেজে ঢোকার পর থেকেই দুজনের ঘর আলাদা-আলাদা। এত বড়-বড় সব ঘরে একা-একা হেসেখেলে শুয়েবসে কত যে সুখ! কত আরাম! দেখেও চোখ জুড়োয়।

বুল্লিদিদি ঘুমে কাদা কাদা। অন্ধকারে ভয় করে বলে একটা হালকা নীল বাতি জ্বলে সারা রাত। জানালায় উঁকি দিলে আলোর আভাসটুকুই চোখে পড়ে। মানুষকে দেখা যায় না। জানালার ভেতরের দিকে পেলমেটের পর্দা অনেক দূরে। গ্রিলের গায়ে বুক লেপটে, ভেতরের দিকে হাত ঢুকিয়ে পর্দাটা একটু টানল রাধা। নিজে মেয়ে হয়েও তাকিয়ে থাকার লোভ। ছোটজামা নেই, শায়া নেই। শুধু একটা নাইটি পরে ফুরফুরে পাখার তলায় তুলতুলে নরম বিছানায় ঘুমিয়ে আছে আরো কুসুম-কুসুম এক শরীর।

এগিয়ে যেতে হয়। পাশেই মুন্নিদিদির ঘরে অন্ধকার। কিন্তু জানালার পর্দা পুরোটা টানা ছিল না। যেটুকু ফাঁক ছিল, খুশি হল রাধা—আলো ছিল ঘরে। সামনেই কবে

নাকি পরীক্ষা। কোণের দিকে টেবিল-লাইট জ্বেলে পড়া করছে রাত জেগে। ভাবল বাধা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুশির মাতন হিসেব মানে না। জানালার গ্রিলে ঠোঁটথুতনি গলিয়ে আচমকা ডাকল চাপা গলায়—'মুন্নিদিদি, অ মুন্নিদিদি...'

আঁতকে উঠল মুনমুন। যথার্থ ভয়ে লাফিয়ে উঠে চেয়ার ধরে ফিরে তাকাল পেছনে—'কে?'

'আমি গ, আমি। রাধা...'

'রাধু? তুই?' ছুটে এসে, দেয়াল নয়, খাট ছিল কাছে, বেডসুইচ টিপল মুনমুন। আলোয় আলোয় ভরে উঠল ঘর। জানালার বাইরে যখন রাধাও স্পষ্ট হলো, দ্রুত দরজার দিকে এগোতে এগোতে—'কি রে, এত রাতে তুই কেন হঠাৎ? কী বলছিস?'

দরজার চাবি ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে রংবাহারের ম্যাকসিস্কার্ট আর জামা, আরো এক রাজকন্যে। দু-হাতে জাপটে ধরল রাধা—'তোমার বিয়ে গ দিদি। হ্যাঁ গ, সত্যি বলছি, বিয়ে...'

'মানে?' মুনমুন হতবাক এবং ক্রোধের প্রাথমিক চোটটা তীব্রই হয় যেহেতু, সে ঝাপটে উঠল—'রাতদুপুরে এসে এখানে ইয়ার্কি করছিস? এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি, বুকটা কাঁপছে এখনও। ছাড় ছাড় তুই। ডাকব মাকে...'

রাধা ছাড়ে না। ওদের ঘরে-পবার জামায়ও হাজার রকমের কুঁচি, ক্রুশের কাজ। হরেক নকশায় ফিনফিনে হালকা গোলাপি রঙের রুবিয়ার আবরণে, যেখানে অন্তর্বাস নেই, হাতে হাতে দিদিমণিদের চটকাতেও বড় সুখ। আবেগে উচ্ছল সে—হ্যাঁ গ দিদি; বিশ্বেস কর। মিছে বলছি নি। মা-কালীর দিব্যি। দিল্লি থেকে তোমার বরের খবর এনেছেন সাহেব। অনেক বড়লোক, খুউউব বড় মানুষ তোমার বর। কাঁড়িকাঁড়ি ট্যাকা রোজগার গ তোমার বরের। শ্বশুরের ভাসুরের দেওরের সব্বার। তোমাকে সেই কোথায় দূরের দেশে নিয়ে যাবেন...'

'মাথাটাথা এক্কেবারেই গেছে তোর। যা ভাগ...' জোর করেই জড়াজড়ি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত মুনমুন—'রাত এগারটা বেজে গেছে। কোত্থেকে হুট করে এসে কী সব আজেবাজে বকতে শুরু করেছিস। পড়াশুনো নেই আমার? ডাকব মাকে?'

'না গ, সাহেবই তো বলছিলেন মাকে। আমি শুনলুম...'

'বেশ করেছিস। তুই যা দেখি এখন। ফোট...' রাধাকে দরজার দিকে ঠেলল মুনমুন, 'বিয়েটা তো তোর নয়, আমার। তুই লাফাচ্ছিস কেন ছাগলের মতো? যা কাট...'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই রাধা শুকনো লতার মতো খসে পড়ল। নিশুতির রাতে শব্দটা একটু বড় করেই বাজল। প্রসাদপুরীর রাতের নিঝুমে রাধা আবার একা। ঘুমকাতুরে মেয়ে এক নাগাড়ে কাজ করে যেতে পারে সারাদিনের পরও অনেক রাত অব্দি। কিন্তু একবার যদি ঘুমের ছুটি জোটে, কোথাও লুটিয়ে পড়তে পারলে, বালিশে মাথা ছোঁয়ালেই সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে কোথায়! কিন্তু আজ এত রাতে সাহেববাড়ির থমথমে নিশুতিতে খুব আর ফ্যালনা মনে হচ্ছে না নিজেকে। ঘুম নেই চোখে। কিংবা ঘুমের মধ্যেই আছে সে এখন। কিন্তু স্বপ্নও তো নয়। এত বড় বাড়ির আনাচে-কানাচেয় কোথায়

কি আছে বা নেই, ঘবদোর দেয়াল জানালা-দরজা, দামি দামি শৌখিন জিনিসপত্তর, এমন কোনও ফাঁক নেই, যা সে জানে না অথবা যেখানে তার স্পর্শ পড়েনি কোনোদিন। তার আপন ভুবনে নিঃসঙ্গ একা ঘুরতে ঘুরতে, কাঁচা সুপুরির পান বা বিজয়া দশমীর দিনে সিদ্ধির সরবত খেলে যেমন হয়, টলতে টলতে কখন সে পৌঁছে যায় সেই ফাঁকা জায়গায়, সাহেববাড়ির দোতালায় চারপাশের ঘর-দিয়ে-ঘেরা শূন্যতা কোনো উঠোন না হয়েও আরো বড়, বিশাল একটা ঘর হয়ে ওঠে, যেখানে গদি আঁটা সোফা কোচ, পেতলের টবে গাছের চাষ, দেয়ালবাতির নীল আলো, মাথার ওপর বাহারের ঝালর, পাখা, দূরে টিভি বা ভি.সি.আর.।

থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ কী খেয়াল হলো, পায়ে পায়ে এগিয়ে গা এলিয়ে বসল একটা সোফায়—সাধারণত মা যেখানে বসেন, যেভাবে, যে-ভঙ্গিতে পায়ে পা তুলে গোড়ালি অব্দি ঢাকা থাকে শাড়ি এবং বসে থেকে, অবিকল মাতৃপ্রতিমায় হাঁটুতে কনুই আর হাতেব তেলোয় গালথুতনি রেখে বোবা টেলিভিশনের দিকে অপলক। এমন বিশাল রাজপ্রাসাদের একমাত্র রাণীর সুখ কী হতে পারে এবং কতটা, জীবনে একবার, একবাব মাত্র উপভোগের আকুলতায় নিশুতির রাতে স্বপ্নে বিচরণ তার। আজ রাজকন্যা সে ঘরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ভাবছেন সাহেব নিজে, এবং মা!

একদিন বিয়ে হবে তার? ভয় কতটুকু? কতটা লজ্জা? অষ্টাদশীর ভরাট যৌবনভাবে রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় মুখ ফুটে বলতে না পারার অবোধ অনুভবে সবটা বুঝে উঠতে না পারলেও আরশিতে নিজের মুখ চিনে নেবার মতোই, শূন্যতায়, সে স্পষ্ট দেখতে পায়—দুহাতে ধবধবে শাঁখা, লাল পলা, লোহা। মাথায় ঘোমটা। সিঁথি থেকে কপালের অনেকটাই নামিয়ে এনে সিঁদুর টানবে সে। ওতে মুখশ্রীর পুরো আদলটাই পাল্টে যায় মেয়েদের। সবই নাকি একজন ব্যাটাছেলের জন্যে? কে সে? কেমন তাব চেহারা? কেমনধারা মানুষ? মানুষটাকে বাদ দিয়েই মানুষটার জন্যে একটা গোপন লজ্জা অথবা ভয়। দেয়ালেব নীলচে আলোর ঢাকনায়-ঢাকা দূরের টিভির দিকে তাকিয়ে থেকে সে নিজের নিঝুমে থিতু হয়ে আসে। নিশুতির ঘরে কোনও শব্দ নেই। একটা টিকটিকি অব্দি ডাকতে সাহস পায় না যেখানে, বোবা টিভির দিকেই নিষ্পলক থেকে সে তাব গোপন সংশয়ে গোপন ভীরুতায় চিনে নিতে চায় অচেনা ভাগ্যলিপি তার। টিভি-ঝলসানো সাহেবসুবোদেরই কেউ হবে মুন্নিদিদির বর। কিন্তু তার?

কোনো মোহ নেই। ন্যাকামি নেই। নরম সোফায় গা এলিয়ে গাঢ় তন্দ্রার আবেশে ছোট হাই তুলে একটা সাফ-সাফ কথা সে মেনে নিতেই পারে খুব সহজে—যার যেমন ভাগ্যি নিয়ে জন্মো, তার তো তেমনটাই হবে। মস্ত সাহেব-বর পাবে মুন্নিদিদি। এরোপ্লেন চেপে বিলেত দেশে যাবে। টিভিতে অনেক, অনেকবার সে দেখেছে বিলেতদেশ। কত বড় বড় শহর। আকাশ ফুঁড়ে কত পেল্লাই পেল্লাই সব দালানকোঠা! ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে মোটরগাড়ি। মস্ত সমুদ্দুর। সেখানে সবাই সাহেব। সাহেবদের দেশে বাংলা বলে না কেউ। সবাই ইংরেজি ইশকুলের পাশ।

পড়ালেখা জানে না রাধা। গায়ের বর্ণ কালো। আহামরি রূপও নেই এমন কিছু। সাহেববাড়ির ভাতে শরীরের গড়নপেটনটা নাকি ভাল—বলে সবাই। ফিগার ধুয়ে কী

আর হবে? বড়-মানুষের ঘরে দাসীবাঁদি বৈ কেউ তো নয়। সাহেববাড়ির রহস্যে-ঘেরা রাতদুপুরের নীলচে আলোর শুনশান নিশুতিতে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার দীর্ঘক্ষণে চোখজোড়া ঝাপসা হয়ে উঠতে থাকে। কি রকম রোজগারপাতি হতে পারে লোকটার? কেমন ঘর? টিভি থাকবে? পাকা দালানকোঠা? গ্যাসের উনুন? খাটবিছানা? মাথার ওপর বিজলী পাখার বাতাস? চোখের পাতায় মনে মনে সে একটা জোয়ানমরদ মানুষের চিত্তির আঁকতে চায়। কোনও গাড়ির ড্রাইভার? মোটর মেকানিক? ইলেকট্রিক-মিস্তিরি? খবরের-কাগজের ফেরিওলা? শহরের রাস্তায় নিত্যি দেখে যাদের—ছোটখাটো দোকানের মালিক? নয়তো ও-রকমই কোনো দোকানের কর্মচারী। ফুটপাতের হকার? শহরের মানুষ সবাই। আর সেই মানুষটা যদি শহরের মানুষ না হয়? যদি এত বড় কলকাতা শহরটাই তার জীবনে হারিয়ে যায় কোনোদিন? মরে যাবে সে।

এবং তখনই ঘাড়টা ভেঙে পড়ল গাছের ডাল-ভাঙার মতো। শিরদাঁড়াটা ঝুঁকে পড়তে পড়তে মুণ্ডুটাকে টেনে নিয়ে আসে একেবারে হাঁটুজোড়ার ওপর। দ্রুত আঁচল টেনে নাকমুখচোখ চেপে ধরতে হয়। নিঝুম রাতের সাহেববাড়িতে কান্নার নিয়ম নেই। সবাই বেরিয়ে এলে...ছিঃ ছিঃ, সে আরেক বিদঘুটে কাণ্ড। জবাব দেবার কোনও যো থাকবে না তার। মেয়েমানুষের দুঃখু তার শরীরের অনেক গোপন ব্যথাবেদনার মতো। অন্ধ তো কী হলো? স্বপ্ন দেখতে পারে না কানা মানুষ? পাবে কিনা, অবিশ্যি জানা নেই তার। বলা তো যাবে না কাউকে—একজোড়া চোখ তারও আছে। দুটো চোখই জ্যান্ত।

ভেজা-ভেজা বুক আর চোখের হাপিত্যেশ নিয়ে মুখ তুলল এবার। সাহেববাড়ির মায়াবী বাত্তির চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে আছে। বুঝি অজান্তেই সে একটা মাকড়সা হয়ে যাচ্ছে। নিজেরই লালায় অনেক বড় জাল ছড়িয়ে নিজেই আটকে পড়ছে। ঝুলছে নিজের ফাঁদে। বাপের ঘর ছাড়লে কোথাও একটা সুখের-ঘর চাই মেয়েদের। সুখের-ঘর চাইতে গেলে যদি ছাড়তে হয় সাহেববাড়ি?

কোথায় খুট করে শব্দ হল একটা! সোফার গদি তার জন্য নয়—ভয়ে, সোফা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে হয়। তাকাল চারপাশে। ধরা পড়ে যাবার ভয়। সাহেব বা মা বাথরুমের জন্য বেরুতে পারেন বাত্তিরে। সে পালায়, পা টিপে টিপে চোরের ভীরুতায় শব্দ না তুলে। বুঝি এ-বাড়ির তকতকে ঝকঝকে নকশা-আঁকা মেঝেয় দুঃখী মানুষের ছায়া পড়লেও কলিংবেল বেজে উঠতে পারে কোথাও। যদি সে ঘরেরই মেয়ে, এ-বাড়ির ঘরদোর যদি তার নিজেরই ভুবন—পালাতে হয় তাকেও। যেহেতু মেয়েই একজন—গভীর রাতে এভাবে নিজেরই ঘরবাড়িতে সে ঘুরে বেড়াবে কেন একা? যদি ঘরেরই মেয়ে, তারও জবাবদিহির দায়?

মস্ত খাবার-ঘরের পাশে ছোট একটা ঘর। ভাঁড়ার ঘর। মেঝেয় কাঁথামাদুর বালিশ পেতে ঘুমোচ্ছিল গোপালের-মা। তেড়াবাঁকা খাটো মশারিটা নিচু হয়ে দুমড়ে পড়ে ফাটা ঠোঙার মতো প্রায় লেপটে গেছে গায়ের ওপর। পাখার বাতাস সইতে পারে না বুড়ি। গরমে সেদ্ধ হয়।

তাই যদি হবে, এঘরে শোবে কেন বুড়ি? ঘরে একটা তক্তপোশ আছে। সেটা

রাধার। রাধার একার। নিত্যি পাখার তলায় ঘুমোবার অভ্যাস তার। পাখাটা চলবে কি চলবে না, কারুর ঘুম ভাঙিয়ে তাই নিয়ে তককো চলে না মাঝরাত্তিরে। বরং তাকেই পিছু হটতে হয়। ওই বুড়ির জন্যেই নিজের ঘরের তক্তপোশ ছেড়ে, বাইরে খাবার ঘরে চেয়ারটেবিলের ধার ঘেঁষে মেঝেয়ই নিজের জন্য শয্যা পাততে হলো। লেকটাউনের অভিজাত এলাকায় শীতগ্রীষ্মের তফাত নেই, লাখো লাখো কোটি কোটি মশা। কিন্তু আজ, এত রাতে মশারি-টাঙানোর দিগদারিতে যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। ওপাশে জানালার গ্রিল, এদিকে দরজার আংটা, অন্য দুদিকে টেবিলের পায়া আর দেয়ালের পেরেক—লম্বা লম্বা দড়ির গিঁট বাঁধার হাঙ্গামা আজ দুঃসহ মনে হলো। ভাঁড়ার ঘরেরই এক কোণে তক্তপোশের শিয়রে পাটিসাপটায় জড়ানো তার তোশকচাদববালিশ। অন্ধকারে হাতড়াতেও হয় না। নিজের ঘবের দেয়ালে চেনা-সুইচের মতো একবারেই হাত পেয়ে যায়। সবটাই তুলে এনে, কোনো বিছানাপাটি নয়, শুধু বালিশটুকু টেনে নিয়ে; খাবার ঘবের দুটো পাখার একটার তলায়, যেখানে চেয়ারটেবিল নেই, ফুলস্পিডের ঝড় তুলে টানটান শুয়ে পড়ল শাদামাটা মেঝেয়। এ-বাড়ির মেঝেটাই এত ঠাণ্ডা আর পিচ্ছল। অচিরেই ঘুম।

সাহেববাড়ি মূলত এক বৃহৎ ক্রীড়ারঙ্গভূমি। মূর্খ যুবতী শালতি চেনে। জানে না সমুদ্দুর।

খেলা-খেলা করে বছর ভরে প্রায়ই এরকম হুলুস্থুল বেঁধে যায় এ-বাড়িতে। দেশ বিদেশের কত যে খেলা, সব কিছুর হিসেব রাখতে গিয়ে হিমশিম সে-মেয়ের। আরো মজা, সবই টিভিতে দেখানো হয়। বিদেশের খেলা হলে মাঝে মাঝে রাতদুপুরেও জেগে বসে খেলা দেখবে সবাই। এক চ্যানেলে সিনেমা থাকলে আরেক চ্যানেলে খেলাই দেখবে। মনে মনে ভীষণ রাগ হয় রাধার। কিন্তু দিনদুপুরে যে-খেলা, সিনেমা-সিরিয়াল কেড়ে নেয় না যে-হট্টগোল, সে-ভারি মজার। বুঝে বা না-বুঝেই রাধা তার অংশ হয়ে যায়।

কলকাতার বড় স্টেডিয়ামে আজ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবল।

আশ্বিন মাস। পুজোর মাস। প্রায় প্রতিদিনই কেনাকাটা চলছে মা আর দিদিমণিদের। এরই মধ্যে হঠাৎ খেলা! খেলা-খেলা করে গোটা কলকাতা শহর জুড়েই পাগলামি চলছে সকাল থেকে। ভোরবেলা দুধ আনতে গিয়ে রাধা দেখেছে পাড়ার মোড়ে মোড়ে রাস্তার এপাশ-ওপাশ জুড়ে লম্বা দড়ি বেঁধে সবুজ-মেরুনের পতাকা ঝুলিয়ে রেখেছে কারা। সে-নাকি মোহনবাগানের। একটু দূরে আরো বড় ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ। দুটো ফ্ল্যাগই গাঁদা ফুলের মালায় মালায় সাজানো। এরা পাল-তোলা নৌকো এঁকে ফুলে ফুলে সাজিয়েছে। ওরা ইস্টবেঙ্গলের মশাল বানিয়েছে আরো অনেক বড়।

রাধা জানে, তার গাঁয়ে সবাই মোহনবাগান। কিন্তু সাহেববাড়ি বাঙাল হলেও দারুণ মজা। মায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। খুলনার-মেয়ে মা নাকি জন্মো থেকেই মোহনবাগান। বুল্লিদিদি আর দাদাবাবু বাপের আহ্লাদে মানুষ। মুন্নিদিদি মায়ের দিকে। হৈ-হট্টগোলে দু-দলেরই দাপট সমান। আজ শনিবার। কলেজফলেজ, কি জানি

কেন, সব ছুটি। সাহেব আপিশে বেরিয়ে যাওয়ার পর-পরই চিৎকার চেঁচামেচিতে গোটাবাড়ি তোলপাড়। রাধা, যেহেতু এ-বাড়িরই মেয়ে এবং দিদিমণিদের সমবয়সী, উৎসাহের সংক্রমণে তাকেও ওদের উৎসবের একজন হয়ে উঠতেই হয়। ক্রিকেটে তো দিনভর সকালবিকেল খেলাটাই টিকে থাকে। টেনিস নামেও খেলা আছে একটা। রাত্তিরে হয়। ফুটবল আলাদা। সেই কখন বিয়ে হবে বিকেলবেলা, সকাল থেকেই সানাইয়ের পোঁ। সবাই লাগামছাড়া।

মুনমুন বোঝাচ্ছিল মাকে। রাধা পাশে ছিল।

'হোয়াট ইজ এ ফুটবল? ফুট মানে তো জানো? এই যে দুটো করে পা আছে আমাদের, সেই পা। বল মিনস...' দু-হাতের মুদ্রায় গোলাকার কিছু বোঝাতে চেষ্টা করে মুনমুন—'বল মিনস...হোয়াট টু সে...মিনস সামথিং রাউন্ড। মানে গোল। তাহলে ফুটবল মানে কী হলো?'

হেসে ফেললেন কিরণময়ী, 'পাগোল।'

রাধা শিখে ফেলল একটা ইংরেজি শব্দ। ফুটবল মানে—পাগল। এবং বাড়িভর্তি সবাইকে সত্যি সত্যি পাগলই দেখল সে।

ফিনফিনে সিলকের কাপড়ে মস্ত একটা ইস্টবেঙ্গলের ফ্ল্যাগ বানিয়ে এনেছে রাবন। ছাদে অ্যান্টেনার পাশে বাঁশ এঁটে উড়িয়ে দিলো লাল-হলুদ। ছাদের বাগানে হলুদ আর লাল ছোপ ছোপ পাতাবাহার গাছ আছে দুটো। গোটা কয়েক পাতা ছিঁড়ে এনে দোতলায় টিভির ঢাকনার ওপর সাজিয়ে রাখল বুলবুলি। সবুজ মেরুনে এমন কিছু না পেয়ে অন্যভাবে দাদা-বোনের জবাব দিলো মুনমুন। শাদা কাগজে রঙিন পেন্সিল ঘষে সেলো টেপে সেঁটে দিলো টিভির পেছনে দেয়ালে। কিরণময়ী দেখলেন সব। মুচকি হাসলেন। ক্ষেপে গেলেন, যখন বাজার থেকে কেজি খানেক বোঁদে কিনে এনে হুল্লোড় বাঁধাল রাবন। ক্রোধের কারণ লাল-হলুদের মাখামাখি আলাদা-আলাদা দানা বলে নয়। এত এত ফালতু মিষ্টি দিয়ে হবেটা কী? খাবে কে? অবিশ্যি পড়ে থাকে না ছিটেফোঁটাও। রাবন একাই তুলে দিলো প্রায় অর্ধেকের বেশি। শুধু লাল-হলুদ বলেই।

মজা! সত্যি দারুণ মজা। গোটা দিন ধরে খেলার হৈ-হুল্লোড়ই আলাদা এক ধরনের খেলা হয়ে ওঠে সকলের। এ-তো শুধু একদিন নয়। বছর ভরে প্রায়ই এমন খেলার উৎসব, খেলার হৈচৈ। অদ্ভুত তামাশা। ঘরসংসারের হাজার কাজ নিয়েও খেলার দিনগুলোতে রাধারও টগবগানি বেড়ে যায় অনেক। তাকেও হাসতে হয়, ছুটতে হয়। হাততালিও মাঝে মাঝে।

এভাবেই সারাদিন ধরে নিজেদের উত্তেজনায় নিজেদের সেঁকতে সেঁকতে যখন দুপুর গড়াল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রাবন। স্টেডিয়ামে বসেই সরাসরি খেলা দেখবে সে। স্টেডিয়ামের আজীবন সদস্য গোল্ডেন কার্ড আছে তার। এছাড়াও ক্লাবের মেম্বরশিপ। বুলবুলিও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিরণময়ী যেতে দেননি মেয়েকে। ফুটবল মাঠ মানেই নাকি মারদাঙ্গা বোমাবাজি। সে-নিয়ে গোটা দুপুর আরেক অশান্তি। শেষমেশ রাবন একাই বেরিয়ে গেছে। কোন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

এবং যখন সময় এল, মাঠে যাওয়া বা যেতে না-পারার কোনো ফারাকই থাকে না। রঙিন টিভিতে ঝলমলিয়ে উঠল সবুজ মাঠ। গ্যালাবি ভর্তি হাজার হাজার মানুষ, কালো পোশাকের তিনজন রেফারি বা রঙচঙে জামাগেঞ্জি জুতো-মোজার খেলোয়াড়রা সকলেই হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কিংবা ঘরের মানুষগুলো ঘরে বসেই চলে গেল স্টেডিয়ামের লম্বা মাঠে। রাধা রং দেখে, মাঠ দেখে, মাঠের ছুটোছুটি দেখে, অন্যদের খেলা-দেখার মজা দেখে। খেলা শুরু হয়ে যেতেই কী রকম বদলে যেতে থাকে চেনা মুখগুলি। তিনজনই মেয়েছেলে। মায়ের মুখে পান। ভুরভুর জর্দার গন্ধ। খুশিতে আতঙ্কে রাগে বা স্বস্তিতে মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে দিদিমণিদের লাফালাফি আর মুখচোখের আদল। মাঝে মাঝেই ধ্যুৎ ধ্যুৎ বোগাস ননসেন্স নয়তো ফ্যানটাস্টিক স্প্লেনডিড বা জবাব-নেই। তককোও বেঁধে যাচ্ছে। রাধা মুনমুনকে দেখে। মুন্নিদিদিকে বড় ভালবাসে সে। মুন্নিদিদিরা জিতলে মা জিতে যাবেন। হেরে যাবে বুল্লিদিদি দাদাবাবু। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তার নিজের হারজিৎ নেই।

হঠাৎ গো ও ও ও ল...

জালের ভেতর বলটা ঢুকে যেতেই টিভিটা যে ফেটে পড়ছে হল্লাচিৎকারে, কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, লাফিয়ে উঠে বুলবুলির সে-যে কী এক তুমুল হৈচৈ—ছুটে গিয়ে টিভির কাচে চুমু খেয়ে ফেলতে, সেটা যে ছোকরা বয়সী গোলদাতা একজন যুবকের গালে গিয়ে পড়ল, মায়ের সামনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ব্রেকড্যান্সই নেচে ফেলল এক ঝলক। উঠে গিয়ে ধমকেধামকে কিরণময়ী সামলাতে পারেন না বেযাড়া মেয়েকে। ঠিক কালো প্যান্টজামার রেফারিবাবুর মতোই অসহায়। নরম গালে টোল ফেলে মুচকি মুচকি হাসছে মুনমুন।

মেঝের কার্পেটে চুপচাপ বসে থেকে আলসেমির হাই ওঠে। একটানা নববুই মিনিট? ওরে বাপস! উঠে পালিয়ে যাবে, রাধা ভাবছে যখন, চনমনিয়ে উঠল। টিভির মাঠে তুমুল হট্টগোল।

এদিকের গোলের সামনে কালো প্যান্টের একজন খেলোয়াড় এমন ল্যাং মারল শাদা প্যান্টকে, লোকটা খাড়াখাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রেফারিসাহেব তেড়েফুঁড়ে ছুটে এসে বুকপকেট থেকে তুলে হাত উঁচিয়ে কী দেখালেন কালো প্যান্টকে, তাই নিয়ে রেফারিকে ঘিরে দল বেঁধে হাত-পা ছুঁড়ছে কালো প্যান্টের আর সব খেলোয়াড়রা। গ্যালারি ভেঙে লাখো মানুষের তুলকালাম কাণ্ড। বুলবুলিও উত্তেজিত।

গাল ভরে টইটম্বুর পানের পিক নিয়ে অসহায় কিরণময়ী। গলাথুতনি উঁচিয়ে অঁ-অঁ করে চড়া গলার খিঁচুনিতে কী বলতে চাইলেন মেয়েকে। বলা গেল না। উঠে গেলেন পিক ফেলতে। সামলাবেন কাকে? মাঠ তাঁর নাগালের বাইরে।

কী আশ্চয্যি! কালো প্যান্টের খেলোয়াড়টা বেরিয়ে আসছে মাঠ ছেড়ে। কিছুই বোঝে না রাধা। সবটাই গোলমেলে। এক ঝটকায় উঠে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল সোফার ওপর। মুনমুনের কানে কানে—'কী হল গ? গোলমাল কেনে? বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা?'

'সে-তুই বুঝবি না। যেদিন বিয়ে হবে তোর, সেদিন বুঝবি।'

বিয়ে? বিয়ে কেন? মগজের ঘিলুতে এতটা প্যাঁচগোছ আর ধরে রাখতে পাবে না রাধা। গাট্টাগোট্টা ব্যাটাছেলেদের খেলার মধ্যে বিয়ে আবার কী?

'হ্যাঁ রে, দিনের বেলায় গায়ে-হলুদ হয় না মেয়েদের? সেটা ইয়েলো কার্ড...' হাসছে মুনমুন—'পরের দিন দেখবি সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে...মানে রেড কার্ড দেখিয়ে তোকে মাঠ থেকে বের করে দিচ্ছে তোর মা—যা, শ্বশুরবাড়ি যা...'

টিভির মাঠে ঘরের মাঠে একইভাবে তুমুল হল্লা। এমন কি, প্রতিদ্বন্দ্বী বুলবুলিও খুশিতে খুশিতে ঢলে পড়েছে দিদির গায়ে—'ব্র্যাভো ব্র্যাভো, এ গুড ব্রাইড অ্যান্ড এ ব্যাড বয় ফুটবলার, বোথ আর অ্যালাইক? আআ, হাউ ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া। ফ্যানটাস্টিক...'

ইংরেজি তককো দুবোনের। হাড়মাস নেতিয়ে শরীর ভেঙে ঘুম নামছে রাধার। হালুম গোছের মস্ত হাই। কিন্তু পানের ছিবড়েয় গালে টোবলা তুলে চঞ্চল মাতাঠাকুরাণী —'দ্যাখ দেখি, এখন কী হবে? তখন এত করে বললাম বাবনকে—আজ যাস নে। আজ এত টেনশন। কখন কি হয়...'

দৃশ্য সত্যি ভয়াবহ। খেলা বন্ধ। রেফারিকে ঘিরে মাঠের ভেতর খেলোয়াড়দের হল্লা চলছেই। গ্যালারির একপাশ থেকে পিলপিল পিলপিল করে নেমে আসতে চাইছে মানুষের ঢল। ঢাল বাগিয়ে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছে পুলিশ। খেলার যুদ্ধ না যুদ্ধের খেলা—চলছে একইভাবে। মাঠের মধ্যে ফেলে পুলিশ বেধড়ক পেটাল কয়েকজনকে। শিউরে উঠল রাধা।

'ধ্যাৎ...' ধমকে উঠল মুনমুন—'দাদা কি আজই নতুন যাচ্ছে নাকি? গোল্ডেন কার্ড ওর। ভি.ভি.আই.পি. গ্যালারি। ওদের দিকে কিছু হবে না।'

'হুঁ, ধুর পাবলিক দাদা...' বুলবুলি নিশ্চিন্ত অনেক—'গাড়ি নিয়ে যায় নি তো কী হয়েছে। ট্যাকসি করে ফিরবে। হেভিপকেট ক্যান ইভেড দ্য রাথ বোথ অব পোলিশ অ্যান্ড পিপল...'

বদলে গেল টিভির মাঠ। পাল্টে গেল টিভির ঘর। ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ চারপাশ থেকে ছুটে এসে স্রেফ লাঠিপেটা করে মাঠ থেকে হটিয়ে দিয়েছে ঢিল-ছোঁড়ার মানুষগুলোকে। নতুন করে খেলার শুরু। অনেকটাই ক্যারাম খেলার মতো। মস্ত বোর্ড জুড়ে ছুটোছুটি সবুজ-মেরুন লাল-হলুদ ঘুঁটিগুলোর।

শরীর ভেঙে ঘুমের ঢল। বুজে বুজে আসছে চোখজোড়া। হাড়গোড় খিঁচিয়ে মস্ত হাঁ তুলে, দুচ্ছাই, এ-খেলা দেখার চেয়ে, বরং এখনও সময় রয়েছে কিছুটা—আধঘণ্টাটাক সে একটু গড়িয়ে নিতে পারে নিজের ঘরে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রাধা। একটু একটু করে সরেও এল। মনটা খিঁচিয়ে থাকে। দাদাবাবু? মারদাঙ্গার খেলায় কেন যে যায় লোকটা? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে না আসা অব্দি ভয়ভাবনা তো থাকবেই ঘরের মানুষদের।

কখন খেলা ফুরলো, কাদের হারজিৎ কিছুই জানল না রাধা। ঘরের ছেলের ঘরে ফেরাব ভয়ভাবনাও কোথায় উবে গেছে। ঘরে ঘরে সাজসজ্জা শুরু হয়ে গিয়েছিল দিদিমণিদের। মাকেও তৈরি হয়ে নিতে হয়।

কিন্তু রাধার নিয়মে চলে না সাহেববাড়ির চন্দ্রসূয্যি। সেখানে অন্য আহ্নিকগতি। সকাল থেকেই প্রোগ্রাম স্থির ছিল, বিকেলের দিকে অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন নিশীথবঞ্জন। মেয়েদের নিয়ে মার্কেটিংয়ে যাবেন কিরণময়ী। পুজোর আগে চৌবঙ্গির কোন বড় হোটেলে এক্সক্লুসিভ প্রিন্ট শাড়ি, শালোয়ারকামিজ বা অন্যান্য গার্মেন্টসেব সেল-কাম-এগজিবিশন। এছাড়াও নিউমার্কেটে কিছু কেনাকাটা।

গোটা দুপুব বাড়িটা ফুটবল মাঠে ভবে থাকার শেষে সন্ধেবেলা, ঘরেব মানুষজন কেউই যখন ঘরে বইল না, এত বেশি ঠাণ্ডা আব নিঝুম, সোনার প্রাসাদ আগলে থাকতে বড্ড ভয় ভয় করে রাধার। একতলায় নন্দদা সদরে কলাপসিবল গেট টেনে বসে আছেন। বাঘাকেও ছেড়ে রাখা হয়েছে। দোতলায় ঢ্যামনা বুড়ি গোপালেব-মাকে নিয়ে সে একা। মাঝেমধ্যে এ-বকম বড়সড় দাযিত্ব চাপলে যেমন তার অহঙ্কার বাড়ে, তেমনি বুকের ভেতর ধড়ফড়। এদিক-ওদিক কিছু একটা ঘটে গেলে মায়ের কাছে তারই তো জবাব দেবার দায়।

বুঝি কোনো যুদ্ধ জয় করে ঘরের ছেলে ফিরল ঘরে। তবু কিছুটা শান্তি। মগজ জুড়োয়।

ঘেমেনেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরেই জোয়ানমরদ একজন মানুষের এমন হাঁকডাক, ঘরে ডাকাত পড়ার হল্লা। চমকে উঠল রাধা। টিভিতে এমন একটা ভাল 'বই' খামোকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গোপালের-মার সঙ্গে রান্নাঘরেই ছিল সে। কাজ ফেলেই ছুটে আসতে হলো।

ফুরসত নেই, স্থির হয়ে দাঁড়াবার ধৈর্য নেই ঘর্মাক্ত যুবকের। পাখার সুইচ টিপল। টিভি চালিয়ে দিলো। পর্দায় অমিতাভ বচ্চন আব রাখী ঘনিষ্ঠ ক্লোজআপে।

জামাটা খুলে ফেলেছে গা থেকে। গেঞ্জি থাকে না শার্টের তলায়। বিচ্ছিরি ঘেমো জামাটা কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেদল দেহের উদোল গায়ে, ঠিক পাখাব তলায পা দুটো সামনে ছড়িয়ে গা ঢেলে বসল একটা সোফায়। পিঠ ঠেসে, দুটো হাত উর্ধ্বে তুলে হাতের তেলোয় মাথা রেখে টানটান সোজা হয়ে বসে এবং চকিতেই লাফিয়ে উঠে—'কী হলো? হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? কী আছে তোদের? খেতেটেতে দে কিছু। ছুঁচোয় ডন মারছে পেটে...'

'কী খাবে?'

'কি খাব, কী? বলছি খিদে পেয়েছে। কেন, মা তোকে বলে যায়নি কিছু?

'বলাবলির কী আছে...' শান্ত ভীরুতায রাধাব কুণ্ঠিত গলার স্বর—'তুমি হাত-পা ধুয়ে এসে বসো এখেনটায়। বই দেখো। আমি জলখাবার করে নিয়ে আসছি।'

'ধ্যাৎ। মুকদ্দার-কা-সিকান্দর তো? ও-আমি তিনবার দেখেছি...' টিভি বা রঙিন পর্দায় নাচগানের বাইরে বাবনের চোখজোড়া হঠাৎ-ই কেমন থিতিয়ে গিয়ে রাধার দিকে কিছুটা ছুঁচলো।

এবং নিশানায় বিদ্ধ হয়ে অনভ্যাসের কাঁপুনিতে হতচকিত রাধা, এত বিশাল ফাঁকা বাড়ির শূন্যতা যে কি ভীষণভাবেই ভূতুড়ে, জীবনের নতুন অনুভবে পিঠের আঁচল নাকেমুখে চেপে নিজে রেহাই পেতে, নয়তো মানুষটাকেই ছাড়ান দিতে, ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল। এমনটা তো হয়নি কোনদিন। তার এত কালের চেনা, তার ঘরেরই মানুষ।

টিভির পর্দায় রাগ-অনুরাগের পালায় রেখা আর অমিতাভ বচ্চন। নজর ছিল না কারুর।

ছোঁয়াছুঁয়ির চাউনিটা ফিরিয়ে নিয়েছে লোকটা। ঘাড় বাঁকিয়ে ছোট করে হাসিও একটুকু—'তোকে আজ এত সুন্দর লাগছে কেন রে বাধু? খুব সেজেছিস?'

এমন কিছু বেখাপ্পা খারাপ কথা নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু রাধা ঝলসে উঠল। লাল ডোরাকাটা হলুদ একটা ঘরে-পরার-শাড়ির সঙ্গে লাল ব্লাউজে কী আর এমন সুন্দরী হতে পারে সে? কিংবা ফাউলটাউল করে কে কোথায় সটকে পড়েছে সবাই। ফাঁকা মাঠে তার একা পেনাল্টি সামলানোর দায়। মুখে আঁচল চেপে ছোট করেই বলল সে। চোখের চাউনিটা তীক্ষ্ণ থাকে—'সেই ছোট্টবেলায় তুমি আমায় মা-কালী বলে ডাকতে গ দাদাবাবু। আমি ক্ষেপে যেতুম...'

'এখনও কি সেই ছোট আছিস নাকি তুই?' এক ঝটকায় অনেকটাই স্প্রিংয়েব মতো ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল মানুষটা। ফিরে তাকাল না রাধার দিকে। সারা দুপুব মাঠে বসে খেলা দেখায় ক্লান্তি ছিল। অবসন্ন দেহে অথবা গলার স্বরে সেই ক্লান্তির ভাঙন- – 'আমি ওপরে যাচ্ছি। বুঝলি! মৌজসে চান করব। তুই যা করবি, করে নিয়ে আয় গরম গরম। ঝটপট করবি। জলদি...'

একইভাবে মুখে আঁচল চেপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাধা। জিনসের প্যান্ট, চওডা বেল্ট, উদোল পিঠেব দিকে তাকিয়ে থেকে মানুষটার চলে-যাওয়া দেখে। ছোট না-থাকা বা নিজের বড় হয়ে ওঠার প্রকৃতিবিধানে কেমন কবে আলাদা থাকা থেকে আস্তে আস্তে ছোঁয়াছানির ভয় হয়ে যায় ঘনিষ্ঠ মানুষ! আপন-পবের হিসেব বোঝে না মূর্খ যুবতী। কিংবা চেনে না নিজেকেই।

নিরিবিলির জনশূন্যতায় নির্জন ছিল না ঘর। অমিতাভ বচ্চন রাখী আমজাদ সকলেই একসঙ্গে ফালতু মাঠে মারা যাচ্ছে। এত ভাল একটা 'বই'! দুঃখু একটা থাকে ঠিকই, টিভির কানমুলে ওদেব বোবা করে দিতেও হয়, যদি কাজেব চাপ বাড়ে।

তাকে ফিবতে হয় রান্নাঘবে। ভাবতে হয়, চটজলদি কী জলখাবার তৈরি করে দেওয়া যায় এক্ষুনি। ঘরে যখন মা নেই এবং তাকেই দেখতে হচ্ছে চারদিক, সেকেলে বুড়ি গোপালেব-মাব হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না এসব কাজ। ঢ্যামনা বুড়ি মর্জিমেজাজ কিছুই বোঝে না শৌখিন মানুষ দাদাবাবুর। ছোট ফ্রিজের ডালাটা খুলল। খুঁজেপেতে দেখতে হয়—কী কী আছে? ডিম তো থাকেই সারাক্ষণ। ফ্রিজেব ডালায় সস-আচারেব শিশিবোতলের উর্ধ্বে সবার ওপর সারি সারি শাদা ডিম। নানা ধরনের ফল সন্দেশ মিষ্টি তো আছেই। পাঁউরুটিও থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। ফুবোবার যো নেই। সকালে বিকেলে

হরবকত কেনা হচ্ছে। মাঝেমধ্যে পচেও যায় কিছু। নষ্টও হয় বিস্তর। দাসদাসীরা খায়। ফেলাও যায় অনেক।

স্ক্র্যাম্বলড এগ বড ভালবাসেন দাদাবাবু। ডিম আছে, রুটি আছে। করা যেতেই পারে। চোখে পড়ল চিনেমাটির বড় প্লেটে মাংসের কিমা বেশ খানিকটা। মা কেন আলাদা করে রেখে দিয়েছেন, সে জানে না। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে স্থির পলকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। টোস্টারে ফেলে গোটাকয়েক মটনটোস্ট এক্ষুনি করে দেওয়া যায়। সাহেববাড়িতে এত অঢেল মজুত ভাণ্ডার, ফাঁকা পেলে প্রাণ ভরে রাঁধতে ইচ্ছে করে অনেক কিছুই। জোয়ান বয়সের একটা মানুষ! বেশ খাইয়ে লোক। খাইয়েও সুখ। নিজের হাতে রেঁধে এমন কাউকে খাইয়ে তারিফ পেতে মন চায়। তেমনি এক নেশায় ছোট ফ্রিজ ছেড়ে বড় ফ্রিজের পাল্লাটা সে খুলল একবার। হরেক ধরনের আনাজপাতি, ঘরে-পাতা টক দইয়ের বাটি, রান্না-করা অনেক কিছুর সঙ্গে চোখে পড়ল চিনেমাটির বড় একটা বাটিতে কাবুলিমিটর সেদ্ধ করে রেখেছেন মা। কখন সেদ্ধ করিয়েছেন এবং কেন, কিছুই জানা নেই। আঙুলে তুলে টিপে টিপে পরখ করল দু-চারটে। হঠাৎ বুদ্ধিটা খুলে যেতেই আরো একটা বাটি এনে দু-মুঠোর পর, কী ভেবে, মাপজোকে অনুমানে তুলে নিলো আরো এক মুঠোর কিছুটা কম। অন্য একটা প্লেটে ছোট ফ্রিজ থেকে মাংসের কিমাও তুলল আন্দাজমতো। আনুষঙ্গিক মশলাপাতি—আদা রসুন ছোট-এলাচ লবঙ্গ দালচিনি মগজ হলুদ লঙ্কা ধনে তেজপাতা কিংবা ঘি পেঁয়াজ টম্যাটো যা যা দরকার, কিছুরই তো অভাব নেই। কৌটোকাটা কোথায় থাকে, সবই তার হাতের-পাঁচ। গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতেই যা একটু সময়।

ওদিকে রাতের রান্নায় ব্যস্ত ছিল গোপালের-মা। একটা ওভেনের দু-দিকই জ্বলছিল। একদিকে কুকার চাপিয়ে ডাল সেদ্ধ হচ্ছে বোধ হয়। অন্যটিতে ছ্যাঁকছ্যাঁক কী ভেজে যাচ্ছে বুড়ি। বুড়ি বড় বেঁটে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতাখুন্তি নাড়তে ঠিকঠাক নাগাল পায় না কড়াইয়ের। কোত্থেকে জলচৌকিগোছের জোগাড় করেছে একটা। পায়ের তলায় পেতে নিয়েছে। খামোকা ওকে ঘাঁটাতে চাইল না রাধা। সাহেববাড়িতে গ্যাসের উনুন তো একটা নয়। 'ইনডেন' আর 'হিন্দুস্থান' দুটো কোম্পানিতে মা আর সাহেবের নাম লেখানো আছে আলাদা করে। দুটো দুটো চারটে সিলিন্ডারের চালাচালি একটা সংসারে। এত এত রান্নাবান্না। এত খানাপিনা! চারটে কেন, আরো গোটাকয়েক সিলিন্ডার পুড়লেই বা কার কী এসে যায়? বুকিংয়ের গোনাগুনতিতেই যা একটু ঝকমারি। রাধা দাঁড়িয়ে গেল বুড়ির সঙ্গে। চোখ টেরিয়ে তাকাল গোপালের-মা—'তুই আবার কী শুরু করলি এখেনে?'

'জলখাবাব গ, জলখাবার।'

'হুঁ, সে-ত শুনেছি। বলি, কার জন্যি লা? খাবে কে?'

'আমি গ, আমি খাব...' সিলিন্ডারের কান মুলে বার্নারে লাইটার ঠুকেছে রাধা। তিন লিটারের ছোট কুকার চাপিয়ে ঘি ঢালল—'কেনে গ, ঘরে কেউ নেই বলে কি আমরাও নেই নিকি? নিকি খিদেতেষ্টা থাকতে নেই সেবাদাসীদের?

'সেবাদাসী কি লা? গতর ভরে ঢলঢল যৈবন। রাজার ঘরের মেয়ে তুই। খা

না খা...' নিজের আক্রোশে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ে গোপালের-মা। গজরায়—' ওই যো কতায় বলে না... পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কিবা মানা...'

মনে মনে হাসে রাধা। কুকারে ঘি গরম হতে থাকে। চিনি আব তেজপাতা ঢেলে খুন্তি দিয়ে নাড়তে নাড়তে, নাড়ার ফাঁকে ছোট শিলনোড়াটা শান বাঁধানো বেঞ্চটপের ওপর তুলে আদা-রসুন থেঁতলে নিয়ে গোটা শরীরের ঝাঁকুনিতে বেটে যেতে হয় মিহি করে এবং কুকারের সঙ্গে পাল্লায় পিছিয়ে না পডার প্রতিযোগিতায়, চিনিটা বাদামি বঙের হালকা একটা আদল পেয়ে যাবার পর, বড় বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে বলে ওভেনের নব ঘুরিয়ে আঁচটা কমিয়ে নিতেও হয় খানিকটা। বড্ড খিদে পেয়েছে একজনের। হা পিত্যেশ কবে বসে আছে। সোহাগ কবে খাবে। রাধাকে ঘামতে হয়। পবেব খিদেটা বুঝি নিজেরই খিদে হয়ে যায় একসময়। ছুটে এসে বঁটিতে বসে একটা পেঁয়াজ কুচি-কুচি করে নিতে হয় দ্রুত হাতে। পেঁয়াজকুচি কুকারে ফেলে দিয়ে সোনালি বাদামি ভাজা ভাজা হয়ে ওঠার মধ্যবর্তী সময়ে আদা-রসুনের পর একটু জল ছিটিয়ে ছোট এলাচ লবঙ্গ দালচিনিকে একসঙ্গে নিয়ে আবাব বাটনাবাটা। ওষুধ সেবনেব আগে শিশিটা ঝাঁকিয়ে নেবার নিয়মেই গোটা শবীরে ঝাঁকুনি তুলে পেস্তার সঙ্গে কিছুটা মগজ গুঁড়িয়ে রাখতে হয় আলাদা কবে। পাখা থাকতে নেই উনুনের ঘরে। খোলা জানালায়ও বাতাস নেই। ঘামে গরমে জ্বলছে পুড়ছে শরীর। পিঠের আঁচল টেনে নাকমুখ গালগলা কপাল ঘষে ঘষে বারবার মুছে নিতে হয়। অতি ত্রস্ততায় মাংসের সবটাই ঢেলে দিলো কুকারে। আবো জোরে জোরে এবার সেটা নাড়তে হয়, ভাজা ভাজা হয়ে উঠতে যেটুকু সময়। দারুণ একটা ঘিয়েব সুবাস, মশলাপাতির তেজী ঝাঁঝ। ভাজা-ভাজা হয়ে মাংসটা যত বেশি বং পাল্টাচ্ছে, গন্ধটা চারিয়ে যেতে থাকে। যত বেশি ঘ্রাণ, ঘামে গবমে নিজেব মধ্যেই একটা তীব্র নেশা। বাঁ-হাতে কুকারের হাতল ধরে ডান হাতের খুন্তিতে আবো জোরে পাগলের মতো ঘাটাং ঘাটাং শব্দ তুলে নেড়ে যেতে থাকে এবং এভাবেই তাকে নেড়ে যেতে হবে অন্তত মিনিট পাঁচ-দশ। দশ মিনিট বড্ড বেশি সময়। খিদে পেলে কতক্ষণ আব বসে থাকতে পাবে একটা ব্যাটাছেলে? রাধার ঘাম ঝবানো শ্রমেব নির্যাস পুজোর ভোগনৈবেদ্য সাজানোর আকুলতায় শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতব হয়ে উঠতে থাকে।

পাশের উনুনে বড় কুকারে হুইসল বেজে উঠেছে। সেটা বুঝবে গোপালের-মা। বাধা তার নিজের রান্নায়, খাঁটি-খাঁটি দামি ঘিয়ে ভাজা মাংসের টুকরোগুলো হালকা বাদামি হয়ে উঠেছে কিনা, পরখ করে নেবার পর সেদ্ধ কাবুলিমটর বাটা-মশলা এবং অন্যান্য সবই ঢেলে দিলো কুকারে। নুন দিলো। আরো কয়েক চামচ ঘি। সবটাই একসঙ্গে ভেজে নেবার শ্রমে আরো বেশি সবল পেশীর চাপে, মগ্নতায়, সে খুন্তি ছেড়ে হাতা নেড়ে যেতে থাকে দাঁতে ঠোঁট চেপে। ফাঁকা বাড়িতে 'মুকুদ্দার কা সিকান্দার' বোবা টিভিতেই ফুরিয়ে গেল—যত তার রাগ বা দুঃখু, সব আপশোসই পূরণ হয়ে যেতে থাকে অনবদ্য লোভাতুর ঘ্রাণে। লোভটা তার নিজের নয়। অন্য একজনেব লোভের নিবৃত্তিতে আত্মনিবেদনের সাধ। কিংবা নিজেরই একটা লোভ বেড়ে উঠতে থাকে হেঁসেলের অবাধ স্বাধীনতায়। সব উপকরণ হাতের কাছে পেলে, যদি কারুর খবরদাবি না থাকে, নিজের খুশিমতো বান্নাবান্নায় কী যে সুখ, স্টিলেব হাতা নাডতে নাডতে

নিজেরই হাতে তৈরি হয়ে ওঠা সুঘ্রাণ বুক ভরে টেনে নিয়ে, একসময়, যখন যথার্থ সময়, পরিমাণমতো জল ঢেলে দিলো কুকারে। আদারসুনএলাচলবঙ্গ-বাটা বা হলুদ লঙ্কার ডান হাতও সে ধুয়ে নেয় সেই জলে। এবার এঁটে দিতে হয় কুকার। জোর আঁচে পুরো প্রেসারে রান্না হোক কিছুক্ষণ।

বিশ্রাম নেই। কাগজের মোড়ক খানিকটা ছেঁড়া হয়ে গেলেও এক পাউন্ড পাঁউরুটির প্রায় আস্তটাই এখনও আছে। আরেকটা গ্যাস জ্বেলে টোস্টারে ফেলে অনেক যত্নে গোটাকয়েক টোস্ট তৈরি করল সে। পরপর সাতটা। বেশ মচমচে কড়া ভাজাই পছন্দ কবেন দাদাবাবু। একটু বেশি সময় নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ উল্টে সাবধানে ভেজে যেতে থাকে। শাদাই থাকবে দু'দিক। যেন খুব বেশি কালো না হয়। গরম-গরম পাঁচটা টোস্টই সে দেবে প্রথম। এর পরও যখন গলা ছেড়ে হাঁক পাড়বে ফের, আবার নিয়ে যেতে হবে দুটো। আর যদি না-ই চান, গোপালের-মাকে আড়াল দিয়ে সে চলে যাবে এদিক-ওদিক কোথাও। সত্যি-সত্যি তার নিজেরও তো খিদে থাকতে পারে।

রুটি সেঁকতে সেঁকতেই ভেন্টওয়েট ঠেলে ফুঁসে উঠেছে কুকার। নিরুত্তাপ রাধা। দ্বিতীয় বাঁশিতেও সে রুটি সেঁকতে থাকে। তৃতীয়বারের পর আর রাখা যাচ্ছে না যখন, নামিযে এনে ঢাকনা খুলতেই নীলচে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় গরম একটা ভাপ চকিতে হানা দিলো এমন, অসম্ভব মিষ্টি একটা গন্ধ। ঘিয়ে ভাজা মশলাপাতির সঙ্গে মিলেমিশে মনোহরা মাংসের-ঘুগনি, যা তার নিজেরই তৈরি। লুব্ধতায় আকুল হলেও যা তার নিজের জন্য নয়। অন্যকে উৎসর্গ করেই সেখানে মনের তৃপ্তি। রাধা নেড়েচেড়ে আরো একটু পরখ করল ভেতরটা। ছোট একটা বাটিতে অল্প একটু তুলে নিযে গালের চোঙায় ঘনঘন ফুঁ দিয়ে দিয়ে যখন আর পুরোপুরি ঠাণ্ডা করে নেবারও ফুরসত নেই, জিভ-পোড়ানো গরমই একটু মুখে তুলে যখন আরেক যন্ত্রণা—অসহ্য দাহে দাঁতে জিভে গালে-গালে সামলে নেওয়াও মুশকিল, হাঁ করে শোসানি তুলে রয়েসয়ে চেখে দেখতেই হয়, মটরদানাগুলো গলে-গলে বেশি সেদ্ধ হয়ে গেল হলো কিনা, নুনের কম-বেশি, ঝাল বা মশলাপাতির পরিমাণ, স্বাদসোয়াদ। কিন্তু লোভ নয়। অন্যের আহারে নজর দিতে নেই। ঝোলটা টানবে আরো একটু এবং টানবে বলেই নতুন করে গ্যাস জ্বালতে হলো। ঢাকনা না এঁটে খোলা-কুকারই তুলে দিতে হয় উনুনে। কড়া আঁচে টানুক জলটা। আরো মাখোমাখো হোক। বরং ইতিমধ্যে অন্য কাজ। পরিপাটি করে ট্রে সাজানোর পালা। বেশ বড়সড একটা চিনেমাটির বাটি, বড় চামচ, কাচের গ্লাস, টোস্টের জন্য শাদা প্লেট। জলের বেসিনে ফেলে সবগুলো ধুয়েমুছে ঝকঝকে করে নিতে যেটুকু সময়। চা করতে হবে এর পর। নয়তো কফি। খাবারটা ওপরে রেখে এসে, নিচে নেমে দ্বিতীয় দফায় রাধাকেই করতে হবে সেটা। মা ঘরে নেই বলে যত্নআত্তির কোনো গাফিলতি চলবে না তাঁর ছেলের।

শুরু থেকে সব মিলিয়ে একুনে পনের থেকে কুড়ি মিনিট। রাধার অর্ঘ রচনা শেষ। নিবেদনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর সুন্দর করে ট্রে সাজিয়ে, সবটাই ঢাকনায় ঢেকে নিয়ে, কিছুটা প্রস্তুতির তাগিদেই আঁচল টেনে ঘষে ঘষে গাল গলা কপালের ঘাম মুছে নিয়ে এবং আঁচলটাকে পিঠ ঘুরিয়ে ডান বগলের তলা দিয়ে টেনে

এনে গুঁজে দিতে হয় বাঁদিকের কোমরে। দু-হাতে ট্রেটা তুলে নেবার পর ঘৃতগন্ধময় অন্নব্যঞ্জনের উপচার উঠে এসেছে বুকের কাছে। ঘাড়শুদ্ধু পিঠের শিরদাঁড়া টানটান সোজা শক্ত হয়ে ওঠে নিজেব নিয়মেই। পায়ে পায়ে সন্তর্পণে এগনোর পথে দাঁতে-ঠোঁট-চাপা চোখের মণিটা নিচের দিকে স্থিব পলক। কেন না, তার পায়ে কোনো চটি নেই। সাহেববাড়ির মেঝে বড় তেলতেলে মসৃণ। কেন না, একজনের ক্ষুধার খাদ্য —তার শ্রম। কেননা, শুধুমাত্র ধাতুনির্মিত ট্রে বা ইস্পাতের চামচ ছাড়া আব সবই বড় ভঙ্গুর।

ঘবে ঘরে সন্ধে দিতে বলে গিয়েছিলেন মা। দাদাবাবু এসে খাবাব চাইতেই গোলমাল হয়ে গেল সব। সন্ধে গড়িয়ে যাচ্ছে। ধুনো দেওয়া হয়নি এখনও। বড় বেশি মশা বেড়ে গেছে শীত পড়ার অনেক আগে থেকেই। জানালায় জানালায় মশা-তাড়ানোব পাল্লা টেনে ঘরগুলোকে হাজত বানাবার সময় হয়নি এখনও। ইলেকট্রিকের যন্ত্রগুলো চালু রাখতে হয় ঘবে-ঘবে, প্রতিটি সুইচবোর্ডে। মশা কেন? লোক-নেই জন-নেই এত বিশাল আর এত ফাঁকা বাড়িতে ডাকাতরাও ঢুকতে সাহস পাবে না কেউ। নিঝুম ঘরবাড়ি কাঁপছে থরথর। বাঘা, হাড়েমাসে ডাকাবুকো বুনো ডোবারম্যান ছাড়া পেয়ে উঠে এসেছে দোতলায়। মাংসের গন্ধেই হোক অথবা রাধারই টান—দস্যিটা আছে পায়ে পায়ে। সেই তখন তিনতলায় উঠে গিয়েই স্টিবিও টেপরেকর্ডারে চড়া ভল্যুমে গান বাজিয়ে দিয়েছে লোকটা। মুকেশের গান—'ডম ডম ডিগা, মৌসম ভিগা ভিগা...' এ-গান রাধা জানে। শুনেছে অনেক... অনেকবার, হাজার বার। পুরো গানটাই মুখস্থ তার। মুখ ফুটে গাইতে জানে না। বক্তে রক্তে শিরায় শিরায় সুরে কথায় চনমনায়। মনে মনে বোবার সুরে গাইতে থাকে। যেন গানই গাইছে সে। গানে-গানে ভাসছে। উদ্দাম সঙ্গীতপ্রবাহ তাকে টানছে উর্ধ্বে তিনতলার দিকে। গোটা দেহমন নিবেদনে আকুল হতে চায়।

সিঁড়ির আলোগুলো জ্বলছিল। নিজেই সে জ্বেলে রেখেছিল সন্ধেবাতির আগে। সবগুলো সিঁডি-বারান্দার আলো জ্বলবে সারা রাত। সাহেববাড়ির নিয়ম। আলোব ঘবে চোরডাকাতরা ভয় পায়।

দুহাতে দু'দিক থেকে ট্রে-টা বুকের কাছে ধরে ছিল সে। এভাবে এগনোর বিপদ —নিচু চোখেই কিছুই দেখছে না। বুক থেকে তলাব দিকে ঢাকা পড়ে আছে নিজেরই শরীর। দোতলা থেকে তিনতলায় ওঠার প্রতিটি সিঁড়িতে অন্ধের নিয়মে সাবধানে পা রেখে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙায় উল্টোপাল্টা পা পড়লে মোজায়েক মসৃণে পিছলে যাবার ভয়। অথচ বাঘা? দস্যিটা লাফিয়ে লাফিয়ে চাব পায়ে তড়তড়িয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে, সিঁড়ি ভেঙে আবাব নেমে আসছে নিচে। আরেক ঝকমারি—এমন ওঠা নামায় বেমক্কা ধাক্কা লেগে যেতে পাবে। হাত ফসকে পড়ে যেতে পারে সব। রাধা ধমকে উঠল। ফাঁকা বাড়িব নির্জন শূন্যতায় রাধাব গলাব স্বর দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎকার হয়ে উঠল। আসলে তো সত্যি জানোযাব। পোষ মানে। ঘাড় নিচু করে সিঁড়িতে গন্ধ শুঁকছে। রাধার গা লেপটে গলা উঁচিযে আদর চাইছে।

পোষ-মানা ভয়ঙ্কর ডোবারম্যানকে নিযে সে নিঃশব্দে এবং নির্বিঘ্নে ঝমঝমাঝম

গানের গুহায় উঠে এল। যার পায়ে ঘুঙুর বাজে না, যদি মেয়েমানুষ হয়, বিশাল প্রাসাদে একা হয়ে গেলে হয়তো বা কখনও কখনও টিপটিপানি বাজে বুকে। তার কোনো আওয়াজ থাকে না।

সন্ধেবেলার ঘন ছায়ায় আকাশ ভেঙে রাত্তির নামছে ডান দিকে ছাদের বাগানে। বাঁদিকে দাদাবাবুর ঘরে আলো ছিল না। গান ছিল। চারপাশের দেয়াল, মাথার ওপব সিলিং কাঁপিয়ে, শুধু ঘরটুকু কেন, বুঝি গোটা বিশ্বদুনিয়ায় তোলপাড় তুলে এত জোরে, বীভৎস চিৎকারে গানের হুল্লোড়, বাইরে থেকেই যা শোনা যাচ্ছিল, ঘরের দরজায় এসে প্রথম ধাক্কায় কানের পর্দায় প্রলয় বিস্ফোরণ। ঘর ভবে গগন ভরে সন্ধেবেলার অন্ধকার উথালপাথাল করে মুকেশ। মুকেশ পাগল কবে তাকে। কী যে হয় এমন সব ভালো ভালো গান শুনলে! সুরে-সুরে অদ্ভুতভাবে ঝমঝমাঝম দুলতে থাকে, ঝিমিয়ে আসে শরীর।

ট্রে হাতে নিয়ে শরীর বাঁকিয়ে মাথা গুঁজে পর্দা সবিয়ে ঘরেব ভেতব প্রথম পা ফেলেই সমস্যা তার, দেখতে পাচ্ছে না কাউকেই। বাইরে থেকে সিঁড়িবারান্দার আলোর বেশ ভেতরে থাকার কথা ছিল, এপাশ-ওপাশ টেনে রাখা পর্দায় সবটাই আড়াল। আলো জ্বালবে—দুটো হাতই বন্ধ। চেনাজানা সুইচ। জ্বালতে পারছে না। জ্বালতে হলে হাতের জিনিসগুলো অন্ধকারেই সন্তর্পণে রাখতে হয় কোথাও।

'কে রাধু নাকি? রাখ্ রাখ্ টেবিলে...'

'আলোটা জ্বলছে নি কেনে গ? জ্বেলে দাও। দুটো হাতই বাঁধা আমার...'

'না, আলোকালো থাক। রাখ্ না তুই। রাখ্ ওখানেই।'

শেষ বাক্যটা উচ্চারিত ছিল। শোনাও উচিত ছিল রাধার। কিংবা প্রভুভঙ্গিতে বলার স্বরে এমন আয়েসী মৃদুতা ছিল, সে কিছুই শুনল না। ঘর ভরে এখন জমজমাটি উদ্দাম স্টিরিও। ঘর থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে ঘরে এখন আর কোনো ধ্বনিই ধ্বনি নয়। টেবিলের ওপর অগোছাল বইখাতাপত্তরের ভিড়ে আবছা আলোয় টেবিলের কোণের দিকে যেটুকু ফাঁকা জায়গা, সেখানে হাতের ট্রে নামিয়ে একটা দিক টেবিলে ঠেকনা দিয়ে, অন্য প্রান্ত ডান হাতে ধরে থেকে বাঁ-হাতে এটা-ওটা সরিয়ে আরো একটু ফাঁকা খুঁজে নিতে চাইল ব্রেইল পদ্ধতিতে। ঘুগনির বাটি, টোস্টের প্লেট, জলের গ্লাস, গোলমরিচের গুঁড়ো আব নিমকদানি সাজিয়ে রাখার টুং টাং শব্দও আর শ্রুতি গোচর নয়। শুধু গান, গান ছিল অন্ধকারে।

অন্ধকার মোচড খেলো। পায়ে পায়ে অন্ধকারে ঘরে ঢুকে পড়েছিল বাঘা। ঢুকেই দুটো পাক খেয়ে ছুটে গেল দরজার বাইরে সিঁড়িবারান্দার আলোয়। রাধা তাকাল একবার। ভয় পেল। ফের ঘরে ঢুকে কোথায় কি ভাঙচুর করে বসবে লেজকাটা দস্যিটা। ওধারের খাটে শুয়ে ছিলেন দাদাবাবু। উঠে দাঁড়িয়েছেন। পেছনের খোলা জানালায় একফালি চৌকো আকাশ। বিবর্ণ আকাশকে পেছনে রেখে জোয়ানমরদ মানুষটা উঠে দাঁড়াতেই কালো কালো ছায়ায় অস্পষ্ট আদল। এগিয়ে আসছেন। বোঝা যায়, বাইরে থেকে এসে

জামাগেঞ্জি পেন্টলুন ছেড়ে একটা জাঙিয়া পরে শুয়েছিলেন। শুয়ে শুয়ে উদোল গায়ে ঘাম শুকোচ্ছিলেন পাখার তলায়। গান শুনছিলেন।

ঘরের মেয়েদের সামনে এরকমই খোলামেলা থাকে ব্যাটাছেলেরা। দোষের কিছু নেই। দ্রুত কাজ সেরে পালাতে চাইল রাধা। নিচে অনেক কাজ বাকি।

'আলোটা জ্বালছ নি কেনে গ? পোকাটোকা পড়বে...'

'সে-আমি জ্বালব। তোর কী?'

'খেয়ে নাও গরম-গরম। পাখার তলায় জুড়িয়ে যাবে।'

ফিরেই যাচ্ছিল রাধা। পিঠে হাত পড়ল কার—'শোন...'

রাধা থমকে দাঁড়াল। শোনার কিছু ছিল না তার। দেখারও কিছু নেই। এভাবে ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে ঘটে যেতে পারে আচমকা, কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাধা তার সমস্ত শরীর নিয়ে জড়িয়ে গেল কোথায় কোন বাঘের কামড়ে... অতর্কিতেই এমন একটা বেমক্কা টান, হাত-পা ছুঁড়ে প্রথাসিদ্ধ প্রতিরোধের নিষ্ফল প্রয়াসে ভীরু আর অসহায় গলার স্বর—'এটা....এ কী করছ গ দাদাবাবু? এ-কি হচ্ছে...'

টিকটিকির মুখে প্রজাপতি বা মথের ডানা-ঝাপটানি যেমন, রাধা আস্তে আস্তে নিভে এল এবং যখন চিৎকার করেও লাভ নেই, কেননা মানুষটা তার চেনা, ঘনিষ্ঠ আপনজন—অবোধ শৈশবের ছেলেবেলা থেকে একই সঙ্গে বড় হতে হতে যাকে সে চিনেছে জেনেছে দেখেছে ঘরের মানুষের মতো, সেই মানুষ তার সর্বাঙ্গে লেপটে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়, ভয়ের ছমছমে বুকের কাঁপুনি থামে না। তার সুঠাম দেহভার যে এতই হালকা পলকা, অথবা মানুষটার ফোঁসফোঁস ঘন নিঃশ্বাসের ধ্বনিতে উষ্ণতায় বোঝা যায়, সে যথেষ্টই দুর্বহ ভারি বস্তু কিছু, এবং রাধা, সমর্পণ নয়, তেমন করে প্রতিরোধও নয় আর—দুটো সবল বাহুর পেষণে পিষ্ট হতে হতে যেটুকু বিস্ময়ের স্তব্ধতা, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাঁসফাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বুঝে উঠতেও পারে না ঠিকঠাক —রাগ না দুঃখ না ভয় না লজ্জা না অসম্মান অথবা সুখ? সুখের বিষ অথবা বিষাক্ত সুখ—কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বা শরীরটা একটা খেলনা হয়ে ওঠার পর খেলায় খেলায়, গায়ে আগুন লাগলে যেমন হয়—পুড়ে মরার যন্ত্রণা নেই, অথচ রক্তে রক্তে গাগতরের তোলপাড়ে একটা দহন। দহনে দহনে জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তেই চোখ বুজে আসে। মুখের বাক্যি নড়ে না কম্পিত ওষ্ঠাধরে। অন্ধকারে বড় রকমের একটা ধাক্কা লাগল টেবিলের সঙ্গে। তারপরই একটা চেয়ারকে লাথি মেরে ফেলে দেবার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। আওয়াজটা ডুবে যায় মুকেশের গানে—'তেরি কসম তু মেরি জান হ্যায়, আঁখিয়া ঝুঁকি ঝুঁকি, বাত হ্যায় রুখি রুখি...' বাইরের কোনো চিৎকার ভেতরে আসবে না বা ঘরের ভেতরকার উদভ্রান্ত দাপাদাপির আওয়াজ বাইরে বেরুবে না, নিশ্চিত জেনেই, দুটো সবল বাহুর জোর তাকে আছড়ে নিয়ে ফেলল কোথাও—রাধা বোঝে, সেটা শয্যা। খাটপালঙ্কে নরম গদির তোশকে বালিশে গা ঢেলে দেবার যে-ভাগ্যি তার স্বপ্নে ছবি হয়ে ভেসেছে এতকাল, সেখানেই কালো অন্ধকারে পেল্লাই এক পাথরের চাপে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, পিষে যাচ্ছে সে —ঘেন্না করার সাহস নেই, প্রতিবাদের জন্য ঘেন্না নেই, বুঝি অনেক...অনেক বছরের নুন খাওয়ার কৃতজ্ঞতায় ঋণ পরিশোধের

ভয়ঙ্কর খেলায় যখন শুধু ভয়টুকুই একমাত্র সম্বল, যখন গলা শুকিয়ে জিভটাকরা কাঠ কাঠ আমসি মেরে উঠছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে একবার চেষ্টা করল কণ্ঠনালিব ভেতর থেকে অস্ফুট উচ্চারণের—'দ্দাদাদাবাবু ...' শুধু এই সংক্ষিপ্ত আবেদনটুকু ছাড়া অন্য কোনো শব্দ খুঁজেপেতে হাতড়ে না পেয়ে যখন সে দামাল আশ্লেষে বন্দি, বুকের ওপর আরো বেশি চাপ বাড়ে। ঝড় ওঠে নিজের দহনে। অঙ্গে অঙ্গে কোষে কোষে আগুন। এবং ডানা-ঝপটানো পাখির আদলে দুটি ঘর্মাক্ত দেহের ক্লান্ত নিঃশ্বাসের গর্জন ক্রমেই মারাত্মক হয়ে উঠতে থাকে। রাধা জানে, এ-অবস্থায় কিলচড়লাথিঘুসিতে লোকটাকে অস্থির করে তোলাই একমাত্র কাজ হতে পারে তার। কামড়েও দিতে পারে এখানে-ওখানে কোথাও—কাঁধে গলায় বুকে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু যখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পাপপুণ্যি সবই অর্থ হারিয়েছে, এবং যখন তার গালেগলায়নাকেঠোঁটেথুতনিতেচোখেকপালে আর কারুব গাল গলা নাক ঠোঁট চোখ কপাল মাখামাখি হয়ে চেটেপুটে নিতে চাইছে তাকে, প্রশ্রয় বাড়ে—দুটি বাহুলতা, প্রতিরোধই হয়তো, দু'দিক থেকে আঁকড়ে ধরল গায়ের ওপর হামলে পড়া উদোল পিঠেব বৃহৎ কাণ্ড। গলা থেকে উগবনো প্রতিবাদ সংশয়ে-সমর্পণে কাতরতায় নীবব হয়ে আসতে থাকে—'পাপ, পাপ গ দাদাবাবু, তোমার সনে কত খেলেছি গ ছোট্টবেলা থেকে...' দলিত মথিত দেহের নিষ্পেষণে বুকের হাপর-টানা ঘন নিঃশ্বাসেব বাক্য কোথায় ভেসে যায়। ওপাশে স্টিবিও ক্যাসেটে এক গান থেকে অন্য গানে চলে যাচ্ছে মুকেশ—'জানে কাঁহা গ্যযো ওহ্ দিন...'

বুঝি সর্বনাশের টানে আরো হিংস্র হয়ে উঠতে চাইল লোকটা—একটা বাঘ অথবা সত্যি সত্যি বাঘা। রাধা তার সব খোয়াবার আগে প্রাণপণ শক্তিতে মোচড় খেল একবার। মুহূর্তের শিথিলতায় চিৎপাত থেকে নড়ে ওঠার প্রথম সুযোগেই দুটো ভাঁজ তুলে শিরদাঁড়া আর দুটো হাতে ভর রেখে লাফিয়ে উঠতেই চেয়েছিল সে, বাঁশ-চেরা কৌশলেই যখন দুটো হাঁটুর মালাইচাকি ধরে প্রবল টান, প্রতিরোধে-অস্বীকারে পা দুটো দামাল হয়ে উঠতেই, কী হলো হঠাৎ, কুমড়ো পাতাব মতো চ্যাবরানো ছড়ানো একজোড়া খড়ম পায়েব পাতা কোথায় গিয়ে লাগল মানুষটার বুকে বা গলার কাছে, হয়তো বা থুতনিতে, লোকটা ছিটকে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে অন্ধকারে। ঘোর কাটে না বাধার। লাথি লাগল গায়ে? ছি ছি ছি...অনুতাপে দগ্ধতায় কান্না পাচ্ছে ভীষণ। তাই বলে দাদাবাবুর বুকে লাথি মারবে সে? অসম্বৃত বেশভূষায় ঠিক যেভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে তাকে, কিছুমাত্র অবাধ্য না হয়ে, একইভাবে পড়ে থেকে দু'হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে, বিছানায় কপাল ঠেকিয়ে আকুল হলো। মুকেশেব গান ছাপিয়ে কান্নাটা স্পষ্ট হচ্ছে। বোবা অন্ধকারে কান্নাটা নানারকম অর্থ পেয়ে যেতে থাকে। এত লণ্ডভণ্ডের পর খাট ছুঁয়েই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তাকে আর ছুঁয়ে দেখছে না! সাধ মিটল? বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। শেষ গানের পর ক্যাসেট ফুরিয়ে এলে অন্ধকার নিঝুমে যখন কান্নটাই বোবা ঘরের একমাত্র ধ্বনি হয়ে ওঠে, নিজের কানেই গমকে গমকে হিক্কা তোলার অদ্ভুত ধরনের আওয়াজটা অসহায় গোঙানির মতো শোনায়। ঘরে তৃতীয় প্রাণী ছিল একজন—বাঘা। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছে বাইরে সিঁড়িবারান্দার আলোয়। ফিরে ফিরে আসছে অন্ধকারে। চেঁচাচ্ছে না ভাগ্যিস! আঁধার ঘরে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কত ভাঙচুর করবে একটা

জানোয়ার? সন্ধেবেলার আবছা আলো ঘরেবাইরে সব উবে গিয়ে ঘর ভরে ঘুটঘুটি কালো। থকথক কালোয় কালোয় চেনা যায়, ঘরের একমাত্র মানুষটা তার ছায়ার শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। জাঙিয়াটুকু ছাড়া সর্বাঙ্গ উদোম। সাড়া নেই শব্দ নেই। বাত্তিরও ঘুমোয় যেখানে, নিশুতির ঘরে রাধা বুঝতে পারে না, এখন আলো জ্বালবে কে? আলোয় মুখ দেখবে কে কার? এক সন্ধ্যায় ফারাক ঘটে গেছে বিস্তর। মাথা তুলে তাকাতে পারে না। কিংবা হিসেব বোঝে না, তার উঠে পড়ার অনুমতি মিলছে কিনা, না-কি এখনও আরো কিছুক্ষণ এভাবেই তাকে শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়? আস্তে আস্তে বিহ্বলতায়, গা-গতরে গাঁটে গাঁটে ব্যথা-যন্ত্রণায় শিরশিবানির কাঁপুনি নিয়ে আস্তে আস্তে সে উঠে বসল খাটের ওপর। খাটের বাইবে পা ঝুলিয়ে। এখন কি করবে সে? তছনছ শাড়িব্লাউজের কী হাল। তাড়াহুড়োয় হদিশ না পেয়ে, শাযার ডুবিতে এক কোণে খানিকটা আটকে থাকাব সূত্র ধরে হারিয়ে যাওয়া বাদবাকি আস্ত শাড়িটাকেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজল এপাশ-ওপাশ। উঠে দাঁড়াল খাট ছেড়ে। নাড়া খেল। এক দুপুব লাঙল-ঘোরানির পর মোষবলদের ফোঁসফোঁসানিতে যেমন কবে আওয়াজ ওঠে, সে-রকমই একটা ভঁসভঁসানি ছিল ঘবে। আওয়াজটা থিতু হযে এলে, স্পষ্ট বোঝা যায়, ছায়া-ছায়া মানুষটা মোচড় খেয়ে ঘবেব লাগোয়া বাথরুমের দিকে চলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না রেখে নিরুত্তাপে। এবং লোকটার চলে-যাওযার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে, যখন বাথরুমের সুইচ টেপাব ছোট একটু শব্দ এবং ওপাশে আলোটা ঝলসে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ কবে দেবার বিকট আওয়াজে আস্ত ঘরটাই কেঁপে উঠল, রাধা তার নিজের মধ্যে বুকের কাঁপুনিতে ভীষণভাবেই নাড়া খেল। এক্ষুনি আবার বেরিয়ে আসতে পাবে লোকটা? অথবা এখনই হযতো তার পালিযে যাবার সুযোগ। কিংবা ভিন্নতবভাবে আরো এক নতুন আশঙ্কা গলাটা চেপে ধরে থাকে--না বলেকয়ে এভাবে পালিয়ে গেলেও শেষে যদি কিছু হয়? আজ যা ঘটে গেল, বিপদ তার চারদিকে। নিজেকে সে টানে সামনের দিকে। টেনে টেনে নিযে যেতে হয় দরজার কাছে। কী সব্বোনাশ! দরজাটা হাট খোলা ছিল এতক্ষণ? সিঁড়িবাবান্দাব আলো আর ঘরের অন্ধকারে ভাগাভাগি মাঝখানের দরজায় পেলমেটে ভাবি পর্দা। পর্দার চাবপাশ ঘিরে আলোর বর্ডারগুলো হাড়েপাঁজরায় ছমছমানির ভয় কাঁপায। আলোয আলোয় থাকলে কত স্বস্তি মানুষের। অন্ধকারে পাপ! কী পাপ গো। অন্ধকারেই অধম্মো পাপ-অনাচার ঘাপটি মেবে থাকে। ঘরেব দবজা উদোম খুলে বেখে এমনটা কবতে পারে কেউ? গোপালের-মা আছে নিচে। সব কেচ্ছাকেলেঙ্কারির গন্ধ শুঁকে বেড়ায কুচুটে বুড়ি। এতক্ষণ ধরে কোথায় গেল মেয়েটা—খোঁজাখুঁজিতে বেতো হাঁটু আর ভাঙা মাজায সিঁড়ি ঠুকে ঠুকে যদি এসে থাকে ওপরে? সব দেখেছে বুড়ি? সব শুনেছে? সর্বাঙ্গেব কাঁপুনিতে হাত-পা শুদ্ধু গোটা শরীর শামুকের মতো সিঁধিয়ে আসে বুকের খাঁচায়। কেউ উঁকিঝুঁকি দিলেও তো টের পাবার যো ছিল না কিছু। ঘাম জমে। মাথাটা ঝিমঝিম কবছে। অন্ধকারে পলক নড়ে না। এলোমেলো শাড়িটা কোনো রকমে বুকেপিঠেপাছায দলা পাকিয়ে নিয়ে ভাঙনে ভাঙনে টলতে টলতে এগোয়। এত বছব বাদে গোটা সাহেববাড়িটাই বদলে বদলে যাচ্ছে। আনাচেকানাচে খুপচিতেও বুঝি তাকিয়ে আছে কেউ।

সবটাই ভয়ের বাসা। কাল যদি দূর-দূর্ করে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেন মা? ফোকট্‌সে ফুর্তি লোটার মজায় তাকে ধরে রাখতে পারবে মায়ের সুপুত্তুর ওই লোকটা? কান্না বাড়ে বুকে। নষ্ট হবার সাধ তো একটু ছিলই আড়ালে গোপনে। এখন পাপের শরীর নিয়ে ভার বইতেও পায়ে পা জড়িয়ে যায়। ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। টলতে টলতে ধরে ফেলল চেয়ারের পিঠ। টেবিলের ওপর হামলে পড়ে নিজেকে সামলায়। মনে পড়ল মাংসের-ঘুগনি টোস্ট! জুড়িয়ে টাল হয়ে গেছে। উলটে যেতে পারত জলের গ্লাস। স্টিরিও টেপরেকর্ডারের মুকেশ আর নেই। কিন্তু অনেক কালের আধিব্যাধিতে কাবু হয়ে পড়লে যেমন হয়, ভগ্নদেহে নিজেকে গোছগাছে ঠিকঠাক করে তুলতেও একটু আলোর প্রয়োজন। আলো জ্বালার অনুমতি নেই। ওদিকে দবজার বাইরে আলোয ভয়? কী আশ্চয্যি! লোকটাও বেরুচ্ছে না বাথরুম থেকে? চোখের ঝাপসায় ঘরের অন্ধকার আরো গাঢ়তর নিরাকার। দূরের দরজায় আলোর ঝলকানিটাই চোখের পাতায় স্থির হয়ে থাকে। চেনা-ঘরের অন্ধকারে কোথায় কীভাবে পা ফেলতে হয়, পতঙ্গের মতো জেনেবুঝেই রাধা এগোয় পায়ে পায়ে সন্তর্পণে। এগোতে এগোতেই গোছায় নিজেকে। আঁচল টেনে গাল-গলা-নাক-মুখ-কপাল ঘষে ঘষে প্রতিটি পা ফেলায় হুমড়ি খাবার ঝুঁকি সামলে নিজের কাছেই একটা হিসেবের বুঝ নিতে চায়। সব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। আচমকা সন্ধের গোলমালেই কী অদ্ভুতভাবে বদলে গেল সে আজ? বুঝি অন্য এক রাধা। পুরনো রাধাকে সাহেববাড়িতে টিকিয়ে রাখতে চাইলে অন্য রাধাকে লুকিয়ে রাখতে হবে আড়ালে। দিদিমণিদের নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসতে পারেন মা। সাহেবও থাকবেন সঙ্গে। নিউমার্কেটে মার্কেটিং সেরে ফেরার পথে সাহেবকে তুলে নিয়ে আসবেন একই গাড়িতে।

আলো-আঁধারির মাঝখানে অন্ধকার গুহার দরজায় পর্দা ঠেলে পা বাড়াতেই প্রকাণ্ড আলোর তুফান গায়ে এসে পড়ল। সামনের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই হাড়েমজ্জায় কাঁপুনি দিয়ে নতুন তরাস। ধক করে উঠল বুকটা। গোল-গোল ভয়ঙ্কর জ্যান্ত দুটো চোখ। চার পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাঘা। লেজ নেই। নাড়তে পারছে না। হাঁ-করা লম্বা জিভের লালা ঝরানোয় ঘঁ-ঘঁ নিঃশ্বাস ছিল। দত্যিদানোর যে-চোখজোড়াকে সে বিন্দুমাত্র আমল দেয় নি কোনোদিন, সেটাই আজ ভয়াল ভয়ঙ্কর। সব জানে, সব দেখেছে বাঘা? বাড়ির একমাত্র জ্যান্ত প্রাণী—তার পাপের সাক্ষী। দরজায় দাঁড়িয়ে পাপের ঘরের পাহারায় প্রতীক্ষায় ছিল, রাধা বেরিয়ে আসবে বলে। এবং বেরিয়ে আসার পর সামনের দুটো পা তুলে দসিটো লাফিয়ে উঠতেই, আদর অথবা ঘেন্না—রাধার জানা নেই, কিংবা কোনোবকম একটা জানোয়ারকেই যুৎসই একটা লাথি মারার সাধ ভেতরে ভেতরে দানা বেঁধে উঠেছিল বলেই হয়তো, এক ঝটকায় ধাক্কা মেরে বিশাল জন্তুটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে যখন পালাবার পথও বন্ধ, ডান দিকে গড়িয়ে নামার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ভয় হলো তার।

এক ঝটকায় ঘুরে গেল বাঁদিকে। অন্ধকারে ছাদের বাগানে। বর্ষাব পর থেকে সব সময়ই কিছু কিছু ফুল থাকে কুঁড়ি থাকে নানাধরনের গাছে। চোখে পড়ছে না কোনো টব। বাতাসে গন্ধ ভাসছে। নিঃশ্বাসে বাতাস নেই। আকাশে নক্ষত্র নেই। আকাশ-

ঃবা অন্ধকারের তলায় ছায়া-ছায়া কলকাতা চারদিক ঘিরে। কাছে দূরে দোতলা তিনতলা ।বতলা কালো কালো প্রাসাদ অট্টালিকার জানালায় দরজায় ক্ষুদে ক্ষুদে আলোর ঝিলমিল। স্ত কলকাতা শহরটা, অন্ধকার বলেই হয়তো, ছোট হতে হতে একেবারে গায়ের সঙ্গে লপটে গেছে তার। কিংবা সে নিজেই ডুবে যায় হাহাকারের বিশাল শহরে। খুব বড়সড় কটা অন্ধকারই তার প্রার্থনা এখন। চোখ বুজে থেকে নিজের জন্য আরো বড় নিষ্প্রদীপ নিয়ে তুলতে চায়। টানটান পিঠে পেছনের দিকে বেঁকে ছোটজামার হুকটা বেঁধে তে হয়। বুক হাতড়ে সেফটিপিন খুঁজল। আছে বা নেই, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বগুলো। তাড়াহুড়ো হুড়োহুড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে কোনটা কোথায়! গায়ে-চামড়ায় বিঁধে গলেও মুখ ফুটে বলার থাকত না কিছু—যদি সবটাই লুট, লুটেরার খামচানি। ব্লাউজটা ছুঁড়ে গেছে। এভাবে সে নামবে কি করে নিচে? শাড়িটা বুকেপিঠে গোছগাছে ঠিক বে নিতে আঁটোসাটো আঁচল জড়াতে হয় শীতের চাদরের মতো।

অথচ এভাবে গুটিসুটি মেরে খাটো হয়ে থাকলেই ধরা পড়ে যাবার ভয়। কত াগে জলখাবার নিয়ে সে উঠে এসেছে ওপরে। বুড়িটা খুঁজছে নির্ঘাৎ। গন্ধ শুঁকছে। -বুড়ি নচ্ছার। দিদিমণিদেব নিয়ে মা-ও ফিরে এসেছেন কিনা, জানা নেই। যদি এগোতে য়, কাজে ফিরতেই হয়, সে যাবে কোন চুলোয়? দেশগাঁয়ের বাড়িতে কালে কাটলে যমন হয়—মাথাটা ঘোরে, পেটের ভেতর মোচড়ানি দিয়ে অঙ্গে অঙ্গে শিরশির। ভীষণ ীষণ কান্না পাচ্ছে তার। এমন পাপেব ভাবনা তার ছিল না কোনোকালে। শুনবে কেউ। বিশ্বাস করবে না। সর্ব অঙ্গে বিষের জ্বলুনি। বিষ ঝাড়াব ওঝা নেই। সুখের বে স্বজন নেই। নিজের ছেলেকে দুষবেন না মা। সাহেববাড়ি ভেঙে যাচ্ছে তার!

াতিমত রঙের বিস্ফোরণ। ভাবি ভারি পেস্টবোর্ডের বাকশো গোটা সাতেক, পলিথিন-াস্টিকের সুন্দর সুন্দর ব্যাগে ব্রাউন-কাগজে-মোড়া প্যাকেট অনেকগুলো। দু-চারটে াকেট হাতে হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে এসেছিল মুনমুন আর বুলবুলি। াকি প্যাকেটগুলো মাথায় বয়ে নিয়ে এল নন্দলাল। পুজোর কেনাকাটার দ্বিতীয় কিস্তিতে াজ বেশ অনেকটাই সেরে এসেছেন কিরণময়ী। সারাদিন খেলায় খেলায় মেতে থাকার ব সন্ধেবেলার মার্কেটিংয়ে হৃদয়মনে ভরপুর উৎসাহের জোযার ছিল। মা খুশি থাকলে াধারও সুবিধে। নিজেকে আলগা রাখতে পারে অনেকটাই।

দোতলায় উঠে এসে মায়ের ঘরে মেয়েদের আবার হুল্লোড়। বাইরে থেকে এসে ামাকাপড় পাল্টাবাবও ফুরসত ছিল না। হাতে-পায়ে ঢেউ খেলানো তোলপাড়ে ক্লান্তিহীন ই বোন খাটের ওপর একে একে প্যাকেটগুলো খুলে ফেলতে থাকে। বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় যনাভিরাম হট্টগোল। অপলক মুগ্ধতায় তাকিয়ে থাকারও আরেক ঝঞ্ঝাট—রঙে রঙে াড়িত হতে পারে মানুষের দৃষ্টি কিংবা সুধাসাগরে দৃষ্টিনন্দনে টেম্পেরা ক্রেয়ন প্যাস্টেল লবঙ তেলরঙ বার্নিশে অনুপম হবার আকাঙ্ক্ষায় নাইলন টেরিকটন লিনেন পলিয়েস্টার নস ভার্লন-সিল্ক একমি-সিল্ক সুইশ-কটন অ্যাক্রিলিক নানাবিধ ফেব্রিকে বিভিন্ন ফ্যাশন জাইনারদের শিল্পভাবনায় ব্যাগিপ্যান্টস ব্যাগি-শার্ট, পেডাল-পুশার শ্ল্যাক ঘাবারা ঘাগরা-নি শালোয়ার-কামিজ পাঠান-শালোয়র ধোতিফ্রক। সবই হয়তো বাজারের রেডিমেড

নয়। পার্ক স্ট্রিট লিন্ডসে স্ট্রিটের বড় বড় দোকানে মাপজোক দিয়ে আসা হয়েছিল আগেই। আজ ডেলিভারির দিন। আসলে দোকানে দোকানে হাজার হাজার ডিজাইন আর চোখ-ধাঁধানো রঙের ভিড়ে ডুবে গিয়ে বাছাইয়ের পর্বটা এত জটিল হয়ে ওঠে, ঘরে ফিরে খোলসা চোখে আরো একবার পরখ করে নিতে হয়। তখন নিজেদের চোখগুলিই অন্যভাবে বদলে যায়। শিল্পরুচির নিয়মই এই—কিছুতেই মন ভরে না; বারবার ফিরে ফিরে দেখার ইচ্ছে। কখনও ভাল-লাগা, কখনও খুঁতখুঁত। বাজারে কেনার সময় যেটা ফ্যানটাস্টিক মনে হয়েছিল সেটাই কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায় ঘরের আলোয়। অথবা ভাল-লাগা বা না-লাগার তর্কাতর্কি বেঁধে যায় ভাইবোনদের। সে-আরো বড় হৈচৈ। সুরাহা হয় না কিছুই। পৃথিবীতে এর চেয়েও ভাল কিছু, আরো জেল্লাদার মহৎ কিছু আছে জেনে এবং সেটা মেনে নিলে যদি হেরে যেতে হয় কোথাও? চিৎকারে দাপটে শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়ে যায় সব কিছুই। হতেই হবে। অনেক টাকা দামে বাজারের সেরা জিনিস। নিজেরাই সেরা।

বাপের-বাড়ির জন্য যাবতীয় কেনাকাটা আজই সেরে ফেলেছেন কিরণময়ী। বৌদি আর ছোটভাইয়ের বউয়ের জন্য তানচোর বেনারসি আর তাঁতসিল্ক। দাদা এবং ভাইয়ের জন্য তাঁতের ধুতি, পাঞ্জাবির কাপড়, শার্টপ্যান্টের লেন্থ। ভাইপো ভাইঝিদের বাজেটেও কাপর্ণ্য নেই কোথাও। পার্কসাকার্সে ভাসুর-দেওরদের ঘরে দেওয়াথোয়ার ব্যাপারটা এখনও বাকি। আসলে এত বড় বাজারে সুবিশাল গোলকধাঁধায় বিপুল পরিমাণ ক্রয় শারীরিক দিক থেকেও এক দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য কর্মকাণ্ড। দু-চারদিন ঘোরাঘুরি না করলে চলে না। এক্ষেত্রে আজকাল মেয়েরা তাঁকে কিছু সাহায্য করে বটে, কিন্তু ছুটোছুটি হয়রানির ধকল সইতে নিজেই আর পেরে ওঠেন না তেমন।

ঘরে খাটের ওপর বাকশো প্যাকেটগুলো ফেলে, খেলনাপুতুলের চেয়ে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে, বিশ্বসম্ভার সাজিয়ে যখন তোলপাড় করছে দুই মেয়ে, কিরণময়ীর চোখে পড়ল—রাধা নেই। অবিশ্যি ওর থাকা না-থাকায় কারুরই যায় আসে না কিছু। কিন্তু ঘরে থেকে এত এত নতুন জামাকাপড় দেখবে না একটা মেয়ে? সে-কি কথা? একবার এলেন রান্নাঘরে তদারকিতে। উনুনে কী চাপিয়েছিল গোপালের-মা। একটানা ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন—'কী করছ? স্যালন? বেশ।'

এগোলেন ফ্রিজের দিকে—'এই দ্যাখো, খেলা-খেলা করে সারাটা দিন হুজ্জুতি হলো এমন, বেরোবার সময় তোমাদের বলে যেতে একদম ভুলে গেছি। গাড়িতে বসে মনে পড়ল। সে-আর কী হবে? অনেক দূর চলে গেছি তখন। রাত্তিরে গোস্তডাল হবে ভেবেছিলাম। বাবন বড় ভালবাসে। সেজন্যে কিমাও রেখে দিয়েছিলাম এক প্লেট...'

'সে-তো আপনার ছেলেই খেয়েছে গ মা'।'

'মানে?' ফিরে তাকালেন কিরণময়ী।

'দাদাবাবুর জন্যে আপনাদের মেয়ে কী সব করল সন্ধেবেলা।'

'খেলা দেখে মাঠ থেকে ফিরেছে বাবন? কখন?' উদ্বেগ থেকে মুক্তি। প্রশান্ত কিরণময়ী—হ্যাঁ, সে-তো কিছু একটা করে দিতেই হবে ওকে। সেই কখন বেরিয়েছিল দুপুরবেলা। খিদে তো পাবেই। কিন্তু কী করল? খাইয়েছে তো ঠিকমত?

'সে-আমি জানি নে গ। সন্ধেবেলা ওই মাংস আর পাউরুটি দিয়ে কী বানাল মেয়ে। সব নিয়ে ওপরে চলে গেল ত গেলই। সে-আর ফেরে না। আমি এখেনে বসে বসে ঘর আগলে মরছি একা।'

'কেন, কোথায় ছিল ও?'

'কী জানি। আমি কী বলব? ছাদের ঘরেই...'

ভ্রূ কুঁচকালেন কিরণময়ী—'তুমি তোমার কাজ করো। সব কিছুতে কথা বলার তো কোনো দরকার নেই তোমার। রাধু কোথায়?'

'সে-আমি কি করে বলব? আমি কী ওর মনিব নিকি যে আমায় বলেকয়ে যাবে? কতা কইলেই ত খালি ফোঁস করে ওঠে। ঘরের মেয়ে আপনেদের...'

'দেখো গোপালের-মা, ওসব ছাইপাঁশ খুনসুটি যা তোমাদের করতে হয়, নিজেরা নিজেরা করবে। আমার অশান্তি বাড়াবে না।'

গোপালের-মা সাতে-পাঁচে না থাকার ভঙ্গি নিয়েই মুখ ফুলিয়ে খুন্তি নেড়ে যেতে থাকে।

'সে-তো হলো। কিন্তু মেয়েটা কোথায়?' এবার সত্যি ক্ষুব্ধ কিরণময়ী—'কড়াইটা নামিয়ে দেখো তো একটু গেল কোথায় ও। তোমাদের জন্যে কি একটু ঘরের বাইরেও যেতে পারব না আমি? সন্ধেবেলা ছিলাম না বলে কাজ করবে না? সব ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায়? দেখো তো, নিচে টাইগারের কাছে কি না। ওই হয়েছে এক মেয়ে। সময় নেই অসময় নেই, কুকুরটার সঙ্গে কী অত খেলা?'

কিন্তু রাধা ছিল খুবই কাছাকাছি। পাশেই খাবার-ঘরে বাতি নিভিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মসৃণ মেঝেয় ঠায় বসে ছিল চুপচাপ। মায়ের গলা বা সব কথাবার্তাই সে শুনেছে আড়ালে। আস্তে আস্তে উঠে এসে মুখে আঁচল চেপে সামনে এসে দাঁড়াল। নিঝুম।

'কি রে, কি হয়েছে তোর? জ্বর নাকি?' বিচলিত কিরণময়ী।

রাধা পাথর হয়ে আছে। এ-বাড়িতে যা প্রায় অভাবনীয়, যে-মেয়ের অসুখবিসুখের কথা সাধারণত শোনেনি কেউ কেনোদিন কিংবা সামান্য জ্বরাজ্বারি হলেও সকলের সেবাযত্নে যে একইভাবে কাজ করে যেতে পারে, তাকে এমন বিমর্ষ বা ভাঙাচোরা দেখে উদ্বিগ্ন হতেই পারেন গৃহকর্ত্রী। এত বড় সংসারে যে-দুটো হাত সর্বাধিক জরুরি, যদি সেটাই অকেজো হয়ে পড়ে? ভাবতেই হয়। কাছে ডাকলেন—'তুই আয়, আয় তো এদিকে...'

মায়ের আদেশ। এগোতেই হয় কন্যাকে। এবং কাছাকাছি পৌঁছলে বুকে-কপালে হাতের চার-আঙুল ছুঁয়ে পরখ করলেন কিরণময়ী—'না, জ্বর তো নয়। কী হয়েছে তোর? মাথা ধরেছে? বসে বসে টি ভি দেখেছিলি বুঝি সারাক্ষণ?'

শব্দ নেই, কথা নেই। অবোধ ভীরুতার চাহনিতে অবোলা গাভীর টলমল টলমল একজোড়া চোখ ভরসা খোঁজে প্রতিপালকের কাছে।

'শরীর খারাপ?'

মুখে আঁচল চেপে একই ভঙ্গিতে মৃদু মাথা নাড়ে রাধা।

'তাহলে ওখানে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থেকে কী করছিলি তুই? দেখিস বাপু,

আর দু-একদিনের মধ্যেই তোর মা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। এর মধ্যে আবার কোনো কাণ্ড বাধিয়ে বসিসনি যেন। যা, আরেক লট কত জামাকাপড় কিনে নিয়ে এলাম আমরা। দ্যাখ গে যা...'

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে রাধা। আরো এক নতুন ধাক্কা। মা আসবে ওকে নিয়ে যেতে? কেন? কোথায় যাবে? দেশগাঁয়ে তো একাই যায় সে, যখন দরকার হয় এবার মা আসবে কেন?

রান্নার কাজকর্মে তদাবকিতে কিরণময়ীর হয়তো আরো কাজ ছিল। কিন্তু মায়ের নির্দেশ না মেনে রাধা সাহসও পায় না দাঁড়িয়ে থাকতে। এগোবারও উৎসাহ নেই এই প্রথম মনে হচ্ছে তার, পুজোর কাপড় তাব কাপড় নয়। তার শাড়িব্লাউজ কেনাও হয়নি এখনও। নিউমার্কেট থেকে আসবে না সেসব। হাতিবাগানের কোনো দোকান থেকে কেনা হবে কিছুটা ভাল গোছের একটা ছাপা-শাড়ি। শায়াব্লাউজ কেনা হবে ফুটপাত থেকে। রাধাকে খুশি হতে হবে। হাসতে হবে। হাত বাড়িয়ে নিয়ে মাকে পেন্নাম করতে হবে। দূরবর্তী মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও খুব নিরাপদ নয় বলেই পায়ে পায়ে এগোতে হয় তাকে এবং এগোবার পথে এতকালের চেনা বাড়িটাকেই আজ বড় অন্য কোনো বাড়ি মনে হচ্ছে হঠাৎ। আলাদা বাড়ি।

সাহেববাড়ির রঙের জেল্লায় আলোর ফিনকিতে, কী জানি কেন, নিজেকেও আলাদা মানুষ মনে হচ্ছে তার। নতুন মানুষ।

দিদিমণিদের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। দুটো পা থমকে দাঁড়াল। বুঝি কোনো নিষেধ পুরীতে বুকের ছমছমে আলোগুলো ভয়ঙ্কর। ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দেয়ালগুলো এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছে চারপাশ থেকে। নকশা-কাটা পাথরের মেঝেয় পা ফেললে বরফের ঠান্ডায় হিম হয়ে আসছে গা-গতর। সবাই জেনে গেছে? এত এত বছরের বসবাসে সাহেববাড়ির দোতলায় সে ছুঁচো-ইঁদুর দেখেনি কোনদিন। একটা আরশোলা টিকটিকিও আজ আর নেই কোথাও? মুখ লুকোবার ঠাঁই নেই? নাকেমুখে আঁচল চেপে কান্নাকে লুকোতে চেয়ে পা ফেলতে বাধা। ওঘরে দিদিমণিদের খুশির আওয়াজে ঝুমুরের বোল বাজে। সেখানে সে যাবে কেমন করে? পড়ালেখার দিদিমণিদের কাছে? বাড়বাড়ন্ত ধানগাছে মাজাবি পোকার সর্বনাশ জানে না ওরা। রাধা জানে। পাপে পাপে সর্ব অঙ্গ হলুদ হয়ে যায়।

'কি রে, কী হয়েছে তোর? বল্ দেখি, বল্ আমার কাছে। এমন করছিস কেন?'

পিছু ফিরে, গোটা শরীরে মোচড় ভেঙে রাধা থরথর কেঁপে উঠল।

'আমি কিছু বুঝি না ভেবেছিস? ঠ্যাটা মেরে আছিস তখন থেকে...' রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে যাবার ফাঁকে একই ভাবে দেখে, স্বাভাবিক, ক্ষেপে যেতেই পারেন গৃহকর্ত্রী। কিন্তু কাছে এসে হাত রাখলেন মাথায়। মা আজ বড় স্নেহময়ী– 'বুঝেছি তো। সে-আর আমার বুঝতে বাকি আছে কিছু? আমি ঘরে ছিলাম না। খুব কষে ঝগড়া করেছিস গোপালের-মার সঙ্গে। তুই...এই তোর জন্যেই তো যত অশান্তি আমার। রান্নার লোক আর তিষ্ঠোতে দিবি না কাউকেই। তাই যদি হবে তো নিজেই

আবার মুখ গোমড়া করে গাল ফুলিয়ে আছিস কেন? বলবি তো, কী হয়েছে। চল্ তুই, আয় আমার সঙ্গে...'

এগোয় বাধা। হিসেবের পা ফেলতে হয়। এবং কাছাকাছি পৌঁছে কিরণময়ী ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন দ্রুত। বাধা থমকে গিয়ে দরজায় পর্দা ধরে দাঁড়াল।

খাটের ওপর বাকশো-প্যাকেটের ডাঁই। নিজেদেরই পছন্দকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পরখ করে ঘাঁটাঘাঁটির পর জামাকাপড়গুলো প্যাকেটের বাকশোয় গুছিয়ে তুলছিল ওরা দু-বোন।

'এ-কি? তোরা তুলে ফেলেছিস সব? হ্যাঁ, সেই ভালো...' স্টিলের আলমারির ডালা খুলতে খুলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন কিরণময়ী—'ঠিক আছে রে বাধু, তুই পরে দেখিস। ফুরিয়ে তো যাচ্ছে না কিছু। অবিশ্যি তোদেরগুলো এখনও কেনা হয়নি কিছু। দেখি, যাব কয়েক দিনের মধ্যেই। উঃ, হাতিবাগান-শ্যামবাজারে যা অসভ্য ভিড়। দেখি, আসছে সপ্তায় না হোক, পরের সপ্তায় একদিন সকালের দিকে...'

'হাতিবাগান মা?' আঁতকে উঠল বুলবুলি— 'ওফ, হরিব্ল, সিম্পলি এ হরিবল প্লেস, হোয়ার সেলর্স হ্যাভ নো শপ অ্যান্ড বায়ার্স নেভার বদার অব দ্যাট। অল ইন পেভমেন্ট...'

এবং মুনমুন—'অ্যান্ড দোজ মিডল-এজেড উইমেন উইথ কোলে বাচ্চা...'

'ওহ্ ইয়েস। সো ডার্টি অ্যান্ড নয়েজি ক্রাউড। বাস্টিক। গায়ের ওপর গা লেপটে থাকে এমন, সিম্পলি জগাখিচুড়ি লাইক নুডলস অর চাউমিন...' হাত-পা খেলিয়ে হৈচৈ তুলে বুলবুলি সহসা সুগম্ভীর—'উই আর নট গোয়িং টু হেল্প ইউ মাম্মি। স্যরি...'

এতাদৃশ গৃহপোষ্য পক্ষীকূজন নিতান্তই আবহধ্বনি সংসারের। এপাশে ওয়ারড্রোবটা মেয়েদের জন্য খুলে দিয়েছেন কিরণময়ী। ঝলসে উঠল শাড়ির সম্ভার। কত ধরনের কত রঙের কত জৌলুসের কত হাজার হাজার টাকা দামের? এখন আর তাক লাগে না বাধার। একপাশে স্তব্ধবাক দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে দেখে। জামাকাপড় রাখার এখনও যা জায়গা আছে আলমারিতে, নিচের দিকে থাকবে নতুন প্যাকেটগুলো। মেয়েরা পরে যার-যারটা তুলে নেবে নিজেদের ঘরে। নিজের নিজের ওয়ারড্রোবে। বিলনো হবে যাকে যা দেবার।

ফিরলেন কিরণময়ী। খাটের ওপর মেয়েদের জিম্মায় ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাগটা। তুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে খুঁজে-খুজে ঝকঝকে ইস্পাত চাবি-বোঝাই রিং থেকে নির্দিষ্ট চাবি নিয়ে খুললেন অন্য একটা স্টিলের আলমারি। গোপন দেরাজ আছে সেখানে। বাধা জানে —অনেক, অনেক টাকা। ব্যাগটা রেখে পাল্লা বন্ধ করতে করতে, এয়ার-কন্ডিসনড সুপারমার্কেট ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত মেয়েরা, তাকালেন হাতিবাগানের দিকে--'আমার তো এখন ওই একটাই ভাবনা। অ্যাদ্দিন ধরে আছে মেয়েটা। এখন যদি ওর মা পুজোর আগেই ওকে নিয়ে যেতে চায়? না, না, সে-হবে না। ওদিকে ওরা যা হয় একটা ব্যবস্থা করুক। রাধু এবারের পুজোটা এখানেই কাটিয়ে যাবে...'

ছলছল চোখের চাউনিতে তাকিয়ে কথাগুলোর অর্থ অস্পষ্টভাবে হলেও কিছুটা

বুঝে, অথবা না-বুঝেই রাধা অপলক তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। তার ভাত-কাপড়ের-মা। তাব অনেক কালের অনেক কাছের মা। অনেক দূরের?

ওদের জানা ছিল বলেই হয়তো মুনমুন আর বুলবুলির হঠাৎ মনে পড়ে যায়—আজ, আজই এক বিশেষ দিনে বিচ্ছেদ-বেদনায় বড় কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে রাধা।

'বাধু, তুই চলে যাবি?' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুনমুন আন্তরিকভাবেই বিষাদের্ ঘনিষ্ঠ আবেগে।

সত্যি-সত্যি বুঝি কেঁদেই ফেলল বুলবুলি। এগিয়ে এসেছে কাছে—'মার্কেটে যাবাব সময় মা গাড়িতে বললেন আমাদের, তোর বিয়ে হয়ে গেলে তুই আসবি তো আমাদের বাড়ি? বল্, আসবি মাঝেমাঝে...'

ঘরের দৃশ্যপট যুৎসই করুণ হয়ে উঠল, এর পব। কিংবা ছেলেবেলার খেলাব সঙ্গী একই সঙ্গে বড়-হয়ে-ওঠা মুন্নিদিদি বুল্লিদিদিব দুঃখভাবের সংক্রমণ বাধাব সজল চোখের পাতায় ঢেউ কাঁপায়। এবং হঠাৎ...হঠাৎ-ই তার মুক্তি ঘটে যায়। কেন না, তাব বুকের ভেতর ধিকিধিকি আগুনের পোড়ানি ছিল। সেই আগুনের অচেনা ধোঁয়ায ধোঁযায় চোখে কান্না জমছিল। দাঁতে দাঁত চেপে চোখের বাঁধ আটকে বাখার গোপন যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণে এবার সে বুক উজাড় করে খোলামেলা ডুকরে উঠতে পারে। সবাইকে সাক্ষী রেখে, প্রাকাশ্যে।

কিবণময়ী এগিয়ে এসেছেন ঘনিষ্ঠতায়। স্নেহময়ী মা—'তোকে তো বলা হযনি বে বাধু। সকালেই এসেছে চিঠিটা। আমার নিজেরই এত খারাপ লেগেছে সাবাটা দিন। আজ আবার খেলাফেলাব ঝঞ্ঝাট ছিল...'

অবোলা গৃহপালিতের কাতরতায় মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিযে থাকে রাধা। নিজেকে যাঁর পুষ্যি বলে মনে হয় নি কখনও, যাঁর মেযে হয়ে বেঁচে থাকার সুখে জীবন ভরপুর ছিল এতদিন।

কিরণময়ীর গলার স্বরও ভাবি হয়ে ওঠে—'কালীব একটা চিঠি এসেছে সকালবেলা। কালীর হাতের-লেখায় তোর মা-র চিঠিও ছিল সঙ্গে। দু'জনের কথা তো একই—তোব মাকে নিয়ে কেউ নাকি আসবে ক'দিনের মধ্যেই। পৌঁছে দিযে যাবে। তোদের গ্রামেব কাছেই নাকি কোথায় কোন্ একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেছে...'

ঝলকে উঠল রাধা।

দেয়াল ঘেঁষে সাইডবোর্ডেই চাপা দেওয়া ছিল সেই চিঠি। কিরণময়ী তাঁর চশমাটাও আটকে নিলেন চোখে—'আরো কীসব লিখেছে। সে-তো আমি বুঝিও না ছাই। যা হাতেব লেখা, এ-তো সবটা পড়াও যায় না ভালো করে...'

চিঠিটা নিয়ে সরাসরি আলোর তলায় দাঁড়ালেন। চিঠিশুদ্ধু হাতটা তুললেন নাকেব ডগায়—'ওরা চার ভাই। বাপ বেঁচে আছে। জমি আছে ক'বিঘে। বাপ-ভাই সবাই মিলে আরো জমি ভাগে চাষ করে। ভাগ কী রে রাধু? ভাইরা সবাই ভাগ হয়ে গেছে? সেই ভালো। একসঙ্গে থাকা যায় আজকাল? খালি-খালি ঝগড়াঝাঁটি গুঁতোগুঁতি...'

এবাব কাঁদল বাধা। দু-পাশের গাল বেয়ে নীরব জলধারা। বুক-কাঁপানো ফোঁপানিব

জন্য বুঝি এখনও আরো কিছু ধাক্কা বাকি। আঁচল-চাপা মুখে শুধুমাত্র জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ চাগিয়ে থাকে। সেই চোখে সাহেববাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে তার। ঝাপসা হয়ে উঠছেন মা। তার অনেক দূরের মা। অনেক কাছের।

'বর্গা কী রে রাধু?' ইনল্যান্ড খামের কাগজকে প্রায় চশমার সঙ্গে লেপটে এনে গাঢ়তর নজরে কী পডতে চাইলেন কিবণময়ী—'এই যে লিখছে, বেকর্ডেড বর্গা আছে ওদের। সেটা কী? কী হয় ওতে?'

'বর্গী মা?' বুলবুলি রীতিমত আতঙ্কিত—'দোজ মাবহাট্টা ডেকয়েটস? বর্গী বব হবে রাধুর? হাউ ডেঞ্জারাস।'

'হোয়াট নন্‌সেন্স... 'ধমকে উঠল মুনমুন—'বর্গীরা এখন কোথায়? ইট ইজ বর্গা। ডোণ্ট ইউ লিসন্, ইট ইজ এ ডিফারেণ্ট ওযর্ড...'

'দেন হোয়াট ইজ দ্যাট?'

'সে-আমি কি করে বলব? কালীজেঠু লিখেছেন। ওসব ইংলিস-ওয়র্ডস ওরা কী বিচ্ছিরি করে বলে, বোঝা যায় নাকি কিছু? মে বি ইট ইজ বার্গেনিং। ফ্রম বার্গেনিং টু বর্গা...'

'রেকর্ডেড বার্গেনিং? হাউ ফানি। হোয়াট ইট মিন্‌স্?'

'ইট মিনস, আওয্যাব বাধু সামহাউ অর বাদার অলওয়েজ অন দ্য বার্গেনিং। ফ্রম পেভমেণ্ট মার্কেট অব হাতিবাগান টু হাব মারেজ...'

কোনো মানে আছে কথাগুলোর। অথবা নেই। দু-বোনেব সহাস্য হাততালি।

একপাশে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে ছিল বাধা। ইংবেজি জানে না। হদিশ পায না তককাতক্কিতে কোন দিদিমণির জিৎ? কে ঠিক, কে বেঠিক। শুধু বোঝে, তাব ওপব সকলের সব মালিকানাই ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে এরপর—বাপেব বাডি, সোয়ামিব ঘব। সাহেববাড়ি নেই।

ওদিকে পায়েব শব্দ কাব? সাহেব আসছেন? গোটা শরীবের ঝাঁকুনিতে শিরায শিরায় রক্তে শিহরন-কাঁপুনিতে চমকে উঠল রাধা। সাহেব নন। ঝোড়ো বাতাসের তোড়ে ঠোঁটে শিস বাজানোব কর্কশ আওয়াজেব দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ধুমধাড়াক্কা লোকটা। ছিটকে সরে এল সে। রাগ বা দুঃখু—নিজের কাছেই স্পষ্ট জানা নেই। কান্না। সুখের ঘবে কান্নাব নিয়ম নেই। পালাবার পথ নেই। কিংবা কাঁদতেও ভয। দাঁতে ঠোঁটে আগল তুলে চোরেব মতো, যেন কান্নাটুকুই কোনো পরম সম্পদ, যা নিজের মধ্যে লুকিযে বাখাব যন্ত্রণায় আবেক ঝকমাবি—চোখের ঝাপসায় ভিজে যাচ্ছে চারদিক, রং বদলে যাচ্ছে সাহেববাড়িব প্রাসাদখিলান ঘরদোর দেয়াল সিলিং মেঝে জানালাদরজার পর্দাব। কান্নার ঠাঁই নেই যার, আঁচলে মুখ চেপে মাথা নুয়ে ছুটতে ছুটতে, যেন কোথাও গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখাই দায়। ঘন নিঃশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে পৌঁছে বান্নাঘর পেবিয়ে খাবার-ঘরেব পাশে ভাঁড়ার-ঘরের ছোট কুঠুরিতে। সেখানে অন্ধকার। আড়ালে লুকিয়ে বিষ গেলা যায় যে-অন্ধকারে অথবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা যায় একা —যে-কান্নায় ঘরের-মেয়ের ঘর হাবাবার দুঃখু আর পরের মেয়ের কলঙ্ক মিশে যেতে পারে একাকার।

সেদিন রাতে হৈহল্লায় মাতামাতি তোলার জন্য অনেক কিছুই ছিল ডিনার-টেবিলে আবার নতুন করে খেলার-মাঠ ঘরের ভেতর।

পুজো মার্কেটিংয়ের পণ্যসম্ভার নিয়ে ঘরে ফেরার সময় নিশীথরঞ্জন গাড়িতে ছিলেন। কার জন্য কি কেনা হলো অথবা বাজেটের মেদমাংস—কোনো কিছুতেই কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না তাঁর। সন্তানদের সঙ্গে অতিবিক্ত উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠার মতো বাড়তি সময়ও খুব কম। তবু পুরনো অভ্যাসে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে-টিতেছে শুনলে বেশ ভালই লাগে এখনও। অথবা যখন টিভিতে-দেখা খেলাব আনুপূর্বিক ধারাভাষ্য দিয়ে যাচ্ছিল মেয়েবা, কিংবা মাঠে বসে সরজমিনে চাক্ষুষ করাব গৌরবে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা দাবি কবছিল বাবন, ওদের ছটফটানিতে ঘাড় নাড়ছিলেন, মৃদু হাসছিলেন স্নেহার্দ্র পিতা। মন্দ লাগে না সারাদিনের একটানা টেনশনেব পব দিবাশেষেব উৎসবময় গার্হস্থ্যপ্রাণ।

প্লেট সাজাচ্ছিলেন কিরণময়ী। টুংটাং জলতরঙ্গের ধ্বনি। নিয়মমাফিক রাধাকে পাশে থাকতেই হয়। খাবার-টেবিল আব রান্নাঘরের দরজায় সংসাবের-মা আর গোপালেব মার সংযোগবক্ষায় মধ্যবর্তিনী।

হাফটাইমের মিনিট কযেক আগেই গোল শোধ করে দিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু দিক বদলের পর রেফাবির বিতর্কিত সিদ্ধান্তে আরো একটি গোল নাকচ হয়ে গেলে মাঠে ইট ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল বিস্তর। গ্যালারি ভেঙে নেমে পড়েছিল জনতা। টিভিতে যেটুকু দেখা গেছে, বেধড়ক পিটিয়েছে পুলিশ। বাবনের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে ঘটনা আরো বেশি রোমহর্ষক।

বুলবুলির সদ্য কার্ল-করা বয়েজকাট চুলের উথালপাথালে কোনো সংশয় ছিল না—'বিজয়ন গট দ্য বল ফ্রম সত্যেন কারেক্টলি অ্যান্ড স্কোবড এ স্পেকটাকুলার গোল ইট ইজ শিয়ার চিটিং টু ডিপ্রাইভ হিম...'

'নো নো নেভার। হি ওয়াজ ভেরি মাচ অন দ্য অফসাইড। নাউ ইউ আর ট্রাইং টু গালপ ইট আপ...' সক্রোধ হুঙ্কারে বাবনের সবল ঘুসি, এমন কি পিতৃসন্নিধ্যেই, টেবিলের ওপর সেটা এমনই ভয়ঙ্কব, সিরামিক প্লেটবাটি কাচের গ্লাস ঝনঝনিয়ে কাঁপল থরথর থবথর।

'আঃ কী কবছিস?' ধমকে উঠলেন কিরণময়ী—'ভাঙবি নাকি সব?'

'ডোন্ট গেট এক্সাইটেড সো মাচ। ইট ইজ নট সো ইমপর্ট্যান্ট...' যথেষ্ট ভারি গলায় নিশীথরঞ্জন। তাঁর হাতে হলুদ কার্ড লাল কার্ড নেই।

ওদেব ভাইবোনের তুমুল হল্লায় ঘরের ছাদে দেয়ালে দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। গরিমাদীপ্ত পিতা বা মাযেব সামনেই অনুজাদের সঙ্গে বিতর্কে বযোজ্যেষ্ঠ দাদা বা গাট্টাগোট্টা পুরুষমানুষ বলেই হয়তো অথবা ক্লাব মেম্বারশিপের কার্ড-হোল্ডার হিসেবে খেলার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী—আধিপত্যের প্রবল জোর সে-যুবকের।

চিনেমাটির প্লেটে সাহেবের জন্য সেঁকা-পাঁউরুটি নিয়ে আসছিল রাধা। চমকে তাকাল। লাফিয়ে উঠছে লোকটা। নতুন সাহেবি কাযদা—বারমুডা না কী বলে ছাই ঢলঢলে কাপড়ের ছাপছোপমারা কী একটা হাফপেন্টলুন পাছায় ঝুলিয়ে বয়স্থা বোনেদের সামনে ঘুরে বেড়ায় জোয়ানমবদ বেলাজ একটা মানুষ! ভারি দাবনা থেকে পায়ের

গোড়ালি অব্দি কালো কুচকুচে ঘন লোমের জঙ্গল উদোম ন্যাংটো। গায়ে হিজিবিজি লেখাজোকার সবুজ ব্যাগি গেঞ্জি। তখন তো সন্ধেবেলা অন্ধকাব ঘরে শুধু একটা জাঙিয়া পরেই ছিল। শিরশিরিয়ে উঠল রাধা। যা কখনও বলা যাবে না কাউকে। চুবি কবা টাকার মতো যা একান্ত গোপন ভয়ঙ্কর, সেই কান্ডটা এখনও হাঁটু কাঁপাচ্ছে তাব। বুক কাঁপছে। টেবিলের চৌহদ্দিতে খুব কাছাকাছি এসে পডার পর আডচোখে তাকিয়ে দেখার সাধ ছিল। ভয় ছিল—সকলের সামনে এব পর ওব দিকে চোখে চোখ বেখে তাকাবে কি করে মানুষটা? কিন্তু তাজ্জব। কোনো হুঁশ নেই। লাজ নেই শবম নেই। লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে হুল্লোড় করছে রোজকার মতো। চোখ টেবিয়ে দেখছেও না একবাবটি। যেন কিছুই হয়নি কোথাও? শখেব পুতুল হাত ফসকে পড়ে ভেঙে গেলেও যেটুকু আহা উঁহু থাকে মানুষেব, একটু আপশোসও থাকবে না গো এমন একটা বেইজ্জতিব কাণ্ড করে ফেলাব পব?

রুটির প্লেটটা সাহেবের ডানদিকেই বাখতে হবে তাকে। সেটাই নিযম। অথচ সাহেবকে বাঁযে বেখে ডানদিকে এগোলে টেবিলের কোণ ঘেঁযে লাগোযা চেয়ারটায় বসে আছে যে-লোকটা, তার নিঃশ্বাসেব নাগালে চলে যেতে হয। সাহেবেব বাঁদিক থেকে, সাহেবেব বুকেব ওপব দিয়ে হাত বাডিয়ে ডানদিকে প্লেট বাখা? ওরে বাপস? সে-অনেক বড় বেয়াদপি। অগত্যা ওদেব ভাইবোনদেব হল্লাচিৎকাবেব মধ্যেই অসহায ভীরুতায় পা ফেলে এগোতে হয় তাকে এবং দু-চাব কদমেই ভযঙ্কব সেই মানুষটার গাযেব গন্ধের ঘামেব গন্ধের আওতায় চলে যেতে হলো। যে-গন্ধগুলি আজই বড বেশি কবে চিনে ফেলেছে সে অথবা যে-ঘ্রাণই চিনিয়ে দেয মানুষ আব মানুষের প্রথম ফারাক, যে-ফারাকে তাথৈ কোলাহলের ঘবেও এক টুকবো দমচাপা নিঝুম তৈবি হযে ওঠে। নিঝমটুকু দাঁতে দাঁত চেপে থাকাব, চোখে চোখ না ছোঁযার, ছোঁয়াছুযিতে পিটপিটে হয়ে ওঠার। পাপের ভয, নিন্দাব ভয়, গলাধাক্কার ভয। বুঝি এ-ও এক খেলা। সবাব সামনে থেকে, সবাব অলক্ষ্যে অদৃশ্য পাঁচিল তুলে পাঁচিলটাকেই আড়াল বাখাব গোপন চতুবতা।

'আজ যে এত সব কাণ্ড হযে গেছে খেলার মাঠে, জানতাম না তো। ধ্যাৎ, টিভি সব দেখায় না...' আহারাদি শুরু হয়ে গিযেছিল সকলেব। সুখাদ্যঘ্রাণে ভরে উঠেছিল ঘব। দু-চাবটে ধাতব ধ্বনি। ব্যাকুল কিরণমযী—'হ্যাঁ, এই তো টিভিব নিউজে বলল, খুব নাকি রক্তারক্তি কাণ্ড। দশজন না বাবোজন হাসপাতালে গেছে। এত কবে যে বলি ছেলেটাকে মাঠেফাঠে গিয়ে কাজ নেই বাপু, কখন কি হয...'

'কি আবাব হবে? ইট মে হ্যাপেন। ভেবি ন্যাচারাল...' ভবাট গালে বাবন—'সামথিং উইল হ্যাপেন ইন সাচ এ বিগ গেম। সাম লুম্পেনস আব অলওয়েজ দেযার...'

'থাক খুব হযেছে। আর বকিস না...' প্লেট থেকে হাত তুলে ঝাঁঝিযে উঠলেন কিরণময়ী—'কেন, এত ভাল টিভি আছে ঘরে। কালার টিভি। কী এমন কম দেখা যায় ওতে? ঘবে বসে আমার আব খেলা দেখা হয না। দুশ্চিন্তায় মরি...'

'এনিথিং দ্যাট ক্যান স্টিমুলেট ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড...' ঘববাড়ি কাঁপিযে বাবন উদ্দাম —'লাইফ ইজ ফর এনজয়মেন্ট, ডিয়ার। সিম্পলি এনজয ইট...'

মুখ্যত যাঁর শাসন প্রত্যাশিত বলেই এত কথা ভোজের-টেবিলে, নিশীথরঞ্জন নিরুত্তাপ ছিলেন নিজের আহারে এবং প্রশ্রয়ে বাবন আরো বেশি স্ফীতকণ্ঠ—'আরে বাবা, এ-আর কী দেখছ? য়ুরোপ ল্যাটিন-আমেরিকায় মেশিনগান চলে ফুটবল-মাঠে। তাই বলে দে হ্যাভ টু গিভ আপ দেয়ার ফুটবল? নেভার, রাদার দে ক্যান ডাই ইন হানড্রেডস...'

'অ্যান্ড দে ক্যান প্রডিউস পেলে মারাদোনা রোমারিও বেবেতো গুলিট বাজ্জো হাজি...' তুখোড় মুনমুন—'হুম ইউ ক্যান ডাই ফর?'

'ফবেন, সবই তো ফরেন মাল রে। এদেশে হয় নাকি কিছু? ভালো জিনিস যা দেখবি, যা কিনবি অল আব ফরেন অর ইন ফরেন কোলাবরেশন... ফরেন প্রডাক্টস অল অ্যাবাউন্ড। হোযাই নট ইন স্পোর্টস?'

ভাষা বোঝে না রাধা। ছবি চেনে নিবক্ষব চোখ। আওয়াজ শোনে। কী বেলাজ বেশবম গো একটা লোক? এত কাছাকাছি আছে সে। এমন লাফালাফি গলাবাজি এখনও মানুষটার? কোথায় কোন্ খেলার মাঠে মারপিট খুনোখুনি। ঘরের ছেলে ঘবে ফিরেছে। মারদাঙ্গার মুরদ নেই। হাড়গোড় ভাঙে নি কোথাও। হাড়গোড় ভাঙেনি বাধারও। হাসপাতালে যেতে হয়নি কাউকেই।

আরো কি বলতে যাচ্ছিল সে-যুবক, নিশীথবঞ্জন কটাক্ষে তাকালেন—'আঃ, হচ্ছে কী? এভরিথিং মাস্ট হ্যাভ এ লিমিট। খেতে বসেছ, খাও। মাংস খেতে খেতে ওভাবে এগজাইটেড হতে নেই। হাইলি ডেঞ্জারাস...'

'সো? হোয়াট হ্যাপেনস্, বাপি?' বুলবুলি হাড় চিবোতে চিবোতেই।

'ইন আওয়ার ইয়ং ডেজ, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি ডাযেড ইন টৌকিও ইন অ্যান অফিসিয়াল ডিনার...'

'আ...' সন্তানরা আতঙ্কিত—'ইভন এ চিকেন ক্যান কিল আস দেন?'

'প্রিসাইসলি...'

বাধার অস্বস্তি ছিল। সাহেববাড়ির খানাপিনায রোজই থাকতে হয় তাকে। তার নিত্যিদিনের কাজের কড়ারে বাধ্যতা—ফাইফরমাসে কানখাড়া বা সেবাযত্নে নজরদারি। আজও সে ঘরেই ছিল, কাছেই ছিল। খাড়া কানে সজাগ। ভ্যাবলা চোখে তাকিয়ে ছিল —স্বাদেগন্ধে পুষ্টিতে সুষম ভোজের আসরে যেমন করে নির্লোভ থাকতে হয় অধস্তনদের।

পায়ে পায়ে পিছিয়ে ছিল। নিতান্তই মূঢ়। জানে না, চোখের পলক উদোম রেখে আলোয় আলোয় ছয়লাপ সুখেব ঘরে এতগুলো মানুষের ড্যালাড্যালা চোখের সামনে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয় কোন্ কৌশলে? বড় বেশি ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আছে সে। বুঝি পাযের তলায় মাটি নেই। জলে জলে বরফ হয়ে ভেসে আছে এবং যেহেতু এভাবেই ভেসে থাকতে হবে তাকে, বুঝতে দেওয়া যাবে না কাউকেই—জলের তলায় কত ভাগ ডুবে আছে অথবা কতটুকু ভেসে আছে জলের ওপর? গলে গলে নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে হবে নিজের মধ্যে নিজেকেই।

কিরণময়ীর হঠাৎ-ই চোখে পড়ল—'কি রে, তোর আবার কী হলো? আজ ওখানে

গিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস যে? উঃ, ওই হয়েছে এক মেয়ে। সেই সন্ধে থেকে জ্বালাচ্ছে এমন...'

পিছোতে পিছোতে দেয়ালেব সঙ্গে প্রায় সেঁটে গিয়েছিল রাধা। চাবদিক থেকে চারটে টিউববাতি জ্বলছে একসঙ্গে। টেবিলেব ওপর, এমন কি, একটা কাঁটাচামচও ছায়া ফেলতে সাহস পায় না যেখানে, টিভির ছবির আদলে বঙিন মানুষগুলো অথবা থালাবাটিগ্লাস ক্যাসারোল—ছায়া নেই কারুর। দেয়ালের গায়ে লেপটে থেকে বাধা ওব নিজেব ছায়া খোঁজে। বুঝি ছায়াব খোলসেও লুকিয়ে রাখা যায় নিজেকে।

'ও হ্যাঁ, ভালো কথা। তোমাকে তো বলাই হয়নি...' খেতে খেতে একবাব ডান দিকে তাকালেন কিরণময়ী—'ওদের গ্রাম থেকে কালী চিঠি লিখেছে একটা। আসলে বাধুর মা-ই ওকে দিয়ে লিখিয়েছে চিঠিটা। কী নাকি একটা ভালো ছেলেব খোঁজ পেয়েছে ওরা। ওদের গ্রামেই...'

এসব তুচ্ছতার অনেক উর্ধ্বে যাঁব অবস্থান, নিশীথবঞ্জন স্টু-র বাটি থেকে কাঁটা দিয়ে ল্যাতপেতে পেঁপেব টুকবো তুলে ঘাড় ফেরাতে চেয়ে ঝামেলায় পড়লেন। ভাঙটুকু টুক করে খসে পড়ে বাটি থেকে ছলকে উঠল ঝোল।

'জানো? জানো বাপি। রাধুব বিয়ে...' স্বভাবে উচ্ছল বুলবুলি—'বর্গী বর হবে বাধুর। ওফ ননাইস...'

'আঃ, ইট ইজ নট বর্গী। সে বর্গা...' সংশোধন মুনমুনের।

'ও স্যরি, বর্গা। বর্গা বব হবে রাধুব?'

ঘাড় নিচু কবে চুমুকেব জন্য চামচে ঝোল তুলেছিলেন নিশীথরঞ্জন। ললাটে ভাঁজ তুললেন—'সেটা কি জিনিস?' বর্গা নয়, বর্গাদাব বলো।'

নাড়া খেলো সকলেই। বড়সড় মাপের কোনো ডানা-ঝাপটানো পাখি আচমকা গা ঘেঁষে চলে গেলে যেমন হয়, সবিস্তার পাখসাটে ঘর ছেড়ে রাধাব দ্রুত বেবিয়ে যাওয়াব স্পর্ধিত আচরণ, বিশেষত জাঁদরেল গৃহকর্তা যেখানে স্বয়ং উপস্থিত, বলা বাহুল্য, ডিনাব-টেবিলের সমস্ত ডিসিপ্লিন লণ্ডভণ্ড কবে দেবার পক্ষে যথেষ্ট বড় ঘটনা। চেয়ার ছেড়ে চকিতে লাফিয়ে উঠেছেন কিবণময়ী। তীক্ষ্ণ শাসনেব হুঙ্কার—'বাধু, এই রাধু, কোথায যাচ্ছিস? শোন্, শোন্ বলছি...'

কোনো সাডা নেই। নিষ্ক্রমণেব দবজায় পর্দা কাঁপছে তখনও।

কিংবা গৃহকর্ত্রী নিজেই হেসে ফেললেন। কৌতুকের মৃদু আস্তবণ গালেমুখে ছড়িয়ে বসলেন চেযারে—'ও-থাক, এ-রকম একটু-আধটু করবেই আজ। মেয়েদেব ও-বকম হয়।'

'মেয়েদেব হয়?' মাংসের বাটিতে আঙুল ঠুকে ঠুকে মেটে খুঁজছিল বুলবুলি। ফিবে তাকাল—'কী হয? হোয়াই গার্লস আর ডিফারেন্ট?'

'তোরা সবাই মিলে ওর বিয়ে-বিয়ে করছিস, সকলেব সামনে একটু লজ্জা পাবে না বেচারি?' নিজের প্লেটে আবার হাত ফেলেছেন কিরণময়ী—'লজ্জা তো আছেই। তাছাড়া অ্যাদ্দিন ধরে তোদের সঙ্গে আছে এ-বাড়িতে। সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, মন খারাপ লাগবে না ওর?'

'ইজ শি স্কেয়ার্ড অব ম্যারিং মাম্মি? বাট হোয়াই?' বুলবুলি, চোখ বাঁকিয়ে।

'মে বি, শি ইজ নট ইগার টু প্লে ইন মিক্সড-ডাবলস্...' সহাস্যে মুনমুন।

'আ...' বুলবুলির প্রবল উচ্ছ্বাস—'বাট ইট ইজ বিয়ে। অলওয়েজ এ গেম অব মিক্সড-ডাবলস...'

ললাটে ভাঁজ তুলে কন্যাদের দিকে শান্ত ভ্রূকুটি নিশীথরঞ্জনের।

'থামবি, থামবি তোরা? চুপ করবি একটু...' মেয়েদের ফুর্তির উৎসবে কিরণময়ী কিছুটা নড়বড়ে। কিন্তু মাতৃত্ব বা মাতৃত্বের শাসন আইন মোতাবেক— 'ঘরে বসে দুটো কথা বলবি, সে-ও সব সময় ফটফট ইংরেজি বলতে হবে তোদের? কেন, আমিও কি তোদের কলেজের আন্টি না ম্যাডাম নাকি? বাংলা জানিস না তোরা?'

বলা বাহুল্য, ভোজনবিলাসী বাবন তার অতি প্রিয় চিকেনের মগ্নতা থেকে ভ্রূ তুলে তাকিয়েছিল একবার। খেলার কথা ফুরতেই যখন তার বলার কথা ফুরিয়ে যায়, সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। অন্যদের কাছে সে-তির্যক চাহনি বা শান্তভঙ্গির স্বতন্ত্র কোনো অর্থ ছিল না।

•

কিন্তু রাধার মরণ—ও-মেয়ে মরতেও শেখেনি নিজের দহনে। কিংবা আজ যা ঘটে গেল, সেটা বিষ খেয়ে মরার জন্যে তেমন কিছু মস্ত ঘটনা কিনা, হিসেবপত্তর করে বুঝে নেবার মতো বিদ্যেবুদ্ধিও নেই বলে কেন্নোর মতো গুটিয়ে গিয়ে সুবিশাল রাজার-বাড়িতে, বুঝি কোন্ দুয়োরাণীর মেয়ে, গর্তখোদল খোঁজে—লুকোবে কোথাও। লুকোতে চেয়ে আরেক বিপদ, দিশেহারায়, আরো বেশি করে জড়িয়ে যায় সাহেববাড়ির গোলকধাঁধায়।

খাবার-ঘর থেকে এভাবে ঝটকা মেরে বেরিয়ে আসা এবং মায়ের ডাকে সাড়া না দেবার বেয়াদপি সে জানে। বুকে তরাস ছিল। এবং বেরিয়ে আসার পর রান্নাঘরে, অদূরেই, গোপালের-মা। বুড়ির সামনে আঁচল চাপা মুখে দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয় মনে করে যখন সে সত্যি-সত্যি পা বাড়াল—পথ নেই পায়ের তলায়। পথ না থাকলে, ঘুরপাকে, প্রতিটি পা ফেলায় শাড়ির খোলের ভেতর দুটো হাঁটু এলোমেলো ঠোকাঠুকিতে জড়িয়ে গিয়ে ঠকঠক কাঁপতে থাকে। রক্তে রক্তে চারিয়ে গিয়ে পেট বুক গলা মাথা মগজ গোটা শরীর অবশ। সাহেববাড়িটা বহরে যত বড়, সুবিপুল দুর্গপ্রাকার আজই হঠাৎ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। রান্নাঘরের বাইরে ফুরোয় না লম্বা বারান্দা। লাউঞ্জের চত্বরটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার। দুপাশে দুটো ওয়ালল্যাম্প জ্বলছে। চারপাশের ঘরদোর সব ফাঁকা। ঘরের মালিকরা সকলেই ডিনার-টেবিলে। ছায়াচ্ছন্ন প্রাসাদপুরীতে নিজের ঘর আপন ঘর নেই যার, অথবা সাধের ঘর খুঁজে নেবার আকুলতায় ভূমণ্ডলে কোথাও ঠাঁই না পেয়ে, একা, টলোমলো টলোমলো সে-মেয়ে এগোয় পায়ে পায়ে। পায়ে স্লিপার নেই চটি নেই, নিজের কোনো ধ্বনি নেই। বুকের হাপরে দীর্ঘশ্বাস ঘাই মারে যদি, সেটাও কোনো আওয়াজ নয়। মানুষের দুঃখুকষ্টের কোনো আওয়াজ থাকে না। ঘরের আলোআঁধারি বা সিঁড়িবারান্দার চড়া আলোয় পায়ে পায়ে লেপটে-থাকা নিজের ছায়াটুকুরও কোনো মাপ নেই, সুস্থিরতা নেই। আগে পিছে ডানে বাঁয়ে কখনও ছোট, কখনও বড়, কোথাও

অনেক লম্বা, গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়ে কখনও বা ছোট, খুবই বেঁটে—মাটিতে পড়ে আছাড়িবিছাড়ি বুঝি তার নিজেরই আছড়ানি। ওপাশে সিঁড়িবারান্দায় পৌঁছে ওপরে উঠতে চেয়ে পা ফেলার ধাপগুলো বড় উঁচু-উঁচু মনে হচ্ছে আজ। একটা পা ওপরের ধাপে ফেলে তলার পা টেনে তুলতে পাছা অব্দি একটা খিঁচুনি। বুকে পেটে, ব্লাউজের তলায় খুঁজেপেতে দেখাই হয়নি এখনও, হয়তো নখেরই আঁচড়, নয়তো হীরে-বসানো আংটিরই ছোবল, জ্বলছে তখন থেকে। যন্ত্রণা। এবং যন্ত্রণায় দেহভার টেনে টেনে সে উঠে আসে তিনতলায় ছাদের ঘরে, সেই ভয়ঙ্করে।

ফাঁদ চিনে ফেলার পর কোনো পাখিই যেমন লোভ গিলতে আসে না দু-বার, রাধার পায়েও বেড়ি ছিল। কিন্তু তাকে তো আসতেই হবে এক সময়। বিছানাপাটি সাজিয়ে দিয়ে যেতে হবে ওদের ঘরের ছেলেকে। হয়তো এই সুযোগ। ওরা এখন খাবার-টেবিলে মশগুল। খেয়েদেয়ে টিভির সামনে বসে হৈহুল্লোড়ে আরো কিছুক্ষণ মেতে থাকবে সবাই। এই ফাঁকে একা ঘরে সে সেরে যেতে পারে নিজের কাজটুকু।

ঘরে ঢুকে, আলো জ্বেলেই থমকে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর চিনেমাটির বাটি প্লেট কাচের-গ্লাস সবই সাফসুফ শাদা। ধবধবে শাদা বাটির গায়ে শুকনো হয়ে ওঠা কিছুটা ডালের দাগ। এত কাণ্ডের পর সবটাই চেঁছেপুঁছে খেয়েছে লোকটা? এবং বাধা টেবিলের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গোটাকয়েক কলাইশুঁটির দানা, পাউরুটির গুঁড়ো আঙুলে-আঙুলে খুঁটিয়ে তুলে, বাটিতে ফেলে, এঁটো বাসন দেয়াল ঘেঁষে এক পাশে মাটিতে রেখে টানটান শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘন নিঃশ্বাস। মানুষটার খিদে পেয়েছিল খুব। বড় যত্ন করে সে রেঁধেছিল মাংসের ঘুগনি। তৃপ্তি করে খেয়েছে লোকটা।

ওদিকে দক্ষিণের জানালায় সিঙ্গল বেডের ডিভানটার দিকে চোখ পড়তেই গা বেয়ে চকিতে একটা হলকা বয়ে যায়। বেডকভারটা এখনও তালগোল-পাকানো, এলোমেলো। শিউরে উঠতে হয়। ভয় অথবা লজ্জা অথবা নিজেরই আনাড়িপনা। বাঁচাতে পারেনি লোকটাকে। কিংবা সে-তার নিজেরই মরণবাঁচন। ঝাঁপিয়ে-পড়া দামাল শক্তিকে রুখতে না পেরে যখন আর উপায় ছিল না, শুধু দুটো হাতই খোলা ছিল। দু-হাতের মুঠোয় খাবলে খাবলে সে নিজেই দু-দিক থেকে বেডকভার বিছানার চাদর উপড়ে উপড়ে টেনে তুলে এনেছিল নিজের গায়ে।

এবং এখন নিজেরই অসহায় লণ্ডভণ্ডের দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে থাকার গা-পোড়ানিতে শক্ত হয়ে উঠতে চাইছে বুকের ভেতর। বুকের পাথর গলে গলে চোখে এসে জল হয়। গলে গলে জল না হলে কঠিন পাথর ভাঙে না, গুঁড়োয় না, দাঁত-কপাটিতে জমাট বেঁধে থাকে হাড়েপাঁজরায়। চিড়বিড়ানিতে জ্বলতে থাকে হাড়মাস। সেই জ্বলুনিতে এবার সে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ল গতরখেকো বিছানায়। শুধু বেডকভার নয়, বিছানার চাদর মাথার-বালিশ পাশপালিশের ওয়াড় সবই উপড়ে ফেলতে চাইল। নতুন করে পাল্টে দেবে সব। এ-বাড়ির বেডকভার বিছানার-চাদর সবই লন্ড্রিতে যায়। কাল সে নিজের হাতে ধুয়ে দেবে। মেয়েমানুষের গায়ের গন্ধ লেপটে আছে একজন আইবুড়ো ব্যাটাছেলের বিছানায়? বুঝি গন্ধটাও একান্ত গোপন কিছু। টের পেয়ে যেতে পারে কেউ। কেউ টের না পাক, যেমন করে সে জ্বলছে পুড়ছে নিজে, সারা রাত বিছানায়

শুয়ে শুয়ে গন্ধে গন্ধে ফোকটসে মজা লুটবে কেন একটা লোক? গা-পোড়ানির বদলা নেবার আক্রোশে হামলে পড়ে বালিশের ঢাকনাগুলো খুলে নিতে টেনেহিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলার আকচাআকচিতে হাঁপায়। জ্বলতে থাকে। সব মজা যদি শুধু এই একটা লোকেরই, সে-ই বা রাতভর দগ্ধে দগ্ধে মরবে কেন একলা ঘরে? একা?

দোতলায় ডাকখোঁজ পড়তেই পারে যে-কোনো সময়। সব কিছু জেনে-বুঝেই আজ সে হঠাৎ মরিয়া। বাতিল শয্যাব চাদর-বেডকভাব বা বালিশগুলোকে ন্যাংটো কবে ওয়াড়গুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়। হাঁটু ভেঙে নিচু হয়ে বসল মেঝেতে। ডিভানেব তলায় পরিপাটি করে সাজানোই থাকে হবেক রঙেব বাহাবি নকশাব বিছানা-পাতার সেট। ভালোমন্দ সুন্দব-অসুন্দর বাছাইয়ের কিছু নেই। হাত বাড়িয়ে যা উঠে এল, নতুন করে সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। কিংবা সময়টা সে এভাবেই চুরি কবে নিজের কাছে রেখে দিতে চায়। যতক্ষণ, যতটা দীর্ঘ সময়, আড়াল করে রাখা যায় নিজেকে।

যথানিয়মেই শলা-কাঠির একটা ঝাঁটা এনেছিল সঙ্গে। ধুলো ঝেড়ে দিতে হয়, যদি পুরনো চাদর-বেডকভারেই বিছানাটা থাকে। কিন্তু আজ সকালেই যেখানে বদলে দিয়ে গেছে সব, নতুন করে পাল্টে দেবাব কোনো দবকার ছিল না আজ রাত্তিরেই। যদি পাল্টানোই হলো, এক দুপুরেই খুব বেশি ধুলো জমে ওঠার কথা নয়। তবু যে কেন ঝাঁটা? গায়ের ঝালে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই জোরে ঝাঁটার পর ঝাঁটা হালকা মেরুন রঙেব ওয়াব-ঢাকা রবাবফোমের নরম তোশকের আশপাশতলায়। এমন লোভাতুর শয্যায় আস্ত একটা ঘুম কেন, দু-চার মিনিট গা-এলানোর ভাবনাও মাথায় আনতে পারে না যে-মেয়ে, সেখানেই গোটা শরীরের সমস্ত ক্রোধ ভেঙে পড়ল। বিছানাই তো পুণ্যিপুকুর গো মেয়েমানুষেব। বিছানাই পাপের বাসা। যেখানে শুয়ে নেই কেউ, অথচ আছে—মানুষটার থাকা না-থাকার শূন্যতায়, ঠ্যাঙাপেটায় ধান-ঝাড়াব ভঙ্গিতে ঝাঁটাব পর ঝাঁটায় বিছানাটার ওপর আছড়াতে থাকে। অথবা হয়তো এখনও নিজেই শুয়ে আছে সে। নিজেকেই ওয়াক্-থু।

চাদরের ভাঁজ ভাঙতে হয়। শূন্যে উড়িয়ে ঢেউ খেলিয়ে লম্বা চাদর চারপাশে চারিয়ে দিলে লাল-হলুদে-নীলে আলপনা-আঁকা সবুজ বঙে বঙে যেন এক মনোহব গালিচা। হাঁটু ভেঙে উঠে পড়তে হয় বাহারি শয্যায়। হামা দিয়ে চাবদিকে পাট কবে গুঁজে দিতে হবে তোশকেব তলায় তলায়। কুঁচকে থাকতে পারবে না কোথাও। সুমসৃণ রাখতে হবে চারপাশ। হাতে-হাতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাখতে হবে বালিশগুলো। তারই হাতের স্পর্শগুলি সুখের জমিতে সর্বত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মেয়েমানুষের গন্ধ থাকবে না এতে। কেন না, এটা কাজের-হাত। আপাতত ন্যাপথলিনের হালকা ঝাঁঝ নাকে লাগছে তার। চাদর পেতে, চাদরের নকশার সঙ্গে রং-মেলানো বালিশের ওয়াড় ভরে, দুটো বালিশই শিয়রে রেখে, ঢাকনায় ঢেকে, পাশবালিশের ওয়াড় ভরতে ভরতে তার নিজেরই হাতে সাজিয়ে তোলা শয্যার দিকে তাকিয়ে বেখেয়ালে উদাস হয়ে ওঠে। ফুলশয্যার রাতে দুজনের জন্যে ফুল দিয়ে বিছানা সাজাতে দেখেছে সে দু-চারটে বিয়ে

বাড়িতে। ফুলটুল নেই এখানে। বিছানাব চাদর বা বালিশের ওয়াড়ে নকশা ছাপা ফুলগুলো ঠিক-ঠিক ফুল নয়। কিন্তু সে নিজেরই হাতে সযত্নে গড়ে-তোলা চকচকে ঝকঝকে বিছানার রঙে-জৌলুসে অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ পেয়ে যায়। মিষ্টি মিষ্টি চাপা একটা সুবাস। ফুলেবই গন্ধ।

এবং এ-রকম কিছু মনে হতেই এক ঝটকায় খাট থেকে নেমে, মেঝেয়, উঠে দাঁড়াল সে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এমন সব আজেবাজে কথা মনে হচ্ছে কেন তার? পাপেব কথা।

কী যে কোথায় শব্দ হলো একটা! নাড়া খেলো রাধা। কি মুশকিল। এখনও মশাবি টাঙানো বাকি।

মশারিটা সে বের করে রেখেছিল ডিভানের তলা থেকে। গোলাপি রঙের নাইলনেব মশারি। তডিঘড়ি পাট ভেঙে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব চারপাশে ঘুরে ঘুরে স্ট্যান্ডগুলোতে ফাঁস এঁটে দিতে থাকে। ঘরের ভেতব ঘর, চারদিক থেকে ঝুলে পডল ঝিবঝিব পর্দাগুলো। কিন্তু চারদিক ঘিবে গুঁজে দেবাব ঝঞ্ঝাট—ঘরে ফুলস্পিড ফ্যানের হাওয়া, একই সঙ্গে দক্ষিণ খোলা জানালায় প্রকৃতিকেও যদি পেতে হয়, দেয়াল ঘেঁষে এমনভাবে এসে পড়েছে এক দিকটা, কারুরই ঠ্যাং ঢোকে না ওই ফাঁকটুকুতে। বাইবে থেকে তিন দিকে গুঁজে দিতে হয় তাড়াহুডোয। ভেতর ঢুকে পড়তেই হয় বাকিটুকুব জন্যে। অবৈধ প্রবেশ নয়। মাছ খাওয়ার নিয়ম নেই যাদেব, মাছের পুকুরে তারাও নাইতে পারে। দোষেব কিছু নেই। হামা দিয়ে দিয়ে চতুষ্কোণে মশারি গুঁজে দিতে দিতে কাদামাটিব চেয়েও নরম তোশক আর জাজিমে হাঁটু ডুবে যায়, হাতের তেলো ডুবে যায, পা ডুবে যায়। টাল সামলে এগনোও এক মস্ত ঝামেলা। ঢলে ঢলে পড়তে চায় শরীব।

ঝলকে উঠল। উৎকর্ণ হতেই হয়। বাইরের শব্দটা কোনো মানুষের? সিঁডিবাবান্দার ধাপে ইচ্ছে করেই শ্লিপার ঘষে ঘষে আওয়াজ তোলাব চেষ্টা করুর?

বাদবাকি মশারিটুকু গুঁজে দেবার জন্য একা ঘরে আরো কিছুটা সময দিতে, কি জানি কেন, সাহস হলো না আর। তাড়াহুডোয় বেরিয়ে এল বাইরে। টিকটিকির ডাক নয। অসভ্যের মতো ঢং ঢং করে এ-বাড়িতে দেযালঘড়ি বাজে না কোথাও। টিউববাতিটা জ্বলছিল। গা-ছমছম নিশুতির ঘরে কী এক আশ্চর্য ভয়। এ-বাড়িব নিঝুমে পা ফেলতে এমন ভয তাব ছিল না কোনোকালেই। কিংবা ভযটা আদৌ কোনো ভয় কিনা, অথবা তরাসে-আতঙ্কে নিজেকে বুঝে নিতে নিতে হঠাৎই একটা মরিয়া দুঃসাহস। দাঁতে দাঁত চাপল রাধা। শিরদাঁড়ায় সোজা থেকে শক্ত হতে চাইল নিজেব মতো করে। আজ সারাদিন শুধু খেলাই ছিল ওদের? শুধু খেলা? সবটা খেলাই হোক তাহলে।

মেঝেয় দাঁড়িয়ে অতি দ্রুত আঁচল টেনে ঘেমো গায়ে নাক মুখ গলা মুছে নিতে হয়। বুক ঢেকে কাঁধের আঁচল ঠিক রেখে, বেরিয়ে যাবার পথে হাত বাড়িযে ঘরেব আলো নিভিয়ে পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে তরতরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যাবে নিচে। তখন সাহেবের সামনে খাবার-ঘর থেকে ঝামটা মেরে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে! এ-রকম বেয়াদপিতে সাহেববাড়িতে চাকরি থাকে না কারুর। মায়ের কাছে তার বুঝ দেওয়া এখনও বাকি। মশারি গোঁজাটুকুও আধাআধি রইল তিনতলায়।

লোকটা যদি ডাকাডাকি হাঁকহুঁকিতে শোরগোল তুলে দেয় এত রাত্তিরে, সে-আরেক ঝকমারি। ছেলের অযত্ন একদম সইতে পারেন না মা। সে-হবে যা হবার। রাধা অনেকটাই বেপরোয়া। দোতলায় দেখা হয়ে যাবে দিদিমণিদের সঙ্গে। কারুরই সঙ্গেই কথা কইবে না সে।

দরজায় ভূত। কিংবা জানাই ছিল বাকিটুকু। পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে পা ফেলতেই পেটের ভেতর কী অসম্ভব খিঁচুনির টান, রক্তমাংসের শরীরে তড়িৎগতি ঝলকানি সামলে রাধা ঝিম মেরে গেল। প্রথম ঝটকায় পা বাড়িয়ে, পাশ কেটে, ছিটকে নেমে যাওয়ার মতো একটা সুযোগ তখনও ছিল। ঠিকমত পা ফেলেও হঠাৎ বেহুঁশ। পিছিয়ে এল। পেছনে অন্ধকার ঘর। সিঁড়িবারান্দার আলোয় কার্নিশের ধার ঘেঁষে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। নিজের ঘরের দোরগোড়ায় এসে ভেতরে ঢুকছে না কেন? এসেছে কখন? দাঁড়িয়ে আছে ঠায়? কতক্ষণ? এসেছেই যখন, চোখ তুলে তাকাচ্ছে না কেন? অথচ বাধা সরাসবি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারে। ভারি গোমড়া গোছের একটা মুখ। এমনটা তো ছিল না ডিনারে!

রাধা ভয়ঙ্কর কিছুর প্রতীক্ষায় ছিল। হালকা হাওয়ায় বাঁশপাতার আদলে ঠোঁট দুটো কাঁপছে তার। থরথর গোটা শরীর। অন্ধকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দু-দিকের পর্দা টেনে গলা অব্দি ঢাকল নিজেকে। পলক ছিল না চোখে। সরাসরি চোখেব পাতায় এমন পয়সাওলা ঘরের দামাল একজন জোয়ানমরদ মানুষকে ভেড়ুযার মতো দেখতে বড় বিচ্ছিরি লাগছে তার। রাধা যাঁর নখের যুগ্যি নয়।

সাড়া নেই শব্দ নেই কথা নেই। ঘন নিঃশ্বাসের ফসফসানি বড় তীক্ষ্ণ ছিল। সেই সন্ধের পর থেকে এই প্রথম দু'জনে মুখোমুখি। একা। আস্ত সাহেববাড়িটাই যেন উঠে এসে স্তব্ধ বোবা বনে গেছে তিনতলায় সিঁড়িবারান্দার চারপাশ ঘিরে টিউববাতিব ঝলমলে।

পর্দা সরিয়ে আচমকাই ঝাঁপিযে নামল বাধা।

লোকটাও মোচড় খেলো। ঘাডগর্দানা টানটান সোজা রেখেই সিঁড়ির মুখটা আগলে দাঁড়িয়েছে।

ডানে বাঁয়ে ফাঁকফোকর খোঁজার চেষ্টায় এপাশ-ওপাশ করে এবং পথ না পেয়ে বাধা এক ঝলক তাকাল চোখ তুলে—'পথ ছাড়ো...'

'শোন, শোন্ না একটু...'

রাধা, যথেষ্ট ভাবি গলায়—'বলছি তো, যেতে দাও। মা ডাকছেন...'

লোকটা হাত বাড়াল।

কী সব্বোনাশ! এক ঝটকায পিছিয়ে এল রাধা। বাড়িশুদ্ধু সবাই যখন জেগে-বসে আছে নিচে, দোতলায়, কী সাহস গো? কী চায়? আরো কত চাইতে পারে ডাকাবুকো একটা মানুষ? রাধু যদি এতই শস্তা বেওয়ারিশ, নিজের একটা কাণ্ডজ্ঞান ভযডর থাকবে না ঢ্যাঙা বয়সের এমন একটা লোকের? এতই যদি মেয়েমানুষের শখ?

সবই কেমন ঘুলিয়ে যায় মগজের ঘোরপ্যাঁচে। বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপাট। ফুটবল-খেলা ছিল আজ। ড্রিবলিং জানে না বাধা। দিনের শেষে সবই যদি খেলা হয়ে উঠল

হঠাৎ, ঘামে-ঘামে হাঁসফাসে পিছোতে পিছোতে দেযালেব সঙ্গে ঠেসে গিয়ে এক সময় সত্যি-সত্যি ফাঁদে আটকে গেল সে। আরো লম্বা করে হাত বাড়িয়েছে লোকটা। এবং তার হতভম্ব উন্মুখ দুটো চোখ পলক না ফেলে নিশানায় স্থির থাকে। হঠাৎই বেকাযদায় পড়ে খড়িস কি কেউটেব ফণাব দিকে তীক্ষ্ণ নজর বেখে যেমন করে নিজেব মরণ দেখে কেউ, ঠাণ্ডা নিঝুমে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কাঁপছিল বুকের তবাস। ফসফসানির বিকট আওযাজটা অদ্ভুতভাবে বাজছিল নিজেব কানেই। লোকটা আরো দু-কদম এগিযে এল। দু-জনের ফারাকটা আরো ছোট হয়ে আসছে। নাগাল ছুঁযে ফেলছে। সতর্ক চোখেব প্রাণ স্থিব রেখে বুঝি কোনো ওঝাগুণিন হযে উঠতে থাকে রাধা। নষ্ট মেয়ে কোনো ডাইনি? মারণ জানে। টুঁটি টিপে ধবতে পাবে মবণেব। তবে মরুক সোনাব-চাঁদ। মরুক মরুক...

এই রাত্তিরে ছাদেব ঘবে কেউ আসবে না, নিশ্চিত ভবসায, এমন তেজী আলোয, এত খোলামেলায, যদি এতটাই লাগামছাড়া হযে উঠতে পাবে একটা লোক, তবে এত এত বছরের চেনা-মানুষটা পুবোপুরি অচেনা হযে ওঠাব পর আব কোনো সংশয থাকে না। দেযালে পিঠ ঠেসে পিঠকোমর মাথা দেযালে দেযালে টানটান বেখে সোজা হযে দাঁড়াল সে। আঁচল টেনে গাল গলা নাক মুখ চোখ ঠোঁট থুতনি কপাল ঘষে ঘষে ঘাম মুছে সাফসুফ কবে নিলো। হাত দুটো অলসভাবে ঝুলে বইল দুদিকে। স্পষ্টই চেনা যায, প্রতিবোধেব বাসনা নেই। চোখ তুলে শুধু এক ঝলক তাকাল শান্তভাবে। চোখ বুজল। দাঁতে ঠোঁট চাপল। বুক চিতিযে সোজা শিবদাঁড়ায দাঁড়িযে থেকে, দেহেব আগুনে মাথা নুয়ে আনতভঙ্গিতে দ্বিধাশূন্য নির্বিকার। নিবেদনে উন্মুখ। তবে হোক, যা হবাব। বুঝি এবার সে নিজেও প্রস্তুত।

কী আশ্চর্য্য! কিছুই কবল না লোকটা। ডান হাতটা টেনে নিযে কী যেন গুঁজে দিতে চাইল জোব করে। দাঁতমুখ খিঁচিযে হাতেব মুঠো আবো শক্ত কবে চেপে বাখতে চাইল রাধা। কিছুই তাব গ্রহণেব জন্য নয। কিংবা যখন তাব হাতটা ছিনিযে নিযে তাগড়াই জোযান একজন পুরুষমানুষ সবলে চেপে ধবে শক্ত মুঠোব আঙুলগুলো একটি একটি করে খুলে নিতে চাইছে, কবজিতে প্রবল চাপ, অসহ্য যন্ত্রণা—ডান হাতকে বাঁচাতে তাব বাঁ হাতটাও জড়িয়ে যায় মাবাত্মক খেলায। পিঠশুদ্ধ মাথাটা ঝুঁকে আসে লোকটাব বুকেব কাছে। মাথার এলোখোঁপা ভেঙে পডল, খসে-পড়া কাঁধেব আঁচল সামলে নেবার বাড়তি হাত নেই। কোনো শব্দ নেই বাক্যি নেই, যন্ত্রণায কাতবধ্বনি নেই। দম-চাপা সর্বশক্তি প্রতিরোধে যখন আব রেহাইও সম্ভব নয়, লোকটাকে সজোবে ধাক্কা মেবে বেবিযে যেতে চাইল প্রাণপণ মরিয়া চেষ্টায। খোলামেলা আলোয ধস্তাধস্তিই কিছুটা। আশ্লেষে লেপটে গেল লোকটাব বুকেব তলায। ঢাকাচাপা সবই যখন উদোম হযে আছে আগে থেকেই, লোকটা কাগজের খশখশ কী-সব গেঁথে দিলো ব্লাউজের ভেতব হাত ঢুকিযে ছোটজামার খাঁজে। বুঝি বাড়তি একটু মজাও লুটে নেওয়া যায এই ফাঁকে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! তাকে আগলে রাখল না। ছেড়ে দিলো? এক লাফে পালিয়ে গেল ঘবেব ভেতব?

এবং এভাবেই ছাড়ান পেযে যাওযাব বিস্ময়ে বিহ্বল রাধা সিঁড়িবাবান্দার তলায, একা, হাঁপাচ্ছে তখনও। নাকেমুখে শ্বাস টেনে টেনে বুকেব তোলপাড়ে হাঁপাতে থাকে।

নিজের মধ্যে নিজেকে আবার ফিরে পেয়ে গা-গতর কাঁপিয়ে পা থেকে মাথা অব্দি এমন চনমনিয়ে উঠল একটা বুক-পোড়ানি জ্বালা, অসহায় ক্রোধের বিকারে অন্ধকার ঘরের দিকে তাকাল একবার। ঘরে ঢুকে এখনও আলো জ্বালেনি লোকটা! বাইরে সিঁড়ির মুখে আলোয় দাঁড়িয়ে ঢেউ-কাঁপানো নিঝুম পর্দার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠছে যন্ত্রণায়, অবোধ কান্না ঝাঁপিয়ে নামছে শরীরে। দাঁতে ঠোঁট চেপে পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আগে ওয়াক-থু ঘেন্নাও সে উগরে দিতে পারছে না কোনোদিকে। থুতু ছুঁড়তে পারে না সাহেববাড়িতে। ভাতের-ঘরে মেয়েমানুষের এত রাগ থাকতে নেই। ঢাকাচাপা থাকলে কে আর খোঁজ রাখে কার? জানাজানি হলেই নষ্ট মেয়ের কেচ্ছা? লাথিঝাঁটায় দূর করে দেওয়া যায় তাকে। ব্লাউজের তলা থেকে কাগজগুলো তুলে এনে নাকের ডগায় রেখে, মুঠোয় মুচড়ে আরো বেশি কান্নায় ঘরের ভেতর ছুঁড়ে মারতেও পারে না বকশিসের বেআব্রু।

এবং যা পারে, সিঁড়ি ভেঙে তরতরিয়ে গড়িয়ে নেমে যেতে থাকে নিচে। সাহেববাড়ির সিঁড়ি তার পায়ে পায়ে চেনা—বারো ধাপ নেমে এসে বাঁক ঘুরলে আবার বারো। গোনাগুনতির হিসেবটা অনেক পুরনো। ইজের আর ছেঁড়াফাটা ময়লা ফ্রক পরে যেদিন প্রথম এসেছিল, তখনকার। সাহেববাড়ির ইটপাথর পাল্টায়নি ছিটেফোঁটা। মানুষগুলোই পাল্টে গেছে সবাই। এবং আজ, এক সন্ধ্যায় এক ধাক্কায় অনেক...অনেকগুলো বছরের বয়স বেড়ে যাবার পর বুঝে গেছে—বয়সে বয়সে বদলে গেলে মেয়েরা অন্যরকম হয়ে যায়। সমান বয়সের মাপে দিদিমণিদের গায়ে গায়ে একই সঙ্গে পরতে পরতে বদলে যেতে যেতে কোনো হুঁশই ছিল না এতদিন, তার বদলে যাওয়ার নিয়ম আলাদা।

হুঁশিয়ার থাকতেই হয়। সতর্কতায় সিঁড়ি ভাঙতে হয়। অসাবধানে পদস্খলন যদি, রাতদুপুরে হৈচৈ উঠলে রক্ষে নেই সাহেববাড়িতে। নষ্ট মেয়ের মরণ ভালো।

দোতলায় লাউঞ্জে যখন কেউ কোথাও নেই, সাড়াশব্দহীন নিঝুমে ইতিউতি তাকিয়ে, বুঝি চারপাশে বোবা দেয়ালের চোখকানগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ভয়। ওপাশে মায়ের ঘরে আলো জ্বলছে। দিদিমণিরা এখনও ঘুমোয়নি কেউ। টিভির পালা শেষ হলে সাহেববাড়িতে নিশুতি নামতে দেরি হয় না খুব বেশি। আশ্চয্যি। খাবার-ঘর থেকে বিচ্ছিরিভাবে সেই কখন বেরিয়ে এসেছে সে। একবারটি ডাকল না কেউ তাকে? কোনো ডাকখোঁজ নেই? হাঁটু কাঁপছে তার, পেটেবুকে অসম্ভব খিঁচুনি। একটা ভয়ের কাঁটা দেহের রসরক্ত গায়ের চামড়া সব টেনে নিয়ে শুষে নিয়ে খামচে ধরে আছে গলার নলি। বুঝি জানাজানি হয়ে গেছে সব। সবাই জেনে গেছে। ঘেন্না আর থুতু আর গলাধাক্কা এরপর। বুকের ছমছমে হাহাকার শূন্যতায় আকাশকুসুম অলীক হয়ে উঠতে থাকে দুটো মাত্র ওয়ালল্যাম্পের ছায়া-ছায়া লাউঞ্জের বিশাল চত্বর। সোফাসেট টিভি টেলিফোন আলমারি অ্যাকুরিয়াম সবই চাঁদনি রাতে দেশগাঁয়ের বনবাদাড়ে রাংচিত্তির ফণিমনসার মতো নিথর কালো-কালো। যে-কেউ বেরিয়ে আসতে পারে এক্ষুনি। ধরা পড়ার ভয়! বাধা রুদ্ধশ্বাস সন্ত্রাসে নাকেমুখে আঁচল চেপে, পা টিপে টিপে, একা, গাঁয়ের শ্মশানঘাটে তেঁতুলতলা ডিঙোয়। সাবধানে। মালিকের ঘর তার। সে গাজ্জিয়ান

খোঁজে। মাথার ওপর চাই একজনাকে, তাব দুঃখু চেনার জন। শাসন চায়। সে আজ শাসনের রকমফের বোঝে।

সজ্ঞানে কোন পাপ করিনি গো ভগবান...নিজেরই দুঃখু-কান্না বুঝি পরদ্রব্য কিছু। বুকের তলায় সংগোপনে লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণায় চাপা ফোঁপানিটা থেকেই যায় নাকেমুখে। এবং চোরের মতোই আলোআঁধারিতে গা ঢেকে ধড়ফড়ানি ধুকপুকানি ডিঙিযে এসে যেখানে মুখের আঁচল ফেলে একটু হাঁপ ছেড়ে দাঁড়াতে পারে সে, রান্নাঘরে, মেঝেতে ভাতের থালা নিয়ে হাঁটু উঁচিয়ে বসে দলায় দলায গিলছে গোপালের-মা। পাশেই গামলায় ঢাকা দেওয়া আছে তার জন্য রাতের খাবাব। সাহেববাড়িব ভাতে বোধ হয় এই প্রথম অরুচি তার। ডাইনি বুড়ির তেরচা চাউনিকেও ভয়। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না রেখে নাকমুখেব আঁচল-চাপায় পাশ কাটিয়ে ছিটকে সরে এসে, কী যে কবছে, কেন করছে--কিছুই না বুঝে, ছুটতে ছুটতে নিজেব ঘবে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকারে! তক্তপোশটা কাতবে উঠল। সস্তা খেলার-পুতুল মাটির-পুতুল ভেবে তাকে যদি আছড়ে ভাঙতে চাইল গো কেউ, করবেটা কী সে অসহায় একা একটা মেয়ে? বাতেব নিঝুমে একা ঘরে জ্বালানিপোড়ানির চিতায় উপুড় হয়ে শুয়ে যদি বুক ভাসিয়ে খোলসা করে কাঁদতেও না পারে, আরো বেশি যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা ভেতরে ভেতরে কামড়ে কামড়ে মাবে। কিংবা এই বেহুঁশ খামচানিটা বুঝি আগে থেকে ছিলই হাড়েপাঁজবায় বুকের গর্তে। পাপ খোঁজে। নিজের পাপ? চেনে না নিজেকেই। উপুড় হয়ে পড়ে তক্তপোশে বুক পেতে, বুঝি ঠাকুরেব পায়ে মাথা-কোটা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতভঙ্গি অথবা আপশোস—দুটো হাত লম্বা কবে দু'দিকে ছড়িয়ে খাবলেখুবলে ধরতে চায় কিছু। নাইলনেব কাঠিতে বোনা টানটান মাদুর হাতের মুঠোয় নাগালে আসে না। আঙুলের নখগুলো, আঙুলগুলোই ছড়ে ছড়ে যেতে চায়। না কি পুতুলটার গায়েই ফাটল ছিল মস্ত বড়? কেউ ভাঙার আগেই ভেঙে পড়তে চাইছিল? শেষমেশ দাঁড়িয়েও গিয়েছিল নিজের ভাঙনে। আইঢাই বাড়ে। কান্নার হিক্কা বা অবুঝ গোঙানিটা ঢাকাচাপা মানে না। নদী যেমন ডানে-বাঁয়ে নিজের পাব ভেঙে ভেঙে নিজের জল নিজেই ঘোলা করে কিংবা পানাডোবায আবশি পায় না আকাশ—রাধা ওর মরণদশায কান্নায় কান্নায় ফোঁপানিতে জলে-জলে ভেজা নাক-মুখ-গাল-থুতনি খসখসে শক্ত মাদুরে আছাড়িবিছাড়ি ঘষে ঘষে নিজের বুঝ বুঝে নিতে চায। দুঃখুকষ্ট সওয়া যায় অনেক। কিন্তু বেইমানি? আহা বে মরদ। শেষ অব্দি কটকটে একটা বাগ, গা চটকানো এক ধরনেব বিচ্ছিরি ঘেন্না। এমন তাগড়াই জোয়ান একটা লোক? মায়েব খোকা, বাপের পয়সায় ফুলবাবু! কোন মুবদ নেই তো হ্যাংলাব মতো ছুঁকছুঁক কবে কেন গিধড়? লোলা ঝরছে তো সাহস নেই বুকের পাটায়? আসলে একটা ভেড়ুয়া। কাপুরুষ।

পবদিনই সাংঘাতিক এক কাণ্ড সাহেববাড়িতে। রাধাও জানে, রাজাবাদশাব কেল্লায় ট্যাকেব জোবেই খেলতে হয় জুয়া। সে-অনেক...অনেক টাকার খেলা।

সাহেবসুবো ধনী মানুষদের পাড়ার নিয়মই আলাদা। কোনো ডাস্টবিন থাকে না

রাস্তায়। ঘন সবুজ গাছপালায় সুমনোহর আদুরে ফুটপাতে ময়লা ফেললে, যাঁদের বাড়ির সামনে পড়বে, যদি চোখে পড়ে যায় কারুর, তুলকালাম হট্টগোল। সাহেবদের ঝগড়ায় গলাবাজি কম। টেলিফোনে-টেলিফোনে গালমন্দ। নয়তো থানা-পুলিশ। ইজ্জতের দাম বড় চড়া।

এমন ঝকঝকে চকচকে মাজাঘষা সব বাড়ি! ঘরসংসার যখন, ময়লা তো জমবেই প্রতিদিন। সাহেববাড়ির নোংরা জঞ্জালেরও একটা ছিরিছাঁদ থাকে। তাকে গুছিয়েগাছিয়ে যত্নে রাখতে হয়। আরো বেশি পরিপাটি যত্নে ফেলে দেওয়াই রোজকার কাজ।

সাতসকালেই দু-চাকার ছোট একটা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে পাড়ায় ঢুকবে জমাদার। সব বাড়ির ফটকের সামনে এসে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে গাড়ির ঘাটাং ঘাটাং বাজাবে লোকটা। দোতলা তিনতলা চারতলা বাড়ির অন্দরমহলে কান পেতে থাকেই কাজের-মেয়েরা। ছুটে ছুটে আসবে সবাই। বালতি-বালতি নোংরা ঢেলে দিয়ে যাবে।

এ-ও রাধার নিত্যকর্ম। সবটা নয়, আধাআধি। বাকিটুকু সদাপ্রহরী নন্দলালের।

লাল রঙের হলুদ রঙের দুটো প্লাস্টিকের বালতি থাকে সাহেববাড়ির রান্নাঘরে এক কোণে। সারাদিন ধরে যা-কিছু আবর্জনা তৈরি হয় রান্নাবান্নায়—আনাজের খোসা, ফলের খোসা, মাছের আঁশ-পিত্তি, ফাটা ডিমের খোলস, চায়ের-পাতা দু-বেলার এঁটোকাঁটা হাবিজাবি সাতসতেরো আরো কত কী, সবই জমা হয়ে ওঠে বালতিতে। ভোরবেলা দুধ আনতে যাওয়ার আগে রাধাকে বালতি দুটো দোতলা থেকে নামিয়ে এনে রেখে দিয়ে যেতে হয় সদর দরজার ধার ঘেঁষে একপাশে। জমাদার এলে নন্দলাল গাড়িতে ঢেলে দেবে। একতলার কলতলায় বালতি দুটো ভালমতো ধোয়াধুয়ি করে আবার পৌঁছে দিয়ে আসবে দোতলায় রান্নাঘরে। যা দুর্গন্ধ, নাক চেপেও রেহাই নেই। পেটের নাড়িভুঁড়ি পিত্তি কাঁপিয়ে বমি উগরে উঠতে চায় বুড়োর। এবং সেটা প্রতিদিনই।

এবং সেদিনও জমাদার এসে যাওয়ার পর বাঁ-হাতে ধুতির কোঁচা টেনে তুলে নাক চেপে ডান হাতে বালতি নিয়ে এগিয়েছিল নন্দলাল। এতটা অভক্তিতে যথাযথ কর্তব্যপালন সম্ভব নয় যেহেতু, পেল্লাই ভারি বালতি ঊর্ধ্বে তুলে সবটা ঢেলে দিতে দুটো হাতই লেগে যায়। এবং সেদিনও যথারীতি দু-হাতে বালতিটা উঁচু করে ধরে উপুড় করে ফেলে দিয়েছিল প্রায়, আকস্মিক চমকে থমকে গিয়ে ঝাঁকুনি খেলো।

দেখে ফেলেছে জমাদার লোকটাও। গোল-গোল চোখে—'ক্যায়া বাবু, হাতসে পড গৈ কা? আপ্‌কো হাত ত সোনাকে হাত লগত হও...'

তপন নামে যে-ছোঁড়া রোজই গাড়ি ধুয়েমুছে দিয়ে যায় ভোরবেলা, বালতি ভরে জল নিয়ে ঢুকছিল গ্যারেজের ভেতর। থমকে দাঁড়াল—'কী দাদু, নাক সিঁটকে ময়লা ফেলছেন, দেখছেন কী হাঁ করে?'

খিঁচিয়ে উঠল নন্দলাল—'যা যা, তুই তোর কাজ কর। ফ্যাঁচফ্যাঁচ করবি না তো মেলা...'

কিন্তু নন্দলাল তখন এক ঘনঘোর বিস্ময়ে ধাঁধায়। অসম্ভব দুর্গন্ধ। জমাদারের ঠেলাগাড়িটা তো আছেই সামনে। পায়ের কাছে বালতিতে সারারাত ধরে পচেছে মাছমাংসের ফ্যালনা আর এঁটোকাঁটার ছাইপাঁশ। এরই মধ্যে নোংরায় মাখামাখি জলজ্যান্ত

একশো-টাকার নোট কতগুলো? ভাঁজে ভাঁজে মনে হয়, দুটো-একটা নয়। একসঙ্গে গোটা কয়েক। এ কী করে হয়? কে ফেলল? অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার তীব্র বিবমিষায় বালতি ছেড়ে চলে যেতে পারছে না বেচারি। তুলে নিতেও পারছে না। ঠাকুরের-সেবা স্নানাহ্নিক হয়নি এখনও। সাতসকালেই যদি এমন বিচ্ছিরি নোংরাগুলো হাতে ঘাঁটতে হয়?

'বাপ সেরা, সেবা ভাই, সবসে সেবা রুপেয়া....' ভেজা-লুঙ্গি ভেজা-জামা, সারা গায়ে ভিজে বেরিয়ে এসেছে তপন। খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি, মহাফুর্তি। জমাদারের দিকে তাকিয়েই ওর অদ্ভুত খিঁচুনি—'এ-ত শালা আচ্ছা উজবুক। আরে পেন্নামির থালায় পয়সা পড়লে ব্যাটা বামুনঠাকুর সব তুলে নেয়। লোট বলে কথা। রাস্তায় পড়েছে কি ডাস্টবিনে গেছে, এ-শালা তোর নয়তো নেড়ি কুত্তার? নে তোল, তুলে নে।'

টাকাগুলো নিঃসন্দেহে এ-বাড়ির, এত টাকা ডাস্টবিনে ফেলার মুরদ আছে যাঁদের। নোটগুলো তড়িঘড়ি তুলেই ফেলল নন্দলাল। টাকা মা-লক্ষ্মী। টাকা গঙ্গাজল। তার শুদ্ধি-অশুদ্ধি নেই। এবং তুলে নিয়ে বাঁ-হাতের মুঠোয় রেখে চটজলদি বালতিটা উপুড় করে দিলো জমাদারের গাড়িতে। আগে তো দূর হোক উটকো লোকটা। ব্যাটা আপদ।

ভিড় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পথচারী দু-চারজন। স্তম্ভিত বিস্ময়—একশো-টাকার নোট হাতের ময়লা? কৌতূহলের চোখগুলো মাথা উঁচিয়ে সুদৃশ্য বাড়িটাকেই দেখল রক্তমাংসের সুন্দরী যুবতীমোহে—এরা কি বাচ্চা ছেলের পাছাও মোছে নাকি নোট দিয়ে? শালাদের বহুৎ পয়সা...

বুড়ো নন্দলালকেই শুনতে হয় কথাগুলো। নক্ষত্র চেনে না সপ্তর্ষিমণ্ডল।

নেহাৎই কাকতালীয়। কে জানত, ঠিক তখনই মর্নিং-ওয়াক থেকে গা ঘামিয়ে টাইগারকে নিয়ে ঘরে ফিরবেন খোদ সাহেব? হাতে ডোবারম্যানের শেকল। দরজায় পৌঁছে ছেড়ে দিয়েছেন হাতের বল্গা। লাফাতে লাফাতে ভেতরে ঢুকে গেল জানোয়ারটা। প্রগঝম্প ঘেউ-ঘেউ। লাফঝাঁপে রঙ্গরস করছিল যে-ছোকরা, তপন, সাহেব দেখেই ঢুকে পড়ল গ্যারেজে।

রাস্তায়, সদর থেকে কিছুটা দূরেই ছিল নন্দলাল। টাকাগুলো দেখছিল। খেয়ালই করেনি, পেছনের দিকে কখন এসে পড়েছেন সাহেব। কুকুরটার চিৎকারে চমক ভাঙতেই ঘুরে দাঁড়াল সম্ভ্রমে।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা গোনাগুনি কেন? ঘরে গিয়ে করতে পারো না এসব?

সাহেবদের গর্জনে আওয়াজ থাকে না। ভ্রূকুটিতেই দুনিয়া কাঁপে। ভ্যাবাচাকা নন্দলাল। হাতে পাঁচ-পাঁচটা একশো-টাকার নোট। মাছমাংসের ঝোলই হবে হয়তো। ছোপ-ছোপ লেগে গেছে কোণের দিকে অল্প একটু। নোংরাও আটকে ছিল ছোট করে। হাতে ঝেড়ে-ঝেড়ে যায় নি। আলতো করে আঙুলের টোকাও দিতে হয়েছে নখের ঘষায়। গা-ঘিনঘিনানির অবকাশ নেই। গোলমেলে টাকা এবং গা ঘেঁষেই টাকার মালিক খোদ সাহেব! বেচারি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল—'কিছুই তো বুঝে উঠতে পারছি না...'

'কেন? কী হয়েছে?'

'এই...এই টাকাগুলো এই বালতির মধ্যে ছিল।'

'বালতির মধ্যে? এই...এই রাবিশের মধ্যে? মানে?'

সাহেবও টাকায় চমকায়? জনগণ সেই আজব চমকানি দেখল।

ভ্রূ কুঁচকে, পায়ের কাছে ফেলে-রাখা শূন্য বালতি আর নন্দলালের টাকায় কার্যকারণ খোঁজেন নিশীথরঞ্জন। ভারি গলায়—'তুমি এসো, এসো আমার সঙ্গে। ভেতরে চলো।'

কম কথার মানুষ নিশীথরঞ্জন। ঘুরে দাঁড়িয়েই গটমটিয়ে লম্বা পা ফেলে দ্রুত ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতর।

জনতা খাবিজ্ঞ। এবং নন্দলাল, এক হাতে ছোট-বড় দুটো নোংরা বালতি, অন্য হাতে নোংরা টাকা নিয়ে নিতান্তই গোলাম, মনিবের পদাঙ্কে পা ফেলে এগোয়। নোটগুলোয় এঁটোফেটো যেটুকু লেগে ছিল, দাঁতে-চিবানো মাংসের ছিবড়েটিবড়েই হবে নির্ঘাৎ, ঝেড়ে ফেলে দেবার পরও একটু আধটু লালচে দাগ লেগে গেছে সবগুলোরই গায়ে। ওপরের নোটটা একেবারেই ল্যাটাপেটা। সাদামাটা জলে কিছুই উঠবে না। সাবান-জলে ঘষলে কী থেকে কী হয়ে আরো চেবড়ে যাবে, কে জানে? যত তেজীই হোক, আসলে তো কাগজ! ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল। নইলে জঞ্জালের সঙ্গে মিশে সবটাই চলে যাচ্ছিল মেথরের গাড়িতে। খুব কষে পচাই গিলত লোকটা। ও-ব্যাটার ভালো হলো কি মন্দ হলো, চুলোয় যাক। বুড়ো-মাথায় চরকি ঘোরে। ঘুরেফিরে একটাই কথা মগজে পাক খায়—এতগুলো টাকা এই বালতিতে পড়ল কি করে? এল কোত্থেকে? এমন যে সেয়ানা মেয়ে রাধু, বালতি দুটো গেটের সামনে রেখে যাবার সময় ওরও চোখে পড়ল না?

এবং এই একই প্রশ্নে, দোতলায় উঠে ভোরবেলার নিস্তরঙ্গ সংসারে ছোট করে একটা ঢিল ছুঁড়লেন নিশীথরঞ্জন। কিছুমাত্র উত্তেজনা নেই। শান্তভাবেই ডাকলেন স্ত্রীকে—'হতে পারে অনেক টাকা তোমাদের। প্লেনটি...প্লেনটি অব মানি ইউ মে হ্যাভ। বাট অল ফর হোয়াট? অ্যান্ড হোয়াই? সেগুলো নষ্ট করবারও তো ভদ্রগোছের রাস্তা আছে অনেক। কোথাও মন্দিরে গিয়ে প্রণামী দিতে পারো, আশ্রমফাশ্রমে ডোনেশন দাও। পুণ্যি হবে। পাড়ার ছেলেদের ডেকে ওদের ক্লাবেটাবে দাও না কিছু কিছু করে। নামডাক হবে খুব...'

মাথামুণ্ডু কিছুই থই পাচ্ছেন না কিরণময়ী। কিন্তু স্বামীকে তিনি চেনেন। চোখের দিকে তাকিয়েই চিনে নিতে পারেন সিস্টোলিক-ডায়াস্টোলিক শোণিত স্তর। তাকালেন সভয়ে—'এই সক্কালবেলা তোমার আবার কী হলো? কী বলছ এসব?'

'আমি কিছুই বলছি না। নন্দলাল আসছে। যা বলার বলবে।'

ব্যস, এটুকুই। কোনো দিকে না তাকিয়ে এক কোণে সোফার দিকে এগোলেন নিশীথরঞ্জন। মর্নিং-ওয়াকে দীর্ঘ হেঁটে আসার পর পাখার তলায় বসে কেডস আর মোজা খুলে খানিকটা বিশ্রাম তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস। অতঃপর শার্ট-গেঞ্জি পাল্টে নিয়ে চা-পান প্রাতঃক্রিয়া ক্ষৌরকর্ম স্নান ইত্যাদির শেষে পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে অফিসে বেরোবার আগে একতলায় নিজের চেম্বারে বসে ঘণ্টা দেড়-দুই সংবাদপত্র পাঠ এবং বিবিধ কাজকর্ম।

এবং আজ স্বামীর এবম্বিধ অত্যদ্ভুত আচরণ, বলা বাহুল্য, কিরণময়ীর রক্তচাপেও

অহেতুক প্রতিক্রিয়া গড়ে তুলতে পারে। হঠাৎ-ই কী সব আগডুম-বাগডুম কথাবার্তা মানুষটার? এমন তো হয় না কোনোদিন! অস্থিরতা বাড়ে। অধস্তনের জন্য প্রতীক্ষা নয়। প্রবল দাপটে নিজেই এগোলেন বারান্দার দিকে। রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে লম্বা হাঁক —'নন্দ, নঅঅন্দ, করছ কী তুমি? ওপরে এসো। এক্ষুনি...'

বেচারি নন্দলাল। নিচের কলতলায় ফেনায়েলের জলে বালতি দুটোর ধোয়াধুয়ি সেরে ওপরে উঠে আসতে কিছুটা সময় লাগে। আজ আবার অচ্ছুৎ বালতিগুলোর সঙ্গে অচ্ছুৎ নোটগুলো। আধাআধি সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই সিঁড়িবারান্দাব মুখে চড়া গলায় স্বয়ং মা-ঠাকরুণের হামলা—'কী হয়েছে বলো তো নন্দ। ব্যাপারটা কী? সাহেব বলেছেন কী নাকি টাকা...'

'হ্যাঁ গো মা, ময়লা ফেলতে গিয়ে দেখি, বালতিটার ভেতর এই একশো-টাকার নোট পাঁচ-পাঁচটা...'

'অ্যাঁ! কী বলছ? পাঁচশো টাকা হতকুচ্ছিত নোংরা ওই বালতির মধ্যে? কী বলছ তুমি?' স্তম্ভিত কিরণময়ী। শিলাভূত প্রায়—'কী অদ্ভুত কাণ্ড! এ-তো রান্নাঘরে থাকে। ছেলেমেয়েরা তো কোনো হদিশই জানে না সেটার। তাহলে ওখানে ফেলল কে এতগুলো টাকা?'

'সেই ত কথা গ মা। এতগুলো ট্যাকা।'

'হুঁ, ঠিক আছে। সে-আমি দেখছি। তুমি যাও। ঠিক জায়গায় রেখে এসো বালতিগুলো...' রহস্যটা যত জটিলই হোক, নিজের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আত্মস্থ হতেই হয় ঘরের গিন্নিকে। সংযত ভ্রূভঙ্গে—'আর শোনো, বালতি রেখে এসে দিদিমণিদের ঘবে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তো ওদের। ওপরে গিয়ে দাদাবাবুকেও আসতে বলবে। বাবুর তো বোধ হয় ঘুমই ভাঙেনি এখনও। সাহেবের কথা বলবে। সাহেব ডাকছেন। এক্ষুনি নেমে আসতে হবে নিচে। এক্ষুনি...'

রঙিন হাউসকোটে আঁটোসাটো মেমসাহেব। ছুটোছুটিতে অক্রান্ত থাকতেই হয় তাঁকে। কেন না, বিষয়টা গুরুতর। শ-পাঁচেক টাকা হয়তো এমন কিছু নয়। ও-রকম কিছু টাকা তো বাজে-খরচা হয়ে যাচ্ছেই হরবখৎ। কিন্তু তাই বলে ময়লা ফেলার বালতিতে? রক্তের ধাক্কা টং করে চড়ে যেতেই পারে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। বাজে-খরচও না-হয় খবচাই একধরনেব। ছেলেমেয়েদের শখ-আহ্লাদ মেটে দু-চারটে। কিন্তু এ-আবার কেমনতরো সাধ? ঘরের লক্ষ্মী আঁস্তাকুড়েয় ফেলে দিতে হয়?

ফিরে এলেন, যেখানে জুতোমোজা খুলে সোফার কুশনে পিঠ ঢেলে সবে খবরের-কাগজটা দু-হাতে নাকের ডগায় তুলে মুখ ঢেকেছেন নিশীথরঞ্জন। স্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ বা তাঁর ছুটোছুটি চঞ্চলতায় কিছুমাত্র সহমর্মিতা নেই।

'সত্যি, এ-তো দেখছি তাজ্জব ব্যাপার...' এলোমেলো কিরণময়ী কিছুটা আপন মনেই—'এতগুলো টাকা ওখানে গেল কী করে? এ-তো আর দু-চারটে কি দশ-বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ টাকা নয় যে কোথাও পড়ে ছিল, আনাজপাতির-খোসা কি আর কিছুর সঙ্গে মিশে ভুল করে চলে গেছে। সে-তো ফেলে রাধু, নয়তো গোপালের-মা।

এত টাকা ওরা কোথায় পাবে? আর পেলেও পাঁচশো টাকা ওরা ভুলে যাবে? সে-হয় কখনও?'

কাগজে মুখ-ঢাকা লম্বা চওড়া ভারভারিক্কি মানুষটা ঘরের ভেতর এক কবন্ধের মতো। কোনো সাড়া নেই।

অথচ স্বামীর সদাশয় নির্লিপ্তিতে আরো বেশি অস্বস্তি বাড়ে। অশান্ত কিরণময়ী। গোয়েন্দা নন। শারদীয় সংখ্যার পত্রপত্রিকায় এমন কিছু রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী হয়তো পড়েছেন কখনও। টিভি সিরিয়ালেও এসব থাকে মাঝে মাঝে। যত লোমহর্ষকই হোক, সবই খুনখারাপির গল্প। মনেও থাকে না কিছু। তাছাড়া এখানে তো টাকাটা চুরিও করেনি কেউ। ময়লার বালতিতে পাচার হয়ে যাচ্ছিল কোথাও, এমনও নয়। ছেলেমেয়েরাই যদি বেখেয়ালে কেউ কিছু করে থাকে, ও-ছাই রান্নাঘরের নোংরা বালতিটায় ফেলতে যাবে কেন মরতে?

ঘোরপ্যাঁচে মাথাটা ঘোরে। রান্নাঘরের দিকেই এগোলেন পায়ে পায়ে। যে-যাই-বলুক, এখন এই মুহূর্তে রাধাকেই চাই তাঁর। সংসারের আঁটোসাটো রাঁধুনি কোথাও কিছু নড়বড়ে হলে ও-মেয়েকে তাঁর খুবই দরকার। দরকার, কেন না ময়লা ফেলার বালতিটা ও-ই দেখেছিল প্রথম। রেখে এসেছিল একতলায়।

এগোতে হয় না বেশি দূর। লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে ডান দিকের বাঁকে, যেখানে দেয়াল ঘেঁষে আড়ালে আড়ি পেতে ছিল রাধা, একেবারে মুখোমুখি সংঘাত—'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস তুই? কোনো কাজ নেই তোর?'

রাধা জানে, এবার কঠিন লড়াই। চোখের জল শুকিয়ে স্ফটিক। গোমড়া মুখে এখন শুধু দুটো চোখ...ড্যালাড্যালা দুটো চোখই একমাত্র সম্বল।

'তুই চল্, চল দেখি আমার সঙ্গে...' শুধু চোখের ইশারাতেই যার ডানদিক-বাঁদিক, এগনো-পিছনো, অবাক কাণ্ড...যা হয় না কখনও, হ্যাঁচকা টানে টেনে নিয়ে ওর পিঠে এমন জোরে ধাক্কা মারলেন কিরণময়ী, রাধা সামনের দিকে গিয়ে পড়ল। অর্থাৎ এগুতে হবে ওকে, মা যেভাবে চাইবেন। এবং বিষোদ্গার—'কাল থেকে বড় বাড় বেড়ে গেছে তোর। সাপের পাঁচ পা দেখে ফেলেছিস রে নচ্ছার? কী পেয়েছিস? কী ভেবেছিস তুই? তোকে ছাড়া চলবে না আমার?'

ঘনিষ্ঠ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ক্রোধ আর উষ্মার প্রতিহত বাক্যসমষ্টি, বুঝি দুঃখকাতরতার কান্নাই এক ধরনের, গুমরে গুমরে ওঠে। এবং রাধা তাড়া খেয়ে খেয়ে, মন্থর পা ফেলে পৌঁছে যায় অকুস্থলে, যেখানে খোদ-মালিক, সাহেব, এক কোণে চুপচাপ। সাহেবকেই সবচেয়ে বেশি ভয়। দারোগাবাবুর মতো।

মুনমুন আর বুলবুলিও পৌঁছে গেছে। আরো বেশি জ্বলে উঠলেন কিরণময়ী। রাধার ওপরই বিষ ঢালার নিরাপদ আক্রোশে— 'কী হলো? ঠ্যাটা মেরে দাঁড়িয়ে আছিস বজ্জাত মেয়ে। বল্ বল্ কিছু। সকালে ময়লার বালতিটা নিচে রেখে আসার সময়, ওতে যে পাঁচশো টাকা ছিল...পাঁচটা একশো-টাকার নোট, দেখিস নি তুই? কিছু বলিসনি কেন? কে ফেলেছে? কোত্থেকে এল এতগুলো টাকা? বল্...'

'হোয়াট ইজ দিস? এসব...এসব কী হচ্ছে?'

সকলেই চমকে তাকিয়েছে।

মুখ থেকে কাগজ সরিয়ে যেভাবে ফুঁসে উঠেছিলেন নিশীথরঞ্জন, সোজা হয়ে বসে হঠাৎ মিইয়ে গেলেন— 'নাহ, তোমার ট্রেনিং যখন, হতেই পারে। সারদা মা শ্রীরামকৃষ্ণ বানিয়ে নিয়েছ সবাইকে। টাকা মাটি মাটি টাকা। ওর এক মাস দেড় মাসের মাইনে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে? ভেরি মাচ ন্যাচারাল। নাথিং বং ইন ইট। অবকোর্স সি ক্যান ডু ইট...'

কিরণময়ীর সর্বাঙ্গে দহন। বেসামাল রাগে খিঁচিয়ে উঠতেও গলা চিরে যায়— 'বেশ তো, বাধু ফেলেনি। কিন্তু তাই বলে টাকাগুলো তো উড়ে গিয়েও পড়েনি ওখানে। আমি ফেলিনি, তুমি ফেলোনি। কেউ ফেলেছে নিশ্চয়ই...'

'সে-কি ওই বাধু?'

'আমি তো বলছি না, বাধু ফেলেছে। সত্যি তো, কোথায় পাবে ও এত টাকা? আমি বলছি, সবার আগে ওরই দেখার কথা ছিল। দেখেনি কেন? বলেনি কেন আমাকে?'

এবম্বিধ ক্ষীণমতি বিতর্কে, খুবই স্বাভাবিক, নিজেকে সরিয়ে নিলেন নিশীথরঞ্জন। কোনো এক বিখ্যাত এন. জি. ও. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হিসেবপত্র নিয়ে ক'দিন ধরেই বড় বেশি টেনশনে আছেন। বিদেশি টাকা। এফ. সি. আর. এ.-র হুজ্জুতি। নিচে একতলার অফিসে বসে ফাইলপত্রগুলো দেখবেন ভেবেছিলেন। ঘরসংসারের এমন সব ফুটোফাটা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তার সত্যি কম। কাগজটা নতুন করে টেনে নিয়ে মনোনিবেশের অছিলায় কিছুটা আপন মনেই ছোট এবং লক্ষ্যহীন উক্তি—'হ্যাঁ, সংসারের দেখাদেখিটা তো এখন কিছুটা ও-মেয়েরই কাজ। অন্যদের আর সময় কোথায় এত?'

'কী? কী বললে?' চোখ টেরিয়ে তাকালেন কিরণময়ী। গোটা শরীরে আর ধরে রাখতে পারছেন না ক্রোধের দাহ। ঘরের-ঝি বাধা বা সন্তানরা আছে কি নেই, বয়েই গেল। আগ্নেয় বীভৎসায়— 'এই বেয়াড়া ছেলেমেয়েগুলোকে সামলাবে কে? ওরা কোথায় পায় এত এত টাকা? কে দেয়? সবই আমার দোষ?'

এবং অগ্নিময় আক্রোশের তীক্ষ্ণ ঝাঁঝ আছড়ে গিয়ে পড়ল সন্তানদেরই ওপর —'বাজে কথা বললেই তো হবে না। তোরা, নির্ঘাৎ তোরা...এ-তোদেরই কাজ। আচ্ছা, একটু কি দয়ামায়াও নেই রে তোদের? একটা মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে এত কিছু করছেন, এত কিছু দিচ্ছেন তোদের। সব কিছুই তো ওই একটা মানুষ...একজনেরই রোজগার। কিছুরই তো অভাব রাখছেন না কোথাও। যখন যা চাইছিস, যেমন করে চাইছিস, সবই পেয়ে যাচ্ছিস। কোনটা পাচ্ছিস না বল। তাই বলে তোরা এভাবে নষ্ট করবি টাকাপয়সা?'

'হাউ ফানি! হোয়াই ডু ইউ শট মি ফর দ্যাট?' মারকুটে তেরিয়া মেয়ে বুলবুলি। মায়ের সঙ্গে সমান পাল্লায় এবং মাতৃভাষায়— 'তোমাদের এই ডাটি বালতিফালতি কোথায় কী থাকে, কী হয় ওতে, আমরা কী জানি? অল ননসেন্স...'

'কী? তুই আমাকে ননসেন্স বললি?'

'হোয়াই সুড আই নট সে দ্যাট?' সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে বুলবুলি আরো বেশি মারমুখো। যেহেতু বিরোধ মায়ের সঙ্গেই, আনুগত্য থাকে না মাতৃভাষায়— 'ইফ আই হ্যাভ সো মাচ মানি হোয়াই শুড আই থ্রো ইট ইন দ্য গার্বেজ?'

'এগ্‌জাক্টলি...' মুখচোখের বিকারে মুনমুনও ততোধিক বিরক্ত— 'এসব কী? হচ্ছে কী তোমাদের? বি র‍্যাশনাল। কাজ নেই কম্মো নেই, পাঁচশো টাকা দলা পাকিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেব? বাট হোয়াই? পারপাসটা কী? হুএভার হ্যাজ ডান ইট, তার ইনটেনশন তো থাকবে একটা? হোয়াট ইজ দ্যাট? ট্রাই টু ডিটেক্ট ইট ফার্স্ট...'

কথা আর কথা। কথা-চালাচালির অঢেল ধোঁয়া। মগজের ঝিমঝিমানিতে সবই ঘুলিয়ে যাচ্ছে এমন, নাজেহাল কিরণময়ী। অথচ বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে অনেক। স্নান হয়নি, ঠাকুরের আসন দেওয়া এখনও বাকি। সংসারের সব কাজই আগোছাল পড়ে আছে। রাধাকেও আটকে রেখেছেন অনেকক্ষণ। মরুক গে ছাই। পাঁচশো-টাকার তুচ্ছতায় যখন সরে যেতেই চাইলেন, বাবন এল। এত সকাল-সকাল খামোখা কাঁচা-ঘুম ভাঙিয়ে দেবার ফালতু উৎপাতে ফোলা-ফোলা চোখের চাউনিতে বিরক্তই ছিল সে-যুবক। টলোমলো শরীরে ঘুমের রেশ কাটেনি তখনও। কাছে এসে দাঁড়াতেই আকুল হলেন মা— 'তুই...তুই কিছু জানিস রে বাবন?'

'হুঁ, নন্দদার কাছে শুনলাম, কী নাকি কোথায় টাকাকাকা পড়ে গেছে তোমাদের...'

'পড়ে গেছে কি রে? এত টাকা কারুর হাত ফসকে পড়ে যায়? পাঁচটা একশো-টাকার নোট...'

হঠাৎ কী হলো, আলসেমি ছেড়ে চনমনিয়ে উঠল সে-যুবক। কোনো লাটসাহেবি গোঁয়ার্তুমি নেই। এক ঝলকে কেমন বদলে গিয়ে হালুমমারা গোল-গোল চোখের দৃষ্টি আপনজনের ভিড় ঠেলে কোথাও কিছু শনাক্ত করতে চায়, অথবা হাত কয়েক দূরে পিতৃসন্নিধান, বোকা-বোকা চেহারায় নিজেই আলাদা হয়ে ওঠে।

কিন্তু হদিশ থাকে না কারুর—সবারই নাকের ডগায় এবং অলক্ষ্যে বিনে-সুতোর ঘুড়ি খেলে যেতে থাকে আলাদা নিয়মে। একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল রাধা। লাখোপতি কোটিপতির ঘরে মাত্র পাঁচশো-টাকার হাহুতাশের তামাশা দেখছিল। লোকটা এসে দাঁড়াতেই কেঁপে উঠল। ওপ্রাশের চোখজোড়া পাক খেতেই—যেভাবে পাক খাচ্ছে, হিসেবের ছক কষে মায়ের পেছনে এমনভাবে নিজেকে আড়াল দিলো, যেখানে দাঁড়ালে বেআক্কেলে চোখজোড়া তাকে সবচেয়ে কম ছুঁতে পায়।

'কী রে, কী হলো তোর? কী খুঁজছিস?'

'তোমাদের টাকাকড়ির আমি কী জানি!' সেই গোঁয়ার্তুমিই ফুঁসে উঠতে চাইল একবার। কিন্তু সম্মুখবর্তী পিতা। সমঝে যেতেই হয়— 'সে-আমি জানি না।'

'ওয়েল দেন, প্রব্লেম ইজ সলভড...' তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ক্রুদ্ধ নিশীথরঞ্জন। ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর কাছে এসে—'ছেলেমেয়েরা কেউ জানে না। তুমিও না। আমিও না। এ-বাড়িতে এতগুলো টাকা যাদের কাছে থাকতে পারে,তারা কেউ কিছু জানে না। এর বাইরে নন্দকে কেন দোষ দেবে? ও-ই তো টাকাগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেই তো কথা।' নিজের মধ্যে মিইয়ে এলেন কিরণময়ী। কুণ্ঠিত গলার স্বর।

'ব্যস, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে, তোমার এই রাধু ছাড়া আর কে করবে এমন কাজ?'

একেবারেই আচমকা হাড়গোড় কাঁপিয়ে টলে উঠল রাধা। সাহেব একঝলক তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। সাহস হয় না মাথা তোলার।

'হ্যাঁ, রাধু ফেলেছে। কবে শুনব গোপালের-মা ববির-মা সবাই এসে টাকা ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার ঘরে।' ভেঙে পড়াব নৈরাশ্যে কিরণময়ীর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ হবে। সেটাই হবে এরপর। নাথিং বং ইন ইট...' নিশীথরঞ্জন তাব প্রচণ্ড ক্রোধের চড়ায়—'জিগগেস কবো না তোমার ছেলেকে। আস্‌ক হিম। ওর মুখচোখেব দিকে তাকিয়ে বুঝতে পাবছ না হি নোজ ইট। হি ইজ ভেবি মাচ উইথ দ্য হোল থিং...'

সাড়া নেই কিরণময়ীব। ভ্যাবাচাকা মেয়ে দুটো ঝিম মেরে ছিল। তাকাল বাঁ-পাশে। বোনদেব পেছনে দরজার গা ঘেঁষে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তেজী যুবক নিজেও স্তব্ধবাক।

ঘরেব ভেতর ঢুকে গিয়েছিলেন নিশীথরঞ্জন। পর্দায়, পতাকা উড়িয়ে আবার বেবিয়ে এলেন— 'পার্কসার্কাসে মেহের আলি রোডের ভাঙা বাড়িটা দেখেছ তোমরা। ওর বয়সে ষাট টাকা ভাড়ার ওই ভাঙা বাড়ির একতলায় মাটিতে পাত পেতে ভাত খেতে হতো আমাদের। নড়বড়ে তক্তপোশে রাত কাটত। ছুঁচো ইঁদুরের উৎপাত। দুটোব বেশি তিনটে জামাপ্যান্ট ছিল না কারুর। আস্ত একটা টাকা পকেটে থাকলে প্রিন্স ভাবতাম নিজেদের। লেখাপড়া শিখতে হয়েছে সেজন্যে। আর এরা...'

ছোট করে একটু কাশি উঠল গলায়। হাতের মুঠো মুখে চেপে, মাথা উঁচিয়ে স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলের দিকে তাকালেন ঋজুতায় এবং সমবেত অধোমুখ বা নির্বিরোধ আনুগত্যে হয়তো-বা নিজেকেই পরখ করে নিলেন একবার। ফিরে গেলেন ঘরে।

এমতাবস্থায় পতিব্রতা নারী অথবা স্নেহশীলা জননী দক্ষিণ অথবা বাম, স্বামী অথবা পুত্র—কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় কোনো দিকেই এগোতে না পেরে মধ্যবর্তী অবস্থানে কিরণময়ী যখন স্থবির নিশ্চল, দ্বিধা হয় না মোজায়েক বসুন্ধরা। অথচ নিজে গ্রাসিতা জানকী।

মুনমুন আলগোছে সরে গেল অকুস্থল ছেড়ে। খাটো চুলের ঝরনায় ঢেউ নাচিয়ে বুলবুলি ঝাঁপিয়ে গিয়ে বসল সোফায় গদিতে।

পাল্টে গেছে মানুষগুলোর হালচাল ধরনধারণ। কাঠগড়ার বাইরে একজন... শুধুই একজন, রাধা, দেয়াল ঘেঁষে শুনশান দাঁড়িয়ে থেকে স্থিরপলকে সাহেববাড়ির মরণ দেখছিল। ছাতাপড়া ছেঁড়াকাটা বড় বড় নোটের আদলে মান্যিগণ্যি বড় বড় মানুষ সবাই।

সংশয়ের শিথিল চবণে ছেলের দিকে এগোলেন কিরণময়ী— 'কি রে বাবন, তুই...তুই করেছিস এমন কাণ্ডটা? সত্যি ওই নোংরার মধ্যে, ও-তো চোখ ফেলে তাকালেই পেটের নাড়িভুঁড়ি ঠেলে বমি উগরে আসে আমার। ওই হতচ্ছাড়া বালতিটা তুই পেলি কোথায়? টাকাগুলো ওখানে ফেলতে গেলি কেন? সেটাই তো মাথায়

আসছে না আমার। বেশি কিছু না হোক, পাঁচশো টাকায় গোটা দুয়েক ভি. ডি. ও. ক্যাসেট এনেও তো রাখতে পারতিস...'

ছেলেকে ছুঁতে পাবলেন না মা। বেসামাল সন্তানেব বাগী-রাগী চোখেব দিকে তাকিযে, নিশানার মাপে পিছু ফিবে দেখলেন। বোঝেন না, কটমটে চোখে কোথায কী খুঁজছে কাকে?

ক্রুদ্ধ যুবক ছিটকে বেবিয়ে গেল মাযের নাগাল ছিঁড়ে।

এবং বাধা মুখে আঁচল চেপে গুটিগুটি পালায নিজেব আস্তানায়। ভয়ডব আব নেই। মানুষটাকে থোডাই কেয়াব। মরণ তাব নিজেরই হাভাতেপনায। নেহাৎ-ই কাজেব-মেয়ে বলে আজ সে পার পেযে গেল। টাকা নেই তাব? অভযাবণ্যের বাঘ বক্ত চিনে ফেলেছে। ব্যাধবাও যদি নিয়ম ভাঙে এবপর? কী সব্বোনাশ! তক্তপোশের তলায় তাব বাকশোব ওপর এখনই যদি হামলে পড়ে কেউ? অনেক...অনেক টাকা। সবই সাহেববাড়ির নোট। মাযেব হিসেবে থাক-ছাই-নাই-থাক, সবই তাব বুদ্ধি-খাটানোর গতব-খাটানোর পযসা। কিন্তু তাব গতবেব দরদাম?

কিংবা কিভাবেই যেন জেনে যায মেযে, আগুনে গা সেঁকতে চাইলে এমন তো হয। হতেই পাবে—ভয।

নিশীথরঞ্জনের মেঘলোক
এবং রাধার ক্রমবিকাশ

হযতো সেখানেই ভ্রম ছিল। কোনো এক মায়াময পক্ষী হিসেবেই নিজেকে সে জেনে এসেছে এতকাল, হালকা ডানায ভেসে উর্ধ্বলোকে মেঘ ছুঁতে পাবে যে-ক্ষুদ্রপ্রাণ।

আকাশ জানে পাখি, মাটিও চেনে। আকাশেব শূন্যিতে তো ঘব গডতে পারে না কেউ। মাটিও নেই পায়ের তলায। সাতরাজ্যি ঘুবে কোত্থেকে একটু একটু করে খড়কুটো কুড়িযে-বাড়িয়ে এনে নিজের ছানাপোনাব জন্যে গাছেব ডালে সুন্দব-সুন্দব বাসা বাঁধে ওরা। দেশগাঁযেব আঁধাব-গুমোট মেটেঘবটাকে পাখির-বাসা মনে হলে, পাখির মেযে সে, নিজেও আশ্চয্যি এক পাখি হয়ে যায়। তাই যদি না হবে, সেই একরত্তি ছোট্ট বয়সে ডানা মেলে উড়তে শেখাব আগেই, সাতজন্মেব চাষিব মেয়ে, কোন্ ভোজবাজিতে অলৌকিক মেঘলোকে পৌছে গিয়েছিল সে? সবই বাপঠাকুদ্দাব পুণ্যিব জোব। পুণ্যির জোরে চন্দ্রসুয্যিব ঘর।

জানে না নিরক্ষব—মেঘলোক আসলে এক অপাব শূন্যতা। মেঘেব উর্ধ্বেও মেঘেব স্তব থাকে। যত সহজে সে পৌছে যেতে পাবে বাঞ্ছিত স্বপ্নলোকে, মেঘলোকের মানুষ সেখানেও উর্ধ্বলোক খোঁজে।

পাঁচশো টাকার একটি নোট হোক অথবা একশো টাকাব পাঁচটি নোট, নর্দমার জলে ভেসে যাক অথবা ময়লা-ফেলার বালতিতে পচেগলে হেজে নষ্ট হোক—এমন

কোনো ঘটনাই নয় যে, গোটা চাটুজ্জে পরিবারকে পুরো একটি সকাল ধরে শোকেসন্তাপে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে মযনাতদন্তে নিজেদেরই কাটাছেঁড়া করতে হবে। এ-রকম গোটা কয়েক পাঁচশো-টাকা তো বছর ভরে হামেশাই এর-ওর-তার অসুখবিসুখে দেওয়াথোয়া দানেধ্যানেই চলে যায়।

কিন্তু একনিষ্ঠ রোটারিয়ান নিশীথরঞ্জনের হিসেবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ড্রেনেজ অব মানি? টাকা যে সত্যি-সত্যি এভাবে নর্দমায় ভেসে যেতে পারে, তাকে চাক্ষুষ করার বাস্তব অভিজ্ঞতায় জাঁদরেল চার্টার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিজেও স্তম্ভিত। টাকা নিজে কেন নষ্ট হবে?

বরং কৃতীভোগ্যা বসুন্ধরা। প্রায় শতকোটি মানুষের জনসমষ্টি সুবিশাল ভারতবর্ষ হয়তো অনন্ত সৌরমণ্ডলেরই প্রতিরূপ। কিন্তু নিজেকেও পরমাণুজ্ঞানে তুচ্ছ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। একদা কোন এক মেহের আলি রোডের একতলায় লক-আপের কয়েদিগোছের ছুঁচোইঁদুরের গর্তে গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলিতে কৈশোর বা যৌবনের প্রথম ভাগ কাটিয়ে এসে একোল বাদে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে গলদঘর্ম হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সাকসেসের রেলগাড়ি বা গগনচারী সুপারজেট যদি একবার ধরে ফেলাই গেছে, প্রবল গতির সঙ্গে পাল্লায় এ. সি. কেবিনের কাচের জানালায় অথবা ঊর্ধ্বলোক থেকে সবুজ দিগন্তে জনগণের ভারতবর্ষকে দেখা যায় ঘুমপাড়ানি ছবির মতো। এই জনগণ অতীব মূল্যবান। এরা ক্রেতা। এরা অভাব বোঝে।

যাঁদের জনগণ নেই, রাজনীতির মঞ্চ নেই, তাঁদেরও দেশপ্রেম থাকে। হিতব্রতী সংগঠন থাকে। আঞ্চলিক রোটারি ক্লাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত সদস্যদের সমাবেশে চোস্ত ইংরেজি ভাষণের যে-সাপ্তাহিক অনুশীলন, সর্বজনকল্যাণে জনগণই সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। সর্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় পূজামণ্ডপে প্রতিবছর যে-শতাধিক দীনদুঃখীকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে নিশীথরঞ্জনের খাতে অন্যূন দ্বিসহস্র মুদ্রা আলাদাভাবে বরাদ্দ। মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে কোথায় কোন্ এক আদিবাসী গ্রামে উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের চিত্তবিনোদন প্রয়াসে একটি ক্লাবঘরে টিভি সংস্থাপনের সমুদয় ব্যয়ভার রোটারি ক্লাব সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। এতদভিন্ন প্রস্তরীভূত দারিদ্র্যমোচনে যে-হারে এন. জি. ও. বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রার আমদানিতে সেবাধর্ম ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের প্রান্তে-প্রত্যন্তে, এসব নিশ্চয়ই ড্রেনেজ নয়। নর্দমায় গড়িয়ে যাচ্ছে না টাকাগুলো।

দানের হাত বা গ্রহণের হাত—উভয়তই মানুষের হাত। কিন্তু ডান হাতের পাঁচ আঙুলের বিপরীতে পাঁচগুণিতক সহস্র আঙুল চারপাশে কিলবিলিয়ে উঠলে তৃণমূলটুল এমন এক মারাত্মক ব্যাপার, চকিতে পিছিয়ে আসতে হয়। কেন না, জনগণবিলাসে চাতুরির খেলা জানা নেই তাঁর। ধাতেও সয় না বেশিক্ষণ।

বরং সমানে-সমান হাতে-হাত মেলানোর উদারতা যেমন সুখকর, প্রয়োজন বোধে তারই সঙ্গে স্মিতমুখ 'সোনালি করমর্দন'। কিছুমাত্র অন্যায় নেই। কেননা, সমৃদ্ধি এক জটিল প্রক্রিয়া। আজেবাজে ন্যাকামো নয় সব কিছু।

পক্ষান্তরে জনগণস্বার্থে দেশের উন্নয়ন-ভাবনা অনেক বেশি জরুরি। সেটা তাঁর নিজের কৃৎকৌশল। একার টেনশন। গত কয়েক বছরে সাবেকি পৃথিবীটাই নতুনভাবে

পাল্টে গেছে এমন, এখন গ্লোবাল টেন্ডারেই খেলতে হয় দুনিয়ার সব খেলা। ঘোমটা টেনে নিজেকে আড়াল রাখার দিন আর নেই। বিশ্বসুন্দরী খেতাব জেতার মুক্ত প্রতিযোগিতায় এখন সবাই খোলামেলা, সবই নিরাবরণ—'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, হেথা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে- —এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

ভারত নয়, ইন্ডিয়া। 'সাগরতীরে' নয়, বিমানবন্দরে।

এমতাবস্থায়, বলা বাহুল্য, একজন প্রফেশনাল মানুষ হিসেবেই মহামানবচর্চায় নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না নিশীথরঞ্জন। টাকা আর ডলারের অসবর্ণ প্রেমে মাতব্বরদের চোখ-রাঙানি অনেকটাই কমেছে আগেব চেয়ে। ঢালাও আমদানি। নতুন কায়দায় ঢুকে পড়ছে পুরনো সাহেবরা। তৎসহ ব্যাপক এন.আর.আই. আবাহন, বৃহৎ... অতিবৃহৎ শিল্পোদ্যোগ, বৃহৎ শিল্পের মোসাহেবিতে ছোট শিল্পেব ব্যাপক প্রসার, ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তার, আবো .আরো ব্যাঙ্ক, ননব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট কনসার্ন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ। বিনিয়োগ যত বাড়ে, দীর্ঘায়ত ব্যালেন্সশিটের গণিত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর পকেটে পকেটে ঘোরে অধস্তন সহকারীদের। নিশীথরঞ্জনকেও তাঁর মগজের অ্যান্টেনা স্থির রাখতে হয়। বড় বড় জবরদস্ত ক্লায়েন্টদের ভজনপূজনেই ওদের হিসেবের তদারকি—ইন্টার্নাল, স্ট্যাচুটরি, কখনও কখনও স্পেশাল অডিট। বোর্ড-অব ডায়রেক্টর্স-এর সভার মিনিটবুক থেকে শুরু করে ক্যাশবুক জেনারেল-লেজার পার্চেজ-বেজিস্টার সেলস-রেজিস্টার জার্নালবুক, ভাউচার-ফাইলের প্রতিটি খুচরো খরচপত্রের অনুপুঙ্খ চেকিং বা ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটির পরখ...ফাইলের পর ফাইল জমে জমে যখন পাহাড়, সব কিছুর ঘাঁটাঘাঁটিতে খুঁজেপেতে দেখতেই হয়, মক্কেলদের চেক্কিং-সিস্টেম কতটা পাকাপোক্ত? কন্ট্রোল বা ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া দুর্বল হলে নানাদিকে গরমিল। চুলচেরা হিসেবনিকেশের পর বেতনভুক সহচররা যা গড়ে তোলেন, সেটা নির্মাণ। ডেবিট-ক্রেডিটের দাঁড়িপাল্লায় ডানে-বাঁয়ে দু-চার পযসার অঙ্কও সমান-সমান মাপে মিলে গেলে, সুনির্মিত আউট রিপোর্টের তলায় একটি স্বাক্ষর—নিশীথরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কোনো মনীষীর অটোগ্রাফ নয়, ততোধিক মূল্যবান এক দলিল। পরীক্ষিত বাণিজ্যসংস্থার নৈতিকতার তকমা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ব্যবসাবাণিজ্যে লেনদেনে এতদতিরিক্ত কিছু পরিমাণ অর্থ নানাভাবে বিবিধ খাতে ব্যয় হয়ে যেতেই পারে। অথবা হয না। টাকাগুলো থেকেই যায় কোথাও। ব্যালেন্সশিটে যাব অস্তিত্ব নেই, সেগুলো কোনো আয় নয়। যা আয় নয়, তার কোনো ব্যয়ও নেই। যা ব্যয়, যদি কাগজেকলমে যথাযথ থাকে, যথাস্থানে ঠিক-ঠিক পেমেন্ট হয়েছে কিনা, তদন্ত ব্যতিরেকেই অনেক সময় ভ্রূকুঞ্চন মুছে নিতে হয়। এসব অজ্ঞাতকুলশীল বায়বীয় ধনসম্পদ দাগী মাফিয়া বা আপসবিমুখ বিপ্লবী বা উগ্রপন্থীদেব মতো। আত্মগোপনে বাঁচে। পুলিশ জানে না, গোয়েন্দারা চেনে না, ইনকামট্যাক্সের আওতায় নেই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ডা নয়।

অতি নগণ্য কটা টাকা, মাত্র পাঁচশো, নর্দমায় ভেসে যাচ্ছিল এবং সেটা নিশীথরঞ্জনেরই ঘরে? ক্ষুব্ধ হতেই পারেন তিনি। ব্যয়হীন টাকা এভাবে নষ্ট হলে

লোকচক্ষুতে ফেরারী-টাকা বলে শনাক্ত হয়ে যেতে পারে অতি সহজেই। যে-টাকার ব্যয় নেই বা যে-টাকায় সুদের মেদ জমে না—সে-টাকার সঞ্চয় উপপত্নীর মতো। সোহাগের চেয়ে টেনশন বেশি। ব্যয়ের কৌলীন্যেই চেনা যায় উপার্জনের অহঙ্কার। যে-খরচপত্রে সম্ভ্রম নেই, সেই তো অপচয়।

এবম্বিধ অপচয়ের কৌলীন্যে রাধারও ইজ্জত। মা-লক্ষ্মী উজাড় করে সব ঢেলে দিলে সাহেববাড়ির সুখেভোগে তারও বরাত খুলে যায়। সে পেয়ে যায়, যা তাব চাইবার নয়, পাবার কথাও নয়। যার-যেমন দরদাম, সে-রকমই একটা পড়তায় এসে যায় সকলেব পাওনাগন্ডা। শুধু তো বেহুলাসতীব ভাগ্যে স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া নয়—দিদিমণিদের গায়ের জামাজুতো, ইমিটেশন গয়নাগাটির জেল্লা, টিভির ছবিতে থাকে যেসব স্নোপাউডারসাবান—রূপলাবণ্যেব দাওয়াই, সবই পেয়ে যায়। দিনে-বাতে আহাবে জলখাবাবে ফ্যাট প্রোটিন ভিটামিন.. নেই-নেই করেও প্রযোজনের ক্যালবি তো থেকেই যায় কিছু। এ-ছাড়াও মাসে মাসে হকের পাওনা—বেতন। মাসবেতনেব বাইরেও এদিক ওদিক থেকে আবো কিছু উপার্জনবিহীন গোপন বোজগার।

সুখও কি বদখত একটা অসুখ মানুষেব? রাধা, নিরেট আহাম্মক, জানেই না, তার আকাশের চন্দ্রসুয্যি ডাকসাইটে সাহেবও কী ভীষণ দুঃখী মানুষ।

এত খরচপত্র করেও, যতদূর মনে হয, একমাত্র ছেলেটা টোটাল ফ্লপ। বুকের পাথবে যন্ত্রণা যত তীক্ষ্ণই হোক, বৃহৎ কাণ্ডে সবল হযে ওঠার পর কোনো সুফলা বৃক্ষই তাব ডালপালা ছড়িয়ে নিজেব বৃদ্ধিকে খাটো কবে রাখতে পারে না নিজের ইচ্ছায়। অনেকেব প্রত্যাশা, অনেকের নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার লোকপ্রিয়তায় খ্যাতিপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার আয়নায় নিজেকেই মর্মরবিগ্রহে দেখার দুর্মর বাসনা। মেঘের ওপরও মেঘ থাকে। নিশীথরঞ্জন ক্লান্তিহীন। একটা কি দুটো বাড়িগাড়ি, ব্যাঙ্কেব গোটাকয়েক ভল্ট বা ফিক্সড-ডিপোজিট বা নানাধরনেব ইনসিওরেন্স বা শেয়াবহোল্ডিংযে দশ-পনেব-কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকার নিরাপত্তা কিছু না। কিছুই না।

টাকা দুর্বার অশ্বগতি। তাকে বিশ্রাম দিতে নেই। তাকে খাটাও, ছোটাও, মাবো চাবুক, লাগাও জ্যাকপট। জীবন মূলত এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

লাখ দশেক টাকার নির্ভরযোগ্য শেয়ার কেনা ছিল আগে থেকেই। আস্তে আস্তে মজাটা জমতে শুরু করল। নিশ্চিত ডিভিডেণ্ডেব চেয়ে অনিশ্চিত গ্যাম্বলিং। হাজাব হাজার লাখ লাখ টাকার জুয়া! অসম্ভব উত্তেজনা। প্রতিযোগিতার বিশাল বাজাবে দেশজোড়া যে-বৃহৎ কর্মযজ্ঞ, ছুঁয়ে থাকা যায় তার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে, ব্যাপক অর্থনীতিকে। কিন্তু অদৃষ্ট না মেনে জুয়াড়ি হওয়া যায় না কখনও। শেষ পর্যন্ত সবই বরাত। কপাল।

সিসমোগ্রাফে ভারতবর্ষ আজ কোন মুলুকে কাঁপল কতটুকু? মিটিওবোলজিব ব্যারোমিটারে কোথায় কত সেলসিয়াস উত্তাপ? বৃষ্টিপাতের পরিমাণ? বাতাসের আর্দ্রতা? কত দর যাচ্ছে টিসকো টেলকো এসিসি হিন্দুস্থান-লিভার ব্রুকবন্ড লিপটন বা গুজরাট টেলিফোনের? রিলায়েন্স বা জয়প্রকাশ ইন্ডাস্ট্রিজ? হিসেবটা জ্যোতিষশাস্ত্রের নয়। গণিতেব, মেধার, বিচারবুদ্ধির। শুধু তো টাকা নয়, অনেক মাপজোক অনেক হিসেবপত্র ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণ বিবেচনার সালতামামি। ঝুঁকি নেবার সাহস চাই। দুর্বহ স্নায়ুচাপ। কী বলছে লোকজন? কোনদিকে ছুটছে উন্মত্ত জনতা? যেখানেই পাগলামির দৌড়, পিছিয়ে এসো। ফরোয়ার্ড ট্রেডিংয়ে খেলতে পারো। নয়তো সরাসরি ক্যাশ। ব্রোকার? সে তো ব্রোকার মাত্র। কেনাবেচার কাগজ তোমার। তোমার ললাট। বুল ফেজ অথবা বেয়্যার? ভালুক কেন ষাঁড়ের চেয়ে কম তেজী? প্রশ্ন করো না। বাজার চেনো বাজার বোঝো বাজার হিসেব করো। নব্বই সালে জনতা সরকারের পতন ঘটল। নিশীথরঞ্জনের পালস-বিট দিল্লিতে এম. পি.-দেব কবজিতে কবজিতে। একানব্বইয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধ আরব দেশে! টিভির সংবাদ-বুলেটিনে ফুসফুসের বিপর্যয় আশঙ্কা। স্কাড পেট্রিয়টের ঠোকাঠুকিতে সেরিব্রাথ্রম্বোসিসের আতঙ্ক মগজের শিরায় শিরায়। তেরানব্বইতে হর্ষদ মেহতা ফেঁসে যাবার পর সুতোয় ঝুলছে যে-সংখ্যালঘু সরকার, তাব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের দিনে নিশীথবঞ্জনের বুকে ওপেন-হার্ট সার্জারি। কয়েক লাখ টাকার খেসারত ঘটে যেতে পারে পলকা বাতাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরণ নেই কোথাও। কেননা, সবটাই ফাটকা নয়। ঘোড়া নয় পাশা নয় তাস নয় সাট্টা নয় ক্যাসিনো নয়। অঙ্ক কষার হবেক ছক্কাপাঞ্জায় দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে বাখা অথবা অবিবেচকেব মতো তড়িঘড়ি ছেড়ে দেওয়ায় লাভ বা লোকসান শেষপর্যন্ত অবশ্যই কপাল। সবই নসিব। একটা পা হড়কে যেতেই পারে কাদার গর্তে, আরেকটা পা পেয়ে যায় শক্ত জমি। ব্যালেন্সেব খেলায় ইনকাম ট্যাক্সের যোগবিয়োগে মস্ত ক্ষতিও যেখানে অনেক বড় লাভ। বীভৎস প্রফিট।

এবং এভাবেই দেবলোকে অমৃতভাণ্ড পূর্ণ হয়ে উঠলে, উপচে-পড়া স্বর্ণকলসের গা বেয়ে একটু-আধটু যা গড়িয়ে নামে, সেখানে আঁজলা পেতেও রাধা পেয়ে যায় কিছু। অনেক কিছুই। তার পাওনার হিসেব শূন্যতা থেকে। যা পায়, যতটুকু পায়, শতকরা একশো ভাগই লাভেব-কড়ি। পর্বতচূড়ায় তুষাব জমলে গলে গলে সমতলে নদী। নদী কুলকুল বয়ে গেলে দু-পাশেব ডাঙায় উচ্চ ফলন। ফলন ভালো হলে মালিকের গোলায় ধান। মনিবমহাজনবা খুশিতে থাকলে হাভাতে চাষিব ঘরেও ভাত ফোটে। পেটের শান্তি। এভাবেই বাজাব বাড়লে সমৃদ্ধি বাড়লে প্রভুতা বাড়লে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে স্বস্তিকল্যাণ। প্রাপ্তি সকলেরই।

সুতরাং রাধা সেদিন অবাক্ হলো। চোখে পড়ার কথাই ছিল না কারুর। পড়লই যদি, মাত্র পাঁচশো টাকার শোকেতাপে এমন পোড়ানি গো মানুষগুলোব? এমন মরণদশা? এমন কবে কেঁপে উঠতে পারে সাহেববাড়ি? অথচ এ-রকম ঘেন্নায় ঘেন্নায়, হেলাফেলাব গলা-খাকরানিতে সেও তো উগবে তুলতে পারে—থ্থু থু, ওয়াক থু...

গবদ-তসরের বর্ণে ভগবতী মায়ের শ্রীচরণ। সেখানে শতকোটি পেন্নাম সমতিবালার।

ওপরতলায় কী সব চিঠি-চালাচালি হয়েছে এতদিন, রাধা জানতই না কিছু। পালানভাইকে নিয়ে মা সাহেববাড়িতে চলে এল একদিন। অনাথ বাখুন্ডীর মেজছেলে, দাঁড়গাছিতেই ঘর, পৌঁছে দিয়ে গেল সকালবেলা। লোকটার আসা-যাওয়ার ভাড়া গুনতে হয়েছে মাকে।

এই ন-দশ বছরে পালানভাই আর মা এর আগেও এসেছে দু-একবার। সে-তো কাজকম্মের বাড়িতে কাজের-লোকের দরকার হয়েছে যখন, সাহেববাড়ির-মা নিজেই ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, এত খরচাপাতি করে হুটপাট এসে যাবে কেন বুড়ি? এলই যদি, শহরে সাহেবসুবোর বাড়ি আসবে, গায়ের কাপড়ের ছিরিছাঁদ থাকবে না একটা? শস্তা সাবানে ঘরে-কাচা কোন্ আদ্দিকালের ফ্যাসফেসে সরু পাড় একটা ধুতিকেই গায়ে জড়িয়ে চলে এসেছে। ইস্তিরি-ফিস্তিরির বালাই নেই। কেমন ন্যাতন্যাতা, ছাপছোপে বিচ্ছিরি। শায়া পরেছে একটা। স্পষ্ট বোঝা যায়, হাঁটু অব্দি খাটো, মিডিস্কার্টের মতো। ঢলঢলে শাদা একটা ব্লাউজ। ওই এক জোড়া শায়াব্লাউজই আছে বুড়ির। ওতেই তো এ-জম্মোটা কেটে গেল—রাধা জানে। রাধার রাগ হয়। লজ্জাও লাগে। এমন হতচ্ছাড়া হয়ে কেউ আসে গো শহরে ভদ্দরলোকদের দোরে?

বরং সে ভড়কে গেল। টেনাকাপড়ের-মা এসেই কেমন সাট বেঁধে গেছে হাউসকোটের মায়ের সঙ্গে? অবাক কাণ্ড—অতিথকুটুমের আদর তো ভারি! একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে মাঠাকরুণের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার মতো এতটা কলকে কি কবে পেয়ে গেল গেঁয়ো-বুড়ি?

টরে টরে ছিল রাধা। মাকে যখন আলগা পেল, ব্যাকুল হলো—'কেনে গ, এমনধারা চলে এলে কেনে গ তোমরা?'

'সেকি আর সাধ করে এয়েচি র‍্যা? সতুর-বাপকে চিঠি লিখেছেন মা-ঠাকরুণ। একবারটি দেখা করতে বলেছেন। তাই এলুম। তা আগে শুনি সব কতা। দেখি, কী বলেন...'

তরাসে বুক কাঁপে রাধার। হাঁটু কাঁপে। পা বাড়ালে অবশ-অবশ লাগে গাগতর। সাহেববাড়িটা ফুরিয়ে যাচ্ছিল নিজের মধ্যে। গাজ্জিয়ানরা সবাই পুরোপুরি ভেঙে দিচ্ছে বাকিটুকু। কিংবা সাহেববাড়ি নয়, তার নিজের ভেতর নিজেরই ভাঙচুর। ড্যাবডেবে চোখের শাদায় কালো-কালো গুলতি দুটো আর ফড়ফড়ে প্রজাপতি থাকে না আগের মতো। সত্যি সত্যি ঠাণ্ডা-মারা দুটো পাথরের মার্বেল বনে যেতে চায়। রাধা সাহেববাড়ির দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগোয়। পুষ্যি বাঘার গায়ে যেমন তার হাত।

নিজের ভাবনা আর ভাবে না রাধা। সে ছাড়া এখন আরো একজন প্রাণী আছে তার ঘরে। তক্তপোশে গুটিসুটি মেরে বসেছে পালনভাই। ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না বাঘার ভয়ে। অথচ এর আগে কালেভদ্রে যখনই এসেছে, দুচোখ মেলে হাভাতের মতো গিলেছে সাহেববাড়ি। দম-চাপা নিঃশ্বাসের বিষাদ বুকে নিয়ে ধমকে-ধমকে ভাইকে সে টেনে বের করল ঘর থেকে। সাহেব আপিশে বেরিয়ে গেছেন ভাগ্যিস! অনেকটাই ভরসা। পাত্তাই দিলেন না দাদাবাবু। কিন্তু ফুটফুটে প্রজাপতি দিদিমণিরা? ভ্রূ কুঁচকে তাকাল বুল্লিদিদি। মুন্নিদিদি সোহাগ দিলেন কাঁধে হাত রেখে। পালান পিছিয়ে আসে। রাধা ভাইকে জগৎ চেনায়—গায়ের চামড়া শ্যামলা হলেও, ইংরেজি জানলে, সবাই এমন চকচকে ফর্সা হয়ে যায়। বয়স বাড়লেও বড় হয় না মেয়েরা। কাঁধের আঁচল অসভ্যের মতো খসে পড়তে পারে, ভয়ে, মিডিম্যাকসি চুড়িদার। মা-ঠাকরুণ ঘরে থাকলে, মাঝে মাঝেই বাহারি হাউসকোটে শাঁখাসিঁদুরে অন্নপূর্ণা।

যাদুঘর দেখে পালান। কিংবা রাজার প্রাসাদ। ঘর থেকে ঘরে গেলে কেমন বদলে যায় দেয়ালের রং, পায়ের তলার নকশা? দরজা জানালার পাল্লায় শার্সিতে পর্দায় বা ঘরের ভেতরে বাইরে চেনা বা অচেনা নাম না জানা হরেক আসবাবপত্রে তাজ্জব সব কাণ্ডকারখানায় যেদিকেই চোখ, সব দিকেই হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখার সাধ। তার নিজের যেটুকু ছিল, জামাপেণ্টুলুনে সাধ্যমতো সাজগোজ করে এসে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে সে নিজেই অচ্ছুৎ হয়ে গেছে, ভীরু বালক, সাহসই পায় না এপাশে-ওপাশে সর্বত্র পা ফেলার। ইশকুলের পড়ার বইয়ে, ইতিহাস, ভূগোলের পাতায় যে-পৃথিবীর হদিশ নেই, ভরাট বিস্ময়ে দেখে, সেই দুনিয়ার কত কী জানে দিদি! দিদিই টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে—গদির চেয়ার কী রে? সোফাকোচ এগুলো। সোফা-কাম-বেড লম্বাটা। খাট আর ডিভান আলাদা। ওটা সাইডটেবিল। জানালায় ভিনিসান বেলাইন্ডার, এয়ারকুলার। টেলিফোন দেখেছিস? এটা কর্ডলেস। এটা এস্টেরিয়ো রেকর্ডপেলেয়ার। টিভি জানিস। ভি. সি. আর.-এর নাম শুনেছিস? যন্তরটা জানিস কেমন? অবিশ্যি ছবি দেখাতে পারে না রাধা। হাতে হাতে বুঝিয়ে দেয়। গাঁয়ের বামুনাড়িতে ফ্রিজ দেখেছে ভাই। কিন্তু রান্নাঘরে গ্যাসওভেন মিক্সার গ্রাইন্ডার? ও-তো ছাই প্রেশারকুকারের হুইশল শুনলেই ছুটে পালায়। এমন বুদ্ধুরাম।

প্রেসার-কুকার কী? যদি সত্যি সত্যি বাঘের গর্জন?

কোনও কালে চিড়িয়াখানায় যায়নি পালান। সাহেববাড়ির একতলায় শেকল-বাঁধা খেঁকুড়ে নেকড়েটা যখন ওরই দিকে তাক করে তেড়েফুঁড়ে গর্জে উঠল, এক ঝলকে বুঝি মরেই গিয়েছিল ছেলেটা। বুকের ফুসফুসটা কোনো রকমে যথাস্থানে সামলে রেখে প্রাণভয়ে ছিটকে এসে লাফাতে লাফাতে ছুটে উঠে এল দোতলায় এবং ওপরে উঠে এসেও বুকের কাঁপুনিতে স্বস্তি ছিল না। দোতলার রেলিংয়ে থুতনি রেখে নিচু চোখে দেখছিল, দিদি সাপাং-সাপাং চড় মারছে জন্তুটার গালে। জানোয়ারটাও দুটো পা তুলে লাফিয়ে উঠতে চাইছে দিদির গায়ে। দিদি হাত বুলোয় ওর পিঠে, লম্বা শিরদাঁড়ায় মসৃণ রোমে। লম্বা জিভ হাঁ হাঁ করছে যখন, হাতের আঙুল রাখে ওর ভয়ঙ্কর দাঁতে? চুমু খায় ওর গালে? দিদি মহীয়সী। দিদি সার্কাসের মেয়ে।

ভাইয়ের হাল দেখে খিলখিল হেসে উঠতে পারত রাধা। বাঘা তার পুষ্যি। কিংবা সে নিজেই এতকাল পুষ্যি ছিল যাদের ঘরে, নিজের মধ্যে নিজেকে হঠাৎ নতুন করে খুঁজে পাবার পর সব ভালো-লাগাগুলোই আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে তার। অনধিকার প্রবেশের দরজায় বাঘা থাকে। ওর তর্জনেগর্জনে ঘরবাড়ি কাঁপে। নিত্য-বসবাসের সাহেববাড়িতে রাধার গোটা দুপুরটাই কেটে যায় মুখভার দুর্ভাবনায়। দুটো হাত দুটো পা চলে। চালিয়ে যেতেই হয় যন্ত্রের নিয়মে। ঘরমোছা কাপড়কাচা রান্নাবান্নায় যোগান কোনা কিছুতেই ঘাটতি থাকে না। মেয়ের পায়ে পায়ে হাঁটে সুমতিবালা। এখানকার কাজকম্মোর হদিশ বোঝে না। কিন্তু মুগ্ধতায় তাকিয়ে দেখে—কত কী শিখেছে মেয়ে! কত কিছু জানে! ঘরকন্নার কাজেকম্মে কী চালাক চতুর! এত বড় শহুরে বাড়ি! হাজারটা বায়নাক্কা! এমন করে সবার মন যুগিয়ে চলতে পারলেই না সার্থক মেয়েদের জীবন। পরের ঘর, আপন কর্। তবেই না নারীজনম!

দুপুরঘুমের শেষে এক কাপ চায়ের পর টিভির ঘরে পানের-বাটা নিয়ে বসলেন কিরণময়ী। পায়ের কাছে, মেঝেয়, হাঁটু ভেঙে পাছা উঁচিয়ে, হাঁটুতে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসেছিল সুমতিবালা। যেহেতু সরু-পাড় ধুতিই পরনের ঘোমটা-টানা শাড়ি, পেছন থেকে অনেকটাই শাদা পুষ্যি-বেড়ালের আদল। অনভ্যাসের শায়াব্লাউজ আরেক বাড়তি দিগদারি।

রাধা কাছেই ছিল। ঝাড়ন বুলিয়ে সোফা কোচ টেবিল আলমারির গায়ে ধুলো ঝাড়ছিল। ফর্সা তোয়ালে ঘষে আদরে-আদরে মুছে দিচ্ছিল জানালার-ব্লাইন্ড কাচের-শার্শি দরজার পাল্লা টিভি টেলিফোন পেতলের-টব।

নিজের মতো করে পান সাজিয়ে মুখে পুরলেন অধীশ্বরী মা। বাঁ-দিকের গালটা ফুলে উঠল। জর্দার কৌটো খুলতেই এক ঝলক তেজী গন্ধ। ঘাড় উঁচিয়ে, সিলিংয়ের দিকে চোখ রেখে বারদুযেক চিমটি কেটে জর্দা ফেললেন মুখের হাঁ-এ। পান চিবুতে চিবুতে সাইডটেবিলে পানের-বাটায় কৌটোকাটা গুছোচ্ছেন যখন, আড়চোখে এক ঝলক তাকালেন রাধার দিকে—'দেখছ গো রাধুর-মা, শরীরস্বাস্থ্যে কেমন তেজী হয়ে উঠেছে তোমার মেয়ে। ওর শরীরের গড়নটা বড় ভালো। গায়ের রং ফর্সা না হলে কী হবে, এমন আঁটোসাটো একটা ফিগার বাস্তাঘাটে ক'টা পাবে গো তুমি? বুলবুলি তো প্রায়ই শোনায় ওকে...'

ওপাশে টিভি-ভি. সি. আর.-এর সেলফে হাত দিয়েছিল রাধা। ঘাড় ফেরাতেই বাজরাণী মায়ের চোখে চোখ পড়ার ভয়। কিংবা নিজের মধ্যে প্রসন্নতায়, খুশির ঢেউয়ে নিঃশব্দে কাজে ডুবে যেতে হয় তাকে। নিজেকে লুকোতে।

'হ্যাঁ গ মা, সেই কতাটাই ত বলে গ গাঁয়ের দশজনে। গরিবের ঘরে জন্মেছে, বাপটাও মরে গেল...' সুমতিবালা কাতর হলো—'বললে ত হবে নি। এমনধারা ভাগ্যি নিয়ে জন্মেছে মেয়েটা! শেষে আপনার চরণে ঠাঁই পেয়ে এ-জন্মে বেঁচে গেল...'

'হুঁ, সে-আজ কত বছর হলো, বলো তো! সেই কবে ছেঁড়া-ময়লা একটা ফ্রক পরে দুধের-বাচ্চা বয়সে এসেছিল। দেখতে দেখতে কেমন ডাগরডোগর হয়ে উঠল...' পানের লালায় ভরে উঠেছে মুখ। জিভের বাটিতে রেখে কথা বলতে বলতে সোফার ধারে মেঝেতে-রাখা পিকদানির দিকে হাত বাড়ালেন কিরণময়ী। লাফিয়ে গিয়ে সুমতিবালাই সেটা তুলে ধরল দু-হাতে। পিক ফেলে, গলা-খাঁকানিতে আরো শ্লেষ্মা উগরে, গালটা সাফসুফ করে গদ্দিতে পিঠ ঠেসে বসলেন আরামে। পানের ছিবড়ে এ-গালে ও-গালে টেনে, পাল্টাপাল্টি করে, দাঁতে দাঁতে সুপুরি কুটতে কুটতে—'ওকে তো পরের-মেয়ে বলে কোনোদিন ভাবি নি গো রাধুর-মা। আমার ছেলেমেয়েরাও ওদেব বোনের মতোই দেখে এসেছে ওকে। এক সংসারে একসঙ্গে বড় হয়েছে চারজন। কিন্তু হলে হবে কী? আমি চাইলেই তো আর ধরে রাখতে পারব না। আর চাইবই বা কেন? তোমাদের মেয়ে...'

'অ্যাই দেখো, সেটা কী বলচেন? পেটে ধরলেই কি মা হয়ে যায় গ সব্বায়? ওই যো কতায় বলে না—অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া। এ-হল গে তাই...' ব্যাঙের মতো দু-পা লাফিয়ে গিয়ে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হতে চায় সুমতিবালা—'আর

জন্মে আপনার পেটের মেয়ে ছেল গ রাধু। এ-জন্মেও ভগবান ওকে আপনার পায়ে টেনে এনে ফেলেছেন। এখনে কি আর ওর ভালোমন্দ আপনাদেরকে বাদ দিয়ে হবে গ মা?'

'ভালোমন্দ আর আমি নতুন করে কী বলব বলো দেখি। সে-তো বলাকওয়া হয়েই গেছে তোমার সঙ্গে। তোমাদের পছন্দমতো ছেলে পেয়েছ। ওরাও তোমাদের ঘরে কাজ করতে চাইছে, বলছ। তাহলে তো আর কোনো ঝামেলাই নেই। কথাবার্তা বলো আরো। দেখো, কী হয়...'

ঝলকে উঠল রাধা। এক পাশে ছোটমতো একটা বাহারি কাঠের আলমারিতে হরেক ধরনের পুতুল আর কিছু বই সাজানোই থাকে সারা বছর। কেউ খুলেও দেখে না কোনোকালে। শুধু তাকেই প্রতিদিন ধুয়ে মুছে সেবাযত্ন করে যেতে হয়। কাচ মুছছিল। টিকটিকির মতো হাতটা কাচের গায়ে আটকে যায়। আটকেই থাকে। তাকে সামনে রেখে তারই জন্য সোহাগী ভালোমন্দের কথা বলছেন দুই মা— তাকে পেটে ধরেছে একজন, তার পেট চালিয়েছেন অন্যজন। ভাতকাপড়ের ঘর ছেড়ে জন্মের আঁতুড়ে ফিরতি যাবার পালা এবার? অচেনা আরেক নতুন ঘর এরপর? ব্যাটাছেলের ঘর?

কিংবা মেয়েকে নিশ্চিন্ত ঘর গড়ে দেবার বাসনায় আরো বেশি আগলছাড়া সুমতিবালা—'কার সনে কতাবাত্রা সব হবে গ মা? মুখপোড়া বুড়ো দাশু সামন্তিকে চেনেন নি গ! পিচেশ গ! এট্টা চামার। মেয়ে কি মাগনা নেবে নিকি? পছন্দ হবে ত ফর্দ ঝাড়বে এমনধারা...'

'সে-তো চাইবেই। মেয়ের বিয়ে দেবে, দিতেথুতে হবে না কিছু?'

'অ, সেই ত ভেবে ভেবে মরলুম। আমার মরণ। বছরভর পিতিদিন গতর ভেঙে খেটে মরচি পরের দোরে। সোয়াস্তি নেই। ঘুম নেই রেতের বেলা...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। সেসব পরের কথা। আগে তো কথাবার্তাটার্তা পাকা হোক তোমাদের। দিনক্ষণ ঠিক হোক। তারপর তো...'

সোফার ধারে গলা বাড়িয়ে আবার উবু হলেন কিরণময়ী। হামা দিতে এগিয়ে গিয়ে পিকদানিটা আরো একবার মুখের সামনে তুলে ধরল সুমতিবালা। স্বস্তি পেলেন মা-ঠাকুরুণ। রক্তবমি গোছের গলগলিয়ে দলায় দলায় মুখের লালা। দামি জর্দার গন্ধ। সুমতিবালা সুঘ্রাণ পায়।

পিক ফেলে গদির নরমে গা এলিয়ে, এরপরও মুখের গর্তে যা থেকে যায়, দাঁতেজিভে জাবর কাটার সুখে...সুখের আরামে পাশের ছোট টেবিল থেকে কী একটা যন্তর তুলে নিলেন ভাগ্যিমানী মা, ডান হাতের মুঠোয় চেপে কী করলেন, সুমতিবালা ভেলকি বোঝে না—বেশ খানিকটা দূরে টিভিটা চলতে শুরু করল নিজে থেকেই। হরেক রঙের শাড়িব্লাউজের জেল্লায় কী বলছেন একজন মেমসাহেবি মেয়েছেলে। বিদঘুটে ভাষা।

হাতের মুঠোয় আবার কী করলেন মা-ঠাকুরুণ? টিভি বন্ধ হয়ে গেল।

তাজ্জব সুমতিবালা। শুকনি বুড়ো দাশু সামন্তিকেও ভুলে যায়।

'উঠি গো রাধুর-মা...' শিরদাঁড়ার টানে মোচড় খেলেন কিরণময়ী। সোফার চওড়া

হাতলে হাতের-তেলো পেতে উঠে দাঁড়ানোব ভঙ্গি— 'তোমাদের কথাবার্তা সব পাকা হোক তাহলে! খবরটবর দিয়ো...'

শুধু খবর? সুমতিবালা কেঁপে উঠল। গাগতরে আড় ভেঙে মা-ঠকুরুণের উঠে দাঁড়ানোর আয়েশি ভঙ্গির দিকে পলক না ফেলে ভ্যাবাচাকা তাকিয়ে থাকার মূঢ়তায় তার হাপিত্যেশের চোখজোড়া ওপরের দিকে ঊর্ধ্বগ্রীবায় উঠে যেতে থাকে এবং সিংহাসনে সমাসীন মায়ের পায়ের কাছে বসে থাকলে যতটুকু, মা-ঠাকরুণেব উঠে দাঁড়ানোর পর, তাঁর হাঁটুর কিছুটা ওপরের দিকে মাথা ছুঁয়ে থাকার মাপে সে আরো খাটো হয়ে যায়। আকাশের দিকেই এমন করে তাকায় মানুষ। মস্ত আকাশের চালচিত্র যেমন, মেমসাহেবি গা-ঢাকা ঢলঢলে জামা নয়, সালঙ্কার শাঁখাসিঁদুব আব চওড়া-পাড় তাঁতেব-শাড়িব মাতৃপ্রতিমায সত্যি সত্যি ভগবতীরূপ। বাজবাজেশ্বরী মাযেব দিকে নয়ন মেলে নিস্পলক থেকে বুঝতে পাবে না সুমতিবালা, চাষের-জল দেবে কি দেবে না মেঘ? না-কী ওপবে-ওপবে ভেসেই চলে যাবে? আকুল হল সে—'মা গ'...

ঘাড় ফিবিয়ে নিচু চোখে তাকালেন কিরণময়ী।

পায়ের ওপর ভেঙেই পড়ল সুমতিবালা। বয়সেব মাপঝোক নেই। ছোটি যে, নিজেকে ছোটই মানবে সে। জগতেব নিয়ম। অঢেল আছে যাঁর, দু-হাত ভবে অভাজনদের দিতে পাবেন যিনি, তিনিই অন্নপূর্ণা। জন্মজন্মান্তরেব আর্তি তাঁর পায়ে—'রাধু ত আপনাদেব ঘবের মেয়ে মা গ...'

'আঃ, সে-তো বুঝেছি, সকাল থেকে কম কবেও হাজাববার শোনালে কথাটা...' এবার বিরক্ত কিরণমযী। খিঁচিয়ে উঠলেন—'কী বলছ? কী চাইছ তুমি?'

প্রথম ঝটকায় ভড়কেই গিয়েছিল সুমতিবালা। এমন সব সাহেববাজাব ঘরে কখন কী বলতে হয়, কেমন কবে বলতে বা চাইতে হয়,—কিছুই জানা নেই বলে যখন গলার কণ্ঠা-চাগানো লিকলিকে শরীবে, মাংসচর্বিশূন্য হাড়-চাগানো শুকনো চোয়ালে খবায-খরায় পুড়ে কালো যে-চামডা, সেখানে আকাশের দিকে উন্মুখ একজোড়া সজল চোখেব চাউনিতে ডোবাপুকুরের আকুতি—'দেশগাঁয়ে স্বজেতেব ঘবে এত বড এট্টা কাজ গ মা! মেয়ের বিয়েব কড়ি, মাযেব গলায দড়ি...'

'তা গলায় দড়ি দিতে বলছে কে তোমাকে? অত ঘটা কবে সানাই বাজিযে যজ্ঞিবাড়ি বানিযে মেয়ের বিয়ে দেবার দরকার কী তোমাব? যাব যেমন অবস্থা, সে তো তাই কববে...'

'দেশগাঁয়ে এমনধারা ভালো-ভালো কতা শুনবে কে গ মা? মিনসেগুলোব যা খাঁই। ছেলের বোতাম আংটি সাইকেল রিডিও। মেয়েব হাতে গলায কানে...' সাহসে ভব করে গুটিগুটি উঠে দাঁড়াল সুমতিবালা। প্রত্যাশায—'সে-আমি পাবব কেনে গ মা? একা বেধবা মেযেমানুষ।'

'কি জানি বাপু, বলছ তো কী যেন ক্ষেতে চাষটাস কী কবে। তোমাদেব গ্রামে কি চাষাবাও বাজপুত্তুর নাকি সবাই? এমন লম্বা লম্বা ফিবিস্তি? সবাই তো চাষা। আকাট মুখ্যু। শুনেছি তো, বাধুর মতো নিজের নামটুকুও সই কবতে পাবে না তোমাদের ছেলেরাও। ওদেরও এত ফুটুনি?'

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে সুমতিবালা। সাহেববিবিদের কথায় কথা জুড়তে ভয়। শুধু জানে, প্রার্থীকে নরম থাকতে হয়। সব কথা শুনে যাওয়াই নিয়ম।

'সে-যাকগে, করো যা তোমাদের খুশি...' জর্দা তো শুধু সুঘ্রাণ নয়, গালে ফেলে রাখলে পানসুপুরি থাকে অনেকক্ষণ। টোল-পড়া ভরাট গালে চিবুতে চিবুতে এগুনোর পথে একবাব ফিরে তাকালেন কিরণময়ী—'রাধুর জন্যে কিছু খরচাপাতি করতে হবে, সে-তো ধরাই ছিল আমার। ঠিক আছে। বিয়ের দিনটিন ঠিক হলে, বলো। দু-চার পাঁচশো কি হাজারখানেক টাকা যা লাগে, নিয়ে যেয়ো...'

পিছু পিছু পায়ে পায়ে গুটিয়ে ছিল সুমতিবালা। থমকে দাঁড়াল। তাকাল মেয়ের দিকে। আলমাবির গায়ে রাধার হাতটা তখনও টিকটিকি। কাচের দিকে মুখ করে, ঝাড়পোছের অছিলায় কোমর ভেঙে দু-হাত দুদিকে ছড়িয়ে পাথর হয়ে আছে সে-মেয়ে।

'ওর বিয়েতে কিছু একটা তো দিতেও হবে আমাকে। একটা আংটি কি কানেব দুল...যা দরকার মনে করবে, খবর দেবে। বলে দেখব'খন তোমাদের সাহেবকে...'

মুখের হাঁ বুজতে ভুলে যায় সুমতিবালা। ঝুলেই থাকে ঠোঁট দুটো। পলক নড়ে না চোখে। আদায়পত্তর কতটা হলো? কতটুকু ওজন তার? হিসেবের হদিশ বোঝে না।

'পিকদানিটা রইল রে রাধু...' বদলে গেলেন কিরণময়ী। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই প্রার্থীজনের দিকে—'মেয়ে দুটো কলেজ থেকে এসে যাবে এক্ষুনি। বসার ঘরে এসব নোংরা জিনিস পড়ে থাকতে দেখলে এমন চেঁচামেচি করে, পোকা ফেলে দেবে মাথায়। তুই বাপু সরিয়ে ফ্যাল আগে থেকেই। ধুয়েটুয়ে পরিষ্কার করে রাখবি।'

আনুগত্যে ছোট করে ঘাড় নাড়ল রাধা। স্থবিরতা থেকে নাড়া খেয়ে, হাতের-কাজ ফেলে গোমড়ামুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পেছনের দিকে পাটভাঙা তাঁতের শাড়ির আঁচল ছড়িয়ে মেঘের ভারে দুলকি চালে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছেন ভাতকাপড়েব-মা। ছাদদেয়াল মেঝের রঙে-রঙে রঙিন বিলাসী আসবাবপত্রের মাঝখানে তার জন্মেব মা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আস্ত একটা বেকুব। কাঙাল সেজেছে বুড়ি! কাঁদুনিও গেয়েছে বিস্তর।

কিংবা বিদেশবিভুঁইয়ে রংবাহারি রাজার-প্রাসাদে স্বস্তি ছিল না সুমতিবালারও। দুধের ছানা কেটে গেলে যেমন হয়, আলাভোলাভাবে আলগা হয়ে গিয়ে এগলো মেয়ের দিকে—'কি র‍্যা, কী বলছেন মা-ঠাকরুণ? কিছুই তো বুঝচি নে...'

'সরো, সরো দিকিন এখন। ঘরে যাও...' ঝামটা মারল রাধা। ভাতকাপড়ের-মা বসেছিলেন যেখানে, সোফার দিকে যেতে যেতে—'দাদাবাবু-দিদিমণিরা এসে যাবেন সবাই। কী একটা টেনা পরে দাঁড়িয়ে আছো? এখানে চলে না এসব। গোপালের-মা ববিব-মা কারুর আসাব নেয়ম নেই এঘরে।'

দিশেহারা সুমতিবালা। এ-তার মেয়ের ঘর নয়। অথবা মেয়েরই ঘর। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটা ঘরবাড়ি থাকতে পারে কোথাও, যদি মেয়ের সুবাদেই সেখানে প্রবেশ তার, জানে না প্রস্থানপথ। ইতিউতি চোখ রেখে দেখে মেয়ের হাতের কাজ। মা-ঠাকরুণের পিকদানিটা গদির আসনের আড়াল থেকে তুলে নিয়েছে রাধু। পরের হাতে পাত্র রেখে

ওভাবে পিক ফেললে সবটাই তো আর গর্তে পড়ে না। চেবড়ে-ছেবড়ে যায়। সুমতিবালার হাতে কবজিতে, এমন কি, কাপড়েও এসে পড়েছে ছিটেফোঁটা। সে-কিছু নয়। হাতে-হাতেই মুছে নিয়েছে। আঁচলে ঘষে নিয়েছে হাত।

মেয়েছেলেদের ওরকম ঘেন্নপাতি থাকলে তো ঘরসংসারের কাজকম্মো কিছুই চলে না তাহলে। নানাদিকে বিচ্ছিরি চ্যাবড়ানো পিকদানিটা ডান হাতে তুলে নিয়ে রাধা অবলীলায় এগিয়ে যায় টয়লেটের দিকে। শুধু তো মুখের লালাগুলো ফেলে দিয়ে জলধোয়া কবে রাখা নয়। সাবানের গুঁড়ো দিয়ে ঘষেমেজে সাফসুফ করে ফের গিয়ে রেখে আসতে হবে মায়ের ঘবে। গা-ঘিনঘিনানিব নোংবা কিছু রাখা চলবে না সাহেববাড়িতে। সব ফিটফাট।

এত বেশি ফিটফাট বড়মানুষেব ঘব, এক দুপুরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল সুমতিবালা। নিজের জন্য হাঁপনিঃশ্বাসের এক চিলতে কোণাখামচি তো খুঁজে পেতেই হয় মানুষকে। গরিবগুব্বোর ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ের মা? দুঃখুযন্ত্রণার কথা কি একটা? বান্নাঘরেব পাশে গোপালের-মা খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল একজন।

চোখে পড়তেই নিমেষে, নিতান্তই অসভ্যেব মতো, মাকে ছোঁ মেবে নিয়ে গেল রাধা। নিজের ঘরে টেনে এনে দরজাব খিল তুলে রীতিমত ঝাঁঝানি—'ও-বুড়ির সনে তোমার কী অত কতা? কী বকছ? কি বলতে কী বলে বসবে, সাতকাণ্ড করে লাগাবে মায়ের কাছে। ও-ডাইনি সব পারে।'

ভিনদেশে থানাপুলিশের ঘরে এসে মানতেই হয় মেয়ের শাসন। এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে সাবধানে গলা উঁচলো সুমতিবালা। চাপা গলায়—'সাহেববাড়ি-সাহেববাড়ি করে অ্যাদ্দিন মরলি র‍্যা তুই? এখনে কী বলছে র‍্যা মা-ঠাকরুন?'

'কেনে? কী বলেছেন?'

'দু-চার পাঁচশো কী বলচেন? ধরাকওয়া করলে বড়জোব হাজার ট্যাকা? কী হবে ওটুকুনে?'

'কেনে? সোনার আংটি দেবেন বলেছেন। নয়তো কানের দুল। সব মিলিয়ে কম হলো? কোনো হিশেব জানা আছে তোমাদের?'

'কিন্তু ওবা যে নগদাই চাইছে তিন হাজার...'

দুদিক থেকে কোমরে হাতের মুঠো ঠেকিয়ে ঠমক মেরে দাঁড়াল রাধা—'কেনে গ, ট্যাকা কি তোমারও কম আছে নিকি?'

'আমার ট্যাকা? কী বলচিস র‍্যা তুই?'

'পাঁচ হাজার ট্যাকা বেঙ্কে নিয়ে রেখে দিয়েছিলেন বামুনবাড়ির মেজকাকা। এই ক-বছরে আরো ট্যাকা পাঠিয়েছি গ! সবই বেঙ্কে সিঁধিয়েছ। সব মিলিয়ে কত হয়েছে শুনি?'

সুমতিবালা তাজ্জব। এমন একটা অলক্ষুণে কথা যে এখন, এই মুহূর্তে, এখানে উঠে পড়তে পারে, ভাবনার মধ্যে ছিল না বলেই আরো বেশি দিশেহারা। বিহিত পায না কথা বলার—'সে...সে-ট্যাকা ত পালানের নামে আছে র‍্যা বেঙ্কে...

'ওতে কী হল? মেয়েমানুষ সইসাবুদ জানে না বলেই না ব্যাটাছেলেদের নামে বেঙ্কে টাকা রাখার নেয়ম?'

সুমতিবালা বেহুঁশ খিঁচিয়ে উঠল—'ওটুকুন দুধের-বাচ্চা এট্টা ভাই। ওর কতাটা তুইঁ একবারটি ভাববি নে র‍্যা মুখপুড়ি? সবটা তুই খাবি? একা খাবি?'

এক ঝটকায় ভাইয়ের দিকে ঘাড় ফেরাল রাধা। তক্তপোশে ঘাপটি মেরে থেকে অবোধ চোখের চাহনিতে দিদিব দিকে তাকিয়ে ছিল ভীরু বালক। নিষ্পাপ চোখেব পাতায় ভয় কাঁপছিল। সাহেববাড়ি ভালো লাগছে না তার। বড্ড খাঁচা-খাঁচা।

কিংবা রাধা তার মাকে দেখছিল। জম্মের-মাকে। রান্নাঘর খাবার-ঘরের লাগোয়া ছোট কুঠুরিটুকু সাহেববাড়ির ঘব হযেও ঠিক সাহেববাড়ি নয়। দেয়ালে রং নেই, টিউববাতি নেই, পায়ের তলায় মোজায়েক নেই। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোয় অবিশ্যি ছোটমতো একটা পাখা আছে সিলিংয়ে। জানালাও রয়েছে পুবমুখো। অসম্ভব গুমোট। ঘরের গুমোটে আর গায়ের জ্বলুনিতে সাহেববাড়ির খাঁচা-খাঁচা ঘরটা দেশগাঁয়ের মেটেঘরের আদল পেয়ে গেলে রাধার নাকের ডগায় তার জম্মের-মা গোপালের-মায়ের মতোই কোন্ এক ডাইনিবুড়ি হয়ে উঠতে থাকে। কচুরিপানার শেকড়বাকড় একগোছ মাথার চুল, চিরুনি ছোঁয়ালেই হাত হড়কে ফুরিয়ে যায়। হাড়জিরজিরে রোগাপ্যাংলা চেহাবায় কুতকুতে দুটো চোখ, মেছেতাব ছোপে-ছোপে চুপসানো গালের থুতনিতে মুণ্ডুটা উঁচিযে আছে এমন, যেন গাগতর থেকে মুণ্ডুটা আলাদা। ঝুলো মাই আর গলার কণ্ঠায় বেঢপ ব্লাউজ, হাড়চিমসে ডিগডিগে হাতে-পায়ে মাংস নেই চর্বি নেই। ব্যাটাছেলেদের মতো কাঠ-কাঠ শুকনো হাড়েব ওপর খসখসে কালো চামড়ায় রগগুলো চাগিয়ে উঠেছে, বুড়ি বয়সে দাসীবাঁদিদের ঠিক যেমনটা হয়। গোটা শরীরে বিধবার সাজ—শাদা ধুতির লেপটানিতে গায়েব কালোটা এত বেশি কটকটে, সাহেববাড়ির আর-দশটা দাসীবাঁদী গোপালের-মা হারানের-মায়ের মতোই বাধার চোখে রাধুর-মা পালনের-মা হয়ে ওঠে। বিষ-নজরে তাকিয়ে থাকাটা তখন অনেক সহজ হয়ে যায় এবং একইভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার রাগে শরীরটা তেতে উঠেছিল এমন, রাধা লঙ্কাফোড়নে ঝাঁঝিয়ে উঠল—'আমার গতবপোড়ানি ট্যাকাগুলো ফোকটসে লুটে নিয়ে কাঙালের মতন ভিখ মেগে মেয়ের বিয়ে দেবে গ তুমি?'

'গতর দেখাচ্চিস কাকে ব্যা হারমাজাদি? কার দোবে কবে ভিখ মাগতে দেখলি র‍্যা তুই তোর মাকে?' নিজের দহনে বেহুঁশ সুমতিবালা। হাতপা পেটবুক সব নিয়ে দাপাদাপি। মুখচোখের খিঁচুনি নিয়ে গলাটা উঁচিয়ে ওঠে, কিছু একটা কামড়ে ধরতে চায় বলেই। হয়তো বা মেয়েকেই—'শ'রের রসে বড্ড বাড় বেড়েচে র‍্যা তোর সব্বোনেশী! দেমাকে পা পড়চে নি মাটিতে? মরণ হয় না র‍্যা তোর? নুলো ঘষে দিতে হয় এমনধারা বজ্জাত মেয়ের মুখে...'

'আআঃ, চিল্লাচ্ছ কেনে?' রাধাও ঝাঁঝিয়ে উঠল। একই রকম তিরিক্ষি--'এ-তোমার কুঁতিপাড়ার উঠুন পাও নি গ! ভদ্দরলোকের বাড়ি এটা। সাহেবসুবোর ঘর। বেশি দাঁত ঝাড়বে ত এক্ষুনি এসে ঘাড ধরে বের করে দেবেন মা।'

সুমতিবালা ভয় পেল। কেন না, কথাটা সত্যি। ভিনদেশের অচেনা শহরে বড়মানুষের

ঘর! ঢাকাচাপা বুকের তরাসে তাকায় এপাশ-ওপাশ বন্ধ দরজা বা খোলা জানলায়। মাথার ওপর বাহারি চরকির ফুরফুরে বাতাস বা চারপাশের বোবা দেয়াল—যেখানে অবাধে চলে ফিরে ঘুরে বেড়াতে পারে মেয়ে, সেখানে ঠাঁই নেই তার। হাড়পিত্তির জ্বলুনিতে তোতো বিঁষ ঝেড়ে ফেলতে পারলেও বুঝি কিছুটা শান্তি ছিল এবং বিদেশবিভুঁইয়ে পরের ঘরে সেটা করা যাচ্ছে না বলেই হয়তো হাঁপায় হাড়পাঁজরা ভেঙে। হাঁপাতে হাঁপাতে থেবড়ে বসে পড়ল তক্তপোশে। ককিয়ে উঠল নড়বড়ে পুরনো শস্তা তক্তা। চতুষ্পদ ভঙ্গিতে দুটো হাত সামনে ফেলে কুঁজো শিরদাঁড়াটা সোজা হতে চেয়ে যখন টনটনিয়ে উঠছে পিঠে, ঘাড় উঁচিয়ে নির্বিষ দুটো চোখ তুলে তাকাল মেয়েব দিকে। বুকের পোড়ানি সামলাতে গিয়ে গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত গোঙানি হয়ে ওঠে—'তোদেব বাপটা মল। জেবনভর জ্বলেপুড়ে পরেব দোরে নিত্যি খেটে খেটে মবচি, সে-কী শুধু আমার নিজের জন্যি র‍্যা আবাগি? এমনধাবা এট্টা কতা তুই বললি ব্যা? বলতে পারলি? মুখ খসে পড়ল নি তোব?'

'কবে তোমাব বুকে মাই চুষেছিলুম, সে-ত আব মনে নেই। জ্ঞান হওয়ার পব ক'টা দিন আর তোমাব অন্ন গিলেছি গ আমি?'

সুমতিবালা আঁতকে উঠল। হালুমমাবা চোখেব সঙ্গে মিশে গিয়ে হাঁ-কবা ঠোঁট দুটো গোটা মুন্ডটাকেই পাথর বানিয়ে দেয়। বোবা জিভটা নিষেধ মানে না—'হ্যাঁ র‍্যা, কী বলছিস তুই? এসব কী কতা?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বেঙ্কেব ট্যাকা আমাব হকেব ট্যাকা, রোজগাবেব ট্যাকা। সব ফেরত চাই আমার...'

অবশ নিঝুম সুমতিবালা। কোনো গাজোয়ারি নয়, আস্তে আস্তে থিতু হয়ে আসা অবাক চোখজোড়া একটা আপস মানতে চায়—'বেথা'ব কথা চলচে ব্যা তোর! আজ বাদে কাল দেখতে আসবে তোকে। এমনধারা কবচিস কেনে তুই? নিজের বিয়েব খরচাপাতি তুই নিজে করবি? আদিখ্যেতায় বলবে কী দশজনে?'

'সে-যার মন চায়, বলবে। আমাব ভারি বয়েই গেল...' পাছায় ঠমকে মেরে ছলকে দাঁড়িয়েছে রাধা। এলোচুলের ঝাপট ঘাড়ে পিঠে—'সাধেব জামাই আনবে ঘবে? শুধিযো গ, টিভি আছে কিনা ঘরে? না থাকে তো আমার ট্যাকা আমায় দেবে। কিনে নিয়ে যাব।'

রা নেই সুমতিবালার। পলক নেই চোখে। সাহেববাড়িব পবম বিস্ময় নিজের মেয়েকেই সে দেখে অবাক চোখে। এ-বিষহরা মনসাকে কে নেবে গো ঘরে? নিজেই তুলে নিয়ে যেতে পাববে কিনা দেশের বাড়িতে—গাঢ়তব সংশয।

সাহেববাড়ির ভয়ে ঘবের ভেতব গুটিয়ে ছিল পালান। মা আব দিদিব ক্যাঁচালে সাহস ছিল না কথা বলার। দিদি যখন এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে, খিল তুলছে, ঝটপট লাফিয়ে নিচে নেমে বাইরে এসে গুটিগুটি দাঁড়াল দরজার পাশে—'ওখেনটায়, ওই বারান্দায় যাব র‍্যা দিদি?'

রাধা হেসে ফেলল—'দোতলার বারান্দায় কেনে র‍্যা? চল তোকে ছাদে দিয়ে আসি। সে-ত আরো উঁচু। তিনতলা। বাঘা যাবে নি ওখেনে। কেউ যাবে নি।'

পাহাড় দেখেনি পালান। দেশগাঁয়ে দোতলা অব্দি পাকা দালান আছে দু-চারটে। কলকাতায় এসে পাঁচতলা সাততলা দশতলা উঁচু উঁচু তাজ্জব সব বাড়ি দেখেছে দূর থেকে। সিঁড়ি ভেঙে বা চড়াই ডিঙিয়ে সমতলের ঊর্ধ্বে ওঠে নি কোনোকালে। ছাদের কার্নিশে বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে, গলা বাড়িয়ে, আকাশ থেকে রাস্তা দেখবে সে। এমন কি, রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছগুলোরও ডগা ছাপিয়ে অনেক ওপর থেকে তলার দিকে গড়িয়ে নামবে তার দৃষ্টি, যেখানে রাস্তার পথচলতি মানুষ, বড় বড় মানুষদের দামি দামি হরেক রঙের গাড়ি সবই ক্ষুদে ক্ষুদে। সবাই পুতুল হয়ে যায়। •

পুতুল নয়, ভাঙা পুতুলের যেমন দশা, সাহেববাড়িতে দিন দুয়েকের মধ্যেই আস্তে আস্তে যেভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ-ই বড় বেশি ফালতু হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় রাধার বুক ঠেলে উগরে ওঠা কান্নাটা আর চোখের জলে নয়, দাঁতচাপা ক্রোধের আগুনে একসময় কঠিন হয়ে উঠল।

টিভির বিজ্ঞাপনে চেনাজানা সাহেবি জগতের সব কিছুই যে সাহেববাড়িতে নেই, জানা ছিল তার। ডিশ-অ্যান্টেনার একটা আবদার অনেকদিন থেকেই চলছিল দাদাবাবু-দিদিমণিদের। কিছুই বলছেন না সাহেব। ছোটখাটো আরো একটা গাড়ি দরকার। গাড়িটা ঘরেই থাকবে। দাদাবাবুর পর দিদিমণিরাও গাড়ি চালাবার লাইসেন্স পেয়ে গেছেন। বাড়তি ড্রাইভার রাখার প্রয়োজন নেই। সাহেব চুপচাপ।

কিন্তু রাতারাতি কী একটা যন্তর পৌঁছে গেল সাহেববাড়িতে। ভরদুপুরে এগারটা নাগাদ একটা মেটাডর এসে থামল সদর দরজায়। লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন কুমারটুলি থেকে মূর্তি এনে ঘরে তোলার মতো চার-পাঁচজন পুরুষমানুষ ঘেমেনেয়ে হল্লা বাধিয়ে বেশ বড়সড় ধবধবে শাদা একটা লোহার সিন্দুক যখন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে তুলতে লাগল, প্রথমদিকে বুঝতেই পারেনি রাধা, জিনিসটা কী? দাদাবাবু-দিদিমণিরা কেউ ছিলেন না বাড়িতে। সাহেব আপিশে বেরিয়ে গেছেন। শুধু মা নিজে একা দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছেন। নন্দদাকে থাকতেই হয় মা-র পাশে পাশে। রাধার খুব একটা আমল ছিল না। এই প্রথম সাহেববাড়িতে গাগতর ঢেলে কোনো কাজে মায়ের কাছে পাত্তা না পেয়ে খারিজ হয়ে যাচ্ছিল সে। ফোঁপানি জমছিল বুকের ভেতর। বোঝাই তো যায় গানবাজনা বা অন্য কোনো শখের জিনিস কিছু নয়। ঘরসংসারের প্রয়োজনেই কোনো নতুন যন্তরপাতি। সাহেববাড়ির প্রয়োজনে রাধা নেই? রাধাকে বাদ দিয়ে সাহেববাড়ি? কান্না পাচ্ছে তার।

দোতলায় বড় বাথরুমটা সত্যি অনেক বড়। অঢেল জায়গা। ছোট ছোট চৌকোমতো শাদা টাইল বসানো দেয়ালের গা ঘেঁষে যন্ত্রটাকে বসানো হলো একপাশে। যেদিকে গিজার ঝুলছে, তার উল্টোদিকে। জলের ট্যাপ দুটোর খুব কাছাকাছি।

গোপালের-মার ভারি দায় পড়েছে এসব বড়লোকি হুজুগের রগড় দেখার। এক দুপুরের জন্য এসে দু-রাত্তির থেকে যেতে হচ্ছে সুমতিবালাকে। এমনিতেই অশান্তির শেষ নেই। জানেও না এত বড় বাড়িতে কী হচ্ছে কোথায়। ইঁদুরের মতো চুকচুক

ছিল পালানের। কিন্তু সাহেববাড়ির মা টানটান চোখে যেভাবে চলছেন ফিরছেন, রাধার সাহস ছিল না ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়বে হাজার হাজার টাকার মেশিন বসানোর ভিড়ে। কিন্তু সে নিজে ছিল। তার কোমর অব্দি উঁচু দুধশাদা একটা যন্ত্র। অনেকটাই লোহার সিন্দুকের মতো। সিন্দুকের মাথায় সামনের দিকে সুইচফুইচ, মেশিন চালাবার হবেক ব্যবস্থা। মোটর গাড়ির হেডলাইটের চেয়েও বড় মাপের কাচ ঢাকা গোলমতো কী একটা আছে সামনের দিকে, ঠিক মাঝখানে। উঁকি দিলে বুঝি ভেতরটাও দেখা যাবে। প্লাগ-বসানো ইলেকট্রিকের তার ডানদিকে। পেছন থেকে বেরিয়ে মস্ত লম্বা একটা রবারের নল!

লোকজন নিয়ে মেশিনটা পৌঁছে দিতে এসেছেন ফর্সা শার্টপ্যান্টের যে-ভদ্রলোক, মা-র হাতে কাগজপত্র তুলে দিয়ে সব কিছু বুঝিযে দেবার ফাঁকে বারকযেক বলেছেন নামটা। শুধু তো নাম নয়, কিছু শোনার আগে রাধা বুঝে ফেলেছে সবটাই। টিভির বিজ্ঞাপনে যে-যন্তরটাকে সে দেখেছে অনেক...অনেকবার। সুন্দর একটা গান হয়। গানের সুরে সুরে হতকুচ্ছিত নোংরা প্যান্টশার্ট, মেয়েদের রঙিন জামাকাপড় ধুয়েমুছে পলকে পলকে ঝকঝকে চকচকে হয়ে বেরিয়ে আসে মেশিন থেকে। ঝলমল ঝলমল পোশাকের জেল্লায় গানে গানে সাহেবসুবো ছেলেমেয়েরা ব্রেকড্যান্স নাচে বাহারি হলঘরে। সেই গানের কথা সুর পা-নাচানোর পাছা-দোলানোর তাল মুখস্থ তার। বিজ্ঞাপন নয়, ছবি নয়। জ্যান্ত মেশিনটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে হাড়েমজ্জায় জলবিচুটির জ্বালায় চেনা-গানের কথাসুরধ্বনি যখন গুনগুনিয়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতবে, রক্তে রক্তে, দাঁতে দাঁত চেপে দেখে যাচ্ছে সে, কী করছে লোকটা? কী বলছে মাকে?

ডানদিক থেকে লম্বা ইলেকট্রিকের তার খুলে নিয়ে বাথরুমের সুইচবোর্ডে এঁটে দিলেন।। বাঁদিক থেকে রবারের নলটা ছড়িয়ে দিলেন ওপাশে নর্দমায় ঝাঁঝরির দিকে। আরো একটা নল? মেশিনেব গা থেকে নলটা নিয়ে গেঁথে দিলেন জলের ট্যাপে। হাত রাখলেন, টেবিলের ওপর সবাই হাত রাখে যেমন—সামনেব দিকে কী একটা ড্রয়ারগোছেব—'এটা ডেটারজেন্ট বক্স। আপনার দরকারমতো হিশেব করে পাউডাব রাখুন। দেখুন, দুটো ভাগ আছে। কটন? সিল্ক অর সিনথেটিক? কালার অর হোয়াইট? খুব বেশি নোংরা? না-কী অল্পসল্প? সব রকমের মেশাবেন না একসঙ্গে। আলাদা আলাদা কবাই ভালো...'

'দাঁড়ান দাঁড়ান...' ইশকুলেব-পড়ায়-হিমশিম মা দু-হাত তুলে হাঁপিয়ে উঠলেন —'হড়বড়িয়ে এমন বলে যাচ্ছেন আপনি? কোথায় কী কতটুকু সাবান লাগবে, এ-ছাই এত সব বুঝব কী করে?'

'বুঝবেন বুঝবেন। দু-চারদিন ব্যবহার করুন। ঠিক বুঝে যাবেন। পনের হাজার টাকার একটা মেশিন! আপনারা না বুঝলে কোম্পানির চলবে কী করে? আমবাই বা যাব কোথায়?' হাসছেন ভদ্রলোক। হাতে হাতে দেখিয়ে যাচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলি —'এটা সুইচ কন্ট্রোল বোর্ড। অপারেশনের জন্যে সবগুলোই বুঝে নেওয়া দরকার —পাওয়ার ইনডিকেটর, ওয়াশ-টাইমার, সাইকল-সিলেক্টর, স্পিন টাইমার...'

মা'র গা ঘেঁষে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল রাধা। খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে চেষ্টা

করছিল। কী সব ইংরেজি শব্দ! শব্দগুলো পর-পর মাথায় চাঁটি মেরে যায়। বোঝা গেল না কিছুই। কিংবা গোটা যন্তরটাই একটা ধাঁধা। এটা হঠাৎ কেন এল? গত রাতের সকলের সমস্ত বাসি জামাকাপড়, দুপুবেলার স্নানের ভেজা কাপড়চোপড় সবই ডাঁই হয়ে পড়ে আছে বাথরুমের কোণে। সবগুলো তুলে নিয়ে একতলার কলতলায় বসে এখন তার কাপড়-কাচার সময়। আর-এখনই, এই ভরদুপুরে যন্তরটা এসে গেল আচমকা? কোণের দিকে স্তূপীকৃত ছাড়া-কাপড়ের গাদায় চোখ রাখল একবার। সব কাপড় একসঙ্গে নয়, হাঁটু ভেঙে উবু হয়ে বসে একটি একটি করে মেঝেতে ফেলে সাবান ঘষে ঘষে নয়তো গুঁড়োসাবানের ফেনা-তোলা গরম জলের বালতি থেকে একটি একটি করে তুলে নিয়ে গোটা বাড়ির তোলপাড়ে আছড়ে আছড়ে যখন তার দুটো হাতের ওঠাপড়ার সঙ্গে গোটা শরীরটাই—খাবলে-ধবা দশটা আঙুলের টানে দুটো কবজি কনুই, কাঁধের হাড়গোড়, বুকের ফুসফুস, পেটের নাড়িভুঁড়ি, মুখের হাঁ, নাকের নিঃশ্বাস, শিরদাঁড়ার ভাঙচুরে পাছা অব্দি হাড়মাসের ব্যথায় যন্ত্রণায় কতটা দেহের ঘাম বা কতটা সাবানজলের ছাঁট—শাড়ি শায়া ব্লাউজে সর্বাঙ্গে ভিজে ধোয়াধুয়ির শেষে, হয়তো আলাদা করে কলপও দিতে হবে কোনো কোনোটায়, গায়ের সমস্ত শক্তি ঢেলে নিংড়ে নিংড়ে, আসলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নিজেরই রসরক্তঘাম নিংড়োতে নিংড়োতে প্রতিটি জামাপায়জামা জাঙিয়া গেঞ্জি ব্রা স্কার্ট ব্লাউজ শাড়ি শায়া হাউসকোট নাইটি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে প্লাস্টিকের গামলায় ভরে কাঁখে বইতে, যখন ডান কাঁখের ভারে প্রতিটি সিঁড়িতে পেটেবুকে হাঁপ ধরে যায়, তখনও টেনে টেনে একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে ছাদে পৌঁছানোর পর কেনো রকম জিরনি ছাড়াই দড়িতে দড়িতে জলঝরানো প্রতিটি জামাকাপড় ক্লিপ এঁটে রোদ্দুরে মেলে দিয়ে নিচে নেমে আসতে, অর্থাৎ কাচাকাচির পুবো পাট চুকিয়ে হাতে পায়ে বিশ্রাম নিতে প্রতিদিন কমসে-কম একঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা, কোনো কোনো দিন হয়তো তারও চেয়ে বেশি কিছুটা সময় লেগে যায়ই তার।

তা লাগুক। সবই তো আর লন্ড্রিতে বা ড্রাইওয়াশে যায না। নিদেন ঘরে পরার জামাকাপড় ঘরে কেচে কলপ দেবার পর বড়জোর ইস্তিরিতে যায়। রাধাকেই করতে হয় সব। ঝকঝকে পোশাকে দাদাবাবু-দিদিমণিরা, এমন কি মা আর সাহেবও যখন ঘরে ঘবে ঘুরে বেড়ান, সবার মতো রাধাও তো নয়ন মেলে দেখে বঙের চেকনাই। লাখ টাকাব মানুষ সবাই। বাহারি কাপড়চোপড়েই তো ইজ্জত!

তাহলে? তাহলে এই মেশিনটা কেন? দাঁত-কিড়মিড় আক্রোশে যন্তরটার দিকে তাকিযে থেকে এবং একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পলক না ফেলার বাগে গায়ের জ্বলুনিই বাড়ে। মানুষ যা পাবে, সব পারবে মেশিন? প্রতিপক্ষ তার, তাব শত্তুর। সোজা শিরদাঁড়ায় টানটান হয়ে ওঠে শরীরটা। দু-হাতের আঙুলগুলো এলোমেলো কচলানি থেকে শক্ত মুঠোয় জমাট বেঁধে যায়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জ্বলুনিপোড়ানিতে নিজের মধ্যেই নিজেকে আঁটোসাটো বেঁধে নিয়ে গা-গতবে পেশি খোঁজে রাধা। মেয়েদের হাড়মাসের গড়ন ঠিক ব্যাটাছেলেদের মতো নয়। দত্যিদানোর ধাঁচে ওদের হাতেপায়ে যেভাবে ফুঁসেফেঁপে ওঠে লোহাপেটাই মাংসের ডেলা, মেয়েছেলেদের কোমল নরম মাংসে থাকবে কেন তেমন? তাহলে আর মেয়েছেলে কেন? ছিঃ!

কিন্তু তাকত? খাটাখাটুনির হ্যাপা? এত কাঁড়িকাঁড়ি ভেজাকাপড় ছাদে টেনে নিয়ে রোদে দিয়ে আসতে পারবে মেশিন? শুকনো কাপড় তুলে নিয়ে আসতে পারবে? ইস্তিরিও কি মেশিনেই হয় নাকি? ইস্তিরিও তো যন্তরই একটা। হিটারের মতো অনেক ছোট। ওতে ফালতু হয়ে যায় না খাটাখাটনির মানুষরা কেউ।

রাধা চমকে উঠল।

'স্পিনড্রামটা খুলে ফেলুন। বাইবেব দিকে, ভেতরেব দিকে দুটো ঢাকনা...' ঝাঁই করে মেশিনের গা থেকে ডালাটা খুলে ফেলল লোকটা—'দিন, সাবান দিন...'

মা আর তাকাচ্ছেন না ডানে বাঁয়ে। বুঝি বাধা নেই। নিজেই ছুটে গিয়ে গুঁড়ো-সাবানের প্যাকেটটা নিয়ে এলেন বাথরুমের র‍্যাক থেকে। ভদ্রলোকও এক কোণে ফেলে-রাখা কতগুলো শুকনো কাপড় তুলে নিয়ে অদ্ভুতভাবে দলা পাকাতে লাগলেন হাতে-—'ড্রেন সিলেক্টরটা ঠিক করে নিন। ওয়াটার সাপ্লাই সিলেক্টর দেখুন ভালো কবে। ভেতরের টবটা পরিষ্কার হয়ে যাক...'

হাতে হাতে যন্ত্রপাতিগুলো দেখিয়ে যাচ্ছেন—'নাউ পুট ইন ক্লোথস অ্যান্ড অ্যাড ওয়াটাব আপটু ডিসায়ার্ড লেভেল, ঠিক যেভাবে ওয়াটাব লেভেল সিলেক্টব সেট করেছেন। জলেব ফ্লো বুঝে নিন। খুব জরুরি। কোথায় কতটা জল দরকার আপনার, হিশেবটা আমাদের লিটারেচারেই পেয়ে যাবেন। প্রথম দিকে একটু উনিশ-বিশ হয়ে যেতেই পারে। ও-কিছু না। ইউজ করতে কবতেই দেখবেন সড়গড় হয়ে গেছে সব...'

আরো কী সব বলে গেলেন ভদ্রলোক। কত কী বোঝালেন। কিছুই বুঝল না রাধা। ঢাকনা ফেলে দিয়ে মেশিনটা চালু হয়ে যাওয়ার পর ভদ্রলোক নন, মেশিন নয়, মুখেচোখে থই খুঁজে না-পাওয়া মায়েব দিকেই তাকিয়ে থাকে সে। মেশিনফেশিনে এমনিতেই খুব একটা হাত দিতে হয় না যাঁকে—মিকশার গ্রাইন্ডার ছুঁয়েও দেখলেন না কোনোকালে, গ্যাস সিলিন্ডার ফুরিয়ে গেলে পাল্টাপাল্টি করতে এখনও যাঁর ভয়, নিজের হাতে টিভি চালালেও ভি. সি. আর. চালাবার কায়দা বুঝলেন না, কিংবা রাধা আছে বলেই হয়তো হাজার কয়েক টাকা খরচা কবে ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার কিনে ফেলেই রাখলেন ঘরের কোণে। তাঁবই ঘরে কাপড় সাফাইয়ের এমন ঢাউশ একটা মেশিন চলবে কতদিন? চালাবে কে? দিদিমণিরা? ভারি বয়েই গেছে ওদেব। নতুন কেউ আসবে এ-বাড়িতে? নতুন রাধা?

রাধা মোচড় খেলো। মায়ের দিকে আবার চোখ ফেরালেন ভদ্রলোক,—'দেখুন এখানে সাইট-উইন্ডো দিয়ে কীভাবে কী হচ্ছে দেখে নিতে পারেন...'

ঘাড় নিচু কবে মেশিনেব ওপব ঝুঁকে পড়েছেন মা। রাধার নিজেরও কৌতূহল ছিল। এবং উঁকি দিতেই স্পষ্ট দেখা যায়, মেশিনের দলাইমালাইয়ে কীভাবে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে দামি দামি জামাকাপড়গুলি। শানবাঁধানো মেঝেতে ফেলে রাধার আছড়ানিতে কি ওরা বেশি কষ্ট পেত? মেশিনে জামাকাপড় কি বেশি ফর্সা হয়? ছেঁড়ে ফাটে কম? ওত পেতে সাবান ফেনায় পাক-খাওয়া ওদের যন্ত্রণাব দিকে তাকিয়ে থেকে যেন নিজেরই মধ্যে বুকেপেটে মোচড়ানিতে অস্থির হয়ে উঠতে থাকে সে। সরে এসে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে, মনে মনে, নিজেরই বাহুবল আর মাংসপেশির হিসেব খোঁজে।

মেশিনের পর মেশিন এসে জায়গা দখল করে নিচ্ছে সাহেববাড়ির? কী ভীষণ শান্ত নির্জীব। রক্তমাংসের মানুষেরই যত মরণ?

'সব তো হলো। মাত্র একবার দেখেশুনে এ-ছাই আমি কি সব করতে পারব?' অসহায়ত্বে কিরণময়ী নিজেও বিব্রত কিছুটা—'আমার মেয়েরা থাকলে ভালো হতো। কিন্তু ওরা দুজনই তো কলেজে বেরিয়ে গেছে। আরেকদিন আসতে পারবেন আপনি? আপনার যেমন সুবিধে। টেলিফোন করে আসবেন। ওদের থাকতে বলব...'

'আপনি বুঝলে হবে না? কেন, কী অসুবিধে হচ্ছে বলুন।'

'না, ঠিক তা নয়। আসলে ও...' চকিতে রাধার দিকে তাকালেন কিরণময়ী—'ও-ও যদি সবটা বুঝে নিত ঠিকঠাক, ঝামেলা মিটে যেত...'

ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়েছেন সরাসরি। রাধা নাড়া খেলো।

'কিন্তু সেও তো হবে না। আমার সংসারের কাজকম্মো ও-ই করেছে এতকাল। এখন ওর মা এসে বসে আছে। মেয়েকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে...'

আঁচল টেনে নাকমুখ চেপে রাধা, নিজেকে যেটুকু সামলে ছিল এতক্ষণ, আর স্থির রাখতে না পেরে থরথরিয়ে ভেঙে পড়ল। সপাটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে যখন ওর পেছনের দিকেই থেকে যাচ্ছে স্নানের ঘর, মেশিনের ঘর, কী শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দরজায়।

'একটা কথা বলব? মনে করবেন না কিছু?'

'বলুন।'

'এ-আপনাদের নিজেদের ঘরের ব্যাপার, আমার তো বলার কথা নয়। তবু বলছি, এ-আপনারা নিজেরাই অপারেট করবেন। যত ইন্টেলিজেন্ট আর ফেথফুলই হোক, এদের হাতে না দেওয়াই ভালো। আমরা এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি, গ্যারেন্টি পিরিয়ডের আগেই যে-মেশিনগুলো খারাপ হয়ে যায়, তার বেশির ভাগই মিসহ্যান্ডলিংয়ের জন্য। বুঝতেই তো পারছেন, সফেস্টিকেটেড মর্ডান টেকনলজি! হাইলি সেনসিটিভ! টেকনিকাল ডিটেলগুলো তো বুঝে নেওয়া দরকার...'

কিছু বুঝল বা বুঝল না রাধা, ছিটকে সরে এল। তার এতকালের চেনাজানা গোটা সাহেববাড়িটাই তখন ভেজা-ভেজা চোখের ঝাপসায় কোন্ এক রূপকথার রঙিন মায়ায় রংবাহারি আলোয় আলোয় বাতাসে অলীক স্বপ্ন হয়ে উঠতে চাইছে। রাধু ছিল রাধু আছে, রাধু নেই। ভরদুপুরে নিঝুমে যখন সাড়াশব্দ নেই কোথাও, শব্দ নেই ধ্বনি নেই কথা নেই কলরব নেই, দূরে বা কাছে কোথায় কোন্ আড়াল থেকে দুটো একটা কাক ডাকছিল। আসলে সেটাও কোনো চিৎকার নয়। বুকের ভেতর গুমরে-মরা কান্নাটাই বাইরে নৈঃশব্দ্যের ধ্বনিতে আর্তনাদ হয়ে উঠছিল। এ-বাড়িতে রাধা নামে কেউ ছিল একদিন। রাধু বলে কেউ আর ডাকবে না কাউকে? সারাদিন ধরে ঘরে বারান্দায় রান্নাঘরে দোতলায় একতলায় ছাদে কাজেকর্মে ছুটে ছুটে বেড়াত যে-মেয়ে, থাকবে না সে? সাহেববাড়ির সত্যিটাকে চোখের জলে ভাসিয়ে রেখে এখন, এই মুহূর্তে, সে তার নিজের না-থাকার শূন্যতায়, দিশেহারায়, কোথাও গিয়ে মুখ লুকোতে চায়। তার তরতাজা দুটো হাত কেনা হয়ে গেল পনের হাজার টাকায়? পা দুটো আছে এখনও। ফাইফরমাশের

কেনাকাটায় হামেশাই রাস্তায় যেত দোকানপাটে। একজোড়া পা বিকোবে কত টাকায়? ঘরধোয়া ঘরমোছা টেবিল চেয়ার আলমারি হরেক আসবাবপত্তর সাফ করতে নতুন করে চালু হবে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার? সাতসকালে ঘরে ঘরে বিছানাপাটি তোলার জন্যেও কি কোনো যন্তর আছে ওদের? কিংবা বাঘা? সকালে-বিকালে একটা খেঁকুরে কুত্তাকে সামাল দেবার কোনো মেশিন? মেশিন সোহাগ জানে? মানবে জ্যান্ত বাঘা?

মেশিন? শুধু কি যন্তরপাতি দিয়েই সব কিছু চলবে এর পর? রাধুর বদলা মেশিনে, শুধু মেশিনের ভেলকিতে ভরে উঠবে সাহেববাড়ি? রাধা থাকবে না। রাধা দেখবে না। রাধা যাবে কোথায়?

কোথাও গিয়ে কান্নার ঠাঁই নেই। তার নিজের ঘব বলে বরাদ্দ যে-অন্ধকাব কুঠুরিটুকু, সেখানেও আজ পালানভাই আর পযসাখেকো মা। সে দেখতে চায় না কারুর মুখ। কোথাও কিছু নেই তার। কেউ নেই। ঘরবারান্দা পেরিয়ে ছুটে যায় সিঁড়ির দিকে। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দোতলা থেকে ওপরের দিকে উঠে যাওয়ার তাড়ায় গোটা সাহেববাড়িটাই যেন তার পায়ে পায়ে উঠে যেতে থাকে এবং সে হাঁপায়, হাঁপাতে থাকে। দোতলা আর তিলতলার মাঝামাঝি ফাঁকা আর ঘেরাটোপের সিঁড়িবারান্দায় পৌঁছে ধপাস করে বসে পড়ল ছাদে-ওঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপে। পিঠের আঁচল টেনে সজোরে ঘষে ঘষে নাকমুখ ঘাড় গলা মুছতে থাকে ছালচামড়া ছিঁড়ে ফেলার কঠিন ক্ষুব্ধতায়। পরের দোরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চাইলেই তো আর থাকা যায় না জোর করে। মেয়ে হয়ে জন্মালে এমনটাই হয়। গাছ নয়, আগাছাও নয়—বাহারি টবে ফুলগাছের শোভা। হাতে হাতে এখান-ওখান করা যায়। গোড়া শুকিয়ে গেলে টেনে উপড়ে ছুঁড়েও ফেলে দিতে পারে কেউ।

সিঁড়ির নির্জনে শিরদাঁড়া ভেঙে মাথা নুয়ে বসে, দুটো হাঁটুব জোড়ায় মুখ লুকিয়ে ছিল সে। ভরা-কলস উপুড় করে এক-বুক কান্নাকে উজাড় করে দিতে চেয়ে কাঁদতেও পারে না নতুন দোনোমনোয়। সজল চোখের ধারায় দুটো গাল ভিজিয়ে আস্তে আস্তে মুখ তুলল সামনের দিকে। প্লাস্টার অব প্যারিস সে জানে। গাঢ় হলুদ রঙেব মসৃণ দেয়ালে ছিটেফোঁটা দাগ নেই, আরশোলা-টিকটিকির সাহস নেই এগোবার। সিলিংয়ের কোণে-খামচিতে এতটুকু ঝুলও সে কোনোদিন জমতে দেয়নি সাহেববাড়িতে। চোখজোড়া ভাসিয়ে রেখে বোবা দেয়ালেব দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। তাকিয়ে থাকার কোনো লক্ষ্য নেই অর্থ নেই কারণ নেই। আদবে হাত বুলনোর পাথুরে দেয়ালও বড্ড নরম বড় আপন হয়ে উঠতে থাকে চোখজোড়ায়। কিংবা তার চোখজোড়াই ন্যাবা।

বিয়ে তো করতেই হয় মেয়েদের। জন্মের ঘর ছেড়ে সবাইকেই যেতে হয় পবের ঘরে। আইবুড়ো থাকবে কেন? ছ্ ছিঃ!

কিন্তু কার ঘর থেকে কোন্ ঘর ছেড়ে কোথায় যাবে সে? ঘর ছাড়াব জন্যে জীবনভর কাঁদবে কতবার?

...

রাধা চলে যাবে এবং কাল সকালেই। ওপরতলায় গুড়গুড় কথাবার্তা বা ভাবনাচিন্তাটা

শেষপর্যন্ত নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠার পর সাহেববাড়ির দেয়ালে দেয়ালে কোথাও এক চিমটি চুনবালি খসে পড়ল কিনা কোথাও, খুঁজে পেতে দেখল না কেউ। যথাবিহিত কাজকর্ম বা নিয়মবিধিতে অন্যথা ছিল না কিছু। কিন্তু হাসপাতালে আধিব্যাধির বিছানায় শুয়ে মানুষ যেমন করে তার চারপাশকে দেখে বা সচল নার্সদিদিমণি বা ডাক্তারবাবুদের দিকে সকাতর মুখ তুলে কৃপাভিক্ষা খোঁজে, রাধা ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যেতে থাকে একই নিয়মে।

যেহেতু তার ছুটির তালিকা বলে ছিল না কিছুই, সে জানে, এ-বাড়িতে তার অলস বিবিয়ানি, এক দুপুরের জন্য হলেও, নিজের গায়েই সইবে না। শেষ দিন অব্দি সব কাজই তাকে করে যেতে হয় যথানিয়মে এবং কাজে কাজে তার দেখার চোখটাই বদলে যেতে থাকে ভিন্ন ভাবে। সে বিষাদ খোঁজে চরাচবে। আজই প্রথম কলেজে বেরুবার আগে, মাকে ছাড়াও রাধাকে ডেকে বলে গেছেন দিদিমণিরা। মুন্নিদিদি কাঁধে হাত রেখে তাকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। আইঢাই তড়বড়ানিতে বুল্লিদিদির হাতে সময়ই থাকে না কথা বলার। বলে গেছেন—'আজ তো আমার এক বন্ধুর জন্মদিন আছে সন্ধেবেলা। কলেজ থেকে ফিরেই যেতে হবে। রাতে ফিরে এসে কথা বলব তোর সঙ্গে...'

দাদাবাবু? তাগড়াই জোয়ান লোকটা সকাল থেকেই কাছেপিঠে এসে ঘুরঘুর করেছে বার কয়েক। ফিরেও তাকায়নি রাধা। ঠোঁটগাল কাঁপছিল, কান্না ভাঙছিল বুকে। কী আর করতে পারে সে? বোঝাপড়ায় হিসেব মেলানোর মতো কিছুই তো ছিল না তার।

শেষদিনে আজই সে ওঁদের ঘরে ওঁদের সকলের বার্থডে কেক হয়ে উঠেছে হঠাৎ। চারপাশ ঘিরে ন'বছরের ন'টা মোমবাতি জ্বেলে যে-যার মতো কেটে কেটে ওকে আস্বাদন করতে চাইছে সবাই। এত কাটাছেঁড়ায় রাধা মোমবাতির মতোই গলে গলে দগ্ধে দগ্ধে মরে যেতে থাকে।

মায়ের দিকে তাকাতেই পারছে না সে। প্রতিদিনের মতো আজও কাজেকর্মে মায়ের পায়ে পায়ে চলতে হচ্ছে তাকে এবং চোখে চোখ পড়লেই দাঁতে ঠোঁট চেপে হাড়পাঁজরার ভাঙনে মুখ ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে বারবার। দুচার বছর তো নয়। সেই বাচ্চা বয়স থেকে একটু করে জ্ঞান হওয়ার সব কিছু নিয়ে সে বড় হয়ে উঠেছে এই মায়েরই কাছে। তার ভাতকাপড়ের-মা। তার নিত্যদিনের নিত্যি-চোখের-মা। তার বড় কাছের-মা। বকুনিঝকুনি খেয়েছে কত, ইয়ত্তা নেই। আড়ালে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছেও অনেক। সেসব আর মনে নেই। মায়ের শাসন মনে রাখে না মেয়েরা। সোহাগ আদরও যে পায়নি কোনোদিন, সে-ও তো নয়। সাহেববাড়ি তো মায়েরই বাড়ি। মায়েরই সংসার।

মাতৃমূর্তি যতই প্রখর হয়ে উঠতে থাকে, রাধা আগাম বুঝে যায়, মেয়েদের ঘর ছেড়ে যাওয়াব যন্ত্রণা। সাহেববাড়িই যদি তার দুঃখুতাপ সব কেড়ে নেবে, দাঁড়গাছি গাঁয়ের নড়বড়ে ভাঙা মেটেঘরটা কী তাহলে?

অন্যদিকে কিরণময়ীও শান্তিতে ছিলেন না খুব। মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেলে কাল সকাল থেকেই যে কী দশা হবে, ভাবনার ভারে মুখে চোখে একটা ছায়া পড়েছিল উদ্বেগ-আশঙ্কায়। এত বড় সাতঝামেলার সংসারে সকলের সব বায়নাক্কার একটা ধাঁচ

জানা ছিল ওর। কাজেকর্মে একটা ছন্দ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঝি-চাকর অন্য কাউকে তো রাখতেই হবে ওর বদলে। এরই মধ্যে অল্প বযসী দু-চারটে মেয়ের খোঁজখবর নন্দ নিয়েও এসেছে। কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না ঠিকমতো। আসলে এত এত বছর ধরে নিজের মতো করে গড়েপিঠে তৈরি করা একটা মেয়ে!

বাঘার জন্য আলাদা ধরনের যে-রান্না হয় প্রতিদিন—পাঁঠা বা খাসিব মুণ্ডু ভেঙে গুঁড়িয়ে হাড়গোড়শুদ্ধু মাংস, মশলাপাতির নিযমবিধিও সেখানে সবই হিসেব কষে। রাধা স্বতন্ত্র ভালবাসায় জীবপ্রেমে রাঁধছিল। কিবণময়ী কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাকিযে বইলেন কিছুক্ষণ। শান্ত চুপচাপ।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, বুকে ফোঁপানি চেপে পাথব হয়ে ছিল বাধা। বাঁ-হাতে কুকাবের হাতল ধরে একটু বাঁকিয়ে নিযে খুন্তি নাডছিল।

'কী করছিস তুই? টাইগারের খাবার?' কিরণময়ী এগোলেন দু-কদম। হাত বাড়ালেন। আস্তে হাতটা রাখলেন রাধাব পিঠে—'ঘবে পুষ্যি বাখলে এই হলো বিপদ। এজন্যে... ঠিক এজন্যেই... বুঝলে গো রাধুর-মা, পবের মেযেকে বেশি দিন বাখতে নেই নিজেব কাছে। দেখো দেখি, কী করছে মেয়েটা? এ-তো আবেক যন্ত্রণা হলো আমার...'

সুমতিবালা, নিতান্তই বাহুল্য গোছের কেউ একজন, ঘবের কোণে হাঁটু ভেঙে ঝিম মেরে বসে ছিল চুপচাপ। উঠে এল মাঠাকরুণের কাছে। খুব একটা বাড়তি আহ্লাদেপনাও নেই আর। এতই যদি দরদ, এত যাঁর আছে, আজ অব্দি সেই পাঁচশো টাকার ওপর আর কোনো বাক্যি ফুটছে না মুখে?

চোখ ফিবিয়ে কিরণময়ী আবার আদর বুলোচ্ছেন রাধাব পিঠে—'আরে বাপু, কাল থেকে এ-সবই তো গোপালের-মাকেই করতে হবে। তা তোর বাঘাবাবুব যা লম্বা জিভ বানিয়ে দিয়েছিস, আর-কারুর রান্না এখন ওর মুখে রুচবে কিনা, কে জানে? থাক, আজ আব কিছু করতে হবে না তোকে। এত বছব ধরে ছিলি। শাড়ি ব্লাউজ ছাড়াও টুকিটাকি জিনিসও তো কম হয় নি তোব। কিছুই তো করিসনি এখনও। যা, এটা-ওটা যা আছে, ঘবে গিয়ে গোছগাছ কবে নে....'

বুঝি এই স্পর্শটুকুই মাধ্যাকর্ষণ ভূ-মৃত্তিকার। রাধা ভুলে গেল, গ্যাস জ্বলছে তার বুকের কাছাকাছি। তিন লিটাবেব ছোট কুকাবে ঢাকনা আঁটা হয়নি তখনও। কী এক অমোঘ টানে এক ঝটকায় ছিটকে সবে এসে কংক্রিটের শ্ল্যাবেব ওপব ঝুঁকে পড়ে, মাথা নুইয়ে, ডুকবে উঠল হিক্কায। আঁটেসাটো-বাঁধা কুকারেব ভেতব ঘনীভূত বাষ্প জমতে জমতে ঠিক এ-বকমই হয। রুদ্ধচাপ থেকে ঠেলেফুঁড়ে বেরোতে চাইলে—যন্ত্র নয, যেহেতু মানুষ, কী এক মর্মান্তিক দাহে পায়ের পাতা থেকে মাথা অব্দি শিরায় শিরায রক্তে তোলপাড় তুলে জ্বলছে পুড়ছে কাঁপছে গোটা শবীব।

নাড়া খেলো তিনজনই। মৃদু হেসে দু-হাতে ধরলেন কিরণময়ী—'কী বোকা মেয়ে বে তুই? কাঁদছিস কেন? বিয়ে হবে না তোর? ঘরসংসার করবি না নিজের? চিরকাল থাকবি আমার কাছে? মেয়েরা মায়ের কাছে চিরকাল কেউ থাকে এ-রকম?'

অঢেল কান্না ছিল বুকে। পাথরের শ্ল্যাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বুক ঠেসে মুখ

লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছিল রাধা। সরে গেছে পিঠের আঁচল, পিঠভাঙা এলোচুল জড়িয়ে গেছে ঘাড়ের কাছে। টকটকে লাল ব্লাউজের আবরণে পিঠটা কাঁপছিল ফোঁপানিতে। বুঝি অনেক দিনের অনেক কালের ভরে-ওঠা পূর্ণ কলস তার সব কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে শূন্য হতে চায় এই রান্নাঘরেই—নিরক্ষরের পাঠশালায়, যেখানে অনেক জেনেছে অনেক শিখেছে সে। অনেক শেখার পূর্ণপাঠে হাত পাকিয়েছে তেজী সব রান্নাবান্নায়।

'কী গো রাধুর-মা, বলো কিছু মেয়েকে। এমন পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে। ওকে নিয়ে যাবে কী করে তোমাদের গ্রামে?'

'কোথায় আর নিয়ে যাব গ মা? এ-মেয়ের কি আর কোথাও গিয়ে মন বসবে দেশগাঁয়ে?' মোচড় খেলো সুমতিবালা। নাভিমূল থেকে টেনে-তোলা এক-বুক ঘন নিঃশ্বাস।

'সে-বললে কি হয়? এই উঠতি বয়স মেয়ের। ভরাট শরীরস্বাস্থ্য। এখন বিয়ে হবে না তো হবেটা কী ওর?' ভ্রূ কুঁচকোলেন কিরণময়ী—'মন বসাবসি আবার কী? ঘরে নিয়ে যাও। ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে একটা ছেলেটেলে দেখো ঠিকমত। বিয়ের জল গায়ে পড়লে ও-দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে...'

সাড়া নেই। শ্রোতারা নির্বাক।

যাকে নিয়ে এত কথা, রাধা, মুখ থুবড়ে পড়েই ছিল পাথরে। সেখানেও আর কোনো ধ্বনি ছিল না। পাথরের সঙ্গে লেপটে থেকে বুঝি এক সময় এভাবেই যন্ত্রণায় নিজেকেও পাথর হয়ে যেতে হয়। অথবা মায়েদের ছায়ায় ছায়ায় বুঝি এখনও সে সেই অবোধ শিশু, গৌরীদানেও যে চিনে উঠতে পারেনি তার নিজের শরীর বা শরীরের নিয়মবিধিগুলি। হয়তো-বা শিশু বলেই, শিশু ভেবেই ওর গায়ে পিঠে স্নেহময়ী হাত কিরণময়ীর—'না গো, না। রাধু আমার সে-মেয়ে নয়। তেমন করে মানুষ করিনি ওকে। ও সব বোঝে। বাপের ঘর ছেড়ে যেতে মেয়েরা ও-রকম কান্নাকাটি করেই একটু-আধটু। ও-কিছু না। দেখো, দেখো তোমরা, রাধু সব মানিয়ে গুছিয়ে নেবে...'

'অঁ, সেইটে হল গে কতা...'

ফিরে তাকিয়েছেন কিরণময়ী। এবং সুমতিবালাও।

'বাপের-ঘরে ভাত ছেল নি। ভাতের-ঘরে বাপ কোথাকে পাবে গ আবাগি বেটি?'

ভ্রূকুঞ্চনে কিরণময়ী—'তুমি আবার কী ফোড়ন কাটছ? মানে কী? মানে কী এসব কথার? কী বলছ?'

ওপাশে একটা ন্যাকড়া নিয়ে ইস্পাতের ঝলমল সাফ করছিল গোপালের-মা। ঘষে ঘষে মুছতে মুছতে, যতটুকু কাজ, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজের অছিলায়, মাথা না তুলেই সাফ-সাফ জবাব—'সে-মানেফানে আমি কী বুঝব গ? মুখ্যু মেয়েমানুষ।'

'বাঃ মানে বুঝবে না? আর এমনি-এমনি বলে দিলে একটা কথা? অদ্ভুত মানুষ যা হোক...' ক্রুদ্ধ গৃহকর্ত্রী এবার অসম্ভব তিক্ততায়—'দেখছ ওর মা নিজেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু বলছে না। আর তোমার গায়েই ফোস্কা পড়ল? এ-যে দেখছি, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। সেও যদি দরদটা একটু আগে দেখাতে। আমার এখানে

কাজে লাগার পর থেকেই তো মেয়েটার সঙ্গে খ্যাচাখেঁচি খিটিমিটি লেগেই আছে তোমার। সে-আরেক রোজকার অশান্তি আমার...'

'ওসব দরদফরদ মা-মাসি জানি নে কো... আমারও তো ওর বয়েসী মেয়ে ছেল গা একটা...' খেঁকুড়ে বুড়ির গলায় ঝাঁঝ তার স্বভাবের দোষ—'সেই কবে কোনকালে বুকের দুধ ছেল। মেয়েটা খুব কষে মাই চুষে পেট ভরিয়ে নিয়েছে মাগনা। মাই শুকলো ত কিনে খাবার বয়স হল যেই, পরের দোরে কাজ করে পয়সাব-মা খুঁজতে বেরুল রাস্তায়। বিয়ে দিলুম। বছর ঘুরল কি ঘুরল নি, সোয়ামির ভাত সইল নি পেটে। লাথিঝাঁটা খেয়ে ভরা মাসের পেট নিয়ে গায়ে আগুন ঢেলে মরেই গেল পোড়াকপালী...'

'আঃ, সে-তো জানি। শুনেছি...কিন্তু তাই বলে... দেখছ, মেয়েটার এই অবস্থা। লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তখন থেকে। আর এক্ষুনি এই অলুক্ষুণে আজেবাজে কথাগুলো না বললেই চলত না তোমার?' তিতিবিরক্ত কিরণময়ী—'ধ্যাৎ, মরো গে যাও। যা ভাল মনে হয়, করো। কে কথা বলবে তোমাদের সঙ্গে? সময় নষ্ট। কি গো রাধুর-মা, তুমি বোঝো। বুঝে নাও ভাল করে—মেয়েকে নিয়ে কী করবে? এখানে আরো কিছুদিন রেখে যেতে চাও তো ভালো। আপত্তি নেই আমার। না হয় মাইনেও বাড়িয়ে দেব কিছু। এরপর কিন্তু দায়দায়িত্ব থাকবে না আমার। কখনও দুষতে পারবে না আমাকে...'

ভ্যাবাচাকা সুমতিবালা বোবা হয়ে গিয়েছিল ঘটনায়-অঘটনে। গোপালের-মাকেই সে দেখে তন্ময় বিস্ময়ে। ডাঙায় এসে জলকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে তার মেয়ে। আর ডাঙায় বসে বাঘকেও ভয় করে না দজ্জাল মেয়েছেলেটা? আসলে শহরের মেয়েমানুষ ওরা। জাতপাত নেই। গতর ফেললেই কাজ। মালিকমনিবগুলোরও পয়সা অঢেল।

যখন অকুস্থল থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্তির উদ্যোগ কিরণময়ীর, আস্তে পিঠটানে উঠে দাঁড়িয়েছে রাধা। নাকের দু-পাশে লেপটে গিয়ে ফোলা-ফোলা গালে বা তলার দিকে চিবুক পর্যন্ত গড়িয়ে-নামা চোখের জল আঁচল টেনে মুছে নিতে নিতে যখন তার নিঃশ্বাসের শোষানি আর আলুথালু চেহারায় বিষাদের করুণ ছায়া, নিজের লণ্ডভণ্ড ভগ্নতায় ঝাপসা চোখে সে দেখল তিন দিকে তিন কোণে মায়েদের মুখ। কুচুটে বুড়ি গোপালের-মা শাপান্তি গায়। তার শত্তুর। মা খোঁজে সে। সাহেববাড়ির মায়ের পাশে একটু দূরে মাই-চোষানি মাথাখাকি বুড়ি? ভেজা-চোখের লোমে লোমে বিন্দু বিন্দু জলের স্ফটিক জমে জমে যখন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে ঝবে পড়ছে, অবোধ চাহনিতে টৈনায আব হাউসকোটের মাঝখানে হয়তো সে নিজেকেই খুঁজে পেতে চায়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। খুব কেঁদেছিস...' ঝাঁকিয়ে উঠলেন কিরণময়ী—'ওদিকে যে গ্যাস পুড়ে যাচ্ছে। কী চাপিয়েছিস কুকারে, খেয়াল আছে কিছুর? ঢাকনাটা পর্যন্ত সেঁটে দিস নি...'

ছলকে উঠল রাধা। বাঘা খাবে দুপুরবেলা।

বুকের ফোঁপানি নিয়েই ছুটে গিয়ে তাকে হামলে পড়তে হয় রান্নায়, যা কোনো মানুষের খাদ্য নয়, কোনো অমানুষের ভোজও নয়, জাব নয়, পোয়াল নয়— পরমান্ন ব্যঞ্জন। ঝুঁকে পড়ে এলোপাথাড়ি খুন্তি নাড়ায় ছ্যাঁকছ্যাঁক আওয়াজ কিছুটা উচ্চকিত হয়ে

উঠলে উঁকি দিয়ে দেখে নিতে হয়। ঘ্রাণেও বোঝা যায় কিছুটা। জল ছিল। চিড়বিড় শুকোতে শুকোতে কষে গেছে একটু বেশি। একটু কষা-মাংসই ভালবাসে বাঘা। ঠিকমতো সেদ্ধ হবে না প্রেসার না দিলে। অবিশ্যি শক্ত লোহাও চিবিয়ে ভাঙতে পারে দস্যিটা।

ওপাশে, পুরো কিচেনটাই যাঁর হুকুমে বা ইচ্ছায় নড়েচড়ে, কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন রাজরাজেশ্বরী মা। কোনো কিছুই না ছুঁয়ে, নজরদারিতে সব কিছুতেই হাত রেখে নিজের সংসারে অনেকটা জায়গা নিয়ে তাঁর পা ফেলা। পেছনের দিকে মেরুন রঙে শাদা-হলুদ ফুল ছড়ানো হাউসকোটের শিরদাঁড়ায় পাটভাঙা ভাঁজের লম্বা একটা দাগ ছিল। মাথার এক রাশ চুল গড়িয়ে নেমেছে পিঠে। মেরুন জমিতে শাদা-হলুদ ফুলের সঙ্গে মিলেমিশে মাঝে মাঝে রুপোলি ঝলকানি নিয়ে চুলের কালোও আলাদা একটা বর্ণ পেয়ে যায়। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি অব্দি গড়িয়ে পড়া জামায় শুধু তো শরীর নয়, বংবাহারে বয়সও ঢাকা পড়ে যায় বয়স্কা মায়েদের।

পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে বাধা এবং এভাবেই তাকিয়ে থাকার বুক-পোড়ানিতে আবার নতুন করে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে গাগতর। রান্নাঘরের অন্তঃপুর থেকে মা এমন করে আড়াল হয়ে গেলে গোটা সাহেববাড়িটাই তাঁর সঙ্গে চলে যায় এবং এ-বাড়িতে, বুঝি এই প্রথম, সে মায়ের ছায়া আগলে নেই। বাতিল হয়ে যাচ্ছে সে? আলাদা হয়ে যাচ্ছে? পরিত্যক্ত হয়ে যেখানে সে পড়ে থাকে, সেখানে পুজোআচ্চার শেষে বট-অশ্বত্থের তলায় ফেলে-রাখা শেতলা মায়ের মূর্তি রোদেজলে রং চটে, মাটি খসে খড় বেরিয়ে পানসে হয়ে গেলে যেমন দেখায়, যেন তারই আদলে আরেক জ্যান্ত বুড়ি সাহেববাড়ির হাবুডুবুতে থই না পেয়ে, দূরে সরে গিয়ে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে দেয়ালে পিঠ ঠেসে। রাধা তাকে চেনে জানে অবশ্যই। আপন বলেও মানে হয়তো। খুঁজে পায় না টানের জোর। অথচ সেদিকেই চোখ যায়। চোখ টেবিয়ে তাকায় বারবার।

কিংবা সুমতিবালা, রেলগাড়ি চেপে যদিও বা ঘরের বাইরে, গাঁয়ের বাইরে এসে পড়েছে এতদূর, তালাশ পায় না চলনে-বলনে চোখ-ধাঁধানিতে হোমরাচোমরা কেষ্টবিষ্টু-বাবুদের লম্বা পৃথিবীর। হাপুস নয়নে মা-ঠাকরুণের চলে যাওয়ার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। হাউসকোটের বুড়িধাড়িকে অতি বৃহৎ খুকুমণিই মনে হচ্ছিল তার। ঝিঙে-শসার মাচায় মস্ত বাঁশের ডগায় ঝোলানো কাকাতাড়ুয়ার ছাঁচ! এবং অনেক দেখার পরও সব দেখা ফুরোয় না যেখানে, রাজাবাদশার রসুইখানায় ঘ্রাণে দৃশ্যে ঝলমলে দেখে দেখে তেরাত্তির কাটিয়ে আজও ঘোর কাটাতে পারছে না বিস্ময়ের। গোটা চারেক পেটের জন্যে এত বড় একটা ঘর? এমনধারা সব যন্ত্রপাতি, যজ্ঞিবাড়ির নিত্যি মোচ্ছব? বিশ্বাসই হয় না, ঠাটবাটের এই ঘরই নাকি মেয়েটার যুগ্যি ঘর? অথচ এ-মেয়ে তো তারই। তার গলার কাঁটা।

'কপালে আছে বাঁদি, সুখের তরে কাঁদি...' সংসারের গিন্নি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর, শেয়ালগুলো যেমন ফাঁকায় ফাঁকায় চুকচুক করে ঢুকে পড়ে গেরস্তবাড়ির উঠোনে, সুমতিবালার দিকে গুটিগুটি এগোল গোপালের-মা—'কি গ দিদি, তোমার মেয়ে ত শুধু শত্তুরই ভাবে আমাদেরকে। নেয্য কতা কইলেই দোষ। তা হবেই বা না কেনে শ'রের বড়মানষের ঘরে ভাত খেয়ে এত্তটা হল য্যাখন...'

কটমটিয়ে তাকাল রাধা।

কাঁধের আঁচল টেনে আরো জড়সড় সুমতিবালা সপাটে ঝাপট মারল এবার—'আমাকে কেনে বলচ বল দিনি এসব কতা? নিকুচি করেচি এমনধারা শ'রের-ভাতের। আমি কি পাখি নিকি গ? এখেনে ই-খাঁচার পারা ঘরটার মধ্যি আব দু-দণ্ডও তিষ্টোতি পারচি নে কো। ভাল লাগচে নি আমার। এখনে পালাতে পারলে বাঁচি...'

'ওম্ মা, সে কী কতা? ডাগর বয়েসের মেয়ে তোমার। ভাববে নি উয়ার কতা?'

'যার যেমন কপাল, সে-ত তেমনটা করেই বাঁচবে গ দিদি। আমি ভাবার কে বল দিনি...' সত্যি বুঝি বুক চিবে অনেক যন্ত্রণা সুমতিবালাব। পাঁজরভাঙা খিঁচুনি থেকে হঠাৎই বেহুঁশ গোঙানিব আওয়াজ—'মুখপুড়ি থাকে ত থাকবে ওর সাহেববাড়িতে। দেখচ নি, কেমনধারা রস জমেচে শবীলে? তা বস ঝরুক এট্টু, বুঝুক। আমি নিয়ে যাব? তা যাব কোন চুলোয? গাজ্জিযান নেই কেউ। বিবিকে পিঁড়ি পেতে বসাবে কে গ ওখেনে?'

কুকারের মুখ আটকে দিয়ে হাতে-পায়ে ফাঁকাই ছিল বাধা। স্থিব পলকে তাকিয়ে ছিল। শাদা থান-কাপড়ে গায়ে-গা-লেপটানো আদ্দিকালের দুই বিধবা বুড়ি খাটো গলায় ফুসমন্তরে কী বলছে শুধোচ্ছে—মেয়েকে সামনে বেখে মেয়েকে নিয়েই গোপন শলা ওদেব। গলা উঁচিয়ে কী বিষ ঢালছে গোপালেব-মা, শুনছে আরেক বুড়ি। বাধা ফিসফাস শুনতে পায়। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে। যেমন কৈকেয়ী, তেমনি তার দোসর মন্থরা। নেহাতই অকারণ, স্টিলেব খুন্তির এক পাশেব ধাব দিয়ে কুকাবেব মুণ্ডুটাকে খুঁচিয়ে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ তোলে রাধা।

'আমি আর কোন কুটুম তোমাদের? আমাব কতা শুনবে কেনে তোমরা? তবু বলি গ, ভালর জন্যেই বলি—এখেনে বেখে যেয়ো নি মেয়েটাকে...'

বাধা ফিরে তাকাল।

'বয়েস হয়েচে বলে কি কানা নিকি গ আমি? দেখি না চোখে?' বয়সকাল এ-বকম মাজার ব্যথা হযই বুড়োবুড়িদের। হাঁটুর ওপর হাতেব তেলো চেপে ককিয়ে ককিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে গোপালেব-মা—'পরেব দোরে দুটো ভাতেব জন্যি এয়েচিস ল আবাগি। তোর কাঁচা বযেসেব ঢুলবুলানিতে কোথায় যেয়ে কাদায থুবড়ে পড়চিস, একটা আক্কেল নেই তোর...'

মিটুলি সাপেব ঝলকানিতে থরথর কেঁপে উঠল রাধা।

'ওদেব ট্যাকা আছে। তোব কী আছে শুনি? শরীল...' দুটো পায়ের ভর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে গোপালের-মা। কথা বলার কোনো সুনির্দিষ্ট নিশানা নেই। মুখেব ভেংচি কেটে, ঘেন্নায়, নিজেরই বিলাপে—'মণ্ডামিঠাই খাচ্চিস যে খুব? আ ল সব্বোনেশী, তোর টসটসে শরীলটাকে ঠুকরে খাচ্ছে যে... যদি কিছু একটা হয়ে যায়? তোকে বাঁচাবে কে লা? তোর রসের নাগর? যাবি কোথাকে তুই? ওই যো কতায় বলে না—দেবতার বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেচে মানষের বেলা। বুঝলে গ রাধুর-মা, পয়সার ঘরে

পাপ ঢোকে ত ট্যাকাপয়সা দিয়েই পাপ ঢাকে উয়ারা। মরণ ত তোমার আমার গ। গরিব মানষের...'

এক কোণে দেয়াল ঠেসে হাত পা থেবড়ে বসে পাথর হয়ে গিয়েছিল সুমতিবালা। এক ঝাপটায় লাফিয়ে উঠে, চারদিকে নিষেধের বেড়া ভেঙে কোথাও যদি পালাবার পথ নেই, চকিতে ওপাশে ওদের খাবার-ঘরের দিকেই ঘুরে দাঁড়াল। একমাত্র চেনা পথ। যেখান দিয়ে এগোলে ওপারে সেই কুঠরি, যেখানে গিয়ে মুখ বুজে থাকা যায় অন্ধকারে এবং সেদিকেই এগোবার মুখে চিলচিৎকারে—'জানি গ জানি। অই ঢেমনিপনাই ত খেলো মুখপুড়িকে। শ'র খেলো। বেহায়া বেলাজ হারামজাদি। নুলো ঘষে দিতে হয় অমনধারা মেয়ের মুখে। কোথায় নিয়ে যাব গ ওকে? শুধোব কী গাঁয়ের দশজনাকে? চোরের মুখে 'মা' বললে যেমনটা শোনায়, ছেনাল মেয়ে 'মা' ডাকলেও ত তাই-ই গ! ত্‌তাই...'

কুকারে পরপর তিনবারের শেষ হুইশল। তিরিক্ষি আওয়াজে ধোঁয়া ছিটকানো মুণ্ডুটা, বুক চাপা ফোঁপানিতে, মানুষের ঠোঁট কাঁপে যেমন, কাঁপতে থাকে রাগে যন্ত্রণায়। স্তব্ধ হতবাক রাধা। জানাজানি হয়ে গেছে সব? ও-বুড়ি সব জেনেশুনে ঘাপটি মেরে বসে ছিল এতদিন? কী সব্বোনাশ! আড়চোখে ভীরুতায় তাকাল গোপালের-মার দিকে। ঘরের একপাশে সরে গিয়ে কাজকর্মের অছিলায় বাসনপত্তর গোছাচ্ছে ভালমানুষের মতো। ঠাণ্ডা, চুপচাপ। ছোবলানির পর ফণা নিভিয়ে কেউটে খরিসগুলো থিতিয়ে যায় যেমন। কিংবা রক্তের ঝলকানিতে উদ্‌ভ্রান্ত রাধা হাতে পেটে বুকে সিঁধিয়ে গিয়ে চোখ বুজে জমাট ঠাণ্ডায় শক্ত বরফ হয়ে যেতে থাকে। শায়া শাড়ি ব্লাউজ ব্রেসিয়ারের তলায় তার মেয়েমানুষের গোপন অঙ্গগুলোর চেয়েও যা আরো অনেক বেশি গোপন, দাঁতে দাঁত চেপে যা সে আড়াল রেখেছিল এতদিন, যদি সবই এমন করে ফাঁস হয়ে যায়, তবে সে নিজেই যে উদোম ন্যাংটো হয়ে পড়বে খোলামেলায়। একটা মা জানল তো আরেকটা মায়ের কানে উঠে যাবে সাতকাহন। দিদিমণিরা জেনে যাবে সবাই।

সিলিন্ডার আর ওভেনের নব বন্ধ করে কুকারটা সে আস্তে আস্তে নামাল উনুন থেকে। ঢাকনা খুলতেই একরাশ মিহি নীলচে ধোঁয়া এসে লাগে নাকে মুখে চোখে। কুকারের ওপর হামলে পড়ে, গায়ের সব জোর ঢেলে হাতা দিয়ে নাড়তে নাড়তে শুধু নুন-হলুদের ঝোলের মাংসে সে বাঘার লম্বা জিভটা দেখতে পায়। ধারাল দাঁতগুলি। মনে মনে নিজেকে বুঝতে গিয়ে হদিশ হারায়। ও-বুড়ি সত্যি জানে? দেখেছে কিছু? জানবে কী করে? সেদিন টিভিতে ফুটবল খেলার শেষে কেউ ছিল না বাড়িতে। একতলা থেকে ছাদ অব্দি গোটা বাড়িটা ছমছম খাঁ-খাঁ করছিল সন্ধেবেলা। একতলায় নন্দদা ছিলেন। রান্নাঘরে গোপালের-মা। শুধু বাঘা ছাড়া কেউ দেখেনি।

ঢাকনা খুলে গোটা কুকারটাকেই সরিয়ে রাখার নিয়ম এখন। জুড়োক, ঠাণ্ডা হোক। বাঘা খাবে দুপুরবেলা।

ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার। ঘামছে শরীর, জ্বলছে হাড়মাস। চোখজোড়া ঘুরে ফিরে গোপালের-মায়ের দিকেই চলে যাচ্ছে বারবার। ওই কুচুটে বুড়ি হয়তো সত্যি সত্যি জানেই না কিছু। কিংবা জানে। এরকমই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে মেয়েদের শরীর এঁটো

হয়ে গেলে এক ধরনের চাপা একটা গন্ধ লেগে যায় সবার গায়ে। কেউ বুঝুক নাই বুঝুক, মায়েরা গা শুঁকেই টের পেয়ে যায়।

মাংসের ঝোল ঠাণ্ডা হবে বলে কুকারটা যখন সরিয়ে রাখাই নিয়ম, নিতান্তই অকারণ, ঠং-ঠং আওয়াজ তুলে পাগলের মতো হাতা নেড়ে নেড়ে সবটাই ঘাঁটতে থাকে সে এবং খামোকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভারি মুখে কান্নাকে বুকে চেপে নিজেরই হাতের রান্নায় এক ধরনের মাংসের গন্ধ পেয়ে যেতে থাকে, যেখানে লোভ থাকে না কোনো মানুষের। বাঘার লোভ মেটাতেই তার যত্নআত্তি, তার গতর-পোড়ানি। দুঃখু বা রাগ —ফোঁপানিটা বড় হয়ে উঠতে চায়। সকলের সব হামলাই তো সে সামলায় রোজ রোজ। শুনবে কেউ? বলা তো যাবে না—শুধু তো সেদিনের সন্ধেবেলাই নয়, এমন চোরাগোপ্তা খুবলানি তো চলছেই সেই থেকে। প্রায়ই হয়। ফাঁকায় ফাঁকায় একা থাকলে চারদিক দেখেশুনে বড় সাবধানে চলতে হয় তাকে। ভয়ডর নেই, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এমন বারমুখো বিচ্ছিরি একটা লোক? ঘরেই যদি এমন ডাকাবুকো লুটেরার বাস গো, ঘাটের-মড়া এই শরীরটা সে রাখবে কোন চুলোয়? পালাবে কোথায়?

কুকারটা সরিয়ে রাখতেই হয একসময়। জুড়োতে দিতে হয়। বড় পুণ্যি নিয়ে জন্মেছে বাঘা। সাহেববাড়ি ছেড়ে কোনোদিন যেতে হবে না ওকে। সবাই ভালবাসে।

এবং কুকার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার পর এত বড় রান্নাঘরে, তিন দিকের ছোট-বড় জানালায় রোদ্দুরের আলো-ঠিকরনো ঝকঝকে দেয়ালের রঙ, মেঝের পাথর, অনেকটাই উঁচু অব্দি রঙিন টাইলস, কাঠের কাবার্ডে সানমাইকার ঝিলিক, প্লাস্টিক ল্যামিনেট বেঞ্চটপ, চারপাশে ছড়ানো দু-দুটো গ্যাসের উনুন ফ্রিজ গ্রাইন্ডার মিকশার হাজার গণ্ডা স্টিলপ্লাস্টিক চিনেমাটির কৌটোকাটাবয়ম বাসনপত্তরে যখন ধারাল ছুরির ফলার ধাঁচে ঝলসে যাচ্ছে আলোর ঝিলমিল, শৌখিন সাহেবি হেঁশেলের অলৌকিকে শুধু দুজন—এক গেঁয়ো বুড়ির সঙ্গে রাধা, পরস্পর থেকে দূরে, তেরচা চাউনিতে ছুরি শানায় এপারে ওপারে। শুধু তো দুঃখুতাপযন্ত্রণা নয়, পা থেকে মাথা অব্দি তিরতিরিয়ে উঠছে একটা রাগ। ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়ির ঘাড় মটকে দিতে পারে সে এখন। ছোট থেকে বড় হতে হতে সাহেববাড়ির হেঁশেলের সব কিছুতে যেমন-তেমন করে হাত দেবার, মেশিনপত্তরের কাজকর্ম করার একমাত্র অধিকার ছিল যার, সব কিছু চেনে জানে বোঝে বলে মায়ের মন পেয়ে গিয়েছিল যে-মেয়ে, সব ছেড়েছুড়ে সে চলে যাবে গাঁয়ে? আর কোথাকার কোন এক গাঁইয়া ভূত? একটা বিধবা বুড়ি দখল পেয়ে যাবে এমন একটা খানদানি রান্নাঘরের? জানে কিছু? হাতের তেলোয় নিয়ে নুন-চিনির পরিমাণ চেখে দেখতে পারবে না তো মুর্গমুসল্লাম রাঁধবে কী আকাট মুখ্যু?

মুর্গমুসল্লাম? একটা শব্দ। শব্দটা মনে হতেই আচমকা ঘাই মারে বুকের হাড়কলজেয়।

বাঘার আহার ছেড়ে, কুকিং-শ্ল্যাব ছেড়ে, আস্তে আস্তে সরে এল রাধা। এমন একটা মোহময় জগতের দৃশ্যগন্ধস্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরে যাওয়ার ভাবনাও যে কতদূর সরে-যাওয়া, অবোধ চোখের পাতায় তারও কোনো পরিমাপ নেই।

বুঝি দেহেরও কোনো ভার নেই। নির্ভার রাধা ভাসছে শূন্যে। কোথাও কোনো

শব্দ না তুলে পায়ে পায়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।. কাজেকর্মে আপিসে কলেজে সবাই বেরিয়ে যাবার পর কেউ যখন বাড়ি নেই, থমথম ভরদুপুরে রংবেরঙের সাহেববাড়িতে কোথায় কোন ঘরে কী করছেন তার মুর্গমসল্লামের-মা অথবা তার নিজের জন্য বরাদ্দ ঘরটুকুও যদি কেড়ে নিয়েছে কলাই-পোস্তর জননী, এত বড় প্রাসাদের সর্বশূন্যতায় হারিয়ে যেতে থাকে সে। বাইরে চকচকে রোদের ঝালর। পূব দিকের ঠাটা রোদ্দুর ঢলে পড়ছে পশ্চিমে। ঘরে ঘরে জানালা-দরজায় বা অলিন্দে খাঁজকাটা রোদ্দুর এখানে-ওখানে গড়িয়ে নেমে যেমন করে আলোব চিত্তির এঁকেছে মেঝেয়, ছায়ায় রোদ্দুরে আলোয় আলোয় নিজের মধ্যেই হারিয়ে যেতে যেতে রাধা নতুন করে নিজেকেই খোঁজে সাহেববাড়ির ফিনকি-ছোটানো রঙেব বাহারে। আজ বাদে কাল, যদি সকাল সকালেই রওনা হয়ে যেতে হয়, এতক্ষণে, দুপুরের আগেই সে পৌঁছে যাবে নিজের দেশে দাঁড়গাছিতে। মেটেঘরটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

নিজের হাতে টেলিফোনের নম্বর ঘুরিয়ে রাধা আব গ্যাসেব সিলিন্ডাব বুক করবে না কোনোদিন? লাইটাব ছুঁয়ে উনুন জ্বালবে না? কুকাবেব হুইশল বাজবে না তার হাতে।

বুকের মেঘ চোখের জলে হালকা হতে চায় না অনেক সময়। নির্দয় খরা। শেষ-দেখা শেষ-ছোঁয়ার মমতায় সাহেববাড়ির অণুপরমাণুতে নিজের দরদাম খুঁজে নিতে, বুঝি রূপকথার গল্পের দুয়োরানীর দুঃখী মেয়ে বাঘসিংহের জঙ্গলে একা একা ঘুবে ঘুরে মরণবাঁচনেব পথ হাতড়ে বেড়ায়। বিশাল শহরে লাখো-লাখো মানুষ। একটা আবাগি মেয়ের দুঃখু যন্ত্রণায় কারুর কিছু যায় আসে না। কিন্তু সে তো পালিয়ে যেতে পারে কোথাও? তার বয়সী কোনো ছেলে হলে পরোয়া করত? থোড়াই কেয়াব। ব্যাটাছেলেরা বেরিয়ে যেতে পারে এক কাপড়েই। একটা কাজ জুটবে না? একটাই তো পেট।

গুটিগুটি পায়ে ঘরবারান্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দক্ষিণমুখো বারান্দায় এসে দাঁড়াল নিঝুম। পশ্চিম দিকের তেরচা রোদ্দুর আছড়ে পড়লেও গা-ঢাকার জন্য এক ফালি ছায়া ছিল কোণের দিকে। রেলিংয়ে বুক চেপে সে ঘাড নিচু কবে চোখ মেলে তাকাল বাস্তার দিকে। ভরদুপুরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু কাক। স্তব্ধতা ভেঙে কাকের ডাক। সামনেই, উল্টোদিকের ফুটপাতে রোগাপ্যাংলা একটা নিমগাছ। শহরের পাথুরে বাস্তায় বেড়ে উঠতেও পারছে না বেচারি। পাতায় পাতায় ধুলো জমে জমে পলেস্তারা পড়ে ফ্যাকাসে এমন, বর্ষার জল ধুয়ে না দিলে সবুজ ফিরবে না ওর।

দুপুরবেলার রাস্তায় মানুষজন কম। মাথা তুললেই সারি-সারি প্রাসাদ-অট্টালিকা। নাভিমূল থেকে টেনে-তোলা দীর্ঘশ্বাসে পিঠের শিবদাঁড়া টানটান সোজা হয়ে উঠলে মস্ত শহর কলকাতার সব মাপজোক না জেনে, না বুঝেও, সে তার আপন ভুবন চিনে নিতে পারে। বড় সহজে সে হারিয়ে যেতে পারে এখানে কোথাও। কাছে-দূরে দোতলা তিনতলা পাঁচতলা ছ'তলা বাড়িগুলো হাতছানি দেয়। মস্ত মস্ত প্রাসাদের খোপে খোপে বাবুদের ঘরসংসার। ব্যাটাছেলে নয়, মেয়ে বলেই তো তার সুবিধে অনেক। অঢেল টাকাপয়সা নিয়েও 'কাজের লোক' ছাড়া একদণ্ড সংসার চলে না সোনার বরণ গিন্নিমায়েদের। দুধের ডিপোতে মণিদীপাদি অঞ্জলিদি রত্নাদি শোভা শিখা জবা মহুয়া

কণা পারুল কাউকে বললে, কাজ? কত কাজ চাই? একটা কোথাও জুটে যাবেই। নতুন সাহেববাড়ি।

হাহুতাশের অস্থির দুপুর। বাইরের পার্লারে মন টেকে না বেশিক্ষণ। পিছু ফিরল রাধা। তিরতির করে গলে গলে পড়ছে মগজের চুয়ানিগুলো। বাড়ির ভেতর ঢুকে, নেহাত-ই অকারণ, দেয়াল-চাপা বিজলি আলোর সুইচবোর্ডে আঙুল টিপে জ্বালায়-নেভায় ভরদুপুরের টিউববাতি। নতুন করে সাহেববাড়ি না পেলে, শহর না পেলে, ধনী মানুষের ঘর না পেলে হয়তো-বা জীবনের শেষ বিজলি-আলো।

শান্ত দুপুরের আলসেমি চিরে একতলা থেকে হঠাৎ-ই শেকল-বাঁধা বাঘার চিৎকার। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয় রাধাকেও। বাঘার খিদে পেয়েছে। খাবে দুপুরবেলা। তাকে ছুটতে হয়। যতক্ষণ না পেটে দানা পড়ছে ওর, চেঁচাবে দস্যিটা। বাঘা তো বাঘাই। বাঘের হুঙ্কার। সে-যে কী ভীষণ গলার আওয়াজ! জাতই আলাদা। গোটা বাড়ি তোলপাড়। কুকুরের ডাক আর কুকুরের কান্না যে এক রকম নয়, জানে রাধা। ওদের কান্নাকে চিনে নিতে হয়।

ছুটতে ছুটতে ফের রান্নাঘরে ফিরে আসতে হলো তাকে। তড়িঘড়ি ব্যস্ততায় এনামেলের আলাদা থালা নিয়ে কুকিং-স্ল্যাবে ফেলে কুকারটা টেনে নিতে হয়। ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে অনেকটাই। ডালা খোলার পর এখনও কিছুটা ধোঁয়া। থালায় ফেলে হাতা দিয়ে নেড়ে নেড়ে, কোলা-গাল ভেঙে লম্বা লম্বা ফুঁ দিয়ে অথবা অল্প একটু ভাত নিয়ে হাতে সয়ে সয়ে ঠাণ্ডা করে তোলার ফাঁকে রাধা তাকায় এপাশ-ওপাশ। গোপালের-মা ঘরে নেই। নির্ঘাৎ ওই দাসীবাঁদির কুঠুরিতে ফিসফাস করে যাচ্ছে দুই বুড়ি। একা ঘরে বাঘার জন্য খাবার তৈরি করতে করতে, চোখের জল আর কতটুকু? কান্না ভাঙে বুকের ভেতর। কতকাল? কত কত বছর পরে সোনামণিকে মনে পড়ছে তার? যখন সে ছোট ছিল, গাঁয়ের মেয়ে ছিল, নিজেদের একটা গাইগরু ছিল দেশের বাড়িতে। ছোট একটা বাছুর ছিল। বাছুরটা তার সই ছিল। ওকে নিয়েই ছোট্টবেলার দিন কাটত তার। সোনামণি এখন কোথায়? বছর-বছর বাচ্চা বিইয়ে এখন দুধ দেয় কার ঘরে? শহরে এসে সোনামণির জন্য সে কেঁদেছিল অনেকদিন। ভুলে গিয়েছিল এক সময়। ডাকাবুকো খুনে-ডাকাত বাঘা? বাঘাকেও ভুলে যাবে একদিন?

বিদায়পর্বে সাহেববাড়িতে ভালবাসাও ছিল অঢেল অঢেল। আলমারি খুলে গোটাকয়েক পুরনো শাড়ি বের করে রেখেছিলেন কিরণময়ী। একটা দামি সিল্কও ছিল। বয়স হয়েছে। এত বেশি রঙিন ঝকমকে শাড়িগুলো বোঝাই করে রেখেই বা কী লাভ? নিজে পরবেন না। মেয়েরা শাড়ি পরে না। কবে পরবে, জানা নেই। আদৌ যদি পরেও কোনোদিন, ফ্যাসফেসে শাড়ি পরবে কেন ওরা?

নিশ্চিতই অভিভূত হওয়ার কারণ ছিল রাধার। সব হারানোর বেদনায় অনেক কিছু পেয়ে যাবার ছোট খুশিটুকু ঠোঁটের ভাঁজে ফুটে ওঠার আগেই, বর্ষাকালে মাঝে মাঝে ভেজারোদ্দুরে যেমন হয়—আকাশে রোদ থাকতে থাকতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ভেজামাটি শুকোয় না, রোদের শুখা জলে ভিজে একশা। দুদিকের গাল বেয়ে চোখের

জল গড়িয়ে নামা যেমন সত্যি—আনন্দাশ্রু অথবা বেদনা, ভরাট চোখের বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকার কাতরতায় অনেকটাই গৃহপোষ্য গাভীর আদল।

'দেশে গিয়ে ভালোভাবে থাকবি। তোদের গ্রামফ্রামের ব্যাপারস্যাপার তো জানি না। তোর বিয়ের দিনটিন ঠিক হোক...' দানসত্রের শাড়িগুলো খাটের বিছানায় পড়ে থাকে। স্টিলের আলমারির পাল্লা বন্ধ করলেন কিরণময়ী—'কারুর তো যাওয়া হবে না অদ্দুর। কে যাবে?'

দাঁড়িয়ে থাকে রাধা। নিশ্চুপ।

'গাড়ি যায় তো তোদের গ্রামে? পাকা রাস্তা আছে?'

মৃদু ভঙ্গিতেই ঘাড় নাড়ল রাধা।

'দিনে-দিনে গিয়ে ফিরে আসা যায়? কালীর বাড়িও তো তোদের গ্রামেই। ও এখন কেমন আছে কে জানে? বড় ভালো ছিল মানুষটা...' আলমারি বন্ধ করে চাবির গোছ হাতে নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন কিরণময়ী—'কত দিন যে গ্রামফ্রামে যাইনি। একবার গিয়ে ঘুরে এলে মন্দ হতো না। কিন্তু যাব কী? ছেলেমেয়েরা রাজি হবে নাকি কেউ? চাতরা-মসলন্দপুর এমন যে শহর হয়ে গেছে, সেই মামাবাড়িতেই যেতে চায় না।'

রাধা ঝলকে উঠল। ইংরেজি-বুলির দিদিমণিদের নিয়ে মা যাবেন দাঁড়গাছির চাষিপাড়ায়? ভাঙা কুচ্ছিত মেটেঘরটা দেখে ফেলবেন? মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রায় অবিশ্বাস্য এক দৃশ্যের ভাবনায় তিরতিরিয়ে ওঠে গোটা শরীর।

'কিরে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? বলবি কিছু?'

সাহেববাড়ির সব পাবার ভিড়ে অনেক কিছুই না পাবার মনস্তাপে একটি প্রার্থনাই বড় বেশি লোভ হয়ে উঠেছিল মনে মনে এবং যা তার পাবার কথা নয়, এমন করে হঠাৎ কিছু চাইবার কাঙালপনায় সাহসও থাকে না কিছু বলার।

'এই দেখো, হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে?' ভ্রূ কাঁপিয়ে তাকালেন কিরণময়ী—'বলবি তো কী বলবি।'

'একটা বাশকো গ মা...'

'বাকশো? এই এখন তোর জন্যে একটা বাকশো কোথায় পাব?'

ভীরুতার বুকে নিজের মধ্যে সাহস খোঁজে রাধা। ভাসা-ভাসা চোখের পাতায় যখন কাঁপছে ঠোঁটজোড়া, বলেই ফেলল মায়ের চোখে পলক স্থির রেখে—'ওই ওখেনে বাথরুমের ওপরে যে-বাশকোটা পড়ে আছে...'

'কী বাকশো বল তো? কোনটা?'

'সেই যো হলুদপানা। ইস্টিলের বর্ডার আছে মাঝখানে। দু'দিকে টিপলেই বন্ধ হয়ে যায়। ফিতে থাকে ভেতরে...'

'বাকশো কী বলছিস? ওই স্যুটকেশটা?' ললাটে ভাঁজ কিরণময়ীর—'সেই সেবারে বোম্বে থেকে ফেরার পর কী যে ছাই হলো, লকদুটো বন্ধই হচ্ছে না। কেউ গিয়ে যে সারিয়ে আনবে, সময়ও হচ্ছে না কারুর? সাহেব ওটা নিয়ে বেরোতে চান না

বলে পড়েই আছে সেই থেকে। সে-তুই ওটা নিয়ে কী করবি? সে-তো এখন প্রায় হাজার তিনেক টাকা দাম...'

নিরুত্তর রাধা। সাহেববাড়ির সব কিছুতেই হাত বাড়ানোর কোনো বাসনা তার থাকার কথা নয়। অথবা নিতান্তই বাতিল বলে যা ভেবেছিল সে, যদি তারও দাম তিন হাজার টাকা, তিন হাজার টাকার পুরো অঙ্কটা থই পায় না মগজে।

এবং অপ্রত্যাশিত—'হাঁ, অ্যাদ্দিন ধরে আছিস, নিয়ে যাবার মতো তোর জিনিসপত্রও তো কম নয়। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে বিচ্ছিরিভাবে যাবি আমার ঘর ছেড়ে, দেখতেও তো খারাপ লাগে। স্যুটকেশটা তো বাথরুমের দরজার ওপরের খুপরিতে পড়ে পড়ে নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। তা তুই চাইছিস, দ্যাখ কী করতে পারিস। লাগে তো দ্যাখ চেষ্টা করে...'

আকস্মিক বরলাভে উদ্বেল রাধা। ভি. আই. পি. স্যুটকেশ বলে এগুলোকে, সে জানে । ভি. আই. পি. কী? কাকে বলে? মানে জানে না।

কিংবা সব কিছুর মানে জানারও কোনো মানে নেই। ব্যবহারে বা অব্যবহারে প্রয়োজন কিছু পাবার। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নিজের অধিকারে কিছু থাকার। আর সকলের চোখে ভেলকি লাগে তো নিজের হাতে মায়ামুকুর।

বড় সহজেই পেয়ে যায় রাধা। কিছু একটা পেয়ে গেল সে। ভারাক্রান্ত অবশ দেহেমনেও একটা চাপা উদ্দীপনা চাগিয়ে উঠতে থাকে ভেতর থেকে। পালানভাইকেও সঙ্গে নিলো। একতলায় বাঘার ঘরের পাশে দরজায় ঠেস দিয়ে একটা ঘরাঞ্চি দাঁড় করানো থাকে গোটা বছর। যথেষ্ট ভারি একটা মই। দিদি আর ভাই দুজন দুদিকে ধরে দোতলায় তুলে নিয়ে আসতে দু'জনকেই ঘেমেনেয়ে উঠতে হলো। কিন্তু উৎসাহে ঘাটতি ছিল না। বাথরুমের ডগায় বাহারি কাঠের পাল্লায় ঢেকে রাখা এমন একটা খুপরি আছে গোপন, কত কী যে টুকিটাকি হাবিজাবি তুলে রাখা আছে অন্ধকার গর্তের ভেতর, বাইরে থেকে দেখে টেরই পাবে না কেউ। রাধা জানে। গোটা বাড়িতে শুধু রাধাই জানে সেখানকার যাবতীয় অকেজো আর বাতিল জিনিসপত্তরের হিসেব। ঘরাঞ্চি বেয়ে ওপরে ওঠা বা নামার গেছোমিটা সেই করেছে এতকাল। এবং আজও সাহেববাড়ির গোপন গুহায় ঢুকে সাতসতের ফালতু জিনিসের ভিড় ঠেলে প্রায় তিন ফুট বাই দু-ফুট বেশ বড়সড় সাইজের স্যুটকেশটা খুঁজে বের করল একাই। কোমর ভেঙে ঘাড় নুয়ে ঠেলেঠুলে ওপর থেকে বাইরের দিকে বাড়িয়ে ধরতে ঘামে ঘামে ভিজে হাঁপিয়ে উঠল এবং মইয়ের দুটো ধাপ ওপরে উঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে সেটা নামিয়ে আনতে আরো বেশি নাজেহাল পালান।

হলুদ নয়। হালকা ঘিয়ের রং। ধুলোয় ধুলোয় পুরু পলেস্তারা পড়ে চেহারাটাই বদলে গেছে পুরোপুরি। ওপরে-নিচে দুটো ডালাব ধার ঘেঁষে ঝকঝকে ইস্পাতের বর্ডারে জেল্লা কমেনি এতটুকু। ডালা দুটো কাঠ নয়, লোহা নয়, ইস্পাত নয়। কী দিয়ে যে তৈরি, জানা নেই। অথচ বেশ পাকাপোক্ত, শক্ত। হালুমমারা চোখে দেখছিল পালান। অনেক প্রশ্ন তার। কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সাহেববাড়ির-মা। কোনো সাহসই ছিল না কিছু বলার।

কিরণময়ী দেখছিলেন কাণ্ডকারাখানা ওদের। নিচু হয়ে নিজের হাতে পরখও করলেন একবার—'এতো দুটো লকই খারাপ হয়ে গেছে রে। চাবিফাবিও নেই। এটা তুই নিবি কী করে?'

'মাথায় তুলে নেব গ মা।'

'এমন দামি একটা স্যুটকেশ শুধু মাথায় করে নিবি? একটু ধাক্কা লাগলেই তো সবটা খুলে যাবে। লোকে বলবে কী? সবাই হাসবে...' নিজেই হাসলেন কিরণময়ী —'কর, যা তোদেব খুশি...'

কিছুমাত্র নিরুদ্যম নয় রাধা। নিজের ঘরে এনে সাবানজলের ভেজা-ন্যাকড়ায় যতই সাফ করতে চায়, শুকনো ধুলো জলের সঙ্গে মিশে গলগলিয়ে উঠে আসতে থাকে কাদায়-কাদায়। শাদা ন্যাকাডা কালো হয়ে যায়।

'এন. সি. কী রে দিদি?' পাশেই ছিল পালান। শুধোয়—'ওই যো দু-দিকে লেখা আছে এন আর সি...'

রাধা তার নিরক্ষতায় চোখ মেলে দেখে হয়তো, চেনে না বর্ণমালা। কিন্তু ভাইয়েব কাছে দাপটটা বাখতেই হয় তাকে— 'সে-ত থাকবেই। কত কী লেখা থাকে এনাদের বাশকোয। এ-কি যে-সে জিনিস ভেবেছিস? এরোপেলেনে চেপে যারা হিল্লিদিল্লি বিলেতদেশে ঘুরে বেড়ায়, এমনধাবা সব বাশকো থাকে তাঁদের। কত ট্যাকা দাম জানিস একটা বাশকোব? তিন হা...জাব... একসঙ্গে তিন হাজাব ট্যাকা গাঁয়ের বামুনবাড়িব লোকেরা, আষবাড়ির মিত্তিরবাডির হালদারদের বাড়িতে চোখে দেখেছে কেউ?'

সাবানজলে ধোয়ামোছার শেষে ঝকঝকে ফর্সায় উজ্জ্বল ঘৃতবর্ণ ফিরে আসার পর নয়নাভিরাম এক পরম সম্পদ। হাতের নাগালে কিছু না পেয়ে শাড়ির আঁচল টেনেই চারপাশ থেকে সুটকেশটাকে উল্টেপাল্টে ভেজা জল মুছে নিতে থাকে রাধা। এবাব তার লড়াই গোটা বাকশোটার সঙ্গেই। এ-ধরনের বাকশো সে খুলতে বা বন্ধ করতে দেখেছে অনেক...অনেকবার। কী যে ছাই দুটো ইস্পাতেব আংটা উঁচিয়ে আছে ডানে-বাঁয়ে, জোরে জোবে থাবড়েথুবড়ে কিছুতেই আর বসানো যাচ্ছে না ঠিকমতো। অথচ ও-দুটোকে বাগে আনতে না পারলে হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া যাবে না সাহেবদের কাযদায়। উড়োজাহাজে চেপে সাতসমুদ্দুরে আকাশপাড়ি দেয়। তার ইজ্জতই আলাদা। ভোল বদলে যায়, সেটা যার হাতে থাকে, তারও।

তক্তপোশের ওপর স্যুটকেশের দুটো ডালাই ছড়িয়ে বাখল এপাশ-ওপাশ। এমন সব বাকশোর ওপরে নিচে দু-দিকেই জামাকাপড় চেপে বাখা যায় অনেক বেশি। ফিতে টেনে আটকে রাখা যায় দু'দিকেই। ভেতরে নড়বে-চড়বে না কিছু। এলোমেলো হবে না। জট পাকাবার ভয় নেই। নতুন পাওযা শাড়িগুলো সে সাজিয়ে রাখতে থাকে পাট করে। পুরনো ভালো শাড়িও তো তার আছে কিছু। দিদিমণিদের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাডিযে পাওযা হরেক বঙের হরেক ফ্যাশনের চুড়িদার-জিনসের প্যান্ট, গেঞ্জি, টিশার্ট —এতদিন যেগুলো তার টিনের বাকশোয বা বিছানার তোশকের তলায় ভাঁজে ভাঁজে রাখা ছিল, সবই ভরে যেতে থাকে নতুন সুটকেশে। টিনের বাকশোটা সে নাকচ করে দিচ্ছে না এখনই। ঘরে-পরার শাড়ি শায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার ছাড়াও তার সংগ্রহের প্রসাধন-

সামগ্রীর কৌটোকাটা শিশিও নেহাত কম নয়। সাবেকি টিনেব বাকশোয় থাকবে সেসব। পালানের হাতে থাকবে সেটা। সুটকেশটা সে নিজের মাথায় বইবে। এমন একটা জেল্লাদার বাকশো? দেখবে দশজনে।

ভরাট বিস্ময় নিয়ে এতক্ষণ চুপচাপই ছিল পালান। বলল ফিসফিসিযে—'তালা ঝুলবে কোথায় রে দিদি? তালাচাবি থাকবে নি ত এ-কেমনধাবা বাশকো? সবই ত চুরি হয়ে যাবে।'

'তালা? তালা আবার কী? শুনলি নি, মা বললেন—চাবি হাবিয়ে গেছে। দু-পাশের আংটাদুটো বন্ধ কবে এই এখেনে... মাঝখানে চাবি দিতে হয...' রাধা পবম বিজ্ঞতায —'সববায়েব মত তালা ঝুলবে ত সাহেবদেব বাশকো হবে কেনে? দেখিস নি টিভিতে? এমনধারা কত সুন্দব সুন্দব সব বাশকোব অ্যাডভাটাইজ থাকে। হাজাব হাজার ট্যাকাব সব জিনিস। সাহেববাড়িতে যা-যা দেখবি, সবই টিভিতে থাকে। টিভিব ভেতব যাদের দেখিস, সব্বাই সাহেব।'

শুধু তো স্যুটকেশই নয। কোথাও তালা ঝোলে না সাহেববাড়িতে। কিন্তু লক ভেঙে চোব ঢুকবে? অত হিম্মত আছে কাব? অথচ বড সহজেই খোলামেলা ঘবে সোনাদানা হারিয়ে যেতে পারে ওদের। হবেক রঙে ঝাড়পোছে এমন তকতকে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন ঘবদোব, হীবে মুক্তো ছিটকে পডলেও বঙিন মেঝেব ঝাঁকিবুকিতে কোথায় মিশে যায, খুঁজে পাওয়াও মুশকিল।

বান্ধবীর জন্মদিনে নেমন্তন্ন ছিল বুলবুলির। নিজেদের গাড়িতেই যাওযা-আসা। ফিরতে ফিবতে রাত হলো। আধুনিক সাজসজ্জায় বাতিল ফ্যাশন হলেও কী যে ঝোঁক চাপল মাথায়, হালকা গোছের পাথরসেট একটা নেকলেস পবেছিল গলায়। কানে দুটো ইয়াবরিং ছিল। বাড়ি ফিরে রাত প্রায় দশটায় নিজেব ঘরে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে আবশিতে মুখ বেখে নিজেকে দেখতে দেখতেই ঘাড বাঁকিয়ে ডান দিকেব দুলটা খুলে, হাতেব মুঠোয় রেখেই যখন বাঁ দিকের কানে হাত এবং খুলেও ফেলেছিল দুলটা, ভযাবহ কাণ্ড আচমকা—এক লাফে সন্ত্রাস আব আতঙ্কের চিৎকার তুলেই ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে এমন হুলুস্থুল, কাছাকাছি ছিলেন যাঁবা, ছুটে এলেন সকলেই। উল্লম্ফনের তীব্রতায় নিজেকে সামলাতে চেয়ে ডিভানের ধাক্কায় হাত ফসকে দুটো দুলই কোথায় যে ছিটকে পড়ল, প্রাথমিক খোজাখুঁজিতে চোখে পড়ল না কারুর।

ঘরেব ভেতর কোনো চোর নয় ডাকাত নয—একটা আরশোলা। নিজেব দিকে তাকিয়ে থাকার মুগ্ধতায় যখন সে গুনগুন গান গাইছিল, হঠাৎ যে কোত্থেকে সেই বীভৎস পতঙ্গ এসে আটকে গেল আয়নার স্বচ্ছতায— সেটা মুখোমুখি কাচেব ওপরই এসে বসেছিল কিনা কিংবা উল্টোদিকের দেয়াল থেকেই তার ছায়া পড়েছিল কাচে, এক পলকের দৃষ্টিপাতে তারও কোনো নিশ্চয়তা স্পষ্ট নয়। কেননা ভয়ঙ্কর সেই দুর্বৃত্ত চোখে পড়ল না কারুর। উড়ে পালিয়েছে।

বলা বাহুল্য, কিরণময়ী ক্ষুব্ধ। তিতিবিরক্ত মাতৃহুঙ্কার—'দুলদুটো খুলেছিস তো হাতে নিয়ে বসেছিলি কেন? টেবিলেও তো রেখে দিতে পারতিস?

'হু নোস, দ্যাট উইল হ্যাপেন? হোয়ার ডাস ইট কাম ফ্রম?'. ভয় কিনা জানা নেই। ঘৃণাও হয়তো নয় ঠিকঠিক। ভয়-ঘৃণা-বিরক্তির রসায়নে কী যে একটা গা-ঘিনঘিনানি শরীর ভরে, আপাতত সোনার দাম ভুলতেই পারে বুলবুলি। কিছুটা বিহ্বল—'গায়ে এসে পড়ত যদি? পড়তেও তো পারত?'

'সে-পড়লই বা। আরশোলা কি বাঘ না ভল্লুক? খেয়ে ফেলত তোকে?' বেশি দূর এগোতে পারেন না কিরণময়ী নিজেও। এমন একটা ব্যাধি তাঁর নিজেরও আছে। বলা যায়, মায়েরই উত্তরাধিকার। কুণ্ঠিত গলার স্বরে—'দ্যাখ দেখি, কোথায় ফেললি দুল দুটো? এখন এই রাত্তিরবেলা কোথায় যাবে? খুব একটা ছোটখাটো জিনিসও তো নয়। চার-আনা চার-আনা করে আধ-ভরির মতো তো হবেই...'

'কোথায় আর যাবে? ঘরেই তো পড়েছে মা। খুঁজলেই পাওয়া যাবে। ইট ক্যান নট ফ্লাই লাইক দ্যাট ককরোচ...' পাশেই ছিল মুনমুন। তাকাল বোনের দিকে—'ওফ, হোয়াট গোডেড ইউ টু পুট দোজ গোল্ড অ্যান্ড অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি?'

'হোয়াই? হোয়াট দ্য হেল...' আত্মপক্ষে বুলবুলিও তৎপর—'ডু আই কেয়ার এনি চিক? আই উইল সেট এনিবডিস হেড অ্যারাইট...ইউ নো?'

'ননসেন্স...' ঊর্ধ্বলোক থেকে বাবনও নেমে এসেছিল নিচে। এবম্বিধ তুচ্ছ সাংসারিক উপদ্রবে কিছুমাত্র উদ্বেগ থাকে না তার। বরং সে বিরক্তই কিছুটা—'আমি তো ওপরে বসে ভাবছি, ডাকাতফাকাত পড়ল নাকি ঘরে? অ্যান্ড অল ফর এ ককরোচ... অ্যান ইনসেক্ট? একটা ককরোচ তো পুরুষফুরুষ নয় রে বাপু দ্যাট গার্লস আর স্ক্রিমিং ফর ওয়ান হ্যাজ এনটার্ড দ্য রুম। এফ. আই. আর. কান্ট বি লজড ফর দিস!'

'ডু ইউ মিন ইট ইজ এ পেটি থিংগ?' কিছুটা বেকায়দায় বুলবুলি দাদার সঙ্গে সম্মুখসমরে।

'ধ্যাৎ, থাম তো তোরা...' খিঁচিয়ে উঠলেন কিরণময়ী—'আজেবাজে বুকনি ছেড়ে খুঁজে দেখবি তো একটু! কোথায় পড়ল সোনাদুটো?'

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গিয়েছিল আগে থেকেই। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে হৃতসম্পদ খুঁজে দেখার মতোই বহুবর্ণময় আলোর ঘরে চার জোড়া চোখের দৃষ্টিতে এক জোড়া ইয়াররিং ক্রমশই অলীক হয়ে উঠতে থাকে—যা আছে, হারায়নি। নিশ্চয়ই আছে কোথাও, এখানেই, এই ঘরে। অথচ নেই। সত্যি নেই। অঘোষিতভাবেই বুঝি একটা কানামাছি খেলা। কে আগে খুঁজে পেতে পারে অনধিক পতঙ্গের মতোই কোনো পরম সম্পদ। প্রাণনাশী কিছু নয়। কিন্তু অস্তিত্বের বিভীষিকা। যা খুঁজে না পেলে দেউলে হয়ে যাবে না চাটুজ্জে-পরিবার। কিন্তু সন্ধান পেলে না-হারানোর সুখ।

পনের-বাই-বারো মোটামুটি একটা প্রশস্ত ঘরের মাঝখানে ঘূর্ণ্যমান পাখার তলায় সিঙ্গল ডিভান, ছিমছাম ঘরের দেয়াল ঘেঁষে টেবিল চেয়ার ওয়ারড্রোব ড্রেসিং-টেবিল খুচখাচ আসবাবের পরও শয্যা ঘিরে চারপাশে ফাঁকা জায়গা কিছুটা। একদিকের দেয়ালে টিউববাতি জ্বলছিল। ফার্নিচারের আঁকিবুকি ছায়াগুলোর সঙ্গে চার-চারটে মানুষের লম্বিত

ছায়াগুলোও কাটাকুটি খেলছিল মেঝেয় দেয়ালে আসবাবে। গায়ে গা বাঁচিয়ে চললেও যেখানে মানুষের ছায়ার সঙ্গে মানুষের ছায়ায় অনাঘাতের ধাক্কা লেগে যেতেই পারে। কিরণময়ী অন্য দেয়ালের টিউবও জ্বেলে দিলেন। সাইড-ল্যাম্প দুটোও জ্বলল। আপনজনদের ছায়াগুলো মুছে যাবার পরও আসবাবপত্রের খাঁজে খাঁজে আনাচে-কানাচেয় অন্ধকার দানা বেঁধে থাকে। বিছানার ওপর উঠে গিয়ে হামা দেবার ভঙ্গিতে বেডকভারে হাত বুলোতে থাকে মুনমুন। গাঢ় হলুদ আর টার্কিশ ব্লুতে ডোরাকাটা সুন্দর একটা চাদর শিয়রের-বালিশ আর পাশবালিশ ঢেকে ছড়িয়ে রয়েছে এমন, হলুদে হলুদে মিশে থাকতে পারে সোনার রং। শাদা চোখে দেখা যায় না। ঘাড় খাটো করে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ নজরে বুঝি হারানো-সূচ খুঁজে চলেছেন কিরণময়ী। আলাদা আলাদা তিনটি ব্যাঙ্কের লকারে গড়ে-তোলা ঐশ্বর্যভাণ্ডারে তিন পুত্রকন্যাই যে তাঁর গোপন পাশনেম, হয়তো সন্তানরাও কেউ জানে না এখনও। গয়নাগাটি আজকাল আব কেউ পরে না মেয়েরা। তাহোক, তবু সেই একই গোপনীয়তায় প্রতি দানা স্বর্ণখণ্ড মূল্যবান। সম্পদরক্ষায় প্রতি বিন্দু দুর্লভকে এমন করে জিইয়ে রাখতে হয়। সেটা লোভ নয়—সামাজিক মর্যাদা, অর্জিত সম্মান। এবং হৃতসম্পদ খোঁজাখুঁজিতে তাঁরও একই মুশকিল, গ্রে আর স্কার্লেট রঙের পার্শিয়ান ডিজাইনে আলপনা-আঁকা মোজায়েক ফ্লোরে ছোট একটু জিনিস কোথায় কী পড়ে আছে, খুঁজে পাবে কার সাধ্যি? ক্ষণে ক্ষণেই উষ্মা—'কী করলি বল তো? এখন এই রাত্তিরবেলা খুঁজব কোথায় ছাই। কর, তোদের যা খুশি। অঢেল টাকা দেখেছিস তোদের বাপের...'

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলার পর, আসলে সেটা আদৌ কোনো অপরাধ কিনা, অথবা অপরাধটা তার নিজের কিংবা পতঙ্গের, বুঝতে না পেরে দুটো হাতের মুঠো ঠোঁটে-থুতনিতে চেপে বলবুলি দাঁড়িয়ে থাকে স্থির।

বাবনের কোনো দায় ছিল না। নেহাতই অলসভাবে পায়চারির ভঙ্গিতে ঘুরেফিরে চোখ রেখেছিল নিচের দিকে। হঠাৎ হয়তো তারই চোখে পড়ে যাবে। এভাবেই অতি সহজে সব প্রতিযোগিতায় জীবনের সব বাজিই জিতে নিতে চায় সে।

'নে নে, ঢের হয়েছে। এবার সর তো তোরা। সর...' এপাশ-ওপাশ, ঘরের চারদিকেই ঘুরে ঘুরে পাখির চোখে কোণে-খুপচিতে চোখ বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত কিরণময়ী নিজেই ধৈর্যহীন। কিংবা তখনও আক্ষেপের সুর—'ঘরেই পড়েছে যখন, সেটা কথা নয়, ঘরেই থাকবে। কিন্তু কাল সকাল থেকে যে আবার রাধুও থাকবে না। নতুন একটা মেয়েকে ঠিক করেছে নন্দ। তার যে আবার কী মূর্তি হবে, কে জানে। ঘর ঝাড় দিতে গিয়ে সেটা যে কার হাতে গিয়ে পড়বে, ঠিক আছে? এভাবে যে কত জিনিস নষ্ট করছিস তোরা...'

খবর শুনে, এমন কি, নন্দলাল পর্যন্ত উঠে এসেছিল ওপরে। ঘরের বাইরেই এক কোণে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল গোপালের-মা, সুমতিবালা। মায়ের গা ঘেঁষে পালান। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের ঘরে এদের ঢোকার প্রয়োজন হয় না কখনওই। আজ তো অবশ্যই প্রবেশ নিষেধ—কেন না সোনা।

সর্বাংশে কাঁসাপেতলের মেয়ে নয় রাধা। ডাক পড়ল তার। কিংবা রাধা নিজেই

জানত, ডাক পড়বেই অকুস্থলে। শক্ত-কাঠির নরম-কাঠির দু-দুটো ঝাঁটা দু-হাতে নিয়ে সশস্ত্র প্রবেশ তার এবং এসেই, বিছানা-তোলা বা নতুন করে বিছানা-পাতায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যে-কাজটা তার নিত্যকর্মই ছিল এতদিন, একই ভঙ্গিতে নারকেল-কাঠির খ্যাংড়া ঝাঁটায় এত বেশি অনাবশ্যক শব্দ তুলে, বুঝি কোনো গা-জ্বলুনির আক্রোশেই হয়তো-বা, গায়ের জোরে বিছানাটার ওপর আছড়াতে লাগল এমন, মনে হয়, শুধু স্বর্ণসন্ধান নয়, সোনায়-মোড়া গোটা সাহেববাড়িটাই সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে এখন এই আয়েশি শয্যায় এবং সে পেটাচ্ছে। দেদার মারছে। ডান-বাঁয়ে কে বা কারা আছে, কী ভাবছে বা কী বলছে কে—বেজার মুখে হুঁশ নেই। নীল-হলুদে বাহারি নকশা-আঁকা বেডকভারের আবরণে মাথার-বালিশের পাশ ঘেঁষে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে-থাকা পাশবালিশটা বুঝি কোনো একজন মানুষ। সাহেববাড়িরই কেউ। এতকাল বাদে হঠাৎই সে ঝাঁটাপেটায় পেয়ে গেছে কাউকে। সে মারছে, সাবানজলে কাপড় আছড়ানির নির্মমতায়। নির্দয় নিষ্ঠুর।

সবাই দেখছে। হাসছে মজায়, তামাশায়। মেয়েটার আন্তরিকতায় সংশয় ছিল না কারুর। হৃতসম্পদ ফিরে পেতে চাইলে এভাবেই পেতে হবে।

'আরে দাঁড়া দাঁড়া, বেডকভারটা ছিঁড়ে ফেলবি নাকি?' খুব একটা ক্রুদ্ধও নন কিরণময়ী—'না না, বিছানায় পড়েনি। সে-হলে তুই যা করছিস, এতক্ষণে বেরিয়ে আসত...'

হাঁপাচ্ছে রাধা। থামল। ফিরে তাকাল বুলবুলির দিকে—'কোথায় বসে ছিলে বলো তো তুমি? ডেরেসিং-টেবিলের সামনে এই টুলটায়? আর্শলাটা কোথায় ছিল? যখন দেখলে, লাফ মেরে উঠলে? হাত থেকে ছিটকে গেল যখন, কোনদিকে হেলে ছিলে? কোনদিকে গেল মনে হয় বলো দেখি...'

এবং বুলবুলির এলোমেলো বেখাপ্পা উত্তরগুলি ঠিক বা বেঠিক, রাধা নিজের মতো করে যাচাইয়ের পর একটা জ্যামিতির ছক কষে নেয় মনে মনে। একজোড়া ইয়ার-রিং যত বড় আর যত মূল্যবানই হোক, বিশাল মাপের কিছু নয়। চারপাশের দেয়াল-আলমারি আসবাবপত্রের অবস্থানগুলি যদিও তার সবই জানা, ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সে একটা হিসেব মেলায়। ছুঁড়ে তো মারেনি কেউ। হাত ফসকে গেলে কতদূর আর যেতে পারে? হয়তো সরাসরি পড়েনি কোথাও। দেয়ালে ধাক্কা লাগতে পারে। ধাক্কা লেগে চলে যেতে পারে সাইডটেবিল বা আলমারি বা ওয়ারড্রোবের পেছনে অন্ধকারে। ডিভানের তলায়ও চলে যাওয়া সম্ভব। অভিজ্ঞ গোয়েন্দার ভঙ্গিতে অথবা কোনো ওঝাগুণিনই হয়তো, রাধা খ্যাংরা-ঝাঁটা ফেলে দিয়ে দ্রুত ফুলঝাড়ু তুলে নিলো হাতে। ঝপ করে বসে পড়ল মেঝেয় এবং এভাবে দুটো পায়ের দশটা আঙুল বা দুটো হাঁটুর নির্ভরতায় মাথা উঁচিয়ে রাখা নিশ্চিতই উপবেশন নয়। হঠাৎ-ই সর্বাঙ্গ ভেঙে উপুড় হয়ে আধাআধি শুয়ে পড়ায় দুটো পায়ের পাতা বা দুটো হাঁটু বা দুটো হাতের কনুই বা দুটো হাতের সবটাই মেঝেতে ফেলে সমতলে মিশে যাবার পর উঁচিয়ে-থাকা পাছা থেকে শিরদাঁড়াটা ঢালু হয়ে পড়ল এমনভাবে, সাহেববাড়ির আপন মানুষরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে দেখল—পায়ের কাছে লুটিয়ে-পড়া উঁচনো পাছায়

হলুদ-বেগুনি ডুরে-শাড়ি বা পিঠের বাদামি ব্লাউজ বা মাথার কালো খোঁপা বা গাত্রবর্ণেব কৃষ্ণতায় আস্ত একজন মানুষ কী করে অনায়াসেই বিশালাকার একটা পতঙ্গের চেহারা পেয়ে যায়—বড়সড় মাপের কোনো আরশোলারই রকমফের।

কিন্তু সোনা ফিরে আসে না। রোজকার মতো আজই সকালবেলা একপ্রস্থ ঝাড়পোছের পর এক দুপুরে কতটুকু আর ধুলো জমতে পারে এমন বাহারি মসৃণ মেঝেয়? ধুলোও আসে না খুব বেশি। বুকের হাঁপ টেনে হাঁটুতে পায়ে ভর রেখে সোজা হয়ে বসল রাধা। উঠে দাঁড়াল না। কেননা, মায়ের চোখে প্রত্যাশা বাড়ছে, সে বুঝতে পারে। হাঁটুপায়েই ঘুবে গিয়ে হামা দিযে চলে যায় ড্রেসিং-টেবিলের পাশেই বুকসেলফের দিকে, যাব তলানিতে ঝাঁটা টেনে টেনে যেখানে, এমন কি, ছিটেফোঁটা ধুলোও সুদুর্লভ, বুকসেলফ থেকে সরে গিয়ে ওয়াবড্রোবেব তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। গৃহী দর্শকজন নিশ্চিতই খুশি। অধুনা নাবীদেহ অলঙ্কাব-গৌরবেব সুপ্রাচীন সম্ভ্রম হাবালেও সোনা অতীব মূল্যবান। এবং সেই মহার্ঘ বস্তু হাত ফসকে ছিটকে গেলে অন্ধকারের খনি থেকে তাকে নতুন করে তুলে আনার অকাতর শ্রমে বা অন্তবঙ্গতায় যদি কেউ এতই দরাজ-দিল, প্রসন্ন থাকতেই হয় তাব বিশ্বস্ত আনুগত্যে।

'কি বে, পেলি?' উৎকণ্ঠায কিরণময়ী।

'না গ মা...' আঁচল-চাপা উচ্চারণে কিছুটা আনুনাসিক স্বব বাধার—'এখেনেও নেই...'

'নেই তো মুখ থুবড়ে ধুলোব মধ্যে পড়ে আছিস কেন? ওঠ্।'

সকলেই কিঞ্চিৎ বিহ্বল। শুধু তো অন্ধকারের খনি নয়, সমুদ্রের তলায় মুক্তো খুঁজতেও ডুবুরি হয়ে যেতে পারে যে-মেয়ে, ওয়ারড্রোবের তলায় উবু হয়ে পড়ে, কি জানি কেন, বড় বেশি সময় নিয়ে ঝাঁটা টানছে বড় আস্তে আস্তে। আরো অদ্ভুত, পিঠেব আঁচল বাঁ-দিক থেকে টেনে পিঠ ঢেকে নাকমুখ চেপে ধরল বাঁ-হাতে। হয়তো ধুলো। ধুলোয় এলার্জি।

এবং আচম্বিতে উঠে বসতেই চাইল রাধা। কিন্তু মাথা তুলে সোজা হয়ে বসার চেষ্টায় এত বেশি সাবধানী কিংবা হয়তো শারীরিক কষ্টযন্ত্রণাই মেয়েটার, সকলেই তাকিয়ে থাকে উন্মুখ। হঠাৎই অপ্রত্যাশিত, এক ঝাপটায় মেয়েটার উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিও এমন বেখাপ্পা, দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁরা, সকলেই নাড়া খেলেন।

এলোমেলো বুলবুলি ত্রস্ত ব্যগ্রতায়—'কী হলো? তুই উঠে পড়লি যে? ওদিকটায়... ওই সাইডটেবিলেব তলায়...'

নাকমুখের আঁচল নড়ে না বাধার। চাপা স্বরে—'এখনে এই রাত্তিরবেলা হবে নি গ। দেখব'খন কাল সকালে।'

'সকালে কখন দেখবি তুই?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন কিরণময়ী—'কাল সকালেই তো চলে যাচ্ছিস তোরা। তাই তো বলছে তোর মা।'

রাধা শুনল না। দ্রুত ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটার এত বড় উদ্ধত আচরণ অথবা হয়তো এই প্রথম, সরাসবি অবাধ্যতায় স্তম্ভিত কিরণময়ী স্থিরপলকে তাকিয়ে বইলেন, যতক্ষণ রাধার প্রস্থানের টানে দরজায় ভারি পর্দাটা কাঁপছিল—'মানে? হঠাৎ কী হলো ওর?'

'হোয়াই ডোণ্ট ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হার? সি ইজ নট ইন হার এলিমেণ্টস...সিন্স চাইল্ডহুড মেনি এ প্র্যাঙ্কস ইউ হ্যাড উইথ হার। নাউ গোয়িং অ্যাওয়ে লিভিং ব্যাক অল অব আস...'

'কী? কী বলছিস তুই আবার?' মুনমুনের দিকে ধমকে তাকালেন কিরণময়ী —'বাংলায় বল্।'

'দেখছই তো, কদিন ধরেই ও যেন কি-রকম কি-রকম করছে। মনটন খারাপ...'

'আ পুয়োর সোল।'

'খারাপ তো সে-আমি কী করব? আমি কি ইচ্ছে করে তাড়িয়ে দিচ্ছি নাকি ওকে?' কিরণময়ী ক্ষুব্ধ। দিশেহারা চোখেমুখে—'তারপরও কিছু কম করেছি নাকি ওর জন্যে? আজও দুপুরবেলা ডেকে কতগুলো ভালো শাড়ি দিয়েছি। জিজ্ঞেস কর তো সত্যি কিনা! সেই যে তোর বাবার সুটকেশটা! শুধু লকদুটোই সারানো হচ্ছে না বলে পড়ে ছিল অ্যাদ্দিন। অত টাকার একটা জিনিস কেউ কাউকে দেয়? আর ওটা দিয়ে ও কী করবে? তা যাক গে, নিজে থেকে চাইল। দিয়ে দিলাম...'

এ-রকম একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর, বলা বাহুল্য সকলের মধ্যেই কিছুটা অস্বস্তি ছিল। বাবন আস্তে আস্তে লঘু পায়ে চলে যাচ্ছে, দেখল সবাই। শুধু আগুন নেভে না কিরণময়ীর—'কাউকে তোয়াক্কা নেই? আমার মুখের ওপর এভাবে চলে গেল? দ্যাখ্ দ্যাখ্, কি বিচ্ছিরিভাবে এগুলো ফেলে রেখে গেছে। এর মানে কী? এগুলো এখন কে সরাবে এখান থেকে? আমি?'

নিশ্চিতই বেয়াদপি। জঘন্য একটা ব্যাপার—দুটো ঝাঁটাই মেঝেতে পড়ে আছে। দুটো ভিখিরি-ঝাঁটা মেঝেয় পড়ে-থাকা যে কী পরিমাণ ইন্‌ডিসেণ্ট—বিশেষত গোছগাছে ঘরদোরের ডিসেন্সি বজায় রাখাই যেখানে গৃহকর্ত্রীর প্রশাসনিক নিপুণতা, সেক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, একজন বেতনভুক 'কাজের-মেয়ের' এতদৃশ ধাষ্টামি এক অসহনীয় উৎপাত। এখন প্রশ্ন, কে এই ঝাঁটা দুটো হাতে করে তুলে নিয়ে যাবে প্রায় বাইশ শো বর্গফুট কার্পেট-এলাকার প্রান্তে ঠিকঠিক জায়গায়?

'আমি একবারটি দেখব গ মা?'

সকলেই ফিরে তাকিয়েছে। দরজায় সুমতিবালা।

'তুমি আবার কোত্থেকে এলে? কী চাও?'

'দু-দিনের তরে এয়েচি গ মা। কাল চলে যাব। আর আজই এমন সব অলক্ষুণে কাণ্ড...'

'কেন? ওতে তোমাদের কী? তোমাদের বলেছে কেউ কিছু?' দু চোখের আগুনেই ত্রিনয়নী বজ্র কিরণময়ীর—'আমার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে হবে না তোমাকে। নিজের মেয়ের কাণ্ডটা দেখেছ? সেই ছোটবেলা থেকে এত বড় হয়েছে এখানে, এই বাড়িতেই। আর আজ এমন কি তালেবর রাজরানী হয়ে গেছে যে আমারই সামনে ঝাঁটা ফেলে কাজ ফেলে চলে যায়?'

কিছুই বলার নেই সুমতিবালার। সোনার ঝাপট বড় সাংঘাতিক। মাটির রাজাও সোনার প্রজা—জানে গেঁয়ো মুখ্যু মেয়েমানুষও।

'বললেই তো হবে না। হয় না। সবার সব কিছু সয় না...' ক্রোধের উদগারে ভাটা টানতে চাইছেন কিরণময়ী। ভিন্নতর বিস্বাদে—'আরে বাপু, যার যেখানে জন্মো, যেমন স্বভাব, তেমনটাই তো হবে। ওর জন্যে তো কম করা হয়নি আজ অব্দি। কিন্তু হলে হবে কী? স্বভাব বদলায় নাকি কারুর? যাও বাপু, মেয়েকে গ্রামে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে মেয়েকে মারো ধরো রাখো যা খুশি করো গে যাও। আমিও রেহাই পাই...'

ভীরু বেড়ালের আদলে ঘরে ঢুকে ঝাঁটাটা হাতে তুলে নিয়েছিল সুমতিবালা এবং দেবভূমির সেই ঘরে, পা ফেলতেই যেখানে শুধু হড়কে যাবাব ভয় অথবা আলতো টানেই ধুলোবালিশূন্য মেঝেয় অনাদরেব-ঝাঁটা নৈঃশব্দ্যের-ঝাঁটা মাটি ছোঁয়-কি-ছোঁয়-না, যদি এমন করে ঠাকুরঘবের চামব হয়ে ওঠে, অনভ্যাসের চামব টেনে টেনে, রঙে রঙে ভরে-ওঠা আলোয় আলোয় ছয়লাপ ঘরে শুধু ফাঁকফোকর নয়, কুঁজোবুড়ির ধাঁচে কোমর ভেঙে পায়ের সঙ্গেই পা জড়িয়ে হেঁটে বা দাঁড়িয়ে থেকে, কখনও হাঁটু ভেঙে বসে হামা দিয়ে অথবা একেবাবেই শুয়ে পড়ে অন্ধকারে মাথা গলিয়ে প্রাণান্ত শ্রমে আঁতিপাতি সোনা খোঁজে সুমতিবালা। জীবনে কোথাও কোনোকালে এমন করে একদানা সোনা খুঁজবে সে—এমন পরম ভাগ্যিও নাকি তার লেখা ছিল কপালে?

ঝাঁটার প্রতিটি টানে কিরণময়ীব তীক্ষ্ণ নজর ছিল। যে-কোনো মুহূর্তেই ঝলসে উঠতে পারে পরম রত্ন।

মুনমুন তাকিয়ে ছিল এক আজব তামাশায়। একটা ঝাঁটাও নাকি এমন মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে কোথাও কখনও? মোর দ্যান এ মেটাল ডিটেক্টব!

বিহ্বল বুলবুলি। ফ্রম ককরোচ টু এ রাস্টিক ডার্টি অ্যান্ড পুয়োর ভিলেজ ওম্যান? সবাই কেঁপে উঠেছে? গোল্ড ইজ নট ইনসেক্টিসাইড!

বৃথাই অন্বেষণ। নেই, সত্যি নেই। চুরি হয়নি, দেখেছে সবাই। ঘরেই পড়েছে, সবাই জানে। খোঁজাখুঁজিতেও গলতি ছিল না, প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই। তবু যে ঘরের জিনিস ঘরেই হারিয়ে কোন ভেলকিতে কোথায় উবে গেল? তাজ্জব।

শেষপর্যন্ত সোনা নয়, ভেলকিটাই বড় হয়ে উঠল। বিষাদবেদনার প্রলাপকথনের চেয়ে ঘনঘোর বিস্ময়ের চোখগুলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অনর্থের অর্থ খুঁজছে যখন, দেয়ালঘড়িতে হঠাৎ-ই সুরেলা সঙ্গীতলহরী তরঙ্গিত হয়ে ওঠাব সঙ্গে নাড়া খেলেন কিরণময়ী—'কী হচ্ছে বল্ দেখি! রাত তো এগারটা বেজে গেল। এ-ছাই আর কী হবে? থাক এখন। কাল সকালেই যা হোক আবার দেখা যাবে...'

এবং মুহূর্তেই কন্যার দিকে তাকিয়ে আরেক ঝাঁঝানি—'তুই... তুই কী করছিস? সেই তখন থেকে ধড়াচূড়াগুলো পরে আছিস? জামা ছাড়তে পারলি না এখন পর্যন্ত?'

'হাউ ফানি...' বুলবুলিও যথারীতি ক্ষিপ্রতায়—'তোমরা সবাই মিলে কী সব করে যাচ্ছ ঘরের ভেতর! আমি কোথায় কী করব?'

'কী করব মানে? এতগুলো লোক শখ করে সেই তখন থেকে খেটে মরছে

তোর ঘরে? তুই-ই তো যত নষ্টের গোড়া। সোনা হারানোর মানে জানিস্? এ-যদি এখন পাওয়া না যায়, সে-যে কার হাতে গিয়ে পড়বে কখন...'

উঠে দাঁড়িয়েছে সুমতিবালা। ঝাঁটাটা হাতে ঝুলিয়ে রেখে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। ব্যর্থতা তারই—'এত করে ত দেখলুম গ মা? পেলুম নি কোথাও...'

'সে-তুমি আর কী করবে? ও গেছে...' তিতিবিরক্ত কিরণময়ী—'যাও, অনেক হয়েছে। ঝাঁটা দুটো নিয়ে রেখে এসো জায়গামতো...'

নির্দেশ মেনেই বেরিয়ে যাচ্ছিল সুমতিবালা। ফ্যাসফেসে ভাঙা গলা। আপন মনেই —'যাবে আর কোথায় গ? আছে। কোন খুপচিতে পড়ে আছে ঘরের ভেতব। চোখে পড়বেই কারুর না কারুর...'

স্তব্ধ কিরণময়ী। নিজেও জানেন, আধভরিটাক সোনাব জন্য আদৌ বিনিদ্র হবে না তাঁর রাত। এ-সোনা যদি ঘরেই থাকে, কারুর চোখে পড়বেই কোনো-না-কোনো একদিন। কিন্তু কার চোখ? কোন হাত? মেয়েদের চোখে পডলে ঠিক আছে। কিন্তু দু-চার জোড়া ভাড়াটে হাত তো থাকবেই এত বিশাল ঐশ্বর্যের গৃহস্থালিতে, ওরফে সোনাব-সংসারে। এক জোড়া বিশ্বস্ত হাত, নিদেন একজন যে বড়ই প্রয়োজন।

পরদিন এতটুকু রং বদলাল না সকালের রোদে। আশ্বিনের শেষে নিয়ম ভেঙে একটু মেঘও তো জমতে পারত আকাশে! বাইরে, পুবদিকের রোদের ঝালরে দরজায় জানলায় ঘরে বারান্দায় দেয়ালে দেয়ালে তেরচা চৌকো তেকোনা ছোট বা বড় হরেক চিত্তিরে বঙে রঙে আলোর বিচ্ছুরণ। গোটা কয়েক কাক রোজই এসে বসে দক্ষিণের বারান্দায়, রেলিংয়ে। আজও চেঁচাচ্ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বড় ঠাণ্ডা নিঝুম হয়ে আসছিল সাহেববাড়ি।

শেষ বিদায়ে প্রস্তুত হয়ে উঠল ওরা তিনজন। 'ঘরের-মেয়ে' ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ঘরে। আকাশ কি জানে এক খণ্ড মেঘ ছিল ছোট বুকে? মেঘ জানে, জলও এক দহনজ্বালা? শুধু-শুধু বুক পোড়ায় মানুষের। মস্ত শহর কলকাতা কি জানে এক চিলতে ছোট একটু দুঃখু ডানা ঝাপটে মরছে ময়না কি চড়ুইয়ের ডানা-ঝাপটানির যন্ত্রণায়?

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ওরা। ঢাউস সাহেবি সুটকেশটা নিজেই ধরেছে রাধা। পাশে পুরনো টিনের বাকশোটা নিয়ে পালান। পেছনে কাপড়ে-বাঁধা পোঁটলাপুঁটলি বগলে চেপে গোপালের-মায়ের সঙ্গে পায়ে পায়ে সুমতিবালা। এগনোর পথে বারবার পা জড়িয়ে যেতে থাকে এবং সবাইকে শেষ প্রণামের তাগিদেই একবার এসে থমকে দাঁডাতে হলো চারপাশের ঘরে-ঘরে তৈরি হয়ে ওঠা বিনোদনের-ঘর বা লাউঞ্জে।

রাধার প্রস্থানকালে নিজেদের পড়ালেখা ছেড়ে উঠে এসেছিল দিদিমণিরা। সাহেববাড়ির মা অবশ্যই পাশে ছিলেন। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গীকে বিদায় দেবার প্রাক্কালে অথবা এত এত বছর ধরে একটি মেয়েকে বড় করে তোলার পর তাব শেষ প্রণাম গ্রহণের মুহূর্তে হয়তো ওদেরও কিছু বিষাদ থাকার কথা ছিল। কিন্তু ঘর-ছাড়া শরণার্থী গোছের ওরা তিনজন দৃশ্যমান হতেই, প্রথম দর্শনেই সমস্বরে এমন

করে হেসে উঠলেন সকলেই, রাধা তার সর্বরিক্ততায় কিংবা প্রত্যাশাভঙ্গে কিছুটা চমকে উঠল।

'উঃ, তোকে নিয়ে আব পারি না বাপু। দেখাচ্ছিস বটে তুই। এটা... এটা কী করেছিস?' সবিস্ময় কৌতুকে ঠিকমতো হাসতেও পারছেন না কিরণময়ী।

মাকে প্রণাম কববে বলে ওরা ওদের বাকশোসুটকেশ পোঁটলাপুঁটলিগুলো রেখেছিল মেঝের এক কোণে। বুলবুলি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুটকেশটার ওপর—'এমন একটা দামি জিনিস! তার এমন দশা করেছিস রে তুই?'

'ন্‌নাইস। নাইস ইম্‌প্রভাইসেশন...' হাসছে মুনমুন।

রাধা হতবাক। কী হলো? কী এমন দোষ করল বাকশোটা? ভাঙা সুটকেশ তো এভাবেই বইতে হয়।

হাসি আর থামে না বুলবুলিব। বং করা লম্বা নখ দিয়ে খুঁটিযে খুঁটিয়ে সে তুলে ফেলল, সুটকেশের গায়ে ইংরেজিতে কী লেখা আছে, দু-দুটো ছাপা হরফ—'এগুলো দিয়ে কী হবে? এ-তো বাপির নাম। দাঁড়া দেখছি। আমার কাছে আছে। তোর নামটা যেন কী? রাধু... রাধা কী যেন...'

বড়ই বাগ রাধার। বাকশোর গা থেকে ইংরেজি তুলে নেওয়া হলো। ইজ্জত অনেকটাই বরবাদ।

বুলবুলি তাকাল পালানের দিকে—'তুই বল্‌ না বে? তোরা যেন কী? ফুল নেম?'

'কুঁতি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কুঁতি। হাউ ফানি অ্যান্ড পিকিউলিয়ার সারনেম...' বুলবুলি নখে আঁচড় কেটে তুলে দুটো স্টিকারই আঙুলে পিষে পিষে ছোট গোল্লা পাকিয়ে কোথায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো—'রাধা কুঁতি? মিনস্‌ আর অ্যান্ড কে? আর ফব রাধা অ্যান্ড কে কর হোয়াট? ওক্‌ ন্‌-ন্‌নাইস... কৃষ্ণ? রাধাকৃষ্ণ? রাধা গোয়িং টু গ্রিট হার কেষ্ট?'

বুলবুলি ছুটে পালাল। মুনমুন তখনও দাঁড়িয়ে থেকেই পায়ের কাছে সুটকেশটাকে এপাশ-ওপাশ চারপাশ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। হাসছে—'এটা কোথায় কী করে নিয়ে যাবি রে তুই? রাস্তায় লোকে কী বলবে?'

'বলবে? হ্যাঁ, লোকের আর খেয়েদের কাজ নেই, ওদের আব কে কী বলতে যাবে? বলবে আমাদেরই। হাতে ধরে এ-রকম একটা ভাঙা সুটকেশ কেউ কাউকে দেয় কখনও?' বিরক্ত কিবণময়ী—'দাঁড়া রে বাপু, দেখি একটু। কী যে সব অদ্ভুত কাণ্ড তোদের।'

ভ্যাবাচাকা রাধা তখনও ঠিক ঠাহর পায় না, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, সুটকেশকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে? বাকশোটা যদি বন্ধ করাই না যায়, তবে আর সেটা বাকশো কেন? যদি সেখানে তালা ঝোলানোর আংটাও না থাকে, চাবি দেবাব জন্যে ছাগলের শিং গোছের কী দুটো যন্তর, সে-দুটোও যদি বেয়াড়া ধরনেব ঘাড় উঁচিয়ে থাকে, হাতে পেয়ে সে-তো ফেলে দিতে পারে না এমন বাহাবি আর দামি

একটা সুটকেশ! যে-সুটকেশ এরোপ্লেন চড়ে, সে-বাকশোটাকে চারদিক থেকে নারকেল ছোবড়ার দড়ি দিয়ে দু-ফেত্তা করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়েছে শক্ত গেরোয়।

ওদিকে নিজের ঘরে চলে গেছেন মা। মুন্নিদিদিও মায়ের পিছু পিছু। শোভাময় বিস্তীর্ণ লাউঞ্জে নিজের মা আর ভাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, রাধা, বছর ফুরিয়ে গেলে পুরনো ক্যালেন্ডারের যে হাল হয়, একই ভাবে দেয়ালের জং-ধরা পেরেকে ঝুলে থাকারও কোনো মানে নেই জেনে আলাদা হয়ে যেতে থাকে। এক পাশের টি. ভি., ভি. সি. আর. ক্যাসেট সব মিলিয়ে গোছে-গোছে-রাখা কেবিনের ওপরতলায় টিভির নীলচে কাচ এখন নির্বাক। উল্টোদিকের জানালার ছায়াপাতে দূর থেকে বোবা পর্দায় নিজেদেরও ছায়া দেখল রাধা। সে-তো আরশির ছায়া। পিঁপড়ে গোছের এত বেশি ক্ষুদে-ক্ষুদে, চেনাই যায় না কাউকে। কিংবা চেনা যায়, এমন করে টিভির ভেতর থেকে টিভির পর্দায় সে বিস্মিত দেখবে নিজেকে, এমন দুরাশা তার ছিলও না কোনোকালে। কিন্তু আজ আস্তে আস্তে পরতে পরতে গোটা সাহেববাড়িটাই একটা আস্ত আর জ্যান্ত টিভি হয়ে উঠতে থাকে চোখের সামনে, যার ভেতর সে ছিল এতদিন। চারপাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্থির খামচানি বুকের হাড়গোড়ে।

মা আর পালানভাই ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে কী দেখছে অবাক চোখে? কিন্তু পাথর-চাপা বুকে কান্নাকে আগলে রাখার কী কঠিন যন্ত্রণা! ফোলা-ফোলা গালে থুতনি-চোয়াল গুঁড়িয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে গোটা শরীরে তিরতির তিরতির কাঁপছিল রাধা। চোখের পাতায় আগল ছিল না। ঝাপসায় ঝাপসায় মেঘলা হয়ে উঠছে সাহেববাড়ি। চারপাশের চেনা-মুখের মানুষজন, রঙে-রঙিন দামি-দামি বাহারি আসবাবপত্তরে সাহেবি দুনিয়ার সমস্ত অলৌকিক—কোনোদিনই যার ছিল না কিছুই, কিংবা ছিল... সবই তার আপন ছিল, ঘনিষ্ঠ ছিল একদিন এবং এই থাকা বা না-থাকার কঠিন হেঁয়ালিতে দিশেহারা অবোধ যুবতী চেনে না নিজেকেই। বুঝি লাস্যনৃত্যে উর্বশীর তালভঙ্গ কোথাও। দেবরোষে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে তাকে মর্তে ফিরে যেতে হবে? দীর্ঘ...দীর্ঘ সময়ের বিস্বাদে অলিপ্সায় স্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিল মেটেঘর পানাপুকুর মশামাছি ঘুঁটেগোবরের যে-দেশ যে-মাটি, অথবা যে-মাটি তার আপন ছিল না কোনোদিনই...

অনেক খোঁজাখুঁজির শেষে কোথায় কী একটা খুঁজে পেয়ে ছুটে এসেছে বুলবুলি। রঙিন ম্যাকসির ঘাগরা ছড়িয়ে হুড়মুড়িয়ে হামলে পড়ল সুটকেশটার ওপর। নখের আঁচড়ে যে-ইংরেজি হরফ তুলে নিয়ে ইজ্জত কেড়ে নিয়েছিল সাহেবি সুটকেশটার, নতুন করে দুদিকে দুটো ইংরেজি হরফের স্টিকার এঁটে দিয়ে সে-কি ফুর্তি আর হাসি—'আর অন দ্য লেফট সাইড, কে অন দ্য রাইট। রামকৃষ্ণ অর রাধাকৃষ্ণ? কেষ্টঠাকুর ইজ ইন কমন...'

'মে বি ইট ইজ রাজকুমারী...' ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মুনমুন। হাতে লতপত করেছে কিছু একটা। নজর ফেললেই বোঝা যায়, খাকি রঙের একটা সুটকেশের ঢাকনা।

'এগজাক্টলি এগজাক্টলি...' বুলবুলি সহাস্যে উদ্দাম—'হোয়াইট ইট মিন্‌স? রয়েল অব রুরাল কিড?'

রাধা এসব ইংরেজি হাসাহাসির অর্থ বোঝে না। কিন্তু তার চোখের সামনে অদ্ভুত এক কাণ্ড! রাধা আজ দাসীবাঁদি নয় সাহেববাড়িতে। সাহেববাড়ির মেয়েরাই, যেন তার সখীরা দু-জন, তার শেষ বিদায়ের দিনে তাকে নিয়ে, শুধু তারই জন্য, সুটকেশটাকে উল্টেপাল্টে মেতে উঠেছে মেঝেতে। এমনতরো কত যে বাকশো আর বাকশোর ঢাকনা আছে ওদের! হয়তো কোনো এটা বাকশো থেকেই ঢাকনাটা খুলে দিয়েছেন মা! নয়তো বাড়তি ছিল। সেটাও দিয়ে দিলেন? দড়ি-বাঁধা বাকশোটার গায়ে জামা পরিয়ে দিতে হিমশিম ওদের দু-বোনের। ওরা কেন পারবে এসব? নিজেরই এগিয়ে যাবার ইচ্ছে হয় রাধার। কিন্তু এগোয় না। দুঃখভাবে তামাশা দেখে।

যেহেতু দুঃখভার, তামাশাটুকুও তুচ্ছ হয়ে যায়।

'বোঁচকাবুঁচকি সুটকেশফুটকেশ নিয়ে বোঝা তো তোর কম হয়নি দেখছি...' ফিরে এসেছেন কিরণময়ী—'এত সব নিয়ে যাবি কি করে তোরা? বাসে উঠতে পারবি? মিনিবাসে? কি জানি বাপু, ওসব বাসফাসে উঠিনি কতকাল...'

রাধা নাড়া খেলো। বুকের ভেতর টানাপোড়েনে কোনো খুশির ঝাপটা গায়ে না লাগুক, ছলকে উঠতেই হয়। নতুন করে এমন রংবাহারি ঝলমলে সেজে উঠেছে তার বিলিতি সুটকেশ? চারপাশ থেকে ঢাকনা টেনে ঢেকে দেবার পর চাপা পড়ে গেছে ছোবড়া-দড়ির বাঁধাছাঁদা। এখন কে বলবে, এটা ভাঙা বাকশো? ভাসা-ভাসা চোখের পাতায় দুই দিদিমণির দিকে তাকাল সে। বোবা আর অবোলা চাহনিতে, অবোধ কৃতজ্ঞতায়, হয়তো বলার কথা ছিল কিছু। অথচ মুখে কোনো বাক্যি ছিল না। কিছু একটা বলতে চাওয়া বা বলতে না-পারার বেদনায় খানিকটা খুশিও তো থেকে যায় বুকের খাঁচায়। এ-সুটকেশ হাতে বয়ে সে এখন আকাশের পাখি হয়ে যেতে পারে।

'না রে বাপু, এত সব বওযাবয়ি করে যাবি কী করে তোরা?' হাত বাড়ালেন কিরণময়ী—'তার চেয়ে বরং নন্দকে ডেকে বলে দে, একটা ট্যাকসি ডেকে দিক। এ-কটা তো টাকা! নে ধর...'

ট্যাকসি? শব্দটা নতুন। সাতজন্মে নাম শোনে নি সুমতিবালা। কিন্তু ঝলকে উঠল পালান। মোটরগাড়ি সে চাপেনি কোনোদিন। রাধার বাড়তি কোনো উত্তাপ ছিল না। কুণ্ঠিত হাত বাড়ায়। বাড়াতেই হয়। প্রসারিত হাতে মায়ের দান—একটা পঞ্চাশ টাকার নোট। নিজের পাওনাগণ্ডার বাইরে তেমন বড় কোনো নোটও হয়তো নয়। কুণ্ঠাও নিরর্থক। কিন্তু মুহূর্তটা সকরুণ হয়ে ওঠে রাধার কাঁপুনিতে।

মেঝেতে হাঁটু পেতে নিজেকে তিন ভাঁজে ভেঙে সুমতিবালা গড় হয়ে পড়েছে ভগবতী মায়ের চরণে। পালান বাচ্চা ছেলে। মালিক-মনিব মায়ের পায়ে মাথা ছুঁয়ে মেমসাহেব দিদিমণিদের দিকে কুঁজো হয়ে এগোতেই সে কী হুলুস্থুল লাফালাফি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড মুনমুন আর বুলবুলির—ওফ, হাউ ফানি! ইভন উই টটু আর টু বি ওয়রশিপড দাস?'

বরং পালান নিজেই ভড়কে গেল। ওরা হাসে—'সো মাচ ইন শ্যাবি ড্রেস, দে পেক লাইক বার্ডস আনহেজিট্যাটিংলি...'

এবং রাধা, শেষ-বিদায়ের প্রণাম যখন সত্যি-সত্যি আনুষ্ঠানিক হয়ে উঠল, গাগতর

ভেঙে মায়ের পায়ে গড়িয়ে পড়তে চেয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখতে চাইল নিজেকে। দাঁতে দাঁতে চাপল। ঠোঁটে ঠোঁট। পেটের নাড়িভুঁড়ি কাঁপিয়ে বুকের হাড়পাঁজরার সব কিছু নিয়ে উথলে উঠতে চাইছে কান্না। কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইলে থরথর কেঁপে ওঠে গোটা শরীরটাই।

নিচু হয়ে, এতকালের পালিতা কন্যা, বুঝি-বা নিজেরই মেয়েকে মেঝে থেকে বুকে তুলে নিয়েছেন কিরণময়ী—'গ্রামে গিয়ে থাকবি ভালো ভাবে। তোব মা তো চেষ্টা করছে। হয়ে যাক একটা কিছু। ঘরসংসাব হোক তোর। চলে আসবি যখন খুশি...'

কথাগুলোর মানে আছে হয়তো। হয়তো নেই। বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাধা। টানটান শিরদাঁড়ায় ঘন নিঃশ্বাস টেনে তুলে তাকাল দিদিমণিদের দিকে। জানে না, ওদেরও প্রণাম করতে হয় কিনা। অথবা চারপাশটা বিচ্ছিরিভাবে ভারি হয়ে ওঠার পব রাধুর দিকে তাকিয়ে থেকে ওরা দুবোন যখন নিজেরাই বিহ্বল, দুঃখু বা যন্ত্রণা নয়, রাধার বুকচাপা অভিমানটাই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

বাড়ির ছাদে ফুলের বাগান? সিঁড়িবারান্দায় পৌঁছে তিনতলায় ওঠার ধাপগুলোব দিকে চোখ রেখে এক ঝলকে কেঁপে উঠল সে। এক ছুটে উঠে গিয়ে তারই কেয়ারিতে নতুন ফুল হলুদ জবা সম্পূর্ণ হয়ে উঠল কিনা, দেখে আসার সাধ। কিন্তু ছাদ বা ছাদের ঘর? অন্য এক ধরনের কাঁপুনিতে শিরশিরিয়ে ওঠে বুকের ভেতরটা। পেছন থেকে তাড়া ছিল না কারুর। সামনের দিকেও টান ছিল না কোনো। তবু দুরূহ বোঝা সেই সুটকেশটা টেনে নেবার কষ্ট সত্ত্বেও দ্রুত ছুটে যাবার তাড়া, নিচের দিকে গড়িয়ে নামার প্রতিটি ধাপে সে হাঁপিয়ে উঠতে থাকে। হাঁপ-টানার নিঃশ্বাসগুলো সবই বোধ হয় শারীরিক ক্লান্তি নয়। মেয়েমানুষের অনেক গোপনের মতো আরো একটা গোপন ভয়। ভয়ও নয় সবটুকু। বড় মায়া হচ্ছে মানুষটার জন্যে। সকাল থেকে একবারটিও নিচে নামেনি লোকটা? কেমন বিচ্ছিবি কেঁচো হয়ে আছে ডাকাবুকো তেজী জোয়ান একটা পুরুষ মানুষ? ছাদের বাগানে হলুদ জবা অথবা ছাদেব ঘরে উসখুসে এক জোড়া চোখ! এক পাক ঘুরে এসে একবার—শুধু তো হলুদ জবা নয়, গোপন মানুষটার সঙ্গে শেষ মোকাবিলায় শুধুই এক ঝলক দেখে আসার বড় সাধ ছিল তাব।

কিন্তু সব ইচ্ছেই তো পূরণ হয় না মানুষের। মেয়েমানুষেব আবার হাজার ঝঞ্ঝাট। এবং সিঁড়ি ভেঙে গড়িয়ে নামার যা নিয়ম, এক সময় একতলায় পৌঁছে যায় ওরা। পিছু পিছু টিনের বাকশো বয়ে পালান, কাপড়ে-বাঁধা পোঁটলাপুঁটিল বগলে চেপে সুমতিবালা। কিংবা রাধা আশ্বস্ত হতে পারে, সাহেববাড়িতে আজ তার অনেক কদর। ওদের পায়ে পায়ে নিজে নেমে এসেছেন মা। সঙ্গে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি অব্দি রঙের ঝরনায় হাউসকোটের দুই দিদিমণি। ভদ্দরলোকেরা কেউ কাজেকর্মে বেড়াতে এলে সদব পর্যন্ত যেমন এগিয়ে আসেন সকলেই। রাধা আজ অনেকটাই বাড়তি আদর পেয়ে যাচ্ছে।

কিংবা তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিজের মধ্যেই তোলপাড়। রাজবাড়িতে পরিত্যক্ত হয়ে প্রকৃতির দিকে ফিরে যাবার দিনে সবটাই ঘুলিয়ে যেতে থাকে।

নিজের বাড়িতে একতলাতেও সাজগোজে গোছানো সুন্দর একটা অফিসঘর।

দুপুরবেলার সত্যিকারের অফিসে বেরুনোর আগে প্রতিদিন সকালের দিকে সেখানে বসে বেশ কিছুক্ষণ কাজকর্ম করেন নিশীথরঞ্জন। কাজের সময় সে-ঘরে প্রবেশের অধিকাব থাকে না কারুব। ওরা এসে দাঁড়াল দরজায়। কাঠের রঙেই ঝকঝকে পালিশ এক-পাল্লার দরজাটা বন্ধ। ভেতর থেকে টাইপরাইটিংয়ের খটাখট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ক্লায়েন্ট বা ভিজিটররা কেউ এসেছেন হয়তো। কফির হুকুম গেছে দোতলায়। সদব দবজাব বাইরে ঝকঝকে·চকচকে একটা নীল মারুতি।

কী আশ্চয্যি! আজ বড় সুন্দর দিন রাধাব। ইজ্জতের দিন।

প্রবেশ-নিষেধের দবজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল বুলবুলি। কি বলল, কি বুঝিয়েছে বাবাকে, বেবিযে এলেন সাহেব—'চলে যাচ্ছিস? ও হ্যাঁ, আজই তো তোব যাওয়ার কথা ছিল...'

পিঠের আঁচল বাঁদিক থেকে ডানদিকেব কাঁধে টেনে এনে ভক্তিভবে হাঁটু ভাঙল রাধা। একই ভাবে গড হযে পাশাপাশি তিনটি প্রণাম।

'থাক থাক থাক...' এ-পর্যন্তই। এরপবও পাযেব কাছে কিসব হচ্ছেটচ্ছে হিসেব না নিয়েই স্ত্রীব দিকে তাকালেন নিশীথরঞ্জন—'আমি তো এখন একটু ব্যস্ত আছি। ওদেব যাওয়াব কি করেছ? স্টেশনে যাবে কী করে? কার সঙ্গে যাচ্ছে?'

'কার সঙ্গে আবার কী? নিজেবাই যাবে...' কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চন কিবণমযীব। পবক্ষণেই ললাট সাফ—'নন্দকে তো বললাম, একটা ট্যাকসি ডেকে দিতে। হ্যাঁ, তাই যাক। কী যে ওর এত জিনিসপত্র? কত কী বেঁধেছে-ছেঁদেছে...'

পাহাড়েব চেয়েও উঁচু একজন মানুষ! এত এত বছবে কত অসংখ্যবার সেখানে প্রণাম রেখেছে বাধা! ঝকঝকে শার্টপ্যান্ট বা ধবধবে শাদা ঘবোয়া পাযজামা-পাঞ্জাবিব আকাশ-ছোঁয়া ঢ্যাঙা মানুষটার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস হয়নি কোনোদিন। শুধু প্রণতিতেই হবিণেব চামডায় রোমশ চটি বা দামি স্লিপাবে মাথা বেখে যাঁকে ছুঁতে পেরেছে কালেভদ্রে, সেখানে প্রণিপাতে কতটুকু আর আগলে বাখা যায় মাটি? উঠে দাঁড়াতেই হয় এক সময়।

এবং উঠে দাঁড়ানোব পব মাথায় হাত বাখলেন সাহেব। কাছে টানলেন। বুকে —'আজ কতকাল ধবে তুই আছিস এখানে! সেই এতটুকুন বযস থেকে দেখছি তোকে। আমাদেব ছেড়ে যেতে মন খাবাপ লাগছে?'

পাহাডেব বুকে মাটি নবম হযে উঠলে কলোচ্ছ্বাসের ঝবনা নামে পাথব গডিযে। থবথর কেঁপে উঠল রাধা।

'মন খারাপ করার কী আছে? কখনও যদি দবকাবটবকার কিছু হয, চিঠি লিখবি মাকে। জানাবি...' যথার্থই বড বেশি ব্যস্ত নিশীথরঞ্জন। জরুরি কাজ ফেলে অহেতুক আবেগের পর্যাপ্ত সময হাতে নেই বলেই তাঁকে পিছু ফিবতে হয এবং আলগাভাবে রাধাকে ছেড়ে দিযে খানিকটা পিঠ চাপড়ে—'মাকে ভাইকে নিয়ে যাচ্ছিস। সাবধানে যাস...'

জীবনে কটা দিন তার সঙ্গে এমন করে কথা বলেছেন সাহেব? নাকেমুখে আঁচল

চেপে এবার আর নিজেকে আগলে রাখতে পারে না রাধা। সাহেব তাঁর আপিসঘরে ফিরে যেতেই নন্দদা এসে জানালেন—ট্যাকসি এসে গেছে।

লগ্ন এসে যায়। সাশ্রুনয়নে আস্তে, খুবই ধীরে ধীরে রাধা মায়াময় সাহেববাড়ির দিকে মাথা তুলে তাকাল একবার। চোখের পাতায় ফুরিয়ে যাচ্ছে তার মোহিনী জগৎ। কিন্তু বুকের মধ্যে থেকেই যায় রাজার-প্রসাদ। সেখানে প্রবল বর্ষণ। অবিরাম বর্ষণধারায় ভিজে যায়, শুধুই ভিজে যেতে থাকে সাহেবলোক।

কিন্তু জানা ছিল না তার, সুবিশাল আনন্দধামে তার বিদায়ের শেষ লগ্নও স্তম্ভিত বেদনায় এমন করে করুণ হয়ে উঠতে পারে—তাকে নিয়ে, শুধু তারই জন্য?

পতিগৃহ উদ্দেশে
রাধার পিতৃগৃহে যাত্রা

প্রস্থান সময় উপস্থিত হলো। সুমতিবালা এবং পালান অনভ্যাসের কম্পিত পদসঞ্চারে রাধার সঙ্গে ট্যাকসিতে ওঠার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত হয়ে উঠল। দুঃখে কাতরতায় যেভাবে আলুলায়িত হয়ে পড়েছিল রাধা, সখীসদৃশ সমান বয়সী দুই দিদিমণি মুনমুন আর বুলবুলি এগিয়ে এসে শোকাকুলার অবিন্যস্ত বেশভূষাকে যথাসম্ভব গোছগাছ করে দিলো। ওদের দিকে নিষ্পলক থেকে কিরণময়ীও কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। নিজের কাছেই কোনো সদুত্তর নেই—আজ রাধু চলে যাবে বলে তিনি কেন এত উৎকণ্ঠিত? চোখজোড়া অনবরত জলে জলে ভরে উঠছে! নিতান্তই একজন 'কাজের-মেয়ে'র জন্য তাঁকে এতটা বিকল হয়ে পড়তে হচ্ছে? না জানি, নিজের মেয়েদের বিয়ে দেবার পর এ-অবস্থায় তাঁকে কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করতে হবে? যথার্থই অনুভব করলেন —'স্নেহ অতি বিষম বস্তু।' স্নেহাধারে কিছুই তুচ্ছ নয়।

এরপর অতি সযত্নে নিজেকে সংযত করে, কিছুটা থিতু হয়ে, রাধাকে বললেন —'বেলা যে চড়ে যাচ্ছে রে মা। আর দেরি করছিস কেন? গাড়িতে ওঠ...'

কথাগুলো বললেন বটে, নিজের ঘরসংসারের কথা ভেবেই নিরতিশয় শূন্যতাবোধে পীড়িত হলেন। মাইনে দিলে আরো অনেক 'কাজের-মেয়ে' পাওয়া যাবে নিশ্চিতই। কিন্তু যথাযথ বিকল্পে অন্য কোনো রাধুকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

শৈশবের খেলার সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে ছিল খুবই কাছাকাছি। চোখের জলে আকুল হয়ে মুনমুনের দিকে ফিরে তাকাল রাধা—'আমি চলে যাচ্ছি গ মুন্নিদিদি। তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে নি। কিন্তু...'

বিমর্ষ মুনমুন—'তুই আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছিস? আমাদেরও কি ভালো লাগছে তোকে ছেড়ে দিতে? তোকে ছেড়ে দ্যাখ কি রকম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাড়িটা...'

কিরণময়ী আরো একবার সস্নেহে হাত রাখলেন রাধার পিঠে—'আর কেন দেরি

করছিস রে মা? এরপরও তো রেলগাড়ি ফেলগাড়ি চেপে কোথায় যেতে হবে তোদের। গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গাড়িয়ে যাবে...'

'বাগানে হলুদ জবাটা কালই ফুটেছিল গ মা। আজ আরো কত বড হলো?' বাধার সজল চোখের আর্তি চকিতেই বাঁক খায় সম্মুখবর্তী অথবা দূববর্তী সখীদের দিকে—'গাছগুলোকে দেখো গ দিদিমণি। ও-ত তোমরাই দেখবে গ এখন থেকে। তোমাদেরকেই দেখতে হবে...'

এতটা চাপ হয়তো সইতে পাবছিল না বুলবুলি। সত্যি সত্যি কেঁদেই ফেলল—'সে ত দেখব। কিন্তু এখন থেকে আমাদের কে দেখবে বল্ দেখি। কারুব কিছু হলেই তুই ছিলি রে। যাব যখন যা দবকার, সবতাতেই বাধু...'

কয়েক পা এগনোব পব বাধাব গতিভঙ্গ হলো। পেছনেব আঁচলে টান পডতেই, আচমকা, ঘাড ফিবিয়ে তাকানোব সঙ্গে সঙ্গে বুকেব ওপব হিংস্র থাবা, প্রবল গর্জন। নির্ঘাৎ শেকল খুলে দিয়েছে কেউ। ছুটে এসে গায়ে লাফিয়ে পডেছে দসি্য। সামনেব দিকের দুটো পা তুলে দিয়ে টানটান শিরদাঁড়ায় যেভাবে থাবলে ধবেছে নাবীবক্ষেব কোমল লজ্জা, তীক্ষ্ণ নখেব আচডে ছিঁডে যেতে পারে হালকা সিনথেটিক শাড়িব আববণ বা ব্লাউজ বা আরো গভীব স্তরে ব্রেসিয়াবের বাঁধন। তবু অমিত পরাক্রম পশুশক্তিকে দুহাতে সামাল দিয়েও আক্রান্ত সে নয়। এ-বাড়িতে যেখানে আক্রমণ, সেখানে ভীরুতা। শ্বাপদ বীভৎসায় ভালবাসা অঢেল, অবাধ।

শান্তস্বব কিবণময়ীব—'এখন এ-বেচাবির কী হবে বল্ দেখি? যাকে তুই মায়েব মতো তোয়াজ করে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে এত বড কবে তুললি, ওর রোজকাব খাবাব নিজের হাতে বাঁধতি, খাওযাতি। অসুখবিসুখ হলে ডাক্তারের ওষুধ গেলাতি নিয়ম মেনে মেনে। গায়ে যাতে পোকা না পড়ে, পাউডার ঘষতি দু-বেলা। আজ ও-ও তো বুঝতে পাবছে কিছু...'

কমলা লেবুব বঙে লালা-ঝরানো অতি দীর্ঘ জিহ্বা, তীক্ষ্ণ দুধশাদা দাঁতে ভযঙ্কব হাঁ তুলে উন্মাদ গর্জন। ভয পায় না বাধা। সোহাগ খোঁজে। কিন্তু বুকেব ভাঁডাবে কান্নাব পুঁজিও বুঝি নিঃশেষ হতে জানে। গায়ে-গা-লেপটে আলিঙ্গনে যখন নির্বাক চতুষ্পদ বা অবোধ মানবী—দীর্ঘবাহু প্রসাবণে স্নেহময়ী হাতের পাঁচটা আঙুল পুষ্যিব টানটান পিঠে শিরদাঁড়ায় মাথায় পশমেব চেয়েও মসৃণ বোমশ কার্পেটে আদর বুলিয়ে হয়তো তখনও ছুঁয়ে থাকতে চায কিছু কিংবা আনত হয়ে নেমে-আসা চুম্বনে পশুমুণ্ডে গাল ঘষে পরিত্রাণেব ভাষা খোঁজে কাতব বিলাপে—'অ্যাদ্দিন দেখেছি রে তোকে বাঘা। নাওয়াখাওয়া ছেড়ে তোব জন্যে অনেক কবেছি। এখন মা আছেন, দিদিমণিবা বয়েছেন। দেখবেন সব্বায...'

কান্না থেকেই যায তবু। বর্ষাব এক মেঘ নিঃশেষে বিক্ত হয়ে এলে নতুন মেঘ ভেসে আসে পূর্ণকুম্ভ জলভারে।

নন্দলাল এসে টেনে ধরল বাঘার গলার বকলস। কিবণময়ী এগিয়ে এলেন। পিঠে হাত রেখে কিছুটা প্রবোধ দানের চেষ্টা—'কী করছিস? কাঁদছিস কেন এমন কবে? টলে টলে পড়ছিস! হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবি যে...

বাকশোপ্যাঁটরা নিয়ে সুমতিবালা আর পালান আগেই উঠে গিয়েছিল ট্যাকসিতে। মাথা নুয়ে রাধাকেও ঢুকে পড়তে হলো। বাকশোবন্দি হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেবার বিকট আওয়াজে বৃন্তচ্যুত হয়েও বুঝি মাটি পায় না বৃক্ষের ফল বা ফুল—গাড়িতে স্টার্ট নেবার যান্ত্রিক ধ্বনির চিৎকারে চাপা পড়ে যায় অবরুদ্ধ ক্রন্দনরোল! ঝাপসা হয়ে ওঠে সাহেববাড়ি, চেনা-মানুষের মুখগুলি। হাত তুলে টা-টা বাই-বাই করছেন দিদিমণিরা, ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন মা। তাকিয়ে আছেন। নন্দদাকে নাজেহাল বানিয়ে আক্রোশের দাপাদাপি বাঘার। তুমুল চিৎকার। যতই ডাকাবুকো খেঁকুড়ে জানোয়ার হোক, বাঘাও বুঝে ফেলেছে জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি।

গাড়িটা ছিটকে বেরিয়ে এল ওদের সবাইকে পেছনে রেখে।

হাওয়ার টানে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। শহরে এসে কদিন ধরেই কোত্থেকে কী যে হয়ে যাচ্ছে ঝটাপট, সব হুজ্জুতি সামাল দিতে গিয়ে, দিশেহারায়, সব শেষে ছেলে আর মেয়েকে দুপাশে নিয়ে, সাতজন্মের পুণ্যি,—সাহেবসুবোদের ট্যাকসিগাড়িতে বসে ভাঙা পুতুলের মতো অবশ সুমতিবালা। ফিনকির তোড়ে এমন করেও নাকি ছুটতে পারে মানুষ? চোখ দুটো খুলে রাখা যাচ্ছে না বাতাসের ঝাপটায়। মাথার চুল বুকের আঁচল সামলে রাখা দায়। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। বাতাসে বাতাসে নাজেহাল শিরশিরানিতে হঠাৎ-ই ভয়—ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে বুকে। এমনিতেই বড্ড সর্দি-কাশির বাই পালানের। নিজেকে নয়, আঁচল ছড়িয়ে ছেলেকে ঢাকাচাপা দিতেই ব্যাকুল সে-রমণী।

'ধ্যাৎ, ধাত্তেরি...' শাসন মানে না ছেলে। ওপাশের জানালায় অশান্ত পালান। গায়েপিঠে মোচড় দিয়ে মাকে হটায় বিরক্তিতে। তার ডাগর চোখের অপার বিস্ময়—কলকাতা। প্রতি মুহূর্তের রোমাঞ্চে—মোটরগাড়ি। মস্ত শহর কলকাতা ঝড়ের পাল্লায় ছুটছে তার পাশে পাশে। বড় হয়ে একদিন সেও আসবে দিদির মতো। এ-শহর তার নিজের দেশ হবে।

শুধু রাধার কাছেই আলাদা কোনো মানে ছিল না আপন-ভাগ্যে-পাওয়া এসব ট্যাকসিফ্যাকসির। কলকাতার দিকে চোখ তুলে তাকাবার ইচ্ছে নেই বলেই হয়তো, অথবা নিজের কাছেই দুর্বোধ্য—এপাশের জানালায় হাঁটুর ওপর পিঠ ভেঙে মাথা ভেঙে পড়ে কাঁপছিল থরথর থরথর। সাহেববাড়ি ফুরিয়ে গেল তার? দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। জলমাটি ঘাসমাঠ ঘন সবুজ গাছপালার দেশে ফিরে যাচ্ছে সে। বাহারি টবে লালনেপালনে বড়-হয়ে-ওঠা সবুজ গাছে হলুদ জবা সম্পূর্ণ হয়ে উঠল কিনা, সে আর দেখবে না কোনদিন?